ভারতের ইতিহাস

সম্পূর্ণ খণ্ড

ডাঃ সিংহ ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের ইতিহাস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের আশুতোষ অধ্যাপক, *Rise of the Sikh Power, Ranjit Singh, Haidar Ali, Economic History of Bengal* প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

এম. এ., পি-এইচ. ডি., প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার

এবং

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক, *Peshwa Madhav Rao I, The Rajput States and the East India Company, The Eastern Frontier of British India, Indian Constitutional Documents* প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এম. এ., পি-এইচ. ডি., প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার

প্রণীত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ—কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
মূল্য : টা. ১৫·০০ (পনর) টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : প্রথম খণ্ড পৃঃ ১—২৪২, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১—৩০৯ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাঃ লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯ এবং তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ১—২৭২ শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত, নবশক্তি প্রেস, ১২৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪

ভূমিকা

আমাদের রচিত History of India নামক ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশে ইহার বহুল প্রচলন হইয়াছে। রুশ ভাষায় ইহার অনুবাদ কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। রুমানীয় এবং সিংহলী ভাষায় ইহার অনুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বঙ্গভাষাভাষী পাঠক এবং ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য আমরা ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম। অনুবাদ কার্যে আমাদের সহায়তা করিয়া শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য এবং শ্রীজগদিন্দু বাগচী আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ
শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

ভারতের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে ভৌগোলিক তথ্য

ইতিহাসের সহিত প্রাকৃতিক অবস্থার যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। কোন দেশের সীমা, জলবায়ু, নদী-পর্বতের অবস্থান ইত্যাদি সেই দেশের ইতিহাসের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। অন্যান্য দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে যেমন এই কথা সত্য, তেমনই ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধেও উহা সমান সত্য। কাজেই ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তনের কাহিনী ভালরূপে বুঝিতে হইলে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক তথ্যাদি সম্বন্ধেও উপযুক্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

সীমা—ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক: প্রাকৃতিক বিচারে ভারতবর্ষ উত্তরে, উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তর-পূর্বে পর্বতমালার দ্বারা পরিবেষ্টিত; অন্যান্য দিকে সমুদ্র উহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মদেশ কিংবা সিংহল ভৌগোলিক মানদণ্ডে ভারতবর্ষের অংশ নহে। তবে সিংহল একদা অংশ ছিল; কোনও এক সময়ে—সে খুব পুরাতন দিনের কথা নহে—উহা ভারতীয় উপদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সীমা উহার প্রাকৃতিক সীমার সহিত সর্বদা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে নাই। আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান প্রাকৃতিক অবস্থিতির দিক দিয়া বিশাল ইরাণীয় মালভূমির অংশস্বরূপ, কিন্তু ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিচারে এই দুইটি ভূখণ্ড যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। মৌর্য সম্রাট্‌গণ ঐ দুই দেশের কোন কোন অঞ্চলের উপর আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। পারসিকগণ, বাহ্লীকদেশীয় গ্রীকগণ (Bactrian Greeks), শক এবং কুষাণ প্রভৃতি বিদেশাগত জাতি আফগানিস্থানের এক বৃহৎ অঞ্চলের সহিত উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোন কোন অংশের সংযোগ ঘটাইয়াছিল। সুলতান

মামুদ, মহম্মদ ঘোরী এবং মুঘল সম্রাট্‌দের শাসনকালে ভারতবর্ষ পুনরায় আফগানিস্থানের সহিত রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মুঘলদের আমলে আফগানিস্থান ভারতীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। আহম্মদ শাহ আবদালী ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের আমলে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও কাশ্মীর আফগানিস্থানের শাসনাধীন বিভাগে পরিণত হয়। অদ্যাবধি বেলুচিস্থানের কিছু কিছু অংশ, —যাহা ঠিক ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সীমার অন্তর্গত নহে, প্রকৃতপক্ষে যাহা ইরাণীয় মালভূমিরই এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ,—পাকিস্থানের রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাবের আওতায় রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে, প্রায়-দুর্ভেদ্য গিরিশ্রেণী আসাম ও বাঙ্গালা দেশকে ব্রহ্মদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ব্রহ্মদেশ ভারতীয় সংস্কৃতির নিকট নানাভাবে ঋণী। উহা প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের সমাপ্তির (১৮২৬) পূর্ব পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক প্রভাব-পরিধির বহির্ভূত ছিল, কিন্তু ঐ যুদ্ধে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জয়লাভের ফলে ব্রহ্মদেশের কিয়দংশ বাঙ্গালা সরকারের শাসনাধীনে আসে। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতের একটি প্রদেশরূপে বিদ্যমান ছিল। ব্রহ্মের সঙ্গে ভারতের এই দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক সম্পর্কের দরুণ ব্রহ্মের ইতিবৃত্তও বর্তমান ভারতের ইতিহাসের আখ্যায়িকায় স্থান পাইবার যোগ্য।

সন্নিহিত সমুদ্রের দ্বীপসমূহ—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, লাক্কাদিভ ও মালদিভ দ্বীপ (the Laccadives and the Maldives) প্রভৃতি—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভারতীয় শক্তিবর্গের শাসনাধীনে আসিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের চোল রাজগণ এই দ্বীপগুলির কোন-কোনটিতে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সিংহল বিজয় সিংহ নামক এক দুঃসাহসিক ভারতীয় অভিযান-কারীর দ্বারা অধিকৃত ও শাসিত হয়। এই বিজয় সিংহ বাঙ্গালার অধিবাসী বলিয়া কথিত। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তনের পর ইংরেজ সরকার সিংহল এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উপর শাসন বিস্তার করে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এখনও পর্যন্ত ভারতের অংশরূপে পরিগণিত, কিন্তু সিংহল কখনও ইংরাজ-শাসিত ভারতের শাসনতান্ত্রিক গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

সামুদ্রিক বৈশিষ্ট্য: ভারতের উপকূলভাগ অতিশয় দীর্ঘ, তিন হাজার মাইলেরও উপর জায়গা জুড়িয়া এই উপকূলভাগ বিস্তৃত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও

ভারতীয় উপকূলে প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়ের সংখ্যা কম। কারণ, উপকূলভাগ প্রায়শঃ দীর্ঘায়িত রেখায় সম্প্রসারিত রহিয়াছে, ফলে সুবিধাজনক পোতাশ্রয়ের সৃষ্টি হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষীয়গণ কখনও সামুদ্রিক জাতিরূপে গৌরব অর্জনের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই ; মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, তাহাদের দৃষ্টি বরাবর উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব দিকে নিবদ্ধ ছিল। সমুদ্রপারের দেশ অপেক্ষা পশ্চিম এসিয়া, পারশ্য, মধ্য এসিয়া, চীন এবং তিব্বত তাহাদিগের সমধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিত। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা বলাও ভুল হইবে যে, সমুদ্রের রহস্যের দ্বারা কোন সময়েই ভারতীয় মন আলোড়িত হয় নাই। প্রাগৈতিহাসিক কালের দ্রাবিড়গণ বাণিজ্য ব্যপদেশে জাহাজে করিয়া সমুদ্র পাড়ি দিত। প্রাচীন আর্যগণের সামুদ্রিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকিলেও *Periplus of the Erythrean Sea* নামক সুপরিচিত গ্রন্থে খৃস্টীয় প্রথম শতকে ভারতবর্ষের সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে বহুসংখ্যক ভারতীয় সামুদ্রিক বন্দরের উল্লেখ আছে। বাণিজ্যিক তৎপরতা এবং সাহসিকতাপূর্ণ অভিযানের স্পৃহা সহস্র সহস্র ভারতীয়কে পূর্ব সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ এবং তৎসন্নিহিত দ্বীপগুলির অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাম্রলিপ্তি (বর্তমান তমলুক, পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত) ছিল তৎকালীন এক সমৃদ্ধ বন্দর ; এইখানেই প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন চীনে প্রত্যাবর্তনকালে জাহাজে আরোহণ করেন। চোলগণ সমুদ্রমধ্যবর্তী বহু প্রাচীন দ্বীপে তাহাদিগের অধিকার বিস্তার করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠাগণ একটি প্রতিপত্তিশালী নৌ-শক্তি সুগঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ভারতের মুসলমান শাসকগণ নৌ-শক্তি সম্বন্ধে কখনও আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহাদিগের দৃষ্টি স্থলে নিবদ্ধ ছিল এবং এই ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজন প্রভূত পরাক্রমশালী ছিলেন। ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতে, নৌ-শক্তি সংগঠনে অবহেলা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম হেতু।

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পর্তুগীজ নাবিকগণ ভারত মহাসাগরে তাহাদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। পর্তুগীজ শাসনকর্তা আলবুকার্ক (Albuquerque) সমুদ্রোপকূলস্থিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঘাঁটি ও দুর্গ নির্মাণ করিয়া এবং রণকৌশলের দিক হইতে সবিশেষ উপযোগী উপকূল-

অঞ্চলগুলির শাসকগণের সহিত মৈত্রী স্থাপন পূর্বক সেই আধিপত্য আরও দৃঢ়মূল করেন। পর্তুগীজ নৌ-শক্তির সমকক্ষ না হইলেও ওলন্দাজগণ সপ্তদশ শতাব্দীতে যবদ্বীপ, মালাক্কা, কলম্বো ও কোচিন অধিকার করে। তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ইংরাজ ও ফরাসী বণিকগণ ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নৌ-শক্তির প্রাধান্য লইয়া এই দুই পক্ষের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, ইংরাজ তাহার উৎকর্ষের বলে জয়লাভ করে। ভারত মহাসাগরে ফরাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সাফ্রেনের (Suffren) ব্যর্থতার পরে এতদঞ্চলে ইংরাজ সেই যে তাহার নৌ-প্রাধান্য সুদৃঢ় করিয়াছিল, দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে সিঙ্গাপুরের পতনের আগে পর্যন্ত উহা আর কখনও খর্ব হয় নাই। দেড়শত বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া ভারত মহাসাগরে ইংরাজের প্রভুত্ব অবিসম্বাদী ছিল।

আজ যাহাকে আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া বলি, ঐ অঞ্চল বহুকাল যাবৎ বৃহত্তর ভারত নামে অভিহিত ছিল। উহা হইতে এই দুই অঞ্চলের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রমাণ হয়। খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া নামধেয় অঞ্চল রাজনীতি ও সংস্কৃতির দিক দিয়া ভারতবর্ষের প্রভাব-পরিধির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতে কেন্দ্রায়িত নৌ-শক্তির সাহায্যে মূল ভূভাগ ও দ্বীপসমূহের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজগণ দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় এক রাজনৈতিক বাণিজ্য-পরিচালন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে, যাহার মূল কেন্দ্র ছিল ভারতে। পর্তুগীজদের পরে আসে ওলন্দাজগণ। তাহারা দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার বাটাভিয়ায় তাহাদের সদর ঘাঁটি স্থাপন করিলেও, মুখ্যতঃ সিংহল হইতেই তাহাদের সামুদ্রিক রণকৌশল পরিচালিত হইত। ওলন্দাজগণ পরে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর সহায়তায় পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অধিকার প্রসারিত করে। সুতরাং ইতিহাস আমাদিগকে এই কথাই বলে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার সামুদ্রিক আত্মরক্ষার প্রশ্ন বরাবর ভারতবর্ষের সহিত যুক্ত ছিল।

বহির্জগতের সহিত যোগ: সমুদ্র এবং পর্বত ভারতবর্ষকে পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ হইতে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে—ভারতের প্রাকৃতিক সীমানির্দেশের সূত্রে এইরূপ যখন আমরা বলি, তখন স্বভাবতঃই ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্যকে একটু বাড়াইয়া বলিতে আমরা প্রলুব্ধ হই। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতাকে বহির্জগতের সম্পর্কবিমুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বয়ংনির্ভর বস্তু মনে

করিলে ভুল হইবে। উহার উপর দিয়া বাহিরের বহু ঝড়-ঝাপ্টাই বহিয়া গিয়াছে, কেবল নিভৃতির ছায়ায় উহা বাড়িয়া উঠে নাই। অবশ্য এ কথা সত্য যে, হিমালয় পর্বতমালার দ্বারা গঠিত অবরোধের প্রাচীর প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থাকে একটা ধারাবাহিকতা দান করিয়াছে; তথাপি উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব দিকের সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট রাখিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে একাধিক সুপরিচিত গিরিবর্ত্ম (যথা, খাইবার, গোমল, বোলান প্রভৃতি) রহিয়াছে। এইসব গিরিবর্ত্ম বহু স্বাভাবিক বাধা সত্ত্বেও আর্য অভিযানকারী হইতে আরম্ভ করিয়া আহম্মদ শাহ আবদালী পর্যন্ত পর পর বহু আক্রমণকারী দলকে ভারতে প্রবেশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। উত্তরে তিব্বত হইতে নেপাল পর্যন্ত একাধিক পথ রহিয়াছে; যুগ যুগ ধরিয়া এইসকল পথে সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রচারকগণ শান্তির পতাকা বহিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, যুদ্ধের দামামা বাজাইয়া সৈন্যদলও অগ্রসর হইয়াছে। উত্তর-পূর্ব দিকে আসাম ও ব্রহ্মদেশের অন্তর্বর্তী পর্বতমালার স্থানে স্থানে গিরিপথ রহিয়াছে; ঐসকল ছিদ্রপথে তিব্বতীয়-বর্মী, অহোম ও বর্মীগণ আসামে প্রবেশ করিয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমান্ত উহার নিরাপত্তার কারণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু বহিরাক্রমণের সম্ভাবনা হইতে উহাকে একেবারে মুক্ত করিতে পারে নাই। স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমান্তের অস্তিত্বের আর-একটি ফল হইয়াছে এই যে, ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ এসিয়ার অন্যান্য অংশের প্রভাব হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া একটি সবিশেষ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু উহাতে বহির্জগতের সহিত তাহাদের সংযোগসূত্র ছিন্ন হয় নাই।

ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক বিভাগঃ সমগ্র ভারতবর্ষ তিনটি তথাকথিত 'আঞ্চলিক বিভাগে' ("territorial compartments") বিভক্তঃ—(১) সিন্ধু-গঙ্গা-বিধৌত সমতল প্রদেশ; (২) দাক্ষিণাত্য, অর্থাৎ বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণে ও কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তরে অবস্থিত অঞ্চল; ও (৩) 'সুদূর দক্ষিণ' (Far South)। ঐতিহাসিক বিচারে সিন্ধু-গঙ্গা-বিধৌত সমতল প্রদেশের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক, কারণ প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যগুলির এইখানেই বিকাশ ঘটিয়াছে এবং সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা-সমূহেরও কেন্দ্রস্থল এই অঞ্চল। ভারতীয় ইতিহাসের এই বৈশিষ্ট্য কতকগুলি

সুস্পষ্ট ভৌগোলিক কারণ হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। উত্তর ভারতের সুবিশাল সমতলভাগ রাজপুতানার মরুভূমি ও আরাবল্লী পর্বতমালার দ্বারা দুইটি অসমান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মরুভূমির পশ্চিমে অবস্থিত সমতলভাগ সিন্ধু নদের দ্বারা বিধৌত, অন্যপক্ষে উহার পূর্বদিকস্থ সমতলভূমি গঙ্গা ও উহার উপনদীগুলির দ্বারা বিধৌত হইতেছে। এই নদীসমূহের অবস্থানহেতু ভূমি উর্বরা এবং যোগাযোগ সহজ হইয়াছে। সুতরাং স্বভাবতঃই সিন্ধু-গঙ্গা-বিধৌত সমতল প্রদেশ অতি প্রাচীন কাল হইতেই এক সমৃদ্ধ, ক্রমবর্ধমান অধিবাসীসংখ্যার বাসস্থানে পরিণত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের ইতিহাস বরাবর উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে আগত আক্রমণকারীদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। কেবল-মাত্র ইংরাজ এই উক্তির ব্যতিক্রম। এই সকল আক্রমণকারীর দল স্বভাবতঃই গঙ্গা নদীর প্রবাহ অনুসরণ করিয়া কালক্রমে সমগ্র উত্তর ভারতে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। অতঃপর তাহারা বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করতঃ দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হয়। আর্য এবং মুসলমান, উভয় অভিযানকারীর আক্রমণের ইতিবৃত্ত হইতেই এই কথা প্রমাণিত হয়। দিল্লী নগরী গঙ্গা-বিধৌত সমতলভূমির ঠিক প্রবেশমুখে অবস্থিত; ফলে স্বতঃই উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে আগত আক্রমণকারীদিগকে উত্তর ভারতের হৃদয়কেন্দ্রে প্রবেশ করিতে হইলে দিল্লী কিংবা উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইত। এই কারণে দেখিতে পাই, ভারতীয় ইতিহাসের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ (তরাইনের দুইটি যুদ্ধ এবং পানিপথের তিনটি) দিল্লীর সংলগ্ন অঞ্চলেই সংঘটিত হইয়াছিল।

বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত অপর দুই প্রাকৃতিক বিভাগ উহাদের ভৌগোলিক সংস্থানের জন্যই কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে। বিন্ধ্য পর্বতমালার দ্বারা এই ভূভাগ উত্তর ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু শত শত বৎসর পূর্বেই ভারতে উপনিবেশ স্থাপনকারী আর্যগণ তাহাদের কার্যের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিল যে ঐ সুউচ্চ এবং বহুদূরবিস্তারী পর্বতমালা প্রকৃতপক্ষে অনতিক্রম্য নহে। আর্যগণ দাক্ষিণাত্যে যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূত্রপাত করিয়াছিল তাহা কালক্রমে আরও ঘনিষ্ঠ হয় এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দক্ষিণাপথ উত্তর ভারতের মতই ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু কতকগুলি সুস্পষ্ট কারণে দাক্ষিণাত্য এবং 'সুদূর দক্ষিণ'-এর ইতিবৃত্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে কিছুটা গৌণ স্থান অধিকার

করিয়া আছে। প্রথমতঃ, বিন্ধ্য পর্বতের অপর প্রান্তবর্তী অঞ্চলের পুরাতন ইতিহাস মূলতঃ দ্রাবিড়গণের ইতিহাস ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, তাহাদের বিষয়ে যথাযথ ইতিহাস রচনার উপযোগী উপাদান এখনও উপযুক্ত পরিমাণে সংগৃহীত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভিনসেণ্ট স্মিথের মতানুসারে, দক্ষিণাপথের কোন শক্তি উত্তর ভারতকে পদানত করিবার কথা কখনও চিন্তা করেন নাই, কিন্তু আর্যাবর্ত বা হিন্দুস্থানের অপেক্ষাকৃত উচ্চাকাজ্ক্ষী নৃপতিগণ প্রায়শঃ নর্মদার সীমারেখা ছাড়াইয়াও আরও দক্ষিণে তাঁহাদের আধিপত্য সম্প্রসারিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস যিনি রচনা করিবেন তাঁহাকে বড় বড় রাজ্য এবং সাম্রাজ্যের উপর মনোযোগ স্থাপন করিতে হইবে, কারণ এই বিশাল দেশের জটিল ইতিবৃত্তের মধ্যে ঐক্য-শৃঙ্খলা আনিতে হইলে ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অতএব যে সকল রাজ্য আঞ্চলিক গুরুত্বের অপেক্ষা অধিক মর্যাদা কখনও অর্জন করিয়া উঠিতে পারে নাই, উহাদিগের প্রতি গৌণ মর্যাদা আরোপ করিতে তিনি বাধ্য।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতের দ্বারা তিনটি সুস্পষ্ট বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে করোমণ্ডল উপকূল পূর্বঘাট পর্বত এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্যে অবস্থিত ; কঙ্কন উপকূল ও মালাবার, পশ্চিমঘাট পর্বত এবং আরব সাগরের মধ্যে অবস্থিত। পূর্বে ও পশ্চিমে বিদ্যমান উল্লিখিত দুই পর্বতমালার অন্তর্বর্তী অঞ্চলটিই হইল আসল দাক্ষিণাত্য মালভূমি। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিতে গেলে, এই তিন সুচিহ্নিত প্রাকৃতিক বিভাগের বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই, কারণ রাজনৈতিক ঐক্য কিংবা সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পথে পর্বতগুলি কখনও অন্তরায় হইয়া উঠিতে পারে নাই। মারাঠাগণ পশ্চিমঘাট পর্বতের উভয় প্রান্তে বাস করে, কিন্তু তাহাদের ভাষা এক, সামাজিক রীতিনীতি এক। মহারাষ্ট্র যখন যে শক্তির দ্বারা শাসিত হইয়াছে প্রায়ই কঙ্কন উপকূলকে সেই শক্তির রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিতে হইয়াছে।

গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদী দাক্ষিণাত্যকে তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করিয়াছে। যে সকল রাজ্য এই তিন বিভাগে প্রতিষ্ঠা লাভ করিত উহাদের পারস্পরিক সংগ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস মূলতঃ আবর্তিত হইত। কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী উর্বরা দোয়াব (Doab)

অঞ্চলকে ঘেরিয়া দাক্ষিণাত্য ও 'সুদূর দক্ষিণ'-এর শক্তিশালী রাজন্যবর্গের মধ্যে হানাহানির অন্ত ছিল না।

কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত 'সুদূর দক্ষিণ' নামধেয় অঞ্চল যদিও কোনরূপ সুচিহ্নিত প্রাকৃতিক সীমারেখার দ্বারা দাক্ষিণাত্যের মালভূমি হইতে বিভক্ত হয় নাই, তৎসত্ত্বেও উহার একটি ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য ছিল। এই স্বাতন্ত্র্য কৃষ্ণা নদীর উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা খুব কমই বিপর্যস্ত হইয়াছে। সুদূর দক্ষিণে দ্রাবিড়গণ স্বাভাবিক ভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ পাইয়াছে, উত্তরাংশের আগ্রাসী ও বিজয়ী মনোবৃত্তি তাহাদের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই ; এই কারণে ঐ অঞ্চলেই দ্রাবিড়দিগের সাংস্কৃতিক গুণপনা ও রাজনৈতিক প্রতিভার সর্বাধিক বিকাশ ঘটিয়াছে। উত্তর ভারতের হিন্দু কিংবা মুসলমান কোন সাম্রাজ্যবিলাসী শাসকই সুদূর দক্ষিণের সমগ্র ভূভাগের উপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন নাই।

মহীশূর কিংবা কোইম্বাটুর হইতে মালাবারে পৌছানো কঠিন ছিল, কোন কোন দুর্গম গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ ছিল। যোগাযোগের এই সকল অসুবিধাহেতু স্থল-বাহিনীর পক্ষে মালাবারে অভিযান অসম্ভব ছিল।

নদীসমূহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব: উত্তর ভারতের নদীসমূহ ভারতীয় ইতিহাসের বিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সিন্ধুনদের উপত্যকায় ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ হয়। এই সভ্যতা ইতিহাসে মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা নামে পরিচিত। পাঞ্জাবের নদীসমূহ এবং গঙ্গা নদীর দ্বারা ভারতে আর্য উপনিবেশের প্রকৃতি ও গতি বহুলাংশে নির্ধারিত হইয়াছে। স্মিথ বলিতেছেন—"ফরাসীদিগকে প্রতিহত করিয়া ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ইংরাজের সাফল্যের মূলে ছিল বাঙ্গালা দেশ তথা গাঙ্গেয় নদীপথের উপর উহাদের অধিকার ও প্রভাব। ইংরাজ-অভিযানের অগ্রগতির পরবর্তী স্তরে তাহারা সিন্ধুনদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে পাঞ্জাব দখল করিয়াছিল। অবশ্য লর্ড অক্ল্যাণ্ড এবং লর্ড এলেনবরা যে উপায়ে এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন উহা খুব নীতিসঙ্গত উপায় ছিল না।" দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ছিল অন্যরূপ ; সেখানে নদীপথের উপর অধিকার বিস্তার করিয়া রাজ্যাভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের তেমন সুবিধা ছিল না। ঐতিহাসিক বিচারে, কেবলমাত্র

শাসনতান্ত্রিক সীমারেখা নির্ধারণেই দক্ষিণ ভারতের নদীসমূহের উপযোগিতা সীমাবদ্ধ ছিল।

ভারতীয় নদীসকল এবং উহাদের ঐতিহাসিক প্রভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, অতীতে অনেক নদীরই গতিপথের পরিবর্তন হইয়াছে এবং কোন কোন নদী এখনও উহাদের গতিপথ পরিবর্তন করিয়া চলিয়াছে। নদীতে প্রবল বন্যা হইলে বন্যার জল তীর ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং তাহার ফলে সমতল মৃত্তিকার উপর নরম পলিমাটির আস্তরণ পড়ে। উহাতে নদীস্রোতও বাঁকিয়া-চুরিয়া যায়। স্মিথ বলেন, "শতদ্রু নদীর পুরাতন খাত অদ্যতন নদীস্রোত হইতে পঁচাশী মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।···দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সময় সিন্ধু নদ কোন পথে প্রবাহিত হইত তাহা কে বলিতে পারে?···বৈদিক ঋষিদের আমলের নদী আর এখনকার নদীর মধ্যে ঘোরতর পার্থক্য।···প্রারম্ভিক মুস্লিম অভিযানসমূহের সময় হইতে নদীগুলির বিস্তর পরিবর্তন হইয়াছে এবং বৈদেশিক বিজেতাদের সমসাময়িক ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ঐ সকল পরিবর্তনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।" বলাই বাহুল্য যে, নদীস্রোতের পরিবর্তন নদীতীরবর্তী নগরীর অবস্থার ব্যত্যয় ঘটাইত। সূচনায় পাটলিপুত্র নগরী ছিল গঙ্গা নদী ও শোন নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত, কিন্তু বর্তমানে ঐ জায়গা সঙ্গম হইতে ১২ মাইল দূরে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। যদি অদ্যাবধি পাটলিপুত্রের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিত, তাহা হইলে অন্য কোন কারণে নহে—শুদ্ধমাত্র শোন নদের গতিপথের পরিবর্তনহেতুই উহার সামরিক গুরুত্ব বিলুপ্ত হইত। কোনও নদীর গতিপথের পরিবর্তন হইলে সেই নদীর তীরে অবস্থিত নগরী সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যাওয়াও আশ্চর্য নহে। একদা রাজপুতানার অভিমুখে পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হাকরা নদীর কথা বলিতে গিয়া স্মিথ বলিয়াছেন, বহু অধুনাবিস্মৃত এবং প্রায়শঃ-নামহীন নগরীর এককালীন অস্তিত্বের নীরব সাক্ষীস্বরূপ হাজার হাজার মাটির ঢিপি এই কথাই আমাদিগকে মনে করাইয়া দিতেছে যে, প্রাণপ্রদায়িনী বারিধারা যখন তাহাদের প্রবাহপথ ত্যাগ করে তখন কি ধ্বংসই না উহা সাধন করিয়া যায়।

উপকূল-রেখার পরিবর্তন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে স্থলভাগের উচ্চতার তারতম্যের ফলেও এইরূপ ভয়ঙ্কর পরিণাম সাধিত হইতে পারে। বাঙ্গালার

পুরাতন বন্দর তাম্রলিপ্তি (বর্তমান তমলুক) এখন সমুদ্র হইতে অনেক দূরে। তিনেভেলী উপকূল-ভাগে অবস্থিত একদাখ্যাত বাণিজ্যনগরী কায়ল এক্ষণে সমুদ্র হইতে অনেক দূরে অবস্থিত ; শুধু তাহাই নহে, উহা বালুস্তূপের তলায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে, সমুদ্র পশ্চাৎগামী হইবার পরিবর্তে বরং আরও আগাইয়া আসিয়াছে। এইজন্য প্রাচীন ইতিহাসের নিষ্ঠাবান অনুসন্ধানীর পক্ষে সর্বদাই আধুনিক মানচিত্রের কৌশলী প্রবঞ্চনাগুলি সম্বন্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারত-ইতিহাসের মূলগত ঐক্য

বৈচিত্র্যের লীলাভূমিঃ ভৌগোলিক মানদণ্ডের বিচারে, ভারতবর্ষ প্রধানতঃ বৈচিত্র্যের দেশ। এইজন্য সঙ্গতভাবেই উহাকে পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ ("the epitome of the world") বলা হইয়াছে। প্রাকৃতিক দিক হইতে, জলবায়ু ও আবহাওয়া, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত, উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু—এ সকলের বৈচিত্র্য স্বতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হিমালয়ের শুষ্ক, প্রবল শীত হইতে কঙ্কন ও করোমণ্ডল উপকূলের আর্দ্রতাযুক্ত গ্রীষ্মমণ্ডলীর দাহ পর্যন্ত আবহাওয়ার কত বৈচিত্র্য! ভারতবর্ষে নানাবিধ শ্রেণীর আবহাওয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—মেরুদেশীয় আবহাওয়া, পরিমিত (temperate) আবহাওয়া এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়া। বৃষ্টিপাতের দিক হইতেও পরিমাণবৈচিত্র্যের সীমা নাই—আসামের চেরাপুঞ্জী অঞ্চলে যেমন বৎসরে ৪৮০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইতে দেখা যায়—পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের সর্বোচ্চ 'রেকর্ড' উহাই—তেমনই সিন্ধুদেশ ও রাজপুতানার কোন কোন অংশে বৎসরে ৩ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টি হয়। নানাবিধ উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তুর প্রকারবৈচিত্র্যেও ভারতের স্থান অগ্রগণ্য—প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পুস্তকে বর্ণিত প্রায় অধিকাংশ নমুনাই এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

জাতিবৈচিত্র্যঃ ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অপেক্ষা উহার মানবীয় বৈচিত্র্যও কম উল্লেখযোগ্য নহে। ভারতের অগণিত সংখ্যক অধিবাসী

শেষোক্ত বৈচিত্র্যের আধার। স্মিথ যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভারত হইল একটি নৃতাত্ত্বিক যাদুশালা ("an ethnological museum")। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতির উপনিবেশস্থাপনার্থীদিগকে আপনার বক্ষে স্থান দিয়া আসিতেছে। সুদূর অতীতে এই দেশে নবপ্রস্তর যুগ ও তাম্রপ্রস্তর যুগের যে সকল মানুষ বাস করিত তাহাদের জাতিচরিত্র সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। ভারতের অধিবাসীসংখ্যার একটা বৃহৎ অংশের মানুষের ধমনীর ভিতর যে জাতির রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, সেই দ্রাবিড়দের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও স্থিরনিশ্চয় ভাবে কিছু বলা কঠিন। দ্রাবিড়গণের পর দীর্ঘাকৃতি গৌরদেহ আর্যগণ ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করে। যদিও প্রথম প্রথম তাহারা এই দেশের অনার্য কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী সম্প্রদায় হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে পরবর্তী কালে উহাদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। আর্যদের উপনিবেশ স্থাপনের পর বহু শতাব্দী যাবৎ ভারতে আর কোন বৈদেশিক অভিযানকারীর পদার্পণ ঘটিয়াছে কি না সে বিষয়ে সঠিক কোন সংবাদ জানা যায় না, তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-দ্বারগুলি কোনও সময়েই বিদেশাগতের পক্ষে একেবারে প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। উত্তর-পূর্ব গিরিবর্ত্মগুলির মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ও নিশ্চয়ই একাধিক বহিরাগত দলের পদার্পণ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের বিষয়েও নিশ্চিত কিংবা বিস্তারিত কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ভারতের ঐ অবহেলিত অঞ্চলের প্রতি প্রথম আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অহোম আক্রমণের পর হইতে।

ঐতিহাসিক কালপরিধির মধ্যে, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সহগামী ও অনুগামী গ্রীকরাই হইল উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রথম সুপরিজ্ঞাত বৈদেশিক উপনিবেশস্থাপনকারী দল। তাহার পর আসে শকেরা। উহারা বেশ কিছু কাল উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারতে রাজত্ব করে; কালক্রমে ভারতের অধিবাসীদের সঙ্গে তাহাদের সত্তা একীভূত হইয়া যায়। "শক" শব্দটি কতকটা অস্পষ্ট অর্থে ভারতীয়েরা ব্যবহার করিত উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্মগুলির পরপার হইতে আগত যে কোন বৈদেশিক দলকে বুঝাইতে, দলগুলির জাতিবর্ণ সম্পর্কে সূক্ষ্ম চুলচেরা বিচার তাহারা করিত না। "শক" বলিতে কদাকার ক্ষুদ্রচক্ষু

ভারত-সভ্যতার সুমহান্ প্রবর্তকগণ তাঁহাদের স্বদেশ এই বিরাট ভূখণ্ডের ভৌগোলিক ঐক্য সম্বন্ধে নিজেরা পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন এবং নানা উপায়ে জাতীয় মানসের ভিতর ঐ ভাবটি মুদ্রিত করিতেও সচেষ্ট ছিলেন।

এই ঐক্যানুভূতির অস্তিত্বের প্রথম প্রমাণ গোটা দেশকে 'ভারতবর্ষ' এই একক নামে তাঁহারা অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। নামটির একটি রাজনৈতিক তাৎপর্যও ছিল, কারণ উহার সহিত সার্বভৌম রাজচক্রবর্তিত্বের ধারণা বিজড়িত ছিল। একজন 'চক্রবর্তী রাজা' বা রাজরাজেশ্বর হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অধীন রাজাদের কর ও আনুগত্য গ্রহণ করিতেছেন—এই ধারণার সহিত প্রাচীন হিন্দু নরপতিগণ বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। 'অধিরাজ', 'রাজাধিরাজ', 'সম্রাট্', 'একরাট্', প্রভৃতি শব্দের ঘনঘন ব্যবহার এবং 'রাজসূয়', 'বাজপেয়' প্রভৃতি যজ্ঞের পুনঃপুনঃ উল্লেখ ইহাই প্রমাণ করে যে, বিশ্বজয় বা সার্বভৌম অধিকার বিস্তৃতির ধারণা প্রাচীনদের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। ভারতের প্রথম সম্রাট্ হইলেন মহাপদ্ম নন্দ এবং তিনি যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়া যান উহার আরও সম্প্রসারণ ও বাস্তব রূপদান ঘটান মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাট্গণ।

রাজনৈতিক ঐক্য : পরবর্তী কালে মুঘল শাসকগণ এমন এক সাম্রাজ্য-ব্যবস্থার পত্তন করেন যাহা ভারতীয় জনসাধারণের মনে ঐক্যবদ্ধ শাসন ও অভিন্ন শাসনতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার আদর্শ বদ্ধমূল করিয়া দেয়। ডক্টর যদুনাথ সরকার বলেন, "নিছক স্বেচ্ছাতন্ত্রী প্রভুত্ব, জনগণের মাথার উপর দিয়া নিছক শাসনতান্ত্রিক স্বৈরাচারের স্টীম-রোলার চালাইয়া যাওয়া—ইহার দ্বারা জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় না। অন্ততঃপক্ষে এইপ্রকার ঐক্য স্বাভাবিক নয়, উহা স্থায়ীও হয় না। একই ধরণের শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত এবং একই শাসন-ব্যবস্থার সাফল্য ও ব্যর্থতার অংশীদার যে জনগণ, সেই সমভাবাপন্ন জনগণের ভিতর হইতেই শুধু যথার্থ ঐতিহাসিক ঐক্যবোধের জন্ম হইতে পারে, কারণ এই ঐক্যবোধ উহাদেরই প্রয়াসের ফল। এই জাতীয় ঐক্যবোধ ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে মুঘলরাই প্রথম প্রতিষ্ঠা করে।" বিচক্ষণ মুঘল শাসকগণ ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য অন্যান্য প্রক্রিয়ার মধ্যে এই সকল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করেন—শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ, আইন ও প্রথাসমূহের একীকরণ, সাধারণ মুদ্রা-ব্যবস্থা ও একটি সরকারী ভাষা (ফার্সি)। ইংরাজ শাসকগণ

বহুলাংশে মুঘলদের পন্থাই অনুসরণ করেন। অপেক্ষাকৃত অনুকূল আধুনিক পরিবেশের মধ্যে তাঁহারা ভারতকে এমন রাজনৈতিক ঐক্য দান করেন যাহা উহার পূর্ব অভিজ্ঞতায় কখনও পরিদৃষ্ট হয় নাই।

ইংরাজ শাসনের অবসানে ভারত দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে। ভারত-রাষ্ট্রের সহিত দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তীকরণ এক অভিনব ঘটনা। বিভক্ত উপ-মহাদেশের বৃহত্তর অংশের (ভারত) রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ঐক্যবিধানে উহা এক বলিষ্ঠ ও তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ।

প্রাকৃতিক অভিন্নতা: ডক্টর যদুনাথ সরকার বলেন যে, "ভারতে নানা জাতির বারম্বার মিশ্রণ ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু উহারই মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়।" "বিভিন্ন বৈদেশিক জাতি, যাহারা দীর্ঘকাল ভারতে বাস করিয়াছে এবং তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে একই আহার গ্রহণ করিয়াছে, একই জল পান করিয়াছে, একই রৌদ্রালোকে পরিপুষ্ট হইয়াছে, একই শাসনাধীনে রহিয়াছে, তাহাদের দেহাবয়বে ও জীবনযাত্রায়ও কিয়ৎ পরিমাণে সাদৃশ্য আসিয়া গিয়াছে। বিদেশাগত মুসলমানেরা পর্যন্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী এ দেশে বাস করিবার ফলে এই দেশের প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, এসিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে (যেমন আরব দেশ ও পারস্য) বসবাসকারী মুসলমানদের সহিত বর্তমানে তাহাদের নানা বিষয়ে পার্থক্য।" সার হার্বার্ট রিস্‌লে যথার্থই বলিয়াছেন যে, দেহগঠন, গোষ্ঠীগত লক্ষণ, ভাষা, রীতিনীতি এবং ধর্মবিশ্বাসের নানাবিধ পার্থক্য ও বৈচিত্র্য ভারত-পর্যবেক্ষকের চোখে পড়িলেও উহাদের তলায় তলায় আসমুদ্র-হিমাচল পর্যন্ত এক প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্যের লক্ষণও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। ভারতীয় চরিত্র এবং সাধারণ ভারতীয় ব্যক্তিত্ব বলিয়া যথার্থই এক ব্যক্তি-সত্তা বিদ্যমান, উহাকে আমরা আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করিয়া লইতে পারি না।

সাংস্কৃতিক ঐক্য: ভারতীয় ঐক্যের সর্বপ্রধান লক্ষণ হইল এই যে, ভারতের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ তাহাদের সম্মিলিত চেষ্টায় এক অখণ্ড সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে। উহা একান্তভাবেই ভারতীয়, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিত উহার পার্থক্য সুবিপুল। দুই হাজার বৎসরের হিন্দু ও বৌদ্ধ আধিপত্যের কালে, নানাবিধ রাজনৈতিক অনৈক্য, ভাষা ও রীতিনীতির পার্থক্য সত্ত্বেও এই বিশাল দেশের সকল প্রদেশের সাহিত্য ও

দর্শনের উপর একটি বিশেষ সংস্কৃত ভাষাকেন্দ্রিক প্রভাব মুদ্রিত হইয়াছিল। হিন্দু যুগে ভারতের সর্বত্র ধর্ম, দর্শন, সাহিত্যভাবনা ও শিল্পরীতি এবং জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটি মূলগত ঐক্য বিদ্যমান ছিল। অদ্যাবধি ভারতের হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে এই ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারত-ইতিহাসের উপাদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান

ঐতিহাসিক বিবরণাদির অভাবঃ বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত অলবীরুণী একাদশ শতাব্দীতে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি এই মর্মে লিখিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুরা ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক ক্রম সম্পর্কে খুব বেশী মনোযোগপরায়ণ নহে। তাহারা রাজা ও রাজত্বের ক্রমিক উত্তরাধিকার বর্ণনা করিতে যাইয়া নিতান্ত অবহেলার পরিচয় দিয়া থাকে। তাহাদিগকে যখন যথার্থ তথ্যের জন্য চাপিয়া ধরা হয়, কি বলিবে বুঝিতে না পারিয়া তাহারা অবধারিতভাবে কল্পকথার আশ্রয় গ্রহণ করে। ফ্লিট সাহেবের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যের মধ্যেও অলবীরুণীর কথার প্রতিধ্বনি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—"প্রাচীন হিন্দুরা যথার্থ ঐতিহাসিক চেতনার অধিকারী ছিল কি না সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। ঐতিহাসিক চেতনা বলিতে এখানে ব্যাপক ভিত্তিতে ও বিচারপরায়ণতার সহিত যথার্থ ইতিহাস লিপিবদ্ধ-করণের ক্ষমতা বুঝাইতেছে। তাহারা ছোটখাট ঐতিহাসিক নিবন্ধ লিখিতে পারিত, কিন্তু উহাদের পরিধি সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সচেতনভাবে গ্রথিত নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থের আকারে সাধারণ ইতিহাস যে তাহারা লিখিতে পারিত তাহার কোন প্রমাণ তাহারা রাখিয়া যায় নাই।"

ধর্মীয় ও ধর্ম-নিরপেক্ষ সাহিত্য : সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতদিগকে অন্যান্য নানাবিধ সূত্র হইতে উপাদান আহরণ করিতে হইবে। আদি অধ্যায়ের কোন উৎকীর্ণ লিপি-প্রমাণ নাই, কাজেই ঐ অধ্যায়কে জানিতে হইলে ধর্মীয় সাহিত্যের উপর নির্ভর করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। আর্যদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে বৈদিক সাহিত্যে প্রভূত মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসাহিত্যের ভিতর ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনাবলী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখাদি রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, গ্রহবিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থে (যথা, 'গার্গী-সংহিতা'), ব্যাকরণে (যথা, পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' ও পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য') এবং কালিদাস ও ভাস-রচিত বিশুদ্ধ কাব্য গ্রন্থাদিতেও অনেক প্রয়োজনীয়, জ্ঞাতব্য তথ্যাদি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, সাহিত্যের সূত্রে প্রাপ্ত এই সকল বিচ্ছিন্ন ও আংশিক সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে অতীত ইতিহাসের যথার্থ চিত্র উপস্থাপিত করা সম্ভব নহে।

ঐতিহাসিক সাহিত্য : অবশ্য, প্রাচীন কালে এমন খাঁটি মালমসলারও অভাব ছিল না, যাহা হইতে অতিশয় মূল্যবান ইতিহাস গড়িয়া তোলা যায়। বংশতালিকা বা কুলজী রাখা একটি প্রাচীন ভারতীয় প্রথা। এ কথা সুবিদিত যে, রাজাদের উত্তরাধিকারের তালিকাসম্বলিত বংশাবলী অতি পুরাতন কাল হইতেই সংকলিত ও সংরক্ষিত হইত। সম্ভবতঃ এই জাতীয় বহু তালিকা মহাকাব্যদ্বয়ে (রামায়ণ ও মহাভারত) ও পুরাণগুলিতে গ্রথিত হইয়াছিল। পুরাণসমূহের চিরাচরিত বিষয়ই হইল 'সর্গ' (আদি জন্ম), 'প্রতিসর্গ' (প্রলয়ের পরে পুনর্জন্ম), বংশ (দেবতা ও ঋষিগণের বংশাবলী), 'মন্বন্তর' (ইতিহাসের বিভিন্ন যুগবিভাগ) ও 'বংশানুচরিত' (প্রাচীন রাজাদের রাজবংশীয় ইতিহাস)। অতি প্রাচীন কাল সম্বন্ধে মহাকাব্যদ্বয়ে ও পুরাণগুলিতে যদিও নানাবিধ পুরাতন তথ্য পাওয়া যায়, উহারা উহাদের বর্তমান আকার পরিগ্রহ করে সম্ভবতঃ যীশু খ্রীস্টের অভ্যুদয়ের পরবর্তী সময়ে। কতিপয় পুরাণ নিঃসন্দেহে পরবর্তী সময়ের রচনা। বিবর্তনের ধারা বাহিয়া অগ্রসর হইবার কালে সম্ভবতঃ উহাদের মধ্যে অনেক অনৈতিহাসিক বা অর্ধ-ঐতিহাসিক বিষয়ের সংযোজনা ঘটিয়াছে, ফলে কালানুক্রম ব্যাহত হইয়াছে। কাজেই পুরাণসকল প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের যত্ন ও বিচারপরায়ণ অনুসন্ধিৎসুর নিকট

বহু মূল্যবান তথ্যের খনি হইলেও উহাদের উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করা নিরাপদ নহে।

'বংশাবলী' ব্যতীত শাসনকার্যের বিবরণী তথা রাজবংশের ইতিবৃত্ত ও দলিলাদিও অনেক ছিল। কিন্তু ইতিহাসগ্রন্থ সংকলনে এগুলির যথাযথ ব্যবহার হয় নাই। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত কাশ্মীরের রাজবংশীয় ইতিবৃত্ত কহ্লণের 'রাজতরঙ্গিণী' সম্ভবতঃ সরকারী বিবরণ এবং পুরাতন আখ্যায়িকাদির ভিত্তিতে সংকলিত হইয়াছিল। কহ্লণ তাঁহার নিজ কাল এবং তৎপূর্ববর্তী শতাব্দীর বিবরণ মোটামুটি নির্ভুলভাবে পরিবেষণ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে তাঁহার প্রদত্ত প্রাচীনতর যুগের ঘটনাবলীর বিবরণী তেমন নির্ভরযোগ্য নহে। 'রাজতরঙ্গিণী' ছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থ মূল্যবান; কিন্তু ইতিবৃত্ত না বলিয়া উহাদিগকে 'ঐতিহাসিক কল্পকথা' (historical romance) বলাই অধিক সঙ্গত। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', বিহ্লণের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত', সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত' ও পদ্মগুপ্তের 'নবসাহসাঙ্কচরিত' সংস্কৃত ভাষায় রচিত ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ। কিন্তু উহাদের ভাষা সর্বজনবোধ্য সহজ সাবলীল ভাষা নহে। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে, উপমায় ও চিত্রকল্পযোজনায় উহারা ধ্রুপদী কাব্যের রীতির স্মারক। প্রাকৃতে রচিত বাক্‌পতির 'গৌড়বাহ' ও হেমচন্দ্রের 'কুমারপালচরিত' 'ঐতিহাসিক কল্পকথা' শ্রেণীর রচনার অন্তর্গত।

বৈদেশিকগণের লিখিত বিবরণ: প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসুদের পক্ষে বিভিন্ন বৈদেশিক লেখক ও পরিব্রাজকগণের লিখিত বিবরণের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। এই বৈদেশিকদের মধ্যে গ্রীক, রোমক, চৈনিক, তিব্বতীয়, মুসলিম প্রভৃতি নানা জাতীয় মানুষ ছিলেন। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া কিংবা ভারত-পর্যটন বা ভারতে বাস করিয়া তাঁহারা এই দেশ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (Herodotus) ভারতবর্ষে আসেন নাই, কিন্তু তাঁহার রচনায় পারসিকগণ কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত জয়ের বিবরণ আছে। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় জ্ঞান গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকবর্গের (যথা, Quintus Curtius, Diodorus, Arrian, Plutarch ও অন্যান্য) রচনাসূত্রে আহৃত হইয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যে ও শিলালিপিগুলিতে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' পরবর্তী কালের গ্রন্থকারদের (যথা, Arrian, Strabo, Justin ও অন্যান্য) রচনায় উদ্ধৃতির আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই গ্রন্থটি মৌর্য যুগের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক রীতিনীতিসমূহের উপর প্রচুর আলোকপাত করে। অজ্ঞাত গ্রন্থকারের রচিত *Periplus of the Erythrean Sea* ও টলেমীর ভৌগোলিক বিবরণ প্রচুর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যের সন্ধান দেয়।

ভারত-ইতিহাসের মৌর্যোত্তর যুগের ইতিবৃত্ত রচনার পক্ষে চৈনিকদের লিখিত বিবরণাদি অপরিহার্য। উহাদের সহায়তা ব্যতিরেকে শক, পার্থীয় ও কুষাণগণের বিষয়ে প্রণালীবদ্ধ ভাবে কিছু জানা সম্ভব নহে। ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ্ প্রমুখ চৈনিক পর্যটকগণ এই দেশ সম্বন্ধে অতিশয় মূল্যবান বিবরণাদি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। চৈনিক ও তিব্বতীয় ঐতিহাসিক উপকরণের সাহায্য ছাড়া বৌদ্ধধর্মের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভব নহে। সুপরিচিত তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের রচনায় এ সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।

মুসলমানগণ কর্তৃক উত্তর ভারত জয়ের কাহিনী মুসলমানদের রচিত ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তগুলিতে সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। অলবীরুণী প্রমুখ মুসলিম পর্যটকগণ অবক্ষয় (decadence)-কালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস তথা হিন্দুদের সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান জ্ঞাতব্য সংকলনে সাহায্য করিয়াছেন। প্রাথমিক মুসলিম ইতিবৃত্তকারদের মধ্যে অলবীরুণী, সুলেমান, অলমাসুদি, হাসান নিজামি এবং ইবন-উল-অথিরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিলালিপি ঃ ফ্লিট বলিয়াছেন যে, শিলালিপি ও শিলালেখগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতেই মুখ্যতঃ প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের জ্ঞান সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতবিষয়ক গবেষণার অন্যান্য ক্ষেত্রেও শিলালিপিগুলির উপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া শেষ পর্যন্ত গত্যন্তর নাই। উহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে সঠিকভাবে তারিখ নির্ধারণ বা ঘটনা ও ব্যক্তিকে সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ একপ্রকার অসম্ভব। পুরাতন ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, মুদ্রা, শিল্পকলা, স্থাপত্য কিংবা অন্য যে কোন সূত্র হইতে আমরা যাহা কিছু পাইয়াছি তাহার মূলে রহিয়াছে শিলালিপি।

শিলালিপি উৎকীর্ণ করিতে একাধিক উপকরণ ব্যবহার করা হইত—যথা,

লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ব্রোঞ্জ, পিত্তল, কাদামাটি, মৃন্ময় দ্রব্য, ইষ্টক, প্রস্তর ও স্ফটিকখণ্ড, ইত্যাদি। কখনও কখনও শিলালিপিতে ঘটনাবলীর সরল বর্ণনামাত্র থাকিত; যেমন খারবেলের হাথিগুম্ফা শিলালিপি বা সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভোৎকীর্ণ শিলালিপি, ইত্যাদি। প্রাচীন হিন্দুরা কত সুন্দরভাবে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-কথা রচনা করিতে পারিতেন এই শিলালিপিসমূহ হইতে উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সকল ইতিবৃত্ত সংহত ও স্থিরলক্ষ্য, তবে উহাদের পরিসর কিয়ৎ পরিমাণে সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ শিলালিপিই হইল ধর্মার্থে দান কিংবা সাধারণ দানের দলিলস্বরূপ। সাধারণতঃ ঐগুলি হইতে বংশাবলী সম্বন্ধীয় অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। অভিনিবেশের সহিত পরীক্ষা করিলে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ঐ সূত্র হইতে আহরণ করা যাইতে পারে। শিলালিপিতে ব্যবহৃত ভাষাসমূহ শিলালিপির উপাদানের মতনই ছিল বহুসংখ্যক—সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম্, কানাড়ী, ইত্যাদি। বাম হইতে দক্ষিণে লেখা ব্রাহ্মী লিপিই সচরাচর ব্যবহার করা হইত; তবে দক্ষিণ হইতে বামে লেখা খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহারও বিরল ছিল না। সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপিগুলির মধ্যে কয়েকটির (যথা, গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের কীর্তি বর্ণনাকারী এলাহাবাদ স্তম্ভগাত্রে খোদিত শিলালিপির উল্লেখ করা যায়) সাহিত্য-মূল্য সবিশেষ ছিল।

বহির্ভারতের দেশসমূহের শিলালিপিতে কখনও কখনও ভারত-ইতিহাসের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যাইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বোঘাজ-কোই (এশিয়া-মাইনর)-এ প্রাপ্ত শিলালিপিসমূহের নাম করা যায়। সম্ভবতঃ উহাদের ভিতর আর্যগণের ভারত-আগমনের পূর্বেকার বৃত্তান্ত উৎকীর্ণ রহিয়াছে, অতএব পরোক্ষতঃ বৈদিক যুগের ইতিহাস সংকলনে উহারা আলোকপাত করে। পার্সিপোলিশ ও নক্‌স্-ই-রুস্তম (ইরাণ)-এ আবিষ্কৃত শিলালেখগুলির ভিতর প্রাচীন ভারত ও ইরাণের রাষ্ট্রনৈতিক যোগাযোগের অনেক মূল্যবান সংবাদ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। দূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দুগণের উপনিবেশ স্থাপন প্রয়াস সম্পর্কিত সংবাদ আহরণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সূত্রই হইল শিলালিপি।

মুদ্রা: প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের আর একটি প্রধান উপাদান সেকালের রাজাদের প্রচারিত মুদ্রা। সাহিত্যের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির

যাথাযথ্য বিচারের প্রাথমিক সহায় হইল মুদ্রা, তবে কখনও কখনও মুদ্রা হইতে সাহিত্য-নিরপেক্ষ সরাসরি তথ্যও পাওয়া যাইত। ঘটনার ক্রম নিরূপণে তারিখ সংবলিত মুদ্রা খুবই মূল্যবান। যে সকল মুদ্রায় তারিখ নাই সেগুলিও উপেক্ষণীয় নহে। উহাদের ভিতর কখনও কখনও রাজাদের নাম খোদিত থাকিত। উহার দ্বারা পরোক্ষভাবে মুদ্রার প্রচলনকালের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থার আভাস পাওয়া যাইত। কোনও অঞ্চলে কোন বিশেষ রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রার সংখ্যাধিক্য হইতে প্রায়শ তাঁহার রাজ্যসীমার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে মূল্যবান ইঙ্গিত পাওয়া যাইত। ভারতবর্ষের বাহ্লীক দেশীয় (Bactrian) ও সিথিয় (Scythian) নৃপতিগণের ইতিহাস এই জাতীয় সযত্ন মুদ্রা পর্যালোচনার ভিত্তিতেই প্রধানতঃ আহৃত হইয়াছে।

স্মৃতিস্তম্ভ : বিশুদ্ধ রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি যাঁহারা নিবদ্ধদৃষ্টি স্মৃতিস্তম্ভ তাঁহাদের বিশেষ কোন কাজে না আসিলেও প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানিবার পক্ষে উহা সবিশেষ প্রয়োজনীয়। স্মৃতিস্তম্ভের সাহায্যে শিল্পকলা ও ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস বুঝিতে পারা যায়, কারণ অধিকাংশ স্মৃতিস্তম্ভই হইল ধর্মের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। স্মৃতিস্তম্ভগুলি প্রকারান্তরে তত্তৎ কালের অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝিতেও সাহায্য করে। হর্ম্য ও সৌধাবলীর স্তরবিন্যাস হইতে কখনও কখনও ইতিহাসের কালক্রম নির্ণয় সম্পর্কিত রহস্যের কিনারা হইতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান

ভারতবর্ষের মুসলমান আমলের ইতিহাস সংকলনে তত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় না। কারণ মধ্যযুগীয় ভারত-ইতিহাসের উপাদান প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান অপেক্ষা পূর্ণতর, অধিক প্রাচুর্যপূর্ণ। মধ্যযুগের ইতিহাস সংকলন করিতে যাইয়া ইতিহাসের কঙ্কাল খাড়া করিবার উদ্দেশ্যে শিলালিপি, কিংবদন্তী, মুদ্রা এবং সাহিত্যবিষয়ক বিচ্ছিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণাদি এখান-ওখান হইতে সংগ্রহ করিয়া একত্র জুড়িবার প্রয়োজন নাই। কারণ বিভিন্ন মুসলিম

শাসকদের শাসনকালের বিবরণ সংবলিত সমসাময়িক এবং অর্ধ-সমসাময়িক বহু ইতিবৃত্ত ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে। উহাদের মাধ্যমে বিস্তারিত ভৌগোলিক বিবরণ এবং কালক্রমের নির্ভুল হিসাব পাওয়া যায়।

সরকারী কাগজপত্র: সরকারী কাগজপত্র, সরকারী কিংবা বেসরকারী দলিল প্রভৃতি প্রত্যেক দেশেই ঐতিহাসিকগণের পক্ষে নির্ভরযোগ্য তথ্য আহরণের একটি প্রধান উৎস। মুঘলদের দলিলপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল অতিশয় পাকা, কিন্তু উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলি বারংবার শত্রুসৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদের সংরক্ষিত দলিলাদির সামান্য অংশই রক্ষা পাইয়াছে। সুতরাং ঐ সূত্রে সহায়তা পাইবার উপায় নাই। আকবরের মূল্যবান পুস্তকাগারে বড় বড় পণ্ডিতদের লিখিত ২৪০০০ সেরা সেরা পুঁথি ছিল, উহার কোনটাই নাই। এজন্য আমরা সাধারণতঃ ভারতের আবহাওয়াকে দোষ দেই, কিন্তু ইতিহাসের এই ক্ষতির জন্য আবহাওয়া যত না দায়ী উহা অপেক্ষা অধিক দায়ী মানুষের অত্যাচার।

ইতিবৃত্ত: কাজেই সমসাময়িক সরকারী দলিলপত্রের অভাবে আমাদিগকে ইতিবৃত্তের উপর নির্ভর করিতে হইবে। এই সকল ইতিবৃত্তের কতকগুলি হইল মুসলিম দুনিয়ার সাধারণ ইতিহাস, উহাদের ভিতর ভারতবর্ষের ইতিহাস ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু অন্যান্য বহু ইতিবৃত্তের আলোচ্য বিষয় কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাস।[১]

মিনহাজউদ্দীন তাঁহার 'তবকত্-ই-নাসিরি'[২] গ্রন্থে ১২৬৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর দাস সুলতানদের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। উহার পরে জিয়াউদ্দীন বরণী উহার সূত্রানুসরণ করিয়াছেন তাঁহার 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে ফিরোজ শাহের রাজত্বকালের প্রথম ছয় বৎসর পর্যন্ত সময়ের বিবরণ আছে।

---

১ Sir Henry Elliot ও Professor John Dowson তাঁহাদের আটখণ্ড *History of India as told by its own Historians*-এ ফার্সী ইতিবৃত্তগুলি হইতে মূল্যবান সব অংশ ও সংক্ষিপ্তসার উদ্ধার করিয়াছেন। উহা হইতে ঐ ইতিবৃত্ত সকলের স্বরূপ ও বিষয়বস্তু মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়। তবে উহাদের মধ্যে কিছু কিছু গুরুতর ভুল এবং ফাঁক ধরা পড়িয়াছে। Mr. Hodivala তাঁহার *Studies in Indo-Muslim History* গ্রন্থে কতক ভুল সংশোধন করিয়াছেন।

২ রাভের্টি (Reverty) কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত।

পাঠান বাদশাহদের শাসনকালের সমসাময়িক কোন ইতিবৃত্ত নাই ; ঐ সময়ের ইতিবৃত্ত জানিতে হইলে সম্রাট আকবর ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে রচিত পুস্তকের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সম্রাট বাবরের আত্ম-স্মৃতিকথা যথার্থই একটি মূল্যবান গ্রন্থ। উহার পারসিক এবং ইংরাজী ভাষায় প্রামাণ্য অনুবাদ আছে।[১] হুমায়ুনের ব্যক্তিগত সহচর জওহর 'তাজকিরত্-উল-ওয়াকিয়ৎ'[২] নামে এক কৌতূহলোদ্দীপক ইতিবৃত্ত লিখিয়া গিয়াছেন। গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন-নামা' গ্রন্থে মুঘল অন্তঃপুরের নানাবিধ তথ্য জানিতে পারা যায়।[৩] আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'[৪] ও 'আকবরনামা'[৫] আকবরের শাসনকাল সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দুইটি গ্রন্থ। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থ হইল বদায়ুনীর 'মুতাঁখাব-উৎ-তারিখ'[৬]। সম্রাট জাহাঙ্গীরের লিখিত আত্মকথাও[৭] ইতিহাসের একটি চমৎকার উপাদান। 'পাদিশানামা' ও 'আলমগীরনামা' নামক দুইটি সরকারী ইতিকথায় সম্রাট শাহ্‌জাহানের পূরাপূরি শাসনকাল এবং সম্রাট ঔরংজীবের শাসনকালের প্রথমদিকের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ঔরংজীবের শাসনকালের শেষ চল্লিশ বৎসরের ইতিবৃত্ত 'মাসির-ই-আলমগিরি' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। ঔরংজীবের মৃত্যুর পর সরকারী নথিপত্র হইতে উহা সংকলিত হইয়াছিল। খাফি খাঁ (মহম্মদ হাসিম) তাঁহার 'মুতাঁখাব-উল-লবাব' গ্রন্থে এমন অনেক তথ্য প্রদান করিয়াছেন যাহা সরকারী নথিপত্রে নাই। তিনি সম্রাট ঔরংজীবের বিরাগ-ভাজন হইবার ভয়ে ছদ্মনামে বই লিখিয়াছিলেন।

বৈদেশিক পর্যটকগণ : মুঘল যুগের পূর্ববর্তী আমলে যে সকল পর্যটক বিদেশ হইতে ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইবন বতুতার নাম সর্বাপেক্ষা পরিচিত। তিনি ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর বাস

---

১ ইংরেজী অনুবাদ Mrs. Beveridge-এর।

২ স্টুয়ার্ট কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত।

৩ মিসেস বিভারিজ কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত।

৪ ব্লকম্যান ও জারেট-এর ইংরেজী অনুবাদ।

৫ এইচ. বিভারিজ-এর ইংরেজী অনুবাদ।

৬ Rankin, Lowe ও Haig-এর ইংরেজী অনুবাদ।

৭ H. Beveridge-এর ইংরেজী অনুবাদ।

করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণের ভিতর প্রামাণ্যতার ছাপ পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে নিকোলো কন্টি (Nicolo Conti), আবদুর রেজ্জাক ও আথানাসিয়াস নিকিটিন (Athanasius Nikitin) অনেক মূল্যবান তথ্য রাখিয়া গিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইউরোপীয় পর্যটকগণ ভারতে আসিতে স্থরু করেন। তাঁহারা ঐতিহাসিকদের ব্যবহারার্থে প্রচুর তথ্য রাখিয়া গিয়াছেন। যেস্থইট ধর্মযাজকগণের লিখিত বিবরণাদিতে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় এবং রল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ (Ralph Fitch), পারচাস (Purchas), টেরী (Terry), স্যার টমাস রো (Sir Thomas Roe), টেভার্নিয়ে (Tavernier), বার্ণিয়ে (Bernier), কারেরি (Careri) ও মানুসী (Manucci) প্রমুখ ইউরোপীয় পর্যটকগণ মুঘল আমলের জনসাধারণের কথা, ব্যবসা ও বাণিজ্যের কথা, দরবারের ও শিবির জীবনের আড়ম্বর সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তবে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রদত্ত তথ্যাদি দুই চারিটি ঘটনাক্রমের বিবরণ বাদ দিলে নিতান্তই জনশ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া রচিত।

সংবাদ-লিপি ঃ সরকারী বিবরণী, স্মৃতিকথা, বেসরকারী ইতিবৃত্ত এবং পর্যটকদের কাহিনী ছাড়াও সৌভাগ্যক্রমে সম্রাট ঔরংজীব এবং তাঁহার বংশধরদের রাজত্বকালের অনেক সংবাদ-লিপি (আকবরাত্‌) পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।[১]

মুদ্রা ও স্মৃতিস্তম্ভ ঃ স্থলতানী রাজত্ব এবং মুঘল রাজত্বের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে মুদ্রা এবং স্মৃতিস্তম্ভের গুরুত্বও আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। মুদ্রা সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, যে সকল অঞ্চলে মুদ্রণ অবিদিত ছিল, সেই সমস্ত জায়গায় এই মুদ্রাগুলিই ছিল মানুষী বুদ্ধির আবিষ্কৃত সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ মুদ্রিত প্রচারপত্র এবং ঘোষণা। এইগুলি বাজারে বাজারে ছড়াইয়া পড়িয়া মুদ্রণের উদ্দেশ্য পূরণ করিত। ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ভারতীয় মিউজিয়ম (কলিকাতা) এবং পাঞ্জাব মিউজিয়মে ইংরাজ পণ্ডিতদের প্রস্তুত মুদ্রার একাধিক তালিকা আছে—এই সকল তালিকা হইতে অনেক মূল্যবান তথ্য জানিতে পারা যায়। স্মৃতিস্তম্ভ দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির

১ এই সকল অপ্রকাশিত সংবাদ-লিপি জয়পুরে এবং লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে।

বিকাশের সাক্ষ্য বহন করে। তবে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সংকলনে উহাদের সহায়তা তেমন মূল্যবান নহে।

মারাঠা, রাজপুত ও শিখ: মুঘল আমলের মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাস জানিবার পক্ষে কয়েকটি সূত্র আছে—তন্মধ্যে সর্বপ্রধান সূত্র হইল 'সভাসদ্ বখর' নামক ইতিবৃত্ত[১]। উহার রচয়িতা শিবাজীর সমসাময়িক ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বিবরণী সংবলিত ইংরাজ কুঠির নথিপত্র তদানীন্তন কালের ঘটনাবলী সম্বন্ধে অমূল্য সাক্ষ্যে পরিপূর্ণ। পর্তুগীজদের দলিলাদিও সবিশেষ মূল্যবান।

রাজপুত চারণ কবিদের রচিত গাথা সঙ্গীতাদি রাজপুত ইতিহাসের প্রয়োজনীয় উপাদান। কিন্তু সাবধানতার সহিত এই সকল উপাদান পরীক্ষা করিতে হইবে। সত্য ও কল্পনায় মিশ্রিত এই বিচিত্র উপকরণাবলী হইতে প্রকৃত তথ্য নিষ্কাশন করিয়া লওয়া প্রয়োজন। টডের বিখ্যাত গ্রন্থ *Annals and Antiquities of Rajasthan* চারণদের গাথা ও কাব্যের অবলম্বনে রচিত। ইতিহাসের তথ্য আহরণে উহার উপর অতিরিক্ত নির্ভর করা উচিত হইবে না।

শিখগুরুদিগের এবং শিখধর্মের ইতিহাস জানিতে হইলে আমাদের গুরুমুখী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর[২] শরণাপন্ন হইতে হইবে। উহাদের মধ্যে 'গ্রন্থসাহেব'[৩] সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই বিষয়ের অনুধাবন করিতে যাইয়া সত্য ও কল্পনার, নির্ভরযোগ্য সমসাময়িক সাক্ষ্য এবং পরবর্তীকালীন কল্প-কাহিনীর মধ্যে সীমারেখা টানিবার প্রয়োজন আছে।

সাহিত্য: সমসাময়িক সাহিত্য হইতে কখনও কখনও সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আহরণ করিতে পারা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বিখ্যাত পারসিক কবি আমীর খসরুর রচনাবলীর মধ্যে মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ 'খজাইন-উল-তুফুহ্'[৪] আলাউদ্দীন খলজীর শাসনকাল সম্বন্ধে একটি বিশেষ তথ্যপূর্ণ রচনা।

---

১ ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত।

২ Macauliffe প্রণীত *The Sikh Religion* গ্রন্থে ইহাদের সারসংগ্রহ আছে।

৩ Trumpp সাহেবের ইংরাজী অনুবাদ।

৪ Prof. Habib কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আধুনিক ভারত-ইতিহাসের উপাদান

সরকারী কাগজপত্র ঃ ফরাসী পর্যটক জাক্‌মঁ (Jacquemont) —যিনি ১৮৩১ সনে ভারতে আসিয়াছিলেন—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই ধারণা সংগ্রহ করেন যে, এই দেশ সরকারী নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ দ্বারা শাসিত। ইংরাজ আমলের ইতিহাসের প্রধান উপাদান সরকারী কাগজপত্র। এগুলি বিস্তৃত বিবরণীপূর্ণ। ইংরাজ আমলের ভারত সরকার সূচনা হইতেই লিখিত দলিলাদির উপর বিশেষ জোর দিয়াছিল। ১৭১৯ সনে কোম্পানীর ডাইরেক্টরবৃন্দ এই মর্মে নির্দেশ দান করেন যে, প্রতি সভ্যের কাউন্সিলের প্রস্তাবাদি সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণের অধিকার রহিয়াছে এবং তিনি তাঁহার মতদ্বৈধের কারণ লিখিতভাবে জানাইতে পারেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন হইতে রাজ্যশাসনে মন দিল, তখন হইতে কাউন্সিলের সভ্যবৃন্দের লিখিত মন্তব্য, ভাষ্য, স্মারক-লিপি ইত্যাদিও স্বভাবতঃই আয়তনে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিশিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি এবং ঐতিহাসিক রূপেও খ্যাতনামা সার জন ম্যালকম্‌ লিখিয়াছেন যে, বাগ্‌বাহুল্য এবং সবিস্তার বর্ণনার অভ্যাস প্রাচ্য-দেশবাসী তাঁহার স্বজাতিদের এক মস্ত দোষ। সরকারী কাগজপত্রের স্তূপের শেষ নাই। নয়া দিল্লীর জাতীয় মহাফেজখানায় (National Archives of India) এবং মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, বোম্বাই, পুণা ও লাহোরের রাজ্য মহাফেজখানায় (Records Office) নিজ নিজ অঞ্চলের প্রচুর সরকারী দলিলপত্র সংরক্ষিত আছে। ঐ সকল দলিলপত্রের অধিকাংশই অমুদ্রিত রহিয়াছে। উহা ব্যতীত লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসেও প্রচুর দলিলপত্র রহিয়াছে। পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন মহাফেজখানায় মুদ্রিত দলিলপত্রের পরিমাণ এতই বেশী যে, উহাদের সব পড়িয়া উঠাও কঠিন, হৃদয়ঙ্গম করা ত আরও পরের কথা। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত সংরক্ষণাধীনেও অনেক দলিলপত্র রহিয়াছে, সেগুলি খুঁজিয়া বাহির করিয়া কাজে লাগানো দরকার।

লিসবন এবং নোভা গোয়ার পর্তুগীজ মহাফেজখানায় ইউরোপীয়-ভারতীয় সম্পর্কের উপর আলোকপাত করিতে পারে এমন অনেক কাগজপত্র আছে। পণ্ডিচেরীতে সংরক্ষিত ফরাসী কাগজপত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাস

বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। ওলন্দাজদের রক্ষিত কাগজপত্রেও এমন অনেক মূল্যবান তথ্য রহিয়াছে, যাহাদ্বারা ভারতীয় ইতিহাসের কতকগুলি পর্ব ও অধ্যায়কে বুঝিতে পারা যায়।

পারসিক ও মহারাষ্ট্রীয় উপাদান: মধ্যযুগকে বুঝিবার পক্ষে পারসিক ইতিহাস যতদূর সহায়ক ইংরেজ আমলকে বুঝিবার পক্ষে ততটা সহায়ক নহে। তবে এই মন্তব্য 'সিয়র-উল-মুতাখারিন'[১] গ্রন্থটির প্রতি প্রযোজ্য নহে। উহা অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাস অনুধাবনের পক্ষে একটি অপরিহার্য গ্রন্থ। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে অধিকাংশ মহারাষ্ট্রীয় কাগজপত্র সরদেশাই কর্তৃক সম্পাদিত *Selections from the Peshwa Daftar* পর্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজওয়াড়ে, খারে এবং অন্যান্যদের সম্পাদিত গ্রন্থাদিতেও অনেক মূল্যবান মারাঠী দলিল মুদ্রিত হইয়াছে। ডুপ্লের দোভাষী আনন্দ রঙ্গ পিল্লাইয়ের রচিত তামিল রোজনামচার (ডায়েরী) ইংরাজী অনুবাদ কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের কারণ ও ইতিহাস বুঝিবার পক্ষে উহা একটি অপরিহার্য তথ্যাধার। আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের গঠনে যেসকল ইংরাজ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের রচিত সমসাময়িক, আধা-সমসাময়িক বহু বৃত্তান্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আছে প্রকাশিত চিঠিপত্র ও স্মৃতিকথার স্তূপ। এই সকল উপাদান তথ্যান্বেষীর পক্ষে প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত।

আদি ইংরাজ লেখকবর্গ: উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত কতকগুলি ঐতিহাসিক গ্রন্থ আছে যাহাতে ভারতে ইংরাজ শক্তির উদ্ভব বর্ণনা করা হইয়াছে। এগুলির মূল্য অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ আছে। উহাদের ভিতর প্রচারের সচেতন কোন চেষ্টা নাই, যে চেষ্টা পরবর্তী কালের কোন কোন ইংরাজ আমল সম্পর্কিত ইতিহাস গ্রন্থের মূল্যাপকর্ষ ঘটাইয়াছে। এইপ্রকার তিনটি গ্রন্থ (যদিও উহাদের কিছু কিছু দোষ স্পষ্ট) হইল জেম্‌স্ মিলের *History of British India*, উইল্‌কসের *History of Mysore* ও গ্রাণ্ট ডাফের *History of the Mahrattas.* কানিংহামের সুবিখ্যাত গ্রন্থ *History of the Sikhs* (১৮৪৯) সেই পর্যায়ের একটি গ্রন্থ, যাহা পুরাতন হইয়াও নূতন, যাহার ভিতর সমসাময়িক বা সদ্যবিগতকালীন ইতিহাসের স্বাদ পাওয়া যায়।

১ ইংরাজীতে অনুবাদ আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাক্-বৈদিক ভারতবর্ষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতের আদিম জাতি

আর্যদের আগমনে ভারতীয় ইতিহাসের স্থচনা, এই ধারণা আর এক্ষণে গ্রহণীয় নহে। আর্যদের আগমনের পূর্বেও ভারত বহু জাতির আবাস-স্থল ছিল এবং তথাকথিত আর্য সভ্যতার বিকাশক্রিয়ায় এই সকল প্রাক্-আর্য বা অনার্যদের দান কোন অংশেই অকিঞ্চিৎকর নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে এইসকল জাতি সম্বন্ধে আমরা খুবই কম জানি। সাহিত্যের সূত্রে কোন কিছুই জানিবার উপায় নাই, কেবল বেদে ও প্রাচীন তামিল সাহিত্যে উহাদের বিষয়ে কিছু অস্পষ্ট উল্লেখ আছে মাত্র। ঐ অধ্যায় সম্বন্ধে জানিতে হইলে আমাদের প্রধানতঃ প্রত্নতাত্বিক অবিষ্কারাদির উপর নির্ভর করিতে হইবে।

প্রস্তর যুগ: ভারতের আদিম অধিবাসীরা ছিল প্রত্ন-প্রস্তর যুগের (Palaeolithic Age) মানুষ। উহাদের ব্যবহৃত পাথরের তৈয়ারী নানাবিধ স্থূল হাতিয়ার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু সংখ্যায় ছড়াইয়া রহিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্ব উপকূলের জিলাগুলিতে উহাদের অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা ধাতুর ব্যবহার জানিত না; কৃষিকার্য কিংবা অগ্নিপ্রজ্বালনক্রিয়াও তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। তাহারা মৃতদেহ সমাধিস্থ করিত না, স্থতরাং তাহাদের কঙ্কাল, অস্থি প্রভৃতির আজ আর কোন চিহ্ন নাই। নৃতাত্বিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পক্ষে এই জাতীয় কঙ্কাল-অস্থির বিশেষ মূল্য রহিয়াছে।

নব-প্রস্তর যুগ: প্রস্তর যুগের পরে আসিল নব-প্রস্তর যুগ (Neolithic Age)। এই যুগে পাথরে-গড়া স্থূল হাতিয়ার সকল পূরাপূরি বর্জন করা হয় নাই, তবে এ যুগের মানুষের ব্যবহৃত অধিকাংশ হাতিয়ারে মস্থণতা লক্ষ্য করা যায়। ঐ সকল মস্থণ হাতিয়ারের দ্বারা বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধিত হইত। নব-প্রস্তর যুগের মানুষেরা মৃতদেহ সমাধিস্থ করিত এবং

সমাধি-মন্দির নির্মাণ করিত। প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানুষ অপেক্ষা তাহারা নিঃসন্দেহে উচ্চ স্তরের সভ্যতার অধিকারী মানুষ ছিল। তাহারা কৃষিকার্য করিত, পশুপালন করিত, মৃত্তিকার দ্বারা নানা দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিতে জানিত। বংশদণ্ড কিংবা কাষ্ঠের ঘর্ষণের দ্বারা তাহারা অগ্নি প্রজ্বালনের কৌশলও শিক্ষা করিয়াছিল। তাহারা নৌকা নির্মাণ ও বস্ত্র প্রস্তুত করিতে জানিত। প্রত্ন-প্রস্তর ও নব-প্রস্তর যুগের মানুষেরা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা বলা দুষ্কর।

ধাতুর যুগ: স্বর্ণই সম্ভবতঃ প্রথম ধাতু যাহা নব-প্রস্তর যুগের মানুষের বংশধরদের দ্বারা ব্যবহৃত হইয়াছিল। তবে উহা শুধু অলঙ্কারের জন্যই ব্যবহৃত হইত। জীবনের সাধারণ দাবী পূরণের জন্য যে সকল হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হইত, সেগুলি দক্ষিণ ভারতে লৌহদ্বারা নির্মিত হইত। উত্তর ভারতে এগুলি প্রথমতঃ তামায় প্রস্তুত হইত, পরে লৌহের প্রচলন হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য তাম্রনির্মিত সরঞ্জামাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাম্রনির্মিত দ্রব্যাদি খৃস্টপূর্ব দুই হাজার বৎসরেরও পুরাতন; সম্ভবতঃ উহারা ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি যে সময়ে রচিত হইয়াছিল সেই সময়ে ব্যবহৃত হইত। উত্তর ভারতে লৌহের ব্যবহার খ্রীস্টপূর্ব এক হাজার বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; অথর্ববেদে লৌহের উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ভারতে লৌহের ব্যবহার সম্ভবতঃ আরও অনেক পরে প্রবর্তিত হয় এবং উত্তর ভারতের সঙ্গে উহার কোন সম্পর্ক না-ও থাকিতে পারে। ভারতবর্ষে নব-প্রস্তর যুগ এবং লৌহ যুগের মধ্যে ব্রোঞ্জ যুগের সূত্রপাত হয় নাই; কেবলমাত্র সিন্ধুদেশে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্রাবিড় সভ্যতা: দ্রাবিড়গণ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সুসভ্য জাতি-গুলির অন্যতম। তাহাদের ভাষা বর্তমানে দক্ষিণ ভারতের প্রধান কয়েকটি ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে—তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম্ প্রভৃতি। মারাঠী ভাষাকে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃতের মধ্যেও দ্রাবিড় ভাষার বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। প্রাচীন দ্রাবিড় বর্ণমালার নাম 'ভাত্তেলুত্তু'; উহা সেমিটিক সূত্র হইতে জাত বলিয়া অনুমিত হয়। এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ মনে করেন যে দ্রাবিড়রা ছিল ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের বংশধর এবং দ্রাবিড় সংস্কৃতি প্রাক্-দ্রাবিড় সংস্কৃতিরই ক্রমিক বিবর্তনের ফল মাত্র। দ্রাবিড় এবং সুমেরীয় জাতির মধ্যে

নৃতাত্ত্বিক গঠনে সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে দ্রাবিড়গণ পশ্চিম এশিয়া হইতে বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। দ্রাবিড় জাতির উদ্ভবের প্রশ্ন আলোচনা প্রসঙ্গে এই তথ্যের প্রতি আমাদের কিয়ৎপরিমাণে গুরুত্ব আরোপ করা উচিত যে, বর্তমানে বেলুচি-স্থানের অধিবাসী ব্রাহুই নামে এক জাতি এমন এক ভাষায় কথা বলে যাহার সহিত প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষার বর্তমান বিবর্তিত রূপগুলির গভীর সাদৃশ্য আছে। যে সকল পণ্ডিত দ্রাবিড়গণকে ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের বংশধর বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের বিশ্বাস, ভারতবর্ষ হইতে দ্রাবিড় অধিবাসী-সংখ্যার একাংশ বেলুচিস্থানে যাইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে, উহার ফলেই শেষোক্ত দেশে পরবর্তীকালে এক দ্রাবিড় উপনিবেশের পত্তন হয়। আর যাঁহারা দ্রাবিড়গণকে পশ্চিম এশিয়া হইতে আগত জাতি বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের ধারণা—ব্রাহুইগণ হইল দ্রাবিড়দের সেই গোষ্ঠীর বংশধর যাহারা পশ্চিম এশিয়া হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশের পথে বেলুচিস্থানে রহিয়া গিয়াছিল। পূর্ণতর সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে জোর করিয়া কিছু বলা কঠিন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, দ্রাবিড়গণ মোটামুটি ভাবে সুসভ্য ছিল। তাহারা ধাতুর ব্যবহার জানিত। তাহাদের প্রস্তুত কারুকার্যমণ্ডিত মৃন্ময় পাত্রাদি তাহাদের শিল্পবোধের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তাহারা হর্ম্য এবং দুর্গাদি নির্মাণ করিতে জানিত। বৈদিক সাহিত্যে 'দস্যু'দের নির্মিত 'পুর' এবং দুর্গের অনেক উল্লেখ আছে। দ্রাবিড়গণই এই 'দস্যু'। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে অনেক সমৃদ্ধিশালী নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়, জীবনের নানাবিধ ভোগসুখের উপকরণের সহিত ঐ সকল নগরের অধিবাসীদের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। দ্রাবিড় ভূমিতে কৃষিকার্যের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং সেচের উদ্দেশ্যে নদীর উপর বাঁধ নির্মিত হইত। ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যপদেশে সমুদ্র পারাপার হইতে দ্রাবিড়গণ ভয় পাইত না।

দ্রাবিড় সভ্যতা নানা দিক দিয়া আর্য সভ্যতা হইতে ভিন্নতর ছিল। দ্রাবিড়ীয় সমাজের গঠন ছিল কতকাংশে মাতৃতান্ত্রিক, আর আর্য সমাজ পুরাপুরিই পিতৃতান্ত্রিক ছিল। এই হেতু উভয় সমাজের প্রকৃতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দ্রাবিড়দের ধর্মবিশ্বাসকে কোন কোন ইউরোপীয় লেখক 'তামসিকতাপূর্ণ ও কুৎসিত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহারা দেবী

অম্বিকা ও বিভিন্ন দানবের পূজা করিত এবং নরবলি তাহাদের পূজাপদ্ধতির একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। দ্রাবিড় সমাজে জাতিভেদ ছিল না। বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করিয়া আর্যদের দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণের পর আর্য-দ্রাবিড় বৈসাদৃশ্য-লক্ষণগুলি ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকে। আর্য-অভিযানের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতের দ্বারা অভিভূত দ্রাবিড় সমাজ বিজেতাদের ধর্ম-সংস্কৃতি গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে আর্যরাও দ্রাবিড়দিগের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার নানা উপকরণ সচেতন ভাবেই হউক আর অচেতন ভাবেই হউক আত্মস্থ করিয়া লইয়াছিল। স্মিথ মনে করেন, দ্রাবিড়দিগের পূজিত দানব-দেবতা সকল পরে আর্যদের দ্বারা গৃহীত হইয়া নূতন নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, অবশেষে খাঁটি হিন্দু দেব-দেবীদের মধ্যে উহারা মিশিয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় দ্রাবিড়-প্রভাব অনু-প্রবেশের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। স্মিথ অনেক বৎসর আগে যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন যে, দাক্ষিণাত্যের অনার্য রীতি-নীতি-প্রথাসমূহের যথাযথ বিচার না হওয়া পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস উহার উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে পরিদৃষ্ট হইতে পারে না। আর্য ইতিহাসকে বুঝিতে হইলে আর্যেতর ইতিহাসও বুঝা আবশ্যক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সিন্ধু সভ্যতা

মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা: মোহেঞ্জোদড়ো (সিন্ধুদেশের লারকানা জিলা) ও হরপ্পা (পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জিলা)[১] নামক দুই স্থানে খননকার্যের ফলে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এতাবৎ অপরিজ্ঞাত এক

---

১ সিন্ধী ভাষায় 'মোহেঞ্জোদড়ো' শব্দের অর্থ হইল 'মৃতগণের সমাধি বা স্তূপ'। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে একটি বৌদ্ধস্তূপ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি তদানীন্তন কালে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পশ্চিম অনুসন্ধান-শাখার কর্মকর্তা ছিলেন। বৌদ্ধ প্রভাবের সহিত সম্পর্কিত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের আশায় তিনি ঐ স্থান খননের আদেশ দেন, কিন্তু খননারম্ভের কিছুকাল মধ্যেই তিনি প্রাগৈতিহাসিক ভগ্নাবশেষের সন্ধান পান। ঐ একই বৎসরে রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহানী হরপ্পায় অনুরূপ ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেন। পরে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার জন মার্শালের নেতৃত্বাধীনে ঐ দুই স্থানে ব্যাপক খননকার্য সুরু করা হয়।

অভিনব অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিয়াছে। এখন আর ভারতবর্ষের ইতিহাস আর্যদের আগমনকাল (খ্রীস্টপূর্ব দুই হাজার বৎসর) হইতে ধরা হয় না। কারণ খ্রীস্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর আগেই সিন্ধুনদের উপত্যকায় এক সুসমৃদ্ধ ও সুগঠিত সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। ঋগ্বেদে লৌহের সরাসরি উল্লেখ পাওয়া যায় না, এই হেতু প্রারম্ভকালীন বৈদিক যুগকে সাধারণতঃ তাম্র-প্রস্তর যুগের (Chalcolithic period) সমকালীন বলিয়া মনে করা হয়। সিন্ধু সভ্যতাও এই যুগের অন্তর্বর্তী। এই সভ্যতার নানা দিক্ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও খুবই অপূর্ণ। জ্ঞানের এই অসম্পূর্ণতার কারণ, প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এখনও মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত শীলমোহরসমূহে খোদিত শব্দাবলীর অর্থোদ্ধারে সক্ষম হন নাই। তবে ইহা প্রায় নিশ্চিত যে, শীলমোহরগুলির ঐ ভাষা না বৈদিক-সংস্কৃত, না বৈদিক-সংস্কৃতের অন্য কোন প্রকারভেদ। কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-উপত্যকার ভারতীয়েরা যে ভাষা ব্যবহার করিত উহা দ্রাবিড়দের ভাষার সগোত্র ও উহার সহিত সংসক্ত।

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ ঃ প্রাচীন মিশরের সভ্যতা যেমন নীলনদের উপত্যকায়, ব্যাবিলনীয় ও আসীরিয় সভ্যতা যেমন ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকায় বিকশিত হইয়াছিল, তেমনই প্রাগার্য ভারতবর্ষের সভ্যতাও সিন্ধুনদের উপত্যকায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সভ্যতা ছিল নাগরিক সভ্যতা। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মোহেঞ্জোদড়োতে এক বিশাল ও সুন্দর নগরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এই নগর সুদক্ষ পূর্তবিজ্ঞানীদের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। উহাতে সকল নাগরিকের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থা ছিল। এক গৃহের সারি হইতে অন্য এক গৃহের সারিকে বিভক্ত করিবার জন্য ছোট-বড় নানা আকারের রাস্তা ছিল। বাসগৃহ ছাড়াও কতকগুলি সুপরিসর অট্টালিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলি সম্ভবতঃ রাজবাটী, দেবালয় কিংবা পৌরভবনের ধ্বংসাবশেষ। অট্টালিকা নির্মাণকার্যে ইষ্টক ব্যবহৃত হইত। তবে লক্ষণীয় এই যে, ইষ্টক বা কাষ্ঠ কোন কিছুতেই কারুকার্যের চিহ্ন নাই। চমৎকার সব দরজা জানালা দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁকানো খিলানের নির্মাণপ্রণালী অজ্ঞাত ছিল, তবে প্রাচীরগাত্র হইতে বহির্বিলম্বিত কয়েকটি খিলানের (corbelled arches) সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পোড়া ইটের তৈয়ারী কূপ হইতে জল তোলা হইত। অনেকগুলি আরাম ও

স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ স্নানাগারের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থাও ছিল উৎকৃষ্ট। একটি স্নানাগারের অভ্যন্তরভাগের আয়তন হইল ১১,৪৪০ বর্গ ফুট। উহাতে একটি সন্তরণের উপযোগী জলাশয় আছে; উহা দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফুট, প্রস্থে ২৩ ফুট, গভীরতায় ৮ ফুট।

খাদ্যের দিক দিয়া মোহেঞ্জোদড়োর অধিবাসীরা গম, বার্লি, দুগ্ধ ইত্যাদির ব্যবহারে সমধিক অভ্যস্ত ছিল। তাহারা খেজুর জাতীয় ফল খাইত। তাহারা মাংসাহারীও ছিল। মৎস্যের প্রচলন ব্যাপক ছিল বলিয়া মনে হয়। ভেড়া, শূকর, মোরগ বলিই হইত বোধহয় বেশী। গৃহপালিত পশুর মধ্যে বৃষ, গাভী, মহিষ, ভেড়া, হস্তী, উট, শূকর, ছাগল, মোরগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কুকুর সম্ভবতঃ ছিল, কিন্তু অশ্বের অস্তিত্বের প্রমাণ সংশয়যুক্ত। অরণ্যচারী জন্তুর মধ্যে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ, বন্য গরু, শশক প্রভৃতির নাম করিতে পারা যায়।

মোহেঞ্জোদড়োর অধিবাসীরা স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, টিন, সীসা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানিত। লৌহ অপরিজ্ঞাত ছিল। স্বর্ণ দেশের অভ্যন্তরে পাওয়া যাইত না। দক্ষিণ ভারতের স্বর্ণখনি হইতে উহা আসিত বলিয়া কোন কোন লেখক মনে করেন। অতএব স্বর্ণের পরিমাণ স্বভাবতঃই অল্প ছিল। পিত্তল ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার হইত যুদ্ধের অস্ত্রাদি নির্মাণে, গার্হস্থ্য তৈজসপত্রাদিও ঐ উপকরণের দ্বারা প্রস্তুত হইত। প্রস্তর দুষ্প্রাপ্য ছিল; কাথিয়াওয়াড় ও রাজপুতানা হইতে প্রস্তর আসিত। শীলমোহর, দেবমূর্তি, পাত্রাদি, অলঙ্কার, ছুরিকা ইত্যাদি নির্মাণের জন্য নানা প্রকারের প্রস্তর ব্যবহৃত হইত। স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কারের সবিশেষ ভক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। এই সকল অলঙ্কার স্বর্ণ, রৌপ্য, হস্তিদন্ত, পিত্তল ও মূল্যবান প্রস্তরাদিতে প্রস্তুত হইত।

মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত মৃন্ময় পাত্রগুলির বহিরাবরণ খুবই মসৃণ এবং কখনও কখনও উহারা অলঙ্কৃতও বটে। মৃন্ময় পাত্র, তৈজসপত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি হইতে অধিবাসীদের শিল্পরুচির প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অধিবাসীদের ভিতর কুশলী ভাস্কর-শিল্পীও ছিল। শীলমোহরের এবং হরপ্পায় আবিষ্কৃত কতিপয় প্রস্তর-মূর্তির উপর খোদিত জীবজন্তুর রূপায়ণ চারুশিল্পের অগ্রগতির পরিচায়ক।

মোহেঞ্জোদড়োর অধিবাসীরা কোন্ ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা চালিত হইত সে বিষয়ে জোর করিয়া কিছু বলা কঠিন। বোধহয় মন্দির বলিয়া কিছু ছিল না, কারণ এই পর্যন্ত যত গৃহ খনন করা হইয়াছে উহাদের কোনটিকেই উপাসনা-গৃহ

আখ্যা দেওয়া চলে না। তবে শীলমোহর এবং মৃত্তিকা ও ধাতুনির্মিত ক্ষুদ্র মূর্তিসমূহের উপর রূপায়িত চিত্রগুলির ভিত্তিতে কতিপয় আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। খুব সম্ভবতঃ দেবীমাতা বা অম্বিকামূর্তির পূজা সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। মোহেঞ্জোদড়োর ধর্মীয় জীবনের এই বৈশিষ্ট্য উহার সহিত পশ্চিম এশিয়ার সম্পর্ক নির্দেশ করিতেছে। অম্বিকা মূর্তির পূজা সম্ভবতঃ পশ্চিম এশিয়াতেই জন্মলাভ করিয়া থাকিবে। বৈদিক ভারতবর্ষ উহার উদ্ভবস্থল বলিয়া মনে হয় না, কারণ এখানে দেবীপূজা অপেক্ষা দেবপূজার অর্থাৎ পুরুষ বিগ্রহের পূজার সমধিক আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। মোহেঞ্জোদড়োবাসীরা অবশ্য একটি পুরুষ দেববিগ্রহেরও পূজা করিত, উহা শিবের বিগ্রহ বলিয়া অনুমিত হয়। লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল। এই ক্ষেত্রেও বৈদিক প্রথার সহিত বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। ঋগ্বেদে লিঙ্গোপাসনাকারীদিগকে স্পষ্টতঃই নিন্দা করা হইয়াছে। অপ্রাণীতে ও নিম্নবর্ণের প্রাণীতে সচেতন প্রাণসত্তা আরোপের প্রথাও যথেষ্ট প্রবল ছিল—বৃক্ষ, পশুপক্ষী ও সর্প পূজিত হইত। মৃতদেহের সংকারবিধি ধর্মচর্চার সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্পর্কিত ছিল। সিন্ধু-উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসীদের সমক্ষে শবসংকারের তিনটি বিধি পরিজ্ঞাত ছিল—পূর্ণ সমাধিদান, আংশিক সমাধিদান এবং দাহকার্য অন্তে সমাধিদান।

কালানুক্রম—মোহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষগুলিকে তিন বিভিন্ন অধ্যায়ের দানরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা হইয়াছে—আদি অধ্যায়, মধ্যবর্তী অধ্যায়, শেষ অধ্যায়। এই তিন অধ্যায় হইতে সম্ভবতঃ অনধিক পাঁচ শতাব্দীর ইতিহাসের হিসাব পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতা মোহেঞ্জোদড়ো নগরের প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল এবং ঐ নগরের বিলুপ্তির পরেও উহা সক্রিয় ছিল। অনুমান খ্রীস্টপূর্ব ৩২৫০-২৭৫০ সনের অন্তর্বর্তী সময়সীমাকে মোহেঞ্জোদড়ো নগরের অস্তিত্বের কাল বলিয়া ধরা হয়।

জাতি—মোহেঞ্জোদড়োর অধিবাসিবৃন্দ সম্ভবতঃ তিন বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল—ভূমধ্যসাগরীয় জাতি, ককেশীয় জাতি, এবং অজ্ঞাত-পরিচয় অন্য একটি জাতি, যাহার বংশধরগণ বর্তমানে আর্মেনিয়া হইতে কাশ্মীর ভূভাগের উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া বাস করিতেছে। মোঙ্গোলীয় বলিয়া চিহ্নিত করা যায় এমন এক কঙ্কালও মোহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ইহা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা কোনও এক বিশেষ জাতির সৃষ্টি নহে ; একই আবেষ্টনীতে বসবাসকারী ও কার্যরত বিভিন্ন জাতির সমবায়ে এই সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। কোন কোন লেখক মনে করেন, মোহেঞ্জোদড়োর অধিবাসিবৃন্দ দ্রাবিড় জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সিন্ধু-সভ্যতা ও বৈদিক আর্যগোষ্ঠী—সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসিবৃন্দ ও বৈদিক আর্যগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক প্রমাণ করিবার নানা চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ঐ মত গ্রহণের অনুকূলে ন্যায়সঙ্গত যুক্তি খুব কমই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ মূলতঃ গ্রামীণ সভ্যতার দান, পক্ষান্তরে সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা ছিল স্পষ্টতঃই নাগরিক। অশ্ব সম্ভবতঃ মোহেঞ্জোদড়োতে অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু বৈদিক যোদ্ধারা প্রায়শঃ অশ্বের ব্যবহার করিত। বেদে গাভী একটি সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু মোহেঞ্জোদড়োতে বৃষ সমধিক সম্মানের অধিকারী ছিল। বিগ্রহপূজা মোহেঞ্জোদড়োর একটি সাধারণ রীতি ছিল, কিন্তু বৈদিক আর্যগণের উহা অজ্ঞাত ছিল। বেদে পুরুষ-দেবতাদের প্রাধান্য ; মোহেঞ্জোদড়োতে শিব অপেক্ষা অম্বিকা দেবীর সমধিক আধিপত্য। এই সকল প্রমাণ দৃষ্টে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হইয়া পড়ে যে, বৈদিক আর্যগণের সভ্যতা সিন্ধু-সভ্যতা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ও পরবর্তী কালের।

ধারণাটি এই মতকেও সমর্থন করে যে, আর্যগণের আগমনের ফলে সিন্ধু-উপত্যকাস্থিত সমৃদ্ধিশালী নগরগুলির রাজনৈতিক আধিপত্যের অবসান হয়। নগরগুলিতে এক সময়ে 'বিপর্যয়ের' সূচনা হইয়াছিল এবং উহার ফলে পরিণামে উহাদের ধ্বংস সাধিত হয়—এইরূপ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হস্তগত হইয়াছে। ঋগ্বেদে আর্য যুদ্ধদেবতা ইন্দ্র ও অগ্নিদেবতা কর্তৃক দুর্গাধিকারী 'দাস' বা 'দস্যু'দিগের বিরুদ্ধে অভিযানের উল্লেখ আছে, উপরি-উক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ ঐ উল্লেখের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত বলিয়া মনে হয়। আর্যগণের এই শত্রু বোধ হয় আর কেহ নহে, সিন্ধু-উপত্যকার সুরক্ষিত নগরসমূহের অধিবাসিবৃন্দকেই বুঝাইতেছে।

সিন্ধু-উপত্যকার নগরসমূহ (খুব সম্ভবতঃ আর্য অভিযানের ফলে) যদিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা ও সংস্কৃতি রাজনৈতিক বিপর্যয়কে অতিক্রম করিবার মত পর্যাপ্ত শক্তির অধিকারী ছিল। কালক্রমে আর্যগণ শত্রুর সংস্কৃতি ও সভ্যতার কোন কোন বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করিয়া লইয়াছিল ;

বর্তমান হিন্দুধর্মের কোন কোন দিক্ সেই সুদূর অতীতের লেনদেনকে স্মরণ করাইয়া দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শক্তিপূজা ও লিঙ্গপূজার আদর্শ খুব সম্ভবতঃ আর্য ভারত সিন্ধু-সভ্যতা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। কথায়ই বলে, পুরাতন বিশ্বাস সহজে মরে না। এমনও হইতে পারে যে, পুরাতন হিন্দুসমাজ সংস্কৃতভাষী বহিরাগত আর্যগণ অপেক্ষা সিন্ধু-সভ্যতার নিকটই সমধিক ঋণজালে আবদ্ধ ছিল।

সিন্ধু-উপত্যকা ও পশ্চিম এশিয়া—এইরূপ অনুমান করিবার সঙ্গত কারণ আছে যে, সিন্ধু-উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা তৎকালীন পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। পশ্চিম এশিয়ার উর, তেল আস্‌মীর (বাগদাদের সন্নিকটে) ও অন্যান্য জায়গায় অসংখ্য ভারতীয় শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। উহাদের কোন কোনটিতে মোহেঞ্জোদড়ো লিপি খোদিত রহিয়াছে। অট্টালিকার বহির্ভাগের খিলান, প্রাচীরগাত্রস্থিত কুলুঙ্গি, মাতৃকা পূজা, শীলমোহরের উপর কতকগুলি সদৃশ জীবজন্তুর রূপায়ণ—এ সকলই মোহেঞ্জোদড়ো ও মেসোপোটেমিয়ার মধ্যে দৃষ্টিগ্রাহ্য যোগসূত্রের নির্দেশ করিতেছে। এইরূপ অনুমিত হয় যে, এই দুই দূরবর্তী অঞ্চলের সভ্যতা-সংস্কৃতি একই সাধারণ সভ্যতার গর্ভ হইতে জাত হইয়াছে। উহাদের পরস্পরের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাহা স্থানীয় কারণসম্ভূত, জাতীয় বৈশিষ্ট্যও উহার মূলে রহিয়াছে। আরও খননকার্যের ফলে এই অতীব কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির উপর ভবিষ্যতে আরও আলোকপাত হইবে এইরূপ আশা করা যাইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

আর্যজাতির আগমন

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতে আর্য-উপনিবেশ

আর্যগণের আদি বাসস্থল—কোন কোন লেখক মনে করেন যে ভারতবর্ষই আর্যগণের[১] আদি বাসস্থল; তবে সাধারণ অভিমত এই যে, তাহারা মধ্য এশিয়া কিংবা ইউরোপের কোন অঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল।

ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ ভাষাভিত্তিক নিদর্শনাদির সাহায্যে আদিম আর্য-সংস্কৃতির একটি মোটামুটি প্রাথমিক রেখাচিত্র অঙ্কনে সমর্থ হইয়াছেন; তবে তাঁহারাও বলিতে পারেন না ঠিক কোন্ ভৌগোলিক অঞ্চলে ঐ সংস্কৃতির উৎপত্তি হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে আর্য-প্রশ্নটিকে কখনও কখনও রাষ্ট্রিক বা জাতীয় বাদ-বিসংবাদের সঙ্গে জড়িত করা হইয়াছে; কিন্তু আমাদের বর্তমান জ্ঞানের অবস্থায় 'আর্য' কিংবা 'ইন্দো-ইউরোপীয়' বা ঐ জাতীয় অন্য নামে সচরাচর পরিচিত মানুষদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাদি যথাযথভাবে নিরূপণ করা খুব সহজসাধ্য নহে। আমরা এইমাত্র জানিতে পারিয়াছি যে, তাহারা শ্বেতবর্ণ জাতি ছিল; কিন্তু তাহারা দীর্ঘকায় কি হ্রস্বকায়, স্থূলাঙ্গ কি কৃশাঙ্গ, সুদর্শন কি মলিনদর্শন সে সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা কঠিন।

সম্প্রতি এক জার্মান পণ্ডিত এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে,

১। সংস্কৃত Arya—আবেস্তায় Airya—প্রাচীন পারসিকে Ariya। শব্দটির মৌলিক অর্থ হইল "বিশ্বস্ত জন", "একই জাতির মানুষ"। বৈদিক স্তোত্রাদির রচয়িতাগণ ভারতের প্রাচীন অধিবাসীগোষ্ঠী হইতে নিজেদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বুঝাইতে 'আর্য' শব্দের ব্যবহার করিতেন। প্রাচীন অধিবাসিদিগকে তাঁহারা শত্রু বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহাদিগকে 'দাস' বা 'দস্যু' আখ্যা দিয়া গিয়াছেন।

ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দসমষ্টির বিবর্তনের দুইটি সুস্পষ্ট স্তরবিভাগ আছে; এই দুই স্তরবিভাগ দুই বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে সংসাধিত হইয়াছিল। তাঁহার মতে প্রথম স্তরের উদ্ভব এক পর্বতমালার সানুদেশে অবস্থিত তৃণময় প্রান্তরে; এই তৃণময় প্রান্তরটিকে তিনি উরাল পর্বতমালার দক্ষিণ দিকস্থিত কিরঘিজ তৃণপ্রান্তর বলিয়া মনে করেন। পরবর্তী স্তরের উদ্ভব কার্পেথিয়ান পর্বতমালার অব্যবহিত পূর্বদিকে অবস্থিত ভূখণ্ডে, অর্থাৎ বোহেমিয়া, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী এই ভূখণ্ডে। আলোচ্য মতানুসারে, ইন্দো-ইউরোপীয়গণ প্রথমে কিরঘিজ তৃণপ্রান্তরের উত্তর-পশ্চিমাংশে বাস করিত; তথা হইতে ইন্দো-ইরাণীয় জাতিগোষ্ঠী পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং পরবর্তী কালে কোন কোন জাতিগোষ্ঠীর গতি হয় পশ্চিমাভিমুখী।

ভারতে আর্যগোষ্ঠীর আগমনকাল—ঠিক কোন্ সময়ে ভারতে আর্যজাতির অনুপ্রবেশ শুরু হইয়াছিল মোটামুটিভাবেও তাহা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ জনসংখ্যার বৃদ্ধি আর্যগণকে তাহাদের পর্বতবেষ্টিত ক্ষুদ্র গৃহকোণ ত্যাগ করিয়া দূরবর্তী দেশে খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইতে বাধ্য করিয়াছিল। যে সকল দেশে তাহারা প্রবেশ করে সেই সকল দেশের অধিবাসিবৃন্দের সহিত নিশ্চয় তাহাদের প্রভূত সংঘর্ষ ঘটিয়া থাকিবে এবং এইভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়া থাকিবে। কেপ্পাডোসিয়াতে (Cappadocia) কয়েক বৎসর আগে জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত বিখ্যাত বোঘাজ-কোই (Boghaz-Koi) শিলালিপি হইতে এইরূপ মনে করা যাইতেছে যে, খ্রীস্টপূর্ব ১৪০৩ বৎসরের কাছাকাছি কোন সময়ে আর্যগণ মিটান্নি (Mitanni) নামধেয় ঐ অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দের উপর তাহাদের কতক কতক দেবতাকে চাপাইতে সমর্থ হইয়াছিল। তবে এই সাক্ষ্য হইতে এরূপ বলা যায় না যে খ্রীস্টপূর্ব ১৪০০-এর পূর্বে ভারতে আর্য-অনুপ্রবেশ ঘটে নাই।

এ বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত যে, ভারতে উপনিবেশ-স্থাপনকারী আর্যগণ জাতিগতভাবে প্রাচীন ইরাণীয়দিগের সগোত্র। মুখ্যতঃ ভাষার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। পাঞ্জাবে বসবাসকারী আর্যগণের ভাষা আর প্রাচীন ইরাণীয় ও আবেস্তার ভাষার মধ্যে গভীর সাদৃশ্য ছিল। উইণ্টারনিৎস্ (Winternitz) মনে করেন যে, সংস্কৃত এবং পালি ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য,

বেদের ভাষা এবং প্রাচীন ইন্দো-ইরাণীয় ভাষার মধ্যে উহা অপেক্ষা কম পার্থক্য বিদ্যমান। ইন্দো-আর্য এবং ইরাণীয় ভাষার মধ্যে পার্থক্যের প্রক্রিয়া বোঘাজ-কোই শিলালিপির পরবর্তী কাল হইতে শুরু হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

ভারতে আর্য-আগমনের কাল নির্ণয় করিতে হইলে আমাদের ঋগ্বেদের কাল নির্ণয় করিতে হইবে। উইণ্টারনিৎস্ বলিতেছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদিগের মধ্যেও প্রচুর মতভেদ; মতভেদ শুদ্ধমাত্র শতাব্দীর হিসাব লইয়াই নয়, সহস্রাব্দের হিসাব লইয়াও। কেহ কেহ খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ বৎসরকে ঋগ্বেদীয় স্তোত্রগুলির রচনাকালের আদিতম সীমানা বলিয়া মনে করেন; কেহ কেহ মনে করেন সেগুলি খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০-২৫০০ সময়সীমার মধ্যে রচিত হইয়াছে। উইণ্টারনিৎসের এই মত অদ্যাবধি গ্রাহ্য। বৈদিক সাহিত্যের সূচনাকালকে খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ কিংবা ২৫০০ বৎসরের কাছাকাছি কোন সময় বলিয়া ধরিয়া লইলে বোধ হয় আমরা খুব বেশী ভুল করিব না। বৈদিক সাহিত্যের বয়স নিরূপণে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সহায় হইল এই সুনিশ্চিত তথ্য যে, জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তীকালীন ঘটনা। ঋগ্বেদের আদি স্তোত্রগুলি যদি খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ কিংবা ২৫০০ বৎসরের কাছাকাছি কোন সময়ে রচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে জৈন এবং বৌদ্ধগণের নিকট সুপরিজ্ঞাত প্রধান উপনিষদ্‌সমূহ অন্ততঃ পক্ষে খ্রীস্টপূর্ব ৫০০ বৎসরের পুরাতন বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ভারতের আদি আর্য উপনিবেশ—অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, আর্যগণ খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ বৎসরের মধ্যেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, উহার পরবর্তী কোন সময়ে নহে। ঋগ্বেদের অধিকাংশ স্তোত্র আধুনিক আম্বালার দক্ষিণে অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদীর চতুষ্পার্শ্ববর্তী দেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান। আর্যরা যে আফগানিস্থান ও পাঞ্জাব দখল করিয়াছিল তাহা ঋগ্বেদে কাবুল, কোরাম, গুমাল, সিন্ধু, ঝিলম্, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, শতদ্রু প্রভৃতি নদীর উল্লেখ হইতে বুঝা যায়। যমুনা এবং গঙ্গা নদীরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে নর্মদা নদীর কোন উল্লেখ নাই। পর্বত-সমূহের মধ্যে হিমালয় সুপরিজ্ঞাত ছিল, কিন্তু বিন্ধ্যপর্বত অজ্ঞাত ছিল। এই ভৌগোলিক উল্লেখাদি হইতে বুঝা যায়, ঋগ্বেদের যুগে আর্যগণের বসতি পূর্ব আফগানিস্থান, পাঞ্জাব এবং আধুনিক উত্তর প্রদেশের অংশবিশেষ—এই কয়টি

অঞ্চলের মধ্যেই মূলতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। উল্লিখিত ভূখণ্ডের একটি বৃহৎ অংশের নাম ছিল 'সপ্তসিন্ধু', অর্থাৎ সপ্ত নদীর দেশ।

পরবর্তী বৈদিককালে আর্যগণের সম্প্রসারণ—অনার্য 'দাস' বা 'দস্যু'দের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষের বর্ণনায় ঋগ্বেদ পরিপূর্ণ। আর্যগণ ক্রমশঃ পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে—মনশ্চক্ষে এইরূপ আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি। 'ব্রাহ্মণ'গুলিতে পাঞ্জাবের উল্লেখ ক্ষীয়মাণ, পক্ষান্তরে পূর্ব দেশগুলির উল্লেখ উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান। সেই যুগে আর্য সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র ছিল মধ্যদেশ ; এই দেশ সরস্বতী নদী হইতে গাঙ্গেয় দোয়াব অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রায়শঃ কুরুক্ষেত্র, কোশল (বর্তমান অযোধ্যা), কাশী (বারাণসী), বিদেহ (উত্তর বিহার), মগধ (দক্ষিণ বিহার), অঙ্গ (পূর্ব বিহার) প্রভৃতি অঞ্চলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কুরু এবং পাঞ্চালগণ সেই সময়ের প্রধান আর্য সম্প্রদায় ছিল। দাক্ষিণাত্যের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয় ; কারণ, গোদাবরী উপত্যকার অন্ধ্রজাতি এবং বিন্ধ্য অরণ্যানীর পুলিন্দ ও শবরদিগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়সমূহ তখনও পুরাপুরি আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাহাদিগকে অন্ত্যজ আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়াছে। আর্য সভ্যতা তখন সবেমাত্র বিন্ধ্যপর্বত ভেদ করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈদিক সাহিত্য ও বৈদিক ধর্ম

বেদের রচয়িতা—এই গ্রন্থে অবলম্বিত প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুসারে, সমগ্র বৈদিক সাহিত্য খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০-৫০০ শতাব্দীর সময়-সীমার মধ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে হইবে। গোঁড়া হিন্দুদিগের ধারণা, বেদ মানুষের রচনা নহে ; হয় স্বয়ং ভগবান প্রাচীন ঋষিদিগকে বেদের শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, নয় বেদ অপৌরুষেয় বাণীসমষ্টিরূপে ঋষিদের নিকট আপনা হইতেই প্রতিভাত হইয়াছিল। তবে উৎস যাহাই হউক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে বেদ আর্যগণের প্রাচীনতম সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শন।

বেদের গুরুত্ব—পুরুষপরম্পরাক্রমে বেদ মুখে মুখে প্রচারিত হইয়াছিল। এইজন্য বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। হিন্দুগণ বেদকে গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছে, এই শ্রদ্ধাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া এরূপ বিশাল পরিমাণ এক সাহিত্যের মুখে মুখে প্রচার সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। ঐ সময়ে উহা লিখিত আকারে বিদ্যমান না থাকিলেও উহাতে প্রক্ষিপ্ত খুব সামান্যই ঘটিয়াছে। একজন আধুনিক লেখক হিন্দু-মানসে বেদের স্থান এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন—"বৈদিক সভ্যতার কাল হইতে, ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাস পরবর্তী বিভিন্ন যুগে প্রভূত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু বেদসমূহের প্রতি এমনই প্রগাঢ় ভক্তি যে, যুগ যুগ ধরিয়া সকল স্তরের হিন্দুদিগের নিকট উহা শ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়া আছে। অদ্যাবধি হিন্দুর জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কিত যাবতীয় আবশ্যিক আনুষ্ঠানিক কর্ম সেই সনাতন বৈদিক বিধি মতে নিষ্পন্ন হয়। অদ্য এক ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা যে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করেন, উহা বেদের শ্লোক হইতে নির্বাচিত দুই বা তিন সহস্র বৎসর পূর্বেকার একই প্রার্থনামন্ত্র।...বেদের পরবর্তী কালে যে সংস্কৃত সাহিত্যের পুষ্টি, তাহার এক বিশাল অংশের যাথার্থ্য বেদের উপর নির্ভরশীল এবং বেদকেই সেখানে প্রামাণ্য বলিয়া মনে করা হয়। হিন্দু ষড়্‌দর্শন কেবল যে বেদের প্রতি আনুগত্যপরায়ণ শুধু তাই নয়; এক দর্শনের অনুবর্তিগণ অন্য দর্শনের অনুবর্তীদের সহিত প্রায়শঃ এই যুক্তিতে কলহ করিতেন যে তাঁহাদের দর্শনই শ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহাদের দর্শনই বেদের একমাত্র বিশ্বস্ত অনুগামী দর্শন এবং একমাত্র উহাতেই বেদের মতামত নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। যে সকল নীতি-নিয়মের দ্বারা হিন্দুদিগের সামাজিক আইনগত গার্হস্থ্য ও ধর্মীয় প্রথা ও অনুষ্ঠানাদি অদ্যাবধি নিয়ন্ত্রিত, উহারা সনাতন বৈদিক ধ্যান-ধারণার বিধিবদ্ধ স্মৃতিরূপে গণ্য, এবং সেই কারণেই উহাদিগকে বাধ্যতামূলক বলিয়া মনে করা হয়। এমনকি বৃটিশ আমলেও, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ এবং অনুরূপ অন্যান্য আইনগত ব্যাপারে হিন্দু বিধিবিধান অনুসৃত হইয়াছে। বেদ হইতেই এই সকল নিয়মের প্রামাণিকতার উদ্ভব বলিয়া দাবী করা হয়।"[১]

---

১ S. N. Das Gupta, *A History of Indian Philosophy*, Vol. 1. pp. 10-11.

বৈদিক সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ—বৈদিক সাহিত্য চারি ভাগে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্।

বৈদিক সাহিত্যের সংহিতা ভাগ কতকগুলি মন্ত্র, প্রার্থনা, আশীর্বচন, যজ্ঞবিধি ও সামাজিক উপাসনা-মন্ত্রের সমষ্টি। মন্ত্রগুলি পদ্যে বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত।

সংহিতার মন্ত্রগুলি চারি ভাগে বিভক্ত—ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ।

১। ঋগ্বেদ সংহিতা সংহিতা-চতুষ্টয়ের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ঋগ্বেদের বর্তমান মন্ত্র-সংখ্যা ১০২৮; এই মন্ত্রগুলি দশটি 'মণ্ডলে' বিভক্ত। এই মন্ত্রগুলির কিয়দংশ গোড়া হইতেই যজ্ঞ এবং উপাসনার মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। তবে অন্যান্য মন্ত্রও আছে, যেগুলির সহিত যজ্ঞবিধির কোন সম্পর্ক নাই। এই সকল মন্ত্রের ভিতর সত্যকার আত্মকালীন আধ্যাত্মিক কাব্যানুভূতির আমেজ পাওয়া যায়।

অথর্ববেদ ৭৩১টি মন্ত্রের সমষ্টি। এই মন্ত্রগুলি ২০টি 'মণ্ডলে' বিভক্ত। মন্ত্রগুলির একাংশ ঋগ্বেদ সংহিতা হইতে হুবহু গৃহীত হইয়াছে। সব জড়াইয়া অথর্ববেদ সংহিতা ঋগ্বেদ সংহিতার তুলনায় অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা। অথর্ব-বেদের প্রধান গুরুত্ব এইখানে যে, উহাতে বহু অপদেবতা ও উপদেবতার উপাসনার ইঙ্গিত এবং আভিচারিক মন্ত্রাদি পাওয়া যায়। পুরোহিততন্ত্রের প্রভাবমুক্ত সত্যকার লৌকিক বিশ্বাসসমূহের জ্ঞানকাণ্ডের উৎসরূপেও অথর্ববেদ সবিশেষ মূল্যবান। নৃতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের দিক দিয়া মন্ত্রগুলির খুবই তাৎপর্য রহিয়াছে।

সামবেদ ১৫৪৯টি মন্ত্রের সমষ্টি। মাত্র ৭৫টি ব্যতীত সামবেদের অন্যান্য সকল মন্ত্রই ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। আলোচ্য ৭৫টি মন্ত্র অন্যান্য সংহিতায়ও পাওয়া যায়। সামবেদের মন্ত্রগুলি যজ্ঞকালে সঙ্গীতরূপে ব্যবহৃত হইত।

যজুর্বেদ কেবলমাত্র মন্ত্রের সমষ্টি নহে, উহাতে গদ্যাংশও (যজুঃ) আছে। এই গদ্যাংশগুলির কতক ছন্দোবৈভবযুক্ত এবং কোথায়ও কোথায়ও কবিত্বমণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। যজুর্বেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ঋগ্বেদ সংহিতায়ও বর্তমান।

২। বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে রচিত। ইহাতে যাগযজ্ঞ সম্বন্ধীয় আচারাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণভাগ এমন এক যুগের রচনা, যে যুগের তাবৎ বুদ্ধিগ্রাহ্য তৎপরতা যাগযজ্ঞ, উহাদের নিয়ম প্রণালী, মূল্যবোধ, তাৎপর্যজ্ঞান

ইত্যাদির উপর কেন্দ্রীভূত। পুরাতন ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত রচনাসমূহ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য—ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও কৌশীতকী ব্রাহ্মণ; সামবেদের অন্তর্ভুক্ত তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ও জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ; যজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত তৈত্তীরিয় ব্রাহ্মণ ও শতপথ ব্রাহ্মণ। অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণসমূহ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা। উহাদের মধ্যে গোপথ ব্রাহ্মণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩। বৈদিক সাহিত্যের আরণ্যক ভাগ ব্রাহ্মণভাগের পরিশিষ্ট মাত্র। এই রচনাগুলি অরণ্য সম্বন্ধীয়, সেই জন্য উহাদের 'আরণ্যক' নাম হইয়াছে।

যাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইতেন এবং অরণ্যবাসহেতু প্রয়োজনীয় উপকরণাদির অভাবনিবন্ধন আড়ম্বর সহকারে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না, তাঁহাদিগকে ধর্মজীবন-যাপনে পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ আরণ্যক রচিত হইয়াছিল। আরণ্যকগুলিতে যজ্ঞক্রিয়ার বদলে ধ্যান ও ধারণা ক্রমশঃ অধিক প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে; ধ্যান-ধারণার তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব এই প্রাধান্যবিস্তারের কারণ। আরণ্যক পর্বে আসিয়াই আমরা দেখি, বিচক্ষণ ব্যক্তিদের একাংশের মধ্যে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানাদির সার্থকতা সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিয়াছে, এবং তৎপরিবর্তে সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার স্ফুরণ হইয়াছে এবং ঐ দার্শনিক চিন্তা ক্রমশঃ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদির স্থলাভিষিক্ত হইতেছে। আরণ্যক ভাগ ব্রাহ্মণ ভাগের পরিশিষ্ট মাত্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ঐতরেয় আরণ্যক ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ধারাবাহী রচনা ভিন্ন আর কিছু নহে।

৪। উপনিষদ্ হইল সেই-জাতীয় রচনা, যাহাতে একান্ত-বৈঠকে শিষ্যের প্রতি গুরুর প্রদত্ত গুহ্য উপদেশাবলী বর্ণিত হইয়াছে। পুরাতন উপনিষদ্ ভাগ —কোন কোন ক্ষেত্রে আরণ্যকের অংশমাত্র, কতকাংশে আরণ্যকের সহিত নূতন সংযোজন। বস্তুতঃ, আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যে প্রভেদরেখা অঙ্কন প্রায়শঃ কঠিন ব্যাপার। আর্যগণের দার্শনিক চিন্তার পরিণত রূপ উপনিষদে পাওয়া যায়। উপনিষদ্ যাগযজ্ঞকেন্দ্রিক ধর্মের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিক্রিয়া-বিশেষ। পরম সত্য ও সত্তার স্বরূপ নির্ণয়ে উপনিষদ্ যত্নবান। উপনিষদের সত্যজ্ঞান মুক্তিকামী মানুষের নিকট এক নূতন জগতের দ্বার উন্মোচন করিয়াছিল। উপনিষদ্ ভাগ সচরাচর গদ্যে রচিত, তবু কিছু অংশ সম্পূর্ণতঃ

অথবা খণ্ডশঃ পদ্যে রচিত। বর্তমানে একশতেরও উপর উপনিষদ বিদ্যমান, তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইল—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তীরিয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর, কৌশীতকী ইত্যাদি।

বেদের ধর্ম—বৈদিক ভারতের ধর্মজীবন কি ছিল, বৈদিক সাহিত্য হইতে উহার একটি আলেখ্য পাওয়া যায়, যদিও সেই আলেখ্য অসম্পূর্ণ। আদিম ধর্মীয় চেতনার সরল-সহজ উচ্ছ্বাস বেদ হইতে পাওয়া যাইবে না, তবে উহাতে সেই ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় আছে, যাহা পুরোহিততন্ত্রের বিধিবদ্ধ চেষ্টার পরিণামফল এবং পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্মমতের মধ্যে ষোল আনা সামঞ্জস্যপ্রয়াসের দান। বৈদিক ভারতবাসীর ধর্ম আর্য জাতির প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের অনুস্মৃতি মাত্র। তাহাদের দেবতাচক্রের মধ্যে এমন কয়েকজন দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব হইতেই আর্যগণ কর্তৃক যে দেবতা সকল পূজিত হইত। আবার কতিপয় দেবদেবীর পূজা, যেমন নদীমাতা সরস্বতীর পূজা, উহাদের ভারতে আগমনের পর প্রবর্তিত হয়। অধিকাংশ দেবদেবীই প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। আমরা দ্যৌঃ, অগ্নি, পর্জন্য প্রমুখ দেবতার উল্লেখ করিতে পারি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মহিমা বৈদিক ঋষিগণের কল্পনাকে উদ্দীপিত এবং তাঁহাদের মনে ভক্তিভাবের সঞ্চার করিয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত দেবদেবীর সংখ্যা অগণন। কখনও কখনও তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বিহারভূমি অনুযায়ী তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—আকাশচারী দেবতা (যথা, মিত্র ও বরুণ), মধ্য-নভোমণ্ডলের দেবতা (যথা, ইন্দ্র ও মরুৎ) এবং মর্ত্যের দেবতা (যথা, অগ্নি ও সোম)। বৈদিক দেবতাকুলের ভিতর পুরুষ দেবতার সমধিক প্রাধান্য, উহা বৈদিক দেবতাচক্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। দেবতাচক্রের মধ্যে মর্যাদার তারতম্যজ্ঞাপক সুনির্দিষ্ট কোন স্তরভেদ নাই, সর্বশক্তিবিশিষ্ট কোনও ঈশ্বরেরও দেখা পাওয়া যায় না। প্রতি দেব কিংবা দেবী তাঁহার পূজাপ্রচলনহেতু অথবা তদভাবে প্রভাদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন অথবা অকিঞ্চিৎকরত্বে লীন হইয়াছেন। এই অধ্যায়টিকে সেইজন্য 'বহুদেবভিত্তিক'ও আখ্যা দেওয়া হয় নাই, 'একদেবভিত্তিক'ও আখ্যা দেওয়া হয় নাই ; উহাকে সঙ্গতভাবেই দুইয়েরই অভিমুখী বলিয়া মনে করা হইয়াছে, যদিও এতদুভয়ের যে-কোন একটির সহিত অভিন্ন হইতে পারে, বৈদিক ধর্মবিশ্বাস তখনও এতদূর পরিণত হয় নাই।

আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিকাশ মানবভাগ্যের নিয়ন্তারূপে দেবদেবীগণের গুরুত্ব স্বভাবতঃই অনেকটা নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছিল। আদি অধ্যায়ের বৈদিক অনুষ্ঠান খুবই সরল ছিল ; দেবগণের উদ্দেশ্যে দুগ্ধ, শস্য, ঘৃতের অনাড়ম্বর নৈবেদ্য নিবেদিত হইত। পূজার লক্ষ্য ছিল পার্থিব সুখ—সন্তান ও গোধন লাভ অথবা শত্রুবিনাশ। 'ব্রাহ্মণ' যুগ হইতে জটিলতার উদ্ভব হইতে থাকে। অর্ঘ্যাদি ক্রমশঃ অধিকতর উপকরণবহুল হইয়া উঠিল, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াও উত্তরোত্তর জটিল হইতে আরম্ভ করিল। যে কোন একটি যজ্ঞের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য বহুতর পুরোহিতের প্রয়োজন হইল। এই পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে রহিয়াছেন 'হোতৃ', যিনি মন্ত্র আবৃত্তি করিতেন ; 'অধ্বর্যু', যিনি প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ কায়িক প্রকরণ সম্পাদন করিতেন ; 'উদ্‌গাতৃ', যিনি সাম গান করিতেন ; এবং কতিপয় সহকারী। যে মনোভাব সহকারে নৈবেদ্য নিবেদন করা হইত, সেই মনোভাবের মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হইল। দেবতাগণের তুষ্টিবিধান আর লক্ষ্য রহিল না, যজ্ঞের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যজ্ঞকারীর আকাঙ্ক্ষিত বস্তুদানে দেবতাদিগকে বাধ্য করাই হইয়া উঠিল যাগযজ্ঞের মূল অভিপ্রায়। এইভাবে দেবতারও উপরে যজ্ঞের মর্যাদা বিহিত হইল। উহার ন্যায়সঙ্গত পরিণাম হইল এই যে, 'পূর্বমীমাংসা' দর্শনে যাগযজ্ঞ ক্রিয়াদি সম্পূর্ণরূপে ধিক্কৃত ও বর্জিত হইল। যাগযজ্ঞের অতিপ্রাধান্যই উহার অন্তিমদশা ঘনাইয়া আনিল।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, দার্শনিক চিন্তা, অর্থাৎ সত্য ও পরম সত্তার সন্ধানচেষ্টার সূচনা আরণ্যকগুলির মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। উপনিষদ্‌সমূহে সেই সন্ধান উহার ন্যায়সঙ্গত পরিণতিতে গিয়া পৌছাইল। এই রচনাগুলি ভারতীয় দর্শনচিন্তার বিকাশের ইতিহাসে সবিশেষ মূল্যবান স্থান অধিকার করিয়া আছে। উহাদের অন্তর্নিহিত মূল ভাবটি হইল এই যে, পৃথিবীর সকল দৃশ্যমান পরিবর্তনের অন্তরালে এক অপরিবর্তনীয় সত্তা (ব্রহ্ম) বিদ্যমান রহিয়াছে, এই পরম সত্তা মানবাত্মার সহিত অভিন্ন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঋগ্বেদীয় আর্যগণের রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সংগঠন

বৈদিক যুগে অনার্যদের অবস্থা—প্রারম্ভিক বৈদিক যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান, দুর্ভাগ্যবশতঃ খুবই সীমাবদ্ধ। এই দেশের আদিম অধিবাসী 'দাস' বা 'দস্যু'দিগের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার অভাব। আর্য এবং তাহাদের অনার্য শত্রুদের মধ্যে পার্থক্য ছিল অনেক, তবে স্পষ্টতঃই প্রধান পার্থক্য আকৃতির, ভাষার ও ধর্মের। অনার্যরা কৃষ্ণবর্ণ ও 'নাসিকাবিহীন' ('অনাসঃ') বিশেষণে বিশেষিত হইত ; তাহাদের ভাষা উপহাসের বিষয় ছিল, এবং আর্য দেবতাগণের প্রতি তাহারা অর্ঘ্য নিবেদন করিত না বলিয়া তাহারা প্রায়শঃ ধিক্কৃত হইত। দুই জাতির ভিতর সংঘর্ষ খুবই দীর্ঘস্থায়ী ও তিক্ত হইয়া থাকিবে, তবে বিজেতা আর্যগণ পরাজয়বরণকারী অনার্য অধিবাসীদিগকে উৎসাদন করিবার কোন চেষ্টা করে নাই বলিয়া মনে হয়। বহু অনার্য পর্বতে ও অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, অন্যান্যরা দাস শ্রেণীভুক্ত হয়। বেদে এবং আদি পর্বের বেদোত্তর সাহিত্যে বহু দাসদাসীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; ঐ সকল দাসদাসী অনার্য হওয়াই সম্ভব। কিন্তু অনার্যরা বর্বর কিংবা সভ্যতাবিহীন ছিল না। তাহারা প্রচুর গোধনের অধিকারী ছিল। তাহারা নগর নির্মাণ করিত, অন্ততঃ পক্ষে, সুদৃঢ় 'পুর' নির্মাণে তাহাদের দক্ষতা ছিল। 'দাস'গণ আর্যদের সহিত সদ্ভাব-সম্পর্ক স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তও আছে।

আর্যদের রাজনৈতিক অনৈক্য—বিজেতাদের নিজেদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। দিবোদাস নামক এক আর্য রাজা তুর্বসা, যদু ও পুরু জাতিত্রয়ের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র (মতান্তরে পৌত্র) সুদাস সরস্বতী নদী ও দৃষদ্বতী নদীর অন্তর্বর্তী দেশ ব্রহ্মাবর্তের আর্যগোষ্ঠী ভরতকুল এবং উত্তর-পশ্চিমের আর্যগোষ্ঠীগুলির মধ্যে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষের নায়ক ছিলেন। আদি-বৈদিক যুগের আর্যগোষ্ঠীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল

ভারতগণ, সরস্বতী নদীর চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পুরুগণ, সিন্ধু ও চন্দ্রভাগা নদীর সন্নিকটে বাসকারী কুরুগণ, এবং ভারতকুলের প্রতিবেশী সৃঞ্জয়গণ।

আর্যদের রাজনৈতিক সংস্থা—বৈদিক আর্যদের সময়ে সম্ভবতঃ রাজতন্ত্র সমধিক প্রচলিত ছিল। তবে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থারও উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজতন্ত্রে সচরাচর উত্তরাধিকারের নিয়ম প্রচলিত ছিল; অবশ্য জনসাধারণ কর্তৃক রাজা নির্বাচিত হওয়ার কয়েকটি অনিশ্চিত দৃষ্টান্তও রহিয়াছে। প্রজাপালন এবং যজ্ঞার্থে পুরোহিত সম্প্রদায়ের পোষণ রাজার প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। পরাজিত জাতিগুলির প্রদত্ত কর এবং প্রজাপুঞ্জের উপহৃত দানাদি হইতে রাজা তাঁহার অর্থ সংগ্রহ করিতেন। এই সকল উপহার নিয়মিত বাধ্যতামূলক দান ছিল কিংবা অনিয়মিত স্বেচ্ছাধীন উপঢৌকন ছিল তাহা বলা কঠিন। সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে আমরা 'সেনানী' (সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ) ও 'গ্রামণীর' (গ্রামপতি) উল্লেখ পাই। পূজাবিধির কর্তা 'পুরোহিত' সমাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং খুব সম্ভব তাঁহার কর্তৃত্ব শুদ্ধমাত্র ধর্মীয় বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। বৈদিক-যুগের পুরোহিত হইলেন ব্রাহ্মণ রাজনীতিকের অগ্রদূত; ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত এই রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধর ব্যক্তিগণ যুগে যুগে রাজ্যশাসন ব্যাপারে প্রভূত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, একজন বিশ্বামিত্র কিংবা একজন বশিষ্ঠ আদি বৈদিক যুগের রাজ্যশাসন-প্রণালীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন।

রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের গণতান্ত্রিক অংশে ছিল 'সমিতি' ও 'সভা'। এই গণতান্ত্রিক পরিষদ্গুলির যথাযথ স্বরূপ ও দায়িত্ব নিরূপণ করা কঠিন ব্যাপার; তবে এ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই যে, বড় বড় ব্যাপার উপলক্ষ্যে সম্প্রদায়ের সকল মানুষ তাহাদের নেতৃবর্গের নির্দেশিত কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য ঐ পরিষদ্গুলিতে সমবেত হইত। রাজা যদিও এই লোকসভাগুলির কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতেন, ঐ পরিষদ্সমূহের অস্তিত্বহেতুই সম্ভবতঃ তাঁহার কর্তৃত্ব কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব ছিল। তিনি নিজে আইন প্রণয়ন করিতে কিংবা বিচার পরিচালনা করিতে পারিতেন কিনা বলা দুষ্কর। বিচার কিভাবে বিহিত হইত সে সম্বন্ধে এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অতীব অকিঞ্চিৎকর। খুব সম্ভবতঃ যুদ্ধকালে, সচরাচর যেরূপ

হইয়া থাকে, রাজার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইত। তিনি যুদ্ধকালে সৈন্য পরিচালনা করিয়াই নিবৃত্ত থাকিতেন না, রথে আরোহণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধও করিতেন।

প্রাচীন আর্য সমাজ—বৈদিক আর্যগণের সামাজিক সংগঠন সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্টতর ধারণা আছে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ছিল সামাজিক তথা রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। এক বিবাহ ছিল বিবাহের প্রচলিত রীতি, তবে বহু বিবাহ অজ্ঞাত ছিল না। এক স্ত্রীর বহুস্বামিত্বের (polyandry) কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। নারী জাতির মর্যাদা ছিল উচ্চ। সচরাচর তাঁহারাই গৃহের কর্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষিতা এবং সংস্কৃতিচেতনাসম্পন্না ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কারণ সংহিতাগুলিতে নারী-রচিত স্তোত্রের সন্ধান মিলে। বাল্যবিবাহ অজ্ঞাত ছিল। বিধবাদের ক্ষেত্রে পুনর্বিবাহ অনুমোদিত ছিল কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা কঠিন। স্ত্রী-জাতির নীতির মান খুব উচ্চ ছিল, তবে নীতি-উল্লঙ্ঘন এবং বারাঙ্গনাবৃত্তিরও কিছু কিছু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

আদি-বৈদিক অধ্যায়ে আর্য সমাজের ভিতর জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব ছিল কি? ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ এই কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিভিন্ন মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের যুগে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের বক্তব্য হইল এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের উল্লেখ কেবলমাত্র ঋগ্বেদের এক শেষ-পর্যায়ের স্তোত্রে[১] পাওয়া যায়। যোদ্ধা এবং পুরোহিত শ্রেণীর মানুষ অবশ্যই ছিল, তবে নিরবচ্ছিন্ন যোদ্ধব্যবসায়ী জাতির উল্লেখ ঋগ্বেদে সামান্যই মিলে। তদ্রূপ, কৃষক, পশু-ব্যবসায়ী, বণিক্‌, কারিগর, শ্রমিক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিম্ন জাতিগুলির পৃথক্ বা সামষ্টিক উল্লেখও বিরল। যাঁহারা এই মত স্বীকার করেন না তাঁহারা বলেন যে, ঋগ্বেদের যুগে পুরোহিততন্ত্র সাধারণতঃ বংশগত ছিল এবং 'রাজন্য' শব্দটির উল্লেখ হইতে মনে হয় সেই সময়ে এক অভিজাতশ্রেণীর অস্তিত্বও ছিল। বস্তুতঃ, আদি বৈদিক সমাজ যে সাত্ত্বিক শক্তির অধিকারী সম্প্রদায় ('ব্রাহ্মণ'), রাজকীয় শক্তির অধিকারী সম্প্রদায়

১ ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ পুরুষসূক্ত (১০, ৯০, ১২); উহাতে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যথাক্রমে ভগবানের মুখ, বাহু, উরু ও পদযুগল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

('ক্ষত্র') এবং গণশক্তির অধিকারী সম্প্রদায় ('বিশ') এই তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল উহার নির্ভুল সাক্ষ্যপ্রমাণাদি বিদ্যমান। আমরা এই বলিয়া এই দুই বিরুদ্ধ মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারি যে, ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলির মধ্যে জাতিভেদ প্রথার অঙ্কুরমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়—জীবিকা, অসবর্ণ বিবাহ অথবা ভোজনাদির ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ ছিল না।

আর্যগণের অর্থনৈতিক জীবন—আদি বৈদিক আর্য-সমাজের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান তদানীন্তন সাহিত্যের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উল্লেখাদি হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আদি-আর্যরা প্রধানতঃ পল্লীজীবী ছিল ; নগরের, এমন কি ছোটখাট শহরেরও[১] উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্বভাবতঃই অধিবাসীরা গোষ্ঠীজীবন যাপন করিত। আয়ের প্রধান উপায় ছিল পশুপালন। গোধনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া কবিরা ছন্দোবদ্ধ রচনা করিতেন। সে সকল রচনা গোসম্পত্তির অনধিকারহেতু শোচনীয় আক্ষেপে পূর্ণ থাকিত। অশ্বও খুব মূল্যবান বলিয়া মনে করা হইত। অন্যান্য গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল ভেড়া, ছাগল, গাধা ও কুকুর। বিড়াল তখনও গৃহপালিত প্রাণীতে পরিণত হয় নাই। কৃষি ছিল সর্বপ্রধান জীবিকা। অনুন্নত এক প্রকারের সেচ-ব্যবস্থারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শিকার জীবিকা নির্বাহের বিশেষ সহায়ক ছিল। সাধারণতঃ সিংহ, শূকর, মহিষ, শৃঙ্গযুক্ত হরিণ ও পক্ষী প্রভৃতি শিকার করা হইত। মৎস্যশিকার প্রচলিত ছিল কিনা বলা দুষ্কর।

শিল্পোৎপাদনে পেশাগত নৈপুণ্য অর্জন বৈদিক অর্থনীতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। চর্মকার বৃষচর্মকে চর্মনির্মিত তরল পদার্থের আধার, ধনুর ছিলা, গ্রন্থিবন্ধনের সহায়ক রজ্জু ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করিত। কাঠের কাজে যাহারা নিযুক্ত ছিল তাহারা একই কালে সূত্রধর, আসবাব-পত্রনির্মাতা ও রথপ্রস্তুতকারী ছিল। ধাতুদ্রব্যনির্মাতাও ছিল। অর্ণবপোতনির্মাণশিল্পের তখন শৈশবকাল। সম্ভবতঃ নদীপথে চলাচলের জন্য নাতিবৃহৎ নৌকা ব্যবহার করা হইত। সমুদ্রপথ নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ছিল না, তবে ব্যাপক ভিত্তিতে সামুদ্রিক বাণিজ্য চলিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসায়-বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ছিল। মুদ্রার পরিবর্তে বৃষ এবং স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয়-

---

১ 'ব্রাহ্মণ' ভাগ রচনার অধ্যায়ে আমরা অশন্দিবৎ, কৌশাম্বী, কাশী প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাই।

কার্যে বিনিময়ের ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হইত। বেদে দাসপ্রথার পৌনঃপুনিক উল্লেখ থাকিলেও বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, বৈদিক অর্থনীতি দাসপ্রথাপ্রসূত শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল না। কোন জীবিকার প্রতিই কোনরূপ অশ্রদ্ধা পোষণ করা হইত না ; এমন কি চর্মকারেরাও সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ বলিয়া গণ্য হইত না।

দুই বা তিন টুকরা কাপড় দিয়া সচরাচর পরিচ্ছদ তৈয়ারী হইত। ভেড়ার লোম হইতে স্ত্রীলোকেরা এই সকল পোশাক তৈয়ারী করিত। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার পরিধান করিত। স্বর্ণ হইতে অধিকাংশ অলঙ্কার প্রস্তুত হইত। খাদ্য বলিতে প্রধানতঃ বুঝাইত ননী, শাকসব্জী ও ফল। বড় বড় ভোজের উৎসবে কিংবা পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে সম্ভবতঃ মাংসাহার চলিত। যজ্ঞার্থে এবং অতিথির আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে গো-মহিষ হত্যার রীতি ছিল। বৈদিক সমাজে পানাদির ব্যাপক প্রচলন ছিল। 'সোমরস' এবং 'সুরা'র পৌনঃপুনিক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সোমরস ছিল একপ্রকার যজ্ঞকালীন পানীয়, আর সুরা ছিল জনপ্রিয় পানীয়। শস্য নিঙ্‌ড়াইয়া সুরা প্রস্তুত হইত।

রথচালনা সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক আমোদ ছিল। অক্ষক্রীড়া, নৃত্য ও গীতাদির সমূহ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে দুন্দুভি, বীণা ও বংশী সমধিক পরিচিত ছিল। স্তোত্রগুলি হইতেই প্রমাণ হয় সঙ্গীত খুবই সম্মানার্হ ছিল।

উইণ্টারনিৎস্ বলিতেছেন, ঋগ্বেদের যুগের মানুষদের নিরীহ মেষচারী সম্প্রদায় মনে করিবারও যেমন কারণ নাই তেমনি রুক্ষ-স্বভাব বন্য মনে করিবারও কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই বলিয়া অতি সুমার্জিত সংস্কৃতিবিশিষ্ট মানুষও তাহারা ছিল না। স্তোত্রগুলিতে সংস্কৃতির যে ছবি পাওয়া যায় তাহা হইতে দেখা যায়, ভারতীয় আর্যরা ছিল কর্মঠ, সদানন্দ, যুদ্ধপ্রিয় এক জাতি। তাহাদের আচার-আচরণ ছিল সরল, তবে উহা একেবারে বন্যতাবিমুক্ত ছিল না। ঋগ্বেদের স্তোত্রসমূহে আমরা এখনও ভারতীয় চরিত্রের সেই নমনীয়-কমনীয়, ভোগবিমুখ ও নিরাশ ভাবটি দেখি না, যে ভাব পরবর্তীকালীন ভারতীয় সাহিত্যে বারে বারেই আমাদের চোখে পড়ে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যঃ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন

উত্তর বৈদিক সাহিত্য—উপনিষদ্‌গুলিকে সম্মিলিত ভাবে বলা হয় বেদান্ত (বেদের উপসংহার ভাগ)। এতদ্ব্যতীত আছে ছয়টি বেদাঙ্গ (অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের সাহায্যকারী শাস্ত্র), শিক্ষা (শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ নির্ধারণের পদ্ধতি), ছন্দঃ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দের উৎপত্তি নির্ধারক শাস্ত্র), জ্যোতিষ ও কল্প (ধর্মের রীতিনীতি নির্ধারক শাস্ত্র)। এই সকল শাস্ত্রের সূচনা হইয়াছে 'ব্রাহ্মণ' এবং 'আরণ্যক'গুলিতে, উহারা 'সূত্রের' আকারে রচিত ('সূত্র' অর্থাৎ স্মৃতির সহায়ক সংক্ষিপ্ত নিয়ম)।

ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে 'কল্পসূত্র'গুলিতেই প্রথম আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ বিস্তারিত আলোচনার মর্যাদা লাভ করে। যে 'কল্পসূত্রে' গুরুত্বপূর্ণ যাগযজ্ঞের বর্ণনা আছে উহার নাম 'শ্রৌতসূত্র', যে সূত্রগুলিতে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান তথা দৈনন্দিন জীবনের যজ্ঞাদির আলোচনা আছে উহাদিগকে বলা হয় 'গৃহ্যসূত্র'। এই রচনাসমূহ ধর্মতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব উভয় শাস্ত্রের পণ্ডিতের নিকট বহু প্রয়োজনীয় তথ্যের আকররূপে সবিশেষ মূল্যবান। 'গৃহ্যসূত্রের' সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হইল 'ধর্মসূত্র' ; উহাতে ইহলোক ও পরলোক উভয় সম্বন্ধীয় বিধি আলোচিত হইয়াছে। 'শ্রৌতসূত্রের' অঙ্গীভূত 'শুল্বসূত্রে' বেদী ও যজ্ঞস্থানের মাপজোকের আলোচনাই মুখ্য। এই সূত্রগুলিকে জ্যামিতি সম্বন্ধীয় সর্বপ্রাচীন ভারতীয় রচনা বলা যায়।

'কল্পসূত্র' 'ব্রাহ্মণ'-ভাগের পরিপূরক, পক্ষান্তরে 'শিক্ষা'সম্বন্ধীয় সূত্রগুলি 'সংহিতা'র পরিপূরক। 'শিক্ষা' বা শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ নির্ধারণ পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রাচীনতম রচনা হইল 'প্রতিশাখ্য'সমূহ ; উহাদের মধ্যে 'সংহিতা'গুলি কিভাবে আবৃত্তি করিতে হইবে সেই নিয়মপ্রণালীর আলোচনা সংবদ্ধ রহিয়াছে।

বৈদিক শব্দার্থ বিধি সম্বন্ধে একটি মাত্র গ্রন্থ বিদ্যমান, উহা হইল যাস্কের 'নিরুক্ত'। পরিমাপন বিদ্যা (Metrics), গ্রহবিজ্ঞান ও ব্যাকরণ সম্বন্ধীয়

পুরাতন রচনাদি হারাইয়া গিয়াছে। বর্তমান প্রচলিত ব্যাকরণগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পাণিনি ব্যাকরণ ; উহা মূলতঃ পরবর্তীকালীন সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্যাদির আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ, উহাতে বৈদিক ভাষার প্রসঙ্গ কচিৎ কখনও উল্লিখিত হইয়াছে।

'সূত্র'গ্রন্থগুলিতে জাতিভেদপ্রথার স্বরূপ—'কল্প-সূত্র'গুলি যেহেতু ধর্মীয় ও সামাজিক উভয়বিধ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদির আলোচনা, সেই হেতু উহাদের ভিতর জাতিভেদপ্রথার বিবর্তন সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, ঋগ্বেদের যুগে জাতিভেদপ্রথা সম্ভবতঃ খুবই প্রাথমিক অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। 'ব্রাহ্মণ' যুগে উহা ক্রমশঃ দানা বাঁধিতে থাকে, দানা বাঁধিতে বাঁধিতে দৃষ্টিগ্রাহ্য আকার পরিগ্রহ করে। পুরোহিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবিকা বংশগত হইল, বৈশ্য ও শূদ্রগণও ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় জীবিকাভিত্তিক শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে লাগিল। জীবিকা কখনও সংখ্যায় এক ছিল, কখনও একাধিক হইত। ভিন্ন গোষ্ঠীর সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ নিষিদ্ধ করিয়া ও জীবিকাকে বংশগত করিয়া শ্রেণীগুলিকে সুনির্দিষ্ট রূপ দান করা হইতেছিল। অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে নিয়ম ক্রমশঃ কঠোর হইতে লাগিল। জাতি পরিবর্তন করা চলিত কি না বলা যায় না। তবে শূদ্রদের অবস্থা অংশতঃ উন্নত হইয়াছিল। তাহারা আর দাসমাত্র রহিল না, কিছু কিছু স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে আর্য শাসনের বিস্তার হওয়ায় আর্য সমাজের নেতৃবর্গের পক্ষে লক্ষ লক্ষ অনার্যকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা আর সম্ভব ছিল না। গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানাদিতে শূদ্রদিগের অংশ গ্রহণের অধিকার 'সূত্র'গুলিতে কখনও কখনও স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এক দিক দিয়া অবস্থার অবনতি হইয়াছিল। অস্পৃশ্যতার সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ঐ অবনতি দেখা দেয়। উচ্চবর্ণের কোন 'পবিত্র' মানুষ তথাকথিত 'অপবিত্র' মানুষের ছায়া মাড়াইলে তাহার জাত যাইতে আরম্ভ করিল। এইভাবে ক্রমেই ছুৎমার্গী মনোভাবের প্রসার ঘটিতে থাকে।

উত্তর বৈদিক যুগে রাজনৈতিক পরিবর্তন—ভারতীয় বিশেষ পরিবেশে আর্যগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য আমরা পাই 'ব্রাহ্মণ' ও 'উপনিষৎ' সমূহে এবং

'সূত্র' সাহিত্যে। ঋগ্বেদের যুগের রাজনৈতিক বিভাগ-উপবিভাগ ক্রমশঃ মোটামুটি বৃহদায়তন শাসনতান্ত্রিক এলাকার জন্মদান করিতেছিল। রাজনৈতিক ঐক্যের ক্রমবর্ধমান আদর্শ 'বাজপেয়', 'রাজসূয়' ও 'অশ্বমেধ' প্রভৃতি রাজনীতি-ধর্ম-বিমিশ্র যজ্ঞক্রিয়ার মধ্যে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল। যে সকল রাজা তাঁহাদের রাজ্যবিস্তার-লিপ্সা চরিতার্থ করিতে কতকাংশেও সফল হইতেন তাঁহারাই এ-জাতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন রাজ্যের সৃষ্টি স্বভাবতঃই রাজকীয় শক্তিবর্ধনে সহায়তা করিল, বড় বড় শহরেরও ঐভাবে জন্ম হইল। উত্তর বৈদিক সাহিত্যে নিম্নলিখিত নগর বা নগরীর উল্লেখ পাওয়া যায়—কাম্পিল (পাঞ্চালগণের রাজধানী), অশন্দিবৎ (কুরুকুলের রাজধানী), কৌশাম্বী (বৎসদেশের রাজধানী) ও কাশী (কাশী রাজ্যের রাজধানী)। ভারত প্রমুখ কয়েকটি গোষ্ঠী, যাহারা ঋগ্বেদের যুগে সবিশেষ প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল, তাহাদের রাজনৈতিক আধিপত্য হারাইল। তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইল কুরু ও পাঞ্চাল প্রভৃতি অন্য কতিপয় জাতিগোষ্ঠী। সাহিত্যে এই সকল জাতির অধিনায়ক রাজাদের যে বিক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা হইতে ঐ সকল জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি মোটামুটি কাঠামোও দাঁড় করানো যায় কি না সন্দেহ।

উত্তর বৈদিক যুগে সামাজিক পরিবর্তনসমূহ— সমাজ ক্রমশঃ এক নূতন আকার পরিগ্রহ করিতেছিল। জাতিভেদপ্রথার অস্পষ্ট রূপ ক্রম-পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। বংশানুক্রমিক বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়গুলি যে ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এই প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণাদি সম্পর্কে আমরা শুধু অনুমান করিতে পারি। যাঁহারা বেদপাঠের সবিশেষ অনুশীলন করিতেন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির হোতা ছিলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইলেন। যাঁহারা রাজনৈতিক ও সামরিক ক্রিয়াকলাপে নিরত থাকিতেন তাঁহাদিগকে বলা হইত ক্ষত্রিয়। আর্য সমাজের সাধারণ জনগণ বৈশ্য নামে অভিহিত হইতে লাগিল—ব্যবসায় বাণিজ্য কৃষি ইত্যাদি তাহাদের মূল জীবিকা ছিল। তবে ইহা স্পষ্ট যে, জাতিভেদপ্রথা তখনও সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে নাই। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ তখনও নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয় নাই এবং কিছু কিছু ক্ষত্রিয় তখনও বেদপাঠ করিতেন ও যাগ-

যজ্ঞাদির হোতৃরূপে কার্য করিতেন। শূদ্রগণ সমাজে একটি বিশেষ সম্প্রদায়রূপে গণ্য ছিল, কিন্তু তাহাদের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা বিশেষ ছিল না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শূদ্রের এইরূপ বর্ণনা আছে—শূদ্র অপরের দাস, যথা ইচ্ছা তাহাকে বহিষ্কৃত করা যায়, যথা ইচ্ছা তাহাকে হত্যা করা যায়।

সাহিত্যের সূত্রে স্ত্রী-জাতির সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়। স্ত্রী-জাতির নিকট শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত ছিল, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ (যথা, গার্গী ও মৈত্রেয়ী) শিক্ষাক্ষেত্রে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কন্যার জন্ম সেই অতীত দিনেও দুর্লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। নৃপতি ও ধনী শ্রেণীর মধ্যে বহুবিবাহ সম্ভবতঃ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। নারী সম্পত্তি ভোগ বা উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি লাভ করিতে পারিত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহাকাব্য ও ধর্মশাস্ত্র

মহাকাব্যের সূচনা ও মহাকাব্যদ্বয়ের যুগ— মহাকাব্যের সূচনা হইয়াছে বৈদিক সাহিত্যে এবং 'সূত্র' সাহিত্যের সহিত উহার সম্পর্ক মোটামুটি স্পষ্ট। 'ইতিহাস পুরাণ' ও 'গাথা নারাশংসী'র (মনুষ্যের স্তুতিমূলক গীত) সমূহ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে রামায়ণ ও মহাভারত[১] ঐ সকল বিশেষ ধারার রচনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। উইণ্টারনিৎস্ বলিতেছেন, "ভারতবাসীর জনপ্রিয় মহাকাব্য বলিতে যে রচনাদ্বয় বুঝায় সেই মহাভারত ও রামায়ণ প্রাচীন ভারতের রাজসভা-গায়ক কিংবা চারণ কবির গীত পুরাতন বীরগাথা নহে, মহৎ কবিদের দ্বারা (অন্ততঃ পক্ষে সুচতুর সংগ্রাহকদের দ্বারা) অখণ্ড কাব্যাকারে সংকলিত রচনাও উহারা

১ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ মহাভারত ও রামায়ণকে 'মহাকাব্য' আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন সত্য, তবে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে মহাকাব্য বলিতে যে শ্রেণীর রচনা বুঝায় এই সমষ্টিগত রচনাগুলি ঠিক সেই পর্যায়ে পড়ে না।

নহে ; উহারা আসলে হইল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ক্রমাগত প্রক্ষেপণ ও সংযোজনার ফলে বিভিন্ন ছাঁদের বিচিত্র যে কাব্যরচনা গড়িয়া উঠিয়াছে উহাদের একত্রীভূত রূপ।” উইন্টারনিৎসের মতে, মহাভারত আদৌ একক কাব্যরচনা নহে, উহা এক ‘সমগ্র সাহিত্য’।

বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম উল্লেখাদিতে মহাভারতের মূল কাহিনীটির পরিচয় পাওয়া যায়, রামায়ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দিক্ দিয়া মহাভারতকে রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিতে হয়। ঋগ্বেদের যুগের সুপরিচিত জাতি ভারতদিগের সম্বন্ধে রচিত একটি প্রাচীন বীরগাথা সম্ভবতঃ মহাভারতের কেন্দ্রস্থ বিষয়। কিন্তু যুগে যুগে উহাতে এত বেশী পরিবর্তন ও সংযোজনা ঘটিয়াছে যে, বর্তমানে কেন্দ্রস্থ বিষয়টিকে একেবারেই চিনিয়া বাহির করা সম্ভব নহে। ভারতীয় ঐতিহ্যে পুরাণোক্ত ব্যাসদেবকে মহাভারতের প্রণেতা বলিয়া মনে করা হয় ; কিন্তু মহাভারত বর্তমানে যে আকারে বিদ্যমান, ব্যাসদেবকে উহার সংকলনকারী আখ্যাও দেওয়া যায় কি না সন্দেহ। মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে নানা মতভেদ রহিয়াছে। আমরা শুধু ইহাই বলিতে পারি যে, বর্তমান-প্রচলিত মহাভারত সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে এবং খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরে রচিত নহে। স্পষ্টতঃই বর্তমান মহাভারতের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কালে রচিত হইয়াছিল।

রামায়ণ যদিও একটি সামগ্রিক রচনা, উহাতে মহাভারত অপেক্ষা সমধিক ভাবৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উইন্টারনিৎস্ মনে করেন যে, পুরাতন গাথা-কবিতাদির ভিত্তিতে বাল্মীকি কর্তৃক আদি রামায়ণ রচিত হয় খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর কোনও এক সময়ে। ঐ আদি রামায়ণকে কেন্দ্র করিয়া পরে অসংখ্য সংযোজন সংবর্ধন পরিবর্তনাদি ঘটে, উহার ফলেই গ্রন্থটি বর্তমান আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। উইন্টারনিৎসের অনুমান সত্য হইলে এইরূপ মনে করিতে পারা যায় যে, রামায়ণ উহার বর্তমান-প্রচলিত রূপের ব্যাপ্তি ও বিষয়বৈশিষ্ট্য লাভ করে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষাশেষি কোনও এক অতীত সময়েই।

মহাকাব্যদ্বয়ের ভিতর সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন—মহাকাব্য দুইটিতে ক্ষত্রিয়কুলের প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তদনুপাতে ব্রাহ্মণগণের জন্য সমাজ-ব্যবস্থায় নিম্নতর স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত এইখানে মহাকাব্যদ্বয়ের সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

রামায়ণ ও মহাভারতে চারিটি শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়—(১) ক্ষাত্রকুল, ক্ষাত্রকুলের শীর্ষাধিপতি হইলেন 'রাজা'; (২) পুরোহিতকুল, পুরোহিতগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ও রাষ্ট্রনীতির দিক্ দিয়া সঙ্ঘবদ্ধ নহেন; (৩) বণিককুল, বণিকসম্প্রদায় কতকগুলি বৃত্তিভিত্তিক সংস্থায় (guilds) সংগঠিত ও তাহাদের শীর্ষস্থানীয় শক্তিমান্ ব্যক্তিগণ ('মহাজন') যথেষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী; এবং (৪) কৃষককুল। কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধ নহে কিন্তু কতকগুলি অধিকার সম্বন্ধে তাহারা খুবই সচেতন এবং আর্য শোণিতের গৌরবকারী। আর্যগণের নিম্নবর্তী ছিল শূদ্র সম্প্রদায়, দাসগণ ও বন্য জাতিসমূহ।

মহাকাব্যদ্বয়ে রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিফলন—কোন কোন ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে, রামায়ণ ও মহাভারতে যে বংশতালিকা সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা মোটামুটি নির্ভুল। পার্জিটার হিসাব করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মহাভারতে বর্ণিত মহাযুদ্ধ খ্রীস্টপূর্ব ১১০০ অব্দে কিংবা উহার কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। কুরুকুল উত্তর বৈদিক যুগের পরাক্রান্ত আর্য জাতি গোষ্ঠীগুলির অন্যতম ছিল; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পাণ্ডুদিগের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অনেক পরে—উত্তরকালীন বৌদ্ধ সাহিত্যে, সেখানে তাহাদিগকে একটি পার্বত্য জাতিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ উভয় নগরই ঐতিহাসিক নগর। রামায়ণের কাহিনী সম্পর্কে কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত এইরূপ মনে করেন যে, উহা আর্যগণ কর্তৃক দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন-প্রয়াসের রূপকাশ্রিত আখ্যান ব্যতীত আর কিছু নহে। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোনও একটি জাতক-কাহিনীতে রামচন্দ্রের উল্লেখ আছে। আমরা ইহাও জানি যে, কোশল দেশ দীর্ঘকাল যাবৎ উল্লেখযোগ্য আর্য রাজ্যগুলির অন্যতম রূপে পরিগণিত ছিল। রামায়ণ কাহিনীর সারাংশটি ইতিহাসের দিক্ হইতে সত্য হওয়াই সম্ভব।

ধর্মশাস্ত্রসমূহ—'ধর্মশাস্ত্র'সমূহের উপজীব্য ঐহিক বিধিবিধান ও পারত্রিক কর্তব্য। প্রধান প্রধান 'ধর্মশাস্ত্র' বলিতে মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদ বিরচিত 'সংহিতা'গুলিকে বুঝায়। সংহিতাসমূহের রচনাকাল সঠিক ভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই, তবে সাধারণতঃ এই কাল খ্রীস্টীয় প্রথম ও পঞ্চম শতাব্দীর অন্তর্বর্তী বলিয়া গণ্য হয়।

'ধর্মশাস্ত্র'গুলিতে জাতিভেদপ্রথার সবিশেষ প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। সনাতন চারি জাতির কর্তব্যাদির সবিস্তার বিশ্লেষণ ছাড়াও এই রচনাগুলিতে 'সঙ্কর' জাতিসমূহের দায়-দায়িত্বেরও উল্লেখ বিদ্যমান। এই সকল সঙ্কর জাতির মানুষ অসবর্ণ বিবাহ এবং চারি মৌলিক জাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অবৈধ মিলনের পরিণামফল বলিয়া অনুমান করা হয়।

ধর্মশাস্ত্রগুলি হইতে প্রাচীন আর্য জীবনযাত্রার একটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকের স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। প্রত্যেক 'দ্বিজ' বা ব্রাহ্মণকে 'চতুরাশ্রম' পালন করিতে হইত। প্রথম আশ্রম 'ব্রহ্মচর্য', উপনয়ন-অনুষ্ঠানে উহার আরম্ভ এবং পাঠ-সমাপ্তিতে উহার অবসান। দ্বিতীয় আশ্রম 'গার্হস্থ্য', এই অধ্যায়ে 'দ্বিজ' বিবাহ-জীবনে প্রবেশ করিয়া গৃহীর ন্যায় সংসারযাত্রা নির্বাহ করিত। তৃতীয় আশ্রম 'বানপ্রস্থ', এই অধ্যায়ে গৃহী মানুষ সাংসারিক দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার বন্ধন কাটাইয়া বনে গমন করিত। বনের শান্ত ও নিভৃত পরিবেশে তাহার দিনগুলি আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত হইত। চতুর্থ আশ্রম হইল 'সন্ন্যাস', এই অধ্যায়ে মানুষ দেহকে নানাবিধ সুকঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা পীড়িত করিয়া তাহার আত্মাকে পরম সত্যের অনুধ্যানে ও উপলব্ধিতে নিয়োজিত করিত।

'ধর্মশাস্ত্র'গুলি হইতে স্ত্রীজাতির অবস্থার ক্রমিক অবনতির পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। মনু বলিয়াছেন, নারীকে স্বাধীনভাবে বাস করিতে দেওয়া উচিত নহে। স্বাধীনতা তাহার অনুপভোগ্য; বাল্যে নারী তাহার পিতার দ্বারা, যৌবনে তাহার স্বামীর দ্বারা এবং বার্ধক্যে তাহার পুত্রগণের দ্বারা পালিত হইবে। মনু ধর্মাচরণের অঙ্গ হিসাবে নারীর বাল্যবিবাহের বিধান দিয়াছেন। মনুস্মৃতিতে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। সম্পত্তির উত্তরাধিকারেও নারীর দাবী মনু কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

বেদোত্তর যুগের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিবর্তন

প্রথম পরিচ্ছেদ

জৈন ধর্ম

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব ভারতে এক প্রগাঢ় ধর্ম-বিপ্লবের সূচনা হয়। এই ঘটনা ভারতীয় ইতিহাসের গতিকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। সেই যুগে জনসাধারণের নিকট বৈদিক ধর্ম বলিতে বুঝাইত কতকগুলি জটিল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ ও রুধিরাক্ত যাগযজ্ঞাদি। কতকটা এই সকল অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার বশেই এই ধর্ম-বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। তবে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতে গেলে, উহাকে উপনিষদ্ যুগের তত্ত্ব-চিন্তার সম্প্রসারণ মনে করা যাইতে পারে। জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভবকে বৈদিক জীবনাদর্শের সহিত পূর্ণ বিচ্ছেদ বলিয়া ভাবিলে ভুল করা হইবে। তবে কালক্রমে এই দুই ধর্মের মধ্যে এমন কতকগুলি মতাদর্শের ও অনুষ্ঠানাদির সূচনা হইল যাহা বৈদিক জীবনদর্শন ও উপাসনা-পদ্ধতির সহিত সামঞ্জস্যবিহীন।

মহাবীর—বর্ধমান মহাবীর জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, সচরাচর এইরূপ মনে করা হয়। তবে জৈনদিগের বিশ্বাস, তিনি ছিলেন জৈনসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য দায়ী এক সুদীর্ঘ গুরু (যাঁহারা 'তীর্থঙ্কর' নামে পরিচিত) -পরম্পরার শেষ গুরু বা তীর্থঙ্কর। জৈন সাহিত্যে উল্লিখিত তেইশ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে একজন, পার্শ্বনাথ, সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। অন্যান্যরা কাল্পনিক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়; রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁহাদের নাম অপরিজ্ঞাত। পার্শ্বনাথ বারাণসীর রাজার পুত্র ছিলেন এইরূপ কথিত আছে। তিনি সংসার ত্যাগ করেন ও সন্ন্যাসী হন। তাঁহার প্রচারিত শিক্ষায় অহিংসা, অসত্য কথন হইতে নিবৃত্তি, অস্তেয় বা চৌর্যহীনতা, অপরিগ্রহের আধ্যাত্মিক মূল্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

মহাবীরের জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত, তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে তিনি খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তিনি খ্রীস্টপূর্ব ৫২৮ অব্দে মারা যান, আবার কাহারও কাহারও মতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে খ্রীস্টপূর্ব ৪৬৮ অব্দে। উত্তর বিহারের বৈশালীর সন্নিকটে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি এক বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান ছিলেন এবং বৈশালীর লিচ্ছবি রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা ছিল। ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি সাধারণ গৃহীর জীবন যাপন করেন। তারপর তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং দ্বাদশ বৎসর যাবৎ নানা স্থান পর্যটন করিয়া বেড়ান। তিনি ক্রমাগত কঠোর তপশ্চর্যার দ্বারা স্বীয় দেহকে নিগৃহীত করেন। বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি দিব্যজ্ঞান ('কৈবল্য') লাভ করেন, তদবধি তাঁহার নাম হয় 'জিন' (ইন্দ্রিয়জয়ী) অথবা 'নির্গ্রন্থ' (সাংসারিক গ্রন্থিবন্ধন বিমুক্ত)। এই দুইটি অভিধা হইতে তাঁহার অনুগামীদিগের নাম হইয়াছে 'জৈন' কিংবা 'নির্গ্রন্থ'। মহাবীর তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত করেন মগধে, অঙ্গে, মিথিলায় ও কোশলে তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়া। মগধের পরাক্রান্ত রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল এইরূপ কথিত আছে। পার্শ্বনাথের শিক্ষাকে তিনি তাঁহার ধর্মমতের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পূর্ববর্তীর প্রচারিত গুণচতুষ্টয়ের সঙ্গে তিনি পঞ্চম একটি গুণ যোগ করেন—সর্বদা জিতেন্দ্রিয় হইবে। পাটনা জিলার অন্তর্গত পাবা নামক স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন।

জৈনধর্মের মূলনীতি—জৈনগণ বেদের কর্তৃত্ব অস্বীকার ও যাগযজ্ঞ, পশুবলিপ্রথা বর্জন করে। অহিংসা নীতির প্রতি তাহাদের নিষ্ঠা বৌদ্ধগণের অহিংসাপ্রীতি অপেক্ষা অনেক কঠোরতর। তাহারা বিশ্বাস করে যে, প্রতি বস্তুর মধ্যেই চেতনামণ্ডিত এক আত্মা ('জীব') বিদ্যমান। এক পরমাশক্তির দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে এই তত্ত্ব তাহারা অস্বীকার করে এবং জৈন মতানুসারে, মানুষের আত্মায় যে শক্তিনিচয় সুগুপ্ত রহিয়াছে, ঈশ্বর সেই শক্তি-সমূহের উচ্চতম মহত্তম পূর্ণতম অভিব্যক্তি ভিন্ন আর কিছু নহেন। হিন্দুদের কর্মবাদে জৈনদের আস্থা আছে। জৈন মতে মুক্তি বলিতে বুঝায়—গত জীবনগুলি হইতে প্রাপ্ত সমস্ত 'কর্মের' বন্ধন হইতে পরিপূর্ণ অব্যাহতি। এই মুক্তিলাভের উপায় তথাকথিত 'ত্রি-রত্নের' সাধনা—প্রকৃত ভক্তি, যথার্থ জ্ঞান ও

সম্যক্ আচরণ। কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মনিগ্রহের দ্বারা আত্মার বলবৃদ্ধি হয় এই বিশ্বাসে জৈনগণ ভোগবিমুখতার আদর্শের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

জৈনধর্মের আদি ইতিহাস—খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম পরস্পরের প্রতিযোগী ছিল। মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ উভয়েই পূর্ব ভারতে তাঁহাদের নীতি প্রচার এবং একই শ্রেণীর মানুষ হইতে তাঁহাদের শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গোড়ার দিকে জৈনধর্মের সমধিক সাফল্য হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কথিত আছে যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শেষ জীবনে জৈনধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর সমাপ্তির পূর্বেই জৈনধর্ম দক্ষিণ ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল এইরূপ অনুমানের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ রহিয়াছে।

খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে জৈনগণ দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়—'শ্বেতাম্বর' সম্প্রদায় ও 'দিগম্বর' সম্প্রদায়। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিত ; শেষোক্তগণ মহাবীরের অনুকরণে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় বিরাজ করিত।

জৈনধর্ম ভারতের বাহিরে অবশ্য কখনও সম্প্রসারিত হয় নাই, তবে ভারতের অভ্যন্তরে—দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে উহা বহু শতাব্দী যাবৎ অন্যতম শ্রেষ্ঠ উন্নতিশীল ধর্মের মর্যাদা লাভ করিয়াছিল।

জৈনদিগের ধর্ম-সাহিত্য—খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাটলিপুত্র নগরে অনুষ্ঠিত এক জৈন সমাবেশে মহাবীরের প্রচারিত নীতিসমূহকে দ্বাদশ 'অঙ্গে' সুবিন্যস্ত করা হয়। কালক্রমে দ্বাদশতম 'অঙ্গটি' হারাইয়া যায়। অবশিষ্ট একাদশ 'অঙ্গ' খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বলভীতে আহূত এক জৈন সভায় পুনর্বিন্যস্ত হয়। এই 'অঙ্গ'গুলি দিগম্বরগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই ; কাজেই উহারা কেবলমাত্র শ্বেতাম্বরদিগের ধর্মশাস্ত্র রূপে পরিগণিত হইল। এই রচনাগুলি 'আর্য' বা 'অর্ধ-মাগধী' প্রাকৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ—সংস্কৃত ভাষায় নহে। কারণ জৈনগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদিগের মতই তাহাদের ধর্মগ্রন্থগুলিকে জনসাধারণের অধিগম্য করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। খ্রীস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে টীকাভাষ্য ও দার্শনিক গ্রন্থাদি প্রথম সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ করে।

জৈনদিগের শাস্ত্রসাহিত্যের পরিমাণ বিশাল, তবে উহাদের সাহিত্যিক মূল্য অপেক্ষা আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক মূল্যই সমধিক। উইন্টারনিৎস লিখিতেছেন, জৈনদিগের ধর্মগ্রন্থাদি নীরস, বিশুদ্ধ উপদেশাত্মক ভঙ্গীতে

লিখিত, উহাদের রচনারীতির ভিতর বৌদ্ধশাস্ত্রের সাহিত্যোচিত মানবীয় আবেদন খুবই অল্প ; দুই-চারিটি ক্ষেত্রে মাত্র এই রীতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। অতএব, বিশেষজ্ঞদের নিকট জৈন শাস্ত্রসাহিত্যের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকিলেও সাধারণ পাঠকের নিকট উহাদের মোটেই তেমন গুরুত্ব নাই।

জৈনদের অন্যবিধ সাহিত্য—ধর্মীয় বা যাজক সাহিত্য ছাড়াও জৈনগণ অন্যপ্রকারের সাহিত্যও রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল রচনা অংশতঃ প্রাকৃত, অংশতঃ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ। জৈন লেখকবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিতদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—ভদ্রবাহু, সিদ্ধসেন, দিবাকর, হরিভদ্র, সিদ্ধ ও হেমচন্দ্র। কাহিনী-সাহিত্য জৈনদিগের অন্যতম বিশিষ্ট কীর্তি। এতদ্ব্যতীত, উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, নাটক, স্তোত্র ইত্যাদি রচনার কৃতিত্বও তাঁহারা দাবী করিতে পারেন। দর্শনে তাঁহাদের দানের মূল্য অধিক। বৌদ্ধ 'শূন্যবাদের' বিপরীতে তাঁহারা 'স্যাৎবাদ'-নামক অস্তিবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার করেন। জৈন দার্শনিকগণ ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ, অভিধানপ্রণয়নবিদ্যা, কাব্যতত্ত্ব, গণিত, গ্রহবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনৈতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় জৈন রচনার দ্বারা সবিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। কতিপয় মাতৃভাষার (যথা, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, গুজরাটী, হিন্দী ও রাজস্থানী) বিকাশসাধনেও জৈনগণ প্রভূত সহায়তা দান করিয়াছেন। মোটকথা, ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের ইতিহাসে জৈন রচয়িতাগণ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

অন্যান্য সম্প্রদায়—খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পূর্ব ভারতে আধ্যাত্মিক অস্থিরতা এত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল যে বিভিন্ন গুরুর নেতৃত্বাধীনে কতিপয় নূতন ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। জৈন গ্রন্থাদিতে ৩৬৩টি সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের উল্লেখ আছে ; বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে দেখা যায়, বুদ্ধ যখন ধর্মপ্রচারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন ৬২টি সম্প্রদায় দেশে বিদ্যমান ছিল। এই সকল সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তবে আজীবিক সম্প্রদায়ের সমূহ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অশোকের শিলালিপিতেও আজীবিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ ধর্ম

গৌতম বুদ্ধঃ জীবনী—বৌদ্ধ ধর্মের সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থ বা গৌতম মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন। মহাবীরের ন্যায় তাঁহার ক্ষেত্রেও, জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ অনিশ্চিত। কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে, খ্রীস্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে গৌতম বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করেন। আবার কাহারও কাহারও মতে তাঁহার পরিনির্বাণলাভের বৎসর খ্রীস্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দ। বর্তমান উত্তর প্রদেশের বস্তি জিলার উত্তরে নেপালের 'তরাই' অঞ্চলে শাক্য জাতি নামে এক জাতি বাস করিত। গৌতম এই শাক্যজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। গৌতমের পিতা শুদ্ধোধন শাক্যজাতির নির্বাচিত রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন এবং কপিলাবস্তুতে তাঁহার রাজধানী ছিল। কপিলাবস্তুর নিকটবর্তী লুম্বিনি গ্রামের উদ্যানে গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। নেপালের বর্তমান রুম্মিনদেই অঞ্চলে এই লুম্বিনি গ্রাম অবস্থিত ছিল। অদ্যাবধি অশোকের সুপরিচিত রুম্মিনদেই স্তম্ভে সেই মহাঘটনার স্মৃতি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তিনি গোপা বা যশোধরা নাম্নী এক বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। গৌতমের বয়স যখন উনত্রিশ বৎসর তখন রাহুল নামে তাঁহাদের এক সুসন্তান জন্মে। কিন্তু গৌতমের চিত্ত ইতোমধ্যেই তৎকালীন আধ্যাত্মিক অশান্ততার দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল এবং মুক্তির সন্ধানে তিনি কৃচ্ছ্রব্রতী পথ বরণ করিলেন। কিছুকাল তিনি রাজগৃহে দুইজন বিশিষ্ট গুরুর নিকট দর্শন অধ্যয়ন করিলেন। তৎপর তিনি বর্তমান বুদ্ধগয়ার সন্নিকটস্থ উরুবিল্ব নামক স্থানে যাইয়া তদানীন্তন যোগীদের অনুসরণে সুকঠোর তপশ্চর্যায় লিপ্ত হইলেন। কিন্তু মুক্তি তখনও পূর্বের ন্যায় সুদূরপরাহত হইয়াই রহিল। অবশেষে গভীর মনঃসংযোগ ও আত্মসমাহিত নিবিড় ধ্যানের ফলে পরম সত্য তাঁহার মনে উদ্ভাসিত হইল। গৌতম সম্বোধি বা 'বুদ্ধত্ব' লাভ করিলেন। তিনি বুদ্ধ (জ্ঞানী) হইলেন। তৎকালে তাঁহার বয়স ছিল মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর।

বুদ্ধ তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট বৎসরগুলি তাঁহার ধ্যানলব্ধ সত্য প্রচারে

নিয়োজিত করিলেন। তিনি কাশীর নিকটবর্তী সারনাথের হরিণ চরিবার উদ্যানে তাঁহার প্রথম উপদেশ প্রদান করেন। সারনাথে তিনি পাঁচজন শিষ্য সংগ্রহে সমর্থ হন। পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ বৎসর তিনি তাঁহার ধর্মপ্রচারকার্যে ব্রতী থাকিয়া অযোধ্যা, বিহার ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলি হইতে বহু শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অবশেষে কুশীনগরে (উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জিলার অন্তর্গত কাশীয়া) আশী বৎসর বয়সে তাঁহার নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটে।

বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা—বুদ্ধ ছিলেন বাস্তবচেতনাসম্পন্ন ধর্মসংস্কারক। তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল দুঃখ-যন্ত্রণার রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতার পীড়ন হইতে মানুষকে মুক্তিদান। তিনি চারিটি মহাসত্যের প্রচার ও ব্যাখ্যা করেন—(১) সংসারে দুঃখ নিত্য বর্তমান ; (২) দুঃখের নিশ্চয়ই কারণ আছে ; (৩) দুঃখের নিবৃত্তি একান্ত কাম্য ; এবং (৪) দুঃখ নিবৃত্তির যথার্থ উপায় কি তাহা জানা আবশ্যক। 'তন্‌হা' বা আকাক্ষার ফলে দুঃখের সূচনা, সুতরাং আকাক্ষার নিবৃত্তিতে দুঃখেরও নিবৃত্তি। আকাক্ষার কবল হইতে নিবৃত্তি লাভ করা যায় 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বা আটটি উপায় অবলম্বনের দ্বারা—(১) সম্যগ্‌দৃষ্টি, (২) সৎসঙ্কল্প, (৩) সদ্বাক্য, (৪) সৎকর্ম, (৫) সৎজীবন, (৬) সৎচেষ্টা, (৭) সৎস্মৃতি, ও (৮) সম্যক্ সমাধি। ইহাই হইল বহুখ্যাত 'মধ্যম পন্থা' (The Middle Path),—যাহা চূড়ান্ত বিলাসভোগকেও পরিহার করিয়া চলে, আবার কঠোর তপশ্চর্যা ও আত্মনিগ্রহের নীতিকেও বর্জন করে। মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিয়া মানুষ শেষ পর্যন্ত মুক্তি লাভ করিতে পারে। এই মুক্তিকে বৌদ্ধেরা 'নির্বাণ' আখ্যা দিয়াছেন। 'নির্বাণ' অর্থে শুধুই আকাক্ষার নিবৃত্তি নহে, পরন্তু এক পরিপূর্ণ আত্মসমাহিত সুস্থির অবস্থা। বৌদ্ধ ধর্মে 'শীল' বা নীতি (হিংসা, মিথ্যা, বিলাসব্যসন ইত্যাদি পরিহার), 'সমাধি' (ধ্যান) ও 'প্রজ্ঞা' (বোধি)-র উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

কৃচ্ছ্রসাধন অর্থাৎ দেহকে ক্লিষ্ট করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা বুদ্ধ অনুমোদন করিতে পারেন নাই। এই প্রশ্নে মহাবীরের সহিত বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধ প্রাণীসকলের প্রতি হিংসাচরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তবে এই ক্ষেত্রে জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম অপেক্ষাও কঠোরতর নীতির অনুগামী। বুদ্ধ বেদের মাহাত্ম্য অস্বীকার করেন, বৈদিক যাগযজ্ঞ আচার-অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক উপযোগিতায়

অনাস্থা ঘোষণা করেন। তবে হিন্দুদের সনাতন জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ তিনি স্বীকার করিয়া লন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের প্রশ্ন লইয়া বুদ্ধ মাথা ঘামান নাই, কারণ তিনি মনে করিতেন, দুরূহ ও জটিল পরাচিন্তায় সময়ক্ষেপ মানুষের নৈতিক ও আত্মিক শক্তির বিকাশের পক্ষে অনাবশ্যক। তাঁহার সরল ধর্মমত স্ত্রী-পুরুষ উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলের জন্য উদ্দিষ্ট ছিল। তিনি তৎকালীন জনসাধারণের কথিত ভাষায় অর্থাৎ পালিতে ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনাদি পরিচালনের রীতি প্রবর্তিত করেন। কেবলমাত্র স্বল্পসংখ্যক বিদ্বজ্জনের ভাষা যে সংস্কৃত, উহাতে ধর্মশিক্ষাদানের অভ্যাস সীমাবদ্ধ রাখার নীতি তিনি পরিত্যাগ করেন।

বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য—বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের অত্যল্পকাল মধ্যে তাঁহার প্রধান শিষ্যবর্গ রাজগৃহে এক সাধারণ সভায় সম্মিলিত হইয়া বুদ্ধের উপদেশাবলীর এক পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণিক সংকলনকার্য নিষ্পন্ন করেন। ইহাই প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। কিন্তু মনে হয় ঐ ঘটনার পর এক বা দুই শতাব্দী অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত বৌদ্ধগণের ধর্ম-সাহিত্য তাহার যথার্থ আকার পরিগ্রহ করে নাই। বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্যকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় 'ত্রিপিটক' (অর্থাৎ তিন পেটিকার সমাহার)। ইহার প্রথম অংশের নাম বিনয়-পিটক, উহাতে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী-গণের পক্ষে পালনীয় নিয়মাবলী এবং বৌদ্ধ বিহারসমূহের সাধারণ পরিচালন-রীতি বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশের নাম সূত্র পিটক, উহাতে বুদ্ধের ধর্মোপদেশসমূহ সংকলিত হইয়াছে। তৃতীয় অর্থাৎ শেষ অংশের নাম অভিধর্ম পিটক, উহা বৌদ্ধধর্মের অন্তর্নিহিত দার্শনিক সূত্রাদির আলোচনা ও ব্যাখ্যানে পূর্ণ।

দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় বৈশালীনগরে বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় এক শতাব্দী পরে। এই অধিবেশনে বৌদ্ধধর্মের নামে প্রচলিত কতকগুলি বিপরীতাত্মক মতবাদের নিন্দা করা হয় এবং শাস্ত্রগ্রন্থগুলির সংস্কারকার্য সাধিত হয়। তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় পাটলিপুত্র নগরে সম্রাট অশোকের উদ্যোগে। এই সম্মেলনেও কতকগুলি বিরুদ্ধ মতবাদের তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং পুরাতন শাস্ত্রবাক্যগুলিকে যথাযথ ও চূড়ান্ত রূপ দানের চেষ্টা করা হয়। চতুর্থ সঙ্গীতির অধিবেশন হয় কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের অধিনায়কতায় এবং সম্ভবতঃ উহা কাশ্মীরে কিংবা পূর্ব পঞ্জাবের জালন্ধরে অনুষ্ঠিত হয়। উহাই শেষ বৌদ্ধ

সঙ্গীতি। উক্ত অধিবেশনে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলির প্রামাণ্য টীকা-ভাষ্য সংকলিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা 'জাতকের' উল্লেখ করিতে পারি। বুদ্ধের জন্ম ও জন্মান্তর সম্বন্ধীয় এই কাহিনীগুলি কোনক্রমেই খ্রীস্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর পরবর্তীকালের রচনা হইতে পারে না। ভক্তিমান বৌদ্ধগণের নিকট জাতকের বিশেষ মূল্য ত রহিয়াছেই, ইহা ব্যতীত প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের অনুশীলনকারীদিগের পক্ষেও জাতকের গল্পগুলি সবিশেষ অনুধাবনযোগ্য। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জাতক হইতে আমরা বহু মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করিতে পারি।

ভিন্নমতাবলম্বী সম্প্রদায়সমূহ—দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশনের সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু সমাজের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল মতসংঘর্ষের উদ্ভব হয়। এইরূপ সংঘর্ষ বৌদ্ধ ইতিহাসে ইতঃপূর্বে আর সংঘটিত হয় নাই। বিবদমান সম্প্রদায়দ্বয়ের একটি পূর্বাগত, অর্থাৎ বৈশালী ও পাটলিপুত্রে তাঁহাদের অধিকাংশের বাস, এবং অপরটি পশ্চিমাগত, তাহার অর্থ এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ভিক্ষু কৌশাম্বী, অবন্তী প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন। প্রথম দলের নাম হইল 'আচরীয়বাদ', দ্বিতীয় দলের নাম 'থেরবাদ'। একবার মতভেদের সূত্রপাত হওয়ায় ক্রমশঃ মতভেদ স্বতঃই পরিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল। 'আচরীয়বাদ' সাতটি উপদলে, অন্যপক্ষে 'থেরবাদ' এগারোটি উপদলে বিভক্ত হইল। আরও কিছুকাল পর প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের কয়েকটি উপদল নূতন নূতন মতবাদের সূত্রপাত করিল। যথা, বুদ্ধের অবতারত্ব স্বীকার, বোধিসত্ত্বের ধারণার প্রবর্তন, ইত্যাদি। এই নূতন মতবাদ হইতেই কালক্রমে 'মহাযান' মতের উদ্ভব হইল। অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, গৌতমের তিরোধানের পরবর্তী দুইশত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস আর একটিমাত্র ধর্মীয় সংস্থার ইতিহাস রহিল না, উহা হইয়া দাঁড়াইল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে স্বতন্ত্রভাবে বিকাশলাভকারী পরস্পর-নিরপেক্ষ অনেকগুলি ধর্মীয় সংস্থার ইতিহাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক ঐক্যের বিকাশ

ঐক্যের আদর্শ—উত্তর বৈদিক সাহিত্যে রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ একটি সুপরিচিত ধারণা। বাজপেয় যজ্ঞের যিনি অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন তিনি 'সাম্রাজ্যের' অধীশ্বর হইতেন। 'ঐন্দ্র মহাভিষেক' অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল 'একরাট্' বা পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা উপাধি লাভের গৌরব অর্জন। 'রাজচক্রবর্তী' অর্থাৎ রাজার উপরেও যিনি রাজা, তাঁহাকে 'অশ্বমেধ' যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে হইত। 'অশ্বমেধ' যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এইরূপ কতিপয় রাজার উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের বর্তমান সীমাবদ্ধ জ্ঞান লইয়া আমরা কোনক্রমেই বলিতে পারি না খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে ভারতে যথার্থই কোন বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে অবশ্য মহাপদ্ম নন্দ উত্তর ভারতের এক সুবৃহৎ অংশকে এবং সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যেরও কিছু অংশকে মগধের সাম্রাজ্য-শাসনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিলেন।

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজনৈতিক অবস্থা—পুরাতন বৌদ্ধ সূত্রাদি হইতে জানিতে পারা যায় যে, খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে ষোলটি রাজ্য বা 'মহাজনপদ' ছিল। রাজ্যগুলির নাম—

১। কাশী—কাশী রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল বারাণসী। প্রথমে 'মহাজনপদ'গুলির মধ্যে কাশী সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে কোশল সমধিক শক্তিশালী হইয়া ওঠে।

২। কোশল—মোটামুটি বর্তমান অযোধ্যাকে আমরা পুরাতন কোশল রাজ্য বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারি। কোশলের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী (বর্তমান উত্তর প্রদেশের গোন্দ জিলার সাহেত্ মাহেত্)। কোশল রাজ্যের অপর দুই উল্লেখযোগ্য নগরী ছিল অযোধ্যা ও সাকেত। কপিলাবস্তুর শাক্য গোষ্ঠীর

রাজ্যসীমা এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে কাশী কোশল রাজ্যের অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

৩। অঙ্গ—মগধের পূর্ব দিকে এই রাজ্যের সীমানা ছিল। চম্পা (বর্তমান বিহারস্থিত ভাগলপুরের সন্নিকটে) ছিল অঙ্গ রাজ্যের রাজধানী। মগধের
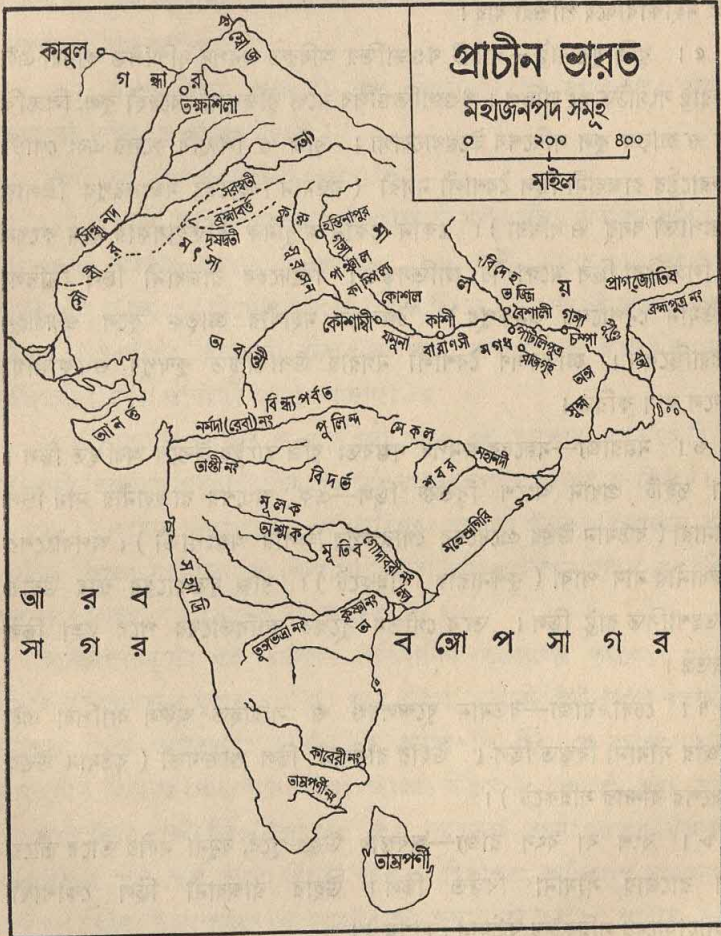
সহিত উহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এক সময়ে মগধ অঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু পরে বিম্বিসার অঙ্গকেই মগধের অন্তর্ভুক্ত করেন।

৪। মগধ—বর্তমান বিহার রাজ্যের পাটনা ও গয়া জিলার সীমানা বরাবর

মগধ রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত ছিল। মগধের প্রাচীনতম রাজধানীর নাম গিরিব্রজ। গয়ার নিকটবর্তী পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে বর্তমান রাজগীরের (রাজগৃহ) নিকটে উহা অবস্থিত ছিল। তৎপর রাজধানী রাজগৃহে স্থানান্তরিত হয়, সর্বশেষে পাটলিপুত্রে। মগধের কতিপয় প্রাচীন নৃপতির উল্লেখ বৈদিক ও জৈন সাহিত্যে এবং মহাকাব্যদ্বয়ে পাওয়া যায়।

৫। বৃজি যুক্তরাষ্ট্র—আটটি খণ্ডজাতির অধিকৃত জনপদ সম্মিলিত করিয়া এই যুক্তরাষ্ট্র সংগঠিত হইয়াছিল। খণ্ডজাতিগুলির মধ্যে বৃজিকুল, বৈদেহী কুল, লিচ্ছবি কুল ও জ্ঞাতৃক কুল সবিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য। বৃজি ও লিচ্ছবি কুলের এবং গোটা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল বৈশালী নগরী (বর্তমান বিহারের মজঃফরপুর জিলার অন্তঃপাতী বসর্ ও বখিরা)। কোন কোন আধুনিক ইতিহাসকার মনে করেন যে, লিচ্ছবিরা ছিল মঙ্গোলীয় জাতিসম্ভূত। বিদেহের রাজধানী ছিল মিথিলা (বর্তমান নেপালের জনকপুর)। জৈনগুরু মহাবীর জ্ঞাতৃক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞাতৃকগণ বৈশালী নগরীর উপান্তস্থিত কুন্দপুর ও কোল্লাগা অঞ্চলে বাস করিত।

৬। মল্লরাজ্য—মল্লদের জনপদ সম্ভবতঃ বৃজি রাষ্ট্রের উত্তরে অবস্থিত ছিল। উহা দুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল—এক অংশের রাজধানীর নাম ছিল কুশীনারা (বর্তমান উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জিলার অন্তঃপাতী); অপরাংশের রাজধানীর নাম পাবা (কুশীনারার সন্নিকটে)। বৃজি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় উহাও গণতন্ত্রশাসিত রাষ্ট্র ছিল। তবে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে উহা ছিল রাজতন্ত্র।

৭। চেদী রাজ্য—বর্তমান বুন্দেলখণ্ড ও সন্নিহিত অঞ্চল ব্যাপিয়া এই রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত ছিল। উহার রাজধানী ছিল শুক্তিমতী (বর্তমান উত্তর প্রদেশের বান্দার সন্নিকটে)।

৮। বংশ বা বৎস রাজ্য—অবন্তীর উত্তর-পূর্বে, যমুনা নদীর তীরে তীরে বৎস রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত ছিল। উহার রাজধানী ছিল কৌশাম্বী (এলাহাবাদের সন্নিকটস্থ বর্তমান কোশম্)।

৯। কুরু রাজ্য—উহার রাজধানী ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লী নগরীর সন্নিকটে)। হস্তিনাপুর ছিল অন্য একটি প্রসিদ্ধ নগর। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে কুরু রাজ্য রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক্ দিয়া আদৌ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

১০। পাঞ্চালদেশ—বর্তমান রোহিলখণ্ড এবং উত্তর প্রদেশের কতকাংশ ব্যাপিয়া পাঞ্চালের সীমানা বিস্তৃত ছিল। গঙ্গা নদী দেশটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল—উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল। উত্তরাঞ্চলের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র (বর্তমান উত্তর প্রদেশের বেরিলী জিলার অন্তঃপাতী রামনগর); দক্ষিণাঞ্চলের রাজধানীর নাম কাম্পিল্য।

১১। মৎস্য—উহার রাজধানী ছিল বিরাটনগর (রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুরের সন্নিকটস্থ বর্তমান বৈরাট)।

১২। সৌরসেন—রাজধানী মথুরা।

১৩। অশ্বক বা অশ্মক—রাজ্যটি গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল।

১৪। অবন্তী—বর্তমান মধ্যপ্রদেশের অন্তঃপাতী মালব ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলি জুড়িয়া এই রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত ছিল। রাজ্যটি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তরাংশের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী; দক্ষিণাংশের রাজধানীর নাম মাহিষ্মতী (নর্মদা তীরবর্তী বর্তমান মান্ধাতা)।

১৫। গান্ধার—কাশ্মীর ও তক্ষশিলা অঞ্চল এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজধানী ছিল তক্ষশিলা (পশ্চিম পঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি জিলায় অবস্থিত)।

১৬। কম্বোজ—কম্বোজের অধিবাসিগণ সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিত, কারণ সাহিত্যে ও শিলালিপি ইত্যাদিতে প্রায়শঃ গান্ধারের সহিত যুক্তভাবে তাহাদের নামোল্লেখ হইতে দেখা যায়।

মহাজনপদসমূহের এই তালিকা ঐতিহাসিক ভূগোলের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে যেমন মূল্যবান বলিয়া মনে হইবে, তেমনই খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা কি ছিল সে সম্বন্ধে সাধারণ কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতেও উহা সহায়তা করিবে। প্রথমতঃ, ইহা সুস্পষ্ট যে, দেশে কোন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ভারতবর্ষ তখন পরস্পর-বিবদমান অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ মহাজনপদ বর্তমান বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের অন্তঃপাতী ছিল। আসাম, বঙ্গ, উড়িষ্যা, সুদূর দক্ষিণ, গুজরাট ও সিন্ধুদেশের[১] কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তালিকায় একটি মাত্র দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যের উল্লেখ রহিয়াছে—অশ্মক।

---

১ নিম্নতম সিন্ধু-উপত্যকার সৌবীরে রোরু নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল।

আর্যজাতির প্রথম ভারতীয় উপনিবেশ পঞ্জাবের বেলায়, দুইটি রাজ্যের নাম পাওয়া যায়—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গান্ধার এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে কুরু রাজ্য। পঞ্জাবের মধ্য অঞ্চল[১] তালিকা হইতে সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়াছে। স্পষ্টতঃই গঙ্গা ও যমুনা নদীর বারিধৌত অঞ্চল তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক কর্মতৎপরতার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। তৃতীয়তঃ, রাজতন্ত্র সমধিক প্রচলিত হইলেও উত্তর-পূর্ব ভারতে কতিপয় গণতন্ত্রশাসিত রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। তালিকায় উল্লিখিত বৃজি ও মল্ল কুল ছাড়াও বৌদ্ধ সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে অন্য কতিপয় গণতন্ত্রশাসিত জাতির নাম জানিতে পারা যায়। এইসকল জাতি বুদ্ধের সময়ে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য হইল শাক্য কুল, কোল্য কুল (শাক্যদিগের পূর্বদেশীয় প্রতিবাসী), ভগ্‌গ কুল (ইহাদের অধিকৃত জনপদ বৎস রাজ্যের অধীনস্থ ছিল), অল্লকাপ্পার বুলি সম্প্রদায়, কেশপুত্তের (সম্ভবতঃ কোশলে অবস্থিত) কল্মগণ এবং কুশীনারার অনতিদূরস্থ পিপ্পলীবনের মৌর্য কুল। এই গণতন্ত্রশাসিত রাষ্ট্রসমূহের অধিকাংশ রাষ্ট্রই ধীরে ধীরে ক্রমপ্রসার্যমাণ মগধ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে।

মগধের আধিপত্যের সূচনা—খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে মগধের রাজা ছিলেন বিম্বিসার। তিনি হর্যঙ্ক বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দক্ষিণ বিহারের এক সামান্য রাজন্যের পুত্র হইয়াও তিনি স্বীয় যোগ্যতাবলে তাঁহার পৈতৃক রাজ্যের সীমানা প্রসারিত করিয়া মগধের শক্তি ও প্রতিপত্তি সবিশেষ বৃদ্ধি করেন। রাজগৃহ ছিল তাঁহার রাজধানী। তিনি তাঁহার কালের প্রতিপত্তিশালী নৃপতিবর্গের সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। গান্ধাররাজ তাঁহার রাজ্যে দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অবন্তীর রাজার চিকিৎসার্থে এক বিশিষ্ট চিকিৎসককে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মদ্র (মধ্য পঞ্জাব), কোশল ও বৈশালীর রাজপরিবারবর্গের সহিত তিনি বৈবাহিক সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার কোশলদেশীয় পত্নীর সূত্রে তিনি কাশী রাজ্যের একটি গ্রাম যৌতুকস্বরূপ লাভ করেন, উহা হইতে প্রচুর আয় হইত। এইসকল বিবাহ নিঃসন্দেহে বিম্বিসারের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল। মগধ ও অঙ্গের মধ্যে পুরাতন সংঘর্ষের নিবৃত্তি হয় নাই, ফলে অঙ্গ শেষ অবধি মগধের

---

১ মধ্য পঞ্জাবের অন্তর্গত মদ্র রাজ্যের এক রাজকুমারীকে বিম্বিসার বিবাহ করেন।

অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। বিম্বিসার মোটামুটি এক বৃহৎ রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ আশী হাজার নগরের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া জানা যায়। বিম্বিসার তাঁহার উচ্চদায়িত্বপূর্ণ কর্মচারীদিগের উপর কঠিন নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রাখিয়াছিলেন ; উহা হইতে তাঁহার ব্যক্তিত্বের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মগধ রাজ্যে অপরাধীদিগকে শাস্তিদানের প্রথা কঠোর ছিল। বিভিন্ন অপরাধের জন্য যেসকল দণ্ডদান করা হইত উহার মধ্যে কারাবাস, চাবুক মারা, তপ্ত লৌহদণ্ডের দ্বারা ছেঁকা লাগান, শিরশ্ছেদন, জিহ্বা কর্তন, পঞ্জরাস্থি ভগ্নকরণ প্রভৃতি নানাবিধ শাস্তি ছিল। সম্ভবতঃ শাস্তিদানের এই প্রথা মৌর্য যুগ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু গুপ্ত সম্রাটদের আমলে অপরাধবিধির পরিবর্তন করা হয় এবং উহাকে মানবতামণ্ডিত করা হয়।

বিম্বিসার বুদ্ধের অনুগামী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। তবে তিনি সত্যসত্যই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। কোন কোন জৈন গ্রন্থে তাঁহাকে মহাবীরের অনুগামী রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বিম্বিসারের পর মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু। বৌদ্ধ কিম্বদন্তীতে অজাতশত্রুকে পিতৃহন্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অজাতশত্রু বুদ্ধের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন ও তাঁহার নিকট স্বকৃত পাপের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন এইরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটির সমর্থন পাওয়া যায় খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে খোদিত অন্যতম ভারহুত ভাস্কর্যশিল্পকর্মের মধ্যে।

অজাতশত্রু রাজ্যবিস্তারের নীতি গ্রহণ করিয়া মগধ রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম আক্রমণ সম্ভবতঃ কোশল রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিল। বিম্বিসারের কোশলদেশীয় পত্নীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা প্রসেনজিৎ বিম্বিসারকে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত কাশীর গ্রাম পুনরধিকার করিতে চাহেন। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পর দুই রাজা মীমাংসায় উপনীত হন। অজাতশত্রু প্রসেনজিতের কন্যাকে বিবাহ করেন, কন্যা বিতর্কাধীন কাশী গ্রাম উপঢৌকন স্বরূপ লাভ করেন। মগধের সম্পত্তি মগধেরই রহিয়া যায়।

জৈন লেখকগণ বৈশালীর লিচ্ছবিদিগের সহিত অজাতশত্রুর সংঘর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। কি কারণে এই সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল তাহা অনিশ্চিত, তবে কোশল-

রাজের সহিত যুদ্ধের সঙ্গে উহার কিছু সম্পর্ক থাকিতে পারে বলিয়া অনুমান হয়। খুব সম্ভব কোশল ও বৈশালী মগধের আধিপত্য-প্রয়াসের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। দীর্ঘকালীন সংগ্রামের পর অজাতশত্রু বৈশালী জয় করেন। মগধ এইরূপে উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য হইয়া উঠে। মগধের অভ্যুত্থান অবন্তীর ঈর্ষার কারণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। দুই রাজ্যের সম্পর্ক তিক্ত হওয়ার উহাই হেতু, তবে অজাতশত্রুর শাসনকালের ভিতর অবন্তী ও মগধের মধ্যে সত্যসত্যই সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল কি না তাহা বলা যায় না।

পুরাতন জৈন গ্রন্থসমূহে অজাতশত্রুকে মহাবীরের অনুগামী বলিয়া দাবী করা হইয়াছে, অন্যপক্ষে বৌদ্ধগণ তাঁহাকে বুদ্ধের অনুগামীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

অজাতশত্রুর পর সম্ভবতঃ রাজা হন তাঁহার পুত্র উদয়ী। তিনি পাটলিপুত্র নগরে মগধের রাজধানী স্থাপন করেন। গঙ্গা ও শোন এই দুই বড় নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্রের অবস্থান শহরটিকে বাণিজ্যনীতি ও রণনীতি উভয়তঃ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। জৈন লেখকদিগের মতে অবন্তীরাজ উদয়ীর শত্রুপদবাচ্য ছিলেন।

উদয়ীর উত্তরাধিকারিগণ সম্ভবতঃ দুর্বল শাসক ছিলেন। বৌদ্ধ বর্ণনাদিতে তাঁহাদের সকলকেই পিতৃহন্তারূপে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রজাগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং তাহাদের অসন্তোষের সুযোগ গ্রহণ করিয়া শিশুনাগ নামে এক মন্ত্রী সিংহাসন দখল করেন। তিনি প্রথমে তাঁহার রাজধানী গিরিব্রজে, তৎপর বৈশালীতে স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি হইল অবন্তীর প্রদ্যোত রাজবংশের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির উৎখাত-সাধন। অবন্তী ইতোমধ্যে কৌশাম্বী জয় করিয়া অধিকতর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

শিশুনাগের উত্তরাধিকারী কালাশোক মগধের রাজধানী পুনরায় পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার রাজত্বকালেই বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। নন্দ রাজবংশের প্রবর্তক মহাপদ্ম সম্ভবতঃ তাঁহাকে নিহত করিয়া মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

নন্দবংশ—পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী মহাপদ্ম (অথবা উগ্রসেন) ছিলেন শূদ্রমাতার গর্ভজাত সন্তান। জৈন কিম্বদন্তীতে তাঁহাকে এক ক্ষৌরকারের ঔরসে বারাঙ্গনার গর্ভজাত সন্তানরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। জনৈক গ্রীক লেখকের মতানুসারে, মহাপদ্ম নন্দ রাজ্ঞীর প্রীতিলাভে সমর্থ হন, অবশেষে

রাজা ও তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করেন। তিনি নীচবংশীয় ছিলেন ও অনুচিত উপায়ের দ্বারা সিংহাসন অধিকার করেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; তবে ইহাও সুনিশ্চিত যে, তিনি একজন নিপুণ ও পরাক্রান্ত শাসক ছিলেন। পুরাণে তাঁহাকে 'একরাট্' (একচ্ছত্র সম্রাট) ও 'সর্বক্ষত্রান্তক' অর্থাৎ সকল ক্ষত্রিয়ের বিনাশকারী রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাপদ্ম নন্দের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের সীমা কতদূর পরিব্যাপ্ত ছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। খারবেলের হাতীগুম্ফা শিলালিপি হইতে অনুমিত হয় কলিঙ্গ তাঁহার রাজ্যসীমার অন্তর্গত ছিল। তৎকর্তৃক কোশল অধিকার সাহিত্যের সূত্র হইতে প্রমাণিত হয়। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চল, যথা কুন্তল (বোম্বাই রাজ্য ও মহীশূরের দক্ষিণাংশ) ও অশ্মক, নন্দ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। তবে এই বিষয়ে নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। গ্রীক লেখকদিগের মতে, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সময়ে বিপাশা নদীর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যে শক্তিশালী জাতি বাস করিত, তাহারা পাটলিপুত্রে রাজধানী বিদ্যমান এমন এক সম্রাটের শাসনাধীন ছিল। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, মহাপদ্ম এক রাজচ্ছত্রতলে ভারতবর্ষের এক সুবিশাল অংশকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সাম্রাজ্য-প্রবর্তক রাজা বলা যাইতে পারে।

মহাপদ্মের পর একে একে তাঁহার আট পুত্র রাজত্ব করেন। শেষ রাজা বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত ধন নন্দ গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক ছিলেন। গ্রীক লেখকগণ তাঁহাকে আগ্রামেস (Agrammes) ও জাণ্ড্রামেস (Xandrames) নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই নাম সংস্কৃত পিতৃনামপ্রসূত 'ঔগ্রসেনীয়' নামের অপভ্রংশ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি একজন পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। জনৈক গ্রীক লেখকের হিসাব অনুযায়ী, তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে কুড়ি সহস্র অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, দুই সহস্র চতুরশ্ববিশিষ্ট রথ ও তিন সহস্র হস্তী ছিল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নন্দ বংশের অপরিমেয় ধনৈশ্বর্যের কথা বারম্বার উল্লিখিত হইয়াছে। তবে শেষ রাজা ধন নন্দ তাঁহার নীচ বংশ, নীতিবিরোধী স্বভাব ও অর্থগৃধ্নুতার জন্য প্রজাপুঞ্জের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন এইরূপ অনুমিত হয়। অবশেষে চতুর ব্রাহ্মণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ চাণক্য বা কৌটিল্যের সহায়তায় মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক তিনি সিংহাসনচ্যুত হন।

কালক্রম সম্পর্কে টীকা—নূতন ঐতিহাসিক উপাদান না পাওয়া পর্যন্ত গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ভারত আক্রমণের সময় পর্যন্ত মগধের শাসকবৃন্দের কালক্রম নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। শিলালেখ ও মুদ্রাঘটিত প্রমাণের অভাবে সাহিত্যের সূত্রে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর একান্তরূপে নির্ভর করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য অর্থাৎ পুরাণাদির সহিত বৌদ্ধ সাহিত্যের বর্ণনার সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে অধিকাংশ আধুনিক ইতিহাসকার মনে করেন যে, বৌদ্ধ লেখকগণের বর্ণনাদি সমধিক নির্ভর ও গ্রহণযোগ্য। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থে এই অধ্যায়ের কালক্রম নির্ণয়ে বৌদ্ধ মত অনুসরণ করা হইয়াছে। পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী, শিশুনাগ যে রাজবংশের পত্তন করেন তাহা মগধে ৩২১ বৎসর যাবৎ রাজত্ব করেন। অবশেষে মহাপদ্ম নন্দ কর্তৃক ঐ রাজবংশের বিলোপ সাধিত হয়। বিম্বিসার ছিলেন এই বংশের পঞ্চম শাসক। অন্যপক্ষে, বৌদ্ধ গ্রন্থাদির হিসাবে, হর্যঙ্ক বংশের শাসকদিগের (বিম্বিসার ইঁহাদের মধ্যে প্রথম) পরে শিশুনাগ ও তাঁহার বংশধরগণের আবির্ভাব হয়, এবং এই দুই রাজবংশে মিলিয়া সর্বশুদ্ধ দুইশত বৎসর রাজত্ব করে। বিম্বিসারের সিংহাসনে আরোহণের কাল খ্রীস্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে কিংবা উহার কাছাকাছি কোনও সময়ে স্থাপন করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মগধ সাম্রাজ্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইরাণীয় ও গ্রীক অভিযান

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রাজনৈতিক অনৈক্য—খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পঞ্জাবের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব হ্রাস পাইয়াছিল। এদেশে আর্য-শক্তির প্রথম অধিষ্ঠান-স্থল হিসাবে পঞ্জাবের যে গুরুত্ব প্রাপ্য ছিল, উহা আর পূর্ববৎ বলবৎ ছিল না। রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম-তৎপরতার কেন্দ্র পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে সরিয়া আসিয়াছিল। মধ্যদেশ

আর্যজাতির কেন্দ্রস্থ অঞ্চল বলিয়া পরিগণিত হইল। এদিকে মগধ রাজ্য ক্রমশঃ একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যে রূপান্তর লাভ করিতেছিল। ভারতীয় সাহিত্যে উল্লিখিত ষোলটি 'মহাজনপদের' মধ্যে একটিও পঞ্জাবে অবস্থিত নহে; শুধু কম্বোজ ও গান্ধারকে পঞ্জাবের বহির্বলয়ের অঞ্চল রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। মহাজনপদগুলির তালিকায় উল্লেখ নাই অথচ পঞ্জাবের অন্তর্গত এমন আর একটি রাজ্যের নাম হইল মদ্র। উত্তর ভারতের অবশিষ্ট অংশ যখন ধীরে ধীরে মগধের সাম্রাজ্য-শাসনের প্রভাব-পরিধির অন্তর্ভুক্ত হইতেছিল, উত্তর-পশ্চিম ভারত তখন অর্থনীতির দিক দিয়া সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিভেদের কারণে বৈদেশিক আক্রমণকারীদিগের সহজ শিকারে পরিণত হইতেছিল ও স্বাধীনতা হারাইতেছিল।

ইরাণীয় অভিযান ও রাজ্যজয়—ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহাবীর কুরুস (Cyrus) ইরাণ বা পারস্য দেশে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পশ্চিম দিকে এই সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্ব দিকে উহা ভারতভূমি স্পর্শ করে। কুরুস গেড্রোসিয়া বা মাকরানের মধ্য দিয়া ভারতের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু ঐ অভিযান চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তবে সিন্ধুনদ ও কাবুল নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল অধিকারে তিনি সমর্থ হন।

অতঃপর এই সাম্রাজ্যের তৃতীয় সম্রাট দারয়বৌস (Darius I) গান্ধার ও সিন্ধু-উপত্যকা স্বীয় অধিকার সীমার অন্তর্ভুক্ত করেন। কতিপয় ইরাণীয় শিলালিপিতে গান্ধার ও সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীদিগকে ইরাণীয় প্রজা রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (Herodotus) বলেন যে, গান্ধার ইরাণীয় সাম্রাজ্যের সপ্তম প্রদেশ ছিল আর ভারত ছিল দ্বাদশতম প্রদেশ। 'ভারত' বলিতে তিনি বুঝাইয়াছেন পূর্বদিকে রাজপুতানার মরুভূমির দ্বারা বেষ্টিত সিন্ধু-উপত্যকা অঞ্চল। ভারতই নাকি সর্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ প্রদেশ ছিল এবং উহা বর্তমানের হিসাবে বৎসরে প্রায় এক কোটি সত্তর লক্ষ মুদ্রা কর দিত।

দারয়বৌসের পুত্র ও তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ক্ষরস (Xerxes) উত্তর-পশ্চিম ভারতের ইরাণীয় প্রদেশগুলির উপর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

গ্রীসের বিরুদ্ধে তিনি যখন অভিযান পরিচালনা করেন ভারতীয় সেনা তাঁহার দল পুষ্ট করিয়াছিল।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইরাণীয় অধিকার কত কাল স্থায়ী হইয়াছিল নির্ণয় করা সুকঠিন। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে তৃতীয় দারয়বৌস কডমেনাস (Codomannus) যে সেনাবাহিনী নিয়োগ করিয়াছিলেন উহাতে ভারতীয় সেনা ছিল। তবে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতীয় প্রদেশ-সমূহের উপর ইরাণীয় সম্রাট্‌দের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল বলিয়া মনে হয়। বৈদেশিক শাসনের ফলে যে সাময়িক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল উহা একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের আবির্ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়।

ইরাণীয় শাসনের ফলাফল—ভারতবর্ষ ও ইরাণের মধ্যে দুই শতাব্দী ব্যাপিয়া যে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল উহা ভারতীয় ইতিহাসের উপর কতিপয় স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যায়। ইরাণীয়রা ভারতবর্ষে উহাদের বর্ণলিপির প্রবর্তন করে, যাহা পরে খরোষ্ঠি বর্ণমালায় রূপান্তরিত হয়। অশোকের সময়ের স্মৃতিস্তম্ভসমূহ, বিশেষতঃ তাঁহার স্থাপত্যশিল্প ইরাণীয় স্থাপত্যের দ্বারা কতকাংশে প্রভাবিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অশোকের অনুশাসনসমূহের প্রারম্ভিক অংশগুলির এবং উহাদের কিছু কিছু শব্দের উপরেও ইরাণীয় প্রভাব অনুমান করা যায়। মৌর্য রাজসভায় সম্ভবতঃ কিছু কিছু ইরাণীয় অনুষ্ঠান পালিত হইত। মৌর্যোত্তর যুগে উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারতের শক শাসকবৃন্দ 'সত্রপ' (ক্ষত্রপ) অর্থাৎ (ইরাণীয়) প্রাদেশিক শাসনকর্তা এই উপাধি গ্রহণ করিতেন।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অবস্থা—খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর সূচনায় সিন্ধু-উপত্যকা অঞ্চলে রাজনৈতিক ঐক্য অজ্ঞাত ছিল। ঐ সময়ে উত্তর ভারতের অবশিষ্ট অংশ মগধের নন্দ রাজবংশের শাসনাধীনে উত্তরোত্তর ঐক্য ও শক্তির আধার হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে অযথা শক্তিক্ষয় করিতেছিল। এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির কোনটি ছিল রাজতন্ত্র, আর কোনটি ছিল সামন্তশাসিত অঞ্চল।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের প্রাক্কালে পঞ্জাবের রাজনৈতিক অবস্থা কি ছিল, প্রাচীন লেখকগণ উহার কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

কাবুল নদীর উত্তরে উষর পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত অস্পসীয় (Aspasian) রাজ্য এমন এক সামন্ত-রাজার শাসনাধীন ছিল যাঁহার রাজধানী ছিল উস্‌প্লা (Euaspla) নদীর তীরে কিংবা উহার সন্নিকটে। সম্ভবতঃ উহাই বর্তমান কুনার নদী। আস্‌সাকেনোদের (Assakenos) রাজধানী ছিল মাস্‌সাগা (Massaga) ; মালাকান্দ গিরিবর্ত্মের উত্তরে এবং উহার অদূরবর্তী সীমানার মধ্যে এই দুর্ভেদ্য দুর্গের অবস্থান ছিল বলিয়া মনে হয়। এই জাতির যিনি রাজা ছিলেন তাঁহার সেনাবাহিনীতে কুড়ি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য, ত্রিশ সহস্রেরও অধিক পদাতিক সৈন্য এবং ত্রিশটি হস্তী ছিল। কাবুল হইতে সিন্ধু-উপত্যকায় যাইবার পথে পুকেলাওতিদের (Peukelaotis) এলাকা অবস্থিত ছিল। ইহাদিগের যিনি রাজা ছিলেন তাঁহার রাজধানী ছিল পেশোয়ারের সন্নিকটে। তক্ষশিলা রাজ্য ছিল প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের পূর্ব সীমা। তক্ষশিলা খুব বড় শহর ছিল, এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সবিশেষ জনাকীর্ণ ও উর্বর ছিল। অর্সেকদের (Arsakes) রাজ্য (বর্তমান হাজারা জিলা) সম্ভবতঃ পুরাতন কম্বোজ রাজ্যের একটি শাখাবিশেষ ছিল। কম্বোজের অন্য একটি শাখা ছিল অবিসারদের (Abisares) রাজ্য, উহা বর্তমান কাশ্মীরের পুঞ্চ্‌ ও নওশেরা জিলা বরাবর অবস্থিত ছিল। বিতস্তা (Jhelum) ও চন্দ্রভাগা (Chenab) নদীর অন্তর্বর্তী পুরুর রাজ্য ছিল এক বৃহৎ ও উর্বর অঞ্চল, এই রাজ্যে আনুমানিক তিনশত নগর ছিল। রাজার সৈন্যবাহিনী ছিল বিরাট ; উহাতে পঞ্চাশ সহস্রেরও অধিক পদাতিক সৈন্য, তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য, এক সহস্র রথ ও একশত ত্রিশটি হস্তী ছিল। সোফাইটদিগের (Sophytes) রাজ্য ছিল ঝিলম নদীর পূর্ব দিকে। বর্তমান সিন্ধুদেশের একটি বৃহৎ অঞ্চল জুড়িয়া ছিল মুসিকানোদিগের রাজ্য। বর্তমান স্কুর জিলার আলোরে ছিল উহার রাজধানী।

উপরে রাজ্যসমূহের যে তালিকা দেওয়া হইল উহা পূর্ণাঙ্গ তালিকা নহে। উপরের সব কয়টি রাজ্যই হইল রাজতন্ত্রশাসিত রাজ্য, উহাদিগের সহিত গণতন্ত্র-শাসিত রাজ্য ও কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা শাসিত রাজ্যব্যবস্থার (Oligarchy) হিসাবও যোগ করিতে হইবে। কাবুল নদী ও সিন্ধু নদের মধ্যে অবস্থিত নাইসা (Nysa) নামক এক ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য গণতান্ত্রিক নীতি-নিয়মের দ্বারা চালিত হইত। বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমস্থলকে ছাড়াইয়া ঝঙ্ জিলা, ঐ জিলায় শিবোই (Siboi) জাতি বাস করিত। আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত-অভিযান

কালে উহাদের সেনাবাহিনীতে চল্লিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য ছিল। শিবোই জাতির পাশাপাশি বাস করিত আগালাস্‌সোই (Agalassoi) জাতি, উহারা সেনাবাহিনীতে চল্লিশ সহস্র পদাতিক ও তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিল। ইরাবতী (Ravi) ও বিপাশা (Beas) নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী অক্সিড্রাকাই (Oxydrakai) জাতি উত্তর-পশ্চিম ভারতের দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিগুলির অন্যতম ছিল। মাল্লয় (Malloi) জাতির অধিকারে ছিল ইরাবতী নদীর উপত্যকা অঞ্চল, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমস্থলের উত্তরে উহা অবস্থিত ছিল। আবাস্তানই (Abastanoi) জাতি বাস করিত চন্দ্রভাগা নদীর নিম্নাঞ্চলে। তাহারাও বিশেষ শক্তিশালী ছিল; তাহাদিগের সেনাবাহিনীতে ষাট সহস্র পদাতিক সৈন্য, ছয় সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং পাঁচশত রথ ছিল। তাহাদের শাসন-বিধি বা সংবিধান ছিল গণতান্ত্রিক।

ইরাণ ও আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া আলেকজাণ্ডারের অগ্রগতি—আলেকজাণ্ডার খ্রীস্টপূর্ব ৩৩৬ অব্দে গ্রীসের অন্তর্গত ম্যাসিডনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গ্রীসের অভ্যন্তরে তাঁহার শাসনকর্তৃত্ব সুরক্ষিত করিয়া তিনি খ্রীস্টপূর্ব ৩৩৪ অব্দে ইরাণ জয়ের মানসে দেশ হইতে যাত্রা করেন। ইরাণীয় সাম্রাজ্য ততদিনে দুর্বল ও শিথিলগ্রন্থি হইয়া আসিয়াছিল। উহার শাসক ছিলেন দারয়বৌস কডমেনাস (Darius Codomannus)। তিনি মহাবীর কুরুস ও প্রথম দারয়বৌসের অযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। চার বৎসরের মধ্যে আলেকজাণ্ডার একে একে এশিয়া মাইনর, সীরিয়া, মিশর, ব্যাবিলন ও ইরাণ জয় করেন। দারয়বৌস কডমেনাস তাঁহার এক প্রাদেশিক শাসনকর্তার হস্তে নিহত হন। এইরূপে অগৌরবের মধ্যে আকামেনীয় রাজবংশের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দারয়বৌসের হত্যাকারী বেস্‌সাস (Bessus) বাহ্লীকদেশে পলায়ন করতঃ মহারাজা উপাধি ধারণ করেন। আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে অনুসরণ করেন এবং অনুসরণ করিবার পথে ড্রাঙ্গিয়ানা বিনাসংঘর্ষে অধিকার করেন। তিনি নূতন প্রদেশের এক রাজধানী স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ হিরাতই সেই অঞ্চল যেখানে ঐ শহর অবস্থিত ছিল। ইহার পর সিস্তান ও গেড্রোসিয়া অধিকৃত হয়। গেড্রোসিয়া অঞ্চল একটি প্রাদেশিক শাসন-এলাকারূপে নির্দিষ্ট হয় এবং পুর (Pura) নগরে উহার রাজধানী স্থাপিত হয়। হেলমাণ্ড্ উপত্যকা বাহিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে

অগ্রসর হইতে হইতে আলেকজাণ্ডার আরাকোশিয়া (Arachosia) অধিকার করেন এবং বর্তমান কান্দাহার শহর যে অঞ্চলে অবস্থিত, সম্ভবতঃ সেই এলাকায় একটি শহর স্থাপন করেন। তারপর তিনি হিন্দুকুশ পর্বতের সানুদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। এই অঞ্চলটি অধিকার করিবার মানসে তিনি কাবুলের উত্তরে কোনও এক স্থানে একটি শহরেরও পত্তন করেন। তিনি বাহ্লীকদেশে পৌছিতে না পৌছিতে বেস্‌সাস অক্সাস নদী অতিক্রম করিয়া পলায়ন করেন এবং এইরূপে কোনরূপ সংগ্রাম ব্যতিরেকে আর একটি প্রদেশ ক্রমবর্ধমান ম্যাসিডনীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আলেকজাণ্ডার বেস্‌সাসের পশ্চাদ্ধাবন করতঃ সগ্‌ডিয়ানায় আসিয়া উপনীত হন এবং তথায় তাঁহাকে বন্দী করেন। অকসাস ও জাক্সার্টেস (Jaxartes) নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল এই সগ্‌ডিয়ানা। জাক্সার্টেস নদীকে তাঁহার সাম্রাজ্যের উত্তর সীমা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া আলেকজাণ্ডার সগ্‌ডিয়ানা স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন এবং ঐ নদীর তীরে একটি নগর (বর্তমান খোদজেণ্ড) প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ী সম্রাটের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আপনাকে প্রাচ্যদেশীয় আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি ও আড়ম্বরের দ্বারা ভূষিত করেন ও নিজেকে দারয়বৌসের উত্তরাধিকারীরূপে ঘোষণা করেন।

পঞ্জাবে আলেকজাণ্ডার—সগ্‌ডিয়ানা (Sogdiana) হইতে আলেকজাণ্ডার আফগানিস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন, তথা হইতে ভারতবর্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। এ দেশের আকার প্রকার সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। গ্রীকগণ ভারতবর্ষকে পৃথিবীর পূর্বসীমার শেষ দেশ এবং সমুদ্রবেষ্টিত দেশ বলিয়া মনে করিত। তাহাদের চক্ষে ভারতবর্ষ ছিল অফুরন্ত সম্পদের আকর এক স্থান ; সে দেশের বনেজঙ্গলে বিচিত্র সব জন্তু চরিয়া বেড়ায়, বিচিত্র সব উদ্ভিদের সাক্ষাৎ মিলে ইহাই ছিল তাহাদের ধারণা। ভারতবর্ষে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের কাহিনী প্রায় সম্পূর্ণভাবে গ্রীক লেখকদিগের বিবরণাদি হইতে সংকলিত হইয়াছে। ভারতীয় নামের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় না থাকায় এমন বহু ভৌগোলিক নাম-বিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার সমাধান অদ্যাবধি হয় নাই। স্মিথ বলিতেছেন যে, আলেকজাণ্ডারের অভিযান-সাফল্য ভারতবাসীর মনের উপর এতই অকিঞ্চিৎকর প্রভাব বিস্তার করে যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কোন শাখার রচনাতেই উহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

আলেকজাণ্ডার খ্রীস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দের গ্রীষ্মকালে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেন এবং স্বাট (Swat) ও বাজাউর (Bajour) উপত্যকার বন্য জাতিগুলিকে স্ববশে আনয়ন করিতে বৎসরের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। শীতকালীন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তাঁহার সেনাবাহিনী সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে বিশ্রাম করে। অবশেষে বসন্ত কালের সূচনায় (খ্রীস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দ) আটকের উপরিভাগস্থিত উণ্ড্ নামক স্থানে নৌকার দ্বারা গঠিত সেতুর সাহায্যে তাহারা সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হয়। আলেকজাণ্ডার তক্ষশিলার সমীপবর্তী হইলে তক্ষশিলার রাজা অম্ভি তাঁহাকে স্বাগত জানান ও বিনা যুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। অম্ভি আলেক-জাণ্ডারকে বহু মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক উপঢৌকনাদি প্রদান করেন। সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে এক নূতন প্রাদেশিক শাসন-এলাকা গঠিত হইল এবং উহার রক্ষার জন্য ম্যাসিডনীয় সৈন্যবাহিনী তক্ষশিলায় ও সিন্ধুনদের পূর্বতীরস্থ অন্যান্য কয়েকটি স্থানে মোতায়েন করা হইল।

অতঃপর আলেকজাণ্ডার পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া বিতস্তা নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছাইলেন। এইখানে তিনি পুরুরাজের নিকট কঠিন বাধার সম্মুখীন হইলেন। হস্তী-যূথের দ্বারা সুরক্ষিত এক বিশাল সেনাবাহিনীসহ পুরুরাজ বিতস্তা নদীর দক্ষিণ তীরে শত্রুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। গ্রীকগণ তাহাদের চক্ষু এড়াইয়া পুরুর সেনাশিবির হইতে ষোল মাইল দূরে নদী অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। দুই দল কারীর (Karri) সমতলক্ষেত্রে (বর্তমান সিরোয়াল ও পাক্রাল গ্রাম) পরস্পরের সম্মুখীন হইল। পুরু শত্রুপক্ষকে প্রথম আক্রমণের সুযোগ দিয়া মহা ভুল করিলেন। 'বিতস্তা নদীর যুদ্ধ' তাঁহার বৃহৎ সৈন্যদলের ধ্বংসে পর্যবসিত হইল। পুরুরাজ সেনানায়করূপে তাদৃশ দক্ষ ছিলেন না কিন্তু একজন অসমসাহসী যোদ্ধা ছিলেন। পরাজিত হইয়াও তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন নাই; বন্দী রূপে শত্রুশিবিরে নীত হইবার পূর্বে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দেহে নয়টি আঘাতচিহ্ন লাভ করেন। আলেকজাণ্ডারের সমক্ষে নীত হইয়া তিনি গর্বভরে রাজার প্রতি রাজার আচরণ দাবী করিলেন। আলেকজাণ্ডার তাঁহার সাহসিকতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। রাজ্যই যে শুধু পুরুকে প্রত্যর্পণ করা হইল তাহা নহে, উহার সীমানাও সম্প্রসারিত করা হইল। চতুর গ্রীকরাজ জানিতেন যে অম্ভি ও পুরুরাজের পারস্পরিক ঈর্ষা উভয়কেই তাঁহার অনুগত করিয়া রাখিবে। বিতস্তা নদীর উভয় তীরে, যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে,

তিনি দুইটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। শহর দুইটির নাম বুকাফালা (Bucaphala) ও নিকাইয়া (Nicaea)—নবজয়লব্ধ অঞ্চলের রক্ষার জন্য এই দুইটি শহর সেনানিবাসরূপে খাড়া করা হইয়াছিল।

অতঃপর আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য তিনি জয় করিলেন এবং সাংগালা শহর ধ্বংস করিলেন। শহরটির তীব্র প্রতিরোধ উহার এই শাস্তির কারণ। আরও পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া উর্বর গঙ্গাপ্লাবিত মধ্যদেশে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিবার বাসনা তাঁহার ছিল, কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল আর পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতে চাহিল না। দীর্ঘকাল কঠোর অভিযানে নিয়োজিত থাকিবার ফলে তাহাদের মনে ক্লান্তি আসিয়া গিয়াছিল এবং স্বভাবতঃই তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। জনৈক গ্রীক লেখক বলিতেছেন যে, গ্রীক সৈন্যদল রাজার ক্রমাগত অভিযান ও বিপদ-বাধার সম্মুখীন হইবার নেশা লক্ষ্য করিয়া প্রমাদ গণিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, ভারতীয়দের দুর্দান্ত সাহস ও সামরিক নৈপুণ্য তাহাদের মনে যথেষ্ট সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। তাহারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যে, পারস্যের ক্ষীণবল সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করা এক কথা, আর পুরু এবং সাংগালার রক্ষাকারীদের মত বীরদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়া ভিন্ন কথা। তদানীন্তন ভারতীয়দের সামরিক দক্ষতার কথা বলিতে গিয়া আরিয়ান (Arrian) বলিতেছেন যে, যুদ্ধবিদ্যায় ভারতীয়রা এশিয়ার তৎকালীন অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত ছিল। বিপাশা নদী পার হইয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে গ্রীক সৈন্যদলের অস্বীকৃতির মূলে ছিল প্রধানতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয়দের সামরিক নৈপুণ্যের অভিজ্ঞতা। গাঙ্গেয় উপত্যকায় রাজত্ব করিতেন পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় রাজা, তিনি বিশাল এক সেনাবাহিনী লইয়া আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার বাহিনীতে আশী সহস্র অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, আট সহস্র যুদ্ধরথ ও ছয় সহস্র যুদ্ধকুশল হস্তী ছিল বলিয়া জানা যায়। গ্রীক সৈন্যদল সম্ভবতঃ এইরূপ শত্রুর সম্মুখীন হইতে সম্মত ছিল না।

গাঙ্গেয় উপত্যকা আক্রমণে সৈন্যদলের অস্বীকৃতি আলেকজাণ্ডারকে বিতস্তা নদী পর্যন্ত পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিয়াছিল। পুরুরাজ বিতস্তা ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিকর্তা হইলেন এবং অম্ভির উপর সিন্ধু-বিতস্তা দোয়াব এলাকার শাসনভার অর্পিত হইল। ভারতভূমির উপর আলেকজাণ্ডার কর্তৃক

স্থাপিত শহরগুলিতে বড় বড় রক্ষী সৈন্যদল নিযুক্ত হইল। এই সকল বিধিব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া আলেকজাণ্ডার পঞ্জাবের নদীপথ বাহিয়া ক্রমশঃ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন (অক্টোবর, খ্রীস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দ)। পশ্চাদপসরণ কালে তিনি শিবোই, আগালাস্‌সোই, মাল্লোই ও অক্সিড্রাকাই (Oxydrakai) জাতিগুলির নিকট হইতে কঠিন বাধার সম্মুখীন হন। এই সব যুদ্ধবিগ্রহের ফলে নিম্নবর্তী সিন্ধু-উপত্যকা অঞ্চল আলেকজাণ্ডারের অধিকারভুক্ত হয়। মুসিকানো (Mausikanos) জাতি আলেকজাণ্ডারের আধিপত্য মানিয়া লয়। খ্রীস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দের অক্টোবর মাসে আলেকজাণ্ডার তাঁহার সৈন্যদলের একাংশ সমভিব্যাহারে বর্তমান করাচী সন্নিহিত অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া গেড্রোসিয়ার মধ্য দিয়া পারস্য অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার বাহিনীর অবশিষ্ট অংশ নিয়ারকসের (Nearchos) অধিনায়কত্বে সমুদ্রপথে অগ্রসর হয়।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক-শাসনের অবসান—খ্রীস্ট পূর্ব ৩২৪ অব্দের মে মাসে আলেকজাণ্ডার পারস্যের সুসা (Susa) নগরীতে উপনীত হন। বর্তমান বাগদাদের সন্নিকটস্থ ব্যাবিলন শহরে খ্রীস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দের মে মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র তেত্রিশ বৎসর। তিনি যখন পারস্যের অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছেন সেই সময় সংবাদ পাইলেন যে, উত্তর সিন্ধু-উপত্যকার গ্রীক শাসনকর্তা নিহত হইয়াছেন। ইউডেমোস নামক এক গ্রীক ব্যবস্থাপকের সাধারণ পরিচালনাধীনে পুরু ও অম্ভিকে পঞ্জাবের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের নির্দেশদান ছাড়া তৎকালে আর বিশেষ কিছু করিবার সাধ্য তাঁহার ছিল না। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পঞ্জাবের গ্রীক সেনানায়কগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গ্রীক শক্তির :উৎখাতে সমর্থ হইলেন। ইউডেমোস খ্রীস্টপূর্ব ৩১৭ অব্দ পর্যন্ত কোন প্রকারে স্বীয় দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন ; ঐ বৎসরই তিনি ভারতভূমি ত্যাগ করেন। সেলুকস আলেকজাণ্ডারের বিজিত ভারতীয় প্রদেশসমূহ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর অবশ্য বাহ্লীক দেশীয় গ্রীকগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক-শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিল।

আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের ফলাফল—স্মিথ লিখিয়াছেন, আলেকজাণ্ডারের নিষ্ঠুর অভিযান ভারতের ভাবধারা বা

প্রথা-প্রতিষ্ঠানের উপর প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ধর্ম, সমাজ ও শিল্প-সংস্কৃতির রূপ অপরিবর্তিত রহিয়াছিল, এমন কি যুদ্ধবিদ্যায়ও ভারতীয়েরা আলেকজাণ্ডারের অপরিসীম যুদ্ধনৈপুণ্যের শিক্ষা গ্রহণে তেমন ব্যগ্রতা প্রদর্শন করে নাই। ভারতের রাজারা তাঁহাদের সেই সনাতন হস্তী, রথ ও সুবিশাল পদাতিক বাহিনীর রণকৌশল অবলম্বন করিয়া পুরাতন পথে চলিতেই অভ্যস্ত রহিলেন। আলেকজাণ্ডারের অশ্বারোহী বাহিনীর ক্ষিপ্রতা-মণ্ডিত রণকৌশল তাঁহারা আয়ত্ত করেন নাই। প্রাচীন ভারত-সভ্যতায় যে গ্রীক-প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তাহা বাহ্লীকদেশীয় গ্রীকদের মারফত আসিয়াছিল, তবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বাহ্লীকদেশীয় গ্রীকদিগের আগমন যে আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের পরোক্ষ ফল সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে কতিপয় গ্রীক উপনিবেশের স্থাপনাকে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ ফল মনে করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শহরগুলির মধ্যে কয়েকটি দীর্ঘকাল টিকিয়া ছিল। অশোকের একটি শিলালিপিতে তাঁহার সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অংশে যবনদিগের (গ্রীক) বাসের উল্লেখ আছে।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ ভারতীয় ঐক্যের বিকাশে প্রকারান্তরে সহায়তা করিয়াছিল। পঞ্জাবের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির শক্তি হ্রাস করিয়া মৌর্য সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণেও ঐ আক্রমণ পরোক্ষে কার্যকরী হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারত এত কাল মগধ সাম্রাজ্যের প্রভাব-পরিধির বহির্দেশে ছিল ; আলেকজাণ্ডার যদি তথাকার খণ্ডজাতি-শাসিত রাজ্যগুলির সামরিক গর্ব চূর্ণ না করিতেন তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পক্ষে সেই অঞ্চল স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন করা বোধ হয় কঠিন হইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৌর্য সাম্রাজ্য

মৌর্য বংশের উদ্ভব—মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য হিন্দু কিম্বদন্তী অনুযায়ী শূদ্র বলিয়া কথিত এবং তাঁহার মাতা (কিম্বা পিতামহী) মুরা মহারাজ নন্দের দাসী ছিলেন এইরূপ প্রবাদ আছে। অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য বৌদ্ধ কিম্বদন্তী অনুসারে, চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন পিপ্পলীবনের মোরিয় বা মৌর্য কুলের অন্তর্ভুক্ত একজন ক্ষত্রিয় বীর। পিপ্পলীবন নেপালের তরাইয়ের অন্তর্গত রুম্মিনদেই ও বর্তমান উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জিলার কাশীয়া নামক স্থানের মধ্যবর্তী কোনও এক অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়। মৌর্যগণ খুব সম্ভব নন্দ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবলমাত্রায় বর্তমান অশান্তি-অসন্তোষের সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কুলের অধিনায়ক ছিলেন এইরূপ অনুমিত হয়।

চন্দ্রগুপ্তের প্রথম জীবন—চন্দ্রগুপ্তের প্রথম জীবন সম্পর্কে প্রামাণিক কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তিনি ব্যাধ, পশুপালক ও পক্ষী-শিকারীদের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন এইরূপ জানিতে পারা যায়। প্লুটার্ক (Plutarch) বলিতেছেন, অ্যান্ড্রোকোটাস (Androcottus, চন্দ্রগুপ্ত) যখন নিতান্ত নবীনবয়সী এক যুবক তখন আলেকজাণ্ডারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আলেকজাণ্ডার তাঁহার প্রগল্‌ভ আচরণ ও তথাকথিত নীচ বংশের জন্য তাঁহাকে খুবই ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সম্ভবতঃ নন্দ শাসনের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে গ্রীক বাহিনীর সাহায্য লাভ আলেকজাণ্ডারের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল। জাস্টিন (Justin) নামক অপর এক গ্রীক লেখকের মতানুসারে, আলেকজাণ্ডার চন্দ্রগুপ্তের স্পষ্টোক্তিতে অসন্তুষ্ট হইয়া এই সাহসী যুবকের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত দ্রুত পলায়নের দ্বারা প্রাণ রক্ষা করেন। চন্দ্রগুপ্ত অম্ভির ন্যায় দুর্বলচেতা নন যে তিনি বিজেতা আলেকজাণ্ডারের অনুগ্রহ ও ঔদার্যের

উপর নির্ভর করিয়া স্বীয় রাজ্য রক্ষায় প্রণোদিত হইবেন। তিনি ভিন্ন ধাতুতে গড়া ছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যজয়—আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধশিবির হইতে পলায়ন করিবার পর চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য বা কৌটিল্যের সংস্পর্শে আসেন। চাণক্য ছিলেন তক্ষশিলাবাসী এক কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণ, নন্দসম্রাটের দ্বারা তিনি অপমানিত হইয়াছিলেন এইরূপ প্রবাদ আছে। বিন্ধ্য অরণ্যে প্রাপ্ত মৃত্তিকাপ্রোথিত অর্থের সাহায্যে তাঁহারা এক সৈন্যদল গড়িয়া তোলেন। ঐ সেনাবাহিনীর সহিত সংঘর্ষে নন্দসম্রাট পরাজিত হন। যুদ্ধে প্রচুর লোকক্ষয় হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এইভাবে চন্দ্রগুপ্ত আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৩২৪ অব্দে মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পরে তিনি আলেকজাণ্ডারের প্রতিনিধি-শাসকদিগকে পরাজিত করিয়া পঞ্জাবে গ্রীক প্রভাবের যে সামান্য অংশ অবশিষ্ট ছিল উহারও ধ্বংসসাধন করেন।

ক্রমশঃ চন্দ্রগুপ্ত ভারতের অপরাপর অংশে তাঁহার রাজ্যজয় সম্প্রসারিত করেন। প্লুটার্ক লিখিতেছেন যে, অ্যাণ্ড্রোকোটাস ছয় লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে ভারতময় অভিযান করিয়া সমগ্র দেশ জয় করেন। পুরাতন তামিল সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, প্রথম মৌর্য সম্রাট মাদ্রাজের তিনেভেলী জিলা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। একটি মহীশূরীয় শিলালিপিতে উত্তর মহীশূরে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত বিন্ধ্য-পরবর্তী ভারতের একটি বৃহৎ অংশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। পশ্চিমে তিনি তাঁহার রাজ্যজয়ের সীমা পশ্চিম ভারতের সৌরাষ্ট্র বা কাথিয়াবাড় পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। রাজা রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালিপি হইতে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চন্দ্রগুপ্তের শাসনের শেষ পর্যায়ে সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সেলুকস ছিলেন পশ্চিম এশিয়ার অধিপতি, তিনি 'নিকাতোর' (Nikator) বা 'বিজয়ী' এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের অকালমৃত্যুর অনতিকাল পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল ; সেলুকস ছিলেন সেনাপতিগণের অন্যতম। সেলুকস ভূমধ্যসাগর হইতে সিন্ধুনদ পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। তারপর তিনি আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করিতে স্বভাবতঃই

প্রলুব্ধ হন এবং অবধারিতভাবে চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধে। তিনি চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধার্থে সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন এবং উভয় বংশের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বলিয়া জানা যায়। সেলুকস আফগানিস্থানের কাবুল, হিরাট ও কান্দাহার প্রদেশ এবং বেলুচিস্থানের মাকরান প্রদেশ দান করিয়া চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধবিরতি ঘটান। বিনিময়ে তিনি পাঁচশত যুদ্ধকুশল হস্তী লাভ করেন। মেগাস্থিনিস নামক এক গ্রীক দূত মৌর্য রাজসভায় প্রেরিত হন। সন্ধির এই সর্ত হইতে স্বভাবতঃই অনুমিত হয় যে চন্দ্রগুপ্ত বিজয়ী হইয়াছিলেন। তবে এই সংঘর্ষের অবসানে দুই শাসকের মধ্যে স্থায়ী মৈত্রী স্থাপিত হয় এবং মৌর্য ও সেলুকস বংশের মধ্যে এই পারস্পরিক মিত্রতার সম্পর্ক পরবর্তীকালে তাঁহাদের উত্তরাধিকারীদের আমলেও অক্ষুণ্ণ থাকে।

চন্দ্রগুপ্তের শেষ জীবন—জৈন মত অনুসারে, চন্দ্রগুপ্ত জৈন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জৈন ধর্ম গ্রহণান্তর তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন। কথিত আছে, প্রচলিত জৈন পদ্ধতি অনুযায়ী প্রায়োপবেশনের দ্বারা তিনি মহীশূরের শ্রবণবেলগোলা নামক স্থানে স্বেচ্ছায় দেহরক্ষা করেন। ২৪ বৎসর রাজত্বের পর আনুমানিক খ্রীস্ট পূর্ব ৩০০ অব্দে এই ঘটনা ঘটে।

মেগাস্থিনিস—একজন সাফল্যমণ্ডিত বিজেতা ও সুযোগ্য শাসক হিসাবে চন্দ্রগুপ্ত ভারতীয় ইতিহাসের উপর তাঁহার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের তথ্যাবলী তিনটি সূত্র হইতে আহৃত—মেগাস্থিনিসের খণ্ডিত বিবরণ, কৌটিল্যকৃত গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র' ও অশোকের শিলালিপিসমূহ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সেলুকস মৌর্য রাজসভায় একজন দূত প্রেরণ করেন। ঠিক কোন্ সময় তিনি দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সেই দূত ভারতবর্ষে কত কাল অবস্থান করেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। গ্রীক দূত যে ভারতের সকল অঞ্চল পরিদর্শন করেন সে সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ স্বল্পতর। তিনি কাবুল এবং পঞ্জাব হইয়া রাজ-সড়ক বরাবর পাটলিপুত্রে আসিয়া উপনীত হন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল তিনি পরিদর্শন করেন নাই। কেবলমাত্র লোকমুখে শুনিয়া ও সংবাদের মারফত গাঙ্গেয় উপত্যকার নিম্নাংশ সম্পর্কে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস ভারতের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া

যান তাহা বহুদিন পূর্বে বিলুপ্ত হইয়াছে, তবে পরবর্তীকালীন গ্রীক লেখকদের রচনায় তাঁহার যে সকল উদ্ধৃতি স্থান পাইয়াছে সেই সংকলিত অংশগুলির ভিতর ঐ বিবরণ খণ্ডশঃ বিধৃত হইয়া আছে।

অধিকাংশ প্রাচীন লেখক মেগাস্থিনিসের বিবরণকে খুব বেশী নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। মেগাস্থিনিস স্থানে স্থানে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, কল্পনা-কাহিনী প্রণোদিত অবিশ্বাস্য সব ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বিচার-ক্ষমতা বিশেষ পরিপক্ব ছিল না ; ভুল তথ্যের দ্বারা তিনি সহজেই পথভ্রষ্ট হইতেন। ভারতীয় ভাষাগুলি সম্পর্কে তাঁহার কোনও জ্ঞান ছিল না। কিন্তু যে সকল বিষয় তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন উহাদের সম্পর্কে তাঁহার প্রদত্ত তথ্যাদি নিঃসন্দেহে প্রামাণিক। তাঁহার পাটলিপুত্র নগরের বিবরণ, চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ ও রাজসভার বর্ণনা ইত্যাদি বিনা দ্বিধায় সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ পাটলিপুত্র নগরে তিনি বাস করিতেন, চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদে ও রাজসভায়ও তিনি বহুবার গিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ অনেক ক্ষেত্রে কৌটিল্যের বিবরণের সহিত মিলিয়া যায়।

পাটলিপুত্র নগরী—মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী, পাটলিপুত্র নগরীর আয়তন ছিল দৈর্ঘ্যে সাড়ে নয় মাইল, প্রস্থে দুই মাইলের কিছু কম। একটি সুপ্রশস্ত পরিখার দ্বারা নগরটি বেষ্টিত ছিল ও উহার চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীরের অবরোধ ছিল। প্রাচীরগাত্রে ৫৭০টি উচ্চ চূড়া ও ৬৪টি প্রবেশপথ ছিল। তিনি পাটলিপুত্রকে ভারতের সর্ববৃহৎ নগর বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে আরও অনেক নগর ছিল। সমুদ্র বা নদীর তীরে যে সকল নগর অবস্থিত ছিল উহারা প্রায়শঃ কাষ্ঠনির্মিত হইত ; উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত নগরগুলির বাসস্থান নির্মাণে ইষ্টক ও প্রস্তর ব্যবহার হইত।

চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ দর্শনে গ্রীকগণ বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিল। তাহারা স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছে যে, সুসায় কিম্বা একবাতানায় অবস্থিত পারসিক সম্রাট্দের রাজপ্রাসাদও চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদের সহিত তুলনীয় নহে। মৌর্য রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন উদ্যানে পোষা ময়ূর ও অন্যান্য পক্ষী চরিয়া বেড়াইত। উদ্যানে ছায়াময় কুঞ্জ ও বৃক্ষশোভিত বিচরণভূমি ছিল। রাজপ্রাসাদ ছিল ইষ্টকনির্মিত। পাটনার নিকটবর্তী বর্তমান কুমরাহার গ্রামের অদূরে উহা অবস্থিত ছিল বলিয়া

অনুমান হয়। কতিপয় ইউরোপীয় পণ্ডিত চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদের গঠন-সৌকর্যের ভিতর পারসিক প্রভাবের চিহ্ন খুঁজিয়া পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের এই মত সাধারণতঃ স্বীকার করা হয় না।

'সপ্ত জাতি'—মেগাস্থিনিস ভারতবাসীদিগকে সাতটি জাতিতে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন—(১) দার্শনিক (ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শ্রমণ)। ইঁহারা অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় সংখ্যাল্প ছিলেন কিন্তু সম্মানের দিক দিয়া সকলের উপরে তাঁহাদের স্থান ছিল; (২) কৃষক। জনগণের উপকারক বিধায় কৃষক-শ্রেণীকে যুদ্ধকালেও সর্বপ্রকার ক্ষয়ক্ষতি হইতে রক্ষা করা হইত; (৩) পশুপালক ও শিকারী। ইহারা নগরেও বাস করিত না, গ্রামেও বাস করিত না, সচরাচর তাঁবুতে বাস করিত; (৪) শিল্পী ও কারিগর সম্প্রদায়। ইহাদিগকে রাজকীয় খাজনা দিতে হইত না, বরঞ্চ রাজকোষ হইতে তাহাদিগের ভরণপোষণ করা হইত; (৫) যোদ্ধাবাহিনী। রাজব্যয়ে যোদ্ধশ্রেণীর ভরণপোষণ নির্বাহ হইত; (৬) পরিদর্শক। পরিদর্শকশ্রেণী দেশের অভ্যন্তরে যাহা-কিছু ঘটিত সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করিয়া রাজার নিকট বৃত্তান্ত প্রেরণ করিতেন; (৭) অমাত্য। অমাত্যগণ জনহিতের বিষয়ে আলোচনা করিতেন। চতুর্বর্ণ সম্পর্কিত প্রচলিত হিন্দু ধারণার সহিত এই সপ্তজাতির ধারণা খাপ খায় না। মেগাস্থিনিস বৃত্তিকেই ভারতীয় জাতিভেদ প্রথার ভিত্তিস্বরূপ মনে করিয়াছিলেন। জাতিভেদকে বংশানুক্রমিক না ভাবিয়া প্রধানতঃ বৃত্তিমূলক মনে করিবার ফলে ভারতীয় সমাজের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে তাঁহার মনে ভাসা-ভাসা ধারণা মাত্র হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। মৌর্য যুগে জাতিভেদ প্রথা সম্ভবতঃ দিন দিন কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিতেছিল, কারণ মেগাস্থিনিস বলিতেছেন যে স্বীয় জাতির বাহিরে কাহারও বিবাহের অধিকার ছিল না, স্বীয় বৃত্তি ভিন্ন অপর বৃত্তি অবলম্বনের স্বাধীনতাও অগ্রাহ্য হইত।

ভারতীয় চরিত্র—মেগাস্থিনিস তৎকালীন ভারতবাসীদিগের মিতব্যয়িতা ও সততার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, সকল ভারতবাসীই পরিমিত জীবনযাত্রার আদর্শ অনুযায়ী সংসারধর্ম নির্বাহ করে, বিশেষতঃ শিবির-জীবনে বাসকালে তাহাদের এই বৈশিষ্ট্য সমধিক প্রকট হয়। চৌর্যাপরাধ খুবই বিরল ঘটনা। যজ্ঞকাল ভিন্ন অন্য সময়ে ভারতবাসীরা সুরা পান করে না। মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী, ভারতীয়দের কোন লিখিত

শাসনবিধি ছিল না, কারণ তাহারা নাকি লিখনবিদ্যা অবগত ছিল না। মেগাস্থিনিসের এই বর্ণনা আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। মৌর্য যুগে লিখনবিদ্যা সুপ্রচলিত ছিল এই তথ্যের সপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। মেগাস্থিনিসের বিবরণের ভিত্তিতে জনৈক লেখক নিম্নোদ্ধৃত উক্তি করিয়াছেন: "ভারতবাসীদের আইন ও চুক্তিপত্র ইত্যাদি খুবই সরল ছিল। ইহার প্রমাণ তাহারা কচিৎ কখনও বিচারালয়ের শরণাপন্ন হইত। প্রতিশ্রুত বাক্যের কখনও লঙ্ঘন হইত না, গচ্ছিত দ্রব্যাদি সম্পর্কেও কখনও বিবাদ-বিসম্বাদের কারণ ঘটিত না। তাহাদের সাক্ষী কিংবা শীলমোহর ইত্যাদি নিশ্চয়তাসূচক প্রমাণের প্রয়োজন হইত না। কারণ পরস্পরের উপর বিশ্বাস ছিল অপরিসীম এবং ঐ বিশ্বাসের মর্যাদা কচিৎ ক্ষুণ্ণ হইত। তাহারা ভূসম্পত্তি এবং আবাসগৃহ সাধারণতঃ অরক্ষিত রাখিয়াই নিরাপদে কাল কাটাইত।" উক্তিটির মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয্য আছে বলিয়া মনে হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রদত্ত বিবরণ উহার সহিত সঙ্গতিহীন।

দাসত্ব—মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুসারে, ভারতবাসী মাত্রেই স্বাধীন ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ দাস ছিল না। কিন্তু সাহিত্য এবং শিলালিপির সূত্রে নিঃসন্দেহে জানিতে পারা গিয়াছে যে ভারতে দাসত্ব ছিল। সম্ভবতঃ মেগাস্থিনিস এই সংবাদ অবগত ছিলেন না, কারণ ভারতে দাসত্ব প্রথা ছিল অনুগ্র, উহার পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ; গ্রীক দাসপ্রথার সহিত উহার তুলনা চলিতে পারে না।

চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য-শাসন-পদ্ধতি—মেগাস্থিনিসের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে উচ্চতন পদে অধিষ্ঠিত দুই শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী ছিলেন—'অগোরানোমি' (Agoranomi) ও 'অস্তিনোমি' (Astynomi)। প্রথমোক্তগণ পল্লী-অঞ্চল শাসন করিতেন; দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারিবৃন্দ রাজধানী-শাসনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রথমোক্তদের কাজকর্ম এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে—কোন কোন কর্মচারী নদীপথের তত্ত্বাবধান করিতেন, মিশরে যেইরূপ জমি জরীপ করা হয় সেইরূপ জমি জরীপ করিতেন, সকলে যাহাতে সমান জলের ভাগ পায় এইজন্য প্রধান খালসমূহ হইতে উহাদের শাখা-প্রশাখায় জল চলাচলের উদ্দেশ্যে যে-সকল স্রোত-কবাট ছিল উহাদিগের পর্যবেক্ষণ করিতেন ইত্যাদি। তাঁহারা শিকারীদিগের কার্যকলাপও দেখাশুনা করিতেন, যোগ্যতা-অযোগ্যতা অনুযায়ী

শিকারীদিগকে পুরস্কৃত বা দণ্ডিত করিবার ভার তাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা রাজস্ব আদায় করিতেন ; কৃষক, কাঠুরিয়া, সূত্রধর, কর্মকার ও খনিশ্রমিকদের কর্মের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহারা সড়কনির্মাণকার্যের তদারক করিতেন এবং দূরত্ব ও শাখা-পথ নির্দেশ করিতে প্রতি ১৯৪০ গজ অন্তর একটি করিয়া স্তম্ভ গাঁথিয়া যাইতেন।

রাজধানীর ভারপ্রাপ্ত উচ্চতন কর্মচারিবৃন্দ ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিলেন। প্রতি সমিতিতে পাঁচজন করিয়া সভ্য ছিলেন। প্রথম সমিতির সভ্যগণ শিল্পোৎপাদনের তদারক করিতেন ; দ্বিতীয় সমিতির উপর বৈদেশিকগণের দেখাশুনার ভার ন্যস্ত ছিল। তৃতীয় সমিতি করধার্যের উদ্দেশ্যে জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখিতেন। এইরূপ ক্ষুদ্র ব্যবসায়, ওজন ইত্যাদির তত্ত্বাবধানের জন্য, উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার জন্য, বিক্রীত দ্রব্যাদির মূল্যের এক-দশমাংশ শুল্ক হিসাবে আদায়ের জন্য ভিন্ন তিনটি সমিতি নিযুক্ত ছিলেন। এই ছয় সমিতি তাঁহাদের নিজ নিজ বিভাগের কার্য ছাড়াও সামগ্রিক ভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ বিভাগের কার্য জনসাধারণের স্বার্থসংক্রান্ত নানাবিধ কার্য, যথা, সাধারণের ব্যবহৃত অট্টালিকাসমূহের তত্ত্বাবধান, মূল্যনিয়ন্ত্রণ, হাটবাজার, পোতাশ্রয় ও মন্দিরাদির রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্যও দায়ী থাকিতেন।

অপরাধ সম্পর্কিত বিধিবিধান—মেগাস্থিনিস অঙ্গচ্ছেদের দ্বারা শাস্তিবিধানের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ অনুসারে, মিথ্যা সাক্ষ্য দানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রত্যঙ্গাদি ছেদন করা হইত। যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির অঙ্গচ্ছেদনের অপরাধে অপরাধী তাহাকেও অনুরূপ শাস্তি দেওয়া হইত ; উপরন্তু তাহার হাত কাটিয়া লওয়া হইত। কোন কারিগরের হাত কিম্বা চক্ষুর হানি ঘটাইলে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা হইত। 'অর্থশাস্ত্রে'ও অনুরূপ দণ্ডদান-ব্যবস্থার উল্লেখ আছে।

সেনাবাহিনী—মেগাস্থিনিস অন্য এক শ্রেণীর উর্ধ্বতন কর্মচারীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা সামরিক ক্রিয়াকলাপের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। 'অর্থশাস্ত্রে' উল্লিখিত 'বলাধ্যক্ষ' অভিধার দ্বারা সম্ভবতঃ ইহাদিগকেই বুঝানো হইয়াছে। মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী এই শ্রেণীর কর্মচারিবৃন্দও ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিলেন। প্রত্যেক সমিতিতে পাঁচ জন সভ্য ছিলেন। এক এক সমিতির উপর এক একটি বিভাগের ভার অর্পিত ছিল—যথা, নৌ-বিভাগ, সেনাদলের

রসদ সরবরাহ ও যানবাহন বিভাগ, পদাতিক সৈন্য বিভাগ, অশ্বারোহী সৈন্য বিভাগ, যুদ্ধ-রথ বিভাগ ও রণকুশল হস্তী বিভাগ। সেনাবাহিনী ছিল স্থায়ী এক বাহিনী, সামন্ত-প্রভুদের আজ্ঞাধীন বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলের সমষ্টি উহা ছিল না। প্লুটার্কের হিসাব অনুযায়ী সেনাবাহিনীতে ছয় লক্ষ সৈন্য ছিল।

'অর্থশাস্ত্র'—কৌটিল্য বা চাণক্যকে 'অর্থশাস্ত্রের' রচয়িতা বলিয়া ধরা হয়। চাণক্য (নামান্তর বিষ্ণুগুপ্ত) ভারতীয় প্রবাদ অনুযায়ী নন্দ রাজবংশের ধ্বংসসাধনে চন্দ্রগুপ্তকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। পরে তিনি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী হন। কিন্তু এই মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা বা উহার রচনার তারিখ সম্বন্ধে এখনও সঠিক তথ্য সংগৃহীত হয় নাই। যদিও কৌটিল্যকেই গ্রন্থটির রচয়িতা বলিয়া পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে, তত্রাচ গ্রন্থটির ভিতর এমন সব প্রমাণ সন্নিবদ্ধ আছে যাহাতে মনে হইতে পারে উহা পরবর্তী কালের রচনা। 'অর্থশাস্ত্রে' যে শাসন-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হইয়াছে উহা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা; অথচ আমরা জানি চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। 'অর্থশাস্ত্রে' চীনাংশুকের (চৈনিক রেশম বস্ত্রের) উল্লেখ হইতে মনে হয় গ্রন্থটি মৌর্যোত্তর যুগে রচিত হইয়াছিল। কারণ মৌর্য যুগে চীন দেশের সহিত ভারতের সম্পর্ক ছিল না। রাষ্ট্রভাষা রূপে সংস্কৃতের ব্যবহার আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ—মৌর্য যুগে সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা ছিল না। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে একাধিক পণ্ডিত মনে করেন যে, 'অর্থশাস্ত্র' বর্তমানে যে আকারে প্রচলিত আছে, উহা মৌর্য যুগে রচিত হয় নাই। তবে সমগ্র গ্রন্থখানি বা উহার অংশবিশেষ চাণক্যের রচিত হউক আর না-ই হউক, উহাতে যে সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থাদির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা মৌর্য যুগের বিশেষ পরিস্থিতির দ্যোতক। অতএব মৌর্য শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কিত নানাবিধ তথ্যের আকর রূপে গ্রন্থটির ব্যবহার প্রশস্ত। প্রাচীন লেখকদের রচনা ও অশোকের শিলালিপিসমূহের মাধ্যমে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, 'অর্থশাস্ত্রে' প্রদত্ত বিবরণাদিতে সচরাচর সেই সকল তথ্যের সমর্থন মিলে, আবার অতিরিক্ত তথ্যও পাওয়া যায়।

কেন্দ্রীয় শাসন—স্বভাবতঃই রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের শীর্ষাধিপতি। শাসন-ব্যবস্থায় তাঁহার ভূমিকা ছিল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কৌটিল্যের মতে রাজাকে উদ্যমশীল ও সদা-সজাগ থাকিতে হইবে। রাজ্যের সর্বত্র প্রহরা নিযুক্ত করা, আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করা, নাগরিক ও পল্লীবাসীদের কার্যকলাপ

তদারকি, কার্যাধ্যক্ষদের নিয়োগ, মন্ত্রিসভার সহিত মৌখিক এবং লিখিত উভয়বিধ সলা-পরামর্শ, গুপ্তচর কর্তৃক সংগৃহীত সংবাদ শ্রবণ, সামরিক চতুরঙ্গ-বাহিনীর (রথাশ্বহস্তিপদাতিক) তত্ত্বাবধান, সেনাপতির সহিত মিলিতভাবে সামরিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা—এইগুলি রাজার অবশ্য করণীয় ছিল। কৌটিল্য ইহাও বলিয়াছেন যে রাজাকে অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং তাঁহার কিছু সময় আত্ম-বিশ্লেষণে যাইবে। তিনি রাজার বিচার-বিভাগীয় দায়িত্বের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। রাজা যখন বিচারাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, বিচারপ্রার্থী-দিগকে যেন আবেদনসহ তাঁহার সন্দর্শনের জন্য অযথা অপেক্ষা করিতে না হয়—ইহাই রাজার প্রতি তাঁহার নির্দেশ। রাজার আইন-প্রণয়নসংক্রান্ত কর্তব্য নির্দেশ করিতে গিয়া কৌটিল্য 'রাজশাসন'[১] অর্থাৎ রাজাদেশকেও আইনসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অশোকের অনুশাসনসমূহ রাজার এই আইনপ্রণয়ন ক্ষমতারই নিদর্শন মাত্র। গ্রীকদের প্রদত্ত বিবরণেও দেখা যায় রাজা কঠোর কর্মময় জীবন যাপন করিতেন। জনৈক গ্রীক লেখক বলিয়া গিয়াছেন: "তিনি (রাজা) এইভাবে সমগ্র দিবস কর্মব্যস্ত থাকেন; নিজের দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সময় সমাগত হইলেও, তাঁহার কার্যক্রমে ছেদ ঘটিতে দেন না।"

রাজকার্য পরিচালনায় যোগ্য ব্যক্তিদের সহায়তা আবশ্যক বলিয়া রাজাকে মন্ত্রী নিয়োগ করিতে এবং মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত। মেগাস্থিনিস ইহাদিগকে "সভাসদ পরিমাপক" (councillors and assessors) নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। কৌটিল্য দুই শ্রেণীর মন্ত্রীর উল্লেখ করিয়াছেন—'মন্ত্রী' ও 'অমাত্য'। 'মন্ত্রী' নামধেয় ব্যক্তিগণ ছিলেন উর্ধ্বতন সচিব, ইহাদিগকেই সম্ভবতঃ অশোক তাঁহার রাজকীয় ঘোষণাগুলিতে 'মহামাত্য' আখ্যা দান করিয়াছেন। রাজাকে শাসনকার্যে পরামর্শদানের জন্য একটি 'মন্ত্রিপরিষদ' ছিল, মৌর্য রাষ্ট্রের পরিচালনায় এই পরিষদের ভূমিকা ছিল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। 'মন্ত্রিপরিষদের' সদস্যগণ এবং 'মন্ত্রিগণ' এক ছিলেন না, 'মন্ত্রী'দের তুলনায় তাঁহারা নিম্নতর মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ কালে রাজা তাঁহাদের পরামর্শ লইতেন। ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের পরিচালনার জন্য যতজন মন্ত্রীর প্রয়োজন হইত মন্ত্রিপরিষদে ততজন মন্ত্রীই লওয়া হইত।

১ কৌটিল্যের মতানুযায়ী আইনের চারিটি পদ। এই পদচতুষ্টয় হইল—'ধর্ম' (পবিত্র বিধি), 'ব্যবহার' (সাক্ষ্য), 'চরিত্র' (ইতিহাস ও ঐতিহ্য) ও 'রাজশাসন' (রাজাদেশ)।

অশোকের অনুশাসনসমূহ হইতেও মন্ত্রিপরিষদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। 'অমাত্য'গণ ছিলেন সাম্রাজ্যের শাসন এবং বিচার উভয় বিভাগীয় উচ্চতন রাজকর্মচারী।

'অধ্যক্ষ'—'মন্ত্রী', 'মন্ত্রিপরিষদ', 'অমাত্য' ছাড়াও অন্য এক শ্রেণীর ঊর্ধ্বতন কর্মচারী ছিলেন, তাঁহারা ছিলেন শাসনসংস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ। ইঁহারা হইলেন 'অধ্যক্ষ' বা বিভাগীয় প্রধান কর্মচারী। গ্রীক লেখকগণ ইঁহাদিগকে রাজধানী ও গ্রামাঞ্চল উভয়বিধ এলাকায় শাসনবিভাগীয় প্রধান কার্যকর্তা (magistrates) রূপে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত বত্রিশ প্রকারের অধ্যক্ষের ও তাঁহাদের কর্তব্যের উল্লেখ 'অর্থশাস্ত্রে' আছে। বিভাগগুলির মধ্যে আছে রাজকোষ, খনি, মুদ্রানির্মাণ, শুল্কসংগ্রহ, জাহাজচলাচল, গবাদি পশু সংরক্ষণ, অশ্ব, রথ, কারাগার, ডাকবিভাগ ইত্যাদি। বিভিন্ন বিভাগের এই সকল অধ্যক্ষের মধ্যে মেগাস্থিনিস কর্তৃক উল্লিখিত সামরিক ক্রিয়াকলাপের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণও রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কতক 'সমাহর্তৃ'র, কতক 'সন্নিধাতৃ'র, এবং কেহ কেহ 'সেনাপতি' বা সেনাবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষের অধীন ছিলেন।

বিচারবিভাগ—রাজকীয় ধর্মাধিকরণ ছিল রাজ্যের উচ্চতন বিচারালয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য যে সকল বিচারালয় ছিল অর্থশাস্ত্রে সেগুলিরও উল্লেখ আছে। অর্থশাস্ত্র বলিতেছেন, 'সংগ্রহণ', 'দ্রোণমুখ' ও 'স্থানীয়' নামে বর্ণিত নগরত্রয়ে এবং যে সকল স্থলে দুই জিলার মিলন হইয়াছে সেই সব জায়গায় ধর্মবিধির সহিত পরিচিত তিনজন ও রাজার তিন মন্ত্রী সম্মিলিত হইয়া বিচারকার্য নিষ্পন্ন করিতেন। 'স্থানীয়' হইল আটশত গ্রামের কেন্দ্র, 'দ্রোণমুখ' চারিশত গ্রামের কেন্দ্র এবং 'সংগ্রহণ' দশটি গ্রামের কেন্দ্র। গ্রামের ছোটখাট বিবাদের নিষ্পত্তি করিতেন 'গ্রামিকেরা' অর্থাৎ নির্বাচিত গ্রামীণ কর্মকর্তারা, কখনও কখনও গ্রাম-প্রধানেরাও এই কর্তব্য সমাধা করিতেন। বৈদেশিকদের বিচারের জন্য আলাদা বিচারক ছিলেন, গ্রীক লেখকগণ ইঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দণ্ডবিধির কঠোরতা সম্পর্কে মেগাস্থিনিসের বিবরণে যাহা বলা হইয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রাদেশিক শাসন—মৌর্য সাম্রাজ্য কতিপয় প্রদেশে বিভক্ত ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে এই প্রকার কয়টি প্রদেশ ছিল তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না।

অশোকের সময় এইরূপ পাঁচটি প্রদেশ অন্ততঃ ছিল বলিয়া জানা যায়।— 'উত্তরাপথ', 'অবন্তিরাষ্ট্র', 'দক্ষিণাপথ', 'কলিঙ্গ' ও 'প্রাচ্য'। উহাদের রাজধানী ছিল যথাক্রমে তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, সুবর্ণগিরি, তোশালী ও পাটলিপুত্র। সাম্রাজ্যের বহির্বলয়ে অবস্থিত প্রদেশগুলির শাসনের ভার ছিল রাজবংশীয় 'কুমারদের' উপর। সাম্রাজ্যের কিছু-কিছু জনপদ ছিল স্বায়ত্ত-শাসিত ; কোন কোন নগরে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কৌটিল্যের রচনায় 'সঙ্ঘের' উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; কম্বোজ ও সৌরাষ্ট্রের যোদ্ধ-সমবায়কে 'সঙ্ঘ' বলা হইত।

গুপ্তচরবৃত্তি—'অর্থশাস্ত্রে' সংবাদ-সংগ্রহবৃত্তির নৈপুণ্যের সবিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রদেশগুলির শাসন-ব্যবস্থার উপর সম্ভবতঃ ইহার দ্বারা যথোচিত নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রাখা হইত। কৌটিল্য দুই শ্রেণীর গুপ্তচরের কর্মতৎপরতার উল্লেখ করিয়াছেন—'সংস্থাঃ' অর্থাৎ স্থানীয় গুপ্তচর ও 'সঞ্চারাঃ' অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ গুপ্তচর।

রাজস্ব—সাধারণতঃ উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ ছিল রাজকর (ভাগ), কিন্তু এই 'ভাগ' কখনও কখনও বাড়িয়া এক-চতুর্থাংশে, কখনও কখনও কমিয়া এক-অষ্টমাংশে দাঁড়াইত। গ্রীক লেখকদের বিবরণ হইতে মনে হয় যে, এক-চতুর্থাংশ করের উপর কৃষকদিগকে অতিরিক্ত করও প্রদান করিতে হইত। কারণ এই ধারণা বলবৎ ছিল যে, "সমগ্র ভারতবর্ষ রাজকীয় সম্পত্তি, প্রজাদের কাহারও ভূমির মালিক হইবার অধিকার নাই।" শহরাঞ্চলে রাজা জন্ম ও মৃত্যুর খাতে কর, বিক্রয়-কর এবং জরিমানার অর্থ আদায় করিতেন।

মৌর্য শাসনের স্বরূপ—'অর্থশাস্ত্র' হইতে মৌর্য শাসনের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা হইল এক নির্মম শাসন-ব্যবস্থা। সম্রাট্, তাঁহার বিরাট সৈন্যবাহিনী, তাঁহার আমলাতন্ত্র, বিভিন্ন বিভাগীয় শাসনের উৎকর্ষ, দূরবর্তী প্রদেশ-সমূহে শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাজবংশীয় কুমারগণ, সুপরিচালিত গোপন সংবাদ-সংগ্রহ-ব্যবস্থা—সব কিছু মিলাইয়া এক সুদক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ শাসন-ব্যবস্থার চিত্র আমাদের মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠে। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে যে বস্তুতান্ত্রিক মনোভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল তাহা চন্দ্রগুপ্তের নির্মিত সুবিশাল সাম্রাজ্য-সংস্থার উপর কেমন যেন এক মালিন্যের ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী

সাম্রাজ্য জনগণের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবিশ্বাসী মনোভাব পোষণ করিলেও সর্বত্র একটি সাংস্কৃতিক ঐক্যের সূচনা করিয়াছিল। শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক সহিষ্ণুতা ও বদান্যতার মহান্ আদর্শের দ্বারা চালিত হইত। এই দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, অশোকের প্রচারিত অনুশাসনসমূহে যে আদর্শের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে 'অর্থশাস্ত্রে' বর্ণিত আদর্শের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। অশোকের ঘোষণা—"সকল প্রজাই আমার সন্তান।" কৌটিল্য বলিতেছেন—প্রজার সুখেই রাজার সুখ, প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল। যে বস্তু শুদ্ধমাত্র রাজার তুষ্টিবিধায়ক উহাকে বাঞ্ছিত মনে করিলে চলিবে না, পরন্তু যাহাতে প্রজার তুষ্টি, রাজা তাহাকেই বাঞ্ছিত মনে করিবেন। কৌটিল্যের অপর একটি উক্তি—রাজা অনাথ, বৃদ্ধ, অশক্ত, রুগ্ন ও পীড়িত এবং অসহায়দিগের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিবেন। গর্ভবতী নারী ও সদ্যোজাত শিশুদিগের সাহায্য দানের ব্যবস্থাও তাঁহাকে করিতে হইবে।

বিন্দুসার—চন্দ্রগুপ্তের পর চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি খ্রীস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ হইতে ২৭৩ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার উপাধি ছিল 'অমিত্রঘাত' (শত্রু হনন-কারী)। ইহা হইতে মনে হয় তিনি শক্তিশালী নরপতি ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের মধ্যে কোন একজন বিন্ধ্য-পর্বতমালার দক্ষিণে এক বিরাট ভূখণ্ড জয় করিয়াছিলেন, কেননা অশোক কেবলমাত্র কলিঙ্গই জয় করেন, অথচ তাঁহার রাজ্যসীমা দক্ষিণে সুদূর পেন্নার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণাপথ পূর্বে বিজিত না হইলে ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারিত না। বিন্দুসারের রাজত্ব-কালে তক্ষশিলায় এক প্রবল বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়, কিন্তু যুবরাজ অশোকের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করে।

বিন্দুসার সমকক্ষতার ভিত্তিতে গ্রীক শক্তিবর্গের সহিত বন্ধুতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা করিয়াছিলেন। সীরিয়ার গ্রীক রাজা তাঁহার সভায় ডেইমেকস (Deimachos) নামে এক গ্রীক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। মিশরের রাজা টলেমী ফিলাডেলফস (Ptolemy Philadelphos)-ও মৌর্য রাজসভায় ডাইয়োনিসিয়াস (Dionysius) নামে এক রাজদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। উক্ত রাজদূত হয় বিন্দুসার নয় অশোকের নিকট তাঁহার পরিচয়-পত্র দাখিল করেন। সেলুকস প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের জনৈক গ্রীক কর্মকর্তা ভৌগোলিক

তথ্য সংগ্রহের জন্য জাহাজযোগে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে পাড়ি দেন। রাজনৈতিক সম্পর্কের ফলে সাংস্কৃতিক সংস্পর্শও স্থাপিত হইয়াছিল। কথিত আছে বিন্দুসার সীরিয়ার গ্রীক রাজা প্রথম অ্যান্টিওকোস (Antiochos I)-এর নিকট একজন গ্রীক দার্শনিককে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

অশোকের রাজ্যলাভ—বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অশোক মগধের রাজা হন। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যাভিষেক উৎসব আরও চারি বৎসর পর অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব ২৬৯ অব্দে অনুষ্ঠিত হয়। সিংহাসনে আরোহণ ও রাজ্যাভিষেকের মধ্যে এই ব্যবধানের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া সিংহলীয় ইতিকথায় ভ্রাতৃবিরোধের অর্থাৎ সিংহাসন লইয়া বিন্দুসারের পুত্রদের মধ্যে কলহের কথা উপস্থাপিত করা হইয়াছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য নিরপেক্ষ প্রমাণের অভাবে এই সকল কাহিনী সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এইগুলি সম্ভবতঃ অলীক কল্পকথা। অশোকের রাজত্বকালের প্রথম চারি বৎসর সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট সংবাদ পাওয়া যায় না। "ভারতীয় ইতিহাসের বর্ণ-সমারোহের মধ্যে" এই চারি বৎসর কাল "অন্ধকার যবনিকাতুল্য।"

কলিঙ্গ জয়—"দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী" অশোক (অশোক তাঁহার শিলালিপিসমূহে আপনাকে এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন) তাঁহার পূর্ববর্তীদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতের অভ্যন্তরে রাজ্যসম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ পূর্বে নন্দ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ; সম্ভবতঃ নন্দ রাজগণের পতনের পর উহা স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। কলিঙ্গ চন্দ্রগুপ্তের আমলে একটি স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল—গ্রীক লিপিকারগণ অন্ততঃ এইরূপ বলেন। রাজ্যাভিষেকের আট বৎসর পর অশোক কলিঙ্গ জয় করেন। কলিঙ্গরাজ ছিলেন এক বিশাল বাহিনীর অধিপতি ; তাঁহাকে পরাভূত করিতে অশোককে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। ত্রয়োদশ সংখ্যক শিলালিপিতে অশোক বলিয়াছেন—"দেড় লক্ষ সৈন্য বন্দী, এক লক্ষ নিহত ও উহার বহুগুণ সংখ্যক মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।" নববিজিত রাজ্য একটি প্রাদেশিক শাসন-এলাকায় পরিণত হয় এবং তোশালী (বর্তমান উড়িষ্যার পুরী জিলার অন্তঃপাতী)-তে উহার রাজধানী স্থাপিত হয়। বিম্বিসারের রাজত্বকালে মগধের যে সামরিক সম্প্রসারণের সূত্রপাত, কলিঙ্গজয়ে ঘটে উহার পরিসমাপ্তি।

অশোকের সাম্রাজ্যের পরিধি—অশোকের শাসনাধীন মৌর্য সাম্রাজ্যের পরিধি প্রায়-সুনির্দিষ্টরূপে নিরূপণ করা সম্ভব। উত্তর-পশ্চিমে তাঁহার সাম্রাজ্য সীরিয়ার প্রথম অ্যান্টিওকোসের সাম্রাজ্যের সীমারেখা পর্যন্ত

বিস্তৃত ছিল এবং আধুনিক আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও সিন্ধুদেশ যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই সকল অঞ্চল তথা উহাদের সন্নিহিত উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ

উহার অন্তর্গত ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার যোন, কম্বোজ ও গান্ধার কুল অধীন উপজাতি রূপে বর্ণিত হইয়াছে। কাশ্মীরও অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে হয়। হিউয়েন-সাঙের বর্ণনা এবং কহ্লণের 'রাজতরঙ্গিণী' এবম্বিধ অনুমানের পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ। নেপালের 'তরাই' অঞ্চলও অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রুমিন্‌দেইয়ে প্রাপ্ত স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি উহার প্রমাণ। ত্রয়োদশসংখ্যক শিলালিপিতে অশোক তাঁহার সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলগুলিকে একটি বিশিষ্ট ক্রমে বিন্যস্ত করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে নাভকের নাভপাম্‌তি কুলের উল্লেখ করিয়াছেন। এই নাভপাম্‌তিরা তরাই অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। পূর্ব দিকে মৌর্য সাম্রাজ্য ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া মনে হয়। হিউয়েন-সাঙ্‌ দক্ষিণ বঙ্গের তাম্রলিপ্তিতে ও উত্তর বঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধনে অশোকের স্থাপিত স্তূপ দর্শন করিয়াছেন; তবে তাঁহার সময়ে কামরূপে (আসাম) অশোকের কোন স্তূপ বা স্তম্ভ ছিল না। দক্ষিণ দিকে মৌর্য সীমান্ত পেন্নার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অশোকের পূর্বোল্লিখিত ত্রয়োদশসংখ্যক শিলালিপিতে 'সুদূর দক্ষিণের' তামিল শক্তিবর্গ (যথা, চের, চোল, পাণ্ড্য ও পল্লব রাজ্য) সীমান্ত রাজ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে অনেকগুলি করদ উপজাতিও ছিল—অন্ধ্র, ভোজ, পুলিন্দ ও রাষ্ট্রিক ইত্যাদি। পশ্চিম দিকে অশোকের সাম্রাজ্য আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সৌরাষ্ট্র ছিল অশোকের সামন্তনৃপতি 'যবনরাজ' তুষাস্পের শাসনাধীন।

অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ—কলিঙ্গ যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সংঘটনরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। এই অভিযানের অপরিমেয় দুঃখকষ্ট ও লোকক্ষয় অশোকের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। তিনি তাঁহার অন্যতম শিলালিপিতে বলিয়াছেন—"এইরূপে কলিঙ্গ বিজয়ের জন্য সম্রাটের মনে অনুশোচনার উদয় হইল। কারণ যেই দেশ পূর্বে জিত হয় নাই সেই দেশ জয়ের অর্থ তত্রস্থ জনগণের প্রভূত হত্যা, মৃত্যু ও অসহায় বন্দিদশা। সম্রাটের নিকট উহা প্রবল দুঃখ ও অনুতাপের কারণ হইয়াছে। কলিঙ্গ যুদ্ধে যত লোক নিহত, নিশ্চিহ্ন ও বন্দিরূপে অন্যত্র নীত হইয়াছে, উহার শতাংশের একাংশ অথবা সহস্রাংশের একাংশ মানুষও যদিও এখন অনুরূপ দুর্ভাগ্যের দ্বারা কবলিত হয় তাহা সম্রাটের নিকট সবিশেষ বেদনাদায়ক বলিয়া মনে হইবে।" অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিলেন, তবে সকল সম্প্রদায়ের

মানুষের প্রতিই তাঁহার পূর্বতন প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ অব্যাহত রহিল। তিনি আপনাকে "দেবানাং পিয়" (দেবতাগণের প্রিয়) অভিধায় অভিহিত করিলেন। ব্রাহ্মণগণের প্রতি তিনি উদার মনোভাব ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করিতেন। 'আজীবিক' সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগের ব্যবহারার্থ তিনি বহু মূল্যবান সম্পত্তি দান করেন। তাঁহার অন্যতম শিলালিপিতে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি রাজার সশ্রদ্ধ মনোভাবের কথা উল্লিখিত আছে।

অশোক 'ধম্ম' বা মৈত্রীর একনিষ্ঠ আচরণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া গিয়াছেন। তিনি এইভাবে 'ধম্মের' ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"পিতামাতাকে মান্য করিতে হইবে; প্রাণীসমূহের প্রতি সম্যক্ বিবেচনাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে, সত্য বলিতে হইবে;—এইগুলি হইল মূল কর্তব্যবিধি।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—"পিতামাতার উপদেশ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ পুণ্যকার্য। বন্ধুজনের প্রতি ঔদার্য প্রদর্শন পুণ্যকার্য। মিতব্যয়িতা ও স্বল্পসঞ্চয়প্রয়াস পুণ্যকার্য।" ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, কতকগুলি গোঁড়া মতামত ও ধর্মীয় তত্ত্বকথার উপর জোর দেওয়ার পরিবর্তে অশোক কতিপয় সহজ বিধির চর্যার কথা বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার প্রচারিত নীতি কিছু অভিনব বস্তু নহে, উহা সকল ভারতবর্ষীয় ধর্মেরই মূলীভূত বিষয়। রীজ ডেভিড্স্ বলিতেছেন, 'ধম্ম' বলিতে কখনও সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত ধর্মকে বুঝায় নাই, বরং একজন সম্যক্ অনুভূতিপরায়ণ ব্যক্তির কার্যক্ষেত্রে কী করা উচিত অথবা এক বিচার-বিবেচনা-পূর্ণ মানুষ কর্মক্ষেত্রে কী করিবেন উহারই নির্দেশ 'ধম্মের' বাণীর ভিতর নিহিত আছে। সকল ধর্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন বা ধর্মীয় কূটকথা হইতে উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। স্বভাবতঃই উহা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল—(১) জনসাধারণের পক্ষে কোন্‌টি সঠিক পথ; (২) পরিব্রাজকের পক্ষে কোন্‌টি সঠিক পথ; ও (৩) যাঁহারা 'অর্হৎ' হইবার সাধনা করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে কোন্‌টি সঠিক পথ তাহা নিরূপণ। অশোকের প্রবর্তিত 'ধম্মে' কেবলমাত্র প্রথম পথের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ উহা ভারতে জনসাধারণ বলিতে সচরাচর যাহাদিগকে বুঝায় তাহাদিগেরই আচরিত ধর্ম; তবে বৌদ্ধধর্মাবলম্বিগণ যে আকারে ও যেই যেই পরিবর্তন সহ উহাকে গ্রহণ করিয়াছে সেই আকার উহার কথঞ্চিৎ রূপান্তর ঘটাইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অশোকের শিলালিপিসমূহে প্রচারিত 'ধম্ম' বৌদ্ধ ধর্মকে বাদ দিয়া ঠিক বুঝা সম্ভব নহে।

অশোকের ধর্মবিজয় নীতি—অশোক তাঁহার সাম্রাজ্যসীমার অভ্যন্তরে ও বাহিরে ধর্মশিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি এই সকল শিক্ষানীতি অবিনাশী শিলা ও প্রস্তরস্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। যেখানে যেখানে তিনি এই বাণীগুলি গ্রথিত করিয়াছেন সেই সকল স্থান সবিশেষ বিচার-বিবেচনার পর নির্বাচিত হইয়াছিল এবং বাণীগুলি প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। লিপিগুলির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপদেশাবলীর মধ্যে সম্রাটের ব্যক্তিত্বের স্পর্শ পাওয়া যায়। তিনি এক নূতন শ্রেণীর রাজকর্মচারীর সৃষ্টি করিলেন, তাঁহাদের নাম 'ধর্ম-মহামাত্র'; ধর্মবিধির প্রতি মনোযোগ, ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা দান তাঁহাদের কর্তব্যসীমার অন্তর্ভুক্ত হইল। সম্রাট্ স্বয়ং পুরাতন প্রমোদ-ভ্রমণ ও রাজকীয় শিকার-যাত্রা পরিহার করিয়া 'ধর্মযাত্রায়' বহির্গত হইলেন। এই রাজকীয় কল্যাণ-ভ্রমণসমূহ ধর্মপ্রচারে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা দান করিয়া থাকিবে।

কলিঙ্গজয়ের পর অশোক রাজগণের আচরিত সনাতন দিগ্বিজয়ের নীতি পরিত্যাগ করিলেন এবং তৎপরিবর্তে বৌদ্ধ-আদর্শানুমোদিত 'ধর্মবিজয়ের' নীতি অবলম্বন করিলেন। ষষ্ঠসংখ্যক শিলালিপিতে তিনি বলিতেছেন যে, যুদ্ধের দুন্দুভিনাদ ধর্মের দুন্দুভিনাদে পরিণত হইয়াছে। এই নূতন আদর্শ অনুসারে ভারতের ভিতরে ও বাহিরে সীমান্ত রাজ্য দখলের আর কোনও চেষ্টা তিনি করেন নাই। সৈন্য না পাঠাইয়া তিনি অহিংসার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রচারক পাঠাইতে লাগিলেন।

অশোক তাঁহার ধর্মবিজয়ের আদর্শের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া গিয়াছেন। এই হেতু তাঁহার ধর্মপ্রচার সম্পর্কিত কর্মতৎপরতার ফলাফল আমাদের বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। তাঁহার ধর্মবিজয় অভিযানে 'ধর্মের' উপরই সবটুকু ঝোঁক পড়িয়াছে এবং 'বিজয়' কথাটি নিতান্ত শব্দমাত্রে পর্যবসিত হইয়া উহার বাস্তবতা হারাইয়াছে। ত্রয়োদশসংখ্যক শিলালিপিতে অশোক এইরূপ দাবী করিয়াছেন যে, তিনি শুধু তাঁহার সাম্রাজ্যের মধ্যেই ধর্মবিজয় করেন নাই, পরন্তু সংলগ্ন সীরিয়ার অধিপতি অ্যান্টিওকোস থীওস (Antiochos Theos), মিশরের অধিপতি টলেমী ফিলাডেল্‌ফস্ (Ptolemy II Philadelphos), উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত সাইরিনের রাজা মগস (Magas) ও গ্রীসের এপিরাসের (মতান্তরে করিন্থের) রাজা

আলেকজাণ্ডারের রাজ্যসমূহের মধ্যেও তাঁহার ধর্মাভিযান পরিচালনা করিয়াছেন। উক্ত শিলালিপিতে অধিকন্তু বলা হইয়াছে—যে সকল স্থানে সম্রাটের ধর্মপ্রচারকগণ প্রবেশ করিতে পারেন নাই, সেই সকল অঞ্চলের জনসাধারণও সম্রাটের মৈত্রীভাবনাপ্রসূত অনুশাসন ও নির্দেশসমূহের কথা শ্রবণ করিয়া ধর্মাচরণে প্রবুদ্ধ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে। এই সকল নানা লক্ষণদৃষ্টে বুঝিতে পারা যায় যে, বৌদ্ধ ধর্ম পশ্চিম এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, যদিও গ্রীকদের মধ্যে উহার অগ্রগতি সাধিত হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত কোন প্রমাণ নাই।

অশোক সিংহলে ও সুবর্ণভূমিতে (নিম্ন ব্রহ্ম অঞ্চল) যে সকল ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পরে লিখিত সিংহলী ইতিকথা 'মহাবংশ' ও 'দীপবংশ'-এ উঁহাদের নামোল্লেখ আছে। সিংহলে যুবরাজ মহেন্দ্রের পরিচালিত ধর্মাভিযান সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। তিস্‌সর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম সিংহলে পরিপূর্ণ জয়যুক্ত হয়।

বৌদ্ধ ধর্মসঙ্ঘের সহিত অশোকের সম্পর্ক—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশোক সম্প্রীতির বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তবে বৌদ্ধ ধর্মের পরিচালনসংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি স্বভাবতঃই সমধিক উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অন্যতম শিলালিপিতে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যন্তরে মতসংঘর্ষ রূপ ঘোরতর পাপের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্মের সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার ও মতসংঘর্ষ নিবারণের জন্য তৎকর্তৃক উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। কিংবদন্তী আছে যে, তিনি তাঁহার রাজত্বের সপ্তদশ বৎসরে পাটলিপুত্রে এক বৌদ্ধ সঙ্গীতি (Buddhist Council) আহ্বান করেন। মতসংঘর্ষ নিরোধ এবং যথার্থ বৌদ্ধ নীতিসমূহের সংকলন ঐ অধিবেশন আহ্বানের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি আপনাকে সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং (I-tsing) সম্রাট্‌কে বৌদ্ধ ভিক্ষুবেশে দেখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্মসঙ্ঘের সহিত অশোকের সম্পর্ক ছিল মিত্রভাবাপন্ন ও সহৃদয়। সঙ্ঘ হইতে 'ধর্মবন্ধু' উপাধির দ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করা হয়। কিন্তু ধর্মের কারণে তাঁহার অর্থব্যয়ের কাহিনী কথঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি তিন বার জম্বুদ্বীপ দান করিয়া ফেলিয়া তিন বারই উহা পুনরায় ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন এইরূপ কথিত আছে।

স্বীয় অনন্যসাধারণ পদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন কোন সম্রাটের পক্ষে এবম্বিধ আচরণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

বৈদেশিক নীতি ও আভ্যন্তরীণ শাসনের উপর বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব—বৌদ্ধ ধর্মে অশোকের দীক্ষা তাঁহার বৈদেশিক নীতিতে গুরুতর পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল ; এ বিষয় ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। 'সুদূর দক্ষিণের' চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র ও কেরলপুত্র প্রভৃতি সীমান্ত রাজ্যগুলিকে স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি তাহাদের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিয়াছিলেন। সীরিয়ার সহিত পুরাতন বন্ধুতার নীতি অব্যাহত ছিল।

আভ্যন্তরীণ নীতি সম্বন্ধেও পরিবর্তন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। যজ্ঞার্থে প্রাণীবধ, জীবহিংসা, অসংযত যৌথ উল্লাস এবং অশোভন আচরণাদির তিনি তীব্র নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শের তিনি উদ্গাতা ছিলেন। রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার ও তাঁহার সহজ ধর্মোপদেশের দ্বারা তিনি তাঁহার প্রজাপুঞ্জের নৈতিক ও অর্থ নৈতিক সমুন্নতি বিধানে সচেষ্ট ছিলেন। দূরবর্তী প্রদেশসমূহে কুশাসনের তিনি অবসান ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। অশোক যে সকল শাসনতান্ত্রিক অভিনবত্বের অবতারণা করেন উহাদের মধ্যে ছিল 'যুত' বা 'যুক্ত', 'রাজুক', 'প্রাদেশিক' ও 'মহামাত্র' উপাধিধারী রাজকর্মচারিবৃন্দের তিন বৎসর বা পাঁচ বৎসর অন্তর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া শাসনকার্যের তত্ত্বাবধান রূপ নূতন ব্যবস্থা। বিচারকার্যের ত্রুটি ও দূরবর্তী প্রদেশসমূহে ন্যস্ত ক্ষমতার অপব্যবহার পর্যবেক্ষণ ও সংশোধন করা ছিল 'মহামাত্র'দিগের বিশেষ কাজ। অন্যান্য কর্মচারিগণ ভ্রমণকালে প্রচারকার্যে নিয়োজিত থাকিতেন। 'ধর্মমহামাত্র' নামক এক নূতন শ্রেণীর রাজকর্মচারী 'অহিংসা ও মৈত্রী' ধর্মের প্রচার করিতেন। বিচারকদের প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা ও দণ্ড হ্রাস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক কার্যের ভারও তাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল।

অশোক মনুষ্য ও জীবজন্তু সকলেরই মঙ্গলসাধনে আগ্রহশীল ছিলেন। পশুহত্যা ও পশুক্লেশ নিরোধের উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি নিয়মবিধি প্রচার করিয়াছিলেন। স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ পঞ্চমসংখ্যক শিলালিপিতে পশুবধের বিরুদ্ধে কতকগুলি বিধান উল্লিখিত আছে। 'অর্থশাস্ত্রে'র স্বীকৃত নিষেধ-বাণীগুলির

সহিত এইসকল বিধানের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। অশোক অর্থশাস্ত্রের নিষেধ-গুলিকেই কার্যকরী করিয়া থাকিবেন। তাঁহার রাজত্বকালে মানুষ এবং পশু উভয়েরই জন্য আরোগ্যালয় তথা দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মিত হইয়াছিল। পথি-পার্শ্বে কূপ খনন, বটবৃক্ষের চারা রোপণ, আম্রকুঞ্জ নির্মাণ ইত্যাদি কার্য যত্নপূর্বক করা হইত। ভিক্ষা বিতরণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইত। বস্তুতঃ সকল প্রকারের বদান্যতাই নূতন শাসন-ব্যবস্থায় বিশেষ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্বয়ং রাজার সক্রিয় কর্মে আত্মনিয়োগ কিছু নূতন ব্যাপার নয়, প্রজার মঙ্গলের জন্য রাজা দায়ী এই ধারণাও কিছু অভিনব বস্তু নহে; কিন্তু অশোক এই আদর্শদ্বয়কে এক নূতন শক্তি ও গতিবেগ দান করিয়াছিলেন। বর্তমান জীবনে ও জীবনান্তরে সুখলাভের উপায় রূপে নৈতিক সমুন্নতির উপর সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিয়া তিনি আপামর জনসাধারণকে তাঁহার স্বকীয় আদর্শবাদ ও স্বকীয় কর্মপ্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অশোকের মাহাত্ম্য—অশোকের রাজত্বকালকে "প্রপীড়িত মানব-ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বলতম বিরতিকাল" বলিয়া মনে করা হয়। এক সুবিশাল বিজয়ী সৈন্যবাহিনী ও সুনিপুণ আমলাতন্ত্রের সাহায্যে এই অপরিসীম দক্ষ শাসক 'সুদূর দক্ষিণের' বিজয় অভিযান সমাপ্ত করিতে ও ভারতের বাহিরে বিজয় অভিযান চালাইবার নীতি গ্রহণ করিতে পারিতেন। আলেকজাণ্ডার শতদ্রু নদীর তীরে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভাগ্য তাঁহাকে পূরাপূরি সাফল্য দান করে নাই বলিয়া তিনি ভাগ্যের উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। সীজার তাঁহার বিজিত রাজ্যগুলির সীমান্তসাম্য রক্ষা করিবার প্রয়োজনে টেম্স্ নদী, রাইন নদী, দানিয়ুব নদী ও ইউফ্রেটিস নদীর সীমারেখা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। অশোক এক 'অখণ্ড জম্বুদ্বীপ' গড়িয়া তুলিবার আদর্শকে সহজেই রূপায়িত করিয়া তুলিতে পারিতেন, অথবা বিশ্বজয়ের বাধাবন্ধহীন পরিকল্পনার চিন্তাও তিনি মনের কোণায় স্থান দিতে পারিতেন। কিন্তু অপরে যেখানে সীজারের ন্যায় 'দেখিয়াই রাজ্যজয়'[১] করিয়াছেন, অশোক সেই স্থলে রাজ্যজয় করিয়া তারপর দেখিয়াছেন, অর্থাৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন রাজ্যজয় বলিতে ঠিক কি বস্তু বুঝায়। এই পরাক্রান্ত মানুষটির ত্যাগ ও তিতিক্ষা ইতিহাসে অনন্য।

---

১ "Veni, Vidi, Vici" : "I went, I saw, I conquered"—Julius Caesar.

এই যোদ্ধা ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্ একটি স্থানীয় ধর্মমতকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি গোঁড়া কিংবা অসহিষ্ণু ছিলেন না। তিনি সকল প্রশ্ন ও সমস্যাকে উদার মানবিক দৃষ্টিতে বিচার করিতেন। একজন বিখ্যাত লেখক লিখিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সভ্য প্রভাব বিস্তারে যে সকল ঘটনা সর্বাধিক কার্যকরী হইয়াছে, সম্রাট্ অশোকের ধর্মবিজয় অভিযানসমূহ উহাদের অন্যতম। তাঁহার বদান্যতা ও মহানুভবতার দৃষ্টান্ত তাঁহার তিরোধানের বহুকাল পরেও রাজাদিগের নিকট প্রেরণার উৎস স্বরূপ ছিল।

এই মহান্ অহিংসাধর্মের প্রচারক আগ্রাসী (aggressive) যুদ্ধের ভয়াবহ দুঃখকষ্ট ও হাহাকার সম্বন্ধে আবেগমথিত যে সকল বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন তাহা আজিও আমাদের কর্ণে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি পৃথিবীকে উহার চিরাভ্যস্ত অভিশপ্ত পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার শান্তিবাদ মানব ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করিতে তো পারেই নাই, বরং মৌর্য সাম্রাজ্যকে দুর্বল করিয়া তুলিয়াছিল এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। চন্দ্রগুপ্তের সংগঠিত বিশাল, শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল তাহা আমরা জানি না। যুদ্ধের দুন্দুভিনাদ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। শিকার-ক্রীড়া বর্জিত হইয়াছিল। অহিংসানীতির প্রভাব এতদূর অবধি গড়াইয়াছিল যে বন্য উপজাতিসমূহের মানুষেরা পর্যন্ত ধর্মের শান্ত বাণী ছাড়া আর কিছু শুনিতে পায় নাই। খ্রীস্টপূর্ব ২৩২ অব্দে অথবা উহার কাছাকাছি সময়ে অশোকের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই মৌর্য সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সাম্রাজ্যের কাঠামোয় ভাঙ্গন ধরে, পতনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হইয়া উঠে। 'যবন'দের আক্রমণের ফলে অবস্থা আরও মন্দের দিকে যায়।

এই সকল ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতে যাইয়াও মনে রাখিতে হইবে যে অশোক বাস্তববোধবিবর্জিত নিছক স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন না। তাঁহার আদর্শবাদ সত্ত্বেও জীবনসত্যের সম্মুখীন হইবার মত প্রগাঢ় ইহচেতনা তাঁহার ছিল। তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে তাঁহার ধর্মবিজয়ের পথ অনুসরণ করিতে বলিয়া গিয়াছেন ; জনসাধারণ যাহাতে ধর্মশিক্ষা ও ধর্মচর্যায় দীক্ষিত হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার পরামর্শ ও নির্দেশিত পন্থা গ্রহণ করিবেন কি না এ সম্বন্ধে তাঁহার সংশয়

ছিল। সেই কারণে তিনি তাঁহার নির্দেশবাণীতে এই উক্তি যোগ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঐকান্তিক পরামর্শ সত্বেও যদি রাজ্যজয়ের আদর্শ তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করে তাহা হইলে শান্ত ও করুণার্দ্র চিত্তে তাঁহাদিগকে সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে, প্রকৃত জয়ের আদর্শ তাঁহাদিগকে কোনক্রমেই বিস্মৃত হইলে চলিবে না। তাহা ছাড়া, সমাজ জীবনের নিরাপত্তার জন্য আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নটি অশোক কখনও পরিহার করেন নাই। কেবল, ঐ আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত করিবার জন্য বলপ্রয়োগ প্রয়োজন কি না, প্রয়োজন হইলে কতটা প্রয়োজন—ইহাই তাঁহার বিবেচ্য ছিল। তিনি একজন বাস্তবচেতনাসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন ; কাজেই মৌর্য সাম্রাজ্যের শক্তিক্ষয়ের জন্য তাঁহার শান্তিনীতিকে দায়ী করিয়া যে সকল কথা বলা হয় সেইগুলি অনুমান ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

অশোকের শিলালিপি—অশোকের শিলালিপিগুলি ক্রমানুযায়ী আট শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। উহারা ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। অশোকের সাম্রাজ্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—শিলালিপিগুলির আঞ্চলিক অবস্থিতি হইতে তাহা বুঝা যায়। শিলালিপির ভাষা প্রাকৃত জনের ভাষা ; সংস্কৃত ও পালির সহিত ঐ ভাষার গভীর সৌসাদৃশ্য বর্তমান। সাধারণতঃ ব্রাহ্মী লিপিতে বাণীগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তবে চতুর্দশ শিলালিপির দুইটি অংশে খরোষ্ঠি লিপির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। নিম্নে তাঁহার প্রচারিত কতিপয় শিলালিপির পরিচয় দেওয়া হইল।

১। **ক্ষুদ্র শিলালিপিদ্বয়**—এই দুই শিলালিপির মধ্যে প্রথম শিলালিপিটি অশোকের ব্যক্তিগত ইতিহাস জানিবার পক্ষে মূল্যবান। দ্বিতীয়টিতে 'ধম্ম' বলিতে কি বুঝায় উহার একটি সংক্ষিপ্তসার সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। নিম্নলিখিত জায়গাগুলিতে এই দুই শিলালিপির নকল পাওয়া গিয়াছে—সাহসরাম (বিহারের সাহাবাদ জিলা), রূপনাথ (মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জিলা), বৈরাট (জয়পুর, রাজস্থান), সিদ্ধপুর, জটিঙ্গা-রামেশ্বর ও ব্রহ্মগিরি (এই তিন জায়গাই মহীশূরের চিতলদ্রুগ জিলায় অবস্থিত), মাস্কি (অন্ধ্র রাজ্যের রায়চূড় জিলা), ইয়েরাগুডি (অন্ধ্র রাজ্যের কুর্ণুল জিলা) ও কোপবল (অন্ধ্র রাজ্য)। মাস্কি প্রতিলিপিই বোধ হয় একমাত্র লিপি যাহাতে সম্রাটের ব্যক্তিগত নামের (অশোক) উল্লেখ আছে ; অন্যান্য লিপিগুলিতে কেবলমাত্র তাঁহার উপাধির ('প্রিয়দর্শী') উল্লেখ পাওয়া যায়।

২। **ভাব্রু শিলালিপি** :—ইহাতে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থগুলি হইতে কতকগুলি মূল্যবান উক্তি সংকলিত রহিয়াছে। অশোক যে সত্যসত্যই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এই শিলালিপি তাহার প্রমাণ। ক্ষুদ্র শিলালিপিদ্বয় যে সময়কার রচিত, এই শিলালিপিটিও প্রায় সেই সময়কার রচিত বলিয়া মনে হয়।

৩। **চতুর্দশ শিলালিপি** :—এইগুলিতে অশোকের রাজ্যশাসন ও নৈতিক সংগঠনের আদর্শ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এইগুলি খ্রীস্টপূর্ব ২৫৭ অব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়। নিম্নলিখিত জায়গাগুলিতে উহাদের নকল পাওয়া গিয়াছে—সাবাজগড়্হি (পেশোয়ার জিলা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাকিস্থান) ও মানসেরা (হাজরা জিলা, ঐ), কলসি (উত্তর প্রদেশের দেরাদুন জিলা), গীর্ণার (বোম্বাই রাজ্যের অন্তঃপাতী জুনাগড়ের সন্নিকটে), সোপারা (বোম্বাই রাজ্যের থানা জিলা), ধৌলি (উড়িষ্যার পুরী জিলা), জওগড়া (উড়িষ্যার অন্তর্গত গঞ্জামের সন্নিকটে) ও ইয়েরাগুডি (অন্ধ্র রাজ্যের কুর্ণুল জিলা)।

৪। **কলিঙ্গ শিলালিপিসমূহ** :—কলিঙ্গজয়ের পরবর্তী অশোকের নূতন রাজ্যশাসননীতি এই শিলালিপিগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী উপজাতিগুলির প্রতি কিরূপ আচরণ করা হইবে তাহারও নির্দেশ এইগুলিতে আছে। চতুর্দশ শিলালিপির ধৌলি ও জওগড়া প্রতিলিপিতে এই দুইটি শিলালেখ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংখ্যক শিলালিপির স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

৫। **বিহারের গয়া জিলার অন্তঃপাতী বরাবর পাহাড়ে প্রাপ্ত গুহালিপি** :—ইহাদের মধ্যে তিনটি গুহালিপি 'আজীবিক' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসীদিগের (জৈন দিগম্বর সন্ন্যাসীদিগের পথিকৃৎ) উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। এইগুলি খ্রীস্টপূর্ব ২৫৭-২৫০ অব্দের মধ্যে রচিত বলিয়া মনে হয়।

৬। **'তরাই' অঞ্চলের স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিদ্বয়** :—নেপালের 'তরাই' অঞ্চলে দুইটি স্তম্ভের গাত্রে এই লিপি দুইটি খোদিত রহিয়াছে। ইহাদের একটি বুদ্ধের জন্মস্থান রুমিন্দেইয়ে, অন্যটি নিগ্লিভায় অবস্থিত। দুইটি স্তম্ভই খ্রীস্টপূর্ব ২৪৯ অব্দে সংস্থাপিত হয়। এই শিলালিপিদ্বয়ে

অশোক গৌতম বুদ্ধের পূর্বে যাঁহারা বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন।

৭। **সপ্ত স্তম্ভলিপি (উৎকীরণকাল খ্রীস্টপূর্ব ২৪৩-২৪২ অব্দ) ঃ—** এইগুলিকে চতুর্দশ শিলালিপির পরিপূরক বলা যায়। পূর্বতন উপদেশসমূহ এখানে পুনরুক্ত হইয়াছে, উহাদের উপর নূতন করিয়া জোর দেওয়া হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ অশোক স্তম্ভগুলি দিল্লী, এলাহাবাদ এবং বিহারের চম্পারণ জিলার অন্তঃপাতী লাউরিয়া আরারাজ, লাউরিয়া নন্দনগড় ও রামপূর্বা নামক তিনটি জায়গায় অবস্থিত।

৮। **অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্তম্ভলিপিচতুষ্টয় ঃ—**এই লিপিসমূহের প্রতিলিপি এলাহাবাদ, সাঁচী (মধ্যপ্রদেশ) ও কাশীর নিকটবর্তী সারনাথে পাওয়া গিয়াছে।

অশোকের উত্তরাধিকারিগণ—অশোকের পুত্রগণের মধ্যে কতিপয়ের নাম জানিতে পারা গিয়াছে—কুণাল, জলৌক ও তিবর। তাঁহার পৌত্রগণের মধ্যেও তিন পৌত্রের নাম জানা গিয়াছে—দশরথ, সম্প্রতি ও বিগতশোক। অশোকের মৃত্যুর পর ইঁহাদের ভিতর কে মৌর্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে প্রচুর মতভেদ আছে। সেই সকল মতবৈষম্যের সামঞ্জস্য সাধন সহজ নহে। মৌর্য সম্রাট্‌গণের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বশেষ সম্রাট্ হইলেন বৃহদ্রথ। তিনি তাঁহার সেনাপতি পুষ্যমিত্র কর্তৃক নিহত হন (খ্রীস্টপূর্ব ১৮৭ অব্দ)। এই পুষ্যমিত্রই শুঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ—মৌর্য সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে বিলয়প্রাপ্ত হয়। অশোকের ধর্মীয় নীতির বিরুদ্ধে প্রবল ব্রাহ্মণ্য মতবাদের প্রতিক্রিয়ার ফলেই মৌর্য সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরে এই মত বিচারসহ নহে। তাঁহার বিরুদ্ধে এই জাতীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে এমন কিছুই তিনি করেন নাই। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার কিংবা তাঁহার কোন উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এইরূপ কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। শুঙ্গ বিদ্রোহ নিতান্তই রাজ্য কাড়াকাড়ির ব্যাপার মাত্র। মৌর্যবাহিনীর উপর সেনাপতি পুষ্যমিত্রের গভীর প্রতিপত্তি এই বিদ্রোহের মূল কারণ।

গ্রীক বর্ণনা অনুযায়ী, সুভগসেন নামক রাজা বৃহদ্রথের পতনের বহু পূর্ব

হইতেই কাবুল উপত্যকায় আপনাকে একজন স্বাধীন নরপতি রূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিদর্ভ (বেরার)-ও স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল এইরূপ প্রমাণ আছে। সীরিয়ার অধিপতি অ্যান্টিওকোস (Antiochos the Great) খ্রীস্টপূর্ব ২০৬ অব্দে যখন উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, পরাক্রান্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা তাহার পূর্বেই বহু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। অশোকের দুর্বল উত্তরাধিকারিগণ রাজ্যভার বহনের অনুপযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা যে অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন সেই অবস্থা সামলাইবার মত ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। এই বিষয়ে তাঁহাদের সহিত পরবর্তীকালীন ঔরঙ্গজীবের উত্তরাধিকারিগণের তুলনা করা যাইতে পারে। দূরবর্তী প্রদেশসমূহে কেন্দ্রাতিগ প্রবণতা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শক্তিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া দূরে যাইবার ইচ্ছা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। পুষ্যমিত্র যখন মগধে বিদ্রোহ ঘটাইলেন, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের স্বহস্ত-নির্মিত বিরাট সাম্রাজ্য-সৌধ প্রায় ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সুবিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের একটিমাত্র অংশ পুষ্যমিত্র আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অশোকের অহিংসা নীতিকে দায়ী করেন। রাজ্যশাসনের নীতি রূপে অহিংসার আদর্শকে গ্রহণ করিবার ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি উত্তরোত্তর দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল ইহাই তাঁহাদের অভিমত। সকলপ্রকার যুদ্ধবিগ্রহ পরিহার ও তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণকে তাঁহার অবলম্বিত পন্থা অনুসরণের পরামর্শ দান করিয়া অশোক নিঃসন্দেহে যে সামরিক স্পৃহা মধগকে বড় করিয়াছিল উহার কণ্ঠরোধ করেন এবং যে সৈন্যশক্তির ভিত্তির উপর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল উহার ক্ষতিসাধন করেন। তত্ত্বগত দিক দিয়া এই যুক্তি মূল্যহীন নহে, তবে উহাকেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের একমাত্র কারণ মনে করিলে ভুল করা হইবে; অন্যান্য কারণও ছিল এবং উহাদের অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা কিছু কম ছিল না। যথা, সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তার, আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন-স্পৃহা, যোগাযোগের অসুবিধা এবং দূরবর্তী প্রদেশসমূহে শাসনের বিশৃঙ্খলা।

এইরূপে অন্তর্ধান ঘটিল প্রথম ভারতীয় বিশাল সাম্রাজ্যের—যে সাম্রাজ্য শতাব্দীকাল ভারতকে রাজনৈতিক ঐক্য দান, পরাক্রমশালী বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা, সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই প্রকার ও সুদক্ষ শাসন-

ব্যবস্থার পত্তন, সরকারী কার্যে একটিমাত্র ভাষার (প্রাকৃত) ব্যবহার প্রবর্তন ও বিভিন্ন ভারতীয় ধর্মের অনুগামীদিগের জন্য একটিমাত্র আচরণবিধির প্রচার করিয়াছিল। সুনিপুণ রাজ্যশাসনের ফলে যে ব্যাপক শান্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল উহা সংস্কৃতির উন্নয়নে পূর্ণতর সুযোগদানের সহায়ক হইয়াছিল। ভারতীয় ইতিহাসের এই যে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ঐক্য, উহা মৌর্য সাম্রাজ্যের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

মৌর্য শিল্পকলা—সিন্ধু-উপত্যকায় প্রাপ্ত শিল্পকলার সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহ বাদ দিলে, ভারতীয় শিল্পের প্রাচীনতম ও বিশিষ্টতম নমুনা সকল (যাহা অদ্যাবধি রক্ষিত আছে) মৌর্য যুগে আসিলে পাওয়া যাইবে। স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ শতস্তম্ভযুক্ত একটি হর্ম্যের ধ্বংসাবশেষ পুরাতন পাটলিপুত্রের এলাকা খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু যে আড়ম্বরময় রাজপ্রাসাদসমূহ গ্রীক ও চৈনিক পরিব্রাজকগণের কৌতূহল ও বিস্ময় জাগ্রত করিয়াছিল উহারা বহু পূর্বেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বরাবর পাহাড়ের প্রস্তর-খোদিত 'চৈত্য' ভবন ও তাহাদের মসৃণ প্রাচীরসমূহ এবং সারনাথ ও সাঁচীতে আবিষ্কৃত 'স্তূপ'সমূহের ধ্বংসাবশেষ হইতে মৌর্য যুগের স্থপতিরা কতদূর শিল্পদক্ষতা অর্জন করিয়াছিল উহার কতকটা ধারণা লাভ করা যাইতে পারে। অবশ্য মৌর্য শিল্পের চূড়ান্ত উন্নতি ঘটিয়াছিল ভাস্কর্য-কলায়। এক-প্রস্তর অশোক স্তম্ভগুলি উহাদের সুচিক্কণ অবয়ব ও শিরোদেশ সমেত শুদ্ধমাত্র শিল্পকর্মেরই নহে, যন্ত্রবিদ্যায়ও অপরিসীম বিস্ময়কর দৃষ্টান্তস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। সারনাথ স্তম্ভের শীর্ষস্থিত ত্রিসিংহ মূর্তির কথা বলিতে যাইয়া স্মিথ বলিয়াছেন, প্রাচীন পশুমূর্তির রূপায়ণমূলক ভাস্কর্যকলার ক্ষেত্রে এই চমৎকার শিল্পকর্মটির অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বা উহার সমতুল উদাহরণ যে কোন দেশে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে। এই শিল্পকর্মটিতে বাস্তবধর্মী প্রতিকৃতি অঙ্কনপদ্ধতির সহিত শ্রেষ্ঠ গাম্ভীর্যের সমন্বয় ঘটিয়াছে এবং উহার প্রতিটি খুঁটিনাটি নির্ভুলতার সহিত খোদিত হইয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যায়, মৌর্য-শিল্পকলার চমৎকারিত্ব ও মহিমা একদিনে সম্পাদিত হয় নাই, উহা এক দীর্ঘ ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়ার সুপরিণত পরিণামফল মাত্র। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, সেই কারণে শিল্পকলার ক্ষেত্রে সিন্ধু-উপত্যকা আর পাটলিপুত্রের মধ্যে ধারাবাহিক যোগসূত্র খুঁজিয়া বাহির করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার।

মৌর্য রাজবংশের বংশতালিকা
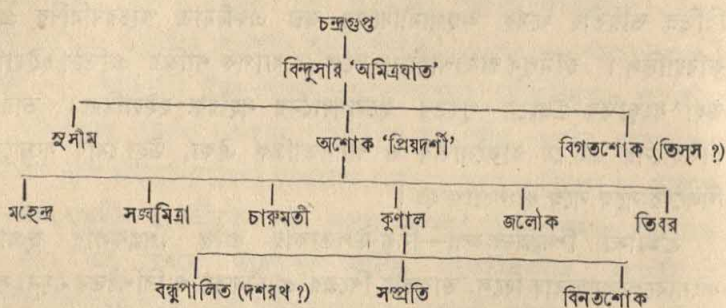
সপ্তম অধ্যায়

মৌর্যোত্তর যুগে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও বৈদেশিক আক্রমণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মগধের প্রভাবহ্রাস

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ—পুষ্যমিত্র শুঙ্গ (আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ১৮৭-১৫১ অব্দ), যিনি মৌর্য রাজবংশের উৎখাত সাধন করিয়া মগধের সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন, একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। সেই সকল দিনে ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে শিক্ষকের বেত্রদণ্ড ত্যাগ করিয়া সৈনিকের অসি ধারণ কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। আয়তনের দিক দিয়া অশোকের বিশাল সাম্রাজ্য অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রতর সাম্রাজ্যের উপর পুষ্যমিত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। শুঙ্গ রাজ্যের সীমা পাটলিপুত্র হইতে নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং অযোধ্যা ও বিদিশা নগরী উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ পুষ্যমিত্র

পঞ্জাবের জলন্ধর ও শিয়ালকোটের উপরেও শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মৌর্য রাজবংশের পতনের পর যে বিশৃঙ্খলার সূচনা হয়, সেই সুযোগে বিদর্ভে (বেরার) একটি স্বাধীন শাসন-এলাকার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তবে পুষ্যমিত্র যুদ্ধ জয়ের দ্বারা বেরারের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে, কলিঙ্গরাজ খারবেল পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্বকালে মগধ আক্রমণ করিয়া পুষ্যমিত্র শুঙ্গকে পরাজিত করেন। খারবেলের হাতীগুম্ফা শিলালিপির কয়েকটি অস্পষ্ট অনুচ্ছেদের অনিশ্চিত ব্যাখ্যার উপর এই মত প্রতিষ্ঠিত। খুব সম্ভবতঃ খারবেল পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন না।

পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক বিখ্যাত বৈয়াকরণ পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে এক গ্রীক আক্রমণের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 'যবন'গণ অর্থাৎ গ্রীকগণ সাকেত (অযোধ্যা) ও মাধ্যমিকা নগরী (চিতোরের সন্নিকটে ?) অবরোধ করে। খুব সম্ভব মাগধীয় বাহিনী কর্তৃক উহারা প্রতিহত হয়। এই গ্রীক আক্রমণের নায়ক কে ছিলেন ভারতীয় সাহিত্যে তাহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীক সূত্রেও নির্ভরযোগ্য ইঙ্গিত বিশেষ মিলে না। তবে কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিকের ধারণা, গ্রীক বীর মিনান্দারই (Menander) ছিলেন এই নায়ক। আবার কেহ কেহ মিনান্দারের পরিবর্তে ডেমেট্রিয়সের (Demetrios) নাম অনুমান করিয়া থাকেন।

পুষ্যমিত্র দুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বিদর্ভ এবং গ্রীক যবনদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভের দ্যোতক রূপেই তিনি ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের গোঁড়া অনুগামী ছিলেন। পরবর্তী বৌদ্ধ লেখকগণ তাঁহাকে বৌদ্ধধর্মের উৎপীড়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের বর্ণনা যথাযথ বলিয়া নিঃসন্দেহে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না।

পরবর্তী শুঙ্গগণ—পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই অগ্নিমিত্রই হইলেন কালিদাসের নাটক 'মালবিকাগ্নিমিত্র'-এর নায়ক। অগ্নিমিত্র তাঁহার পিতার রাজত্বকালে বিদিশার ভারপ্রাপ্ত শাসক ছিলেন, বিদর্ভের বিরুদ্ধে তিনিই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য জানা যায় না।

তবে এইমাত্র জানিতে পারা গিয়াছে যে, তাঁহাদের অন্যতম ভগভদ্রের রাজসভায় তক্ষশিলার তদানীন্তন গ্রীক রাজা অ্যান্টিয়ালকিডাস (Antialkidas) এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই গ্রীক দূতের নাম হেলিওডোরাস (Heliodoros)। তিনি ভাগবত (বৈষ্ণব) ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং বিদিশায় বা বেশনগরে একটি 'গরুড় স্তম্ভ' স্থাপন করিয়া যান। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের বাহ্লীক দেশীয় গ্রীকগণ (Bactrian Greeks) ভারতীয় শাসকগণের সহিত বন্ধুতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। একজন গ্রীক দূতের ভারতীয় ধর্মের প্রতি অনুরাগ হইতে প্রতীয়মান হয় যে গ্রীকগণ ক্রমশঃ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবাধীন হইয়া উঠিতেছিল।

কাণ্ব রাজবংশ—পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী শুঙ্গগণ ১১২ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। খ্রীস্টপূর্ব ৭৫ অব্দে বা ঐ বৎসরের কাছাকাছি সময়ে শুঙ্গ রাজবংশের শেষ নরপতি দেবভূতি তাঁহার মন্ত্রী বসুদেব কর্তৃক নিহত হন। বসুদেব সিংহাসন দখল করিয়া কাণ্ব বা কাণ্বায়ন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের চারিজন রাজা সর্বসাকল্যে ৪৫ বৎসর কাল মগধের সিংহাসনে রাজত্ব করেন।

খ্রীস্টপূর্ব ৩০ অব্দে বা উহার কাছাকাছি সময়ে কাণ্ব রাজবংশের শাসনের অবসান হয়। কাণ্ব রাজবংশের পতন ও খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত রাজবংশের অভ্যুদয়ের মধ্যবর্তী সময়ের ইতিহাস নির্ণয় করা আজ অতি সুকঠিন ব্যাপার। দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন রাজগণ পূর্ব-মালবে কাণ্বদিগের পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন এইরূপ অনুমিত হয়। তবে তাঁহারা মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাম্রশাসনাদির সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, কতিপয় 'মিত্র' বংশীয় রাজা মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন ; তবে শুঙ্গ বা কাণ্ব রাজগণের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক কি ছিল জানা যায় না। 'মিত্র' রাজগণের পরে সম্ভবতঃ শক বংশীয় 'মুরুণ্ড'গণ ও তাঁহাদের নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসকগণ পাটলিপুত্রে এবং মথুরায় রাজত্ব করেন। তাঁহাদের পরে নাগবংশীয় ও গুপ্তবংশীয় রাজগণ সিংহাসন অধিকার করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ

কলিঙ্গের চেত রাজবংশ—অশোকের মৃত্যুর পর কলিঙ্গের ইতিহাস অস্পষ্টতার কুয়াশায় আচ্ছন্ন। সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এই অঞ্চলে চেত বা চেতি রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে। এই রাজবংশ সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু জ্ঞান তাহা এই বংশের তৃতীয় রাজা খারবেলের সমকালীন হাতীগুম্ফা শিলালিপি হইতে আহৃত। শিলালিপিতে বংশের প্রথম দুইজন রাজার নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না, এবং খারবেলের রাজত্বকালের ত্রয়োদশতম বৎসরে শিলালিপিটি প্রচারিত হওয়ায় তাঁহার রাজত্বের শেষ বৎসরগুলিরও কোন বিবরণ উহাতে নাই। ঠিক কোন সময়ে উহা প্রচারিত হইয়াছিল তাহা জানা না গেলেও উহাতে উল্লিখিত কয়েকটি শব্দ হইতে বুঝা যায় যে উহা নন্দ-শাসন বিলুপ্ত হইবার ৩০০ বৎসর (মতান্তরে ১০৩ বৎসর) পরে প্রচারিত হইয়াছিল। এই হিসাব অনুযায়ী, খারবেল প্রথম অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

হাতীগুম্ফা শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায়, গণিত, ব্যবহারশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্রসমেত নানা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণান্তে যুবরাজ খারবেল কলিঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কলিঙ্গ নগর ছিল তাঁহার রাজধানী। সাতবাহন বংশীয় রাজা শাতকর্ণিকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং রথিক ও ভোজক-গণকে তাঁহার নিকট নতি স্বীকারে বাধ্য করেন। দুইবার তিনি উত্তর ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন ; তাঁহার আক্রমণে মগধের অধিবাসিগণ ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে, মগধের রাজা (নাম অনিশ্চিত) তাঁহার পদানত হন। তিনি দক্ষিণ ভারতেও অভিযান পরিচালনা করেন এবং পাণ্ড্য রাজগণকে অবদমিত করেন। তাঁহার চমকপ্রদ শাসনকালের শেষ বৎসরগুলির বিবরণ আমাদের নিকট অজ্ঞাত, তাঁহার মৃত্যুর ঠিক পরে কলিঙ্গের অবস্থা কি হইয়াছিল সে বিষয়েও আমাদের কিছু জানা নাই।

মহারাষ্ট্রের সাতবাহনগণের অভ্যুদয়—মহারাষ্ট্রের সাতবাহন বংশীয় রাজগণের সম্বন্ধে পুরাণে পরস্পরবিরুদ্ধ মত সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। এক মত অনুযায়ী, তাঁহারা সার্ধ চারি শতাব্দী কাল রাজত্ব করেন। বর্তমানের কোন কোন পণ্ডিত এই মত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা সাতবাহন রাজশক্তির সূচনাকাল খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষপাদ বলিয়া চিহ্নিত করেন। তাঁহাদের মতে খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এই বংশের পতন হয়। কিন্তু এই মত গ্রহণ করা কঠিন। কারণ পুরাণের অন্য এক বিবরণ অনুসারে, সাতবাহন বংশীয়দিগের রাজত্বকাল তিনশত বৎসর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অন্য এক পৌরাণিক বর্ণনা অনুযায়ী, সাতবাহন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুক 'শুঙ্গ রাজশক্তির ক্ষীণাবশেষকে উন্মূলিত করিয়া পৃথিবীভোগের অধিকার লাভ করেন।' এই তৃতীয় মতটিই সমধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। কাজেই তাঁহার রাজত্বকাল খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইলেই সঠিক গণনা হয়।

পুরাণাদিতে সাতবাহনদিগকে 'অন্ধ্র' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গোদাবরী নদী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী তেলেগু দেশে অন্ধ্রগণ বাস করিত। বৈদিক সাহিত্যে অন্ধ্রদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের খণ্ড-বিবরণ এবং অশোকের শিলালিপিসমূহের ভিতরও তাহাদের উল্লেখ আছে। কিন্তু সাতবাহনগণ অন্ধ্র জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, এইরূপ অনুমানের পক্ষে প্রমাণ আছে। তাঁহারা সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদিগের রক্তের সহিত কিছুটা নাগবংশীয় রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়া থাকিবে। তাম্রশাসন ও শিলালিপিগুলিতে তাঁহারা ব্যতিক্রমবিহীন ভাবে সর্বদা আপনাদিগকে 'সাতবাহন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 'অন্ধ্র' নামের উল্লেখ কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যাহা-কিছু প্রাথমিক নজীর-প্রমাণ সবই মধ্য-ভারত ও উত্তর দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে ; উহাদের কোনটাই অন্ধ্র অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ 'অন্ধ্র' নাম পরবর্তী কালে (অর্থাৎ যখন হইতে তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধিকার কৃষ্ণা নদীর মোহানায় অবস্থিত জনপদে মাত্র সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে) তাঁহাদের প্রতি প্রযুক্ত হয়।

সাতবাহন বংশের তৃতীয় রাজা শাতকর্ণি ব্যাপক রাজ্যজয়ের দ্বারা বংশের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব-মালব জয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। প্রতিষ্ঠান নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। বোম্বাই

রাজ্যের অন্তর্গত গোদাবরীর উত্তর তীরস্থিত বর্তমান পৈঠানই এই প্রতিষ্ঠান। কলিঙ্গরাজ খারবেলের হস্তে যে সাতবাহনবংশীয় রাজার পরাজয় ঘটে ইনিই সম্ভবতঃ সেই রাজা।

শাতকর্ণির উত্তরাধিকারিগণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য জানা যায় না। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে ক্ষহরাট (Kshaharatas) নামক পশ্চিম-ভারতে শাসনক্ষমতা বিস্তারকারী শক শাসকদিগের এক শাখা সাতবাহনদিগের নিকট হইতে মহারাষ্ট্রের কতকাংশ ছিনাইয়া লন। সাতবাহনগণ সম্ভবতঃ তাঁহাদের রাজ্যের দক্ষিণাংশে তাঁহাদের শাসন কেন্দ্রীভূত করেন।

সাতবাহন রাজবংশের গৌরবের যুগ—সাতবাহন রাজবংশের ক্ষমতা গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি কর্তৃক পুনরুজ্জীবিত হয়। তিনি পরাক্রান্ত শক শাসক নহপানকে পরাজিত করেন। শকগণ, যবনগণ অর্থাৎ গ্রীকগণ ও পহ্লবগণ (Parthians) তৎকর্তৃক বিতাড়িত হয়। তাঁহার রাজ্য কেবলমাত্র মহারাষ্ট্র ও পৈঠানের চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না ; উত্তর কোঙ্কন, সৌরাষ্ট্র, বেরার ও মালবেও তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এমন কোনও প্রমাণ নাই যাহার বলে বলিতে পারা যায় তিনি অন্ধ্র দেশ ও দক্ষিণ কোশলেও রাজত্ব করিয়াছিলেন। কতিপয় আধুনিক পণ্ডিতের মতানুসারে, তিনি ১০৬ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্ততঃপক্ষে চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তদানীন্তন একটি শিলালিপিতে তাঁহাকে সমাজ-সংস্কারক রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বর্ণনাটি এই—"তিনি ক্ষত্রিয়দিগের গর্ব ও অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছিলেন, দ্বিজগণের ও শূদ্রগণের স্বার্থ সংবর্ধন করিয়াছিলেন এবং চারি বর্ণের ভিতর মিশ্রণজনিত কলুষ রুদ্ধ করিয়াছিলেন।"

তাঁহার মৃত্যুর পর বাশষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী (আনুমানিক ১৩০-১৫৪ খ্রীস্টাব্দ) সাতবাহন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম সাতবাহন রাজা, যিনি অন্ধ্র দেশে তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার শাসনশক্তি একদিকে করোমণ্ডল উপকূল, অন্য দিকে বর্তমান মধ্য প্রদেশের কোন কোন অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া মনে হয়। আধুনিক কালের কোন কোন ইতিহাসকারের ধারণা, তিনি তাঁহার শ্বশুর পরাক্রান্ত শক শাসক রুদ্রদামন কর্তৃক দুই-দুই বার পরাজিত হইয়াছিলেন।

যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি (আনুমানিক ১৬৫-১৯৪ খ্রীস্টাব্দ) সাতবাহন বংশের শেষ

পরাক্রান্ত নৃপতি। সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রদেশ উভয় দেশেই তিনি রাজত্ব করিতেন। তিনি রুদ্রদামনের বংশধরদের নিকট হইতে উত্তর কোঙ্কন পুনরধিকার করিয়া লন। মুদ্রাঘটিত প্রমাণ হইতে দেখা যায়, তিনি সামুদ্রিক বাণিজ্য ও নৌ-যুদ্ধবিদ্যায় উৎসাহশীল ছিলেন।

সাতবাহনগণের পতন—যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণির মৃত্যুর পর হইতে সাতবাহনদিগের শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। আভীরগণ খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাষ্ট্র দখল করিয়া লয়। পরবর্তীকালীন সাতবাহনগণ পূর্ব-দাক্ষিণাত্য ও কানাড়ীভাষী অঞ্চলে রাজত্ব করিতে থাকেন। ঐ দুই অঞ্চল শেষ পর্যন্ত ইক্ষ্বাকুগণ ও পহ্লবগণের অধিকারে আসে।

মধ্যভারতের বাকাটকগণ—শুঙ্গ, কাণ্ব ও সাতবাহনদিগের ন্যায় মধ্য ভারতের বাকাটকগণও ছিলেন ব্রাহ্মণ। সম্ভবতঃ তাঁহারা বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন। খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকের তৃতীয় পাদে তাঁহাদের শক্তির সূচনা হয়। এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা হইলেন বিন্ধ্যশক্তি। পুরাণে তাঁহাকে বিদিশার (ভূপালের সন্নিকটস্থ বর্তমান ভিলসা) অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার পুত্র প্রথম প্রবরসেন চারিটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন ও প্রভূত শক্তির দ্যোতক রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন। বুন্দেলখণ্ড হইতে মহীশূরের সীমা পর্যন্ত শাসনক্ষমতাবিস্তারকারী প্রথম পৃথ্বীসেন সম্ভবতঃ গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের অভিযানসমূহের বিবরণ প্রদানকারী বিখ্যাত এলাহাবাদ শিলালিপিতে বাকাটকগণের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মনে হয় যুদ্ধজয়ের ফলে সমগ্র মধ্য ভারত সমুদ্রগুপ্তের শাসনাধীনে চলিয়া আসিয়াছিল এবং বাকাটকগণ একটি দক্ষিণ ভারতীয় শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য তাঁহার অন্যতরা কন্যা প্রভাবতী গুপ্তাকে বাকাটকরাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের হস্তে সমর্পণ করেন। এই বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা তিনি বাকাটকগণের মিত্রতাপূর্ণ আনুগত্য লাভ করেন। পশ্চিম ভারতের শকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই মৈত্রী গুপ্ত সম্রাটের বিশেষ কাজে আসিয়াছিল। কারণ স্মিথ বলিতেছেন, "বাকাটক মহারাজা এমন এক সুবিধাজনক ভৌগোলিক এলাকায় রাজত্ব করিতেন যেখান হইতে তিনি ইচ্ছামাত্রে গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের শক শাসকদিগের রাজ্য-আক্রমণকারী উত্তর-ভারতীয় যে কোন রাজার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সবিশেষ সহায়কও হইতে পারিতেন,

আবার অন্তরায়ও হইতে পারিতেন।" বাকাটক রাজবংশের শেষ বড় রাজা হইলেন হরিসেন, তিনি খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি মালব, দক্ষিণ কোশল (পূর্ব মধ্যপ্রদেশ), কলিঙ্গ, অন্ধ্রদেশ, কানাড়ীভাষী অঞ্চল ও লাট (দক্ষিণ গুজরাট) প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপক যুদ্ধজয়ের গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলচুরি ও কদম্বগণ কর্তৃক বাকাটক বংশের শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

পল্লবগণের আদি ইতিহাস—প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের যে সকল বিষয়ের অদ্যাবধি কোন মীমাংসা হয় নাই, পল্লবগণের আদিকথা সেই সকল বিষয়ের অন্যতম। পল্লবগণ ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের পহ্লবগণ (the Parthians) অথবা বাহ্লীকদেশীয় গ্রীকগণের (the Bactrian Greeks) সহিত সংশ্লিষ্ট এক বৈদেশিক আক্রমণকারী জাতি—এই মত নিছক তুচ্ছ নাম-সাদৃশ্যের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে, সুতরাং উহা অবলীলায় অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে। অন্য এক মত অনুসারে, পল্লবগণ হইল চোল-নাগ বংশসম্ভূত; সুদূর দক্ষিণে ও সিংহলে তাহাদের আদিবাস ছিল। কিন্তু এই মত স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না, কেননা চোলদিগের সহিত পল্লবদিগের চিরন্তন বৈরিতা ছিল, এবং পল্লবদিগের সংস্কৃতি ছিল একান্তভাবেই উত্তরাঞ্চলীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য চিহ্ন মণ্ডিত। পল্লব রাজগণ গোড়ায় তাঁহাদের সরকারী কাগজপত্রে প্রাকৃত ব্যবহার করিতেন, সংস্কৃত ভাষার তাঁহারা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহারা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সকল তথ্যের সহিত পল্লবদিগের ব্রাহ্মণত্বের দাবী একত্র মিলাইয়া দেখিলে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত উত্তরাঞ্চলের কোন জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

পল্লব রাজগণের আদিতম ঘোষণাপত্রগুলি খ্রীস্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর রচনা বলিয়া অনুমিত হয়। এই বংশের প্রথম বিখ্যাত রাজা হইলেন শিব-স্কন্দ-বর্মন, তিনি এক বৃহৎ রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন এবং অশ্বমেধ ও অন্যান্য বৈদিক যজ্ঞাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন। পল্লবদিগের রাজধানী ছিল কাঞ্চী (কাঞ্চীপুরম্)। সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারত আক্রমণ করিলে কাঞ্চীর পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপ পরাজিত হন ও গুপ্ত আধিপত্য মানিয়া লইতে বাধ্য হন। পল্লবদিগের খ্রীস্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর ইতিহাস নিতান্ত অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন। সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ কয়েকটি সনন্দ-পত্রে কতিপয় রাজার নাম দেখিতে

পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের শাসনঘটিত ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

সুদূর দক্ষিণের রাজবংশসমূহ: চোলগণ, পাণ্ড্যগণ ও চেরগণ সুদূর দক্ষিণের স্থায়ী অধিবাসী ছিল। পেন্নার ও ভেল্লার এই দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ চোল দেশ। বর্তমান তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপলি জিলা এবং পূর্বতন দেশীয় রাজ্য পুদুকোট্টাইয়ের কতকাংশ লইয়া চোল দেশ গঠিত ছিল। আমরা চোল রাজগণের সম্বন্ধে প্রথম ঐতিহাসিক নজীর-প্রমাণ দেখিতে পাই অশোকের ঘোষণাসমূহের ভিতর। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এলারা নামক এক চোল রাজা সিংহল জয় করিয়াছিলেন এবং তথায় বেশ কিছুকাল রাজত্ব করেন। চোল দেশ সম্বন্ধে বহুবিধ কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যের আকর হইল *Periplus of the Erythrean Sea* (রচনাকাল আনুমানিক ৬০ খ্রীস্টাব্দ) নামক গ্রন্থখানি। টলেমীর সুপরিচিত ভূগোল-গ্রন্থ (আনুমানিক খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত) হইতেও বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করা যায়। খ্রীস্টীয় তৃতীয় (মতান্তরে চতুর্থ) শতাব্দীতে পল্লবদিগের অভ্যুত্থান এবং পাণ্ড্য ও চেরগণের আক্রমণাত্মক অভিযান প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে চোলদিগের শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি দিকে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি চোল দেশে উপনীত হইয়া তথায় বনজঙ্গল ছাড়া আর কিছু দেখিতে পান নাই। এককালীন সমৃদ্ধ চোল দেশ তাঁহার নিকট পরিত্যক্ত ও বন্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। চোল দেশে তখন কে রাজা ছিলেন হিউয়েন-সাঙ্ তাহার উল্লেখ করেন নাই, তবে তিনি লিখিয়াছেন যে, চোল রাজ্যের তদানীন্তন অধিবাসী-সংখ্যা খুবই অকিঞ্চিৎকর ছিল এবং সৈন্য ও দস্যুদল দেশের ভিতর অবাধে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। হৃতশক্তি চোলদিগের ক্ষমতা আবার ফিরিয়া আসে নবম শতাব্দীতে।

পাণ্ড্য দেশ বর্তমান মাদুরা, রামনাদ, তিনেভেলী ও ত্রিবাঙ্কুরের দক্ষিণাংশ লইয়া গঠিত ছিল। 'দাক্ষিণাত্যের মথুরা' মাদুরা শহর পাণ্ড্যগণের রাজধানী ছিল। রাজ্যের প্রধান বন্দর ছিল—কোরকাই (তিনেভেলী জিলার অন্তর্গত) ও কায়ল।

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই ভারতীয় সাহিত্যে পাণ্ড্য রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে

পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিস পাণ্ড্য রাজ্য সম্বন্ধে কতকগুলি কৌতূহলপ্রদ কাহিনীর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ অনুযায়ী পাণ্ড্য রাজ্য নারীশাসিত ছিল। অশোক তাঁহার এক ঘোষণা-বাণীতে পাণ্ড্য রাজ্যের অধিবাসিগণকে তাঁহার সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমার অপর প্রান্তবর্তী এক স্বাধীন জাতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কলিঙ্গরাজ খারবেলের দাবী অনুযায়ী, পাণ্ড্যরাজ তাঁহার পদানত হইয়াছিলেন। এক পাণ্ড্য নৃপতি খ্রীস্টপূর্ব ২০ অব্দে প্রসিদ্ধ রোমক সম্রাট অগাস্টাসের দরবারে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর সূচনার পূর্ব পর্যন্ত পাণ্ড্যদিগের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতিশয় সীমাবদ্ধ বলিতে হইবে।

চের রাজ্য মোটামুটি এই কয়টি অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল—বর্তমান মালাবার ও কোচিন জিলা এবং ত্রিবাঙ্কুরের উত্তরাংশ। রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে দুইটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল—মুজিরিস (বর্তমান ক্র্যাঙ্গানোর) ও বৈক্কারই। উভয় বন্দরেই জোর বৈদেশিক বাণিজ্য চলিত।

আমরা চেরগণ সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ পাই অশোকের একটি ঘোষণায়। উহাতে তিনি কেরলপুত্রদিগকে দক্ষিণের এক স্বাধীন জাতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পূর্বোক্ত *Periplus* ও টলেমীর ভূগোল-গ্রন্থেও চের দেশের উল্লেখ রহিয়াছে ; কিন্তু উহার রাজনৈতিক ইতিহাস অস্পষ্টতায় আবৃত। তামিল সাহিত্যে সেনগুত্তুবন নামক এক চের নৃপতির বীরত্বব্যঞ্জক ক্রিয়াকলাপের অতিরঞ্জিত বিবরণ সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। তিনি সুদূর হিমালয়-সীমা পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া উহার পর অনেককাল চের দেশ কখনও পাণ্ড্যদিগের কখনও চোলদিগের অধীনতাপাশে বদ্ধ ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈদেশিক আক্রমণ

মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ভুক্তি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এক রাজদণ্ডের অধীনে সমগ্র ভারতের একীকরণের পথে ইহা এক অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে মগধ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে এই রাষ্ট্রীয় সংযোগ অশোকের মৃত্যুর পর আর খুব বেশীকাল স্থায়ী হয় নাই বলিয়া মনে হয়। কারণ সিরিয়ার অধিপতি আন্টিয়োকসের (খ্রীস্টপূর্ব ২০৬ অব্দ) আক্রমণের পূর্বেও সুভগসেন নামক একজন ভারতীয় রাজা গান্ধার দেশে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারত পর পর একাধিক বৈদেশিক জাতির শাসনাধীনে আসে এবং ভারতের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

বাহ্লীকদেশীয় গ্রীকগণের অভ্যুদয়ঃ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর ফলে সেলুকস যে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে উহার প্রভাব ক্ষীয়মাণ হইতে আরম্ভ করে। পার্থিয়া (খুরাসান ও কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল) ও ব্যাক্ট্রিয়া (বাহ্লীক দেশ, অর্থাৎ হিন্দুকুশ পর্বত ও অক্সাস নদের মধ্যবর্তী অঞ্চল) প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ব্যাক্ট্রিয়া বা বাহ্লীক দেশ ছিল এশিয়ায় গ্রীক সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র।

বাহ্লীক দেশের তৃতীয় স্বাধীন রাজা ইউথাইডেমস্ (Euthydemos) সিরিয়ার অধিপতি সেলুকসবংশীয় অ্যান্টিয়োকসের (Antiochos the Great) সমসাময়িক ছিলেন। দীর্ঘ সংগ্রামের অন্তে অ্যান্টিয়োকস ইউথাইডেমসের স্বাধীনতা স্বীকার করেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহার কন্যাকে ইউথাইডেমসের পুত্র ডেমেট্রিয়াসের হস্তে প্রদান করেন। সিরিয়ার অধিপতির ভারত-সীমান্ত হইতে চলিয়া যাইবার পর (খ্রীস্টপূর্ব ২০৬ অব্দ) ইউথাইডেমস আফগানিস্থানের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করেন। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে তাঁহার মৃত্যু হইলে ডেমেট্রিয়স তাঁহার স্থলে রাজা হন। ডেমেট্রিয়স পঞ্জাবের এক বৃহৎ অংশ

অধিকার করিয়াছিলেন। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিকের ধারণা, পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্বকালে যে 'যবন' অধিপতি উত্তর ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন ইনিই সেই ব্যক্তি। ডেমেট্রিয়স যখন ভারতের অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালনায় নিরত ছিলেন, ইউক্রেটাইডিস (Eukratides) নামক একজন গ্রীক সেনাপতি বাহ্লীক দেশ দখল করিয়া বসেন। ডেমেট্রিয়স বাহ্লীক দেশে তাঁহার ক্ষমতা আর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার শক্তি সিন্ধু-উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং তিনি 'ভারতীয়দের রাজা' এই নামে পরিচিত হন। তাঁহার রাজধানী ছিল ইউথাইডেমিয়া (Euthydemia) বা শাকল (পশ্চিম পঞ্জাবের শিয়ালকোট)। তিনিই প্রথম গ্রীক রাজা যিনি দ্বিভাষিক মুদ্রার প্রচলন করেন। ঐ মুদ্রায় গ্রীক ভাষায় এবং ভারতীয় ভাষায় খরোষ্ঠী লিপিতে নানা কাহিনী সংবদ্ধ ছিল।

মিনান্দার: মুদ্রাদি হইতে কতিপয় বাহ্লীক দেশীয় গ্রীক অধিপতির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ কিছু জানা যায় না। উত্তর-পশ্চিম ভারতের শ্রেষ্ঠ গ্রীক অধিপতি রূপে পরিচিত মিনান্দার ইউথাইডেমসের বংশের রাজা ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সঠিক বৃত্তান্ত নিরূপণ করা কঠিন। মিনান্দার পরাক্রান্ত শাসক ছিলেন। স্ট্রাবো বলিতেছেন যে, মিনান্দার আলেকজাণ্ডারেরও অপেক্ষা অধিকসংখ্যক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা পশ্চিমে কাবুল ও পূর্বে মথুরা, এমন কি বুন্দেলখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের নানা স্থানে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। *Periplus* গ্রন্থ রচনার কালে (আনুমানিক ৬০ খ্রীস্টাব্দে) তাঁহার প্রচারিত মুদ্রা পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলিতে প্রচলিত ছিল। প্লুটার্ক তাঁহাকে বহু নগরের শাসক রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কতিপয় আধুনিক পণ্ডিতের মতে, মিনান্দারই হইলেন সেই 'যবন' আক্রমণকারী, পুষ্যমিত্র শুঙ্গ যাঁহার আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' (মিলিন্দের প্রশ্ন) নামক প্রসিদ্ধ পালি গ্রন্থে উল্লিখিত রাজা মিলিন্দ বলিয়া মনে করেন। তিনি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল শাকল (বর্তমান শিয়ালকোট)। শাকল ছিল কঠিন রক্ষা-প্রাচীর-বেষ্টিত সুদৃশ্য হর্ম্যাবলীশোভিত এক সমৃদ্ধিশালী নগরী।

বাহ্লীক দেশীয় গ্রীক রাজগণের পতন: বাহ্লীক দেশীয় গ্রীক রাজগণের মধ্যে ঐক্য ছিল না। ইউথাইডেমসের বংশ

আর ইউক্রেটাইডিসের বংশের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। বাহ্লীক দেশে (Bactria) ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পর ইউক্রেটাইডিস কাবুল উপত্যকা, গান্ধার ও পঞ্জাবের পশ্চিম অংশ জয় করেন। খ্রীস্টপূর্ব ১৫৫ অব্দে বা উহার কাছাকাছি সময়ে সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী হেলিয়োক্লেসের (Heliokles) দ্বারা নিহত হন। হেলিয়োক্লেসের মৃত্যুর পর শকগণ বাহ্লীক দেশ দখল করেন এবং ইউক্রেটাইডিসের বংশের পরবর্তী রাজগণ আফগানিস্থান ও পশ্চিম পঞ্জাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহাদের অন্যতম অ্যান্টিয়ালকিডাস (তক্ষশিলার অধিপতি রূপে অভিহিত) মধ্যভারতের শুঙ্গরাজ ভগভদ্রের সভায় হেলিওডোরস নামক এক দূত প্রেরণ করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের শেষ গ্রীক রাজা হইলেন হারমেইয়স (Harmaios)। তিনি খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ রাজা প্রথম কাদফাইসেস বা কদফিস (Kadphises I) কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন।

উত্তর ভারতে শক শাসন: খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইউচি (the Yueh-chis) জাতির পশ্চিমাভিমুখী অগ্রাভিযান যাযাবর শকদিগকে তাহাদের সির দরিয়া নদীর উত্তর তীরস্থ অঞ্চলের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দিকে সরিয়া যাইতে বাধ্য করে। শকগণ বাহ্লীক দেশ ও পার্থিয়া বা পহ্লব দেশ দখল করে। দ্বিতীয় মিথরিডেটস (Mithridates II)-এর অধীনে পহ্লবগণের শক্তির পুনরুজ্জীবনের (খ্রীস্টপূর্ব ১২৩-১৮৮ অব্দ) ফলে শকগণ সিস্তানের অভিমুখে অপসরণ করিতে বাধ্য হয়। তাহারা আর পঞ্জাবের অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারে না, কারণ মধ্য এশিয়া এবং ভারত-সীমান্তের মধ্যে ইউক্রেটাইডিস-এর বংশধরগণ কর্তৃক শাসিত রাজ্য একটি অন্তরায়রূপে দণ্ডায়মান ছিল। অতঃপর তাহারা দক্ষিণ আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া নিম্ন-সিন্ধু উপত্যকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমশঃ তাহারা ভারতের অভ্যন্তরে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং কতিপয় অঞ্চলে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করে।

ভারতীয় শিলালিপিসমূহে উল্লিখিত আদিতম শক শাসকদিগের অন্যতম হইলেন ময়েস বা মোগ (Maues, Moga)। তাঁহার রাজত্বকাল বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন সময়ে বলিয়া অনুমান করেন। অনুমিত কাল খ্রীস্টপূর্ব ১৩৫ অব্দ হইতে ১৫৪ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। মুদ্রা হইতে জানা যায় তিনি গান্ধারের শাসক ছিলেন।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার রাজ্য দুই বাহ্লীকদেশীয় গ্রীক রাজ্য কাবুল উপত্যকা ও পূর্ব পঞ্জাবের অন্তর্বর্তী ছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রথম এজেস (Azes I) সম্ভবতঃ পূর্ব পঞ্জাব জয় করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের শক শাসকদের রাজ্যপরিচালন-পদ্ধতি ইরাণীয় ও গ্রীক আদর্শের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

মথুরায় এক শক প্রাদেশিক শাসনকর্তার বাস ছিল। বংশপরম্পরায় তাঁহারা তথায় শাসন-পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরই একজন রাজুভুল (Rajuvula) সম্ভবতঃ পূর্ব পঞ্জাবে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন। পণ্ডিতদের ভিতর কেহ কেহ মনে করেন যে, মোগ ও রাজুভুল প্রমুখ তথাকথিত শক 'সত্রপ' বা প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ পার্থীয় জাতিসম্ভূত ছিলেন, শক ছিলেন না।

পশ্চিম ভারতে শক শাসন: 'ক্ষহরাট' নামে শক 'সত্রপ' বা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের এক বংশ পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে তাঁহাদের ক্ষমতা সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। ভূমক সৌরাষ্ট্রে (কাথিয়াবাড়) শাসন পরিচালনা করিতেন। শ্রেষ্ঠ 'ক্ষহরাট' সত্রপ নহপান সাতবাহনদিগের নিকট হইতে মহারাষ্ট্রের একটি বৃহৎ অংশ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার রাষ্ট্রিক ক্ষমতা সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্র ও উত্তর কোঙ্কন হইতে কাথিয়াবাড়, মালব ও আজমীঢ় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, খ্রীস্টীয় ৭৮ অব্দ হইতে যে 'শকাব্দের' সূচনা হয়, উক্ত নাম নহপানের উত্তরাধিকারী শক শাসকদিগের নামানুসারে হইয়াছে। তাঁহাদের মত অনুযায়ী নহপান খ্রীস্টীয় ১১৯-১২৪ অব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছেন। খুব সম্ভব নহপানের শক্তি গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি কর্তৃক খর্ব হইয়াছিল। গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি মহারাষ্ট্রে ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে সাতবাহন শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

উজ্জয়িনীর শক শাসকগণ: রুদ্রদামন: শক 'সত্রপ'দের কর্দমক শাখা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পশ্চিম ভারতে শাসন পরিচালনা করিয়াছিলেন। উজ্জয়িনী ছিল তাঁহাদের শাসনের কেন্দ্র। এই বংশের প্রথম 'মহাক্ষত্রপ' হইলেন চস্টন (Chastana), তিনি আনুমানিক ১৩০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি সম্ভবতঃ একজন কুষাণবংশীয় প্রাদেশিক রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন।

চস্টনের পৌত্র রুদ্রদামন (আনুমানিক ১৩০-১৫০ খ্রীস্টাব্দ) একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন। ১৫০ খ্রীস্টাব্দের জুনাগড় শিলালিপিতে তাঁহার জীবনেতিহাস মোটামুটি সবিস্তারে বর্ণিত আছে। এই বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি 'মহাক্ষত্রপ' এই গৌরবজনক উপাধির ধারক হইবার অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ণনার এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে যে, তাঁহার বংশের ক্ষমতা কোনও প্রতিবেশী রাজা (সম্ভবতঃ গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি) কর্তৃক বিচলিত হইয়াছিল, তিনি স্বীয় শৌর্যবীর্যের দ্বারা তাঁহার প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার প্রভুত্ব পূর্ব এবং পশ্চিম মালব, উত্তর গুজরাট, কাথিয়াবাড়, কচ্ছ, মাড়বার, নিম্ন সিন্ধু-উপত্যকা, উত্তর কোঙ্কন ও উহার সন্নিহিত কতিপয় এলাকায় স্বীকৃত হইয়াছিল। এই সকল অঞ্চলের কতকাংশ মূলতঃ সাতবাহন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হয় গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি নয় তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের কাহারও নিকট হইতে রুদ্রদামন সেইগুলি ছিনাইয়া লন বলিয়া মনে হয়। জুনাগড় শিলালিপির বর্ণনা অনুযায়ী, রুদ্রদামন দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর শাতকর্ণিকে দুই-দুইবার পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে নিকট আত্মীয়তা বর্তমান থাকায় তিনি তাঁহার শক্তির চূড়ান্ত বিনাশ সাধন করেন নাই। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, এই শাতকর্ণি বাশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী ভিন্ন কেহ নহেন। তিনি সম্ভবতঃ রুদ্রদামনের জামাতা ছিলেন। নিম্ন সিন্ধু-উপত্যকা খুব সম্ভব কণিষ্কের কোনও এক উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছিল। রুদ্রদামন যৌধেয়দিগকেও পরাজিত করেন। যৌধেয়গণ শতদ্রু নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ও ভরতপুরের (রাজস্থানের অন্তর্গত) কতকাংশ শাসন করিতেন।

রুদ্রদামন শুধুই একজন প্রসিদ্ধ রাজ্যজয়ী বীর ছিলেন না, তিনি একজন সুশাসকও ছিলেন। তাঁহার নিযুক্ত একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আধুনিক জুনাগড়ে বিখ্যাত সুদর্শন হ্রদের উপর একটি নূতন বাঁধ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ঐ বাঁধ নির্মাণের সকল ব্যয়ভার রাজকোষ হইতে বহন করা হয়। রুদ্রদামন একজন কৃতবিদ্য পণ্ডিত ছিলেন। কারণ শিলালিপির বর্ণনা হইতে দেখা যায়, তিনি ব্যাকরণ, রাষ্ট্রনীতিবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র ও সঙ্গীত অনুশীলনের দ্বারা প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন কারণে তিনি মানুষের প্রাণহরণ করিতেন না।

পশ্চিম ভারতের 'সত্রপ'গণের পতন: রুদ্রদামনের উত্তরাধিকারিগণের বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ খুব কমই সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে ; মুদ্রা ও শিলালিপি হইতে কিছু-সংখ্যক নাম আহৃত হইয়াছে মাত্র। উত্তরাধিকার সম্পর্কে মতপার্থক্য, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং সাতবাহন প্রমুখ শক্তিশালী প্রতিবেশী রাজ্যের আক্রমণ—এই সকল বিভিন্ন কারণে তাঁহাদের রাজ্য ক্রমশঃ পঙ্গু হইয়া পড়ে। উত্তর কোঙ্কন, সিন্ধু, রাজপুতানা ও মালব প্রভৃতি অঞ্চল খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের আগেই হস্তচ্যুত হয়। পরবর্তী শতকের গোড়ার দিকে চসটনের বংশ অজ্ঞাতপূর্বপরিচয় এক শাসক কর্তৃক উন্মূলিত হয়। ২৯৫ খ্রীস্টাব্দ হইতে আনুমানিক ৩৪৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত 'মহাক্ষত্রপ' কেহ ছিলেন না ; শাসকগণ তন্নিম্ন 'ক্ষত্রপ' উপাধি মাত্র ব্যবহার করিতেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে শাশানীয় আধিপত্যের জন্যই সম্ভবতঃ শক শক্তির প্রভাব হ্রাস পাইয়াছিল। দূরবর্তী ভারতীয় শাসন-অঞ্চলগুলিতে শাশানীয় সম্রাট্‌গণের আধিপত্য যখন দুর্বল হইয়া পড়িল তখন রুদ্রদামনের উত্তরাধিকারী-দিগের অন্যতম তৃতীয় রুদ্রসেন 'মহারাজ' উপাধি ধারণপূর্বক আপনার শক্তি ঘোষণা করিলেন। তাঁহার শাসনকাল সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের তৃতীয় পাদ জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম ভারতের এই শক পুনরভ্যুত্থান স্বল্পায়ু প্রমাণিত হয় ; কারণ, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য মালব ও কাথিয়াবাড় জয় করেন এবং উক্ত অঞ্চলদ্বয়ের শেষ শক অধিপতির প্রাণবিনাশ করেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে পহ্লব শাসন ঃ গণ্ডো-ফারনিস: খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি দিকে পহ্লবগণ (Parthians) গান্ধার দেশের কতিপয় অঞ্চলে শক শাসনের উৎখাত সাধন করে। পহ্লবগণ ক্রমশঃ পূর্বাভিমুখে তাহাদের ক্ষমতা প্রসারিত করে। ভারতে আগত পহ্লব শাসকগণের মধ্যে গণ্ডোফারনিস (Gondophernes) ছিলেন শ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁহার শাসনকাল সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। তাঁহার শাসনের প্রারম্ভকালে তাঁহার কর্তৃত্ব কেবলমাত্র দক্ষিণ আফগানিস্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। উহার পর তিনি পেশোয়ার অঞ্চল দখল করেন। তিনি পূর্ব গান্ধার জয় করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। তবে এজেস (Azes) বংশ হইতে তিনি কিছু অঞ্চল ছিনাইয়া লইয়াছিলেন ইহা সম্ভব হইতে পারে। খ্রীস্টীয় কিংবদন্তী অনুযায়ী গণ্ডোফারনি

যীশুখ্রীস্টের শিষ্য সাধু টমাস কর্তৃক খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সাধু টমাস এই সময়ে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্য ভারতে আসেন। গণ্ডোফারনিসের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। শিলালিপির প্রমাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আফগানিস্থান, পঞ্জাব ও সিন্ধুর পহ্লব শাসকগণ কুষাণগণ কর্তৃক শাসনাধিকারবঞ্চিত হইয়াছিলেন।

ইউচি জাতির অনুপ্রবেশঃ খ্রীস্টপূর্ব ১৬৫ অব্দের কাছাকাছি সময়ে উত্তর-পশ্চিম চীনে বসবাসকারী ইউচি (the Yueh-chis) নামক এক জাতি হিয়ুঙ্-নু (Hiung-nu) নামক এক যাযাবর জাতি কর্তৃক পরাজিত ও স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হয়। ইউচিরা পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। এই অগ্রগতির কালে সির দরিয়া নদীর উপত্যকায় শকদিগের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ হয়। ইউচিরা শকদিগের ভূমি অধিকার করে। খ্রীস্টপূর্ব ১৪০ অব্দে ইউচিরা শত্রু কর্তৃক পর্যুদস্ত হইয়া আরও পশ্চিমে অক্সাস (Oxus) নদীর তীরবর্তী ভূখণ্ডের অভিমুখে অগ্রসর হয়। অক্সাস নদীর তীরবর্তী ভূখণ্ডে উপনীত হইয়া তাহারা কতকগুলি উপজাতিকে পদানত করে। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর সূচনায় গোটা বাহ্লীক দেশ ও সগডিয়ানা সম্ভবতঃ ইউচিগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইউচিরা ক্রমশঃ তাহাদের যাযাবরীয় অভ্যাস পরিত্যাগ করে ; তাহাদের অধিকৃত ভূখণ্ডকে তাহারা পাঁচটি মূল শাসন-এলাকায় বিভক্ত করে। এই পাঁচ শাসন-এলাকার একটি হইল ইউচি জাতির অন্যতম শাখা কুষাণদের অধিকৃত এলাকা ; উহা সম্ভবতঃ চিত্রল ও পঞ্জশির অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত ছিল।

আদি কুষাণগণঃ কুষাণ জাতির প্রথম সুপরিচিত অধিনায়ক কুজুল কদফিস বা প্রথম কদফাইসেস (Kujula Kadphises, Kadphises I) পাঁচটি শাসন এলাকাকে তাঁহার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব তিনি কাবুল নদের তীরবর্তী ভূখণ্ডে রাজ্য পরিচালনাকারী ইউক্রেটাইডিস বংশের শেষ অধিপতি হারমেয়সের সহযোগী অথবা মিত্র ছিলেন, অবশেষে উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। আলোচ্য মত অনুসারে, কুষাণগণ বাহ্লীক দেশীয় গ্রীকগণকে কাবুল নদের তীরবর্তী ভূখণ্ড হইতে উৎখাত করিয়া তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। কুজুল কদফিস পহ্লবগণকেও পরাজিত করেন। গান্ধার দেশ ও দক্ষিণ আফগানিস্থান সম্ভবত তৎকর্তৃক অধিকৃত হয়। তিনিই

প্রথম কুষাণ অধিপতি যিনি হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণে মুদ্রার প্রচলন করেন। রোমক সম্রাট অগাস্টাস ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী উত্তরাধিকারিগণের প্রচারিত মুদ্রার অনুকরণে তিনি মুদ্রা প্রস্তুত করান। কদফিস বংশীয় রাজাদের মুদ্রা-নির্মাণ পদ্ধতির উপর রোমক প্রভাব প্রমাণ করিতেছে যে, সেই সময়ে চীন এবং রোমক সাম্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের ব্যাপক বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ছিল। কুজুল কদফিস তাঁহার কোন কোন মুদ্রায় আপনাকে "বুদ্ধের সত্যধর্মে অবিচলিতচিত্ত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্পষ্টতঃই কুষাণগণ ভারতে প্রবেশের সূচনায়ই ভারতীয় প্রভাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

কুজুল কদফিসের পর রাজা হন তাঁহার পুত্র বিম কদফিস বা দ্বিতীয় কদফাইসেস (Wema Kadphises, Kadphises II)। তিনি ভারতের অভ্যন্তরে অনেক দূর পর্যন্ত তাঁহার কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। পঞ্জাব এবং সম্ভবতঃ উত্তর প্রদেশও তাঁহার প্রভাব-পরিধির অন্তর্গত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের এই অংশের শাসনভার একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার হস্তে অর্পণ করেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, তিনিই ৭৮ খ্রীস্টাব্দে 'শকাব্দের' প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই মত অনুসারে বিম কদফিস ছিলেন ক্ষহরাট 'সত্রপ' নহপানের অধিরাজ (overlord)। তাঁহার মুদ্রা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি শিবের উপাসক ছিলেন।

কণিষ্ক ঃ ভারতের কুষাণ শাসকগণের মধ্যে নিঃসন্দেহে কণিষ্ক ছিলেন শ্রেষ্ঠ শাসক। কিন্তু তাঁহার সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদির পরিমাণ খুবই অকিঞ্চিৎকর। কোন কোন ঐতিহাসিক এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, কণিষ্ক কদফিস রাজাদের পূর্ববর্তী ছিলেন এবং তিনিই খ্রীস্টপূর্ব ৫৮ অব্দে সূচিত 'বিক্রমাব্দের' প্রবর্তক। কিন্তু এই মত নির্ভরযোগ্য কিনা বলা কঠিন, কারণ উপযুক্ত প্রমাণাভাব। শিলালিপি তথা মুদ্রাঘটিত সাক্ষ্যপ্রমাণে দেখা যায় গান্ধার কণিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু চৈনিক সাক্ষ্যসূত্র বলে যে, খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শেষার্ধে গান্ধার কণিষ্কের শাসনাধীন ছিল না। ইহা ছাড়া, কণিষ্কের প্রচারিত মুদ্রার উপর খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে প্রচলিত রোমক মুদ্রার প্রভাব সুস্পষ্ট। এই মত আজ প্রায় সর্বস্বীকৃত যে কণিষ্ক কদফিস রাজাদের পরবর্তীকালীন শাসক ছিলেন, যদিও তাঁহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা, কণিষ্ক খ্রীস্টীয়

তৃতীয় শতকের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু চৈনিক ও তিব্বতীয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে। মার্শাল, স্মিথ ও অন্যান্য কতিপয় পণ্ডিতের মতানুসারে, কণিষ্কের শাসন ১২৫ খ্রীস্টাব্দে আরম্ভ হইয়া দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধের কোনও এক সময়ে পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু কণিষ্ক একটি নূতন অব্দের প্রবর্তক ছিলেন এই সুপরিজ্ঞাত তথ্যের সহিত উক্ত মতের সামঞ্জস্য হয় না। কাজেই টমাস, র‍্যাপ্‌সন প্রমুখ পণ্ডিতদের প্রতিষ্ঠিত এই মত গ্রহণ করাই সমধিক যুক্তিযুক্ত যে, কণিষ্ক খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে রাজা ছিলেন এবং তৎকর্তৃক ৭৮ খ্রীস্টাব্দে শকাব্দের সূচনা হয়। কণিষ্কের কালকে শকাব্দের কাল বলা হয় সম্ভবতঃ এই কারণে যে, পশ্চিম ভারতের শক রাজগণ দীর্ঘকাল বৎসর-গণনার এই মান ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কণিষ্কের রাজ্যজয়ঃ কণিষ্ক একজন প্রসিদ্ধ বিজেতা ছিলেন। তাঁহার সামরিক অভিযানে সাফল্য তাঁহাকে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছিল। তিনি কাশ্মীর জয় করেন। সাকেত (অযোধ্যা) ও পাটলিপুত্রের রাজগণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের কাহিনী চৈনিক ও তিব্বতীয় সাহিত্যে সংরক্ষিত আছে। কণিষ্ক পহ্লবরাজকে পরাজিত করেন। চৈনিকদিগের সহিত যুদ্ধের ফলে তিনি কাশগড়, খোটান ও ইয়ারখন্দ অধিকার করেন। প্রসিদ্ধ সম্রাট হো-তির রাজত্বকালে (৮৯-১০৫ খ্রীস্টাব্দ) চৈনিকগণ মধ্য এশিয়ায় তাহাদের হৃত প্রভাব পুনরুদ্ধারের জন্য প্রবলভাবে উদ্যোগী হয় এবং পাঞ্চাও নামক একজন চৈনিক সেনাপতি কণিষ্ককে পরাজিত করেন। কয়েক বৎসর পর কণিষ্ক পামীর মালভূমি বরাবর এক অভিযান পরিচালনা করিয়া পাঞ্চাওয়ের পুত্রকে পরাজিত করেন। খুব সম্ভব এই অভিযানেই তিনি একজন চীনদেশীয় রাজপুত্রকে বন্দী করিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিজ রাজ্যে সন্ধির জামীনস্বরূপ রাখিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের বাহিরে কণিষ্কের সাম্রাজ্য আফগানিস্থান, বাহ্লীক দেশ, কাশগড়, খোটান ও ইয়ারখন্দ অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল। ভারতীয় প্রদেশ-সমূহের মধ্যে পঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু ও উত্তরপ্রদেশ (পূর্ব দিকে কাশী পর্যন্ত) এই কয়টি অঞ্চল তাঁহার রাজ্য-সীমার অন্তর্ভুক্ত ছিল ইহা প্রায় নিশ্চিতরূপেই বলিতে পারা যায়। তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা সুদূর বিহার ও বঙ্গদেশে পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল 'মহাক্ষত্রপ' ও 'ক্ষত্রপ'

উপাধিধারী প্রতিনিধি শাসকগণের দ্বারা শাসিত হইত। কণিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর (পেশোয়ার)।

কণিষ্কের ধর্ম : পালি সাহিত্যের কিংবদন্তীতে বলা হইয়াছে যে, কণিষ্ক তাঁহার রাজত্বের সূচনাতেই বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। মুদ্রা, শিলালিপি ও প্রত্নতত্ত্বঘটিত সাক্ষ্যেও এই কিংবদন্তীর সমর্থন মিলে। তাঁহার কোন কোন মুদ্রায় বুদ্ধের মূর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। পুরুষপুরে তিনি একটি চৈত্য ও বিশাল কাষ্ঠময় চূড়া নির্মাণ করেন। ঐ চূড়ার অভ্যন্তরে তিনি বুদ্ধের কতিপয় স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করেন। তিনি এক বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন এবং উহাই শেষ বিখ্যাত বৌদ্ধ সঙ্গীতি। ঐ সঙ্গীতি কাশ্মীর অথবা গান্ধারে অথবা জলন্ধরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বসুমিত্র ও অশ্বঘোষ উহার কার্য পরিচালনা করেন। অধিবেশনে বৌদ্ধ শাস্ত্রবিধিসমূহের উপর পূর্ণাঙ্গ টীকাভাষ্য সংরচিত হয় ; ঐ সকল রচনা পিত্তলফলকে খোদিত করিয়া এক স্তূপের অভ্যন্তরে রক্ষা করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান হইয়াও কণিষ্ক ভারতীয় সর্বধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার মুদ্রাসমূহের ভিতর হিন্দু, গ্রীক, জরথুস্ট্রীয়, ইরাণীয়, রোমক প্রভৃতি নানা ধর্মের দেবতার মূর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ কণিষ্ক তাঁহার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সকল উপাস্য দেবতার প্রতিই ভক্তিমান ছিলেন।

শিল্প-সাহিত্যের প্রতি কণিষ্কের অনুরাগ : কণিষ্ক শিল্প ও সংস্কৃতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পুরুষপুরে তিনি যে চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর বহু শতাব্দী পরেও চৈনিক ও মুসলিম পর্যটকদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। তাঁহার যে স্তূপের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে উহা এজেসিলাওস্ (Agesilaos) নামক একজন গ্রীক স্থপতির তত্ত্বাবধানে নির্মিত হইয়াছিল। কণিষ্ক তক্ষশিলার নিকটে একটি নগরী নির্মাণ করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব কাশ্মীরের কণিষ্কপুর নগরীটিও তাঁহার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজসভা নানা গুণী-জ্ঞানীর দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান বিখ্যাত বৌদ্ধ মনীষী পার্শ্ব ও বসুমিত্র, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ কবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষ, সুপরিচিত দার্শনিক নাগার্জুন এবং আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রবেত্তা চরক।

পরবর্তী কুষাণগণ ঃ কণিষ্কের পর সম্ভবতঃ বাসিষ্ক রাজা হন। বাসিষ্কের শিলালিপিসমূহ মথুরা ও পূর্ব মালবের উপর তাঁহার আধিপত্যের প্রমাণ। বাসিষ্কের পরবর্তী রাজা হুবিষ্ক নিম্ন সিন্ধু-উপত্যকার উপর তাঁহার অধিকার হারাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। প্রসিদ্ধ শক শাসক রুদ্রদামন খুব সম্ভব উক্ত অঞ্চল অধিকার করেন। হুবিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন; তিনি মথুরায় একটি চমৎকার বিহার নির্মাণ করেন। তাঁহার মুদ্রাগুলি সবিশেষ শিল্পসৌন্দর্যের পরিচায়ক; উহাদের ভিতর বহুবিধ গ্রীক, ইরাণীয় ও ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। পেশোয়ার জিলার আরায় একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে কণিষ্কের নাম পাওয়া যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক ইঁহাকে প্রসিদ্ধ কণিষ্ক ভিন্ন অন্য কেহ নহেন বলিয়া মনে করেন; আবার কাহারও কাহারও মতে তিনি ভিন্ন ব্যক্তি। প্রথম বাসুদেব ছিলেন ভারতবর্ষের কুষাণ শাসকগণের মধ্যে শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক। তাঁহার রাজত্বকাল খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের তৃতীয় পাদে বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার নামাঙ্কিত শিলালিপি ও মুদ্রা কেবলমাত্র পঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে পাওয়া গিয়াছে। বাসুদেব সম্ভবতঃ শিবের উপাসক ছিলেন।

খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কণিষ্কের বিশাল সাম্রাজ্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল রাজ্যের শাসকগণ ছিলেন অতিশয় হীনবল; উঁহাদের শাসনের কালানুক্রম ও ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বিশেষ-কিছু জানা যায় না। পারস্যের শাশানীয় সম্রাটগণ বাহ্লীক দেশ, আফগানিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের উপর তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু তাঁহাদের রাজ্যজয় পঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে শাশানীয়দের প্রতিপত্তি হ্রাস পায়; তৎস্থলে গুপ্তগণ বলবত্তর হইয়া উঠেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কুষাণ রাজগণের উপর সমুদ্রগুপ্তের প্রভাব সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কুষাণগণকে প্রথমে হূণ পরে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করিতে হয়। নবম শতাব্দীর সমাপ্তির দিকে পঞ্জাবের হিন্দুশাহী বংশ ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট প্রভাব নির্মূল করেন।

নাগ বংশ ঃ কুষাণদিগের পরে নাগগণ মথুরা ও গোয়ালিয়র অঞ্চলে ক্ষমতা অধিকার করেন। নাগদিগের দুই বংশ—এক বংশের রাজধানী ছিল

মথুরায়, অন্য বংশের পদ্মাবতীতে (মধ্য প্রদেশের পদম্-পাওয়া)। এই দুই বংশের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব ছিল কি না বলা দুষ্কর। তাহারা খ্রীস্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠে। পদ্মাবতীর নাগ শাসকগণ 'ভারশিব' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু নাগ শাসকগণের মধ্যে একজনের সম্বন্ধে মাত্র সুনিশ্চিত ঐতিহাসিক তথ্যাদি জানিতে পারা যায়। তিনি হইলেন ভব নাগ। ভব নাগ বাকাটকগণের মিত্র ছিলেন। নাগদের শক্তি গুপ্তগণ কর্তৃক নির্মূল হয়।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম : কুষাণ রাজত্বকালেই প্রথম ভারতীয় সভ্যতা মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় বিস্তৃতি লাভ করে। বৌদ্ধধর্ম চীনে নীত হয় এই কুষাণদের আমলেই। আনুমানিক ৬১-৬৭ খ্রীস্টাব্দে কাশ্যপ মাতঙ্গ কর্তৃক এই কার্য সাধিত হয়। ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্মের প্রসার এবং উহার সহিত বৈদেশিক জাতিগুলির নিবিড় সংস্পর্শ একইকালে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসেও এক দূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করে। কণিষ্কের রাজত্বের সময় হইতেই মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিকাশের লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের অনুশাসনসমূহের ব্যাখ্যায় ঔদার্যনীতি অনুসৃত হইতে আরম্ভ করে। এই ঔদার্যনীতিকে দ্বিতীয় শতকে বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যলক্ষণ মনে করা যাইতে পারে। ভিক্ষু জীবনের পূর্বতন কঠোরতা কিয়দংশে শিথিল করা হইল এবং নূতন বোধিসত্ত্বের আদর্শের ঘোষণায় বলা হইল, গৃহীই হউন আর অগৃহীই হউন যে-কেহ 'পারমিতা' রূপ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরিণামে বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী। অশোকের ঘোষণাগুলিতে প্রথম এই আদর্শের প্রতি পক্ষপাত পরিদৃষ্ট হয়। তদানীন্তন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বুদ্ধ-অনুরাগী জনসাধারণের সমক্ষে এই আদর্শ তুলিয়া ধরেন। অতএব অসম্ভব নহে যে, অশোকের অধিনায়কতায় তৎকালীন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করেন এবং বৌদ্ধধর্মের সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিতর জনগণের যাহাতে স্থান হইতে পারে তাহার উপায় ও পন্থা নির্ধারণ করেন। সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় কিংবা দ্বিতীয় শতকে 'পারমিতা' তত্ত্বের সূচনা হয়।

এই নূতন মত 'মহাসজ্ঘিক'গণ কর্তৃক সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। তাঁহারা ঘোষণা করেন যে, যে-কেহ বুদ্ধত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন ; উপযুক্ত শীলাদির আচরণ করিয়া প্রত্যেকেরই বোধিসত্ত্ব হইবার অধিকার আছে এবং

সে অধিকার কার্যতঃ প্রয়োগ করা উচিত। তাঁহারা বুদ্ধ-পূজার অবতারণা করেন। এইভাবে ব্যক্তি-পূজার মাধ্যমে তাঁহারা বুদ্ধ-অনুরাগীদিগের ভিতর প্রভূত অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেন। প্রতীক-পূজায় কখনও এবম্বিধ দৃষ্টিগ্রাহ্য ভাব জাগ্রত হইতে পারে না। বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন ও বুদ্ধের মূর্তি পূজার প্রচলন হইল। লোকান্তরিত ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত ত্রাতার উপাসনায় রূপান্তরিত হইল। এইরূপে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সূচনা হইল।

ঠিক কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্মে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। তবে দেখা যায়, এই বিষয়ে আদিতম রচনা 'প্রজ্ঞা পারমিতা' খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে প্রচলিত ছিল এবং উহা ১৪৮ খ্রীস্টাব্দে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। কণিষ্কের ধর্মসভার অধিবেশন যে সময়ে হয় তাহার পূর্ব হইতেই মহাযান ধর্ম একটি জাগ্রত শক্তিরূপে সমাজে বলবৎ ছিল। মহাযান দর্শনের প্রথম প্রসিদ্ধ প্রবক্তা নাগার্জুন সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে জীবিত ছিলেন। তিনি বিদর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, পরে তিনি নালন্দা সঙ্ঘের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। হীনযান মতবাদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বুদ্ধগয়া নালন্দা কর্তৃক নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। মহাসঙ্ঘিকদের কর্মকেন্দ্র অন্ধ্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া মহাযান বৌদ্ধধর্ম খ্রীস্টীয় প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শতকে সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়াইয়া পড়ে এবং নাগার্জুন, আর্যদেব, আসঙ্গ ও বসুবন্ধুর সযত্ন চেষ্টায় উহা পূর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়।

গান্ধার শিল্প ঃ স্বভাবতঃ ধর্ম শিল্পের ভিতরও প্রতিফলিত হইয়াছিল। পূর্বতন সাঁচী কিম্বা ভারহুতের বৌদ্ধ ভাস্কর্যগুলিতে জাতকের গল্প ও বুদ্ধের জীবনের অন্যান্য কাহিনী হইতে নির্বাচিত দৃশ্যাদির চমৎকার রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু কোথায়ও স্বয়ং বুদ্ধের মূর্তি প্রস্তরে খোদিত দেখিতে পাওয়া যায় না। নানা প্রতীক-চিহ্ন, যথা, পদচিহ্ন, ছাতা ইত্যাদির দ্বারা তাঁহার উপস্থিতি নির্দেশ হইত। কুষাণ যুগের ভাস্করগণ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের প্রস্তরমূর্তি নির্মাণের অভিনব শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই নবশিল্পরীতিকে বলা হয় গান্ধার শিল্পরীতি, কারণ এই রীতির অধিকাংশ নমুনাই গান্ধার অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। কখনও কখনও এই শিল্পরীতিকে গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পরীতিও বলা হয়, কেননা, এই শিল্পে বৌদ্ধ বিষয়ের সহিত গ্রীক আঙ্গিকের সমন্বয় ঘটিয়াছে। বুদ্ধের প্রতিকৃতি দেখিলে মনে হয় অ্যাপোলোর প্রতিকৃতি দেখিতেছি, যক্ষ কুবের

দাঁড়াইয়া আছেন যেন গ্রীক দেবতা জুপিটারের ভঙ্গীতে। এইরূপ সকল মূর্তির ক্ষেত্রেই এক ধারা। বেশভূষাতেও গ্রীক প্রভাব। ভারতীয় সংস্কৃতির উপর গ্রীক প্রভাবের ইহা এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গান্ধার রীতির শিল্পকলা স্বভাবতঃ মৌর্যোত্তর যুগের ভারতীয় শিল্পের দুই প্রধান কেন্দ্র মথুরা ও অমরাবতীর শিল্পকলার উপরও কতক ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

শাসন-ব্যবস্থায় বৈদেশিক প্রভাব: ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির দীর্ঘকালীন শাসন স্বতঃই রাষ্ট্রিক ধ্যান-ধারণা ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিছু-কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সাহায্যে রাজ্য-শাসনের ইরাণীয় রীতি ভারতের নানা অংশে প্রচলিত হয়। গ্রীক উপাধি (যথা, 'Strategos')-যুক্ত উর্ধ্বতন ভারতীয় রাজকর্মচারী ভারতীয় জনগণের নিকট পরিচিত হইয়া উঠেন। রাজতন্ত্রের ধারণায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সংঘটিত হয়। রাজতন্ত্রের মহিমা প্রচারের চেষ্টা দুইটি সূত্র হইতে প্রমাণিত হয়—এক, রাজগণ কর্তৃক বাগাড়ম্বরপূর্ণ দেবকল্প সব উপাধি ধারণ ; দুই, মৃত শাসকগণের প্রতি দেবত্ব আরোপ। অশোকের ন্যায় মহান্ শাসক 'রাজা' এই সামান্য উপাধি ধারণ করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন ; এদিকে মৌর্য সম্রাটের অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রতর অঞ্চলের অধিকারী রাজারা 'চক্রবর্তী' এই গালভরা উপাধি ধারণ করিয়া অসার আত্মগৌরব প্রচার করিতেন। অশোক যেখানে আপনাকে 'দেবপ্রিয়' বলিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, অনেক বিদেশাগত রাজা সেই স্থলে আপনাদিগকে মহিমান্বিত 'দেবপুত্র' বলিয়া প্রচার করিতেন। সম্ভবতঃ চৈনিক উদাহরণ অনুকরণ করিয়াই তাঁহারা এইরূপ করিতেন। শাসকগণের প্রতি দেবত্ব আরোপের রোমক রীতি কুষাণগণ কর্তৃক প্রবর্তিত হয় ; মথুরা 'দেবকুলের' রাজধানী রূপে পরিচিত হয়। উহা প্রতিকৃতি-মূর্তিশিল্পের রাজকীয় আধারস্থলরূপে পরিগণিত হয়। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কোন কোন অঞ্চলে যে দ্বৈরাজ্য-রীতি (দুই রাজা কর্তৃক সংযুক্তভাবে রাজ্যশাসন) প্রচলিত ছিল উহার মূলে ছিল গ্রীক-রোমক প্রভাব।

অষ্টম অধ্যায়

গুপ্ত সাম্রাজ্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুপ্তবংশীয়দের রাজনৈতিক ইতিহাস

গুপ্ত রাজশক্তির অভ্যুত্থানঃ গুপ্ত বংশের গোড়ার কথা আমরা খুব সামান্যই জানি। এই বংশ সম্ভবতঃ বৈশ্য শ্রেণী সম্ভূত, যদিও এই সম্পর্কে কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিলালিপিতে উদ্ধৃত প্রমাণ অনুসারে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম গুপ্ত। তিনি শুধুমাত্র 'মহারাজ' উপাধি ব্যবহার করিতেন এবং সম্ভবতঃ মগধের অথবা বঙ্গদেশের অন্তর্গত কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। ইনিও 'মহারাজ' উপাধি ব্যবহার করিতেন। ইঁহারা স্বাধীন নরপতি ছিলেন কিংবা সামন্তরাজ ছিলেন তাহা নির্ণয় করা খুবই শক্ত।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তঃ 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি দ্বারা ভূষিত প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নিঃসন্দেহে স্বাধীন ও সার্বভৌম নৃপতি ছিলেন। তিনি ঘটোৎকচের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ ৩২০ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সন হইতেই গুপ্ত অব্দ আরম্ভ হয় এবং প্রথম চন্দ্রগুপ্তই ঐ অব্দের প্রবর্তক। তাঁহার সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে তিনি তাঁহার বংশের ক্ষমতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি লিচ্ছবি বংশের রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করেন এবং এই বৈবাহিক বন্ধন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ঐ সময়কার লিচ্ছবিদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। স্মিথ অনুমান করেন যে লিচ্ছবিরা তখন কুষাণদের অধীনে সামন্ত-রাজা রূপে পাটলিপুত্রে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার বিবাহ দ্বারা 'তাঁহার পত্নীর আত্মীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন।' ইহাও সম্ভব যে, লিচ্ছবিরা উত্তর বিহারে রাজত্ব করিতেছিলেন ; তাঁহাদের রাজধানী ছিল বৈশালী (মজঃফরপুর জিলার বর্তমান বসার শহর)।

লিচ্ছবিদের উত্তরাধিকারিণীর সহিত বিবাহ হওয়ায় তাঁহার এবং তাঁহার পত্নীর আত্মীয়দের রাজ্য একীভূত হইয়া গেল। যাহা হউক, চন্দ্রগুপ্ত যে বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং বাঙ্গালা ও উত্তর প্রদেশের কিছু কিছু অংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে।

সমুদ্রগুপ্ত ঃ চন্দ্রগুপ্ত স্বীয় পুত্রদিগের মধ্য হইতে যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া সমুদ্রগুপ্তকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। কাচ নামে একজন গুপ্ত শাসনকর্তা নিজের নামে কিছু স্বর্ণমুদ্রা প্রচার করেন। স্মিথ মনে করেন যে কাচ সমুদ্রগুপ্তের প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা ছিলেন, কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত এবং কাচ একই ব্যক্তি হওয়াও অসম্ভব নয়। সমুদ্রগুপ্ত ৩২০ খ্রীস্টাব্দের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৮০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের এবং মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায় না।

সমুদ্রগুপ্তের বিজয় অভিযান ঃ সমুদ্রগুপ্ত মস্তবড় বিজয়ী সম্রাট ছিলেন। মহাপদ্ম নন্দ এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ন্যায় তিনিও ভারতের ঐক্যবিধানে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার বিজয় অভিযানের মোটামুটি বিস্তারিত বিবরণ তাঁহার সভাকবি হরিষেণ কর্তৃক লিখিত শ্লোকে এলাহাবাদ স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ আছে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং মধ্যভারতে বিজিত রাজাদের রাজ্য সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তিনি শুধু যুদ্ধ জয় করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন—পরাজিত রাজাদের রাজ্য তিনি স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। উত্তর-পূর্বাঞ্চল হইতে সুদূর দক্ষিণ ভারত শাসনের অসুবিধা তিনি সম্ভবতঃ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

এলাহাবাদ স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপিতে জানা যায় যে, সমুদ্রগুপ্ত রুদ্রদেব (প্রথম রুদ্রসেন, বাকাটক বংশীয় ?), মতিল (সম্ভবতঃ উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বুলন্দশহরের শাসনকর্তা), নাগদত্ত (জনৈক নাগরাজা ?), চন্দ্রবর্মণ (শুশুনিয়া-গিরিতে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে যে চন্দ্রবর্মণের উল্লেখ আছে ইনি সেই ব্যক্তি—ইনি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বাঁকুড়া জিলার পুষ্করণ অথবা পোখরণ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন), গণপতি নাগ (মথুরার নাগবংশীয় শাসনকর্তা), নাগসেন (পদ্মাবতীর নাগরাজা), অচ্যুত (অহিচ্ছত্রের রাজা—উত্তর প্রদেশের বেরিলী জিলার বর্তমান রামনগর), নন্দী (জনৈক নাগরাজা ?), বালবর্মণ (আসামের কোন রাজা ?) এবং আর্যাবর্তের বহু রাজাকে সমূলে উৎখাত করিয়াছিলেন।

তিনি কোট বংশের (দিল্লী এবং পঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে ইহারা রাজত্ব করিতেন) রাজাদের পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই সকল বিজিত রাজাদের রাজ্য উত্তর প্রদেশ, মধ্যভারতের কিয়দংশ এবং বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বিস্তৃত ছিল। এই সকল এলাকা রাজপ্রতিনিধি এবং রাজা কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারিবৃন্দ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে শাসিত হইত। গাজীপুর-জব্বলপুর এলাকায় অবস্থিত 'বন্য দেশের' আরণ্য অঞ্চলের কতিপয় শাসনকর্তাকেও সমুদ্রগুপ্ত পরাজিত করিয়াছিলেন।

উত্তর ভারতে বিজয় অভিযান সমাপ্ত হইলে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতের দিকে দৃষ্টি দিলেন। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার অভিযান উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে এবং দাক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূলে কাঞ্চী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। দাক্ষিণাত্যের যে সকল শাসনকর্তাকে তিনি পরাজিত করিয়াছিলেন তাঁহারা হইতেছেন কোশল রাজ্যের মহেন্দ্র (অর্থাৎ দক্ষিণ কোশল—উড়িষ্যার সম্বলপুর জিলা এবং মধ্যপ্রদেশের রায়পুর ও বিলাসপুর জিলাসমূহ), 'মহাকান্তার' (মধ্যভারতের অরণ্য) অঞ্চলের ব্যাঘ্ররাজ, কৌরলের (শোনপুর অঞ্চল ?) মন্তরাজ, কোট্টুরের রাজা স্বামীদত্ত (গঞ্জাম জিলায়), পিষ্টপুরের রাজা মহেন্দ্র গিরি (গোদাবরী জিলায়), এরণ্ডপল্লের রাজা দমন (ভিজাগাপট্টম জিলায়), কাঞ্চীর রাজা বিষ্ণুগোপ (পল্লববংশের), অবমুক্তের নীলরাজ (পরিচয় অনিশ্চিত), ভেঙ্গীর (ইলোরার সন্নিকটে) রাজা হস্তীবর্মন (সম্ভবতঃ শালঙ্কায়ন বংশসম্ভূত), পলাক্কর (নেলোর জিলা) রাজা উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের (ভিজাগাপট্টম জিলা ?) রাজা কুবের, কুস্থলপুরের (উত্তর আর্কট জিলা ?) রাজা ধনঞ্জয় এবং আরো অনেকে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে এই সকল বিজিত রাজাদের রাজ্য সমুদ্রগুপ্ত নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। এলাহাবাদ স্তম্ভে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে বাকাটকগণের সংঘর্ষের পরিষ্কার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু এরূপ বলা হইয়াছে যে বাকাটকগণের অধীনস্থ সামন্ত রাজা ব্যাঘ্ররাজ গুপ্তগণ কর্তৃক পরাজিত হইবার ফলে গুপ্তগণ মধ্যভারতের সার্বভৌম কর্তৃত্ব বাকাটকগণের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত এলাকার শাসনকর্তাদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল এবং পঞ্জাব, পশ্চিম ভারত, মালব ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন উপজাতিরা "কর প্রদান করিয়া, আদেশ পালন করিয়া এবং সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সম্রাটোচিত মর্যাদাকে তুষ্ট করিয়াছিল।" সীমান্ত এলাকার

যে সব রাজা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন সমতটের রাজারা (দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ ঃ কুমিল্লা জিলার বড়কামতায় ইঁহাদের রাজধানী ছিল), ডবাক (আসামের নওগাঁ জিলা ? অথবা পূর্বপাকিস্থানের ঢাকা জিলা ?), কামরূপ (উত্তর আসাম), নেপাল, কর্তৃপুর (পঞ্জাবের জলন্ধর জিলা নতুবা উত্তর-প্রদেশের কুমায়ুন, গাড়োয়াল এবং রোহিলখণ্ড অঞ্চল)। যে সকল উপজাতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল তাহারা হইল মালবগণ (পূর্ব রাজপুতানা এবং মাণ্ডাসোর অঞ্চলের অধিবাসী), অর্জুনায়নগণ (রাজস্থানের আলোয়ার এবং জয়পুর অঞ্চলের অধিবাসী), যৌধেয়গণ (পশ্চিম পাকিস্থানের বাহাওয়ালপুর রাজ্যসীমায় শতদ্রু নদীর উভয়তীরে বসবাসকারী), মদ্রকগণ (পশ্চিম পঞ্জাবের শিয়ালকোট জিলায় বসবাসকারী), আভীরগণ (মধ্যপ্রদেশের সাঁচী এলাকার অধিবাসী), ক্ষরপরিকগণ (মধ্যপ্রদেশ ?), প্রার্জুনগণ (মধ্যপ্রদেশ ?), সনকনিকগণ (মধ্যপ্রদেশের ভিলসা এলাকার অধিবাসী ?) এবং কাকগণ (ভিলসা এলাকায় বসবাসকারী)।

সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার সমসাময়িক রাজাদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, উত্তর-পশ্চিম ভারত, মালব এবং কাথিয়াবাড় প্রভৃতি এলাকায় অবস্থিত বৈদেশিক শক্তিসমূহ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া তাঁহার সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন। হরিষেণ এই সব শাসকদিগকে "দৈবপুত্র শাহী-শাহানু-শাহী-শক-মুরুন্দ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহারা কুষাণ এবং শকদের উত্তরাধিকারী ছিলেন। এই কুষাণ ও শকরা উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় রাজত্ব করিতেন।

সমুদ্রগুপ্তের খ্যাতি ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সিংহল এবং "অন্যান্য সকল দ্বীপের অধিবাসীরা" তাঁহার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ তাঁহার রাজসভায় একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধগয়াতে একটি মঠ নির্মাণ করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সমুদ্রগুপ্ত মালয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা এবং ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য দ্বীপের হিন্দু উপনিবেশসমূহের উপর কিয়ৎপরিমাণে কর্তৃত্ব করিতেন। এই দিগ্বিজয়ী রাজা স্বভাবতঃই অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা তাঁহার বিজয়গৌরবোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ঃ সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বের শেষের দিকে

দেখা যায় যে সমগ্র উত্তর ভারতে (পশ্চিম পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু, পশ্চিম রাজপুতানা এবং গুজরাট ব্যতীত), মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যার মালভূমি অঞ্চল এবং দক্ষিণে মাদ্রাজ সহর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁহার রাজ্যসীমা প্রসারিত হইয়াছিল। উত্তর ভারতে এক সুবিশাল এলাকা সম্রাট্ স্বয়ং তাঁহার প্রতিনিধিগণের সাহায্যে শাসন করিতেন। তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত বহু রাজ্য এই এলাকার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। এই সকল প্রভাবিত রাজ্যের বাহিরে ছিল শক ও হূণ বংশীয়দের শাসিত রাজ্যসমূহ এবং সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপসমূহ। ইহাদের রাজারাও সমুদ্রগুপ্তের আজ্ঞাপালনকারী মিত্র ছিলেন। সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষের সঙ্গে এইভাবে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক অঞ্চলগুলি একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল।

সমুদ্রগুপ্তের গুণাবলী: এলাহাবাদ স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় সমুদ্রগুপ্ত বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। উক্ত লিপিতে বলা হইয়াছে, "বহু কবিতা রচনা করিয়া তিনি 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।" সম্ভবতঃ তাঁহার রচিত কবিতার সংখ্যা অনেক, কিন্তু সেগুলি সবই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার কোন কোন মুদ্রায় তাঁহার বীণাবাদনরত আলেখ্য অঙ্কিত আছে। উহার দ্বারা তাঁহার সঙ্গীতপ্রীতি স্পষ্টতই প্রমাণিত হইতেছে। বিদ্যা ও জ্ঞানের তিনি ধারক এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কথিত আছে যে, বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধু তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। ধর্মের দিক্ দিয়া তিনি ব্রাহ্মণ্য-ধর্মপন্থী ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য মতবাদের প্রতি তিনি অসহিষ্ণু ছিলেন এমন প্রমাণ নাই। তাঁহার আমলে প্রচারিত মুদ্রাগুলি অপরূপ শিল্পকলার পরিচয় বহন করিতেছে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য: যোগ্যতম বলিয়াই বোধ হয় সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার বহু পুত্রের মধ্য হইতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব আরম্ভের প্রথম ও শেষ অনুমিত তারিখ হইতেছে যথাক্রমে ৩৮০ খ্রীস্টাব্দ এবং ৪১২-১৩ খ্রীস্টাব্দ। কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ অনুমান করেন যে সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অন্তর্বর্তী সময়ে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ভ্রাতা রামগুপ্ত কিছুটা বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গুপ্তদের আমলে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে অথবা প্রচলিত মুদ্রায় এই অভিমতের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালের সাহিত্যেই শুধু এই ধরণের কথা প্রচারিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। তিনি নাগ ও বাকাটকগণের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এই সাম্রাজ্যকে আরও সুদৃঢ় করিলেন এবং যুদ্ধজয়ের দ্বারা ক্রমে এই সাম্রাজ্যের সীমা পশ্চিম ভারত
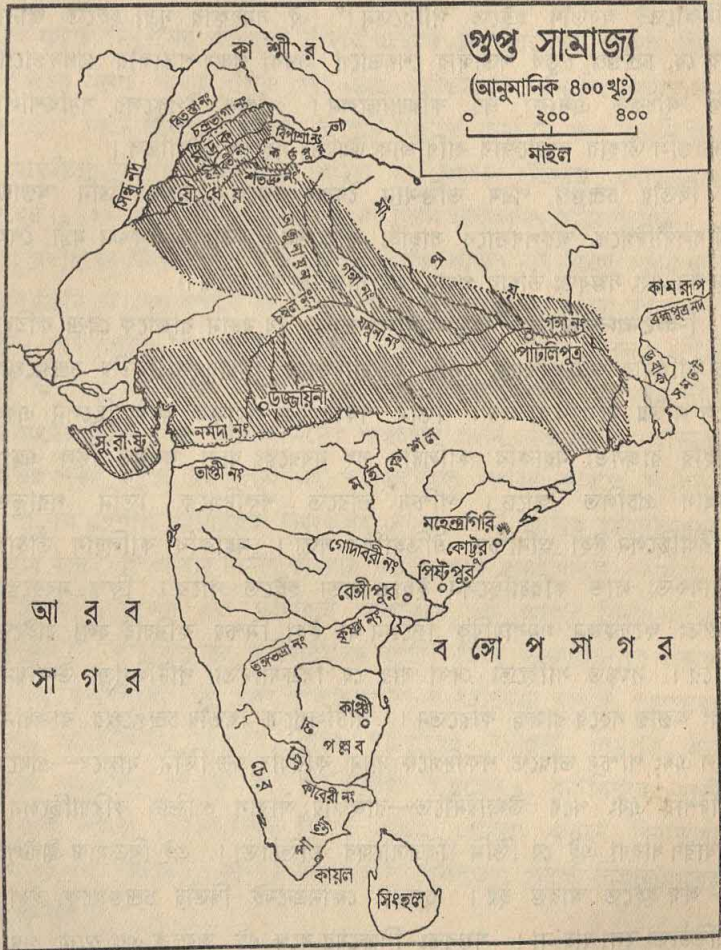
পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। তিনি জনৈকা নাগরাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন এবং নিজের এক কন্যাকে বাকাটকবংশীয় রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সহিত বিবাহ দিলেন। বাকাটক রাজার সহিত এই বন্ধন খুব ফলপ্রসূ হইয়াছিল। কারণ তিনি যখন পশ্চিম ভারতে শকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন তখন

"বাকাটক মহারাজ এমন একটি ভৌগোলিক স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন যে গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের শক-অধিকৃত স্থানসমূহের উপর উত্তর ভারত হইতে আগত আক্রমণকারীর নিকট তিনি মহা উপকারী অথবা মহা অপকারী এই দুই ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হইতে পারিতেন।" ঐ সময়কার মুদ্রা হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে শক অধিকৃত এলাকা জয় করিয়াছিলেন। পশ্চিম উপকূলের সমৃদ্ধিশালী বন্দরগুলি তাঁহার সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক উন্নতির সহায়ক হইয়াছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পরম ভক্তিমান বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তিনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগকে অকৃপণভাবে সাহায্য করিতেন। তাঁহার একজন মন্ত্রী শৈব ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন বৌদ্ধ।

কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য: যে মহান্ রাজাকে কেন্দ্র করিয়া বহু কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে সেই বিক্রমাদিত্যকে সাধারণতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। তিনি শকদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজসভা মহাকবি কালিদাস সহ নবরত্নের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে। পশ্চিম ভারতে শকদিগকে তিনি পরাভূত করিয়াছিলেন ইহা সুনিশ্চিত ঐতিহাসিক সত্য। মহাকবি কালিদাস তাঁহার পোষকতা লাভ করিয়াছিলেন ইহাও সত্য হইতে পারে। কিন্তু নবরত্নের অন্ততঃ কয়েকজন সমসাময়িক ছিলেন না ইহা নিশ্চয় করিয়াই বলা যাইতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় যে বিক্রমাদিত্য পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী এবং অন্যান্য সহরে রাজত্ব করিতেন। পাটলিপুত্রে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল এবং পশ্চিম ভারতে শকদিগকে দমন করিবার জন্য তিনি মালবে—প্রথমে বিদিশায় এবং পরে উজ্জয়িনীতে—রাজকীয় আবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সাধারণ ধারণা এই যে তিনি বিক্রমাব্দের প্রতিষ্ঠাতা। এই বিক্রমাব্দ খ্রীস্টপূর্ব ৫৮ অব্দ হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং কোনক্রমেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে ইহার প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় না। সম্ভবতঃ বিক্রমের সঙ্গে এই অব্দকে এক সূত্রে গ্রন্থন পরবর্তী যুগের আবিষ্কার।

ফা-হিয়েন: দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষ পরিদর্শন করেন। তিনি গোবি মরুভূমির ভিতর দিয়া খোটানের পার্বত্য এলাকা, পামীর মালভূমি এবং সোয়াত ও গান্ধার

দেশ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছান। ভারতবর্ষে তিনি পেশোয়ার, মথুরা, কনৌজ, শ্রাবস্তী, বারাণসী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর, বৈশালী, পাটলিপুত্র এবং অন্যান্য অঞ্চল পরিদর্শন করেন। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য নিদর্শনের অন্বেষণই তাঁহার ভারতে আসিবার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বৌদ্ধদের নিকট পবিত্র বলিয়া গণ্য এরূপ এলাকাতেই তিনি বিশেষভাবে ভ্রমণ করেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে বিখ্যাত সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্তিতে (মেদিনীপুর জিলার তমলুক) সিংহল ও জাভার উদ্দেশ্যে পোতারোহণ করেন। ৩৯৯-৪১৪ খ্রীস্টাব্দ এই কয় বৎসর তিনি ভারতভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ফা-হিয়েন তাঁহার বিবরণীতে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের নাম উল্লেখ করেন নাই, তবে তিনি এই দেশ সম্পর্কে বহু চিত্তাকর্ষক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি পাটলিপুত্রে তিন বৎসর অবস্থান করিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। তিনি এই সহরে দুইটি বিশাল বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই মঠ দুইটি বৌদ্ধধর্মের হীনযান ও মহাযান মতের শাস্ত্রচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু ছাত্র এই মঠ দুইটিতে অধ্যয়ন করিতে আসিত। অশোকের বিশাল প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন; তাঁহার মতে "এই প্রাসাদ নির্মাণ করিবার জন্য অশোক দানবদিগকে (spirit) নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহারাই অশোককে এই প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল।" পাটলিপুত্রের অধিবাসীদের সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে তাহারা ধনী এবং সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং ন্যায়পরায়ণতা ও সদাশয়তা সম্পর্কে পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত। বৈশ্য পরিবারের ব্যক্তিরা ঔষধপত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যসম্পদ দানের জন্য গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতেন। পাটলিপুত্রে একটি চমৎকার দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। দরিদ্র রোগীরা এখানে বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য পাইত। বড় বড় সহরে এবং রাজপথের পার্শ্বে বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা ছিল।

চণ্ডালগণ ব্যতীত মধ্যদেশের (উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকা) সমস্ত অধিবাসীরাই নিরামিষাশী ছিল এবং অহিংসাই তাহাদের জীবনের নীতি ছিল। ফা-হিয়েন বলিতেছেন, "ভারতের অধিবাসীর সংখ্যা বিপুল এবং তাহারা সুখী; তাহাদের আবাসগৃহ রাজদ্বারে চিহ্নিত করিবার প্রয়োজন হইত না; কোন বিচারকের নিকট তাহাদিগকে যাইতে হইত না; যাহারা রাজার জমি চাষ করিত তাহারাই

ঐ জমি হইতে উৎপন্ন শস্যের কতকাংশ করস্বরূপ রাজাকে দিত। মৃত্যুদণ্ড এবং অন্যান্য গুরুতর শাস্তির প্রচলন ছিল না। অপরাধীরা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইত। পুনঃ পুনঃ গুরুতর অপরাধ করিলে অপরাধীর ডান হাত কাটিয়া দেওয়া হইত। রাজার দেহরক্ষী এবং ব্যক্তিগত ভৃত্যেরা প্রত্যেকেই বেতনভুক্ ছিল।" চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শাসন সম্পর্কে নিঃসন্দেহে এই বিবরণ চিত্তাকর্ষক, কিন্তু এই পর্যটক কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র কতখানি বাস্তব তাহা বলা কঠিন।

স্বভাবতঃ ফা-হিয়েন বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত ব্যাপারেই অধিকতর আগ্রহশীল ছিলেন। তাঁহার মতে বৌদ্ধধর্ম পঞ্জাব এবং বঙ্গদেশে খুব প্রসারলাভ করিতেছিল এবং মথুরাতেও উহার বিস্তৃতি ঘটিতেছিল। মধ্যদেশে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় ছিল না ; সেখানে ব্রাহ্মণ্য মতবাদেরই প্রাধান্য ছিল। ধর্ম লইয়া কোন কলহ ছিল না, হিন্দু এবং বৌদ্ধদিগের মধ্যে গভীর সম্প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

প্রথম কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য : দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি ৪১৪-৪৫৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার সম্পর্কে রাজনৈতিক বিবরণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তবে মুদ্রা ও শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার সময়েও সাম্রাজ্যের শক্তি, একতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় তিনিও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তবে কোনও নূতন দেশ জয়ের উপলক্ষ্যে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কি না জানা যায় না। তাঁহার রাজত্বের শেষদিকে নর্মদা উপত্যকা অঞ্চলে বসবাসকারী পুষ্যমিত্রগণের বিদ্রোহে গুপ্ত সাম্রাজ্য খুবই বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্ত এই বিপদ হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রাজপরিবারের ভাগ্য ফিরাইয়া আনেন।

স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য : গুপ্তবংশের শেষ প্রধান রাজা স্কন্দগুপ্ত ৪৫৫-৪৬৭ খ্রীস্টাব্দ—মাত্র এই কয়বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। যখন পুষ্যমিত্রগণের সঙ্গে যুদ্ধ চলিতেছে সম্ভবতঃ তখনই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুষ্য-মিত্রগণকে পরাজিত করিয়া তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হূণরা পশ্চিম এবং মধ্যভারতের দিক হইতে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করে। তিনি হূণদিগকে পরাজিত করিয়া পৈতৃক রাজ্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের

পতন আরম্ভ হয়। স্কন্দগুপ্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষদের মতই পরমতসহিষ্ণু ছিলেন।

গুপ্ত রাজগণের শাসন-ব্যবস্থা : গুপ্তরাজগণ কর্তৃক উৎকীর্ণ শিলালিপিতে তৎকালীন শাসন-ব্যবস্থার অনেক কথাই জানা যায়। প্রধানতঃ উত্তরাধিকার সূত্রে রাজারা সিংহাসন লাভ করিতেন, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী মনোনীতও করা হইত। মৌর্য-পরবর্তী যুগে ভারতের বৈদেশিক শাসনকর্তারা যে রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেন গুপ্তদের আমলে তাহা গৌরবের চরম শিখরে উন্নীত হইয়াছিল এবং সম্রাট্‌কে তখন "শ্রেষ্ঠতম দেবতা" রূপে বর্ণনা করা হইত। মন্ত্রিত্বের পদও অনেক সময় উত্তরাধিকার সূত্রে নির্দিষ্ট হইত। সামরিক এবং বেসামরিক কর্মচারীদের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা বিদ্যমান ছিল না।

গুপ্ত সাম্রাজ্য এতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, কোন একটি কেন্দ্র হইতে তাহা প্রত্যক্ষভাবে শাসন করা যাইত না। ইহাকে কতকগুলি প্রদেশে (দেশ, ভুক্তি ইত্যাদি) ভাগ করা হইয়াছিল। ঐ প্রদেশগুলি আবার কতকগুলি জিলায় (প্রদেশ, বিষয়) বিভক্ত হইত। প্রদেশগুলি রাজপ্রতিনিধি (উপরিক, উপরিক মহারাজ) দ্বারা শাসিত হইত। ইঁহারা অনেকেই রাজপরিবারের কুমার ছিলেন। জিলাগুলি উচ্চ রাজকর্মচারিবৃন্দ কর্তৃক শাসিত হইত। ঐ কর্মচারীরা প্রত্যক্ষভাবে রাজার অধীনে থাকিতেন ; অনেক সময় কিছু কিছু কর্মচারী প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অধীনেও থাকিতেন। শাসন-ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম বিভাগ ছিল গ্রাম—একজন প্রধান (গ্রামিক) দ্বারা গ্রাম শাসিত হইত। সাম্রাজ্যের বহির্ভাগে অবস্থিত রাজ্যের রাজারা এবং উপজাতীয় প্রধানরা সম্রাটের নিকট নত থাকিতেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন : ৪৬৭ খ্রীস্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবস্থা কি হইয়াছিল তাহার সঠিক ইতিহাস সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই। পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণের যে সরকারী বংশতালিকা পাওয়া যায় তাহাতে স্কন্দগুপ্তের কোনই উল্লেখ নাই। রাজকীয় বংশধারা প্রথম কুমারগুপ্ত হইতে তাঁহার পুত্র পুরুগুপ্ত এবং তাঁহার পুত্র বুধগুপ্ত—এইভাবে চলিয়া আসিয়াছে। পুরুগুপ্ত তাঁহার ভ্রাতা স্কন্দগুপ্তের পূর্বে অথবা পরে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে আমরা কিছুই জানিতে পারি না। বুধগুপ্তের রাজত্বকাল ২০ বৎসরেরও অধিক সময় বিস্তৃত ছিল এবং তিনি ৪৭৭ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরূঢ়

ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে "বাহিরের দিক্ দিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণই ছিল এবং তাঁহাদের কর্তৃত্ব পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর এবং দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত স্বীকৃত হইত" ; কিন্তু "ইঁহাদের ক্ষমতা ও মর্যাদা বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সীমান্তবর্তী কয়েকটি প্রদেশ—যেমন কাথিয়াবাড় এবং বুন্দেলখণ্ড—অর্ধ-স্বাধীনতা উপভোগ করিত।"

সরকারী বংশতালিকা অনুসারে বুধগুপ্তের পরে তাঁহার ভ্রাতা নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন ; কিন্তু মুদ্রা ও শিলালিপিতে প্রমাণ পাওয়া যায় স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর আরও কয়েকজন রাজা রাজত্ব করিয়াছেন—দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত, বৈন্যগুপ্ত (উঁহারা সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন), ভানুগুপ্ত (ইনি মধ্যপ্রদেশে এক বিখ্যাত যুদ্ধ করিয়াছিলেন) এবং আরও কয়েকজন। বোধ হয় আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং উত্তরাধিকার লইয়া কলহের ফলেই গুপ্ত সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। তোরমান এবং মিহিরকুলের নেতৃত্বে হূণ আক্রমণ এবং মান্দাশোরের যশোধর্মনের মত স্থানীয় শাসনকর্তাদের অভ্যুত্থানের ফলে সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক সৃষ্ট বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইতে আরম্ভ করে।

হিউয়েন-সাঙের বর্ণনা স্বীকার করিলে দেখা যায় যে, মিহিরকুল সরাসরি গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন এবং নরসিংহগুপ্ত তাঁহার কাছে নতিস্বীকার করিতে বাধ্য হন। পরে অবশ্য মৌখরীগণ ও অন্যান্য সামন্তরাজাদের সহায়তায় গুপ্তরাজগণ হূণ আক্রমণকারীকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। মিহিরকুলকে পরে মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু তাঁহার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে হূণ আধিপত্য বিস্তারের সম্ভাবনা লুপ্ত হইল। নরসিংহগুপ্ত বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং নালন্দায় তিনি একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

নরসিংহগুপ্ত এবং তাঁহার দুই উত্তরাধিকারী তৃতীয় কুমারগুপ্ত এবং বিষ্ণুগুপ্তের (যথাক্রমে তাঁহার পুত্র ও পৌত্র) রাজত্বকাল ৫০০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ৫৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতেই এমনকি মগধে পর্যন্ত গুপ্তদের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ: কুমারগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে পুষ্যমিত্রগণ ও হূণগণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। যদিও পুষ্যমিত্রগণকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয় কিন্তু হূণেরা সাম্রাজ্যের মধ্যভাগে ও পশ্চিমাংশে পূর্ববৎ আক্রমণ

চালাইয়া যাইতেছিল এবং স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর উহার কিয়দংশ তাহারা দখল করিয়া লইয়াছিল। নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের বিজয় লাভের পর হূণদের আক্রমণ-আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভাবে দূরীভূত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তৎপূর্বেই সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দুর্বলতার ফলে ভিতর হইতেই সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। বলভীর মৈত্রকগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। যশোধর্মনের অধীনে মান্দাশোর স্বাধীন হইল। মৌখরীগণ উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকায় একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিল। গৌড়ের রাজারা বঙ্গদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল। রাজপরিবারের অভ্যন্তরে বিরোধের ফলে সামন্ত রাজাদের এবং অধীন প্রজাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতে লাগিল। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত শাসকগণ তদানীন্তন রাজনৈতিক সংগ্রামে কখনও কখনও পরস্পর-বিরোধী পক্ষসমূহে যোগদান করিতেন। সর্বশেষে, তাঁহাদের কয়েকজনের বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগ সম্ভবতঃ তাঁহাদের সামরিক বীর্যকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল।

গুপ্ত সম্রাটগণের বংশতালিকা
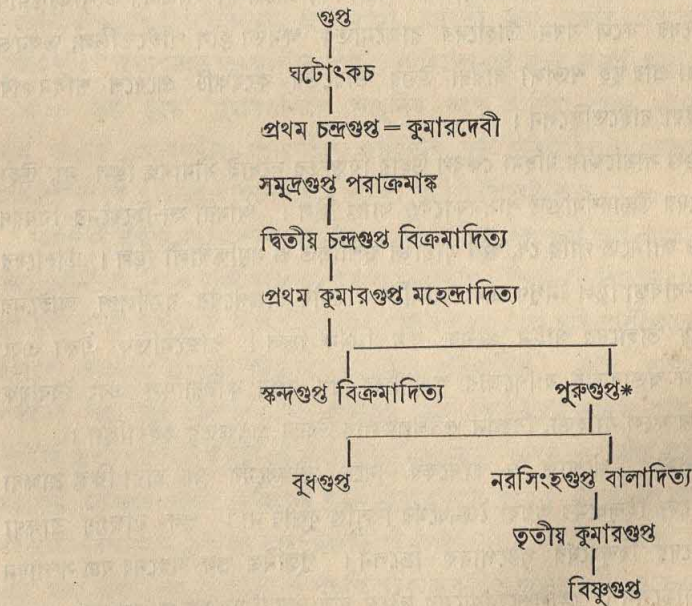
* পুরুগুপ্ত স্কন্দগুপ্ত অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন কি না তাহা জানা যায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুপ্ত সভ্যতা

রাজনৈতিক ঐক্যঃ গুপ্ত রাজগণকে সর্বশেষ বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য স্থষ্টিকারী বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। কারণ, পরবর্তী কালে হর্ষ, গুর্জর-প্রতিহারগণ, পাল রাজগণ, রাষ্ট্রকূটগণ এবং চোলগণ যে সকল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন সেগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের তুলনায় কম বিস্তৃত, কম স্থায়ী এবং কম দীপ্তিমান ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, গুপ্ত যুগের পরে সাম্রাজ্যবাদের প্রাচীন ধারা ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া গিয়াছিল। যদিও গুপ্ত রাজগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ অথবা স্থদূর দক্ষিণাংশ কখনও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন নাই, তবু তাঁহারা প্রায় দুই শতাব্দী কাল যাবৎ ভারতের একটি বিশাল অংশ ঐক্যবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে যখন তাঁহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পাইতেছিল, তখনও তাঁহারা প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া উত্তর ভারতের কয়েকটি প্রদেশে শাসনকার্য চালাইয়া যাইতেছিলেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের মহিমা কেবল উহার বিস্তৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উহা তাঁহাদের উচ্চাদর্শমণ্ডিত শাসনকার্যেও ব্যাপ্ত ছিল। আমরা ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানিতে পারি যে, গুপ্ত সাম্রাজ্য স্থশাসিত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। তাঁহাদের শাসন-ব্যবস্থা ছিল নিপুণ এবং মানবিক ; মৌর্য রাজগণের রক্তলিপ্সু আইনের তুলনায় তাঁহাদের আইন অনেক কম নির্মম ছিল। রাজনৈতিক ঐক্য এবং স্থশাসন স্বভাবতঃই বাণিজ্যের অগ্রগতির পথ স্থগম করিয়াছিল এবং বৈষয়িক উন্নতির ফলে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উন্নয়ন প্রশস্ততর হইয়াছিল।

ধর্মঃ অশোক ও কণিষ্কের সময়ে বৌদ্ধধর্মের জয় দ্বারা কিন্তু ব্রাহ্মণ্য মতবাদের হিন্দুধর্মের অথবা জৈনধর্মের বিলুপ্তি বুঝায় না। শুঙ্গ রাজগণ ব্রাহ্মণ্য মতবাদের হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। হেলিওডোরাসের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভাগবত অথবা বৈষ্ণব মতবাদের হিন্দুধর্ম দ্বারা উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীকগণও

হইয়াছিল। উজ্জয়িনীর শক ক্ষত্রপগণ ব্রাহ্মণ্য মতবাদের হিন্দু ছিলেন। কোন কোন কুষাণ রাজা, যেমন দ্বিতীয় কাদফিসেস এবং প্রথম বাসুদেব, হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিতেন। মৌর্য যুগোত্তর কালে উত্তরাঞ্চলের এবং দক্ষিণাঞ্চলের কতিপয় রাজবংশ (যেমন, ভারশিব নাগরাজগণ, বাকাটক রাজগণ, সাতবাহন রাজগণ, পল্লব রাজগণ এবং সালঙ্কায়ন রাজগণ) অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং গুপ্ত যুগেই 'হিন্দু রেনেসাঁস' বা ব্রাহ্মণ্য মতবাদের হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। তবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, গুপ্ত রাজাদের সক্রিয় আনুকূল্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে শক্তিশালী করিয়াছিল এবং উহাকে নূতন গতি দিয়াছিল। গুপ্ত রাজারা ছিলেন ভক্ত হিন্দু। বিষ্ণুপূজা তাঁহাদের বিশেষ প্রিয় অনুষ্ঠান ছিল।

গুপ্ত যুগের ধর্মসম্বন্ধীয় ইতিহাসের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক্ হইতেছে এই যে এই সময়ে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য মতবাদ ধীরে ধীরে কতকটা আধুনিক হিন্দুধর্মে রূপান্তরিত হইতেছিল। এই রূপান্তরিত মতের লক্ষণ হইল বহু দেবদেবীর (যেমন, বিষ্ণু, শিব, কার্তিকেয়, সূর্য, লক্ষ্মী, পার্বতী এবং অন্যান্য দেবদেবীর) পূজার্চনা। স্বভাবতঃই তৎকালীন শিল্প ও সাহিত্যে এই নূতন আদর্শ স্থান লাভ করে। গুপ্ত যুগে পুরাণগুলিকে আধুনিক রূপে ঢালিয়া সাজা হইয়াছিল এবং তাহাই প্রয়োজনীয় পৌরাণিক কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছিল। ভাস্কর্যশিল্প দেবদেবীগণকে সাধারণ মানুষের গৃহে হাজির করিয়া দিতেছিল।

বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ ইহার শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছিল এবং গুপ্ত যুগে বাস্তবিকই উহা অবনতির দিকে যাইতেছিল—অন্ততঃ মধ্যদেশে ; কিন্তু ফা-হিয়েনের মোহ-মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই দুঃখজনক অবস্থা ধরা পড়ে নাই। অশোকের শক্তিশালী আনুকূল্য ইহাকে ভারতের প্রধান ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ইহা মিনাণ্ডার ও কণিষ্কের ন্যায় বিদেশীদের আকর্ষণ করে এবং খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই ধর্ম চীনে প্রচারিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দে মহাযান বৌদ্ধধর্ম উত্তর ভারতের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। কিন্তু এই মহাযান ধর্মমতের বিকাশকে একদিক দিয়া দুর্বলতারই লক্ষণ বলা যাইতে পারে, কারণ এই মত এমন সব পূজার্চনা ও পদ্ধতি স্বীকার করিত যাহার ফলে ক্রমে বৌদ্ধ-ধর্মকে হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক্ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। গুপ্ত যুগের জনপ্রিয় হিন্দুধর্ম পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল বৌদ্ধধর্মকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়া

ফেলিতে লাগিল। বুদ্ধ হিন্দুর দশ অবতারের (ভগবানের প্রতিভূ) এক অবতাররূপে স্বীকৃত হওয়ার ফলে ঐ পদ্ধতি ত্বরান্বিত হইল।

গুপ্ত যুগের উৎকীর্ণ শিলালিপিতে প্রায়শঃ জৈনধর্মের কথা উল্লেখ আছে; কিন্তু ইহার কঠোর নিয়মনিষ্ঠা ও রাজানুকূল্যের অভাববশতঃ এই ধর্মটির অগ্রগতি ব্যাহত হয়। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্য ভাগে বলভীতে একটি জৈন পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং তথায় শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মনির্দেশসমূহ লিখিত হয়।

গুপ্ত যুগের ধর্মজীবনের মূল কথা হইতেছে পরমতসহিষ্ণুতা। গুপ্ত রাজারা ধর্মমতবিরোধীদিগকে দমন করিতেন না। ধর্মবিশ্বাসে পার্থক্য থাকিলেও তাঁহারা তাঁহাদিগকে উচ্চ পদ দানে ইতস্ততঃ করিতেন না। ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের বিজয় সাম্প্রদায়িক পরমত-অসহিষ্ণুতার উপর গড়িয়া উঠে নাই বা উহাকে উৎসাহও দেয় নাই। ফা-হিয়েনের বিবরণী হইতে প্রমাণিত হয় যে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ ও ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত ছিল।

সাহিত্যঃ জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত যথার্থই বলিয়াছেন যে, গ্রীসের ইতিহাসে পেরিক্লীয় যুগ যে স্থান লাভ করিয়াছে, 'ক্ল্যাসিকাল' ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত যুগ তদ্রূপ স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে গুপ্ত যুগ নিশ্চিত ভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। ঐ যুগে জাতীয় মনীষা ও কল্পনাশক্তির যে বিস্ময়কর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তাহা আংশিক ভাবে রাজনৈতিক ঐক্য ও আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য এবং আংশিক ভাবে গুপ্ত রাজাদের আনুকূল্যে সম্ভব হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত কেবল পাণ্ডিত্যের পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না, তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে যদি বিক্রমাদিত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতের পরিজ্ঞাত ইতিহাসের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যে উৎসাহদানকারী রাজা। সর্বশেষে বলা যায়, ভিনসেন্ট স্মিথের এই মন্তব্যের মধ্যে কিছু সত্য আছে যে, গুপ্ত যুগে ধী-শক্তির যে বিস্ময়কর স্ফুরণ দেখা যায় তাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশসমূহের মধ্যে অবিরত মত ও চিন্তাধারা বিনিময়ের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। এই সময়ে পূর্বে চীন ও পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্যের সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির যে সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল, উহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না; তবু এ কথা বলা যায় যে, ঐ সংযোগই নিঃসন্দেহে বুদ্ধিবৃত্তির উদ্দীপক ও প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করিয়াছে।

গুপ্ত যুগে সংস্কৃত ছিল সাহিত্যের ভাষা। সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল এ কথা বলিলে ভুল হইবে, কারণ ঐ ভাষা কখনও মরিয়া যায় নাই বা মৃতকল্পও হয় নাই। মৌর্যযুগে সংস্কৃত সরকারী ভাষা ছিল না। অশোকের অনুশাসন 'সহজে বোধগম্য বিভিন্ন দেশজ ভাষায়' লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু বহু পণ্ডিত মনে করেন যে, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছিল। পতঞ্জলির মহৎ কীর্তি 'মহাভাষ্য', পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্ব-কালে লিখিত হইয়াছিল। জুনাগড়ে প্রাপ্ত রুদ্রদামনের বিখ্যাত শিলালিপি গোটাটাই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। অশ্বঘোষ এবং চরক বোধ হয় কণিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমগ্র রচনাবলীই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মহাযান বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃত ভাষাকেই সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে ভাব প্রকাশের বাহনরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। গুপ্ত সম্রাট্গণ সেই ধারাকে অব্যাহত রাখিয়াছিলেন এবং নিজেরা আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়া উহাতে নূতন শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশ শিলালিপিই সুন্দর সংস্কৃত ভাষায় কাব্যছন্দে লিখিত। হরিষেণের প্রশস্তি কাব্যে রচিত কাহিনীর একটি চমৎকার নিদর্শন। গুপ্ত রাজগণের মুদ্রাসমূহও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত।

প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার কালিদাস সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য অথবা তাঁহার পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত অথবা উভয়েরই সমসাময়িক ছিলেন। পরম্পরাগত প্রবাদ তাঁহাকে বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নব 'রত্নে'র অন্যতম রত্ন করিয়াছে। তিনি সম্ভবতঃ মালবের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার প্রধান মহাকাব্য 'রঘুবংশম্'-এ বোধ হয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সামরিক বিজয়ের সামান্য ইঙ্গিত আছে। তাঁহার অপর মহাকাব্য 'কুমারসম্ভবম্'-এ হিন্দু দেবতা শিবের প্রতি গুপ্তযুগের সশ্রদ্ধ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার 'মেঘদূতম্' সুকুমার সৌন্দর্যানুভূতিমণ্ডিত এক বিস্ময়কর গীতি-কাব্য। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'কে পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিত ব্যক্তি ও সমালোচকগণও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকটিতে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের পুত্র অগ্নিমিত্রের কথা আছে এবং মনে হয় উহাতে ইতিহাসের দিক্ হইতে মূল্যবান তথ্যাদিও আছে।

গুপ্ত যুগে বহু খ্যাতিমান সাহিত্যকলাকুশলী, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকের

আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নাটক 'মুদ্রারাক্ষসম্'-এর লেখক বিশাখদত্ত, কৌতূহলোদ্দীপক নাটক 'মৃচ্ছকটিকম্'-এর লেখক শূদ্রক, বিখ্যাত শব্দকোষ-রচয়িতা অমরসিংহ, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী প্রসিদ্ধ লেখকদ্বয় বসুবন্ধু ও দিঙ্‌নাগ এবং বিখ্যাত জ্যোতিষী আর্যভট (জন্ম ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দ), বরাহমিহির (৫০৫-৫৮৭ খ্রীস্টাব্দ) এবং ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম ৫৯৮ খ্রীস্টাব্দ)। আর্যভট ও বরাহমিহির গ্রীক্ বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের রচনাদিতে গ্রীক্ প্রভাব পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট।

আমাদের পৌরাণিক সাহিত্য লোকপরম্পরাগত প্রবাদ, পুরাতন কথা, প্রাচীন উপাখ্যান, ধর্মাচরণের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি, উপদেশবাক্য, নৈতিক বিধি এবং ধর্মসম্বন্ধীয় ও দার্শনিক মূলনীতি দ্বারা পরিপূর্ণ। যদিও এই পৌরাণিক সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল অনেক পূর্বে, সম্ভবতঃ ইহা বর্তমান আকার পরিগ্রহ করে গুপ্ত যুগে। ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন পুরাণের সহিত নূতন যুগের সামাজিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন। পুরাণসমূহকে তাঁহারা নূতন রূপ দিয়াছিলেন এবং সহজ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কতকগুলি পুরাণ (যথা, বিষ্ণু পুরাণ, গরুড় পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ) কিছুটা সম্প্রদায়গত। গুপ্ত যুগে যে নব-হিন্দুত্বের রীতিনীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্যই ঐগুলি রচিত হইয়াছিল।

অনুরূপ পদ্ধতিই প্রাচীন স্মৃতি সাহিত্যের রূপ পরিবর্তিত করিয়াছিল। ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘাতের ফলে ধীরে ধীরে যে সকল সামাজিক পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছিল তাহা নূতন স্মৃতি রচনাবলীতে (যেমন, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের গ্রন্থের অধুনা প্রচলিত সংস্করণে) রূপ এবং অনুমোদন লাভ করিয়াছিল।

শিল্পকলা—গুপ্ত যুগের কথা বলিতে গিয়া ভিনসেণ্ট্ স্মিথ বলিয়াছেন, "স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রাঙ্কন—একই পর্যায়ের এই তিনটি শিল্পকলা গুপ্তযুগে উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল।" দুঃখের বিষয়, গুপ্তযুগের অধিকাংশ অট্টালিকা ও মন্দিরই মুসলমান অভিযানকারীর দল বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং সে যুগের স্থাপত্যের পূর্ণ ও তুলনামূলক বিবরণ উপস্থাপিত করা সম্ভব নহে। দেওগড়ে (ঝাঁসী জিলা, উত্তর প্রদেশ) অবস্থিত একটি প্রস্তরনির্মিত মন্দির এবং ভিতরগাঁও-এ (কানপুর জিলা, উত্তর প্রদেশ) অবস্থিত একটি ইষ্টক-নির্মিত মন্দির—গুপ্ত যুগের স্থাপত্যের চমকপ্রদ এই দুইটি নিদর্শন মাত্র বর্তমান

আছে। সম্ভবতঃ কাশীর সন্নিকটস্থ সারনাথে গুপ্ত যুগের কয়েকটি বিস্ময়কর প্রস্তরনির্মিত মন্দির বিদ্যমান ছিল।

গুপ্ত রাজাদের শাসনকালে ভাস্কর্যকলা নিঃসন্দেহে চমৎকারিত্বের উন্নত শিখরে উঠিয়াছিল। সারনাথে গুপ্ত যুগের বহু মূর্তি ও অন্যান্য নিদর্শন সঞ্চিত আছে। উহাদের কতকগুলি গুণের দিক হইতে খুবই উচ্চস্তরের। ঐ সব মূর্তি সমুদ্রগুপ্ত এবং তাঁহার বংশধরগণের সময়কার। ঐ সকল ভাস্কর্যের বিষয়ের মধ্যে যেমন বৌদ্ধধর্মোক্ত ঘটনাবলী আছে তেমনই পৌরাণিক ঘটনাবলীও আছে। গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যে প্রীতিকর লক্ষণাদি সুপরিস্ফুট। মূর্তিসমূহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য, তাহাদের ভঙ্গিমার কমনীয় সম্ভ্রম এবং রূপারোপে সংযত ও মার্জিত রুচি প্রভৃতি যে সকল গুন তদানীন্তন ভাস্কর্যের বিশেষত্ব ছিল, তাহা ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পে আর কুত্রাপি চোখে পড়ে না।

বিশ্ববিশ্রুত অজন্তাগুহাগুলি প্রথম হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। প্রাচীরচিত্রের দ্বারা ইহাদের অভ্যন্তরভাগ সজ্জিত ছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একাধিক শিল্পরসিক ও শিল্পবিশেষজ্ঞ এই চিত্রাবলীর অবিমিশ্র প্রশংসা করিয়াছেন। উহাদের কতকাংশ যে গুপ্তযুগে অঙ্কিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বিভিন্ন ধাতুর সাহায্যে নানা বস্তু তৈয়ারীর ব্যাপারে গুপ্ত যুগের শিল্পী ও কারিগরগণ চমৎকার দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিল। দিল্লীতে অবস্থিত চন্দ্ররাজের নামাঙ্কিত লৌহনির্মিত বিখ্যাত স্তম্ভটি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে তৈয়ারী হইয়াছিল। বহু শতাব্দী ধরিয়া ক্রমান্বয়ে রৌদ্র ও বৃষ্টির আক্রমণ সত্বেও উহাতে বিন্দুমাত্র মরিচা ধরে নাই। ঐ সময় তাম্র দ্রব করিয়া মূর্তি গঠনের কাজও যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

বহির্বিশ্বের সহিত সংযোগ—গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষ জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন দেশের সহিত ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে চীনদেশে প্রচারকদল প্রেরিত হইয়াছিল। চীন হইতে কতিপয় বৌদ্ধ পর্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন। ভারতও তাহার কতিপয় স্বনামধন্য সন্তানকে চীনদেশে পাঠাইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে কুমারজীবের (আনুমানিক ৩৮৩ খ্রীস্টাব্দ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরের যুবরাজ

গুণবর্মণ, যিনি যবদ্বীপবাসীদিগকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তিনি চীনদেশের নানকিং শহরে ৪৩১ খ্রীস্টাব্দে মারা যান।

উৎকীর্ণ শিলালিপি ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় সাক্ষ্যাদি হইতে এ কথা সহজেই বলা যায় যে, গুপ্ত যুগে মালয় উপদ্বীপ এবং তৎপার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ভারতীয় নাবিকগণের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক উদ্যোগে এবং রণনিপুণ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি যবদ্বীপ, সুমাত্রা, ক্যাম্বোডিয়া এবং ঐ অঞ্চলের অন্যান্য দ্বীপে নীত হইয়াছিল।

সপ্তম শতাব্দীতে ভারত ও পারশ্য যে নিজেদের মধ্যে দূত বিনিময় করিয়াছিল অজন্তা গুহাচিত্রে তাহা রেখাঙ্কিত আছে। কুষাণ যুগে সম্ভবতঃ রোম সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের যোগ স্থাপিত হয়, পরেও তাহা অব্যাহত ছিল। রোম সাম্রাজ্যে তিনটি দল (৩৩৬ খ্রীস্টাব্দ, ৩৬১ খ্রীস্টাব্দ ও ৫৩০ খ্রীস্টাব্দ) প্রেরণের উল্লেখ দেখা যায়। ইহা ছাড়া, গুপ্ত যুগের মুদ্রাসমূহে রোমক প্রভাব সুস্পষ্ট।

নবম অধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদের পতন

প্রথম পরিচ্ছেদ

হূণদের আক্রমণ এবং রাজনৈতিক বিভেদ

হূণগণ এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য—খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে হিউং-নূ জাতি উত্তর-পশ্চিম চীন হইতে ইউ-চি-জাতিকে বিতাড়িত করে। হিউং-নূ জাতি ভারতীয় সাহিত্যে ও উৎকীর্ণ লিপিতে হূণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিছুকাল পরে হূণেরা পশ্চিমদিকেও অগ্রসর হয়। হূণদের একটি শাখা ধীরে ধীরে ইউরোপে আসিয়া উপনীত হয় এবং নিষ্ঠুরভাবে রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংস করে। অপর একটি শাখা খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে অক্সাস নদীর উপত্যকায় শিবির স্থাপন করে। ইহারা এপ্‌থালাইট্‌স্ বা শ্বেত হূণ নামে পরিচিত। ইহারা

স্কন্দগুপ্তের রাজত্বের প্রথম ভাগে (৪৫৮ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করে, কিন্তু গুপ্ত সম্রাট ইহাদের প্রতিহত করিতে সমর্থ হন। হূণগণ ৪৮৪ খ্রীস্টাব্দে শাশানীয় রাজা ফিরোজকে হত্যা করিয়া ধীরে ধীরে কাবুল ও পারশ্য অধিকার করে। পারশ্য জয়ের পরে হূণেরা অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে। তাহারা একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলে। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বল্‌খ্‌।

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্য পূর্বাপেক্ষা আরও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। হূণেরা আবার ভারত আক্রমণ করিল। হূণদের প্রথম বিখ্যাত দলপতির নাম হইতেছে তোরমান। কতিপয় শিলালিপিতে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। সম্প্রতি বলা হইতেছে যে তিনি জাতিতে হূণ ছিলেন না, তিনি একজন কুষাণ প্রধান, হূণদের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। যাহা হউক, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের একটি বিরাট অংশ তিনি দখল করিয়া লইয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহার ক্ষমতা মধ্য মালব পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ৫১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভানুগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হন।

তোরমানের পর তাঁহার পুত্র মিহিরগুল বা মিহিরকুল রাজা হন। মিহিরকুল একজন নৃশংস ও বিশ্বাসঘাতক শাসক ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মদ্বেষী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধদের বহু স্তূপ এবং মঠ ধ্বংস করেন। গোয়ালিয়র পর্যন্ত তিনি তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি মালবের অন্তর্গত মান্দাশোরের শাসনকর্তা যশোধর্মন কর্তৃক পরাজিত হন। তিনি পুনরায় নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য কর্তৃক পরাজিত ও বন্দী হন, কিন্তু পরে মুক্তিলাভ করেন। সম্ভবতঃ বালাদিত্যের বিজয় মধ্য ভারতকে হূণদের কবল হইতে মুক্তি দান করে এবং উহার ফলে সেই অঞ্চলে গুপ্ত রাজাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতে হূণ আক্রমণকারীদিগকে নির্মূল করিবার জন্য বালাদিত্য এবং যশোধর্মন একত্র হন। কিন্তু এই মত সমর্থনের উপযুক্ত কোন নির্দিষ্ট তথ্যাদি পাওয়া যায় না। পরাজিত মিহিরকুল কাশ্মীরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অনতিবিলম্বে সেই সিংহাসন দখল করিয়া লন। মিহিরকুলের রাজধানী পশ্চিম পঞ্জাবের শাকল (শিয়ালকোট) নামক স্থানে ছিল। সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার রাজত্বের অবসান হয়।

হূণদিগের হিন্দুসমাজে অন্তর্ভুক্তি—মিহিরকুলের মৃত্যুর

পর হূণেরা নেতাশূন্য হইয়া পড়িল। ফলে তাহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পাইল। কিন্তু শিলালিপি ও বিভিন্ন সাহিত্যগত প্রমাণ হইতে দেখা যায়, খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাহারা ভারতীয় রাজগণকে উত্যক্ত করিয়াছে। থানেশ্বরের প্রভাকরবর্ধনকে "হূণ হরিণদের নিকট সিংহ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ হূণেরা ধীরে ধীরে আক্রান্ত দেশের ধর্ম ও ভাষা গ্রহণ করে, এইরূপে ক্রমশঃ হিন্দুসমাজে মিশিয়া যায়। একাদশ শতাব্দীর একজন কলচুরি রাজা এক হূণ রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। হূণদের সঙ্গে সঙ্গে অথবা পরে গুর্জরদের ন্যায় কোন কোন বৈদেশিক গোষ্ঠী ভারতে আসে। তাহারাও পরিণামে ভারতীয় জনসাধারণের সহিত মিশিয়া যায়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর বর্বর জাতিদের আক্রমণকে স্মিথ উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের পরিবর্তনের দিক্‌চিহ্ন বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন তাহা যথার্থ। রাজনৈতিক দিক্ হইতে ঐ সকল আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের এবং সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টির কারণ হইয়াছিল। সামাজিক দিক হইতে উহারা একটি বিপ্লবের সৃষ্টি করে যাহার ফলে তথাকথিত ক্ষত্রিয় রাজপুতদের[১] অভ্যুত্থান হয়।

বলভীর মৈত্রকরাজগণ—গুপ্ত রাজাদের শাসনের বিরুদ্ধে যে সব প্রদেশ বিদ্রোহ করিয়াছিল সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াবাড়) তাহাদের অন্যতম। এই স্থানের শাসক বংশ ছিল মৈত্রক গোষ্ঠীসম্ভূত। এই গোষ্ঠীকেই স্মিথ উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণাদি ব্যতিরেকে ইরাণ দেশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম ভটার্ক। ইঁহার রাজধানী ছিল বলভীতে। সপ্তম শতাব্দীতে দ্বিতীয় ধ্রুবসেন হর্ষের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী চতুর্থ ধ্রুবসেন আড়ম্বরপূর্ণ সম্রাট মর্যাদা জ্ঞাপক উপাধি গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ তাঁহারই রাজত্বকালে বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্য 'ভট্টিকাব্যম্' রচিত হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে বলভী শিক্ষার একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। অষ্টম শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে সিন্ধু দেশের আরবগণ সম্ভবতঃ এই রাজ্যের অবসান ঘটায়।

মান্দাশোরের যশোধর্মন—অত্যাচারী মিহিরকুলকে যিনি পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই মান্দাশোরের যশোধর্মনের কথা আমরা ইতিপূর্বে

---

১ একাদশ অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

উল্লেখ করিয়াছি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসকগণ যে সব প্রদেশে বাস করিতেন উহাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ হইতেছে মান্দাশোর। যশোধর্মন গুপ্ত রাজাদের ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া স্বীয় জয়ের কথা ঘোষণা করিবার জন্য বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেন। ৫৩৩ খ্রীস্টাব্দের একটি শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পশ্চিমে মহাসাগর এবং উত্তরে হিমালয় পর্বত হইতে দক্ষিণে পূর্বঘাট পর্বত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসকগণ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ের এই লোকপরম্পরাগত কাহিনী অবশ্য পুরাপুরি সত্য নয়। যশোধর্মনের ক্ষমতা নিশ্চয়ই স্বল্পস্থায়ী ছিল। কতিপয় আধুনিক পণ্ডিত তাঁহাকেই ইতিহাসখ্যাত বিক্রমাদিত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যশোধর্মন কখনও শক রাজাদের পরাজিত করেন নাই, তিনি উজ্জয়িনীতেও রাজত্ব করেন নাই। তিনি যে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, সমসাময়িক তেমন কোন প্রমাণও নাই।

মৌখরী বংশ—মৌখরীরা বোধ হয় ক্ষত্রিয় ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর তাহারা উত্তর ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই বংশ কয়েকটি শাখায় বিভক্ত ছিল। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি গাঙ্গেয় উপত্যকায় খুবই ক্ষমতাশালী হইয়াছিল। ইহারা সাধারণতঃ কনৌজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অপর একটি শাখা বিহারের গয়া অঞ্চলে রাজত্ব করিত। তৃতীয় শাখাটির ইতিহাস পাওয়া যায় রাজস্থানের ভূতপূর্ব কোটা রাজ্যে।

মৌখরী পরিবারের কনৌজ শাখার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হইতেছেন ঈশানবর্মণ (আনুমানিক ৫৫৪ খ্রীঃ)। তিনি অন্ধ্র, স্থলিক (এই জাতি ঠিক কোথায় বাস করিত তাহা নিশ্চিত ভাবে জানা যায় নাই) এবং গৌড় জাতির উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করেন। তিনি সম্রাট মর্যাদা জ্ঞাপক উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মৌখরী ও 'পরবর্তী' গুপ্ত রাজগণের সহিত দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে মৌখরী শক্তির বিকাশের সঙ্গে উহার অবসান হয়। থানেশ্বরের প্রভাকরবর্ধন 'পরবর্তী' গুপ্ত রাজগণের মিত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার কন্যা রাজ্যশ্রীকে গ্রহবর্মণ নামক একজন মৌখরী যুবরাজের সহিত বিবাহ দেন। থানেশ্বর এবং কনৌজের মধ্যে এই মিত্রতার পর, মালবের শাসনকর্তাদের সমসাময়িক 'পরবর্তী' গুপ্তবংশের (?)

দেবগুপ্ত গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের সহিত পূর্বোল্লিখিত মিত্রতার বিরুদ্ধে একটি প্রতি-মিত্রতা চুক্তি করেন। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর দেবগুপ্ত ও শশাঙ্ক সম্ভবতঃ যুক্তভাবে মৌখরী রাজ্য আক্রমণ করেন, ফলে উহা ধ্বংস হইয়া যায়।

'পরবর্তী' গুপ্তরাজগণ—মৌখরীগণের ন্যায় তথাকথিত 'পরবর্তী' গুপ্তরাজগণও প্রথমে গুপ্ত সম্রাট্‌গণের অধীনস্থ সামন্ত রাজা ছিলেন। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাঁহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সম্ভবতঃ এই বংশ প্রথমাবধি মগধেই রাজত্ব করে। কিন্তু অনেকে বলেন, প্রথমে ইহারা মালবে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, পরে মগধে তাঁহাদের রাজত্ব বিস্তার করেন। 'পরবর্তী' গুপ্তরাজগণ ক্রমে গৌড় এবং মগধের শাসনকর্তা হন। "অর্থাৎ গুপ্ত সাম্রাজ্যের যে সকল অংশ স্বাধীন হয় নাই, সেই সকল অংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী রূপে উঁহারা দখল করিয়া লন।" কিন্তু উঁহারা যে গুপ্তরাজবংশসম্ভূত ছিলেন তাহা প্রমাণ করিবার মত কোন সাক্ষ্যাদি নাই। এমন কি, তাঁহাদের সভাকবিগণও তাঁহাদিগকে গুপ্তবংশজ বলিয়া দাবি করেন নাই।

এই বংশের প্রথম শক্তিশালী ও স্বাধীন সম্রাট্ ছিলেন বোধ হয় কুমারগুপ্ত। তিনি মৌখরী-রাজ ঈশানবর্মণকে পরাজিত করেন। তাঁহার পুত্র দামোদরগুপ্তও মৌখরীদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। দামোদরগুপ্তের পুত্র মহাসেনগুপ্ত কামরূপের (আসাম) রাজা সুস্থিতবর্মাকে পরাজিত করেন এবং মালব স্বীয় শাসনাধীনে আনেন। কিন্তু বলভীর মৈত্রকগণ ও কলচুরি রাজগণ ছিলেন তাঁহার শক্তিশালী শত্রু। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কও ঐ সময় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বিপর্যয়ের মধ্যে সম্ভবতঃ তাঁহার (মহাসেনগুপ্তের) জীবনাবসান ঘটে এবং তাঁহার পুত্রগণ থানেশ্বরের রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র মাধবগুপ্ত হর্ষের মৃত্যুর পর মগধের শাসনকর্তা হন। তাঁহার পুত্র আদিত্যসেন খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি সম্রাট্ মর্যাদা জ্ঞাপক উপাধি গ্রহণ করেন এবং মৌখরীদের ও নেপালের শাসনকর্তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগে 'পরবর্তী' গুপ্তরাজগণের ক্ষমতা লোপ পায়। মালবের দেবগুপ্ত মৌখরী ও পুষ্যভূতিবংশীয় রাজগণের শত্রু ছিলেন। তিনি বোধ হয় 'পরবর্তী' গুপ্তবংশের কোন সমপুরুষ জ্ঞাতি-শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

গৌড়ের রাজবংশ—উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে নিশ্চিত ভাবে

প্রমাণিত হয় যে, চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বঙ্গদেশ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ঐসব বিভক্ত রাজ্যগুলি সম্ভবতঃ স্বাধীন ছিল। ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র, সমাচারদেব নামক তিনজন রাজা স্বাধীনতা সূচক উপাধি গ্রহণ করেন এবং সম্ভবতঃ ধ্বংসোন্মুখ গুপ্ত রাজগণের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড়বাসীদের (অর্থাৎ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গদেশের জনসাধারণ) সঙ্গে মৌখরীদের বিরোধ আরম্ভ হয়।

শশাঙ্ক—গৌড়ের রাজগণের মধ্যে প্রধানতম ছিলেন শশাঙ্ক। ইনি থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের ও কনৌজের মৌখরীদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সম্ভবতঃ আদিতে তিনি 'পরবর্তী' গুপ্তরাজাদের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন, মহাসেনগুপ্তের ক্ষমতা হ্রাস পাইবার পর তিনি স্বাধীন হইয়া বসেন। যাহা হউক, 'পরবর্তী' গুপ্তরাজগণ ও মৌখরী রাজগণের মধ্যে সংগ্রাম শশাঙ্ককে পশ্চিমদিকে তাঁহার রাজত্ব বিস্তারের চমৎকার সুযোগ আনিয়া দেয়। মালবের দেবগুপ্তের সহিত সম্ভবতঃ মহাসেনগুপ্তের বিরোধ ছিল। শশাঙ্ক দেবগুপ্তের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর এই দুই নৃপতি যুক্তভাবে মৌখরী রাজ্যের উপর আক্রমণ চালান। মৌখরীরাজ গ্রহবর্মণ নিহত হন এবং তাঁহার স্ত্রী থানেশ্বরের প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রী কনৌজের এক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। প্রভাকরবর্ধনের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী রাজ্যবর্ধন ভগ্নীর উপর অবিচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য বিপুল বাহিনী লইয়া অগ্রসর হন। তিনি দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন, কিন্তু সম্ভবতঃ শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন (৬০৬ খ্রীঃ)। এই বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী পাওয়া যায় পুষ্যভূতি বংশের বন্ধু ও 'হর্ষচরিত' গ্রন্থের রচয়িতা বাণভট্টের এবং হিউয়েন সাঙ্-এর রচিত গ্রন্থে। এই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কিছু অবকাশ আছে। শশাঙ্ক যদিও কনৌজ দখল করিয়াছিলেন তথাপি বেশী দিন উহা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী হর্ষবর্ধন স্বভাবতঃই ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শশাঙ্কের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল সে সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। হর্ষ কামরূপের ভাস্করবর্মণের সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হন। একটি শিলালিপি হইতে জানা যায়,

শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জিলা, পশ্চিম বঙ্গ) শহরটি কিছুকাল কামরূপের রাজার দখলে ছিল। কর্ণসুবর্ণের যে শাসককে ভাস্করবর্মণ সিংহাসনচ্যুত করেন তিনি সম্ভবতঃ শশাঙ্কের উত্তরাধিকারী ছিলেন। ৬১৯ ও ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন একসময় শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। পূর্ব উপকূলের গঞ্জাম (উড়িষ্যা) পর্যন্ত তিনি তাঁহার রাজত্ব বিস্তার করেন। পুষ্যভূতি বংশের অনুকূলে প্রচারিত জনপ্রবাদে তাঁহাকে বৌদ্ধধর্মের নিগ্রহকারী বলিয়া দেখানো হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হর্ষবর্ধন

পুষ্যভূতি রাজবংশের গোড়ার ইতিহাস—পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে থানেশ্বরে পুষ্যভূতি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। হূণদের আক্রমণের ফলে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় সম্ভবতঃ সেই সুযোগেই এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বংশের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শাসক হইতেছেন প্রভাকরবর্ধন। তিনি গুর্জরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং তাঁহার ক্ষমতা মালব ও গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি 'পরবর্তী' গুপ্ত রাজা মহাসেনগুপ্তের মিত্র ছিলেন। তাঁহার শাসনকালের শেষ ভাগে তিনি কনৌজের মৌখরীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার জামাতা গ্রহবর্মণ, তাঁহার কন্যা রাজ্যশ্রী এবং তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী রাজ্যবর্ধনের জীবনে যে শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিয়াছিল ইতিপূর্বে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

হর্ষের প্রথম জীবন—রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে থানেশ্বর ও কনৌজের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বৎসর হইতে হর্ষাব্দ আরম্ভ হয়। গ্রহবর্মণের মৃত্যুতে কনৌজের সিংহাসন শূন্য হইলে মৌখরী রাজ্যের মন্ত্রিগণের অনুরোধে সম্ভবতঃ হর্ষ কনৌজের সিংহাসনে আরোহণ করেন। চীনা ভাষায় লিখিত কোন সূত্র হইতে জানা যায় যে, স্বামীর রাজ্য শাসনের ব্যাপারে রাজ্যশ্রী হর্ষের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। প্রথমে

হর্ষ 'রাজপুত্র' এই উপাধি গ্রহণ করেন। ৬১২ খ্রীস্টাব্দে তিনি সার্বভৌমত্ব সূচক উপাধি গ্রহণ করেন। গ্রহবর্মণের ভ্রাতা অবন্তীবর্মণের মৌখরী সিংহাসনের উপর ন্যায়সঙ্গত দাবি ছিল। তিনি সম্রাট্ মর্যাদা জ্ঞাপক উপাধিও গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেই সম্ভবতঃ হর্ষের সার্বভৌমত্ব ঘোষণায় বিলম্ব হইয়াছিল। যাহা হউক, হর্ষের অধীনে থানেশ্বর ও কনৌজের ঐক্যবদ্ধতার ফলে উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকায় একটি বিরাট ও শক্তিশালী রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। হর্ষ তাঁহার রাজধানী কনৌজে স্থানান্তরিত করেন এবং উহাকে রাজনৈতিক দিক হইতে উত্তর ভারতের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত করেন।

রাজকীয় ক্ষমতা অর্জনের পর হর্ষের প্রধান কর্তব্য হইল বন্দিনী রাজ্যশ্রীকে মুক্ত করা। এক বিরাট বাহিনী লইয়া তিনি কনৌজের দিকে অগ্রসর হন। পথে তিনি কামরূপের (আসাম) রাজা ভাস্করবর্মণের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। ইহা বিজ্ঞজনোচিত কূটনৈতিক চাল। কারণ, এই চুক্তির পর পূর্ব এবং পশ্চিম—উভয় দিক হইতেই শশাঙ্কের রাজ্য আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। গৌড়ের রাজা অবশ্য আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার মৃত্যুর পর ভাস্করবর্মণ তাঁহার রাজধানী অধিকার করেন। কামরূপের সহিত মিত্রতা চুক্তি নিষ্পন্ন করিবার পর হর্ষ জানিতে পারিলেন যে কনৌজের বন্দীশালা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রাজ্যশ্রী বিন্ধ্যের অরণ্যে চলিয়া আসিয়াছেন। প্রবল অনুসন্ধানের পর তিনি যখন রাজ্যশ্রীর সন্ধান পাইলেন তখন তিনি সহচরীদের সহিত একসঙ্গে অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হর্ষ এবং তাঁহার মিত্র কামরূপের রাজা কর্তৃক ভীতি প্রদর্শনের ফলে শশাঙ্ক সম্ভবতঃ কনৌজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

হর্ষের বিজয়—হিউয়েন সাঙ্ হর্ষের অভিযানসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি তাঁহার বিজয়ের প্রমাণসিদ্ধ পূর্ণ বিবরণ দেন নাই। শশাঙ্ক স্বভাবতঃই ছিলেন হর্ষের ক্রোধের প্রথম লক্ষ্য। কিন্তু তিনি কিভাবে শক্তিশালী গৌড়ের নৃপতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। শশাঙ্ক অন্ততঃ ৬১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ণ গৌরবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দের কিছু পূর্বে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষ মগধে স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হর্ষ উত্তরবঙ্গও জয় করিয়াছিলেন। তিনি ৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে কোঙ্গোদ এলাকা (গঞ্জাম জিলা, উড়িষ্যা) জয় করেন। পশ্চিম দিকে

তিনি বলভীর রাজাকে পরাজিত করেন। হিউয়েন সাঙ্ বলেন যে, বলভীর দ্বিতীয় ধ্রুবসেন হর্ষের কন্যাকে বিবাহ করেন। হর্ষ যে সিন্ধু ও কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু এই সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। দক্ষিণ দিকে নর্মদা নদী অতিক্রম করিয়া তিনি রাজ্যবিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। বাতাপীর চালুক্যরাজ পরাক্রমশালী দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহার আক্রমণ প্রতিহত করেন। হর্ষের গুরুতর ক্ষতি হয়। ৬৩৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে এই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল।

শিলালিপিতে হর্ষকে 'সমগ্র উত্তরাপথের প্রভু' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শিলালিপির ভাষায় অতিরঞ্জন প্রকাশ পাইয়াছে। অথচ সেই সময়কার অন্যান্য শিলালিপির লেখন হইতে এবং হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণী হইতে পরিষ্কার জানা যায় যে, হর্ষের সাম্রাজ্য একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় বিস্তৃত ছিল। পঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলীয় কতকগুলি জিলায়, বর্তমান উত্তর প্রদেশের সমস্ত এলাকায় (মথুরা বাদে), বিহার, বঙ্গ ও কোঙ্গোদ অঞ্চল (গঞ্জাম) সহ উড়িষ্যায় তাঁহার প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াবাড়) ও কামরূপে (আসাম) তাঁহার শাসন-ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ বর্তমান। তবে উত্তর ভারতের সমস্ত সমসাময়িক নৃপতিই তাঁহার ক্ষমতা স্বীকার করিতেন।

চীনের সহিত সম্পর্ক—ইহা সর্বজনবিদিত যে বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ হর্ষের রাজত্বকালে ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ৬২৯ খ্রীস্টাব্দে ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি যাত্রা শুরু করেন এবং তাসখন্দ ও সমরখন্দ অতিক্রম করিয়া ৬৩০ খ্রীস্টাব্দে গান্ধারে আসেন। ৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারত পরিত্যাগ করেন এবং কাসগড়, ইয়ারখন্দ ও খোটানের ভিতর দিয়া চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশ পরিদর্শন করেন। সেই সময়ে তিনি দেশ, স্মৃতিস্তম্ভ, জনসাধারণ ও ধর্ম সম্পর্কে বহু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। ইহার ফলে তিনি 'ভারতীয় পসানিয়াস' (Pausanias) নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। তিনি প্রায় ৮ বৎসর (৬৩৫-৬৪৩ খ্রীস্টাব্দ) হর্ষের রাজত্বে বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বন্ধুত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণীকে হর্ষের যুগে ভারতের রাজনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় তথ্যের ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে। স্মিথ ঠিকই বলিয়াছেন, হিউয়েন সাঙের নিকট ভারতের ইতিহাস যে কত ঋণী তাহা সঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

৬৪১ খ্রীস্টাব্দে হর্ষ চীনের তাঙ্‌ সম্রাট তাই-স্থঙের নিকট একজন ব্রাহ্মণ দূত প্রেরণ করেন। একটি চীনা সাংস্কৃতিক দলও পরবর্তী কালে তাঁহার রাজসভা পরিদর্শন করেন।

হর্ষের শাসন-ব্যবস্থা—হর্ষ একজন উদার শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার বিশাল রাজ্যের বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা তিনি ব্যক্তিগতভাবে দেখাশুনা করিতেন। হিউয়েন সাঙ্‌ বলেন, "তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী, তাঁহার জীবনের দিনগুলি (তাঁহার কাজের তুলনায়) ছিল অতি সংক্ষিপ্ত।" পরামর্শ দিবার জন্য সম্ভবতঃ তাঁহার একটি মন্ত্রিসভা (মন্ত্রি-পরিষদ) ছিল। তাঁহার রাজ্যের দূরবর্তী প্রদেশসমূহ রাজপ্রতিনিধিগণ বা সামন্ত রাজগণ শাসন করিতেন। এই শাসকবৃন্দ সম্ভবতঃ বেশ দক্ষ ছিলেন। প্রদেশগুলি (ভুক্তি) কতকগুলি জিলাতে (বিষয়) বিভক্ত ছিল। স্বভাবতঃই গ্রাম ছিল শাসন-ব্যবস্থার সর্বনিম্ন কেন্দ্র। রাজস্বের হার ছিল খুবই কম। কৃষকদিগকে তাহাদের উৎপন্ন শস্যের মাত্র এক-ষষ্ঠাংশ রাজকররূপে দিতে হইত। দণ্ডবিধি গুপ্তযুগের তুলনায় কঠোরতর ছিল। সাধারণ শাস্তি ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, দেশ হইতে বহিষ্কার এবং অঙ্গচ্ছেদ। লঘু অপরাধের জন্য সাধারণতঃ জরিমানা হইত। অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ কিনা তাহা কখনও কখনও অগ্নি, জল প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষা করা হইত। দণ্ডবিধি কঠোর হওয়া সত্ত্বেও গুপ্তযুগের তুলনায় এই সময় অপরাধ বেশী হইত। কিন্তু ভারতীয়দের চরিত্রে হিউয়েন সাঙ্‌ খুবই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, "তাহারা অন্যায় ভাবে কিছু গ্রহণ করিত না। অপরের পাপের শাস্তি দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত ভীত হইত এবং তাহাদের জীবন হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিত। তাহারা প্রবঞ্চনা করিত না এবং তাহাদের প্রতিজ্ঞা তাহারা রক্ষা করিত।" হর্ষের কয়েক শতাব্দী পূর্বে মেগাস্থিনিস যাহা বলিয়াছিলেন হিউয়েন সাঙ্‌-এর বিবৃতি যেন তাহারই প্রতিধ্বনি।

হর্ষের শাসনাধীনে কনৌজ—হর্ষের অধীনে কনৌজ উত্তর ভারতের প্রধান নগরে পরিণত হয় এবং পাটলিপুত্রের গৌরব স্তিমিত হইয়া পড়ে। হিউয়েন সাঙ্‌ বলেন যে, এই শহরটি ছিল বেশ বড় (দৈর্ঘ্যে ৫ মাইল এবং প্রস্থে ১$\frac{1}{2}$ মাইল), বেশ সুরক্ষিত আর সুন্দর। এখানে প্রায় একশত বৌদ্ধ বিহার ও প্রায় দুইশত দেবমন্দির ছিল।

কনৌজে যে চমৎকার ধর্ম-সম্মেলন হইত চীনা পর্যটক তাহার একটি

বিস্তারিত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। হিউয়েন সাঙ্ ও ভাস্করবর্মণের সমভি-ব্যাহারে হর্ষ তাঁহার শিবির হইতে গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতেন। সম্মেলনের সমীপবর্তী হইলে বহু রাজা ও ধর্মগুরু তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেন। সম্মেলনের কার্যাবলী একটি শোভাযাত্রা দ্বারা আরম্ভ হইত। শোভাযাত্রায় একটি হস্তিপৃষ্ঠে বুদ্ধের প্রতিমূর্তি বাহিত হইত। শোভাযাত্রা সমাপ্ত হইলে হর্ষ সেই মূর্তিকে পূজা অর্পণ করিতেন এবং একটি গণভোজ দিতেন। তারপর সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হইত। অতঃপর হিউয়েন সাঙ্ মহাযান মতের নীতিবাক্য ব্যাখ্যা করিতেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদিগের প্রতি হর্ষ অত্যধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন বলিয়া ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হন। তাঁহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য একজন গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করেন। সৌভাগ্যক্রমে হত্যাকারীর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রধান আসামীরা শাস্তি পায়, কিন্তু অন্যদিগকে দয়া প্রদর্শন করা হয়।

প্রয়াগে পঞ্চবার্ষিক দানোৎসব—প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তে গঙ্গা ও যমুনার পবিত্র সঙ্গমস্থলে প্রয়াগে (এলাহাবাদ) হর্ষ এক ভাবগম্ভীর ধর্মোৎসবের আয়োজন করিতেন। কনৌজের অনুষ্ঠান শেষ হইলে হর্ষ হিউয়েন সাঙ্কে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক দানোৎসব দর্শন করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। সেই উৎসবের কার্যাবলী ৭৫ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু রাজারাজড়া সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। স্বল্পকালের জন্য যে বিহার নির্মিত হইয়াছিল প্রথম দিন তাহাতে বুদ্ধ মূর্তি স্থাপন করা হইত এবং ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ উৎসর্গ করা মূল্যবান দ্রব্যাদি বিতরণ করা হইত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে সূর্য ও শিবের পূজা করা হইত। ঐ দুই দিন যে সব উপহার বিতরণ করা হইত তাহা পূর্বদিনের দ্রব্যাদির তুলনায় কম মূল্যবান। চতুর্থ দিন ১০,০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষুকে দান করা হইত। পরবর্তী কুড়ি দিন ধরিয়া ব্রাহ্মণদের উপহার প্রদান করা হইত। পরের দশ দিন জৈন এবং অন্যান্য ধর্মমতাবলম্বীদের উপহার দেওয়া হইত। তারপর দশ দিন ধরিয়া ভিখারীদের ভিক্ষা দেওয়া হইত। পরের এক মাস দরিদ্র, পিতৃমাতৃহীন এবং নিঃসম্বলদিগকে দান করা হইত। এইভাবে গত পাঁচ বৎসরে সঞ্চিত সমস্ত সম্পত্তিই নিঃশেষ হইয়া যাইত। অতঃপর হর্ষ তাঁহার নিজস্ব ধনরত্ন ও দ্রব্যাদিও দান করিয়া দিতেন এবং রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে একখানা পুরাতন

বস্ত্র চাহিয়া লইয়া পরিধান করিতেন। তারপর দশ অঞ্চলের বুদ্ধের পূজা করিতেন। ভারতের ইতিহাসে দান এবং দয়ার এত বড় দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

হর্ষের ধর্ম—হর্ষের পূর্বপুরুষগণ সূর্যের উপাসক ছিলেন। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজত্বকালের অন্ততঃ প্রথম পঁচিশ বৎসর হর্ষ শিবের উপাসক ছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষের দিকে অবশ্য তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, সম্ভবতঃ তাঁহার ভগ্নী রাজ্যশ্রীর প্রভাবেই ইহা হইয়াছিল। হিউয়েন সাঙ্-এর সহিত তাঁহার বন্ধুত্বও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত পরিবর্তনের আংশিক কারণ। তিনি বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ধর্মসম্বন্ধীয় সমস্যাদি সম্পর্কে আলোচনার জন্য তিনি বৎসরে একবার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একত্র সমবেত করিতেন। তিনি প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ করেন। অশোকের ন্যায় তিনিও দরিদ্র সহায়সম্বলহীনদের বিনামূল্যে আহার্য ও ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। কনৌজের অনুষ্ঠানে তিনি মহাযান মতাবলম্বীদের সম্বন্ধে কিছু পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তিনি কখনও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন নাই। প্রয়াগের অনুষ্ঠানে সরকারীভাবে তিনি শিব এবং আদিত্যকেই (সূর্য) শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেন। হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণী হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তখন বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইতেছিল, যদিও চীনা পর্যটক সে বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন কিনা বলা সম্ভব নয়। উত্তর বিহার, উত্তর বঙ্গ এবং সমতট (পূর্ববঙ্গ) ভিন্ন অন্য কোথায়ও জৈনধর্ম তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। সেই সময় প্রধান ধর্ম ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং প্রধান দেবতা ছিলেন আদিত্য, শিব এবং বিষ্ণু।

সাহিত্যচর্চা—হর্ষ অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। হিউয়েন সাঙ্ বলেন যে, রাজ্যের রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ বিদ্বান ও সাহিত্যিকদের পুরস্কৃত করিবার জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা হইত। বৌদ্ধদের বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দায় হর্ষ প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন। এই নালন্দাতেই হিউয়েন সাঙ্ কয়েক বৎসর বিদ্যাচর্চা করিয়াছিলেন। চীনা পরিব্রাজক বলেন, "এই রকম প্রতিষ্ঠান ভারতে সহস্রাধিক ছিল সত্য, কিন্তু নালন্দার মত জাঁকজমকপূর্ণ প্রতিষ্ঠান একটিও ছিল না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মসম্বন্ধীয় বহু বিষয়ে দশ হাজার ছাত্র পাঠ গ্রহণ করিত। শতাধিক পাদপীঠ হইতে প্রতিদিন

শিক্ষাদান করা হইত। রাজারাজড়াগণ বংশপরম্পরায় তথায় কেবলমাত্র যে বিরাট বিরাট আবাসিক অট্টালিকা ও শিক্ষাদানের জন্য ভবন নির্মাণ করাইয়া দিতেন তাহা নহে, সেই অগণিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সমস্ত পার্থিব দ্রব্যই সরবরাহ করিতেন। প্রায় ১০০টি গ্রাম হইতে আদায়ীকৃত রাজস্ব ঐ উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইত এবং ঐ সব গ্রামের দুই শত গৃহের মালিক পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন উহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেন।" নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ উচ্চ ক্ষমতা ও ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। সমগ্র অঞ্চলের আবহাওয়া বুদ্ধিবৃত্তির উদ্দীপনায় সরগরম থাকিত। "গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর-প্রত্যুত্তরেই দিনগুলি শেষ হইয়া যাইত না। প্রত্যূষ হইতে রাত্রি পর্যন্ত সেই স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে গম্ভীর আলোচনা চলিত। সেই আলোচনায় বৃদ্ধ ও যুবা পরস্পরকে সানন্দে সাহায্য করিতেন।"

হর্ষ সাহিত্যিকগণের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজেও কম খ্যাতিমান কবি ছিলেন না। 'হর্ষ-চরিত' প্রণেতা বাণভট্ট তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থটিতে হর্ষের রাজত্বের প্রথম ভাগের ঘটনাবলীর বর্ণনা রহিয়াছে। সেই দিক হইতে ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রহিয়াছে। বাণভট্টের অপর গ্রন্থ 'কাদম্বরী' নামক গদ্য গ্রন্থখানি সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। হর্ষ নিজে তিনখানা নাটক রচনা করিয়াছেন ; উহাদের নাম হইতেছে : 'প্রিয়দর্শিকা', 'রত্নাবলী' ও 'নাগানন্দ'। ইহাদের মধ্যে 'রত্নাবলী' সমধিক প্রসিদ্ধ।

হর্ষের মৃত্যুর ফলাফল—হর্ষ দেশজয়ের দিক হইতে যেমন বিখ্যাত ছিলেন না, তেমনি সম্ভবতঃ বিশেষ কৃতী শাসকও ছিলেন না। তাঁহার গুণপনার সমস্ত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় কেবল তাঁহার বন্ধু ও দলভুক্ত লেখকদ্বয়, বাণভট্ট ও হিউয়েন সাঙ্-এর রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মধ্যে। তিনি যে সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা গুপ্ত সাম্রাজ্যের ন্যায় তেমন বৃহৎ বা সুশাসিত ছিল না। তিনি কোন উত্তরাধিকারী রাখিয়া যান নাই। তাহা ছাড়া, সাম্রাজ্যের সংগঠন এত শক্তিশালী ছিল না যাহা তাঁহার পতাকা উচ্চে তুলিয়া রাখিতে পারে। সম্ভবতঃ অর্জুন নামে তাঁহার কোন মন্ত্রী কনৌজের সিংহাসন দখল করিয়া লন। হর্ষের মৃত্যুর পূর্বে যে চীনা পর্যটক দল এদেশে যাত্রা করিয়াছিল, হর্ষের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত শাসক কিন্তু তাঁহাদের

দেশে প্রবেশ করিতে দিলেন না। ঐ পর্যটকদের সহিত যে ক্ষুদ্র রক্ষীদল ছিল তিনি তাহাদিগকে নিহত অথবা বন্দী করিলেন। দলের নেতা ওয়াং-হিউয়েন-ৎসে নেপালে পলাইয়া গেলেন। নেপাল তখন তিব্বতের করদ ছিল। ওয়াং-এর অনুরোধে তিব্বতের রাজা স্ট্রং-সান গাম্পো (ইনি জনৈকা চীনা রাজকুমারীকে বিবাহ করেন) হর্ষের সিংহাসন দখলকারীকে শাস্তি দিবার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। অর্জুনকে বন্দী করিয়া চীনে পাঠান হইয়াছিল। তিরহুত অঞ্চল তিব্বতের সহিত যুক্ত হইল এবং বাকী অংশ ৭০৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিব্বতের শাসনাধীনে রহিল। উত্তর ভারত পুনরায় রাজনৈতিক ঐক্য হারাইয়া ফেলিল।

পুষ্যভূতি বংশের রাজগণের তালিকা
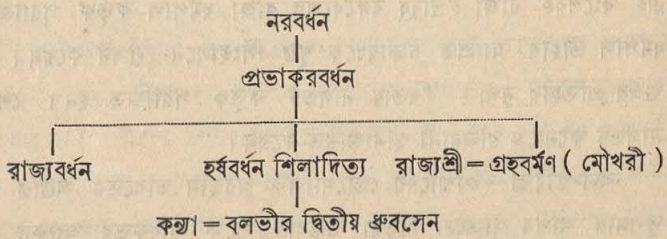
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হর্ষের পরে উত্তর ভারতের অবস্থা

অষ্টম শতাব্দীতে কনৌজ—হর্ষের মৃত্যুর পরবর্তী প্রায় ৭৫ বৎসরের কনৌজের ইতিহাস বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ যশোবর্মণ নামে জনৈক সমরনায়ক আনুমানিক ৭২৫-৭৫২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কনৌজের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। তাঁহার সঠিক বংশপরিচয়ও পাওয়া যায় না। চৈনিক বিবরণে দেখা যায় 'মধ্যভারতের রাজা' ৭৩১ খ্রীস্টাব্দে চীনদেশে মন্ত্রী প্রেরণ

করিয়াছিলেন ; কাহারও কাহারও মতে তিনিই ছিলেন যশোবর্মণ। এই মন্ত্রী প্রেরণের উদ্দেশ্য বা ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নাই। যশোবর্মণের জনৈক সভাকবি বাক্‌পতির রচনায় বলা হইয়াছে যে তিনি গৌড়ের রাজাকে পরাজিত করেন এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত জয় করেন। বাক্‌পতির বিখ্যাত প্রাকৃত গ্রন্থ 'গৌড়বহ'-এ যশোবর্মণের দিগ্বিজয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। উহা সত্য, অথবা চিরাচরিত গুণবর্ণনা মাত্র, তাহা বলা কঠিন। যশোবর্মণ সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ভবভূতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভবভূতি-রচিত 'উত্তররামচরিত' ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যশোবর্মণের পরিণাম সুখাবহ হয় নাই। কাশ্মীরের ললিতাদিত্য কর্তৃক তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

অষ্টম শতাব্দীর চতুর্থ পাদে কনৌজের সিংহাসন একটি ক্ষুদ্র রাজবংশের অধীন ছিল। এই বংশের রাজাদের নামের শেষে 'আয়ুধ' শব্দটি যুক্ত থাকিত। এই বংশেরই রাজা ইন্দ্রায়ুধ বঙ্গদেশের রাজা ধর্মপাল কর্তৃক পরাজিত হন। ধর্মপাল তাঁহার আশ্রিত চক্রায়ুধকে শূন্য সিংহাসনে স্থাপন করেন। চক্রায়ুধ গুর্জর-প্রতিহার নৃপতি দ্বিতীয় নাগভট কর্তৃক পরাজিত হন। শোনা যায় নাগভট কনৌজে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

কাশ্মীর—কাশ্মীরের ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় আপন স্বাতন্ত্র্যে গড়িয়া উঠিবার পক্ষে অধিকতর অনুকূল হইলেও, উহাকে দেশের মূল ঐতিহাসিক প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারে নাই। কাশ্মীর অবশ্যই মৌর্য এবং কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল, কিন্তু গুপ্ত সম্রাট্‌গণ এত দূরের এই উপত্যকাভূমি অবধি তাঁহাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীতে কহ্লন কর্তৃক রচিত সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ 'রাজ-তরঙ্গিণী'ই হইল কাশ্মীরের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের প্রধান উৎস। তাহাতে দেখা যায় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে দুর্লভবর্ধন নামে একজন রাজা কর্কোট রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারই রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ্ কাশ্মীর পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

এই বংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নরপতি ছিলেন ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় (আনুমানিক ৭২৪-৭৬০ খ্রীঃ)। তিনি তিব্বতীয়দের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। অক্ষুনদীর উচ্চতর উপত্যকা পর্যন্ত তাঁহার সামরিক

প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। কনৌজরাজ যশোবর্মণ তাঁহারই হাতে পরাভূত হন। পঞ্জাবের কিয়দংশও তিনি অধিকার করেন। শোনা যায় তাঁহার আক্রমণে পূর্ব-ভারত (মগধ, বঙ্গ, কামরূপ এবং উড়িষ্যা) পর্যুদস্ত হইয়া পড়ে ; দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়া তিনি চালুক্য-বংশের গর্ব খর্ব করেন ; মালব ও গুজরাট তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়া যায় এবং সিন্ধুর আরবগণকে তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। এই সকল কাহিনী সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন, তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাশ্মীর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। ললিতাদিত্য চীন-সম্রাট্ হিউয়েন স্থুঙ-এর নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি বৌদ্ধ বিহার এবং হিন্দু মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন ; সেগুলির মধ্যে প্রধানতম হইতেছে সূর্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত মার্তণ্ড মন্দির।

ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পর কয়েকজন অকর্মণ্য রাজা কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন ; তাঁহাদের পক্ষে কাশ্মীরের ক্ষমতা ও মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হইল না। তাঁহার পৌত্র জয়াপীড় বিনয়াদিত্য (৭৭৯-৮১০ খ্রীঃ) কর্কোট বংশের হৃতগৌরবের পুনরুদ্ধার সাধনে সমর্থ হন। তিনি কনৌজের জনৈক নৃপতিকে পরাভূত এবং সিংহাসনচ্যুত করেন। সম্ভবতঃ ইনি ছিলেন ইন্দ্রায়ুধ অথবা তাঁহার ঠিক পূর্ববর্তী নরপতি। কহ্লন বলেন জয়াপীড় নেপাল ও উত্তর-বঙ্গের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তবে সে কথার ঐতিহাসিক মূল্য সন্দেহাতীত নয়। জয়াপীড় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজসভা কয়েকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল।

নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি উৎপল বংশ কর্কোট বংশের স্থান অধিকার করে। রাজ্য বিস্তারের সমুদয় পরিকল্পনা পরিহার করিয়া কাশ্মীর বিস্মৃতির মধ্যে বিলীন হইয়া যায় ; তবে ১৩৩৯ খ্রীঃ অবধি উহা স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কনৌজের গুরুত্ব—হর্ষের রাজত্বকালে কনৌজ উত্তর-ভারতের প্রধান নগর হইয়া দাঁড়ায় এবং রাজনৈতিক ভারকেন্দ্ররূপে উহা পাটলিপুত্রের স্থান অধিকার করিয়া বসে। অষ্টম শতাব্দীতে কনৌজ অধিকারই ছিল সাম্রাজ্য গঠনাকাঙ্ক্ষার সঙ্কেতস্বরূপ। আমরা দেখিয়াছি ললিতাদিত্য এবং

জয়াপীড়, কাশ্মীরের এই দুইজন রাজাই কনৌজের রাজাদের পরাজিত করিয়াছিলেন ; সম্ভবতঃ ললিতাদিত্য কনৌজ নগরীকে নিজ অধিকারে আনয়নেও সমর্থ হন। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, বঙ্গদেশের পাল রাজারা, গুর্জর-প্রতিহার রাজারা এবং দক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্রকূট রাজারা সাম্রাজ্যের নাভিকেন্দ্র-স্বরূপ এই নগরটির অধিকার লাভের জন্য দীর্ঘকাল সংগ্রামে রত ছিলেন। শেষ অবধি জয়লক্ষ্মী গুর্জর-প্রতিহাররাজগণেরই করায়ত্ত হয়। তাঁহারা কনৌজেই তাঁহাদের রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহারা যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন তাহা হর্ষের ক্ষণস্থায়ী সাম্রাজ্যের চেয়ে সুবিস্তৃত, শক্তিশালী এবং আরও অধিক স্থায়ী ছিল।

গুর্জর-প্রতিহার বংশের অভ্যুত্থান—গুর্জর-প্রতিহারগণ নিজেদের সূর্যবংশীয় রাজপুত বলিয়া দাবি করিতেন ; কিংবদন্তী অনুসারে তাঁহাদের আদিপুরুষ ছিলেন রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। খুব সম্ভব ইহারা বিদেশ হইতেই ভারতে আগমন করেন। খ্রীস্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে হূণদের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য যে সব উপজাতি বন্যা-স্রোতের ন্যায় ভারতে আসিয়া প্রবেশ করে, তাহাদেরই অন্যতম গুর্জর জাতি হইতেই সম্ভবতঃ ইহাদের উৎপত্তি। গুর্জর জাতির প্রথম উপনিবেশ ছিল মান্দোরে (রাজপুতানার অন্তর্গত মারবার)। এই বংশের একটি শাখা ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয় এবং মালবে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। এই বংশেরই প্রথমদিকের একজন রাজাকে অবন্তীর অধিপতি-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

গুর্জর-প্রতিহার বংশের রাজা প্রথম নাগভট "শক্তিশালী ম্লেচ্ছ রাজার সৈন্য-বাহিনী" অর্থাৎ সিন্ধুর আরবদের বিতাড়িত করিয়া বংশের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তিনি বরোচ পর্যন্ত সৈন্য পরিচালনা করেন। ইঁহার পরবর্তী দুইজন রাজা দুর্বল হইলেও, খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগে বৎসরাজ (আনুমানিক ৭৩৮-৭৯৪ খ্রীঃ কেবল যে মালব ও রাজপুতানায় স্বীয় অধিকার সুদৃঢ় করিয়াছিলেন তাহাই নহে, ভারতের পূর্বাঞ্চলেও রাজ্যবিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেখানেই তিনি তাঁহার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বঙ্গদেশের পালবংশের সম্মুখীন হন।

পালরাজাদের অভ্যুত্থান—শশাঙ্কের মৃত্যুর (আনুমানিক ৬৩৭ খ্রীঃ) ফলে বঙ্গদেশে রাজনৈতিক গোলযোগের যুগ দেখা দেয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই হিউয়েন সাঙ বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিতে আসেন। তিনি বঙ্গদেশে চারিটি রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই চারিটি রাজ্য হইতেছে পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ), কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ), সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ) এবং তাম্রলিপ্তি (তমলুক অর্থাৎ মেদিনীপুর অঞ্চল)।
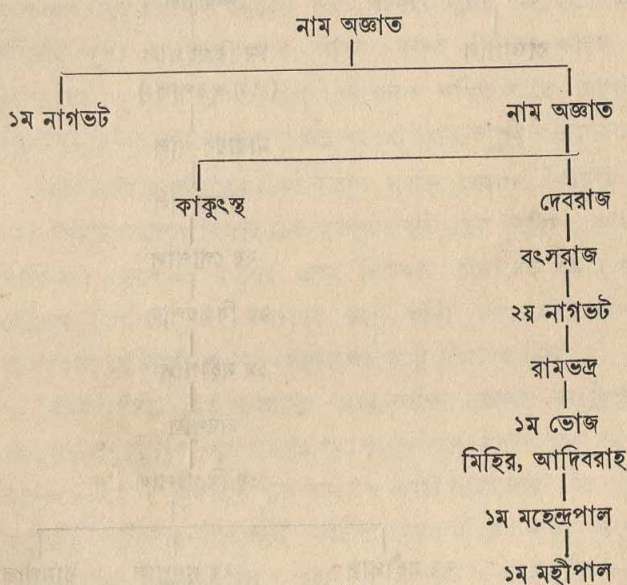
পালরাজগণের বংশতালিকা
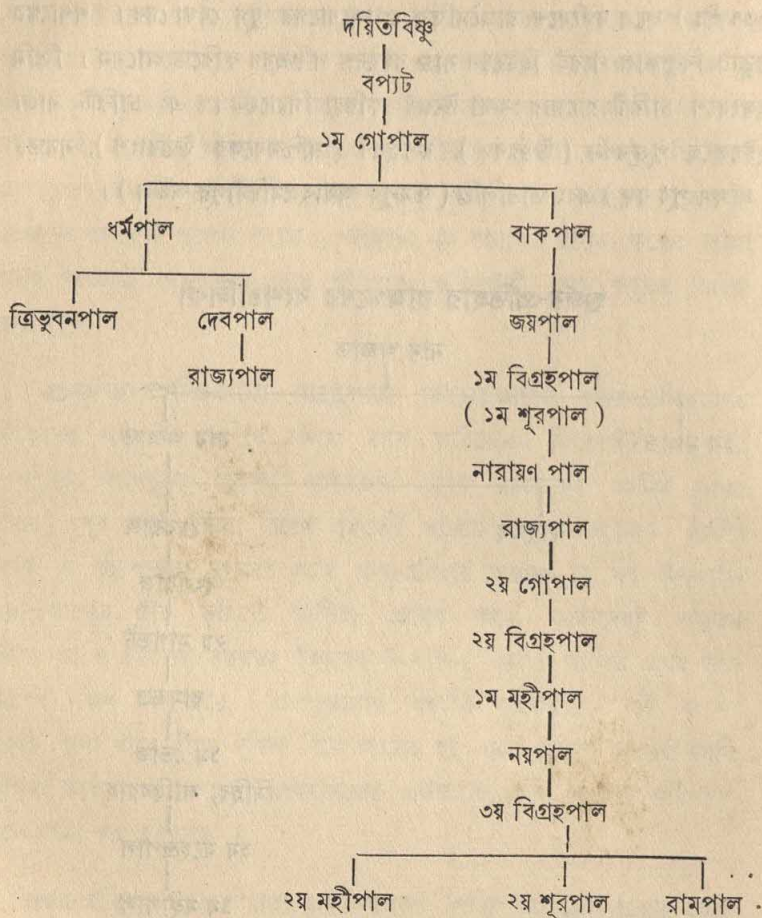
কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণ কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়া শশাঙ্কের রাজধানী হইতে একটি দানপত্র প্রচার করেন। আনুমানিক খ্রীস্টীয় ৬৫০ হইতে ৭৫০ অব্দ পর্যন্ত গৌড়ের ইতিহাস বড়ই অস্পষ্ট। রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব বৈদেশিক আক্রমণের পথ মুক্ত করিয়া দেয়। ভাস্করবর্মণের পরে আসেন কনৌজের রাজা যশোবর্মণ ; কথিত আছে, তিনি বর্তমান বাঙ্গালার প্রায় সমগ্র অংশই আপন অধিকারে আনয়ন করেন। কাশ্মীরের ললিতাদিত্যও নাকি বাঙ্গালার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

এক শতাব্দীর অধিক কাল ব্যাপিয়া বঙ্গদেশে যে অরাজকতা ও বিপর্যয় চলিতেছিল, অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি তাহার অবসান ঘটে। তখন "অরাজক অবস্থা (মাৎস্যন্যায়)-জনিত প্রতিবেশীদের পরস্পরের মধ্যে খাদ্যখাদক সম্পর্ক দূর করিবার জন্য লোকে গোপালকে রাজপদে বরণ করে।" গোপালের পূর্ব-পুরুষেরা যে রাজা ছিলেন এরূপ কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। পাল রাজাদের কোন পুরাতন শিলালিপিতে তাঁহাদের কোন পৌরাণিক বংশ-সমুদ্ভূত বলিয়া দাবি করা হয় নাই, কোন প্রাচীন রাজবংশের সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্পর্কের উল্লেখও করা হয় নাই। তবে পালবংশের পরবর্তী কালের শিলালিপিসমূহে সূর্য বংশ এবং সমুদ্র হইতেও উদ্ভবের কথা পাওয়া যায়। জাতিতে ইঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য হইতেন, তবে আবুল ফজল ইঁহাদের কায়স্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। কথিত আছে, গোপাল নালন্দাতে একটি মঠ নির্মাণ এবং ধর্মশিক্ষার জন্য বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন।

গোপালের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কোনও বিবরণই পাওয়া যায় না ; তাঁহার রাজ্যের বিস্তার ঠিক কতদূর অবধি ছিল তাহাও আমরা জানিতে পারি না। তবে এই বংশের প্রথম দিককার রাজাদের বঙ্গ (পূর্ব বঙ্গ) ও গৌড়ের (পশ্চিম বঙ্গ) অধীশ্বর রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। গোপালের রাজত্বকাল মোটামুটি ৭৫০-৭৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

ধর্মপাল, প্রতিহার রাজগণ এবং রাষ্ট্রকূটগণের মধ্যে সংগ্রাম—গোপালের পর তাঁহার পুত্র ধর্মপাল রাজা হন (আনুমানিক ৭৭০-৮১০ খ্রীঃ)। তিনিই পাল-রাজ্যকে একটি সাম্রাজ্যের উচ্চ আসনে উন্নীত করেন। প্রতিহার-সিংহাসনে তাঁহার সমসাময়িক রাজা ছিলেন বৎসরাজ (আনুমানিক ৭৩৮-৭৮৪ খ্রীঃ) এবং ২য় নাগভট (আনুমানিক ৮০৫-৮৩৩ খ্রীঃ) এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-সিংহাসনে তাঁহার সমকালীন নরপতি ছিলেন ধ্রুব (আনুমানিক ৭৭৯-৭৯৩ খ্রীঃ) এবং ৩য় গোবিন্দ (আনুমানিক ৭৯৩-৮১৪ খ্রীঃ)। দীর্ঘকাল এই কয়জন রাজার মধ্যে উত্তর-ভারতে সার্বভৌম ক্ষমতা লাভের জন্য যুদ্ধবিগ্রহ হয় ; শেষ অবধি বিজয় লাভ করেন প্রতিহারগণ।

ধর্মপাল তাঁহার রাজ্য-সীমানা পশ্চিমদিকে বিস্তারের জন্য উন্মুখ ছিলেন। বৎসরাজ পূর্ব-ভারতে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিলে স্বভাবতই ধর্মপাল তাহাতে বাধা দেন। বৎসরাজ 'অনায়াসেই গৌড়ের রাজলক্ষ্মীকে অঙ্কশায়িনী করিতে

সমর্থ হন' বলিয়া দাবি করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে অবশ্য নিঃসংশয়ে একথা বোঝায় না যে, তিনি পাল-রাজ্যের কোন অংশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তবে ইহা প্রায় নিশ্চিত যে যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভ হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় ধ্রুবের হস্তে বৎসরাজের মারাত্মক পরাভবের ফলে পাল-রাজবংশের ক্রমবর্ধমান শক্তি পশ্চিমাঞ্চল হইতে আগত নবতর বিপৎপাতের কবল হইতে রক্ষা পায়। প্রতিহাররাজ রাজপুতানার মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর ধ্রুব গাঙ্গেয় দোয়াব আক্রমণ করেন। সেখানে ধর্মপালের সম্মুখীন হইয়া তিনি তাঁহাকে পরাস্ত করেন। কথিত আছে তিনি 'গৌড়েশ্বরের শ্বেত ছত্রসমূহ হস্তগত করিয়াছিলেন।' কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলের একজন রাজার পক্ষে উত্তর অঞ্চলে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা খুব কমই ছিল। ধ্রুবের এই ক্ষণস্থায়ী সাফল্য ধর্মপালের কোন স্থায়ী ক্ষতি করিতে পারে নাই; বরং তাঁহার প্রতিহার প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাভব তাঁহাকে উত্তর-ভারত পদানত করিবার পথ মুক্ত করিয়া দিয়া যায়।

পাল রাজাদের কতকগুলি শিলালিপি হইতে আমরা ধর্মপালের উত্তর-ভারতে বিজয় অভিযান পরিচালন সম্পর্কে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারি। আমরা জানিতে পারি যে তিনি ইন্দ্ররাজকে (সাধারণতঃ ইন্দ্রায়ুধ[1] বলিয়াই গৃহীত) পরাজিত করিয়া মহোদয়ের (অর্থাৎ কনৌজ) সার্বভৌম অধিকার লাভ করেন এবং পরে চক্রায়ুধকে সেই সিংহাসন দান করেন। কনৌজের এই নূতন রাজার অভিষেকে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার ও কির[2] প্রভৃতি নৃপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নাই যে, উপরিউক্ত রাজন্যবর্গ ধর্মপালের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং মনে হয় যে, ধর্মপাল উত্তর-ভারতের সম্রাট রূপে স্বীকৃতিলাভে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। বঙ্গ ও বিহার প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার শাসনাধীন ছিল; কনৌজ ছিল তাঁহার মনোনীত রাজা চক্রায়ুধের শাসনাধীন একটি সামন্ত রাজ্য; ইহা ভিন্ন

১ ১৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২ গান্ধার, মদ্র ও কুরু রাজ্য যথাক্রমে পশ্চিম, মধ্য ও পূর্বপঞ্জাবে অবস্থিত ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। আধুনিক আলোয়ার-জয়পুর-ভরতপুর অঞ্চলে ছিল মৎস্যরাজ্য। যবন বলিতে সম্ভবতঃ সিন্ধু অথবা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কোন আরব রাজ্যকে বুঝাইত। যদুগণ পঞ্জাব, মথুরা, সৌরাষ্ট্র ইত্যাদি অঞ্চলে শাসন করিতেন। ভোজ রাজ্য সম্ভবতঃ বেরারে অবস্থিত ছিল।

পঞ্জাব, রাজপুতানার পূর্বাঞ্চল, মালব, বেরার এবং সম্ভবতঃ নেপালের বহু রাজ্য এমন সব রাজাদের দ্বারা শাসিত হইত "যাঁহারা কম্পিত কিরীটে তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেন।"

খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রতিহার-শক্তির পুনরভ্যুদয় সাধন করেন ২য় নাগভট। কথিত আছে তিনি সিন্ধু, অন্ধ্র, বিদর্ভ ও কলিঙ্গের নৃপতিগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। এইভাবে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করিয়া তিনি কনৌজ আক্রমণ করেন। চক্রায়ুধ পরাজিত হইয়া তাঁহার অধিরাজ ধর্মপালের নিকট পলায়ন করেন। কোন কোন লেখকের মতে চক্রায়ুধকে পরাজিত করিবার পর নাগভট কনৌজ দখল করেন এবং সেখানে স্বীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তবে এই অভিমতের স্বপক্ষে কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। যাহা হউক, চক্রায়ুধকে পরাজিত করিবার পর নাগভট বিজয়গর্বে পূর্ব দিকে অগ্রসর হন এবং মুঙ্গেরের (বিহার) নিকট এক যুদ্ধে ধর্মপালকে ভয়ানকভাবে পরাজিত করেন। পাল-সাম্রাজ্যের পক্ষে এই পরাজয় মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু উত্তরাঞ্চলের সংঘর্ষে রাষ্ট্রকূটদের পুনরায় হস্তক্ষেপের পরোক্ষ ফলস্বরূপ তাহা পরিত্রাণ লাভ করে।

প্রতিহার-বাহিনী তাঁহার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরভাগে আসিয়া প্রবেশ করিলে পর ধর্মপাল ৩য় গোবিন্দের নিকট সাহায্যভিক্ষা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন কি না তাহা আমরা জানি না। সে সময় রাষ্ট্রকূটরাজের অধীন মালবের কিয়দংশ অধিকার এবং রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত কয়েকটি রাষ্ট্রের (অন্ধ্র, বিদর্ভ) সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া নাগভট রাষ্ট্রকূটরাজের ক্রোধের কারণ হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেজন্যই ৩য় গোবিন্দ স্বেচ্ছায় প্রতিহার-ক্ষমতা চূর্ণ করিবার জন্য উত্তরাভিমুখে অভিযান করেন। যাহা হউক, একথা ঠিক যে ৩য় গোবিন্দ নাগভটকে মারাত্মক ভাবে পরাজিত করেন এবং তাঁহার রাজ্য অতিক্রম করিয়া গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত অগ্রসর হন।

রাষ্ট্রকূটদের তথ্যপঞ্জী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ধর্মপাল এবং চক্রায়ুধ উভয়েই ৩য় গোবিন্দের নিকট 'আত্মসমর্পণ' করেন। নাগভটের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকূট-রাজের সাহায্য লাভের মূল্য স্বরূপই ছিল বোধ হয় এই 'আত্মসমর্পণ'। কিন্তু উহা নামমাত্র 'আত্মসমর্পণ' ছাড়া বিশেষ কিছুই ছিল না, এবং পাল-সাম্রাজ্য সম্ভবতঃ নাগভটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রায় অক্ষত অবস্থায়ই পরিত্রাণ লাভ করে।

প্রতিহার রাজাদের ক্ষমতা সম্ভবতঃ রাজপুতানা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। একটি প্রাচীন লিপিতে নাগভটকে আনর্ত (উত্তর কাথিয়াবাড়), মালব, মৎস্য, কিরাত (হিমালয় অঞ্চল), বৎস (কোশাম্বী অঞ্চল) এবং তুরুষ্ক (সিন্ধুর আরবগণ) বিজেতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

দেবপাল, প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূটগণের মধ্যে সংগ্রাম—ধর্মপালের পর তাঁহার পুত্র দেবপাল (আনুমানিক ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ) রাজা হন। তিনি একজন শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। বিবিধ প্রাচীন লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে তিনি প্রাগজ্যোতিষ, উৎকল, হূণ, গুর্জর এবং দ্রাবিড়গণের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। প্রাগজ্যোতিষ বলিতে স্পষ্টতঃই ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা বা কামরূপকে বুঝাইতেছে। এই রাজ্যের রাজা (হয় প্রলম্ভ নয় হর্জর) দেবপালের আধিপত্য স্বীকার করায় উৎপীড়নের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। উৎকল (উড়িষ্যা) সম্পূর্ণভাবে পদানত হয়। হূণদের বিরুদ্ধে জয়লাভের উল্লেখ হইতে মনে হয় সম্ভবতঃ তিনি উত্তরাপথে হিমালয়ের নিকটে অবস্থিত কোন হূণ-রাজ্য আক্রমণ করিয়া সাফল্য অর্জন করেন। দেবপাল কম্বোজ জয়ের দাবিও করিয়া গিয়াছেন। ইহা পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

শুনিতে পাওয়া যায় দেবপাল গুর্জরদের দর্প চূর্ণ করেন। ধর্মপালের মৃত্যুর পর নাগভট কর্তৃক স্বীয় ক্ষমতার পুনরুদ্ধার সাধন, এমন কি কনৌজ জয়েরও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার উত্তরাধিকারী রামভদ্র একজন দুর্বল নৃপতি ছিলেন ; শোনা যায় তাঁহার রাজত্বকালে প্রতিহারদের শত্রুরা তাঁহার রাজ্য ছারখার করিয়া দিয়া যায়। কিন্তু তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী মিহির ভোজ (আঃ ৮৩৬-৮৮৫ খ্রীঃ) একজন শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। তিনি কনৌজ অধিকার করেন, বুন্দেলখণ্ড ও গুর্জরত্রা (মারবার) অঞ্চলেও তাঁহার আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ ৮৪০ খ্রীঃ হইতে ৮৫০ খ্রীঃ মধ্যে দেবপালের হস্তে পরাজিত হন। পূর্বদিকে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ভোজ দক্ষিণদিকে মনোনিবেশ করেন। রাজপুতানার দক্ষিণ অঞ্চল ও মালব অবধি তাঁহার বাহুবল প্রসারিত হয়। ফলে রাষ্ট্রকূটগণের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হইয়া যায়। ২য় ধ্রুব নামে বরোচের জনৈক রাষ্ট্রকূট শাসকের হাতে তিনি পরাভূত হন। ২য় কৃষ্ণের সহিতও তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল (আঃ ৮৭৭-৯১৩ খ্রীঃ), ফলাফলের বোধ হয় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই। পর পর এই সকল পরাজয়ের ফলে ভোজের শক্তি-

ক্ষয়ের উপক্রম দেখা দেয়, এবং গুর্জরত্রার মতো অঞ্চলও তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়ে।

দেবপাল কর্তৃক দ্রাবিড়দের পরাভবের বিবরণ হইতে মনে হয় রাষ্ট্রকূট-রাজ ১ম অমোঘবর্ষই (আঃ ৮১৪-৮৭৭ খ্রীঃ) তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূট-রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিরোধই পাল রাজার এই সাফল্যের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে ধর্মপাল কর্তৃক বিজিত দ্রাবিড় নরপতি পাণ্ড্যরাজ শ্রী-মার শ্রী-বল্লভ ব্যতীত অপর কেহই ছিলেন না।

আরবদেশীয় পর্যটক সুলেমান বলেন যে, দেবপালের সৈন্যসংখ্যা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহার রাজগণের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশিই ছিল। অভিযান কালে তাঁহার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে থাকিত প্রায় ৫০,০০০ হস্তী এবং তাঁহার সৈনিকদের পোষাক-পরিচ্ছদ ধৌত করার জন্য থাকিত প্রায় ১৫,০০০ লোক। আরব-পর্যটক পাল রাজ্যকে 'রুম্মি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি দেবপালের সামরিক শক্তির যে বিবরণ দান করিয়াছেন তাহাকে আতিশয্যদোষে দুষ্ট বলিয়া জ্ঞান করা কঠিন।

পাল-রাজের যশ ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজা বালপুত্রদেব তাঁহার নিকট একজন দূত প্রেরণ করিয়া, নালন্দায় তিনি যে চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার ব্যয়ভার বহনের জন্য পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষা চাহেন। দেবপাল সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

পাল সাম্রাজ্যের পতন ও প্রতিহারগণের বিজয়—দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের গৌরব অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। পাল বংশের তথ্যপঞ্জীতে তাঁহার উত্তরাধিকারী ১ম বিগ্রহপাল বা ১ম শূরপাল (আঃ ৮৫০-৮৫৪ খ্রীঃ) এবং নারায়ণপালের (আঃ ৮৫৪-৯০৮ খ্রীঃ) কোনও সামরিক কীর্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রকূট-রাজগণের একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের নৃপতিগণ ১ম অমোঘবর্ষকে কর প্রদান করিতেন। ১ম অমোঘবর্ষ সম্ভবতঃ নারায়ণপালের রাজত্বকালে পাল-রাজ্য আক্রমণ করেন।

সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটরাজ কর্তৃক দুর্বল ও শান্তিপ্রিয় পালরাজের পরাভবের

ফলেই গুর্জর ভোজ উত্তর-ভারতে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করেন। বিখ্যাত আরব পর্যটক সুলেমান ৮৫১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার বিবরণীতে ভোজকে 'আরবদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন' এবং 'মুসলিম ধর্মমতের প্রধানতম শত্রু' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই মুসলিম লেখক তাঁহার সৈন্যবাহিনীর, বিশেষ করিয়া তাঁহার অশ্বারোহী বাহিনীর, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ভোজ বুন্দেলখণ্ড এবং উত্তর প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পদানত করিয়া প্রায় মগধ-সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। লিপিমালা হইতে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সমসাময়িক পাল রাজার গর্ব খর্ব করেন। পশ্চিম দিকে তাঁহার আধিপত্য কাথিয়াবাড় এবং কর্ণাল (পঞ্জাব) পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। আসাম ও উড়িষ্যার নৃপতিগণ পালরাজাদের দুর্বলতার সুযোগে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। রাষ্ট্রকূটগণ তাঁহাদের গুজরাট শাখার বিদ্রোহে এবং পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্যগণের সহিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলে সাময়িকভাবে দুর্বল হইয়া পড়েন, কিন্তু মনে হয় ২য় কৃষ্ণ নারায়ণপালকে পরাজিত করেন।

ভোজের পর তাঁহার পুত্র ১ম মহেন্দ্রপাল (আঃ ৮৮৫-৯১০ খ্রীঃ) রাজা হন। তাঁহারই সময়ে প্রতিহার সাম্রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তিনি নারায়ণপালকে পরাজিত করেন, মগধ নিজ রাজ্যের সহিত যুক্ত করেন, এমন কি কিছু সময়ের জন্য উত্তরবঙ্গও দখল করেন। পশ্চিমদিকে তাঁহার ক্ষমতা কাথিয়াবাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কহ্লনের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ভোজ পঞ্জাবের যে অংশ দখল করিয়া নিয়াছিলেন কাশ্মীরের রাজা শঙ্করবর্মণ উহা পুনর্দখল করেন। কিন্তু পঞ্জাবের অন্তর্গত কর্ণাল এলাকা মহেন্দ্রপালের শাসনাধীনে থাকিয়া যায়। বিখ্যাত কবি রাজশেখর তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রপালের পর রাজা হন তাঁহার পুত্র ২য় ভোজ। কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাঁহার ভ্রাতা মহীপাল (আঃ ৯১২-৯৪৪ খ্রীঃ) কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। সম্ভবতঃ ৯০৮ খ্রীঃ অথবা উহার কাছাকাছি কোন সময়ে নারায়ণপাল উত্তরবঙ্গ ও বিহার পুনরুদ্ধার করেন। ৯১৫ খ্রীস্টাব্দ হইতে ৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে রাষ্ট্রকূট নৃপতি ৩য় ইন্দ্র কর্তৃক মহীপাল নিদারুণভাবে পরাজিত হন। ৩য় ইন্দ্র কনৌজ বিধ্বস্ত করিয়া প্রয়াগের (এলাহাবাদ) পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত প্রতিহার-রাজ্য লুণ্ঠন করেন। কয়েক বৎসর পরে রাষ্ট্রকূটগণ

অধিকতর সাফল্য অর্জন করেন। ২য় কৃষ্ণের জয়গৌরবে উত্তরাঞ্চল অভিযানের ফলে মহীপালের রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসর তমিস্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

নারায়ণপালের উত্তরাধিকারী রাজ্যপাল (আঃ ৯০৮-৯৪০ খ্রীঃ) এবং ২য় গোপাল (আঃ ৯৪০-৯৬০ খ্রীঃ) উত্তর-ভারতে প্রতিহার আধিপত্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইবার মতো শক্তিশালী না হইলেও মগধে এবং উত্তরবঙ্গে নিজেদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন। রাজ্যপাল সম্ভবতঃ জনৈকা রাষ্ট্রকূট রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। মনে হয় এই বৈবাহিক সম্বন্ধের ফলে পালদের শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছিল।

প্রতিহার-সাম্রাজ্যের পতন: নূতন নূতন রাজবংশের উত্থান—একাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে প্রতিহার রাজবংশ নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিহার রাজগণ যদিও ভারতের উত্তর অঞ্চলের বিস্তৃত অংশসমূহের উপর নামমাত্র আধিপত্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তবুও রাষ্ট্রকূটগণের হস্তে মহীপালের নিদারুণ পরাভবের পর তাঁহাদের প্রকৃত রাজকীয় ক্ষমতার অবসান হইয়াছিল। মহীপালের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের অধীনে কতিপয় রাজপুত বংশ ভারতের উত্তর অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে স্বশাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে। এই সব রাজবংশের মধ্যে বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লগণ, চেদির (মধ্যপ্রদেশ) কলচুরিগণ, মালবের পরমারগণ, গুজরাটের চৌলুক্যগণ এবং শাকম্ভরীর (রাজপুতানায় অবস্থিত) চৌহানগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গজনীর সুলতান মামুদের আক্রমণে যখন কনৌজের পতনাশঙ্কা দেখা দেয় তখন শেষ প্রতিহার নৃপতি রাজ্যপাল ভীরুর ন্যায় পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। কিন্তু এই হতভাগ্য রাজা চন্দেল্লরাজ বিদ্যাধর কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। এইভাবেই প্রতিহারবংশের কলঙ্ককর অবসান ঘটে। ইহার পর আর কোন হিন্দু রাজবংশই উত্তর ভারতকে রাজনৈতিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়া সাম্রাজ্যগত শান্তি দান করিতে সমর্থ হয় নাই।

পরবর্তী পাল রাজগণ—প্রতিহার বংশের পতনের পর পালরাজগণকে পশ্চিমাঞ্চলের চন্দেল্ল ও কলচুরি এই দুই নূতন শত্রুর সহিত শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হয়। লিপিমালায় ২য় গোপাল এবং ২য় বিগ্রহপালের (৯৬০-৯৮৮ খ্রীঃ) রাজত্বকালে চন্দেল্ল এবং কলচুরিগণ কর্তৃক বঙ্গদেশ আক্রমণের উল্লেখ আছে। মনে হয় দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে

বঙ্গদেশ রাজনৈতিক ঐক্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তদানীন্তন শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সেই সময় পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

পাল বংশের লুপ্ত গৌরব সাময়িকভাবে পুনরুজ্জীবিত করেন ১ম মহীপাল (আঃ ৯৮৮-১০৩৮ খ্রীঃ)। তিনি উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে স্বীয় ক্ষমতা সংহত করেন। তিনি পশ্চিম অথবা দক্ষিণ বঙ্গে পাল বংশের শক্তির পুনরুদ্ধার সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। ১০২১ খ্রীঃ হইতে ১০২৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক প্রেরিত একজন চোল সেনাপতি "মহীপালকে পরাজিত করিয়া উত্তর-রাঢ় জয় করিবার পূর্বে পর পর দণ্ডভুক্তির ধর্মপাল, রাঢ়ের দক্ষিণাঞ্চলের রণশূর এবং বঙ্গালের গোবিন্দচন্দ্রকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন।" এইসব রাজাদের সহিত মহীপালের কি সম্পর্ক ছিল তাহা সঠিক জানা যায় না; তবে একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, চোলদের এই যুদ্ধ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর দ্রুত অভিযান ভিন্ন আর কিছুই নয়। শিলালিপি পাঠে জানা যায় মহীপাল উত্তর ও দক্ষিণ বিহার শাসন করিতেন। তিনি সম্ভবতঃ কলচুরি বংশের রাজা গাঙ্গেয় কর্তৃক পরাজিত হন।

গাঙ্গেয়র আক্রমণাত্মক নীতি তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী লক্ষ্মী-কর্ণ কর্তৃকও অনুসৃত হয়। মহীপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী নয়পাল (আঃ ১০৩৮-১০৫৫ খ্রীঃ) এবং নয়পালের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ৩য় বিগ্রহ-পালের (আঃ ১০৫৫-১০৭০ খ্রীঃ) সহিত তিনি দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম পরিচালনা করেন। সম্ভবতঃ ১০৬৮ খ্রীস্টাব্দের কিছুকাল পূর্বে বঙ্গদেশকে চালুক্যরাজ ১ম সোমেশ্বরের আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হয়। খ্রীস্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে কোন এক সময়ে উড়িষ্যার সোমবংশী নরপতি মহাশিবগুপ্ত যযাতি বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে স্বাধীন রাজ্যসমূহের উদ্ভব ঘটে।

অবশেষে কতিপয় সামন্ত-প্রধানের বিদ্রোহের ফলে ২য় মহীপাল (আঃ ১০৭০-১০৭৫ খ্রীঃ) পরাজিত ও নিহত হন এবং উত্তরবঙ্গ দিব্য নামে একজন কৈবর্ত জাতীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীর করতলগত হইয়া পড়ে। তিনি একজন শক্তিশালী এবং যোগ্য নরপতি ছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা রুদ্রোক এবং রুদ্রোকের পর ভীম সিংহাসনে উপবেশন করেন। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কাব্য 'রামচরিতম্'-এর বিষয়বস্তু হইল এই রাজনৈতিক বিপ্লব। ২য় মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল পাল বংশের ক্ষমতা কিয়দংশে পুনরুদ্ধার করেন। তিনি ভীমকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া তাঁহার উপর ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। উত্তর বঙ্গে স্বীয় ক্ষমতা সংহত করিয়া রামপাল পূর্ব বঙ্গ এবং আসাম আপন শাসনাধীনে আনয়ন করেন। অতঃপর তিনি কলিঙ্গ পর্যন্ত অগ্রসর হন, ফলে পূর্বাঞ্চলীয় গঙ্গবংশের অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধে। পশ্চিমদিকে তিনি গাহড়বালবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি যে রাজ্য গঠন করিয়া রাখিয়া যান, তাঁহার হীনশক্তি উত্তরাধিকারীরা তাহার সংহতি রক্ষা করিতে পারিলেন না।

দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পাল-রাজ্য মধ্য ও পূর্ব বিহারে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, সম্ভবতঃ উত্তর বঙ্গের একাংশও উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর সেনরাজারা উত্তর বঙ্গ অধিকার করেন। ইহার পরও 'পাল' উপাধিভূষিত কয়েকজন রাজা কিছুকাল বিহার শাসন করিতে থাকেন; তবে গোপালের বংশের সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা, থাকিলেও কিরূপ সম্পর্ক ছিল, তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

পালরাজগণের অধীনে সংস্কৃতির অগ্রগতি— পালরাজগণের রাজত্বকাল পূর্ব ভারতে সাংস্কৃতিক অগ্রগতির একটি বিশিষ্ট স্তরস্বরূপ ছিল। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বাঙ্গালায় সংস্কৃত চর্চা একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতির রূপ পরিগ্রহ করে; দশম ও একাদশ শতাব্দীতে "কেবল সংস্কৃত ভাষাগত কৃষ্টিই নহে, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মীয় সংস্কৃত সাহিত্যও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল।" তবে, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাহিত্য বাদ দিলে, অন্যান্য যে সকল সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে সেগুলি সংখ্যায় খুবই কম, এবং অসম্পূর্ণও বটে। এই যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে ছিলেন তৎকালপ্রসিদ্ধ রাজনীতিক, পণ্ডিত এবং গ্রন্থকার ভবদেব ভট্ট এবং বঙ্গীয় ধর্মশাস্ত্রের প্রথম প্রধান আচার্য জীমূতবাহন।

"মধ্যযুগ ও আধুনিক কালের ভারতবর্ষে বিবিধ জাতি-সমবায়ের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ শ্রেণীরূপে বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব ঘটে পাল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই।" পাল রাজাদের শাসনকালেই সৃষ্ট হয় মাগধী প্রাকৃত ও আঞ্চলিক অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত স্থানীয় কথ্য ভাষা—বাঙ্গালীদের নিজস্ব "জাতীয় ভাষা"।

ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে যে চর্যাপদগুলি আবিষ্কার করেন তাহাই হইল বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। যদিও সে সব রহস্য-সঙ্গীত রচনার নির্দিষ্ট কাল নির্ণয় করা যায় নাই, তবু একথা বলা যায় যে, ঐসব সঙ্গীতের অধিকাংশই নিঃসন্দেহে পাল-যুগে রচিত হইয়াছিল।

পালরাজগণ বৌদ্ধধর্মানুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ভারত হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, তাহার শেষ আশ্রয়ভূমি হইয়া দাঁড়ায় বঙ্গ এবং বিহার। তাঁহাদেরই আনুকূল্যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম তিব্বত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপসমূহে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। তাঁহারা বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরী, সোমপুর ও অন্যান্য স্থানে কয়েকটি বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া পাল-যুগে ধর্ম-সম্পর্কিত অনুদারতার কোন স্থান ছিল না। পালরাজগণ বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নৈষ্ঠিক সমাজ-ব্যবস্থাই মানিয়া চলিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন হিন্দু মন্দিরও নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

ললিত কলার ক্ষেত্রে পাল-রীতির ভাস্কর্য "নেপাল ও তিব্বতে গৃহীত হয় এবং···ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার কলারীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।" শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গদেশই এমন একটি সৃজনশীল শিল্পে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে যাহার আবেদন ছিল বাস্তবিকই বিশ্বজনীন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গুপ্তোত্তর যুগে দক্ষিণ-ভারত

বাতাপির চালুক্য বংশের অভ্যুত্থান—চালুক্যগণ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসে একটি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁহাদের উদ্ভবের কাহিনী বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তবে উত্তর-ভারতের অযোধ্যা হইতে যে সকল ক্ষত্রিয় বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাঞ্চলে গিয়া বসতি স্থাপন করে তাঁহারা তাহাদেরই অধস্তন পুরুষ হইতে পারেন। স্মিথ তাঁহাদের সঙ্গে গুর্জরদের সম্পর্ক অনুমান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত

হইয়াছেন যে, তাঁহারা রাজপুতানা হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এই মতবাদের পক্ষে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোন এক সময়ে ১ম পুলকেশী বাতাপির (বর্তমান বোম্বাই রাজ্যের বিজাপুর জেলার অন্তর্গত বাদামী) পার্শ্ববর্তী কানাড়ী ভাষাভাষী অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করেন। তখন হইতে উহাই তাঁহার রাজধানী হইয়া উঠে। তিনি একটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যের আয়তন এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি সাম্রাজ্য-গৌরব লাভের উপযোগী ছিল না। তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ১ম কীর্তিবর্মণ সম্ভবতঃ ৫৬৬ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন ; তাঁহার বাহুবলে উত্তর-কোঙ্কন ও উত্তর-কানাড়া পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়। সম্ভবতঃ বেল্লারি ও কুরণুল জেলা অবধিই ছিল তাঁহার রাজ্যসীমার বিস্তার। মগধ, বঙ্গ, চোল ও পাণ্ড্যদেশে তাঁহার বিজয় অভিযানের কাহিনী সম্ভবতঃ অনৈতিহাসিক কবিকল্পনা মাত্র। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা মঙ্গলেশ (৫৯৭-৬০৮ খ্রীঃ) রাজা হন। তিনি কোঙ্কন উপকূলে রত্নগিরি জেলা অধিকার এবং দাক্ষিণাত্যের উত্তরাঞ্চলে কলচুরিদের বশীভূত করেন। তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার দানের চেষ্টায় বাধা দান করেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (কীর্তিবর্মণের পুত্র) পুলকেশী। পুলকেশী তাঁহাকে পরাভূত ও নিহত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

চালুক্য-শক্তির চরম উন্নতিঃ ২য় পুলকেশী (৬০৯-৬৪২ খ্রীঃ)—সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সংগ্রাম চালুক্য বংশের ভাগ্যের উপর ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল। ২য় পুলকেশীর রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর বিদ্রোহী সামন্তরাজগণকে এবং প্রতিবেশীদের দমন করিতেই কাটিয়া যায়। তিনি উত্তর-কানাড়ার কদম্বদের রাজধানী জয় করেন, মহীশূরের গঙ্গ রাজাদের ভয়সন্ত্রস্ত করিয়া তোলেন এবং উত্তর-কোঙ্কনের মৌর্যদের পদানত করেন। দক্ষিণ-গুজরাটের লাটগণ, মালবগণ এবং গুর্জররা (বরো-এর ?) তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। কনৌজের হর্ষ তাঁহার নিকট ভীষণভাবে পরাভূত হন ; নর্মদা অতিক্রম করিয়া তাঁহার রাজ্যবিস্তারের আশা ব্যর্থ হইয়া যায়। চালুক্য সৈন্যবাহিনীর অভিযান সংবাদে মহাকোশল (আধুনিক মধ্যপ্রদেশ) ও কলিঙ্গের রাজারা ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। পিষ্টপুরের দুর্গ (পিঠপুরম, গোদাবরী জেলায় অবস্থিত) বিনা বাধায় তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে। তিনি পল্লবরাজ

১ম মহেন্দ্রবর্মণকে পরাজিত করেন এবং পল্লব রাজ্যের রাজধানী কাঞ্চীর কয়েক মাইলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। বিজয়ী চালুক্য সৈন্যবাহিনী কাবেরী নদী অতিক্রম করিতেই চোল, কেরল এবং পাণ্ড্যরাজারা ২য় পুলকেশীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এইভাবে চালুক্যরাজ দক্ষিণ-ভারতের একটি বৃহৎ অংশ (নর্মদা নদীর তীর হইতে সুরু করিয়া কাবেরী নদীর পরবর্তী জেলাগুলি পর্যন্ত) এক ছত্রতলে আনয়ন করেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহার জীবন মর্মান্তিকভাবে শেষ হয়। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণ বাতাপি বিধ্বস্ত করিয়া (৬৪২ খ্রীঃ) সম্ভবতঃ স্বহস্তে পুলকেশীকে নিধন করেন।

২য় পুলকেশী নিঃসন্দেহে একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। কথিত আছে তিনি পারস্যের রাজা ২য় খুসরুর সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁহার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন যে, ২য় পুলকেশী কর্তৃক পারসিক দূত-সংসদকে অভ্যর্থনার চিত্র অজন্তা গুহায় অঙ্কিত রহিয়াছে।

চালুক্য-রাজ্য সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙ্—২য় পুলকেশীর রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ্ দক্ষিণ-ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রের জমিকে খুব উর্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে "তত্রত্য অধিবাসীরা ছিল গর্বিত-হৃদয় এবং যুদ্ধপ্রিয়, সদ্ব্যবহারে কৃতজ্ঞ এবং অসদ্ব্যবহারে প্রতিশোধ-পরায়ণ, কৃপাপ্রার্থী আর্তের ত্রাণে আত্মত্যাগে প্রস্তুত এবং অবমাননা-কারীর প্রাণনাশের জন্য রক্তমোক্ষণে উন্মুখ। তাহাদের সেনাবাহিনীর পুরোভাগ রক্ষায় নিযুক্ত রণনায়কগণ মত্ত অবস্থায় রণতাণ্ডবে যোগদান করিতেন, যুদ্ধের প্রাক্কালে তাহাদের হস্তিযূথকেও মদ্যপানে মত্ত করিয়া তোলা হইত।"

২য় পুলকেশী সম্বন্ধে চীনা পর্যটক মন্তব্য করিয়াছেন, "রাজার অধীনে এইরূপ যোদ্ধার দল ও হস্তিযূথ আছে বলিয়া প্রতিবেশীদের তিনি অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহার কর্মক্ষেত্রের বিস্তার সুদূরপ্রসারী, বহুদূর অবধি তাঁহার জনহিতকর কার্যাবলীর প্রভাব অনুভূত হইয়া থাকে। তাঁহার প্রজাবৃন্দ সম্পূর্ণ বশ্যতা-সহকারে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া থাকে।"

বাতাপির 'পরবর্তী' চালুক্যগণ—২য় পুলকেশীর মৃত্যুর পর সাময়িকভাবে চালুক্য বংশের প্রতিপত্তি হানি ঘটে। কিন্তু তাঁহার পুত্র ১ম বিক্রমাদিত্য (৬৫৫-৬৮০ খ্রীঃ) পল্লবদের কবল হইতে পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার

করিতে সমর্থ হন। পল্লবদের সহিত সংগ্রাম চলিতে থাকে, পল্লব রাজাদের রাজধানী লুণ্ঠিত হয়, এবং চোল, কেরল ও পাণ্ড্য রাজারা পুনরায় চালুক্য-বাহিনীর শক্তিমত্তা উপলব্ধি করেন। তাঁহার দুই উত্তরাধিকারী ১ম বিনয়াদিত্য ও ১ম বিজয়াদিত্যও শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। তাঁহারা আনুমানিক ৬৮০ খ্রীঃ হইতে ৭৩৩ খ্রীঃ অবধি রাজত্ব করেন। ১ম বিনয়াদিত্যকে "সমগ্র উত্তরাপথের অধীশ্বরকে" পরাজিত করার গৌরব দান করা হইয়া থাকে। এই উত্তরাপথপতি সম্ভবতঃ ছিলেন 'পরবর্তী' গুপ্ত রাজা আদিত্যসেনের কোন বংশধর। ২য় বিক্রমাদিত্যের (আঃ ৭৩৩-৭৪৬ খ্রীঃ) রাজত্বকালে পুনরায় পল্লবদের পরাভব ঘটে এবং চালুক্য-বাহিনী কর্তৃক পুনরায় তাহাদের রাজধানী লুণ্ঠিত হয়। চোলগণ, পাণ্ড্যগণ এবং মালাবারের অধিবাসীরা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। লাট (গুজরাটের দক্ষিণাঞ্চল) সে সময় ছিল চালুক্য-রাজ্যের অন্তর্গত; সিন্ধুর আরবগণ তাহা আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হয়। এইভাবে দক্ষিণ-ভারত 'আরবাতঙ্ক' হইতে উদ্ধার লাভ করে। তাঁহার পুত্র ২য় কীর্তিবর্মণ রাষ্ট্রকূট-রাজ দন্তিদুর্গের নিকট পরাজিত হন, দন্তিদুর্গ মহারাষ্ট্র দখল করেন। এইভাবে চালুক্য শাসনের অবসান ঘটে (আঃ ৭৫৩ খ্রীঃ)।

চালুক্য রাজাদের বংশতালিকা
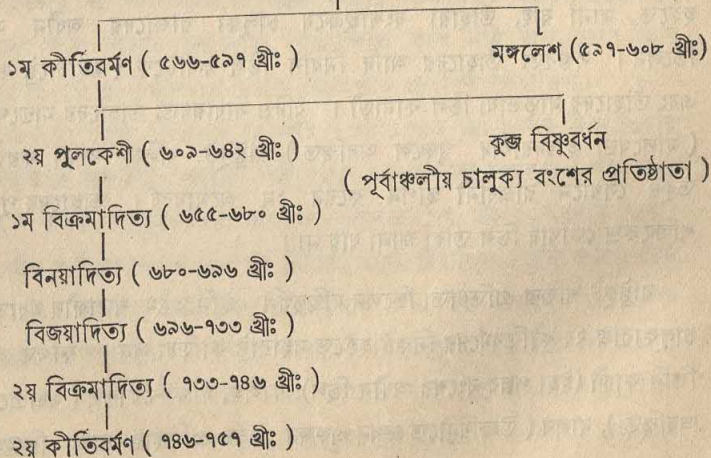
চালুক্য শাসনে ধর্ম—চালুক্য রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী হিন্দু, তবে তাঁহারাও পরমতসহিষ্ণুতার ভারতীয় ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে বিলোপ পাইয়া আসিতেছিল, তবে হিউয়েন সাঙের বিবরণী হইতে মনে হয় তাহা তখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় নাই। চীনা পরিব্রাজক শতাধিক বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পান। এই সময় দাক্ষিণাত্যে জৈন ধর্ম বেশ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। চালুক্য রাজগণ উহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। বাতাপি ও পত্তদকল-এ (বোম্বাইয়ের বিজাপুর জেলায়) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের বড় বড় মন্দির নির্মিত হয়। এই সময়ই পর্বত-গাত্র ক্ষোদিত করিয়া গুহা-মন্দির নির্মাণের কাজ স্থরু হয়। অজন্তার গুহাগাত্রে অঙ্কিত কতকগুলি চিত্র সম্ভবতঃ চালুক্য যুগেরই স্মৃষ্টি।

রাষ্ট্রকূট বংশের আদি ইতিহাস—রাষ্ট্রকূটগণ দাক্ষিণাত্যের বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দুই শতাব্দীরও অধিককাল প্রভুত্ব করেন ; কিন্তু ভারতের অন্যান্য অনেক প্রাচীন রাজবংশের ন্যায় তাঁহাদের উদ্ভবও অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই বংশের পরবর্তী রাজগণ মহাকাব্য বর্ণিত নায়ক যদুর বংশোদ্ভব বলিয়া দাবি করিতেন, কিন্তু এইরূপ কিংবদন্তীকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। কোন কোন পণ্ডিত রাষ্ট্রকূটগণকে অশোকের একটি অনুশাসনে উল্লিখিত রঠিকগণের সহিত যুক্ত করিয়াছেন। কোন কোন চালুক্য তথ্যতালিকা হইতে জানা যায়, রাষ্ট্রকূটরা অন্ধ্রদেশের চাষী ছিলেন। শিলালিপি হইতে জানা যায়, তাঁহারা বংশানুক্রমে চালুক্য রাজাদের অধীন সামন্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল কর্ণাটকে (মহারাষ্ট্রে নহে), এবং তাঁহাদের মাতৃভাষা ছিল কানাড়ী। যদিও সাধারণতঃ তাঁহাদের মান্যখেতের (মালখেড, হায়দরাবাদ অঞ্চলে অবস্থিত) রাষ্ট্রকূট বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তবুও সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন ১ম অমোঘবর্ষ। তাঁহাদের পূর্বতন শক্তিকেন্দ্র কোথায় ছিল তাহা জানা যায় না।

রাষ্ট্রকূট-শক্তির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দন্তিদুর্গ। ইনি অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্যরাজ ২য় কীর্তিবর্মণের নিকট হইতে মহারাষ্ট্র কাড়িয়া লন। কথিত আছে তিনি কাঞ্চী (ইহা পল্লব বংশের অধীন ছিল), কলিঙ্গ, দক্ষিণ-কোশল (মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত), মালব (উজ্জয়িনীতে তখন একজন গুর্জর-প্রতিহার রাজা ছিলেন),

লাট (দক্ষিণ গুজরাট) এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমসাময়িক রাজাদের পরাভূত করেন।

তাঁহার পর রাজা হন তাঁহার পিতৃব্য ১ম কৃষ্ণ (৭৬৮-৭৭২ খ্রীঃ)। তিনি ২য় কীর্তিবর্মণের পরাজয় সম্পূর্ণ করেন এবং রাহপ্প নামক কোন অহঙ্কারী রাজার অহঙ্কার চূর্ণ করেন। রাহপ্পের পরিচয় আজিও অজ্ঞাত। ইহা ভিন্ন তিনি কোঙ্কন পদানত করেন, মহীশূরের গঙ্গরাজাদের রাজ্য আক্রমণ করেন, বেঙ্গীর পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য রাজা চতুর্থ বিষ্ণুবর্ধনকে পরাজিত করেন। তিনি সম্রাট মর্যাদা জ্ঞাপক পদবী গ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি ইলোরায় (বোম্বাই রাজ্যে অবস্থিত) পাথর কাটিয়া বিখ্যাত শিব মন্দির নির্মাণ। স্মিথ ইহাকে "ভারতের ভাস্কর্যের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ কাণ্ড" রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণের পর রাজা হন তাঁহার পুত্র ২য় গোবিন্দ। তিনি নিরতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্রুব তাঁহাকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করেন।

রাষ্ট্রকূটগণের গৌরবময় যুগ—ধ্রুব নিরুপমের (আঃ ৭৭৯-৭৯৩ খ্রীঃ) রাজত্বকাল হইতে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যতন্ত্রের আরম্ভ হয়। গঙ্গরাজ তাঁহার নিকট পরাজিত হন, তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লওয়া হয়। কাঞ্চীর পল্লবরাজ তাঁহার নিকট পরাজিত হন। অতঃপর ধ্রুব উত্তরদিকে মনোযোগ দেন। গুর্জর-প্রতিহার ও পালরাজগণের সঙ্গে তাঁহার সংঘর্ষ সুরু হয়। উত্তরাঞ্চলে অভিযানের ফলে তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তারলাভ করে নাই বটে, তবে উহার ফলে রাষ্ট্রকূট-বংশের ক্রমবর্ধমান শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছিল।

ধ্রুবের মৃত্যু অথবা সিংহাসন ত্যাগের (আঃ ৭৯৩ খ্রীঃ) পর উত্তরাধিকার লইয়া যুদ্ধবিগ্রহ সুরু হয়, অবশেষে তাঁহার পুত্র ৩য় গোবিন্দ জগত্তুঙ্গ (আঃ ৭৯৩-৮১৪ খ্রীঃ) কর্তৃক রাষ্ট্রকূট-রাজ্য অধিকার করিবার পর উহার অবসান ঘটে। পিতা কর্তৃক অধিকৃত গঙ্গ-রাজ্যে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল তিনি তাহা দমন করেন এবং কাঞ্চীর পল্লবরাজ দন্তিবর্মণকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি গুর্জর-প্রতিহারগণ এবং উত্তর-ভারতের পালরাজগণের বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করেন। এই ভাবে তিনি যখন উত্তর ভারতে ব্যস্ত ছিলেন সেইসময় দক্ষিণ দিকে চোল, পাণ্ড্য, কাঞ্চী, গঙ্গবড়ী (মহীশূরের গঙ্গ-রাজ্য) ও কেরলের নৃপতিগণ

তাঁহার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হন। গোবিন্দ এই দুর্জয় শক্তিসমবায় বিধ্বস্ত করিয়া দক্ষিণ-ভারতে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন।

৩য় গোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিহাসে তিনি কেবল তাঁহার ১ম 'অমোঘবর্ষ' (আঃ ৮১৪-৮৭৭ খ্রীঃ) উপাধিতেই পরিচিত। সম্ভবতঃ তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল সর্ব। সিংহাসনে আরোহণের সময় তিনি নাবালক ছিলেন। এই বংশেরই[১] গুজরাট শাখার কর্করাজ-সুবর্ণবর্ষ ছিলেন তাঁহার অভিভাবক। ১ম অমোঘবর্ষ নাবালক ছিলেন বলিয়া কোন কোন করদ রাজা বিদ্রোহ করিতে সাহস পান, অবস্থা এরূপ সঙ্কটজনক হইয়া উঠে যে অমোঘবর্ষকে সিংহাসন হারাইতে হয়। কিছুকালের মধ্যেই তিনি সিংহাসন ফিরিয়া পান। তখনও তাঁহার বয়স কম ছিল, সামরিক অভিযান পরিচালনার ক্ষমতা জন্মে নাই। পরবর্তীকালে তিনি বেঙ্গীর চালুক্য রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কথিত আছে তিনি তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব ভারতের পূর্বাঞ্চলেও (বিহার ও বঙ্গ) বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু এই দাবির মূলে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ, অমোঘবর্ষের সামরিক দুর্বলতার ফলেই উত্তর-ভারতের প্রভুত্বের জন্য পাল এবং গুর্জর-প্রতিহার রাজগণ পরস্পরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ লাভ করেন। মনে হয় অমোঘবর্ষ সামরিক অভিযান অপেক্ষা ধর্ম ও সাহিত্য চর্চায়ই অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। তিনি জৈন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, তবে তিনি তাঁহার পিতৃপুরুষগণের আচরিত ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং হর্ষের ন্যায় নিজেও ছিলেন একজন গ্রন্থকার।

আরব পর্যটক ও ইতিবৃত্তকারগণ রাষ্ট্রকূট রাজাদের 'বলহরা' উপাধিভূষিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহে সংস্কৃত 'বল্লভরাজ' শব্দের আরবীয় অপভ্রংশ। সুলেমান নামে একজন আরব বণিক নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণ করেন। তিনি 'দীর্ঘজীবী বলহরার' (অর্থাৎ ১ম অমোঘবর্ষের—যিনি 'ইতিহাসে লিপিবদ্ধ দীর্ঘতম রাজত্বকালসমূহের একটি ভোগ

---

১ ইন্দ্র এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৩য় গোবিন্দ কর্তৃক লাটের (দক্ষিণ গুজরাট) শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। নবম শতাব্দীর শেষের দিকে লাটের রাষ্ট্রকূট বংশের রাজনৈতিক প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়।

করিয়া গিয়াছেন) কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে বিশ্বের চারিজন শ্রেষ্ঠ নরপতির অন্যতম বলিয়া স্বীকার করা হইত, অপর তিনজন ছিলেন বাগদাদের খলিফা, চীনের সম্রাট এবং কনস্তান্তিনোপলের সম্রাট। রাষ্ট্রকূট রাজারা সিন্ধুর আরবদের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চলিতেন, প্রজাদেরও আরবের বণিকদের সহিত বাণিজ্য করিতে উৎসাহ দিতেন। এই মুসলিম-ঘেঁষা নীতির কারণ বোধহয় এই ছিল যে গুর্জর-প্রতিহারগণ রাষ্ট্রকূট এবং সিন্ধুর আরব উভয় দলেরই শত্রু ছিলেন।

১ম অমোঘবর্ষের পর রাজা হন ২য় কৃষ্ণ অকালবর্ষ (আঃ ৮৭৭-৯১৩ খ্রীঃ)। তিনি তেমন কৃতী শাসক ছিলেন না। বেঙ্গীর পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্যদের সহিত এবং মালবের পরমাররাজ ভোজের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের ফলে রাষ্ট্রকূট বংশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় নাই। তাঁহার পর তাঁহার পৌত্র ৩য় ইন্দ্র নিত্যবর্ষ রাজা হন (আঃ ৯১৫-৯১৭ খ্রীঃ)। তিনি ধ্রুব ও ৩য় গোবিন্দের সামরিক গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধন করেন। তিনি কনৌজের গুর্জর-প্রতিহারগণের গর্ব খর্ব করিতেও সমর্থ হন। ২য় অমোঘবর্ষ, ৪র্থ গোবিন্দ এবং ৩য় অমোঘবর্ষ, তাঁহার পরবর্তী এই কয়জন রাজার রাজত্বকাল ছিল আনুমানিক ৯১৭ খ্রীঃ হইতে ৯৩৯ খ্রীঃ পর্যন্ত। ইঁহারা দুর্বল রাজা ছিলেন।

রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ শক্তিশালী নরপতির নাম ৩য় কৃষ্ণ (আঃ ৯৩৯-৯৬৮ খ্রীঃ)। সম্ভবতঃ তাঁহার সহিত গুর্জর-প্রতিহার বংশের রাজা মহীপালের যুদ্ধ হয় এবং তিনি মহীপালের নিকট হইতে কালঞ্জর ও চিত্রকূট কাড়িয়া লইতে সমর্থ হন। দক্ষিণে তিনি কাঞ্চী ও তাঞ্জোর অধিকার করেন। ৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে তক্কোলম্ (মাদ্রাজের উত্তর-আর্কট জেলায় অবস্থিত) নামক স্থানের বিখ্যাত যুদ্ধে তিনি ১ম পরন্তকের পুত্র রাজাদিত্য নামক একজন চোল রাজাকে পরাজিত করেন। তিনি পাণ্ড্য ও কেরলের রাজাদেরও গর্ব খর্ব করেন। শোনা যায় সিংহলের রাজা অবধি তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন।

রাষ্ট্রকূট বংশের পতন—৩য় কৃষ্ণের পরবর্তী রাজন্যবর্গের দুর্বলতার ফলে ৯৬৮ খ্রীস্টাব্দের পর রাষ্ট্রকূটগণের ভাগ্যরবি অধোগামী হইয়া পড়ে। পরমার রাজা সিয়ক-হর্ষ কর্তৃক মান্যখেত অবধি লুণ্ঠিত হয়। ঐ বংশের শেষ রাজা ৪র্থ অমোঘবর্ষ পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য রাজা তৈলপ কর্তৃক ৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে পরাজিত হন।

রাষ্ট্রকূট রাজগণের বংশতালিকা
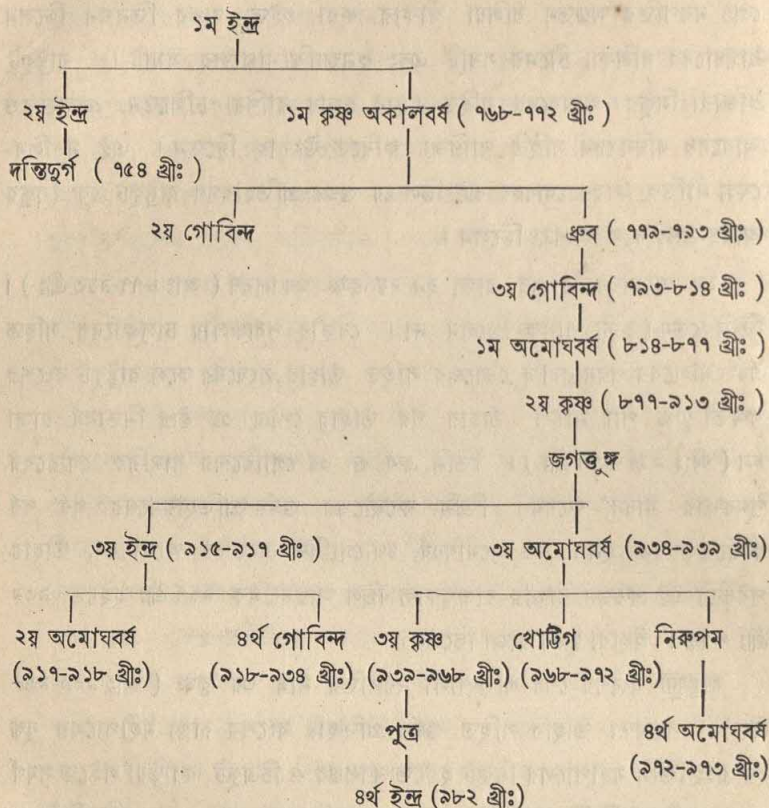
বেঙ্গীর পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্যগণ—বাতাপির ২য় পুলকেশী তাঁহার রাজ্যের পূর্বাঞ্চল শাসনের ভার দেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জ-বিষ্ণুবর্ধনের উপর। কুব্জ-বিষ্ণুবর্ধনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ১ম জয়সিংহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এইভাবে বেঙ্গীকে কেন্দ্র করিয়া একটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া ওঠে। পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্যগণ অন্ধ্রদেশ এবং কলিঙ্গের কিয়দংশ চারি শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া শাসন করেন। ২য় বিজয়াদিত্য এবং ৩য় বিজয়াদিত্যের রাজত্বকাল প্রায় সমগ্র নবম শতাব্দী পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল ; কথিত আছে তাঁহারা রাষ্ট্রকূটগণকে, গঙ্গদিগকে এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দশম শতাব্দীর শেষ পাদে চোল রাজা ১ম রাজরাজ

পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য-রাজ্য আক্রমণ করিয়া পর্যুদস্ত করেন। একাদশ শতাব্দীতে পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্যগণ চোলদের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। ২য় রাজেন্দ্র চোল—ইনি ১ম কুলোত্তুঙ্গ নামে পরিচিত—চোল-রাজ্যকে বেঙ্গী রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করেন।

কদম্ব বংশ—ময়ূরশর্মণ নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন কদম্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি কর্ণাটকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশের প্রথম শ্রেষ্ঠ রাজার নাম হইতেছে ককুৎস্থবর্মা। এই বংশের রবিবর্মণ খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজত্ব করিতেন। তিনি হালসিতে (বোম্বাই রাজ্যের বেলগাঁও জেলা) তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। গঙ্গ ও পল্লবদের তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। ১ম ও ২য় পুলকেশী কদম্ব বংশের ক্ষমতা খর্ব করেন এবং গঙ্গগণ তাহাদের রাজ্যের দক্ষিণাংশ দখল করিয়া নেয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত কদম্ব বংশের কোন কোন শাখা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করিয়াছিল। কদম্বদের অধিকৃত রাজ্যে প্রধান ধর্মমত ছিল শৈব ও জৈনধর্ম।

গঙ্গবংশ—গঙ্গবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তাঁহাদের রাজ্য সাধারণতঃ গঙ্গবড়ী নামে পরিচিত ছিল। মহীশূরের একটি বৃহৎ অংশ ছিল উহার অন্তর্ভুক্ত। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। তালবনপুর (মহীশূর জেলায় কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত তালকড়) ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। মান্যখেতের রাষ্ট্রকূট বংশ ছিল গঙ্গবংশের প্রধান শত্রু। ১০০৪ খ্রীস্টাব্দে চোলরা গঙ্গবংশের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করে। গঙ্গবংশের কোন কোন রাজা চোল এবং হোয়সলদের অধীন সামন্ত রূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। গঙ্গবড়ীতে জৈনধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল।

পল্লবদের রাজনৈতিক ইতিহাস—পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে পল্লব রাজাদের প্রারম্ভিক ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে সিংহবিষ্ণু একটি নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া পল্লব-রাজ্যের সীমা কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তার করেন। কথিত আছে তিনি পাণ্ড্য, চোল এবং চের রাজাদের এবং সিংহলের নৃপতিকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ১ম মহেন্দ্রবর্মণ মোটামুটি সপ্তম শতাব্দীর প্রথমপাদে রাজত্ব

করিতেন। তিনি শক্তিশালী চালুক্যরাজ ২য় পুলকেশী কর্তৃক পরাজিত হন; পুলকেশী তাঁহার নিকট হইতে বেঙ্গী প্রদেশ কাড়িয়া লন। তাঁহার পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পুত্র ১ম নরসিংহবর্মণ। তিনিই ছিলেন 'এই শক্তিশালী বংশের সর্বাপেক্ষা কৃতী এবং বিশিষ্ট পুরুষ'। ৬৪২ খ্রীস্টাব্দে তিনি চালুক্যদের রাজধানী বাতাপি দখল করেন এবং সম্ভবতঃ নিজে ২য় পুলকেশীকে হত্যা করেন। এই জয়লাভে পল্লবগণ দক্ষিণ-ভারতে প্রধান শক্তিতে পরিণত হন। নরসিংহবর্মণ সিংহলে দুইবার নৌবাহিনী প্রেরণ করেন এবং নিজের একজন মনোনীত ব্যক্তিকে সেখানকার সিংহাসনে স্থাপন করেন। তাঁহারই রাজত্বকালে চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ কাঞ্চী পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, "এখানকার জমি বেশ উর্বর, নিয়মিতভাবে চাষ-আবাদও করা হয়, ফসলও ফলে প্রচুর। ফুল ও ফলও ফলে অনেক। এখানে মূল্যবান রত্ন ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়; এখানকার জলবায়ু উষ্ণ, অধিবাসীরা সাহসী। তাহারা সততা এবং সত্যের বিশেষ অনুরাগী, এবং বিদ্যাকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে।"

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে পল্লব ও চালুক্যদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল প্রায় এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রতিদ্বন্দ্বী বংশ-দ্বয়ের শিলালিপিতে স্ব স্ব বংশের বিজয়ের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল পরস্পরবিরোধী বিবৃতি হইতে সঠিক সত্য খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। কথিত আছে ১ম পরমেশ্বরবর্মণের সমসাময়িক চালুক্য বংশীয় রাজা ১ম বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী দখল করেন এবং দক্ষিণ দিকে কাবেরী নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধের ফলে পল্লব-রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। ৭৩৩ খ্রীস্টাব্দের কিছুকাল পরেই ২য় বিক্রমাদিত্য (চালুক্য) কাঞ্চী দখল করেন, কিন্তু পল্লব রাজারা শীঘ্রই তাঁহাদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। চোল, পাণ্ড্য ও গঙ্গরাজাদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সংগ্রাম করিতে হয়। কিন্তু তাঁহারা রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা দন্তিদুর্গ কর্তৃক পরাজিত হন। শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে নন্দীবর্মণ অন্ততঃ ৬৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। নবম শতাব্দীর প্রারম্ভের দিকে ৩য় গোবিন্দ (রাষ্ট্রকূট) পল্লব-রাজ্য আক্রমণ করিয়া সেখানকার রাজা দন্তিবর্মণকে পরাজিত করেন (আঃ ৭৭৬-৮২৮ খ্রীঃ)। দন্তিবর্মণ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে পাণ্ড্য রাজাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। ৮৮০ খ্রীঃ অব্দের দিকে একজন পাণ্ড্য রাজা ভীষণ ভাবে পরাজিত

হন। অবশেষে চোল রাজা ১ম আদিত্য অপরাজিতবর্মণকে পরাভূত করিয়া (আঃ ৮৭৬-৮৯৫ খ্রীঃ) তোণ্ডমণ্ডলম্ অধিকার করেন; তাঁহারই হস্তে পল্লব-শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পল্লব বংশের কেহ কেহ স্থানীয় রাজা হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া ছিলেন।

পল্লব রাজগণের বংশতালিকা
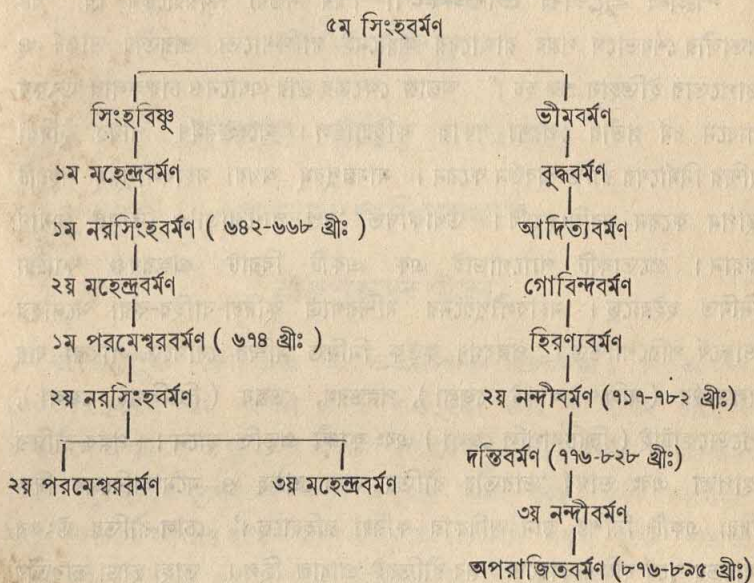
পল্লব-রাজ্যে ধর্ম—পল্লব রাজারা প্রায় সকলেই ছিলেন শিবোপাসক ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী হিন্দু। এই বংশের প্রথম শ্রেষ্ঠ নরপতি সিংহবিষ্ণু সম্ভবতঃ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। মহেন্দ্রবর্মণ প্রথমে জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু স্বীয় রাজত্বকালের মধ্যভাগে তিনি বিখ্যাত সন্ত অপ্পরের প্রভাবে শিবের উপাসনা আরম্ভ করেন। অপ্পরের প্রচারের ফলেই পল্লব-রাজ্যে শৈব ধর্মের অবস্থার উন্নতি ঘটে। মহেন্দ্রবর্মণ অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীকেও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে তিনি জৈনধর্মের প্রতি ভয়ানক বিরূপ হইয়া উঠেন এবং দক্ষিণ আর্কটে অবস্থিত একটি বৃহৎ জৈন মঠ

ধ্বংস করেন। হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণী হইতে জানা যায় যে, পল্লব-রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। কাঞ্চীতে তিনি শত শত বৌদ্ধ মঠ এবং ১০,০০০ বৌদ্ধ পুরোহিত দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ছিলেন মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি বহু নির্গ্রন্থের (জৈন) কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ আলবারগণের চেষ্টায় বৈষ্ণবধর্ম প্রসার লাভ করে। তাঁহাদের তামিল ভাষায় রচিত গীতাবলী গভীর অনুভূতি এবং ধর্মভাবে সমৃদ্ধ।

পল্লব যুগের চারুকলা—স্মিথ মন্তব্য করিয়াছেন যে, "ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পল্লব রাজাদের অধীনেই দাক্ষিণাত্যে ভারতীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ইতিহাস শুরু হয়।" অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও চারুকলার উৎকর্ষ সাধনে ধর্ম গভীর প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। মহেন্দ্রবর্মণ পাথর কুঁদিয়া মন্দির নির্মাণের রীতি প্রবর্তন করেন। মামল্লপুরম্ অথবা মহাবলীপুরম্ শহরটি স্থাপন করেন নরসিংহবর্মণ। তথাকথিত 'সপ্ত প্যাগোডা'ও তিনিই নির্মাণ করান। প্রত্যেকটি প্যাগোডাই এক একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া নির্মিত হইয়াছে। মহাবলীপুরমের মন্দিরগাত্র কুঁদিয়া-বাহির-করা মনোহর ভাস্কর্যে পরিশোভিত। পল্লবগণ কর্তৃক নির্মিত মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় দলভান্নুর (দক্ষিণ আর্কট জেলা), পল্লভরম, ভল্লম (চিংলিপুট জেলা), পুডোকোট্টাই (ত্রিচিনাপলি জেলা) এবং কাঞ্চী প্রভৃতি স্থানে। পল্লব-রীতির স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য 'ভারতীয় রীতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও মনোহারিত্বের দিক দিয়া একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।' চোল-রীতির উৎকর্ষ লাভের পূর্বে দক্ষিণ-ভারতে পল্লব-রীতিরই প্রাধান্য ছিল। তাহা ছাড়া ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই রীতি এবং পল্লবদের উৎকীর্ণ লিপিতে ব্যবহৃত "গ্রন্থ"- লিপির প্রচলন করেন।

পল্লব-রাজ্যে সাহিত্য—পল্লব রাজারা সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশ শিলালিপিই সংস্কৃত ভাষায় রচিত; এমন কি তামিল শিলালিপিমালার 'প্রশস্তি'-ভাগেও সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছে। বহুকাল পূর্ব হইতেই কাঞ্চী সংস্কৃত শিক্ষার একটি পীঠস্থান ছিল। এক-একটি মন্দির ছিল সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার এক-একটি কেন্দ্র। কথিত আছে 'কিরাতার্জুনীয়ম্' নামক কাব্যগ্রন্থের লেখক বিখ্যাত কবি ভারবি পল্লব রাজা সিংহবিষ্ণুর রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অলঙ্কারশাস্ত্রের একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থের প্রসিদ্ধ

রচয়িতা দণ্ডী সম্ভবতঃ ২য় নরসিংহবর্মণের রাজত্বকালে (সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে) জীবিত ছিলেন। ১ম মহেন্দ্রবর্মণ নিজে একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ 'মত্তবিলাস প্রহসন' নামে একখানি কৌতুকনাট্য রচনা করেন।

দশম অধ্যায়

রাজপুত জাতির আধিপত্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজপুতদের উদ্ভব

রাজপুত জাতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব: ভি. এ. স্মিথ দেখাইয়াছেন যে, অষ্টম শতাব্দী হইতে রাজপুতরা উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, "হর্ষের মৃত্যু হইতে মুসলমানগণ কর্তৃক হিন্দুস্থান বিজয় পর্যন্ত, অর্থাৎ মোটামুটি সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ অবধি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া তাহারা এমনই প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল যে এই সময়কালকে সঙ্গতভাবেই রাজপুত যুগ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই যে প্রায় সমস্ত রাজ্যই যে সব পরিবার বা গোষ্ঠীর দ্বারা শাসিত হইত, তাহাদের সমবেত ভাবে বহু যুগ ধরিয়া রাজপুত নামে অভিহিত করিয়া আসা হইয়াছে।"

ইতিহাসে রাজপুত জাতির গুরুত্বের কারণ কেবলমাত্র তাহাদের কয়েক শতাব্দী ব্যাপী প্রভুত্বই নয়। মুসলমান আক্রমণের যুগে তাহারাই ছিল হিন্দুধর্মের রক্ষক, হিন্দু সংস্কৃতির বাহক, হিন্দু ঐতিহ্যের পতাকাবাহী। ঐতিহাসিক টড্ তাঁহাদের বীরত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "একমাত্র অসাধারণ-চরিত্র রাজপুত ভিন্ন বিশ্বের আর কোন্ জাতি এত শতাব্দীর নিদারুণ অবসাদের মধ্যেও সভ্যতার রেশ, তাহাদের পিতৃপুরুষের ভাবধারা অথবা রীতিনীতি রক্ষা

করিয়া চলিতে পারিয়াছে? মানবজাতির ইতিহাসে কেবলমাত্র রাজস্থানই সর্ব প্রকারের নৃশংস বর্বরতা সহ্য করিয়াছে, মানব প্রকৃতির চরম সহিষ্ণুতার নিদর্শন স্বরূপ ভূ-লুণ্ঠিত হইয়াও পুনরায় উৎফুল্ল হৃদয়ে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে, এবং বিপৎপাতকেই সাহসের খড়্গ শাণিত করার কঠিন প্রস্তর স্বরূপ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।"

রাজপুতগণের উদ্ভব সম্বন্ধে বিতর্ক: রাজপুতগণের উদ্ভব সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণ একমত নহেন। কিংবদন্তী অনুসারে রাজপুতেরা প্রাচীন সূর্য ও চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের বংশধর। বর্তমানে এই কিংবদন্তীর সুযোগ্য সমর্থক হইতেছেন পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা; তাঁহার রচিত রাজপুত-জাতির ইতিহাস (হিন্দীতে লিখিত) কালোত্তীর্ণ গবেষণার পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু এই পরম্পরাগত কাহিনীকে ঐতিহাসিক কারণে বহু ইউরোপীয় এবং ভারতীয় মনীষী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিমত সংক্ষেপে এই: "কয়েকটি অভিজাত শ্রেণীর রাজপুত গোষ্ঠী গুর্জর অথবা অন্যান্য বিদেশী জাতির বংশোদ্ভূত; অন্যান্য রাজপুত গোষ্ঠীর সহিত ভারতের কোন কোন আদিম জাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান বলিয়া যে সাধারণ মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহাকেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া ধরা যায়।"

লোকপরম্পরাগত অভিমত: লোকপরম্পরাগত অভিমতের সমর্থকগণ স্বভাবতঃই কিংবদন্তীর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে উৎকীর্ণ লিপিতে লিখিত তথ্যদ্বারা তাহা সমর্থিত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মেবারে প্রচলিত কিংবদন্তীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিংবদন্তী অনুসারে উদয়পুরের রাণারা রামায়ণের বীর রামের বংশধর। কিন্তু অতি প্রাচীন এক শিলালিপিতে এই গুহিলোট বংশের প্রতিষ্ঠাতাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই অবস্থায়, অর্থাৎ যখন মধ্যযুগীয় ও আধুনিক লোক-পরম্পরাগত কাহিনীর সহিত প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপিতে প্রাপ্ত তথ্যের সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না তখন ঐতিহাসিকগণ মনে করেন—কিংবদন্তী অপেক্ষা শিলালিপির প্রমাণই অধিকতর গ্রহণীয়।

লোকপরম্পরাগত কাহিনীর সমর্থকরা বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুধর্মের প্রতি রাজপুতদের শ্রদ্ধাভক্তি এবং হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার্থ মুসলমানদের সহিত তাহাদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম প্রভৃতির দ্বারা তাহারা যে ভারতীয় তাহাই প্রমাণিত হয়।

যে ধর্ম তাহারা নূতন গ্রহণ করিয়াছে সেই ধর্মের জন্য কেন তাহারা এত কঠোর সংগ্রাম করিবে? আধুনিক মতবাদের সমর্থকেরা বলেন যে, নব ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিদের উৎসাহ অনেক সময় সেই ধর্মের পুরাতন অনুগামীদের চেয়ে অধিক হয়। আরব ও তুর্কীদের মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায়, তুর্কীরা ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য আরবদের চেয়ে বেশী উৎসাহ দেখাইয়াছে। সর্বশেষ, ১৯০১ সালের লোকগণনার সময় মনুষ্য-দেহের যে মাপ গ্রহণ করা হয় তাহাতে দেখা যায়, রাজপুতদের দৈহিক গঠনের সহিত আর্যদের দৈহিক গঠনের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রহিয়াছে। আমরা যদি এই সৌসাদৃশ্যকে জাতির সহিত জাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করি, তবে আমাদিগকে রাজপুত বংশসমূহের উদ্ভব সম্পর্কে লোকপরম্পরাগত যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাহাই বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু মনুষ্য-দেহের মাপজোকের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে ভারতের মত দেশে, যে দেশে প্রায়শঃই বহু জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, তাহা ঐতিহাসিক বিচারে টিঁকিবে না। স্মিথ বলেন, "বহু জাতির রক্তের সংমিশ্রণে যেখানে এক জাতির সৃষ্টি হইয়াছে সেখানে মাথার খুলি মাপিয়া অথবা আকৃতির বৈশিষ্ট্য বিচার করিয়া কিছু বোঝা যাইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।"

আধুনিক মত: টডের সময়ে রাজপুতানায় যে সব কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, তিনি প্রধানতঃ উহার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ (*Annals and Antiquities of Rajasthan*) রচনা করিলেও, তিনি রাজপুত জাতির উদ্ভব সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত ছিল তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাজপুতরা শক জাতি হইতে উদ্ভূত। এইভাবে দেখা যাইতেছে যে, রাজপুতরা বৈদেশিক জাতির বংশোদ্ভূত বলিয়া মতবাদটি শতাব্দী কালের বেশী সময় ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। কোন কোন ইউরোপীয় এবং ভারতীয় পণ্ডিত ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে এই মতবাদই দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন।

যে যুগে রাজপুতদের উদ্ভব ঘটে তখন হিন্দুসমাজে বৈদেশিক জাতির সংমিশ্রণ কোনরূপ অভিনব ব্যাপার ছিল না। শক জাতি যে হিন্দুদের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইত তাহার ঐতিহাসিক নিদর্শন রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে জনৈক সাতবাহন রাজা রুদ্রদামনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া-

ছিলেন। অধিকন্তু হূণ, গুর্জর এবং এইরূপ অন্যান্য যে সব জাতি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে হিন্দুরা নিশ্চয়ই নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলে নাই। সুতরাং ইহা নিশ্চিতরূপেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, গ্রীক, কুষাণ ও শকদের মত উহারাও হিন্দু সমাজের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল।

হিন্দু সমাজবিধানে এই সব বিদেশীদের স্থান নির্দিষ্ট হইত তাহাদের নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে। যে সব পরিবার নিজেদের জন্য রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহারা ক্ষত্রিয় বা রাজপুত বলিয়া পরিগণিত হইতেন। টড্ কর্তৃক উল্লিখিত রাজপুত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটির নাম 'হূণ'। কোন কোন সময় বৃত্তি পরিবর্তনের ফলে সামাজিক শ্রেণীরও পরিবর্তন ঘটিত। উদাহরণস্বরূপ, মেবারের গুহিলোটগণ আদিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের পর তাঁহারা হইয়া দাঁড়াইলেন শাসক, রাজপুত। এরূপ পরিবর্তন প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিপন্থী নহে। ধর্মশাস্ত্র নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইবার সম্ভাবনা স্বীকার করেন। এখনও হিন্দু সমাজে এই ভাবে উন্নয়নের ধারা বহিয়া চলিতেছে।

কোন কোন রাজপুত গোষ্ঠী যে বিদেশী বংশোদ্ভূত তাহা শিলালিপি দ্বারা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গুর্জর-প্রতিহারগণকে 'গুর্জর বংশ হইতে উদ্ভূত' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে এরূপ অনুমানেরও যথেষ্ট কারণ আছে যে, কোন কোন রাজপুত গোষ্ঠী ভারতের আদিম জাতিদের বংশধর। স্মিথ মনে করেন চন্দেল্লগণ 'হিন্দুত্বে পরিণত গোন্দ' মাত্র। বিভিন্ন শ্রেণীর রাজপুতগণের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরণের ধর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি এবং ধর্মবিশ্বাস, রীতি-নীতি ও দেশাচার দেখা যায় তাহা তাহাদের পৃথক পৃথক বংশ হইতে উদ্ভবেরই নিদর্শন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, যে সব রাজপুত গোষ্ঠী বিশেষ ভাবে সূর্যের উপাসক তাঁহারা বিদেশী বংশোদ্ভূত, আর যাঁহারা সর্পের (নাগ) পূজারী তাঁহারা এই দেশেরই আদিম জাতির বংশধর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরবগণ কর্তৃক সিন্ধু বিজয়

প্রথম দিকের মুসলমান অভিযান: মহম্মদের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই আরবগণ আরব, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর এবং পারস্য লইয়া গঠিত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া বসে। ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে অন্যতম বিশেষজ্ঞ আর্নল্ডের মতে, সেদিন পর্যন্ত যাহারা ছিল তুচ্ছ এক মরুজাতি তাহাদের এই বিস্ময়কর রাজ্যবিস্তারের পশ্চাতে নব-ধর্মের প্রেরণা অপেক্ষা অধিকতর বলবতী ছিল সৌভাগ্য ও সম্পদে সমৃদ্ধতর প্রতিবেশীদের ভূমি ও ধনরত্ন হস্তগত করার বাসনা। আবার অন্য অনেক লেখক মনে করেন, আরবদের প্রত্যেকটি সামরিক অভিযানে বিজয়লাভের, এবং এমন অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে এতাবৎকালে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলার মূলে ছিল প্রকৃত ধর্মোন্মাদনা, ছিল অন্তর্গূঢ় পূর্ণ পবিত্রতায় প্রথম প্রস্ফুটিত ধর্মবিশ্বাসের অভূতপূর্ব শক্তি। তবে মনে হয়, ভারতের ক্ষেত্রে ধর্ম প্রচারের আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা দেশটির অফুরন্ত ধনরত্নের কাহিনীই আরবদের অধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল। পারস্য বিজয়ের ফলে আরবদের ভারতে পদার্পণের পথ প্রশস্ত হইয়া যায়।

ভারতের উপর প্রথম আরব অভিযান হয় ৬৩৬-৩৭ খ্রীস্টাব্দে। ঐ সালে ভারতের পশ্চিম উপকূল লুণ্ঠন করিবার জন্য আরবেরা চেষ্টা করে। খলিফা ওমরের শাসনকালে বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী থানাতে এই আক্রমণ চালান হয়। খলিফা ওমর জলপথে দূরদেশ আক্রমণ পছন্দ করিতেন না। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ অতটা সাবধান ছিলেন না। তাঁহাদের সময় আরবদের রাজ্য জয় করার বাসনা পূর্ণ হইবার সুযোগ পাইল। কিরমান ও মাকরানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হইল ; সামরিক সাফল্য লাভ হইল, কিন্তু তাহাতে রাজ্য বিস্তার সম্ভব হইল না। আফগানিস্থান জয়েরও চেষ্টা হইয়াছিল।

সিন্ধু জয়: অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবদের শক্তি উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল। পশ্চিম দিকে তাহাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তৃত হয় উত্তর-আফ্রিকা অতিক্রম করিয়া স্পেন অবধি। পূর্ব দিকে তাহারা বোখারা,

খোজন্দ, সমরকন্দ ও ফরঘনা জয় করিয়া কাশগড় পর্যন্ত অগ্রসর হয়। খলিফার প্রতিনিধি হিসাবে হজ্জাজ ইরাক শাসন করিতেন। সিংহলের রাজা কর্তৃক খলিফাকে প্রেরিত উপঢৌকনপূর্ণ আটখানি জাহাজ জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ায় হজ্জাজ তাহাদের দমন করিবার জন্য সিন্ধুতে অবস্থিত দেবল বন্দরে (থাট্টা নামক শহরটির অনতিদূরে অবস্থিত একটি সমুদ্র-বন্দর) সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। অভিযান ব্যর্থ হয় এবং সেনাপতি নিহত হন। তখন মহম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে একটি সুসংবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত নূতন অভিযান প্রেরণ করা হয়।

মহম্মদ ৭১২ খ্রীঃ দেবলে উপনীত হন এবং বিপুল বিক্রমে নগর অধিকার করেন। প্রচুর লুণ্ঠিত সামগ্রী বিজয়ীদের হস্তগত হয়। সতেরো হইতে তদূর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তাহাদের হত্যা করা হইল। মহম্মদ অতঃপর উত্তর দিকে অগ্রসর হন। পথে নিরুনের (হায়দরাবাদের দক্ষিণে অবস্থিত আধুনিক জরক-এর নিকটবর্তী কোন স্থান) জনসাধারণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। সিন্ধুর ব্রাহ্মণ রাজা দাহির রওয়ারের নিকটে এক বিপুল বাহিনী সমাবেশ করেন। এক মুসলমান ঐতিহাসিকের মতে সেই স্থানে "অশ্রুতপূর্ব ভীষণ সংগ্রাম সুরু হয়।" দাহির যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন এবং তাঁহার নেতৃহীন সৈন্যগণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। দাহিরের স্ত্রী এবং পুত্র রাওয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রায় ১৫,০০০ সৈন্য দুর্গ রক্ষার জন্য মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে থাকে। দুর্গের পতন আসন্ন হইলে বীরাঙ্গনা রাণী এবং অন্যান্য পুরনারীরা অসম্মানের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য আগুনে ঝাঁপাইয়া প্রাণ বিসর্জন দেন। মহম্মদ দুর্গ অধিকার করিয়া প্রায় ৬,০০০ লোককে হত্যা করেন; দাহিরের যাবতীয় ধনরত্ন সেখানে সঞ্চিত ছিল, তাহাও তাঁহার হস্তগত হয়। অতঃপর তাঁহার বাহিনী ব্রাহ্মণাবাদের (হায়দরাবাদের উত্তরে এই শহরটির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়) দিকে যাত্রা করেন। নিরুনের অধিবাসীদের ন্যায় এখানকার অধিবাসীরাও বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর আরোর (আলোর) দুর্গ অধিকৃত হয়। হিন্দুদের শেষ ঘাঁটি ছিল মুলতান। তুমুল যুদ্ধের পর তাহাও অধিকৃত হয়।

মহম্মদের জয়গৌরবমণ্ডিত জীবন কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। বোধহয় খলিফার

রাজসভায় তাঁহার যে সব শত্রু ছিল তাহাদের ষড়যন্ত্রেই তাঁহার জীবনাবসান হয়। খলিফা ওয়ালিদের (৭০৫-৭১৫ খ্রীঃ) আদেশে তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হয়। তবে পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকগণের বিবিধ কল্পিত কাহিনী হইতে এই করুণ ব্যাপার কিভাবে সংঘটিত হয় সে সত্য উদ্ধার করার কোন উপায়ই আর নাই।

সিন্ধুদেশে আরব-শাসনঃ নববিজিত প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় ('ইক্তা') বিভক্ত করা হয়। সামরিক সেবার শর্তে আরবদেশীয় সামরিক কর্মচারিগণ ঐ সব জেলার ভার পান। সাধারণ সৈন্যদের কাহাকে কাহাকেও জমি এবং অন্যদের নির্দিষ্ট বেতন দেওয়া হইত। মুসলমান সাধু এবং মসজিদের ইমামগণও জমি ভোগ করিতেন। এই সব ব্যবস্থার ফলে ধীরে ধীরে সিন্ধুদেশে আরবদের কতকগুলি সামরিক উপনিবেশ গড়িয়া উঠিতে থাকে। আবার সেগুলির মধ্যে কয়েকটি বাণিজ্য ও কৃষ্টির দিক হইতে সমৃদ্ধিশালী নগরেও পরিণত হয়।

ভূমি-কর এবং জিজিয়া[১] ছিল সরকারী রাজস্বের প্রধান উৎস। সাধারণতঃ উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ হইতে এক-চতুর্থাংশ ছিল ভূমি-কর। ইহা ভিন্ন কিছু অতিরিক্ত করও ছিল ; সেগুলি সাধারণতঃ নীলামের সর্বোচ্চ ডাকওয়ালাদের বিলি করা হইত।

সুগঠিত কোন বিচার-বিভাগ ছিল না। অভিজাত শ্রেণী স্ব স্ব এলাকায় অনুষ্ঠিত অপরাধের বিচার করিতেন ; গুরু অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিবার অধিকার তাঁহাদের ছিল। কাজীরা ইসলামের আইন অনুসারে বিচার করিতেন। হিন্দুদের বিচারও ঐ আইনমতে হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুদের অত্যন্ত কঠোর সাজা দিবার বিধান ছিল। যেমন, হিন্দুরা চুরির দায়ে অপরাধী হইলে তাহার পরিবারের সকলকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করা হইত। বিবাহ, উত্তরাধিকার, ব্যভিচার প্রভৃতি সম্পর্কিত বিরোধে যেখানে কেবল হিন্দুদেরই স্বার্থ জড়িত থাকিত সেখানে তাহাদের পঞ্চায়েৎরাই বিচার করিতেন।

বিজয় অভিযানের সঙ্গে সঙ্গেই মন্দির ধ্বংস এবং 'কাফের'দের নির্যাতন

---

১ প্রারম্ভে এই করটি সামরিক সেবার পরিবর্তে 'জিম্মি'দের (মুসলমান রাষ্ট্রে অমুসলমান অধিবাসিগণ 'জিম্মি' নামে পরিচিত) নিকট হইতে আদায় করা হইত।

আরম্ভ হয়, কিন্তু অচিরেই বুঝিতে পারা যায় যে শক্তি প্রয়োগে হিন্দুধর্ম বিনষ্ট করা সম্ভবপর নয়। অতঃপর আরবরা পরমতসহিষ্ণুতার নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। এই নীতি বর্ণনা করিতে গিয়া হজ্জাজ বলিয়াছেন, "যখন তাহারা অবনতি স্বীকার করিয়াছে এবং খলিফাকে কর দিতে সম্মত হইয়াছে তখন তাহাদের নিকট হইতে ন্যায়তঃ আর কিছু চাহিবার নাই। তাহাদিগকে আমাদের রক্ষণাধীনে আনা হইয়াছে, এই অবস্থায় তাহাদের জীবন ও সম্পত্তির দিকে আমরা আর হাত বাড়াইতে পারি না। স্ব স্ব দেবদেবীকে পূজা করার অধিকার তাহাদের দেওয়া হইল। কাহাকেও নিজ ধর্ম অনুসরণে বাধা দেওয়া অথবা নিষেধ করা উচিত হইবে না।" মহম্মদ বিন কাশিম মুলতানে ঘোষণা করেন, "খ্রীস্টানদের গীর্জা, ইহুদীদের ধর্মসভা এবং পারসিক পুরোহিতমণ্ডলীর বেদীর মতো (হিন্দুদের) মন্দিরও পবিত্র থাকিবে।" তাঁহার এই ঘোষণা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ কতটা মান্য করিয়া চলিয়াছিলেন তাহা বলা কঠিন।

সিন্ধুতে আরব-শক্তির পতন : ধর্মের ব্যাপারে অতি উৎসাহ এবং রাজনৈতিক লোভই আরবদিগকে বিজয় অভিযানের প্রথম দিকে একসূত্রে বাঁধিয়াছিল, কিন্তু শক্তির দৃঢ়তা সম্পাদনের পর ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে দেখা দিল অনৈক্য ও বিভেদ। একজন প্রধান আর একজন প্রধানের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে লাগিল, সুন্নিরা শিয়াদের এবং খারিজি ও কারমাথিয়ানদের মতো অনৈষ্ঠিক মতবাদীদের উৎপীড়ন করিতে লাগিল। খলিফার শক্তি যত হ্রাস পাইতে লাগিল সিন্ধুদেশও ততই কার্যতঃ স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। নবম শতাব্দীর শেষভাগে সিন্ধুদেশ খলিফার শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তিন শতাব্দী পরে মহম্মদ ঘুরী মুলতান হইতে দেবল পর্যন্ত সমগ্র সিন্ধুদেশ দখল করিলেন এবং মৃত্যুকালে উহা ভারতস্থ স্বীয় উত্তরাধিকারীকে দিয়া গেলেন।

ভারতীয় ইতিহাসের উপর সিন্ধুতে আরব শাসনের ফল : আরবগণ কর্তৃক সিন্ধু বিজয়কে 'ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে একটি প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান, একটি ফলহীন বিজয়' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আরবরা ভারত জয়ের জন্য সিন্ধুকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিতে পারে নাই। তাহারা রাজপুতানা, গুজরাট, কাথিয়াবাড় ও কচ্ছের রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযান করে, কিন্তু রাজপুতদের, বিশেষ করিয়া গুর্জর-প্রতিহারদের,

পরাজিত করা তাহাদের সাধ্যের অতীত ছিল। আরবদের শাসনাধীন সিন্ধুদেশ ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোতে একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্ররূপে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। বস্তুতঃ সিন্ধুর আরবেরা যেরূপ ব্যাপক ভাবে বাণিজ্যিক কর্মতৎপরতা সুরু করিয়াছিল তাহাতে এই ভারতীয় প্রদেশটি মুসলমান রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি অঙ্গে পরিণত হইয়া, রাজপুতানার মরুভূমির পরপারে হিন্দু-জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

আরবেরা সিন্ধুবাসীদের একাংশকে ধর্মান্তরিত করিতে সমর্থ হইলেও স্থায়ীভাবে ভাষা, শিল্প, ঐতিহ্য এবং দেশের রীতিনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহারা যে সব পথঘাট ও অট্টালিকা নির্মাণ করে তাহা কালের ধ্বংসলীলা হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই। পক্ষান্তরে আরবেরাই হিন্দু-সভ্যতার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। ভারতীয় সঙ্গীত, চিত্রকলা, চিকিৎসাবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র ইসলামের সেই তরুণ অবস্থায় তাহাকে বহু শিক্ষা দান করিয়াছিল। ভারতীয়গণের নিকট হইতেই আরবেরা প্রাথমিক জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করে। আব্বাসীয় বংশের পতনের পর হিন্দু ও আরবগণের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নিদারুণ আঘাতে ছিন্ন হইয়া যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উত্তর ভারতের রাজবংশসমূহ

হর্ষের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে যে সকল হিন্দু-রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার বেশীর ভাগই যে সকল উপজাতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহারা নিজেদের রাজপুতবংশোদ্ভব বলিয়া দাবি করিত। এই সব রাজপুত বংশের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কনৌজের গুর্জর-প্রতিহার রাজবংশ। দশম শতাব্দীতে প্রতিহার সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবার পর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপুত বংশের উদ্ভব হয়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বংশ যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দান করে। সেগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি রাজবংশের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

শাকম্ভরী ও আজমীরের চাহমান (অথবা চৌহান) বংশ ঃ রাজপুত চারণগণ কর্তৃক রক্ষিত ঐতিহ্য অনুসারে, রাজপুতানার আবু পাহাড়ে বিখ্যাত বশিষ্ঠ মুনির অগ্নিবেদী হইতে প্রতিহার, চাহমান, চালুক্য এবং পরমার—এই চারিটি 'অগ্নিকুলের' উদ্ভব। অবশ্য চাহমান বংশের প্রাচীন শিলালিপিতে এই কাহিনীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনে হয়, পূর্বতন যোধপুর ও জয়পুর রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত শাকম্ভরী (বা শম্ভর) অঞ্চল ছিল চাহমানদের আদি বাসভূমি। তাহারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে শাকম্ভরী শাখা নিঃসন্দেহে ছিল শ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকারী। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বসুদেব। তিনি কখন যে স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। ১ম গুবাক ছিলেন গুর্জর-প্রতিহার সম্রাট ২য় নাগভটের অধীন সামন্ত রাজা। কথিত আছে ২য় গুবাক দিল্লী অঞ্চলের[১] একজন তোমর রাজাকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। এইভাবেই শুরু হয় চাহমান ও তোমরদের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবং তাহার ফলে শেষ অবধি দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয় চাহমান-বংশের আধিপত্য।

১ম বাক্‌পতি এবং সিংহরাজের সামরিক কৃতিত্বের ফলে এই বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সম্ভবতঃ ২য় বিগ্রহরাজের (আঃ ৯৭৩ খ্রীঃ) সিংহাসনারোহণের পূর্বেই চাহমানগণ প্রতিহারদের অধীনতাপাশ হইতে মুক্তিলাভ করেন। তিনি দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত স্বীয় রাজ্যের বিস্তার সাধন করেন; গুজরাটের চৌলুক্য রাজা মূলরাজও তাঁহার নিকট পরাজিত হন। অজয়রাজ মালবের পরমার রাজার একজন সেনাপতিকে পরাস্ত করেন এবং উজ্জয়িনী পর্যন্ত দেশ জয় করেন। তিনিই ছিলেন বিখ্যাত অজয়-মেরু বা আজমীর শহরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পুত্র অর্ণোরাজ (আঃ ১১৩৯ খ্রীঃ) গুজরাটের চৌলুক্য নৃপতি জয়সিংহ সিদ্ধরাজ এবং কুমারপাল কর্তৃক পরাজিত হন।

---

১ তোমরবংশ (তুয়ারগণ) ছিল ৩৬টি বিখ্যাত রাজপুত কুলের অন্যতম। চারণদের গাথায় পাওয়া যায়, তোমর বংশের রাজা অনঙ্গপাল অষ্টম শতাব্দীতে দিল্লী শহর প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত তোমরগণ গুর্জর-প্রতিহার রাজগণের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। অতঃপর তাঁহারা স্বাধীন হন, কিন্তু চাহমানদের বিরুদ্ধতার ফলে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। ১১৬৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কোন সময় চাহমানগণ কর্তৃক দিল্লী অধিকারের ফলে তোমর বংশের অবসান হয়।

কোন কোন চাহমান শিলালিপিতে ২য় গোবিন্দরাজ, অজয়রাজ ও অর্নোরাজ কর্তৃক মুসলমানদের পরাভবের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ পরাজিত মুসলমানেরা ছিল সুলতান মামুদ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের সৈন্যদল। মুসলমানদের সহিত এই যুদ্ধবিগ্রহ ৪র্থ বিগ্রহরাজের সময় পর্যন্ত (আঃ ১১৫৩-১১৬৪ খ্রীঃ) চলে। পঞ্জাবের ইয়ামিনি বংশ সেই সময় দুর্বল হইয়া পড়ায় তিনি সেই সুযোগে শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল দখল করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি তোমরদের নিকট হইতে দিল্লী ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলও অধিকার করিয়াছিলেন। "দিল্লী এবং যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ অধিকারের ফলে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার প্রবেশদ্বার রক্ষার ভার তাঁহারই বংশের উপর আসিয়া বর্তায়। পরবর্তী কালের ইতিহাসে দেখা যায়, ঘূরের পর্বত হইতে উত্থিত পুনরুজ্জীবিত মুসলমান শক্তির প্রথম সংঘাত চাহমানদেরই সহ্য করিতে হয়।"

চাহমান বংশের শাকম্ভরী শাখার শেষ বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন ৩য় পৃথ্বীরাজ (আঃ ১১৭৯-১১৯২ খ্রীঃ)। ভারতীয় ইতিহাসের পাঠকদের নিকট তাঁহার নাম বিশেষ পরিচিত। জয়ঙ্ক কর্তৃক বিরচিত 'পৃথ্বীরাজ-বিজয়' নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে এবং চাঁদ বরদাই রচিত 'পৃথ্বীরাজ-রাসো' নামক হিন্দী মহাকাব্যে তাঁহার জীবন-কাহিনী বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু চাঁদ বরদাই-এর গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য সন্দেহের অতীত নয়। ইহাতে বর্ণিত ঘটনাসমূহের পারম্পর্য অযৌক্তিকতায় পরিপূর্ণ; তাহা ছাড়া সংযুক্তা সম্পর্কিত বিখ্যাত প্রেমকাহিনীও সত্য বলিয়া মনে হয় না।

জেজা-ভুক্তির চন্দেল্লগণের সহিত এবং গুজরাটের চৌলুক্যগণের সহিত পৃথ্বীরাজের সংঘর্ষের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে, কিন্তু হিন্দু ভারতের শেষ মহাবীর রূপে তাঁহার খ্যাতির কারণ মহম্মদ ঘূরীকে তাঁহার প্রতিরোধের প্রয়াস। পঞ্জাবের ইয়ামিনি বংশের বিলোপের ফলে (১১৮০ খ্রীঃ) ঘূর ও শাকম্ভরী বংশ পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য উত্তর ভারতের হিন্দু রাজারা সমবেত ভাবে কোন চেষ্টা করেন নাই। ১১৯১ খ্রীঃ অব্দে তরাইনের ক্ষেত্রে মহম্মদ ঘূরী পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। জনৈক মুসলমান তথ্যপঞ্জী-লেখক বলেন, "ইসলামের বাহিনীর এমনই পরাভব ঘটিল যে তাহার আর কোন প্রতিকার রহিল না।" যাহা হউক, মুসলমান সৈন্যদিগকে

গজনীতে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হয়। মহম্মদ ঘূরী স্বীয় বাহিনী পুনর্গঠিত করিয়া ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে আবার তরাইনের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত, ধৃত ও নিহত হন। হিন্দুগণের এই বিপর্যয়ের কারণ হইতেছে মহম্মদের উন্নততর রণকৌশল এবং চলমান অশ্বারোহী বাহিনীর চমৎকার ব্যবহার।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলে কার্যতঃ চাহমান-রাজ্য মুসলমানদের হাতে চলিয়া যায়। আজমীর, দিল্লী ও মীরাট অল্পদিনের মধ্যেই অধিকৃত হয়। পৃথ্বীরাজের আত্মীয়স্বজন যে হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা শীঘ্রই দমন করা হয়।

জেজা-ভুক্তির (বুন্দেলখণ্ডের) চন্দেল্ল (বা চন্দ্রাত্রেয়) বংশঃ চন্দেল্ল বংশের পূর্ব ইতিহাস রহস্যাবৃত। সাধারণের বিশ্বাস চন্দ্র হইতে এই বংশের উৎপত্তি। এই বংশের প্রথম যে ঐতিহাসিক ব্যক্তির নাম শিলালিপিতে পাওয়া যায় তিনি হইতেছেন নন্নুক। তিনি সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে জীবিত ছিলেন। চন্দেল্লদের আদি শক্তিকেন্দ্র ছিল খজুরাহো। এই বংশের প্রথম নৃপতিগণ ছিলেন গুর্জর-প্রতিহারগণের সামন্ত। যদিও চন্দেল্লগণের সরকারী নথিপত্রে ৯৫৪ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত প্রতিহার বংশের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়, তবুও মনে হয় ৯১৫ খ্রীস্টাব্দের পরে কোন সময় ৩য় ইন্দ্র (রাষ্ট্রকূট) কর্তৃক মহীপাল (প্রতিহার) পরাস্ত হইবার পর পতনোন্মুখ সম্রাট বংশের নিকট চন্দেল্ল রাজবংশের বশ্যতা স্বীকার নামে মাত্র ছিল।

আদি চন্দেল্ল রাজাদের মধ্যে হর্ষ ও যশোবর্মণ নিঃসন্দেহে শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন, কিন্তু শিলালিপি প্রভৃতিতে তাঁহাদের কার্যকলাপের ইতিহাস এত অস্পষ্ট এবং অতিরঞ্জিত যে, উহা হইতে তাঁহাদের জীবনের কার্যাবলীর বিস্তারিত ধারা সঠিক ভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

এই বংশের প্রথম শ্রেষ্ঠ নৃপতির নাম ধঙ্গ (আঃ ৯৫৪-১০০২ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি এলাহাবাদ, কালঞ্জর ও গোয়ালিয়র সহ উত্তর ভারতের এক বিস্তৃত অংশে রাজত্ব করিতেন। কথিত আছে তিনি উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের বহু নৃপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু উৎকীর্ণ লিপির এই সকল বিবৃতির সত্যতা যাচাই করা কঠিন। সম্ভবতঃ ধঙ্গের রাজত্বকালেই খজুরাহোর কতকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়। তাঁহার পর সিংহাসনে আরোহণ

করেন তাঁহার পুত্র গণ্ড (আঃ ১০০২-১০১৯ খ্রীঃ)। অনেকের মতে কোন কোন মুসলমান তথ্যপঞ্জী-লেখক সুলতান মামুদের প্রতিপক্ষ রূপে 'নন্দ' নামে যে শক্তিশালী নৃপতির কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন গণ্ড ছিলেন সেই 'নন্দের' সহিত অভিন্ন ; তবে সম্ভবতঃ ইহা ঠিক নয়। গণ্ডের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বিদ্যাধরকে মুসলমান ঘটনাপঞ্জী-লেখকগণ 'ভারতের নৃপতিগণের মধ্যে রাজ্যের আয়তনে সর্বশ্রেষ্ঠ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রতিহার বংশের শেষ সম্রাট রাজ্যপালকে তিনি পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। সুলতান মামুদের আক্রমণ হইতে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা রক্ষা করিবার দায়িত্ব তাঁহার উপরই পড়িয়াছিল। মুসলমান লেখকগণ কর্তৃক উল্লিখিত শক্তিশালী হিন্দু রাজা 'নন্দের' সহিত তাঁহার অভিন্নতা অনুমান করা হইয়াছে। সুলতান মামুদের সহিত 'নন্দের' যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সংবাদ পাওয়া যায় তাহা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই শ্রেষ্ঠ বিজয়ী অন্যান্য হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে যে জয়লাভ করিয়াছিলেন চন্দেল্লগণের ক্ষেত্রে কিন্তু তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে পারেন নাই।

বিদ্যাধরের ঠিক পরবর্তী উত্তরাধিকারিগণ দুর্বল শাসক ছিলেন, ফলে বিখ্যাত কলচুরি রাজা লক্ষ্মী-কর্ণের বিজয় লাভে চন্দেল্ল রাজাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারাবৃত হইয়াছিল। কীর্তিবর্মণের রাজত্বকালে চন্দেল্লগণের ক্ষমতার পুনরুদ্ধার হয়। কীর্তিবর্মণের সেনাপতি গোপাল লক্ষ্মী-কর্ণকে ভীষণভাবে পরাস্ত করেন। কিন্তু কলচুরি রাজার আঘাত এত কঠিন হইয়াছিল যে, সেই আঘাত সামলাইয়া চন্দেল্ল রাজবংশের পক্ষে উত্তর ভারতে শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা অর্জন আর সম্ভব হয় নাই। এই বংশের সর্বশেষ ক্ষমতাশালী নৃপতির নাম মদনবর্মণ (আঃ ১১২৯-১১৬৩ খ্রীঃ)। তিনি কালঞ্জর, খজুরাহো, অজয়গড় ও মহোবা—চন্দেল্ল বংশের রাজত্বের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত এই চারিটি প্রধান স্থানে প্রভুত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি মালবের পরমার রাজা, ডাহলের কলচুরি রাজা এবং গুজরাটের চৌলুক্য নরপতি সিদ্ধরাজ জয়সিংহকে পরাজিত করেন। শোনা যায় বারাণসীর গাহড়বাল রাজা (কীর্তিবর্মণের প্রতি) 'সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণে তাঁহার কালহরণ করিতেন।'

মদনবর্মণের পৌত্র পরমর্দি (আঃ ১১৬৭-১২০২ খ্রীঃ) দিল্লী ও আজমীরের বিখ্যাত চাহমান বংশীয় নৃপতি ৩য় পৃথ্বীরাজ কর্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন। ১২০২ খ্রীঃ অব্দে কুতবউদ্দীন আইবক কালঞ্জর দখল করিয়া পরমর্দিকে

'পরাধীনতার ফাঁস গলায় পরিতে' বাধ্য করেন। তাঁহার পুত্র ত্রৈলোক্যবর্মণ (আঃ ১২০৫-১২৪১ খ্রীঃ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সম্ভবতঃ তিনি কালঞ্জর উদ্ধার করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বুন্দেলখণ্ডের কিয়দংশ চন্দেল্ল বংশের রাজাদের শাসনাধীন ছিল।

মধ্যপ্রদেশের কলচুরি বংশঃ আমাদের 'মহাকাব্যে' এবং পৌরাণিক কাহিনীতে যে হৈহয় ক্ষত্রিয়দের কথা উল্লেখ আছে, কলচুরি রাজারা দাবি করিতেন যে তাঁহারা সেই হৈহয় ক্ষত্রিয়দেরই অধস্তন পুরুষ। অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত শিলালিপিতে ইঁহাদের নাম পাওয়া যায়। এই বংশের প্রধান শাখা হইতেছে ডাহল অথবা ত্রিপুরির (জব্বলপুরের নিকটস্থ আধুনিক তেওয়ার) কলচুরি বংশ। ইঁহারা নিজেদের বিষ্ণুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দান করেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন কোক্কল (আঃ ৮৭৫-৯২৫ খ্রীঃ)। মধ্যপ্রদেশস্থ আধুনিক জব্বলপুর বিভাগ বলিতে যাহা বোঝায়, তিনি সম্ভবতঃ সেই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তিনি চন্দেল্ল এবং রাষ্ট্রকূট বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। গুর্জর-প্রতিহারগণের সহিতও তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের রীতি তিন পুরুষ ধরিয়া অনুসৃত হইয়াছিল। কলচুরিবংশীয় লক্ষ্মণরাজ দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজত্ব করিতেন। তিনি বঙ্গ, কোশল, গুজরাট, কাশ্মীর ও পাণ্ড্য-রাজ্যের রাজাদের পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়া গিয়াছেন। তিনি হয়ত লুণ্ঠনের জন্য বঙ্গ, কোশল ও গুজরাটে অভিযান করিয়াছিলেন, কিন্তু কাশ্মীর ও পাণ্ড্য-রাজ্য আক্রমণ করা সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। পরমারবংশীয় রাজা দ্বিতীয় বাক্‌পতি (মুঞ্জ) কলচুরিবংশীয় দ্বিতীয় যুবরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কলচুরি-রাজধানী ত্রিপুরি শহরও তিনি দখল করেন। কিন্তু শীঘ্রই ত্রিপুরি পুনরধিকৃত হয়। কল্যাণীর চালুক্য বংশীয় রাজা দ্বিতীয় তৈল সম্ভবতঃ দ্বিতীয় যুবরাজকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় যুবরাজের উত্তরাধিকারী সম্ভবতঃ চন্দেল্ল বংশীয় রাজা বিদ্যাধর কর্তৃক পরাজিত হন।

গাঙ্গেয় বিক্রমাদিত্য (আঃ ১০৩০-১০৪১ খ্রীঃ) কলচুরি বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। কথিত আছে তিনি কির (কাঙ্গরা উপত্যকায় অবস্থিত), বঙ্গ, উৎকল এবং কুন্তলের নৃপতিদের পরাজিত করেন। এলাহাবাদ ও বারাণসী

দখল করিয়া তিনি উত্তরে গঙ্গা নদী পর্যন্ত স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন। অবশ্য তিনি পরমার বংশীয় রাজা ভোজ কর্তৃক পরাজিত হন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মী-কর্ণ (আঃ ১০৪১-১০৭০ খ্রীঃ) একজন খ্যাতনামা দিগ্বিজয়ী ছিলেন। "অন্ততঃ কিছু কালের জন্য তিনি পশ্চিমে বনস ও মাহী নদীর উৎস হইতে পূর্বে হুগলী নদীর জোয়ার-ভাঁটার মুখ অবধি এবং উত্তরে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা হইতে মহানদী, বেন গঙ্গা, ওয়ার্ধা ও তাপ্তী নদীর উজান পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা স্বীয় শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের যে পতাকা গুর্জর-প্রতিহার বংশের নৃপতিগণের হস্তচ্যুত হইয়া চন্দেল্ল ও পরমার রাজগণের হস্তে পতিত হইয়াছিল, তাহা অবশেষে কলচুরি নৃপতিগণ কর্তৃক অধিকৃত হইল।" এই শক্তিশালী নৃপতিও তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে বঙ্গদেশের নয়পাল ও ২য় বিগ্রহপাল, চন্দেল্ল বংশীয় রাজা কীর্তিবর্মণ, পরমার রাজা উদয়াদিত্য, চৌলুক্য বংশীয় নৃপতি ১ম ভীম এবং কল্যাণীর চালুক্য বংশীয় রাজা ১ম সোমেশ্বরের হাতে পরাজিত হন।

তাঁহার উত্তরাধিকারী যশঃ-কর্ণও (১০৭৩-১১২৫ খ্রীঃ) এইভাবে পরমার, চন্দেল্ল ও চালুক্য নৃপতিগণ কর্তৃক পরাজিত হন। সম্ভবতঃ তাঁহারই রাজত্বকালে গাহড়বাল রাজারা বারাণসী হইতে কনৌজ পর্যন্ত দখল করেন। ইহার ফলে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকাস্থিত ভাল ভাল জেলাগুলি কলচুরিগণের হস্তচ্যুত হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী গয়া-কর্ণ (আঃ ১১৫১ খ্রীঃ) সম্ভবতঃ চন্দেল্ল বংশীয় রাজা মদনবর্মণ কর্তৃক পরাজিত হন। তুম্মনের কলচুরি রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া গয়া-কর্ণকে দক্ষিণ কোশলের অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সম্বন্ধে খুব সামান্য কথাই জানিতে পারা যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে মুসলমানেরা তাহাদের ক্ষমতা ভান্‌রের গিরিমালা পর্যন্ত বিস্তার করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জব্বলপুর অঞ্চলে গোন্দদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সম্ভবতঃ কলচুরিরা ঐ অঞ্চল শাসন করিয়াছিলেন।

বারাণসী ও কনৌজের গাহড়বাল রাজবংশঃ শিলালিপি হইতে জানা যায়, এই রাজবংশের আদিপুরুষের নাম যশোবিগ্রহ। তিনি যে রাজবংশের লোক ছিলেন তাহা মনে হয় না। এই বংশের গৌরবের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চন্দ্র। তিনি একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কনৌজ

দখল করেন। গাহড়বালগণের প্রাচীন রাজধানী সম্ভবতঃ বারাণসীতে অবস্থিত ছিল। কলচুরিগণের দুর্বলতার জন্যই তাঁহাদের পক্ষে আধুনিক উত্তর প্রদেশে রাজ্যবিস্তার সম্ভবপর হইয়াছিল। গাহড়বাল বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র (আঃ ১১১৪-১১৫৪ খ্রীঃ)। পঞ্জাবের ইয়ামিনি সুলতানগণ, বিহারের পালরাজগণ, বঙ্গদেশের সেন রাজগণ এবং ডাহলের কলচুরি বংশীয় রাজগণের সহিত তাঁহার যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না। তিনি উত্তর ভারতে চন্দেল্লগণের সহিত ও দাক্ষিণাত্যে চোলগণের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিজয়চন্দ্রের সময় পর্যন্ত ইয়ামিনিদের সহিত যুদ্ধ চলে।

এই বংশের পরবর্তী রাজা জয়চ্চন্দ্রের (আঃ ১১৭০-১১৯৩ খ্রীঃ) নাম ইতিহাসের সমস্ত ছাত্রের নিকটই সুপরিচিত। কথিত আছে তাঁহার সমসাময়িক বঙ্গদেশের সেনবংশীয় নৃপতি লক্ষ্মণসেন বারাণসী ও এলাহাবাদে বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করান। এই দাবি যদি সত্য হয় তবে নিশ্চয় তিনি জয়চ্চন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। চাঁদ বরদাই লিখিত 'পৃথ্বীরাজ-রাসো' নামক মহাকাব্যে ৩য় পৃথ্বীরাজের সহিত জয়চ্চন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিখ্যাত গল্পটি আছে। জয়চ্চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তার সহিত তাঁহার প্রেমের কাহিনীও উহাতে পাওয়া যায়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে চাঁদ বরদাই-এর মহাকাব্য খুব বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে মহম্মদ ঘূরীর বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতবউদ্দীন আইবক গাহড়বালদের রাজ্য আক্রমণ করেন। চন্দবরের (এটোয়া জেলা, উত্তর প্রদেশ) যুদ্ধে ১১৯৩ সালে জয়চ্চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হন। অস্‌নি (জৌনপুর বা ফতেপুরের নিকটে অবস্থিত)—'যেখানে রাজার ধনসম্পত্তি লুক্কায়িত ছিল'—লুণ্ঠিত হয়। বিজয়ী মুসলমানেরা অতঃপর বারাণসী দখল করে এবং বহু মন্দির ধ্বংস করে।

শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, মুসলমানগণ কর্তৃক গাহড়বাল-রাজ্যের প্রধান প্রধান শহর অধিকৃত হইলেও, জয়চ্চন্দ্রের পুত্র হরিশ্চন্দ্র পিতৃরাজ্যের কিয়দংশে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। চারণ-কবিদের কোন কোন গাথায় যোধপুরের রাঠোর বংশকে জয়চ্চন্দ্রের বংশোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শিলালিপির সাক্ষ্য হইতেও এই লোকপরম্পরাগত কাহিনী সমর্থিত হইয়া থাকে।

মালবের পরমারগণঃ পরবর্তী কালের চারণ-গাথা ও শিলালিপি অনুসারে আবু পাহাড়ের পৌরাণিক অগ্নিকুণ্ড হইতে পরমার বংশের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই রাজবংশের কয়েকটি প্রাচীন শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, এই বংশের সহিত দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণের সম্পর্ক ছিল। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগের দিকে পরমারগণ গুজরাটের রাষ্ট্রকূটগণের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। সম্ভবতঃ উপেন্দ্ররাজ ছিলেন এই বংশের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তবে বোধ হয় রাষ্ট্রকূট-সামন্ত ১ম বাক্‌পতিরাজই ছিলেন পরমারদের বংশগৌরবের প্রথম প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। পরমার বংশের আদি শাসকগণ সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূট, গুর্জর এবং প্রতিহারগণের বিরোধে অংশ গ্রহণ করিতেন। দশম শতাব্দীর শেষের দিকে ঐ দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী বংশের যুগপৎ শক্তিহানিতে পরমারগণের পক্ষে মালবে স্বাধীনতা স্থাপন সহজ হইয়াছিল। ইতিপূর্বেই তাঁহারা গুজরাট হইতে মালবে সরিয়া আসিয়াছিলেন।

হর্ষ বনাম ২য় সিয়ক (আঃ ৯৪৮-৯৭৪ খ্রীঃ) সম্ভবতঃ প্রথম স্বাধীন পরমার রাজা ছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় বাক্‌পতি বা মুঞ্জ (আঃ ৯৭৪-৯৯৫ খ্রীঃ) একজন শক্তিশালী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী নৃপতি ছিলেন। অন্যায় ভাবে সিংহাসন দখলকারী দ্বিতীয় তৈলকে কল্যাণীর সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য তিনি বারবার চেষ্টা করেন। ডাহলের কলচুরি বংশীয় রাজা দ্বিতীয় যুবরাজকে তিনি পরাজিত করেন। কেরল, চোল, গুজরাটের চৌলুক্য, নাড়োলের চাহমান ও মেবারের গুহিলোট বংশের রাজগণের সহিত তাঁহার সংগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় তৈলের সহিত সংঘর্ষে তাঁহার জীবনের বিষাদান্ত অবসান ঘটে। তিনি বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'নবসাহসাঙ্ক-চরিত' রচয়িতা পদ্মগুপ্ত এবং ছন্দঃশাস্ত্রের বিখ্যাত ভাষ্যকার হলায়ুধ সহ কয়েকজন বিখ্যাত মনীষী তাঁহার অনুগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মুঞ্জ নিজে একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন এবং নিজেও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

পরমার বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ভোজ (আঃ ১০১০-১০৫৫ খ্রীঃ) ভারতীয় ইতিহাসে এবং পৌরাণিক উপাখ্যানে বিখ্যাত হইয়া আছেন। সমসাময়িক শিলালিপিতে তাঁহার সামরিক বিজয় কাহিনী সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি আছে। কল্যাণীর চালুক্য বংশের সঙ্গে এবং ডাহলের কলচুরি বংশের সঙ্গে তাঁহার সংগ্রামের প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায়, এবং একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট

কারণ আছে যে, ঐ সব যুদ্ধের কোন কোনটিতে তিনি জয়লাভও করেন। দ্বিতীয় বাক্‌পতির মত তাঁহার মৃত্যুও মর্মান্তিক অবস্থায় হয়। কল্যাণীর চালুক্যরাজ ১ম সোমেশ্বর আহবমল্ল, গুজরাটের চৌলুক্যরাজ ১ম ভীম এবং কলচুরি বংশীয় বিখ্যাত রাজা লক্ষ্মী-কর্ণ যুগপৎ তাঁহার রাজধানী ধারা নগরী আক্রমণ করেন এবং সেই যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়। চন্দেল্লগণের সহিত ভোজের সম্পর্ক সম্ভবতঃ বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। সামরিক ও রাজনৈতিক জয়গৌরব অপেক্ষা শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়া গিয়াছেন। শিলালিপি হইতে জানা যায় তিনি বহু সৌধাদি নির্মাণ করান, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলির বড়-কিছুই আজ আর অবশিষ্ট নাই। এই প্রতিভাশালী নৃপতি দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতির্বিদ্যা, স্থাপত্য, ভেষজ, ব্যাকরণ, শব্দকোষ ও অনুরূপ অনেক বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

উদয়াদিত্য (আঃ ১০৫৮-১০৮৭ খ্রীঃ) পরমার বংশের ধূল্যবলুন্ঠিত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। যে তিনটি মিত্রশক্তি (চালুক্য, চৌলুক্য এবং কলচুরি বংশ) ভোজরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় সম্ভবতঃ উদয়াদিত্যের সুবিধা হয়। এই বংশের পরবর্তী কয়েকজন নৃপতি পরমার বংশের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উজ্জয়িনীসহ পরমার-রাজ্যের বৃহদংশ গুজরাটের সিদ্ধরাজ জয়সিংহ কর্তৃক অধিকৃত হয়। আভ্যন্তরীণ বিরোধ এই সকল সামরিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কুফলকে আরও বিষময় করিয়া তোলে। এই বংশের শেষ ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন অর্জুনবর্মণ (আঃ ১২১১-১২১৫ খ্রীঃ)। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে মুসলমানদের বারংবার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হয়। আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকালে মুসলমানরা পাকাপাকি ভাবে মালব অধিকার করে।

গুজরাটের চৌলুক্য (অথবা শোলাঙ্কি) এবং বাঘেলা বংশঃ প্রায় সার্ধ তিন শতাব্দী কাল (আঃ ৯৫০-১৩০০ খ্রীস্টাব্দ) চৌলুক্য অথবা শোলাঙ্কি বংশ গুজরাটে ও কাথিয়াবাড়ে রাজত্ব করিয়াছিল। কোন কোন লেখক চৌলুক্য এবং চালুক্যগণের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, অন্যেরা অবশ্য এই সম্বন্ধকে সন্দেহজনক বলিয়া মনে করেন। চারণ-গীতিতে দেখা যায় চৌলুক্যরা হইতেছে বিখ্যাত অগ্নিকুল গোষ্ঠীরই অন্যতম,

কিন্তু এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মূলরাজ হয়ত চাপোৎকট রাজবংশের কোন রাজকুমারীর সন্তান। এই চাপোৎকট বংশ অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে গুজরাটে রাজত্ব করিত।

দশম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে গুর্জর-প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট বংশের ক্ষমতা হ্রাস পাইবার ফলে যে রাজনৈতিক সুযোগ দেখা দেয় বহু উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজা তাহার সদ্ব্যবহার করেন। ১ম মূলরাজ (আঃ ৯৬১-৯৯৬ খ্রীঃ) সরস্বতী উপত্যকায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করেন এবং চাপোৎকট বংশের শেষ নৃপতির নিকট হইতে অনহিলবাড়া (বা অনহিল-পাটক) শহরটি দখল করেন। এই বংশের পরবর্তী শক্তিশালী নৃপতির নাম ১ম ভীম (আঃ ১০২২-১০৬৪ খ্রীঃ)। তিনি সিন্ধুর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই ব্যাপারে তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষদের নীতিই অনুসরণ করেন। কলচুরিগণের এবং কল্যাণীর চালুক্য রাজগণের মিত্র হিসাবে তিনি বিখ্যাত পরমার রাজা ভোজকে পরাজিত করেন। ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, তিনি কলচুরি বংশীয় রাজা লক্ষ্মী-কর্ণকে পরাজিত করেন।

সুলতান মামুদ ভীমের রাজত্বকালে সোমনাথ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্যাবধি প্রাপ্ত শিলালিপিসমূহে অথবা জৈন ধর্মাবলম্বী ঘটনাপঞ্জী লেখকগণের লেখায় ইহার কোন উল্লেখ নাই। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির ইতিহাসের জন্য আমাদের একান্তভাবে মুসলমানগণের রচনার উপর নির্ভর করিতেই হইবে। মামুদ যখন অনহিলবাড়ায় আসিলেন তখন ১ম ভীম হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া সম্ভবতঃ নগর ত্যাগ করিলেন। ঐ শক্তিশালী অভিযানকারী যখন সমুদ্রতীরে অবস্থিত সোমনাথের মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন তখন স্থানীয় সেনাধ্যক্ষও সম্ভবতঃ সমুদ্রবক্ষে এক জাহাজে যাইয়া আত্মগোপন করিলেন। মন্দিরের পূজারীরা অবশ্য হতাশামিশ্রিত সাহসিকতার সহিত আক্রমণকারীকে বাধা দিতে লাগিলেন। সমসাময়িক একজন মুসলমান ঘটনাপঞ্জী লেখক বলেন, "পঞ্চাশ হাজার কাফেরকে মন্দিরের কাছাকাছি নিহত করা হয়। যাহারা মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায় তাহারা জাহাজে করিয়া পলায়ন করে।" বিজয়ী মামুদ মন্দির লুণ্ঠন করেন। একজন আধুনিক লেখকের মতে তিনি মন্দিরে ১,০৫,০০,০০০ পাউণ্ড স্টার্লিং মূল্যের ধনরত্ন পান। একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, পুরোহিতেরা নাকি মন্দিরের বিগ্রহ বিনষ্ট না করিবার বিনিময়ে

মামুদকে বহু স্বর্ণ দিতে সম্মত হয়, কিন্তু মামুদ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার হস্তস্থিত এক দণ্ডাঘাতে 'সোমনাথের ফাঁপা উদর বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন' এবং উহাতে বহুমূল্য ধনরত্নাদি পান। মামুদের মৃত্যুর প্রায় ছয় শতাব্দী পরে এই কাহিনী প্রচলিত হয়, সেইজন্যই ইহা বাতিল করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

মামুদ অনহিলবাড়ার পথে ফিরেন নাই। তিনি মনস্থরা হইয়া একটি জনবিরল পথে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি পথে সম্ভবতঃ ১ম ভীম কর্তৃক প্রেরিত একটি সৈন্যবাহিনীর দ্বারা উত্ত্যক্ত হইতে থাকেন। মামুদ কোন শহর দখল করিতে অথবা গুজরাটের কোন অংশ অধীনে আনিতে চেষ্টা করেন নাই।

ভীমের উত্তরাধিকারী ১ম কর্ণের (আঃ ১০৬৪-১০৯৪ খ্রীঃ) শাসনকাল শান্তিপূর্ণ ছিল। তাঁহার পুত্র জয়সিংহ সিদ্ধরাজ (আঃ ১০৯৪-১১৪৪ খ্রীঃ) তদানীন্তন কালের একজন শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। শিলালিপি হইতে জানা যায় তাঁহার রাজ্য গুজরাট, কাথিয়াবাড় এবং কচ্ছ ছাড়াও মধ্য ভারত ও রাজপুতানার বিস্তীর্ণ এলাকায় বিস্তৃত ছিল। তিনি মালবের পরমার বংশীয় রাজা যশোবর্মণকে পরাজিত করেন এবং উজ্জয়িনীসহ পরমার-রাজ্যের কিয়দংশ দখল করেন। তিনি চন্দেল্ল রাজাদের ও সিন্ধুর মুসলমানদের এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় রাজার সহিতও সংগ্রাম করেন। ভোজ পরমারের ন্যায় তিনিও বহু অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পাটনে অবস্থিত বৃহৎ কৃত্রিম হ্রদ সহস্রলিঙ্গ তিনিই তৈয়ারী করাইয়াছিলেন বলিয়া বলা হয়। বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষা দানের জন্য তিনি অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বহু বিদ্বানকে নানাভাবে অনুগৃহীত করেন।

কুমারপাল (আঃ ১১৪৪-১১৭৩ খ্রীঃ) খুব কর্মক্ষম নৃপতি ছিলেন। তিনি শাকম্ভরীর চাহমান বংশীয় রাজা অর্ণোরাজকে পরাজিত করেন। মালব এবং আবুর পরমার বংশীয় নৃপতিগণ, কোঙ্কনের রাজা এবং সৌরাষ্ট্রের শাসক প্রভৃতি নৃপতিগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুমারপাল জৈন ছিলেন। তিনি স্বীয় রাজ্যে পশুহত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন এবং বারাণসীতেও যাহাতে পশুক্লেশ দমিত হয় সেজন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় অজয়পালের রাজত্বকালে (আঃ ১১৭৩-১১৭৬ খ্রীঃ)। ইনি বহু জৈন মন্দির ধ্বংস করেন।

২য় ভীমের রাজত্বকালে (আঃ ১১৭৮-১২৪১ খ্রীঃ) মহম্মদ ঘূরী গুজরাট আক্রমণ করেন (১১৭৮ খ্রীঃ)। 'ভীম' বয়সে কম হইলেও তাঁহার 'বিরাট বাহিনী

ছিল এবং হস্তী ছিল অনেক। যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল'। মহম্মদ ঘূরী গজনী প্রত্যাবর্তনের পর বিশ বৎসর আর গুজরাট আক্রমণের ভয় দেখান নাই। ১১৯৫ খ্রীঃ অব্দে কুতবউদ্দীন আইবক অনহিলবাড়া লুণ্ঠন করেন। দুই বৎসর পরে তিনি আজমীর ও নাড়োলের পথে অপর একটি অভিযান প্রেরণ করিয়া কিছুকালের জন্য অনহিলবাড়া অধিকার করেন। ইহা সম্ভব যে ২য় ভীমকে মালবের পরমার রাজাদের, শাকম্ভরীর চাহমান রাজাদের এবং দেবগিরির যাদবদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হয়।

এই সব যুদ্ধের ফলে সম্ভবতঃ রাজকীয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে অধীন রাজারা ও মন্ত্রীরা স্বাধীন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ পান। ভীমের রাজত্বের শেষের দিকে চালুক্য বংশের বাঘেলা শাখার প্রধান লবণপ্রসাদ সবরমতী ও নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে অবস্থিত ঢোল্‌কার আশেপাশে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে লবণপ্রসাদের পুত্র বীরধবল স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বিশালদেবের রাজত্বকালে (আঃ ১২৪৪-১২৬২ খ্রীঃ) বাঘেলাদের জোর করিয়া রাজ্য স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হয়। বিশালদেব অনহিলবাড়া দখল করেন এবং চালুক্যদের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গুজরাটের শেষ স্বাধীন নরপতি ২য় কর্ণ ১২৯৬ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহারই রাজত্বকালে গুজরাট আলাউদ্দীন খলজীর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

মেবারের গুহিলোট বংশঃ রাণা সংগ্রাম সিংহ, রাণা প্রতাপ সিংহ এবং রাণা রাজসিংহের কীর্তিকলাপের কথা ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রগণ মোটামুটি জানে, কিন্তু গুহিলোট বংশের প্রাচীন রাজাদের সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য অতি অল্পই জানা যায়। চারণ-কবিদের গাথায় পাওয়া যায় যে, গুহিলোটরা রামায়ণে বর্ণিত রামের অধস্তন পুরুষ, কিন্তু শিলালিপির প্রমাণ হইতে মনে হয় তাঁহারা হূণ-গুর্জর বংশোদ্ভব। এই বংশের সর্বপ্রাচীন যে সকল শিলালিপি পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায়, গুহিলোটদের আদিপুরুষেরা ছিলেন গুজরাটের আনন্দপুরে বসবাসকারী বিদেশী ব্রাহ্মণ।

কিংবদন্তী অনুসারে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন বাপ্পা। কিন্তু বাপ্পা বাস্তবিক কাহারও ব্যক্তিগত নাম কি না তাহা বলা কঠিন। এই পরিবারের বংশসূচী-সমন্বিত যে প্রাচীনতম শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বাপ্পার নামোল্লেখ নাই। তালিকার সর্বপ্রথম নাম হইতেছে গুহদত্ত। এই গুহদত্ত

হইতেই গুহিলোট শব্দটি আসিয়াছে। এই বংশের প্রথম দিককার রাজাদের সম্ভবতঃ সবরমতীর উজান উপত্যকায় ক্ষুদ্র একটি রাজ্য ছিল। তাঁহাদের কেহ কেহ হয়ত পরমার ও চৌলুক্য রাজাদের অধীন সামন্ত ছিলেন। কখন যে গুহিলোটরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেন তাহা ঐ সময়কার বিশৃঙ্খলাময় ইতিহাস হইতে জানা সম্ভব নয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মেবারের শাসকগণ—বিশেষতঃ জৈত্রসিংহ (আঃ ১২১৩-১২৫৩ খ্রীঃ)—কয়েকটি মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। ইহার চরম পরিণতি হইল রত্নসিংহের রাজত্বকালে। ১৩০৩ খ্রীস্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজী মেবার আক্রমণ করিয়া রাজধানী চিতোর অধিকার করেন।

বঙ্গদেশের সেন বংশ ঃ পাল বংশের পতনের পরে বঙ্গদেশে সেন বংশের অভ্যুথান হয়। শিলালিপি হইতে জানা যায়, সেনরা আদিতে বিখ্যাত ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় জাতীয় ছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক (মহীশূর রাজ্য ও হায়দরাবাদ রাজ্যের কানাড়ী ভাষাভাষী অঞ্চল) হইতে আগমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্তসেন বৃদ্ধ বয়সে বঙ্গদেশে গঙ্গানদীর তীরে বসবাস স্বরু করেন, কিন্তু তিনি যে রাজ্যশাসক ছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র হেমন্তসেন একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র বিজয়সেন (আঃ ১০৯৫-১১৫৮ খ্রীঃ) বর্মণদের নিকট হইতে পূর্ববঙ্গ এবং পালরাজাদের নিকট হইতে উত্তর বঙ্গের একাংশ জয় করেন। তিনি কামরূপও আক্রমণ করিয়া থাকিবেন। কথিত আছে তিনি মিথিলা এবং কলিঙ্গও জয় করেন। একটি শিলালিপি পাঠে জানা যায় "পশ্চিম দিকে রাজ্য জয়ের জন্য তাঁহার নৌবহর গঙ্গা নদী ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিল"। তাঁহার তুইটি রাজধানী ছিল। একটি রাজধানী পশ্চিমবঙ্গের বিজয়পুর এবং অপরটি পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর।

বিজয়সেনের পরে তাঁহার পুত্র বল্লালসেন (আঃ ১১৫৮-১১৭৯ খ্রীঃ) রাজা হন। সম্ভবতঃ তিনিই পালরাজাদের চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত করেন এবং উত্তরবঙ্গ জয় সম্পূর্ণ করেন। মগধের বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কে যে কাহিনী চলিয়া আসিতেছে তাহা শিলালিপি দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই। তিনি একজন বিদ্বান ও খ্যাতনামা লেখক ছিলেন। 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' তাঁহার রচিত তুইখানি স্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শোনা যায় তিনি বহু সামাজিক সংস্কার সাধন করেন যাহার

ফল ছিল সুদূরপ্রসারী; তিনিই না কি গোঁড়া হিন্দুমতে যাগযজ্ঞের পুনঃপ্রচলন করেন—সম্ভবতঃ ইহা ছিল পাল যুগের বৌদ্ধ ধর্মেরই প্রতিক্রিয়া। তিনি সম্ভবতঃ আধুনিক পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সমগ্র অংশ এবং উত্তর বিহারের কিছু অংশও শাসন করিতেন।

বল্লালসেনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী লক্ষ্মণসেনই (আঃ ১১৭৯-১২০৫ খ্রীঃ) সেন বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। শিলালিপির প্রমাণ হইতে জানা যায় তিনি গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ ও কাশীর নৃপতিদের পরাস্ত করেন। তিনি নাকি পুরীতে, বারাণসীতে এবং এলাহাবাদে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। শিলালিপি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে গয়া জেলা তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে তিনি গাহড়বালদের বিরুদ্ধে কিছু সামরিক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। যদি তিনি সত্য সত্যই বারাণসী ও এলাহাবাদ পর্যন্ত সৈন্য চালনা করিয়া থাকেন তবে তাহার উদ্দেশ্য রাজ্য জয় ছিল না, তাহা ছিল শুধু দেশ আক্রমণ মাত্র। তাঁহার রাজত্বের শেষের দিকে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের দরুণ শক্তিশালী সেন-রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহার ফলে দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়।

ভাগ্যান্বেষী তুর্কী সৈনিক ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বক্তিয়ার খল্‌জীর আক্রমণের ফলে সেন-রাজ্য খণ্ডীকরণের পর্ব ত্বরান্বিত হইল। ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন সম্ভবতঃ মহম্মদ ঘূরীর একজন অনুচর রূপে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মগধ দখলের পর তিনি ঝাড়খণ্ডের জনবিরল পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতর দিয়া অশ্বারোহী বাহিনী চালনা করিয়া হঠাৎ 'নদীয়া'য় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণসেন তখন 'নদীয়া'য় বাস করিতেছিলেন। এই দুঃসাহসিক আক্রমণের জন্য বোধহয় বৃদ্ধ সেনরাজা প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি পূর্ববঙ্গে পলায়ন করিলেন। ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন 'নদীয়া' দখল করিলেন। পরে তিনি তাঁহার প্রধান ঘাঁটি লক্ষ্মণাবতীতে স্থানান্তরিত করেন এবং উত্তর বঙ্গের কোন কোন অংশে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। 'নদীয়া' আক্রমণের পরেও অন্ততঃ তিনচার বৎসর লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গ শাসন করেন। তিনি মারা যান ১২০৫ খ্রীস্টাব্দের পরে কোন সময়।

যদিও তুর্কী আক্রমণের সাফল্য লক্ষ্মণসেনের সুনাম ঢাকিয়া দিয়াছে, তবু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জীবনের প্রথম দিকে তিনি সামরিক দিক

হইতেও কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া বঙ্গের সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁহার স্থানের কথা ভুলিলে চলিবে না। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ সকলে শৈব হইলেও তিনি নিজে ছিলেন ভক্তিমান বৈষ্ণব। বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি জয়দেব তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ধোয়ী, সরণ ও গোবর্ধন প্রমুখ বিখ্যাত কবিগণও তাঁহার আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। হলায়ুধ নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁহার প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান বিচারক ছিলেন। লেখক হিসাবেও লক্ষ্মণসেনের সুনাম কম ছিল না। তাঁহার পিতা 'অদ্ভুতসাগর' নামক যে গ্রন্থটি রচনা আরম্ভ করেন তিনি তাহা সমাপ্ত করেন। তাঁহার নামে চলিত কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক বিবিধ সংকলন গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন পর পর রাজপদ লাভ করেন। তাঁহাদের ক্ষমতা সম্ভবতঃ পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহাদের সহিত মুসলমানদের সংঘর্ষের উল্লেখ শিলালিপিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। আমরা 'তবকৎ-ই-নাসিরি' নামক গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ বঙ্গদেশে অন্ততঃ ১২৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, সম্ভবতঃ ১২৬০ খ্রীঃ পর্যন্তই রাজত্ব করিয়াছিলেন।

"সেন বংশের কলঙ্কময় পরিণতি সত্ত্বেও, সেন রাজাদের সংক্ষিপ্ত শাসনকাল বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। পর পর তিনজন দক্ষ ও ক্ষমতাশালী রাজা সমস্ত প্রদেশকে একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে দেবপালের মৃত্যুর পর এরূপ ঐক্য ও শক্তির প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালায় বোধহয় ইহার পূর্বে আর কখনও হয় নাই। গোঁড়া হিন্দুধর্মকে বিশেষ ভাবে সমর্থন করিয়া সেন রাজারা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বঙ্গে ইহার শীর্ষ আসন অধিকারে সাহায্য করেন। সেন রাজাদের শাসনকালেই বঙ্গদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়।...বঙ্গদেশে হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি যে মুসলমান আক্রমণের হাত হইতে আংশিক ভাবেও আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল তাহার প্রধান কারণ হইতেছে কর্ণাটকের এক শক্তিশালী হিন্দু শাসক বংশ কর্তৃক হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে নূতন প্রেরণা ও জীবন সঞ্চার।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণ ভারতের পরবর্তী রাজবংশসমূহ

কল্যাণীর পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য বংশঃ কল্যাণীর পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যগণ সম্ভবতঃ বাতাপির চালুক্যগণেরই সমগোষ্ঠীভুক্ত ছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা তৈলপ সম্ভবতঃ প্রথমে রাষ্ট্রকূটগণের সামন্ত রাজা ছিলেন। শেষ রাষ্ট্রকূট রাজা চতুর্থ অমোঘবর্ষকে পরাজিত করিয়া তিনি রাষ্ট্রকূট-রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি লাট (দক্ষিণ গুজরাট) জয় করেন, কিন্তু তাঁহার এই বিজয় স্বল্পস্থায়ী হইয়াছিল, কারণ পরে উহা অনহিলবাড়ার মূলরাজ চৌলুক্য কর্তৃক অধিকৃত হয়। তিনি কুন্তল (কানাড়ী ভাষাভাষী অঞ্চল) দখল করেন এবং সম্ভবতঃ কলচুরি ও চোলরাজাদের পরাজিত করেন। মালবের বিখ্যাত পরমার বংশীয় রাজা বাকৃপতি-মুঞ্জ তাঁহাকে কমপক্ষে বারছয়েক পরাজিত করেন বলিয়া প্রবাদ আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তৈলপ কর্তৃক ধৃত ও নিহত হন। দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর তৈলপ ৯৯৭ খ্রীস্টাব্দে অথবা উহারই কাছাকাছি কোন সময়ে মারা যান।

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যগণের রাজ্য চোল রাজা ১ম রাজরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। মালবের বিখ্যাত পরমার নৃপতি ভোজও চালুক্যরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পিতৃব্যের মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ভোজ অতঃপর তাঁহার পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তস্থিত প্রতিবেশী চেদির কলচুরি বংশীয় রাজা এবং অনহিলবাড়ার চৌলুক্য রাজাকে লইয়া একটি সঙ্ঘ গঠন করেন। এই সঙ্ঘ গঠনের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যদের ক্ষমতা খর্ব করা। চালুক্য বংশীয় রাজা ২য় জয়সিংহ জগদেকমল্ল (আঃ ১০১৫-১০৪২ খ্রীঃ) ঐ ত্রিশক্তির সম্মিলিত সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া দেন এবং চালুক্যদের সৌভাগ্য পুনরুদ্ধার করেন।

জয়সিংহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম সোমেশ্বর আহবমল্ল (১০৪২-১০৬৮ খ্রীঃ) একজন বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী ছিলেন। ভোজরাজ তখনও জয়সিংহের হাতে নিদারুণ পরাভবের জের কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, এমন সময় সোমেশ্বর মালব আক্রমণ করিয়া সেখানকার প্রধান প্রধান নগর মাণ্ডু, ধারা

ও উজ্জয়িনী বিধ্বস্ত করেন। ভোজের মর্মান্তিক পরাজয় ও মৃত্যুর পরে জয়সিংহ পরমার রাজাদের সিংহাসন দাবি করিলেন। সোমেশ্বরের নিকট হইতে তিনি যে সাহায্য লাভ করেন, প্রধানতঃ তাহার ফলেই তাঁহার সাফল্যলাভ সম্ভব হইয়াছিল। এই ভাবে চালুক্য ও পরমারগণের ভিতরকার পুরাতন শত্রুতার স্থানে বন্ধুত্বপূর্ণ মিত্রতা স্থাপিত হয়, ইহা নিঃসন্দেহে উচ্চাকাঙ্ক্ষী চালুক্য রাজার শক্তির উৎস হইয়াছিল। অতঃপর তিনি দক্ষিণ দিকে নজর দিলেন। শীঘ্রই তাঁহার সঙ্গে চোল রাজাদের বিরোধ বাধিল। চোলবংশীয় বিখ্যাত রাজা প্রথম রাজাধিরাজ কোপ্পম্ (১০৫২ খ্রীঃ)-এর যুদ্ধে নিহত হন। চালুক্য সৈন্যরা চোল রাজাদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি কাঞ্চী পর্যন্ত বিধ্বস্ত করে। সোমেশ্বর আবার উত্তর দিকে মনোনিবেশ করেন। কনৌজের রাজা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। কলচুরি বংশীয় বিখ্যাত রাজা লক্ষ্মী-কর্ণ তাঁহার নিকট পরাজিত হন। মিথিলা, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ এবং গৌড় লুণ্ঠিত হয়। বিজয়ী চালুক্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি দুর্বল পাল রাজাদের ছিল না। কিন্তু কামরূপের রাজা রত্নপাল তাঁহার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দাঁড়ান এবং স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন। সোমেশ্বর কল্যাণে[১] একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন (কল্যাণ বোম্বাই রাজ্যে অবস্থিত)। জীবনের শেষের দিকে তিনি বীর রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক কুড়লসঙ্গমম্-এর যুদ্ধে পরাজিত হন। আনুষ্ঠানিক ভাবে তিনি তুঙ্গভদ্রা নদীর জলে ডুবিয়া আত্মবিসর্জন দেন।[২]

প্রথম সোমেশ্বরের পরে রাজা হন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় সোমেশ্বর (১০৬৮-১০৭৬ খ্রীঃ)। তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা ছিলেন। অল্পদিন রাজত্ব করার পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য[৩] ত্রিভুবনমল্ল (১০৭৬-১১২৭ খ্রীঃ) তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজা হন। বিক্রমাদিত্য (বা বিক্রমাঙ্ক) কবি বিহ্লণ রচিত 'বিক্রমাঙ্ক-চরিতে'র নায়ক। পুস্তকখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত অল্প কয়েকখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থের অন্যতম। পশ্চিমাঞ্চলীয়

---

১ ৯৯৩ খ্রীস্টাব্দে তৈলপের রাজধানী মান্যখেতে অবস্থিত ছিল।

২ এই ব্যবস্থাকে 'জলসমাধি' বলা হয়।

৩ বাতাপির প্রাচীন চালুক্য বংশের রাজাদের হিসাব ধরিতে হইলে ইঁহাকে ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বলিতে হইবে।

চালুক্য নৃপতিগণের মধ্যে নিঃসন্দেহে তিনি শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। প্রথম সোমেশ্বরের রাজত্বকালে যে সব সামরিক জয়লাভ হয় তাহা তাঁহার নেতৃত্ব ও উদ্যোগের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। তিনি যে বৎসর (১০৭৬ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন তাহা হইল তৎপ্রবর্তিত চালুক্য অব্দের প্রথম বৎসর। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি সাফল্যের সহিত অনহিলবাড়ার চৌলুক্য রাজাদের, চোল রাজাদের এবং হোয়সলবংশীয় রাজা বিষ্ণুবর্ধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। শান্তির ক্ষেত্রে বিজয়ের জন্যও তাঁহার অর্ধশতাব্দী স্থায়ী রাজত্বকাল কম উল্লেখযোগ্য নয়। তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বিহ্লণ নামে একজন কাশ্মীরী কবি ও 'মিতাক্ষরা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। 'মিতাক্ষরা' গ্রন্থটি হিন্দু আইন সম্পর্কে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় সোমেশ্বর রাজা হন (১১২৭-১১৩৮ খ্রীঃ)। তিনি পিতার মতই বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং নিজেও একজন গ্রন্থকার ছিলেন। কথিত আছে অন্ধ্র, দ্রাবিড়, মগধ ও নেপালের নৃপতিগণ তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহা চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী প্রশস্তি মাত্র। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জগদেকমল্ল (আঃ ১১৩৮-১১৫১ খ্রীঃ) মালবের একাংশ দখল করেন। তিনি অনহিলবাড়ার কুমারপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং হোয়সলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন।

দ্বিতীয় জগদেকমল্লের মৃত্যুর পর পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যদের ক্ষমতা রাহুগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ১১৫৭ খ্রীঃ অব্দে কল্যাণের সিংহাসন কলচুরিগণের যুদ্ধমন্ত্রী বিজ্জল বা বিজ্জন কর্তৃক অপহৃত হয়। তাঁহার শাসনকাল দক্ষিণ ভারতের ধর্মসম্বন্ধীয় ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে। তাঁহার সচিব বাসব ছিলেন 'বীর শৈব' বা 'লিঙ্গায়ত' নামক ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্প্রদায়ের বহু অনুগামী এখনও মহীশূরে এবং কানাড়ী ভাষাভাষী অঞ্চলে দেখা যায়। এই সম্প্রদায় ভক্তির উপর বিশেষ জোর দিত এবং শিবের ('লিঙ্গ' আকারে) এবং তাঁহার বাহন নন্দীর পূজা করিত। লিঙ্গায়ত সম্প্রদায় বেদের কর্তৃত্ব মানিত না। তাহারা ব্রাহ্মণ্যধর্মবিরোধী বহু রীতিনীতি পালন করিত (যেমন, বিধবা বিবাহ, উপবীত পরিত্যাগ করা, ইত্যাদি)।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে চতুর্থ সোমেশ্বর নামক জনৈক চালুক্য বংশীয় রাজা তাঁহার পিতৃপুরুষদের রাজ্যের কিয়দংশ উদ্ধার করেন। দেবগিরির যাদবগণের অভ্যুত্থান এবং হোয়সলগণের সহিত সংগ্রাম পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য বংশের ধ্বংসের কারণ হয়।

পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য রাজগণের বংশতালিকা
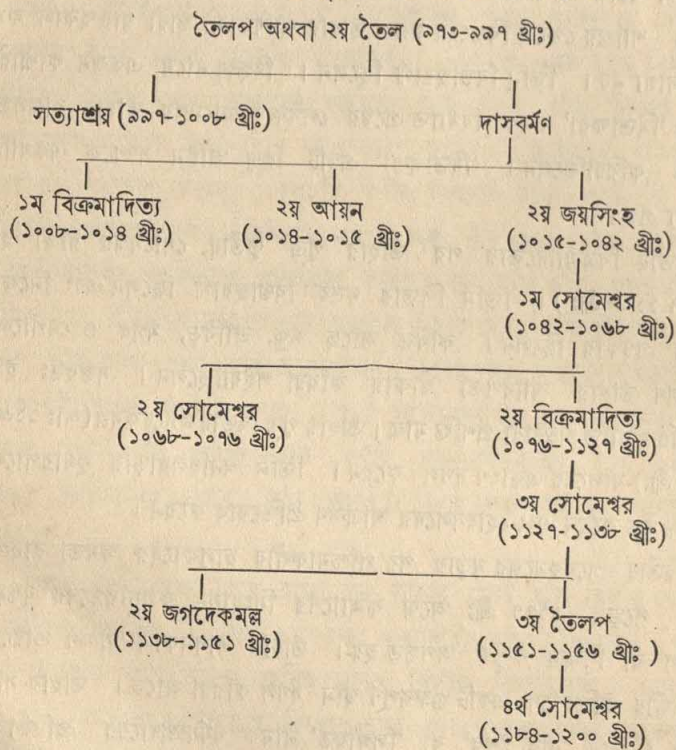
দেবগিরির যাদব বংশঃ যাদবেরা নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের পূর্বপুরুষ যদুর বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন। সাহিত্যে এবং শিলালিপিতে তাঁহাদের বিস্তারিত বংশতালিকা পাওয়া যায়। রাষ্ট্রকূট ও পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যগণের অধীনে সামন্ত নৃপতি হিসাবে তাঁহারা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যদের পতনের পরে তাঁহারা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। প্রথম বিখ্যাত যাদব নৃপতি ৫ম ভিল্লম কৃষ্ণা নদীর উত্তর দিকে অবস্থিত

চালুক্য-রাজ্যের এক বৃহদংশ ৪র্থ সোমেশ্বরের নিকট হইতে কাড়িয়া নেন। তিনি অবশ্য হোয়সল বংশীয় রাজা ১ম বীর বল্লাল কর্তৃক পরাজিত এবং সম্ভবতঃ নিহত হন। ভিল্লমই দেবগিরিতে (বোম্বাই রাজ্যে অবস্থিত আধুনিক দৌলতাবাদ) তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার পর এই শহরটি দক্ষিণ ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয়।

পরবর্তী রাজা ১ম জৈত্রপাল অথবা জয়তুগি (আঃ ১১৯১-১২১০ খ্রীঃ) কাকতীয় সিংহাসনে নিজের মনোনীত ব্যক্তিকে বসান। এই ভাবে তিনি যাদব বংশের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহার পুত্র সিংঘন (আঃ ১২১০-১২৪৭ খ্রীঃ) যাদব বংশের শ্রেষ্ঠতম শাসক ছিলেন। তিনি হোয়সল বংশীয় রাজা ২য় বীর বল্লালকে পরাজিত করেন এবং কৃষ্ণা নদী ছাড়াইয়া স্বীয় রাজ্যের সীমানা বিস্তার করেন। বাঘেলা রাজাদের সময় তিনি একাধিকবার গুজরাট আক্রমণ করেন। তিনি কোহ্লাপুরের শিলহর রাজ্যটি জয় করেন। তিনি মালব ও ছত্রিশগড়ের (মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত) রাজাদের সঙ্গে এবং গোয়ার কদম্বগণের ও পাণ্ড্যগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। তিনি কাবেরী নদীর তীরে একটি বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতের এক বৃহদংশ যাদবগণের ক্ষমতাধীন হয়। প্রাচীন ভারতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ নৃপতিগণের মত সিংঘনও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। শার্ঙ্গধর তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করেন ; তিনি সঙ্গীতের উপর একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ চঙ্গদেবও তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

সিংঘন সাহিত্যক্ষেত্রে যে ধারার প্রবর্তন করেন তাহা তাঁহার উত্তরাধিকারীদের সময়ও প্রচলিত থাকে। যাদব বংশীয় রাজাদের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন এমন কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি সেই সময় কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ ও ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। সেই সময় হেমাদ্রি নামে জনৈক খ্যাতনামা লেখক 'ধর্মশাস্ত্রের' উপর গ্রন্থ রচনা করেন এবং জ্ঞানেশ্বর নামে জনৈক মারাঠী সন্ত মারাঠী ভাষায় 'গীতার' ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহারা যাদব বংশের শেষ শ্রেষ্ঠ নৃপতি রামচন্দ্রের (আঃ ১২৭১-১৩০৯ খ্রীঃ) আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময়ে আলাউদ্দীন খলজী দেবগিরি আক্রমণ করেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই যাদব বংশের কলঙ্কময় সমাপ্তি ঘটে।

দ্বারসমুদ্রের হোয়সলগণঃ যাদবদের মত হোয়সলগণও[১] নিজেদের যদুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহারা প্রথমে চোল অথবা পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য রাজাদের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। মহীশূরে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁহারা শাসন করিতেন। এই বংশের প্রথম বিখ্যাত রাজা হইতেছেন বিষ্ণুবর্ধন (আঃ ১১১০-১১৪০ খ্রীঃ)। তিনিই রাজধানী বেলুপুর (আধুনিক বেলুড়, মহীশূরের হাসান জেলায় অবস্থিত) হইতে দ্বারসমুদ্রে (আধুনিক হলেবীদ) স্থানান্তরিত করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি সমগ্র মহীশূর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল স্বীয় শাসনাধীনে আনেন। তিনি চোল ও পাণ্ড্যরাজাদের, মালাবার ও দক্ষিণ কানাড়াবাসীদের এবং গোয়ার কদম্বদের পরাজিত করেন। তিনি কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। এই সব জয়-কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ণয় করা সম্ভব না হইলেও, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিষ্ণুবর্ধন একজন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার অভিযানাত্মক নীতি অবশ্য পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যবংশীয় রাজা ২য় বিক্রমাদিত্য কর্তৃক সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি রামানুজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।

বিষ্ণুবর্ধনের পৌত্র ১ম বীর বল্লাল (আঃ ১১৭২-১২১৫ খ্রীঃ) খোলাখুলি রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য রাজাদের প্রভুত্ব অস্বীকার করেন। তিনি চতুর্থ সোমেশ্বরের জনৈক সেনাপতিকে পরাজিত করেন। যাদব বংশীয় রাজা ৫ম ভিল্লমও তাঁহার নিকট পরাজিত হন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী ২য় বীর বল্লাল সিংঘন কর্তৃক পরাজিত হন। সিংঘন কৃষ্ণা নদী ছাড়াইয়া যাদবদের ক্ষমতার প্রসার করেন।

চোল এবং পাণ্ড্যদের সহিত অবিরত সংগ্রামের ফলে পরবর্তী হোয়সল রাজারা দুর্বল হইয়া পড়েন। এই বংশের সর্বশেষ রাজা ৩য় বীর বল্লাল মুসলমান আক্রমণের ফলে রাজ্য হারান। হোয়সলদের বিখ্যাত মন্দির নির্মাতা হিসাবে এখনও স্মরণ করা হয়। ঐ সব মন্দিরের মধ্যে কয়েকটির ধ্বংসাবশেষ এখনও হলেবীদে দেখিতে পাওয়া যায়।

---

১ কথিত আছে যে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সল একজন সন্তের আদেশে একটি ব্যাঘ্রকে লৌহদণ্ড দ্বারা হত্যা করেন। ইহা হইতেই ('পোয় সল' অর্থাৎ আঘাত কর, সল) এই বংশের নাম হয় পোয়সল বা হোয়সল।

বরঙ্গলের কাকতীয় বংশ : কাকতীয়গণ নিজেদের রামায়ণে উল্লিখিত সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দের বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন, কিন্তু শিলালিপি হইতে জানা যায় তাঁহারা শূদ্র ছিলেন। যাদব ও হোয়সলদের মত তাঁহারাও আদিতে পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যদের সামন্ত রাজা ছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যদের পতনের পর কাকতীয়রা স্বাধীন হইলেন এবং আনুমানিক ১৪২৫ খ্রীঃ অব্দে বাহমনী সুলতান আহম্মদ শাহ কর্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত তেলেঙ্গানায় (অন্ধ্রপ্রদেশে) রাজত্ব করেন।

কাকতীয় বংশের প্রথম শক্তিশালী রাজার নাম হইতেছে প্রোলরাজ (আঃ ১১১৭ খ্রীঃ)। তিনি পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। কাকতীয় বংশের রাজাদের মধ্যে গণপতি (আঃ ১১৯৯-১২৬১ খ্রীঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি যেমন চোলরাজাদের পরাজিত করিয়াছিলেন তেমনি কলিঙ্গ, দেবগিরি, কর্ণাটক ও লাটের (দক্ষিণ গুজরাট) নরপতিগণকেও পরাজিত করেন বলিয়া বলা হয়। তাঁহার সমসাময়িক চোল রাজাদের দুর্বলতা তাঁহাকে রাজ্য জয়ের এক অভাবনীয় সুযোগ আনিয়া দেয়। তাঁহার পর তাঁহার কন্যা রুদ্রাম্বা রাণী হন। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর সাফল্যের সহিত রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রতাপরুদ্র আলাউদ্দীন খলজীর বশ্যতা স্বীকার করেন। গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের রাজত্বকালে কাকতীয় রাজ্য মুসলমানগণ দখল করিয়া নেয়। কাকতীয়রা তাঁহাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব হারাইয়া ফেলেন, কিন্তু বাহমনী সুলতানেরা তাঁহাদের রাজনৈতিক সত্তার অবসান না ঘটানো পর্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের রাজ্যের কোন কোন অংশে রাজত্ব করিতে থাকেন।

চোলদের প্রাচীন রাজনৈতিক ইতিহাস : পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে চোল রাজাদের প্রাচীন ইতিহাস সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। নবম শতাব্দীতে[১] পল্লব শক্তির পতনের ফলে চোল রাজাদের নিকট যে চমৎকার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তাঁহারা উহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। বিজয়ালয় (আঃ ৮৪৬-৮৭১ খ্রীঃ) এই বংশের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তিনি সম্ভবতঃ উরায়ুর (Uraiyur)-এর আশেপাশে পল্লবদের অধীনে রাজত্ব করিতেন। পরে তিনি পাণ্ড্যদের অধীন কোন মিত্রের হাত হইতে

১ চোলরা পল্লব রাজাদের অধিকৃত কাঞ্চী দখল করেন এবং পরে উহা চোল সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়।

তাঞ্জোর দখল করেন। ইহার পর তাঞ্জোরই চোল-রাজ্যের রাজধানী হয়। তাঁহার পুত্র ১ম আদিত্য (আঃ ৮৭১-৯০৭ খ্রীঃ) একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি পল্লব বংশীয় রাজা অপরাজিতবর্মণকে পরাজিত করেন এবং তোণ্ডমণ্ডলম্ নিজের রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন। কথিত আছে তিনি পশ্চিমাঞ্চলীয় গঙ্গদের রাজধানী তালকড়ও দখল করেন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে চোল-রাজ্য উত্তরে আধুনিক মাদ্রাজ হইতে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১ম পরন্তকের রাজত্বকালে (৯০৭-৯৫৩ খ্রীঃ) পাণ্ড্যদের রাজ্য দখল করিয়া লওয়া হয় এবং পাণ্ড্য বংশীয় রাজা রাজসিংহ সিংহলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিজয়ী চোল নৃপতি সিংহল আক্রমণ করেন, কিন্তু এই অভিযান বিফলে যায়। অতঃপর তিনি পল্লবশক্তির অবশিষ্টাংশ নিশ্চিহ্ন করেন এবং তাঁহার রাজ্যসীমানা উত্তরে নেলোর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। চোল শক্তির এত দ্রুত বিস্তারে রাষ্ট্রকূটগণ বিশেষ শঙ্কা অনুভব করেন। ৩য় কৃষ্ণ গঙ্গবংশীয় রাজার সহায়তায় চোলদের পরাস্ত করেন। তাঁহারা ৯৪৯ খ্রীঃ অব্দে তক্কোলমের (উত্তর আর্কট জেলা) যুদ্ধে পরন্তকের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজাদিত্যকে নিহত করেন এবং তাঞ্জোর ও কাঞ্চী দখল করেন। এই নিদারুণ আঘাতে চোল রাজারা সাময়িক ভাবে পর্যুদস্ত হন। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আর তাঁহারা লুপ্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই।

চোল রাজাদের শ্রেষ্ঠত্বের যুগঃ ১ম রাজরাজই (আঃ ৯৮৫-১০১৬ খ্রীঃ) পুনর্বার চোল বংশের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তিনি এই বংশকে দক্ষিণ ভারতের অধিপতি করিয়া তোলেন। তিনি চের রাজাদের নৌশক্তি ধ্বংস করেন এবং চের-রাজ্য স্বীয় শাসনাধীনে আনেন। মাদুরা অধিকৃত হয় এবং পাণ্ড্যবংশীয় রাজা বন্দী হন। সিংহলে অভিযান চালাইয়া ঐ দ্বীপের উত্তরাংশ দখল করা হয়। ফলে উহা চোল-শাসিত প্রদেশে পরিণত হইয়া যায়। মহীশূরের এক বৃহদংশও জয় করা হয়। রাজ-রাজের এই বিজয়ের ফলে পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য বংশের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ সৃষ্টি হয়। চোল রাজা চালুক্যদের রাজ্য লুণ্ঠন করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যাশ্রয় তাঁহাকে প্রতিরোধ করেন। রাজরাজ অতঃপর বেঙ্গীর পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্যদের রাজ্য আক্রমণ করেন। বেঙ্গীর বিমলাদিত্য (১০১১-১০১৮ খ্রীঃ) তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি বিজেতার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। রাজরাজ কলিঙ্গও

জয় করেন এবং 'সমুদ্রের ১২,০০০ শত পুরানো দ্বীপ' দখল করেন। এই দ্বীপগুলিকে সাধারণতঃ লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। সমগ্র আধুনিক মাদ্রাজ রাজ্য ও অন্ধ্রপ্রদেশ, মহীশূরের কিয়দংশ (কুর্গ সহ), সিংহলের উত্তরাংশ এবং সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ—এই বিরাট ভূখণ্ড নিয়াই ছিল তাঁহার সাম্রাজ্য। তাঁহার একটি শক্তিশালী নৌবহর ছিল। উহার সাহায্যে তিনি চোলদের সামুদ্রিক সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

১ম রাজেন্দ্র চোল : রাজরাজের উপযুক্ত পুত্র ও উত্তরাধিকারী ১ম রাজেন্দ্র চোল (আঃ ১০১৬-১০৪৪ খ্রীঃ) চোল-শক্তিকে ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে স্থাপন করেন। দিগ্বিজয়ী হিসাবে তিনি তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় দেন পিতার রাজত্বের শেষের দিকে। সেই সময় তুঙ্গভদ্রা অতিক্রম করিয়া তিনি সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালান। সিংহাসনে আরোহণ করিবার কিছুদিন পরে তিনি সমগ্র সিংহল দখল করেন। তিনি পাণ্ড্য ও কেরল ভূখণ্ড শাসনের দায়িত্ব দিলেন তাঁহার পুত্রের উপর। ইহার ফলে ঐ সব অঞ্চল সরাসরি তাঁহার অধীন হইল। পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য নৃপতি ২য় জয়সিংহের সহিত তাঁহার যুদ্ধের ফল কি হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা সম্ভব নয়, তবে তুঙ্গভদ্রার উত্তর দিকস্থ ভূখণ্ড ২য় জয়সিংহের দখলেই রহিয়া গিয়াছিল।

রাজেন্দ্র চোলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিন্তু দক্ষিণ ভারতেই আবদ্ধ ছিল না। রাষ্ট্রকূট রাজাদের মত তিনি উত্তরেও বাহু বিস্তার করিলেন। সেই অঞ্চলে তাঁহার জয় তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিল। তাঁহার বাহিনী গঙ্গা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইল এবং বঙ্গ ও বিহারের পাল বংশীয় রাজা মহীপালের রাজ্য বিধ্বস্ত করিল। এই অভিযান সম্ভবতঃ ১০২১ ও ১০২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন সময় হইয়াছিল। চোলদের একটি শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, রাজেন্দ্র উড়িষ্যা, দক্ষিণ কোশল (আধুনিক মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত), উড়িষ্যার একাংশ (বালেশ্বর), পশ্চিমবঙ্গ (মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্ধমান) ও পূর্ববঙ্গকে অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী ঐ সব অঞ্চল আক্রমণ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, তিনি ঐ সব অঞ্চল স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। তাঁহার এই বিরাট অভিযানের একটি মাত্র ফল পাওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতেছে বঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে কিছু কর্ণাটকবাসী গোষ্ঠীপতির বসবাস স্থাপন এবং সম্ভবতঃ উত্তর হইতে দক্ষিণ

অঞ্চলে কয়েকজন শৈবকে আনয়ন। গাঙ্গেয় বদ্বীপে জয়ের স্মরণার্থ রাজেন্দ্র 'গঙ্গই কোণ্ড' (বা গঙ্গা বিজয়ী) উপাধি ধারণ করেন। তিনি গঙ্গইকোণ্ড-চোলপুরম্ (আধুনিক গঙ্গাকুণ্ডপুরম্) নাম দিয়া একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। নগরের সম্মুখে তিনি একটি বিরাট জলাশয় খনন করেন, কোলেরুণ ও ভেল্লর নদী হইতে খাল কাটিয়া সেই জলাশয় জলপূর্ণ করা হয়। সেই নগরী আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে এবং সেই সুবৃহৎ জলাশয়ের বুকে জন্মিয়াছে গভীর বন।

পিতার মত রাজেন্দ্রেরও একটি শক্তিশালী নৌবহর ছিল। এই নৌবহর বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া পেগু এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করে। পূর্ব দিকে চোল রাজাদের নৌবহরের এই যে আনাগোনা ইহার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ ছিল দক্ষিণ ভারত এবং ব্রহ্মদেশ ও মালয় উপদ্বীপের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন। পশ্চিমদিকে রাজেন্দ্র তাঁহার পিতাকর্তৃক অধিকৃত 'সমুদ্রের পুরানো দ্বীপপুঞ্জ'ও দখলে রাখেন।

চোল-চালুক্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা: রাজেন্দ্র চোলের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ১ম রাজাধিরাজ (আঃ ১০৪৪-১০৫২ খ্রীঃ) একজন কৃতী শাসক ছিলেন। পাণ্ড্য, কেরল ও সিংহলে যে সকল বিদ্রোহ দেখা দেয় তিনি তাহা দমন করেন। অতঃপর তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া বিজয়গৌরব উৎসব সম্পন্ন করেন। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য নৃপতি ১ম সোমেশ্বর আহবমল্লের সহিত তাঁহার যুদ্ধের ফল নিদারুণ হইয়াছিল। কোপ্পমের যুদ্ধে (১০৫২ খ্রীঃ) তিনি প্রাণ হারান। তাঁহার ভ্রাতা ২য় রাজেন্দ্র (আঃ ১০৫২-১০৬৪ খ্রীঃ) যুদ্ধক্ষেত্রেই রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি সোমেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যান। চোল শিলালিপি তাঁহার বিজয় দাবি করে; কিন্তু বিহ্লণ বলেন যে, তাঁহার পৃষ্ঠপোষক কাঞ্চী বিধ্বস্ত করেন। বীর রাজেন্দ্রের (আঃ ১০৬৪-১০৭০ খ্রীঃ) সময় একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়। কথিত আছে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কুদলসঙ্গমের (জেলা কুর্নূল) যুদ্ধে বীর রাজেন্দ্র সোমেশ্বরকে ভীষণ ভাবে পরাজিত করেন। তিনি সোমেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র ২য় বিক্রমাদিত্যকেও পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার অনুগত মিত্র ২য় বিজয়াদিত্যকে বেঙ্গীর সিংহাসনে বসান। তারপর তিনি কেরল ও পাণ্ড্যের বিদ্রোহ দমন করেন। সিংহলের বিজয়বাহু সিংহলকে চোল শাসন হইতে মুক্ত করিতে

চেষ্টা করেন। বীর রাজেন্দ্র তাহা সাফল্যের সহিত প্রতিহত করেন। চোল নৃপতি অতঃপর প্রাচ্যদ্বীপপুঞ্জে এক নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন।

চোল সম্রাটগণের বংশতালিকা
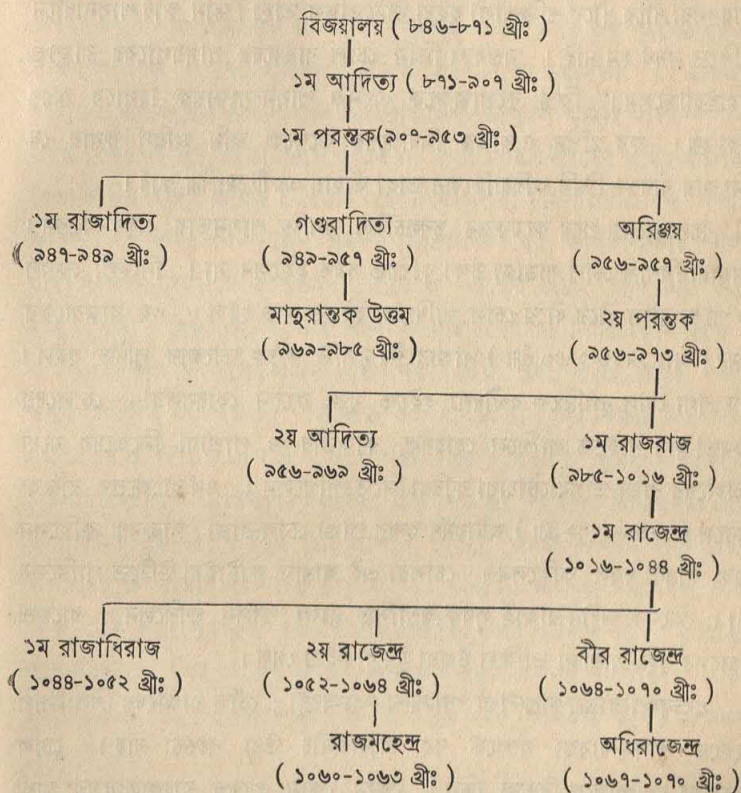
চোল-চালুক্য রাজবংশ : বীর রাজেন্দ্রের মৃত্যুর পর চোল-রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল ; ইহার ফলে তাঁহার পুত্র অধিরাজেন্দ্র মারা যান এবং ১ম কুলোত্তুঙ্গ (আঃ ১০৭০-১১২২ খ্রীঃ) সিংহাসন অপহরণ করিয়া লইলেন। ১ম কুলোত্তুঙ্গের ধমনীতে প্রবাহিত হইত দাক্ষিণাত্যের দুইটি শ্রেষ্ঠ রাজবংশ চোল ও চালুক্যদের শোণিতধারা। তিনিই চোল এবং পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য রাজাদের রাজ্য এক নৃপতির শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন। বেঙ্গী চোল-রাজ্যের

একটি প্রদেশে পরিণত হইল। উহা প্রধানতঃ রাজবংশজ কোন প্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হইত। চোল বংশীয় পূর্বপুরুষদের মত কুলোত্তুঙ্গ পাণ্ড্য ও কেরলে বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি মালবের পরমারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং দুইবার কলিঙ্গ আক্রমণ করেন। কিন্তু যে গঙ্গাবড়ীতে (দক্ষিণে মহীশূর) হোয়সলরা ধীরে ধীরে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল তাহা তিনি স্বীয় শাসনাধীনে রাখিতে সমর্থ হন নাই। সম্ভবতঃ তিনি চোল রাজাদের সাগরপারের রাজ্যও হারাইয়াছিলেন। কিন্তু কুলোত্তুঙ্গকে এখনও শাসন-সংস্কারক হিসাবে স্মরণ করা হয়। কর স্থাপন ও রাজস্ব নির্ধারণের উদ্দেশ্যে জমি জরিপ করার যে চমৎকার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার একটি স্মরণীয় কার্য।

কুলোত্তুঙ্গের পরে কয়েকজন দুর্বলচরিত্র নৃপতি শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা বিশাল চোল সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। সিংহল, কেরল ও পাণ্ড্য-রাজ্য ধীরে ধীরে চোল আধিপত্য হইতে মুক্ত হইল। ৩য় রাজরাজের সময় (আঃ ১২১৬-১২৪৬ খ্রীঃ) পাণ্ড্যবংশীয় নৃপতি কর্তৃক তাঞ্জোর লুণ্ঠিত হইল। হতভাগ্য চোল নৃপতিকে বন্দীদশা হইতে মুক্ত করেন হোয়সলরা। চোলদের ক্ষমতা হ্রাস পাইতে লাগিলে হোয়সল, কাকতীয় ও পাণ্ড্যরা নিজেদের মধ্যে তাঁহাদের রাজ্য ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া নিতে লাগিলেন। ৪র্থ রাজেন্দ্রের রাজত্ব-কালে (১২৪৬-১২৭৯ খ্রীঃ) জটাবর্মণ সুন্দর পাণ্ড্য চোল-রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং কাঞ্চী দখল করিলেন। চোলরা এই আঘাত কাটাইয়া উঠিতে পারিলেন না। অনেক অধীন রাজাই পৃথক স্বশাসিত রাজ্য স্থাপন করিলেন। রাজেন্দ্র চোলের বৃহৎ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল।

চোলরাজগণের শাসন-ব্যবস্থা: চোল রাজাদের শিলালিপি হইতে শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। চোল সাম্রাজ্য বহু প্রদেশে বিভক্ত ছিল। কোন কোন প্রদেশ রাজপুত্রগণের দ্বারা শাসিত হইত। প্রদেশ ছাড়া ছিল অধীন সামন্তদের শাসিত ভূখণ্ড। তাঁহারা কর দিতেন এবং যুদ্ধের সময় সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতেন। প্রদেশগুলি (মণ্ডলম্) বিভিন্ন বিভাগে (কোট্টম্, ভলনাডু) বিভক্ত ছিল। বিভাগ আবার জেলায় (নাডু) বিভক্ত ছিল। কতকগুলি গ্রাম (কুর্‌রম্) লইয়া একটি জেলা হইত। শাসন-ব্যবস্থার নিম্নতম সংস্থা ছিল গ্রাম।

চোলদের শাসন-ব্যবস্থার বোধহয় সর্বপ্রধান বিশেষত্ব ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর

জন-পরিষদ। সমগ্র প্রদেশের জন-পরিষদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। 'নাডু' বা জেলা এবং শহর বা 'নগরমের' জন্যও পৃথক পৃথক পরিষদ ছিল। এই সব পরিষদের গঠনতন্ত্র ও কার্যধারা সম্বন্ধে অবশ্য খুব কম তথ্যই জানা যায়। গ্রামের পরিষদগুলি ছিল বিভিন্ন ধরণের। 'উর্'-এ স্থানীয় জনসাধারণ কোনরূপ আনুষ্ঠানিক নিয়ম অথবা কর্মবিধি ব্যতিরেকেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য সমবেত হইত। ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত গ্রামের পরিষদকে বলিত 'সভা' (বা 'মহাসভা')। রাজকর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে এবং সাধারণ নিয়ন্ত্রণাধীনে 'সভা'গুলি স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের সমস্ত বিভাগেই পূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করিত। 'সভা'ই ছিল গ্রামের জমির মালিক। 'সভা'ই কর আদায় করিত। ছোট ছোট ফৌজদারী মামলার বিচারও 'সভা'ই করিত। প্রাথমিক শিক্ষা ছিল 'সভা'র নিয়ন্ত্রণাধিকারে। ভাগ্যপরীক্ষার (lot) দ্বারা সদস্যগণ নির্বাচিত হইতেন। প্রত্যেক সদস্যের মেয়াদ ছিল এক বৎসর মাত্র। 'সভা' বসিত কোন মন্দিরে অথবা জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট কোন কক্ষে।

চাষের জমি খুব যত্নের সহিত জরিপ করা হইত এবং সমস্ত জমিই যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইত। 'ভারতে এই ব্যবস্থা চালু হয় বিজয়ী উইলিয়মের (ইংলণ্ডরাজ William the Conqueror-এর) বিখ্যাত 'ডুমসডে' রেকর্ডের (Domesday Survey) অন্ততঃ এক শতাব্দী পূর্বে'। সাধারণতঃ মোট উৎপাদনের এক-ষষ্ঠাংশ ছিল রাজপ্রাপ্য। নগদে অথবা শস্যাদি দ্বারা অথবা উভয় ভাবেই রাজার প্রাপ্য দেওয়া যাইত। বিভিন্ন ধরণের কর ছিল, যেমন তাঁত, তৈল কল, পুষ্করিণী, পশু, বাজার প্রভৃতির উপর স্থাপিত কর। ভারতের শাসনবিভাগের স্মিথ-এর মত একজন অভিজ্ঞ ইংরেজ কর্মচারীও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, "এই শাসনপ্রণালী খুবই সুচিন্তিত এবং যুক্তিসঙ্গত রূপেই কার্যকরী ছিল।"

চোল-রাজগণের ধর্মবিশ্বাস: চোল রাজারা শিবভক্ত ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী হিন্দু ছিলেন। রাজরাজের ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিষ্ণুর মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু ১ম কুলোত্তুঙ্গের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ বিখ্যাত বৈষ্ণব সংস্কারক রামানুজকে হোয়সলদের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করে। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম তখন বিলুপ্তির পথে, কিন্তু তবু কোন কোন বৌদ্ধ মঠে চোল রাজাদের দান ছিল ; কিন্তু সাধারণতঃ রাজকীয় দান একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই জন্য বাঁধা ছিল।

চোল রাজগণের শিল্পকলা ঃ "চোল যুগে যে শিল্পকলা ছিল তাহা পল্লব যুগের শিল্পকলারই অনুবৃত্তি।" চোল যুগের স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঞ্জোর এবং গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরমে স্থিত বিরাট মন্দিরসমূহ। কয়েকটি মন্দিরের গাত্রে খোদিত মূর্তি ভাস্কর্যের চমৎকার নিদর্শন। মন্দিরগুলির প্রধান বিশেষত্ব উহাদের 'বিমান' অথবা চূড়া। পরবর্তী কালে চূড়ার পরিবর্তে কারুকার্য-মণ্ডিত 'গোপুরম' অথবা প্রবেশদ্বারই প্রধান বিশেষত্ব হইয়া উঠে। চোল রাজারা ব্যাপক ও কার্যকরী জলসেচের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সুন্দর সুন্দর রাজপথ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

পাণ্ড্য বংশ ঃ পাণ্ড্যরাজগণের প্রাচীন ইতিহাস পূর্বের একটি অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে অথবা সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে পাণ্ড্য বংশের শ্রেষ্ঠত্ব শুরু হয়। পাণ্ড্য-রাজ্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ নৃপতির নাম কাড়ুনগোঁ। তাঁহার কথা বিশেষ কিছুই জানা যায় না। অষ্টম শতাব্দীতে পাণ্ড্যদের রাজ্য, বিশেষ করিয়া চোল ও কেরলদের অধিকারের বিলোপ সাধনের ফলে, চারিদিকে বিস্তার লাভ করে। কথিত আছে এই বংশের শ্রীমার শ্রীবল্লভ (আঃ ৮১৫-৮৬২ খ্রীঃ) সিংহলের রাজাকে পরাজিত করেন। তাহা ছাড়া, চোল, পল্লব এবং গঙ্গদেরও নাকি তিনি পরাজিত করেন। পল্লবরাজ অপরাজিতবর্মণ আনুমানিক ৮৮০ খ্রীঃ অব্দে বীরগুণবর্মণকে ভীষণভাবে পরাজিত করেন। চোল বংশীয় রাজা ১ম পরন্তক ২য় মারবর্মণ রাজসিংহকে পরাজিত করেন এবং তাঁহাকে সিংহলে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন। তিনি পাণ্ড্য-রাজ্য দখল করেন।

পরবর্তী তিন শতাব্দীকাল পাণ্ড্য-রাজ্য চোল রাজাদের অধীন ছিল, যদিও সিংহাসনচ্যুত পাণ্ড্য নৃপতিগণ রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রায়ই চেষ্টা করিতেন। ১ম রাজেন্দ্র চোল পাণ্ড্য-রাজ্যকে চোল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করেন এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশটি শাসন করিবার জন্য স্বীয় পুত্রকে নিয়োগ করেন। ১ম কুলোত্তুঙ্গের পর চোল রাজাদের ক্ষমতা হ্রাস পাইলে, পাণ্ড্যদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। জটাবর্মণ কুলশেখরের (আঃ ১১৯০-১২১৬ খ্রীঃ) রাজত্বকালকে পাণ্ড্যদের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তাঁহার সময় পাণ্ড্য-শক্তির যে পুনরুত্থান শুরু হয় তাহা ১ম মারবর্মণ সুন্দর পাণ্ড্যের (আঃ ১২১৬-১২৩৮ খ্রীঃ) রাজত্বকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১ম মারবর্মণ সুন্দর পাণ্ড্য চোল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন এবং তাঞ্জোর ও উরায়ুর লুণ্ঠন করেন।

জটাবর্মণ সুন্দর পাণ্ড্যের (আঃ ১২৫১–১২৭২ খ্রীঃ) রাজত্বকালে পাণ্ড্যদের ক্ষমতা সর্বোচ্চ শিখরে উঠে। ইনি চোল রাজাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব করেন, কাঞ্চী দখল করেন এবং চের দেশ ও সিংহলকে অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেন। তিনি হোয়সল, কাকতীয় এবং পল্লব রাজাদের পরাজিত করেন। এই সব জয়লাভের পর তাঁহার রাজ্য উত্তরে কুদ্দাপা ও নেলোর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তিনি বহু যজ্ঞ করেন।

বিখ্যাত ভিনীসিয় পর্যটক মার্কো পোলো ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাণ্ড্য-রাজ্য পরিদর্শন করেন। এই রাজ্য যখন ক্ষমতার শীর্ষদেশে অবস্থিত তখনকার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাম্রপর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত কায়ল নগর 'একটি বিরাট ও শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল'। উহা একটি সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যিক কেন্দ্রও ছিল। রাজার প্রভূত ধনসম্পত্তি ছিল। মুসলমান লেখক ওয়াসাফ কর্তৃক এই সকল বিবৃতি সমর্থিত হইয়াছে।

পাণ্ড্য-রাজ্যে যখন উত্তরাধিকারের যুদ্ধ শুরু হয় তখনই মালিক কাফুর পাণ্ড্য-রাজ্য আক্রমণ করেন এবং ইহার ফলেই পাণ্ড্য-রাজ্যের পতন হয়।

একাদশ অধ্যায়

ভারতবর্ষ ও তাহার প্রতিবেশী দেশসমূহ

আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতের প্রাকৃতিক সীমা ইহাকে কখনও অবশিষ্ট জগৎ হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে সমর্থ হয় নাই। সম্ভবতঃ ভারতের নব্যপ্রস্তর যুগের অধিবাসিগণ স্থল ও জলপথে ইন্দোচীন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস রচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সহিত সমসাময়িক পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহা বিশ্বাস করিবার মত যথেষ্ট কারণ আছে। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন যে, দ্রাবিড়গণ পশ্চিম এশিয়া হইতে ভারতে আসে। আর্যরা খুব

সম্ভবতঃ হয় মধ্য এশিয়া অথবা কোন ইউরোপীয় দেশ হইতে ভারতে আগমন করে। দূর অতীতেও মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া ও মিশরের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল।

ভারতবর্ষ ও পশ্চিম এশিয়াঃ খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পশ্চিম এশিয়ার সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মহাবীর আলেকজাণ্ডার ও সেলুকাসের অভিযান এবং তৎপরে পাটলিপুত্রে গ্রীক দূতাবাস স্থাপন পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে অশোকের প্রচারকার্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীকগণ ভারতে গ্রীক (হেলেনীয়) ভাবধারা আনয়ন করে, কিন্তু নিজেরা ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টির প্রভাবাধীন হইয়া পড়ে। কুষাণদের রাজত্বকালে রোম ভারতকে প্রভাবিত করিয়াছিল। আনুমানিক ২৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে পাণ্ড্যবংশীয় রাজা রোমের সম্রাট অগস্টাসের নিকট দূত প্রেরণ করেন। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রীয়ান সী' (Periplus of the Erythraean Sea) নামক গ্রন্থে ভারত ও পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশসমূহের মধ্যে যে বাণিজ্য চলিত তাহার একটি সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। সেই সময়ে সকোত্রা সহ আরব সাগরের কোন কোন দ্বীপে ভারতীয় বণিকগণের উপনিবেশ ছিল। ইসলাম ধর্মাবলম্বী আরবগণ রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সহিত বাণিজ্য শুরু করিয়াছিল। সিন্ধু জয়ের পর তাহারা ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতীয় ভেষজ ও অঙ্কে দশমিক পদ্ধতি ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি তাহারাই ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে লইয়া যায়।

ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়াঃ মধ্য এশিয়ায় স্যর অরেল স্টাইন যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার মধ্যে আছে বৌদ্ধ স্তূপ ও মঠসমূহের ধ্বংসাবশেষ, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবীর মূর্তি এবং ভারতীয় ভাষায় ও অক্ষরে লিখিত বহু পাণ্ডুলিপি। মনে হয় যে, কুষাণ যুগে এবং তৎপরবর্তীকালে মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতিরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। খোটান অঞ্চলে যে সমৃদ্ধিশালী ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারও প্রমাণ আছে। হিউয়েন সাঙ-এর সময় পর্যন্ত মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় কৃষ্টি বাঁচিয়া ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে মোঙ্গলরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহারাও কিছু রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্ম স্বীকার

করিত। মধ্য এশিয়ায় সুদূরপ্রসারী প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিবর্তন সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে ভারতীয় প্রভাব ছিল তাহা একেবারে মুছিয়া দিয়াছে।

ভারতবর্ষ ও দূর প্রাচ্য: চীনা লোকপরম্পরাগত কাহিনী অনুসারে খ্রীস্টপূর্ব ২ অব্দই সাধারণতঃ চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচলনের শুভ বৎসর বলিয়া ধরা হয়। খ্রীস্টীয় ৬৭ অব্দে শকদিগের নিকট প্রেরিত সম্রাট মিঙের দূত দুইজন বৌদ্ধ পুরোহিত লইয়া আসে। পরে আরও প্রচারকের আগমন হয়। খ্রীস্টীয় ১৮০ অব্দে প্রথম চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং দশ বৎসর পরে প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম মন্দির স্থাপিত হয়। পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে চীনে বৌদ্ধ ধর্ম দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক ও বৌদ্ধ মূর্তি সংগ্রহের জন্য এবং ভারতীয় শিক্ষকগণের নিকট হইতে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য জল ও স্থল পথে বহু চীনা পণ্ডিত ও ধর্মোৎসাহী ব্যক্তি ভারতে আসিতে থাকেন। চীনা পণ্ডিতগণের মতে তৃতীয় ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে ছয় শত বৎসরে প্রায় ১৬৯ জন তীর্থ পর্যটক ভারতের পথে যাত্রা করিয়াছিল। ভারতীয় পণ্ডিতগণও প্রচারক হিসাবে চীনে গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের চীনা ভাইদের বৌদ্ধধর্মের মর্ম উপলব্ধি করিতে এবং বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক অনুবাদ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। যে সব বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল উহার সংখ্যা নিশ্চয়ই অনেক। আমরা চীনা ভাষায় রূপান্তরিত বহু বৌদ্ধগ্রন্থ দেখি যাহার মূল গ্রন্থটি ভারতে পাওয়া যায় না। তখন সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সেই সময়ে উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল ; বাণিজ্যিক সম্পর্কও যে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যদিও উহার কোন বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না।

চীনে পাথর কুঁদিয়া মন্দির নির্মাণ করার পরিকল্পনাটিও ভারত হইতে গৃহীত। চৈনিক শিল্পের উপর ভারতীয় প্রভাব খুবই পরিষ্কার। চৈনিক প্রাচীরচিত্রে যে সব আঙ্গিক অনুসরণ করা হইয়াছে ও স্বর্গলোকবাসীদের যে সকল মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতেও ভারতীয় শিল্পকলার ছাপ রহিয়াছে। গান্ধার শিল্পরীতি হইতেই চীনারা অ্যাপোলোর ন্যায় মুখাবয়ব অঙ্কনের প্রেরণা পায়। অনেকের মতে গুপ্ত শিল্পরীতিই চীনের শিল্পধারায় এক স্থললিত উল্লাসের ভাব প্রবর্তন করে। ভারতীয় পুরাণ-কাহিনী হইতে অজস্র আঙ্গিক গ্রহণ করিয়া তাহা বৌদ্ধ পৌরাণিক কাহিনী, বোধিসত্ত্ব, অর্হৎ এবং লোকপালদের (বিশ্বের

চতুর্দিকের অভিভাবক) মূর্তি অঙ্কনে চৈনিক ছাঁচে ঢালাই করা হয়। ভারতীয় অবলোকিতেশ্বর চীনের জনসাধারণের কাছে হইয়া দাঁড়ান কুয়ান-ইন।

বৌদ্ধধর্ম কোরিয়া এবং জাপানেও বিস্তার লাভ করে।

ভারতবর্ষ ও তিব্বত: তিব্বতের শক্তিশালী রাজা স্রোং-সান গাম্পো সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচলন করেন। তিনি খোটানে ব্যবহৃত ভারতীয় অক্ষরও নিজ দেশে প্রচলন করেন। এইভাবে তিব্বতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি নূতন যুগের পত্তন হয়। বঙ্গদেশের পালরাজারা তিব্বতের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছিলেন। বিখ্যাত বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষু অতীশ দীপঙ্কর একাদশ শতাব্দীতে তিব্বতে যান এবং সেখানে বৌদ্ধধর্ম সংস্কারে সাহায্য করেন। বহু তিব্বতীয় ভিক্ষুও ভারতে আসেন এবং নালন্দা ও বিক্রমশিলা মঠে বিদ্যাভ্যাস করেন। বহু পবিত্র বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ: খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর বহুপূর্বেই সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশের উপকূলে এবং অভ্যন্তরে অনেক হিন্দু উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। যদিও এই সব উপনিবেশ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না, তবু এই সিদ্ধান্ত করিবার অনুকূলে বহু প্রমাণ আছে যে, "ব্রহ্মদেশের সমগ্র কৃষ্টি ও সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা হইতে এবং যদিও চীনারা ব্রহ্মদেশবাসীদের নিকটতর প্রতিবেশী, এবং রক্তের ও ভাষার সম্পর্ক তাহাদের সহিতই ঘনিষ্ঠতর, তবু ব্রহ্মদেশের কৃষ্টি ও সভ্যতা গঠনে উহাদের উল্লেখযোগ্য প্রভাব নাই।"

নিম্ন-ব্রহ্মদেশের প্রধান অধিবাসীদিগকে বলে মোন্ (Mons) বা তেলৈং (Talaings)। তেলৈং নামটি আমাদের সম্ভবতঃ তেলিঙ্গনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, যদিও ইহা নিশ্চিত যে নিম্ন-ব্রহ্মদেশের সমস্ত ভারতীয়ই দক্ষিণ ভারতের ঐ অঞ্চল হইতে আসে নাই। হিন্দু ভাবাপন্ন তেলৈং উপনিবেশগুলি সমবেত ভাবে 'রমন্নদেশ' নামে পরিচিত। নিম্ন-ব্রহ্মদেশের তেলৈং এলাকার উত্তরে হিন্দুভাবাপন্ন পিউ জাতি (Pyus) একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। উহার রাজধানী স্থাপিত হয় শ্রীক্ষেত্রে (প্রোমের নিকটস্থ হ্‌মওয়াজা (Hmawza) শহর)।

আরাকানের ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জীতে কয়েকটি ভারতীয় রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। শিলালিপির প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, খ্রীস্টীয়যুগের প্রথম দিকে বৌদ্ধধর্ম যেমন আরাকানে প্রচলিত হয়, তেমনি সেখানে ভারতীয় অধিবাসীরা

আসে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরাকানের জনৈক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নৃপতি বর্মীগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া বঙ্গদেশে পলায়ন করেন। পরে তিনি গৌড়ের সুলতানের সহায়তায় স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।

মধ্য-ব্রহ্মদেশে অবস্থিত ক্ষুদ্র রাজ্য পাগান (Pagan) নবম শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। রাজা অনরথ বা অনিরুদ্ধের (১০৪৪-১০৭৭ খ্রীঃ) সময় এই রাজ্যটি খুব শক্তিশালী হয়। তাঁহার রাজত্বকালে বর্মীরা মোনদের ধর্ম ও বর্ণমালা গ্রহণ করে। এই দুইটিরই উৎপত্তি হইয়াছে ভারতীয় ধর্ম ও বর্ণমালা হইতে। তাঁহার পুত্র কিয়ন্‌জিত্তা (Kyanzittha) (১০৮৪-১১১২ খ্রীঃ) ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। তিনি বহু বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ঔপনিবেশিককে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পাগানের শক্তিশালী নৃপতিগণের শাসনকালে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম ক্রমে ব্রহ্মদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তৎস্থলে 'থেরবাদ' বৌদ্ধধর্ম প্রধান ধর্মমত হইয়া দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষ ও থাইল্যাণ্ড: থাইল্যাণ্ড (অথবা শ্যাম) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে থাইদের দেশ হইয়া দাঁড়ায়। এই দেশে তাহাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে প্রায় এক হাজার বৎসর এই দেশ প্রধানতঃ হিন্দু ঔপনিবেশিকদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। সেখানে বেশ কয়েকটি হিন্দু উপনিবেশ ছিল, কিন্তু কোনটিই শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু ভারতীয় ধর্মমত ও পবিত্র গ্রন্থসমূহ এবং ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য থাইল্যাণ্ডের প্রাচীন সভ্যতার উপর প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

থাইরা আদিতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব চীনে বাস করিত। সেখানে তাহারা বর্তমান কালে য়ুনান নামে পরিচিত অঞ্চলে একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই রাজ্যের নাম হয় গান্ধার এবং ইহার এক অংশকে বলা হইত মিথিলা। গান্ধারের থাইরা এমন একটি বর্ণমালা ব্যবহার করিত যাহার উৎপত্তিস্থল হইতেছে ভারতবর্ষ। তাহারা ভারতীয় ধর্মপ্রচারকগণ দ্বারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়। কুবলাই খাঁ ১২৫৩ খ্রীঃ গান্ধার দখল করেন।

শ্যামদেশ জয়ের পর থাইরা তদ্দেশে প্রচলিত সমৃদ্ধিশালী ভারতীয় কৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত হইল। তাঁহাদের দ্বারা প্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যটি স্থাপিত হয় তাহার নাম ছিল সুখোদয়। পরবর্তী কালে অযোধ্যা রাজ্য প্রভাব-প্রতিপত্তিতে সুখোদয়ের সমকক্ষ হইয়া উঠে। এই দুইটি রাজ্যের রাজগণ ও অধিবাসীরা

ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং পালি ছিল তাঁহাদের পবিত্র ভাষা। শ্যামের শিল্পকলা ভারতীয় ভাবধারা আঙ্গিকের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ ও মালয় উপদ্বীপঃ খ্রীস্টীয় শতকাবলীর প্রথম দিকে মালয় উপদ্বীপে কয়েকটি হিন্দু উপনিবেশ ছিল। এখনও সেখানে কিছু কিছু হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহু শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। যে সব প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইতে একথা বলা যায় যে, "বন্দোন উপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহ ছিল ভারতীয় প্রভাবের তরঙ্গাভিঘাতে উদ্বুদ্ধ দূরতর প্রাচ্য কৃষ্টির জন্মভূমি···"।

ভারতবর্ষ ও জাভা (বা যবদ্বীপ)ঃ খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে জাভায় হিন্দু উপনিবেশ স্থাপন আরম্ভ হয়। ১৩২ খ্রীঃ অব্দে জাভার রাজা দেববর্মণ চীনে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন। খ্রীস্টীয় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিম জাভায় একটি শক্তিশালী হিন্দু-রাজ্য ছিল। মধ্য-জাভাতেও হো-লিঙ বা কলিঙ্গ নামে একটি হিন্দু-রাজ্য ছিল। মধ্য-জাভার শক্তিশালী মাতরম্ রাজ্যটির উদ্ভব হয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের প্রসার এবং সম্ভবতঃ কোন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত অথবা ভীষণ মহামারীর ফলে জাভার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভারকেন্দ্র পূর্ব জাভাতে স্থানান্তরিত হয়। পূর্ব জাভার অভ্যুত্থান শুরু হয় সম্ভবতঃ সিন্দোকের রাজত্বকালে (আঃ ৯২৯-৯৪৭ খ্রীঃ)। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই রাজ্য এক বিপর্যয়ের ('প্রলয়') ফলে ধ্বংস হয়। সেই বিপর্যয় যে ঠিক কি ধরণের ছিল তাহা আজিও অজ্ঞাত। দীর্ঘ কাল ধরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত থাকিবার পর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জাভায় রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃ-স্থাপিত হয়। রাজা রাজসনগরের রাজত্বকালে (১৩৫০-১৩৮৯ খ্রীঃ) মজপহিত এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি হয়। গৃহযুদ্ধ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং দুর্ভিক্ষের ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে জাভার রাজনৈতিক শক্তি ও গুরুত্ব নষ্ট হইয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলমানরা জাভাতে তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে।

ভারতবর্ষ ও সুমাত্রাঃ সুমাত্রার প্রাচীনতম হিন্দু রাজ্যের নাম হইতেছে শ্রী-বিজয় (পালেম্বঙ)। ইহা খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠে। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ইৎ-সিং শ্রী-বিজয় রাজ্যটিকে বৌদ্ধধর্মের একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র

রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সুমাত্রার অপর একটি হিন্দু-রাজ্যের নাম মলয়ু (আধুনিক জাম্বি)। ইহা একসময় শ্রীবিজয়ের অংশ ছিল। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য ও জাভার পতনের পর মলয়ু শক্তিশালী হইয়া উঠে। মার্কো পোলোর বিবরণী হইতে জানা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মলয়ু একটি সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। ইবন বতুতা চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুমাত্রা পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার বিবরণী হইতে সেই দ্বীপে মুসলমান প্রভাব বৃদ্ধির কথা জানা যায়।

ভারতবর্ষ ও বোর্ণিয়ো: শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে বোর্ণিয়োতে হিন্দু উপনিবেশের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মই ছিল প্রধান ধর্ম এবং ব্রাহ্মণেরা মোট জনসংখ্যার একটি প্রধান অংশ ছিল। মুয়র কমন (মহকম্ নদীর তীরে) এবং কোম্‌বেঙ গুহায় যে সব পুরাকালের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহা ভারতের সহিত এই দেশের যোগাযোগই নির্দেশ করে।

ভারতবর্ষ ও বলি: দূরপ্রাচ্যে একমাত্র বলি দ্বীপেই এখনও হিন্দু উপনিবেশ টিঁকিয়া আছে। ইসলাম ধর্ম সেখানে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতেও বলিতে একটি সমৃদ্ধিশালী হিন্দু-রাজ্য ছিল। বলিতে যে বৌদ্ধ ধর্মও ছিল ইৎ-সিং তাঁহার বিবরণীতে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বলি জাভার নৃপতিগণের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে ওলন্দাজরা বলিতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। সেখানে শেষ হিন্দু রাজার রাজত্বের অবসান ঘটে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য: খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি শক্তিশালী শৈলেন্দ্র বংশের অধীনে একত্রিত হইয়াছিল। সুমাত্রা, জাভা ও মালয় উপদ্বীপের হিন্দু-রাজ্যগুলি শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ ছিল। তাঁহাদের মূল শক্তিকেন্দ্র হয় জাভাতে নয় মালয় উপদ্বীপে ছিল। কয়েকজন আরব লেখক শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যকে 'জাবাগ' অথবা 'জাবাজ' ('মহারাজা'র সাম্রাজ্য) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহার সমৃদ্ধির একটি চমকপ্রদ বিবরণ দিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়ায় ইহাই ছিল প্রধান নৌশক্তি। নবম শতাব্দীতে এই শক্তিশালী সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় এবং কম্বুজ ও জাভা হস্তচ্যুত হয়। একাদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের সহিত চোলদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম আরম্ভ হয়। রাজেন্দ্র চোল তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী নৌবহর

প্রেরণ করেন। এই অভিযানে জয়লাভ করিয়া সুমাত্রার পূর্ব উপকূল এবং মালয় উপদ্বীপের মধ্য ও দক্ষিণ জেলাগুলিতে তিনি স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল তাঁহাদের বৈদেশিক রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে চোলরা ইন্দোনেশিয়ার উপর প্রভুত্ব করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করেন। শৈলেন্দ্রবংশ কর্তৃক সৃষ্ট সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে, কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর পর হইতে এই রাজবংশ সম্বন্ধে আর কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চন্দ্রভানু নামে শৈলেন্দ্র বংশের একজন উত্তরাধিকারী সিংহলের বিরুদ্ধে দুইটি নৌ-অভিযানে নেতৃত্ব করেন। ১২৬৪ খ্রীঃ অব্দের দিকে তিনি পাণ্ড্যবংশীয় রাজা জটাবর্মণ বীর পাণ্ড্য কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ জাভা কর্তৃক বিজিত হয়। একদা শক্তিশালী এই সাম্রাজ্যের শেষ হিন্দু নৃপতি ১৪৭৪ খ্রীঃ অব্দে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন।

শৈলেন্দ্র বংশীয় নৃপতিগণ ইন্দোনেশিয়ার বৃহদংশই কেবল যে এক রাজনৈতিক সূত্রে বন্ধন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহাদের আনুকূল্যে ইন্দোনেশিয়ায় কৃষ্টির উন্নতি হইয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্ম এক নূতন প্রেরণা পায়। শিল্পকলা যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন হইতেছে চণ্ডী কলসন ও বোরোবুদুরের মন্দির। এক নূতন ধরণের বর্ণমালা প্রচলিত হয়।

শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা বঙ্গদেশের পাল রাজাদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে কুমারঘোষ নামক জনৈক বাঙ্গালী পণ্ডিত শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাদের ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন। খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে বালপুত্রদেব নালন্দাতে একটি মঠ নির্মাণ করান। দেবপাল যে পাঁচটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন সেই সব গ্রাম হইতে যে রাজস্ব পাওয়া যাইত তাহা দ্বারা ঐ মঠের ব্যয় নির্বাহ হইত।

দেশ বিজয়ের ফলে যে ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় কৃষ্টি বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা মনে হয় না। শান্তিপূর্ণভাবে উপনিবেশ স্থাপনেই সাংস্কৃতিক প্রচার সম্ভবপর হইয়াছিল। গ্রীস পশ্চিম জগতে যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, বিশ্বের এই অংশে ভারতবর্ষও ঠিক সেই অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মনির্বিশেষে ভারতীয় প্রচারক ও ঔপনিবেশিকগণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণের মনে চিন্তা ও শিল্পের প্রেরণা জাগাইয়াছিল। সেখানকার শিল্প ও

স্থাপত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল দক্ষিণ ভারতীয় রীতিতে। গুপ্ত ও পাল রাজাদের সময়কার শিল্পের অনুকরণের দৃষ্টান্তও দেখা যায়।

হিন্দু উপনিবেশসমূহের সাধারণ বিবরণ—উপরে যে সব হিন্দু উপনিবেশের কথা বলা হইয়াছে সেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম দুই-ই প্রচলিত ছিল। জাভাতে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম প্রচলিত হয় অষ্টম শতাব্দীতে। শিবই ছিলেন প্রধান উপাস্য দেবতা, কিন্তু হিন্দুর সমস্ত দেবদেবীর কথাই সেখানে পরিচিত ছিল। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সেখানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল হীনযান বৌদ্ধধর্ম, কিন্তু শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাদের আমলে মহাযান বৌদ্ধধর্ম সুমাত্রা ও জাভা হইতে হীনযান মতকে প্রায় বিতাড়িত করে। জাভা বৌদ্ধধর্ম চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং অতীশ দীপঙ্করের মত বহু জ্ঞানী ও গুণীকে তাহা আকর্ষণ করে। এই দ্বীপের ধর্মজীবনে বুদ্ধ ও শিবের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন জাভার সাহিত্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সাহিত্যের প্রধানতম স্তম্ভ হইতেছে 'রামায়ণ'। ইহা কিন্তু বাল্মীকি-রচিত রামায়ণের অনুবাদ নহে, ইহা সম্পূর্ণ নূতন রচনা। 'মহাভারতের' একটি গদ্য-অনুবাদও আছে। এই গ্রন্থগুলি জাভাতে বিখ্যাত ভারতীয় মহাকাব্যদ্বয়কে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল এবং এই ধরণের গ্রন্থ রচনার পথ প্রস্তুত করিয়াছিল।

হিন্দু উপনিবেশসমূহের সামাজিক জীবন ভারতীয় ছাঁচেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। জাভা ও সুমাত্রাতে জাতিভেদ প্রথা বেশ সুপ্রতিষ্ঠিতই ছিল। চিরাচরিত চারিটি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। অস্পৃশ্যতা ছিল না, কিন্তু বলিতে দাসরা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। সেই দ্বীপে শূদ্র ছাড়া সমস্ত জাতির মধ্যেই বিধবাকে অগ্নিতে পোড়াইয়া মারিবার রীতি ছিল।

ভারতের মত এখানেও শিল্প ছিল ধর্মের দাসী। দুর্ভাগ্যবশতঃ একমাত্র জাভাতেই প্রাচীন ধর্মমন্দিরাদি মোটামুটি রক্ষিত হইয়াছে। অন্য অন্য দ্বীপে সেগুলি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইলেও তাহাদের ঐতিহাসিক মূল্য তেমন নহে। মধ্য-জাভায় কতকগুলি ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের ও বৌদ্ধ ধর্মমন্দির আছে। বোরোবুদুর নামে পরিচিত বিশাল সৌধটি সম্ভবতঃ ৭৫০-৮৫০ সালে শৈলেন্দ্র বংশীয় কোন রাজার আনুকূল্যে নির্মিত হয়। জাভায় স্থাপত্য-শিল্পেরও আশ্চর্যজনক অগ্রগতি হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ ও আনামঃ আধুনিক আনাম (টন্‌কিঙ এবং কোচিন-চীন ছাড়া) প্রাচীন হিন্দু-রাজ্য চম্পার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতিহাসে যাঁহার নাম পাওয়া যায় তেমন প্রথম হিন্দু রাজা সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। চম্পা শহর বলিতে এখন ট্রা-কিয়েন বুঝায়। ইহার নিকটে দুই শ্রেণীর বহু মন্দির আছে। ৩য় ইন্দ্রবর্মণ (৯১১-৯৭২ খ্রীঃ) নাকি হিন্দু দর্শনের ছয়টি বিভাগ, বৌদ্ধ দর্শন, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অন্যান্য বিষয় বিশেষভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে আনামের সৈন্যবাহিনী চম্পার উপর প্রায় এক শতাব্দী কাল ধরিয়া আক্রমণ চালায়, ইহার ফলে একদা সমৃদ্ধিশালী হিন্দু-রাজ্যটি খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। তারপর কম্বুজ ও চীনের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম শুরু হয়। খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ঐ হিন্দু রাজ্যটি কার্যতঃ ভাঙিয়া পড়ে, তবে নামে ইহার অস্তিত্ব ১৮২২ খ্রীঃ পর্যন্ত ছিল। এই ভাবে, ভারতের যেসব বীর সন্তান বহু দূর দেশে ভারতের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল এবং উহার মান ও মর্যাদা ১৫০০ বৎসরাধিককাল সসম্মানে রক্ষা করিয়াছিল, তাহারা শেষ পর্যন্ত বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে।

চম্পাতে গোঁড়া ভারতীয় ধরণে একটি হিন্দু সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ ছিলেন সর্বোচ্চ পদাধিকারী, তবে ক্ষত্রিয়দের স্থানও ব্রাহ্মণদের স্থান হইতে খুব নিম্নে ছিল না। সংস্কৃত তাহাদের সরকারী ভাষা ছিল এবং কিছু কিছু সাহিত্য সৃষ্টিও হইয়াছিল। সমস্ত হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে শিবই অধিক প্রাধান্য পাইতেন। চম্পার ধর্ম-জীবনে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম কোন কোন নৃপতির আনুকূল্য লাভ করিয়াছিল। যে সব মন্দিরাদির অবশেষ এখনও আছে তাহা হইতে শিল্পকলায় তত্রত্য জনসাধারণের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সব মন্দিরাদি সাধারণতঃ ইষ্টকে নির্মিত হইত।

ভারত ও কাম্বোডিয়াঃ আধুনিক কাম্বোডিয়া এবং কোচিন-চীন বলিতে যাহা বুঝায় সেই ভূখণ্ডেরই প্রাচীন নাম কম্বুজ। কম্বুজের প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের নাম ফু-নান। সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর পরে ইহা স্থাপিত হয় নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুইটি ধর্মমতই এইস্থানে পাশাপাশি উন্নতিলাভ করিয়াছিল। ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃত ভাষা এখানে চর্চা করা হইত। এখানে জাতিভেদ প্রচলিত ছিল।

খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পরে ফু-নানের ইতিহাস অন্ধকারে হারাইয়া যায়

এবং ইহার স্থলে কম্বুজ রাজ্য কাম্বোডিয়ায় প্রধান রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হয়। কম্বুজের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না, তবে খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইহা যে একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিছুকাল অবনতির পরও জাভার অধীন থাকার পর কাম্বোডিয়া খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীতে আবার প্রতিপত্তি লাভ করে। এই সময়ই বিখ্যাত কম্বুজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং আঙ্গোর অঞ্চলে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ইন্দ্রবর্মার বংশের রাজত্বকালে (৮৭৭-১০০১ খ্রীঃ) কম্বুজের রাজনৈতিক ক্ষমতা ইউনান, মালয় উপদ্বীপ এবং শ্যাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বিশ্ববিখ্যাত অঙ্কোরবাত নির্মাতা দ্বিতীয় সূর্যবর্মা (আঃ ১১১৩-৪৫ খ্রীঃ) আনাম ও চম্পা আক্রমণ করেন এবং চীনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলেন। সপ্তম জয়বর্মার (সিংহাসনারোহণ ১১৮১ খ্রীঃ) সময় কম্বুজ সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশী বিস্তার লাভ করে। তিনি চম্পা ও ব্রহ্মদেশের নিম্নভূমি জয় করেন, একটি নূতন রাজধানী (অঙ্কোর থোম) স্থাপন করেন এবং বহু ধর্মমন্দিরাদি ও জনসাধারণের প্রয়োজনীয় অট্টালিকাদি রক্ষা করেন। শ্যামের থাইদের ও আনামবাসীদের চাপে খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে কম্বুজের পতন আরম্ভ হয়। ১৮৫৪ সালে ইহা একটি ফরাসী-আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়।

কম্বুজে বৌদ্ধধর্ম মাঝে মাঝে রাজার আনুকূল্য লাভ করিলেও হিন্দুধর্ম, বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম, ছিল প্রধান ধর্ম। কম্বুজের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিলালিপিসমূহ চমৎকার কাব্যছন্দে রচিত হইত। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। সেখানে বহু 'আশ্রম' নির্মিত হইয়াছিল। ঐগুলি সরকারী বদান্যতায় এবং জনসাধারণের দানে চলিত। ঐ আশ্রমসমূহ ছিল হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি। কম্বুজে ভাস্কর্যের আশ্চর্যজনক উন্নতি আমরা লক্ষ্য করি। এই উন্নতিরই একটি নিদর্শন অঙ্কোরবাত। ইহা বিষ্ণুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয়।

ভারত ও সিংহল ঃ যদিও সিংহলের প্রাচীন অধিবাসিগণ ভাদ্দা জাতিরই সমগোত্রীয় ছিলেন, কিন্তু ঐ দ্বীপের বর্তমান অধিবাসিগণ দ্রাবিড় ও আর্য আক্রমণকারী এবং অধিবাসীদের বংশধর। "ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতেই ভারতের দ্রাবিড় অধ্যুষিত অঞ্চল, বিশেষ করিয়া তামিলভাষী দেশ হইতে জনস্রোত সিংহলের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে……; কিন্তু সিংহলী ভাষায়

দ্রাবিড়দের কিছু প্রভাব দেখা গেলেও উহা আর্য ভাষাসম্ভূত। বেদের ভাষার কাছাকাছি সংস্কৃত সংশ্লিষ্ট কোন ভাষাই ইহার জনক।" সম্ভবতঃ "প্রাচীনকালে অভিযানকারী আর্যগণ সিংহলের কিছু বা সমগ্র অংশ দখল করে এবং তাহাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কিছু কিছু অংশ ঐ দ্বীপের প্রাচীন (Vadda-Dravidian) অধিবাসীদের উপর চাপাইয়া দেয়।"

কিংবদন্তী অনুসারে গুজরাট (অথবা মগধ অথবা কলিঙ্গ) দেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের অল্পকাল পূর্বে যক্ষদিগকে পরাজিত করিয়া সিংহল অধিকার করেন। যে 'সিংহল' বা সিংহজাতির নাম অনুসারে দ্বীপটি সিংহল নামে পরিচিত, সেই আর্য উপনিবেশ স্থাপনকারীদের আগমনই বোধ হয় এই কিংবদন্তী দ্বারা সূচিত হইতেছে। যাহা হউক, 'দেবানাং পিয়' তিস্স যখন সিংহলের অধিপতি (আনুমানিক ২৪৭-২০৭ খ্রীঃ পূঃ) তখন অশোক কর্তৃক প্রেরিত প্রচারকগণ কর্তৃক তথায় বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হয়। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে এলারা (Elara) নামক চোলরাজ সিংহল অধিকার করেন। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে সিংহলের কোন কোন অংশ ক্রমান্বয়ে পাঁচজন তামিল আক্রমণকারী দ্বারা অধিকৃত হয়। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লম্বকর্ণ বংশীয় জনৈক শাসক দ্বারা সিংহলের সিংহাসন অধিকৃত হয়। কথিত আছে যে এই বংশ মগধের মৌর্য বংশের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে চোলরাজ কারিকল সিংহল আক্রমণ করেন। সিংহলরাজ ১ম গজবাহু (১১৩-১৩৫ খ্রীঃ) ইহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ চোলদেশ আক্রমণ করেন। সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক সিংহলরাজ মেঘবর্ণের রাজত্বকালে বুদ্ধের পবিত্র দন্ত মগধের অন্তর্গত দন্তপুর হইতে সিংহলে নীত হয়। মহানামের রাজত্বকালে (৪১৪-৪৩৪ খ্রীঃ) প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত বুদ্ধঘোষ (তিনি সম্ভবতঃ উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন) বৌদ্ধধর্মের যে ব্যাখ্যা করেন তাহাই বর্তমানে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও কাম্বোডিয়াতে প্রচলিত রহিয়াছে। পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সিংহল পাণ্ড্যদেশ হইতে আগত তামিল আক্রমণকারীদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। সাম্রাজ্য স্থাপয়িতা চোলরাজগণের সময়ে সিংহলের ভাগ্যসূত্র আবার তামিল দেশের সহিত গ্রথিত হইয়াছিল।

ভারতের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বাদশ অধ্যায়

উত্তর ভারতে তুর্কী আধিপত্য স্থাপন

প্রথম পরিচ্ছেদ

গজনীর রাজগণ

গজনীর অভ্যুত্থান: আমরা দেখিয়াছি যে, সীমান্তের সিন্ধু প্রদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চল আরব অভিযানের বন্যাস্রোতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব স্থাপন তুর্কীদেরই কীর্তি এবং এই কাজ আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনীর তুর্কী স্থলতানরাই আরম্ভ করিয়াছিলেন।

আলপ্তিগীন নামে এক তুর্কী বীর কর্তৃক ৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে গজনী রাজ্যের পত্তন হয়। তিনি প্রথম জীবনে সামানী রাজাদের ক্রীতদাস ছিলেন; তাঁহাদের ক্ষমতা এককালে জাক্সার্টেস হইতে বাগদাদ এবং খাওয়ারিজম হইতে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আলপ্তিগীন তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় সাফল্য লাভের কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যান; তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ১৪ বৎসর কাল পরে তাঁহার ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তিগীন তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন (৯৭৭ খ্রীস্টাব্দ)। এই নূতন স্থলতান ছিলেন বিজয় গৌরব লাভে সমুৎসুক একজন উদ্যোগী সামরিক নেতা। ফলে স্বভাবতঃই তাঁহার দৃষ্টি হিন্দু শাহী বংশীয়[১] রাজা জয়পালের রাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। জয়পালের প্রভুত্ব লাঘমান হইতে চন্দ্রভাগা নদী পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল।

সবুক্তিগীন ও জয়পাল: সবুক্তিগীন কর্তৃক জয়পালের রাজ্যে এক লুণ্ঠনাভিযান প্রেরণের ফলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। জয়পাল এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া গজনী অভিমুখে অগ্রসর হন, কিন্তু পথিমধ্যেই প্রতিপক্ষের

---

১ নবম শতাব্দীর তৃতীয় দশকে লল্লিয় কর্তৃক হিন্দু শাহী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জয়পাল মোটামুটিভাবে ৯৬৫-১০০২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সাক্ষাৎকার লাভ করেন। অকস্মাৎ তুষারপাতের ফলে জয়পালের সৈন্যবাহিনী বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে ; ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ, ৫০টি হস্তী এবং সীমান্তবর্তী কতকগুলি দুর্গ ও নগর ছাড়িয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে তিনি সবুক্তিগীনের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সন্ধির এই সকল অপমানজনক সর্ত মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হন। সবুক্তিগীন লাঘমান বিধ্বস্ত করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। জয়পাল উত্তর-ভারতের কয়েকজন রাজাকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে পুষ্ট এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে গজনী অভিযান করিলেন। কিন্তু তিনি আবার পরাজিত হন। লাঘমান ও পেশোয়ারের মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহ সবুক্তিগীন কর্তৃক অধিকৃত হয় ; সেখানে তিনি ইসলামের প্রসার সাধন করেন।

হিন্দু শাহী বংশের পতন : সবুক্তিগীন তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে (৯৯৭ খ্রীস্টাব্দ) আলপ্তিগীনের এক কন্যার গর্ভজাত তাঁহার এক কনিষ্ঠ পুত্রকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। ইহাতে স্বভাবতঃই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মামুদ রুষ্ট হন এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতাকে পরাভূত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন (৯৯৮ খ্রীস্টাব্দ)।

সিংহাসন লাভের অল্পকাল পরেই মামুদকে বাগদাদের খলিফা স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করেন (৯৯৯ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁহার অবস্থা তখন সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়া উঠিল, সুতরাং তিনি তাঁহার পিতার প্রবর্তিত ভারত-আক্রমণের কর্মপন্থা অনুসরণের সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহার সমসাময়িক জনৈক মুসলমান লেখক বলেন, "প্রতি বৎসর ভারতের বিরুদ্ধে একটি করিয়া অভিযান পরিচালনা করাকে তিনি স্বীয় কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন।" এই উক্তি হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় না মামুদ তাঁহার ভারত-অভিযানের সঙ্গে ধর্মভাব জড়িত করার কোনরূপ অভিসন্ধি পোষণ করিতেন কি না।

মামুদের প্রথম অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল ১০০০ খ্রীস্টাব্দে ; ইহার ফলে সীমান্তের কতকগুলি দুর্গ তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। পর বৎসর মামুদ এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী লইয়া পেশোয়ারের সন্নিকটে উপস্থিত হন এবং তুমুল যুদ্ধে জয়পালকে পরাজিত করেন। মুসলমান অশ্বারোহী বাহিনীর কৃতিত্বেই এই যুদ্ধের গতি নির্ণীত হয়। বিজেতারা 'অপরিমেয়' ধনসম্পত্তি হস্তগত করে। জয়পাল স্বয়ং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণের সঙ্গে বন্দী হইলেন। প্রচুর মুক্তিপণ

এবং ৫০টি হস্তী দেওয়ার সর্তে তিনি মুক্তিলাভ করেন। মামুদ জয়পালের রাজধানী ওয়াইহিন্দে (উদভাণ্ডপুর) অগ্রসর হইয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ বিধ্বস্ত
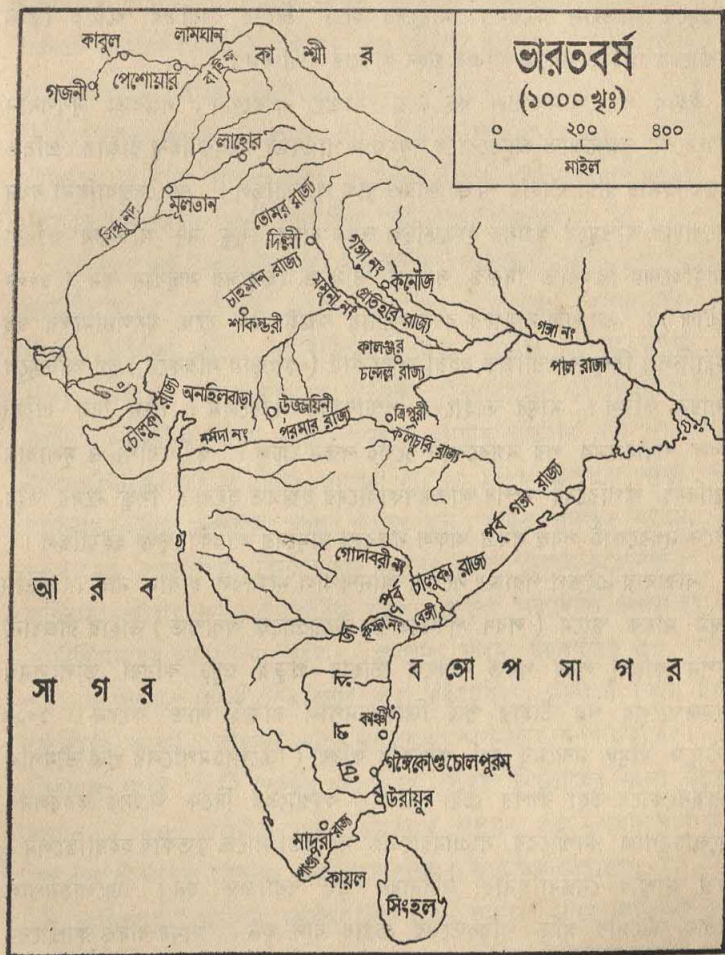
করেন। গর্বিত হিন্দু রাজা অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন (আঃ ১০০২ খ্রীস্টাব্দ) দিয়া অধিকতর অপমানের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

জয়পালের পর তাঁহার পুত্র আনন্দপাল শাহী রাজ্যের রাজা হন। মামুদ ১০০৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া মুলতানের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে

চাহিলেন, কিন্তু আনন্দপাল তাহাতে সম্মতি দানের পরিবর্তে মুলতানের মুসলমান রাজার পক্ষাবলম্বন করিয়া আক্রমণকারীকে বাধা দানের উদ্দেশ্যে পেশোয়ার অভিমুখে অভিযান করেন। মামুদের হস্তে তাঁহার পরাভব ঘটে ; তিনি কাশ্মীরের পাহাড় পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

ইহার পর আনন্দপাল বহু সৈন্য সংগ্রহ করিলেন ; সম্ভবতঃ মুসলমান আক্রমণের বন্যাস্রোত প্রতিরোধে সমুৎসুক পার্শ্ববর্তী অন্যান্য হিন্দু রাজার প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর দ্বারা তাঁহার শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সৈন্যবাহিনী যখন পেশোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল তখন মামুদ সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া ওয়াইহিন্দের বিপরীত দিকস্থ সমতল ভূমিতে হিন্দুদের সম্মুখীন হন (১০০৯ খ্রীস্টাব্দ)। একমাত্র মামুদের রণনৈপুণ্যের জন্যই এই যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হইয়াছিল। হিন্দুগণ পরাজিত হইয়া নগরকোট (কাংড়ার সন্নিকটে) দুর্গ অভিমুখে পলায়ন করিল। মামুদ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ; তিন দিন ধরিয়া প্রবল বাধাদানের পর নগরকোট দুর্গের পতন ঘটিল। স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান বস্ত্রাদিসহ অপরিমেয় সম্পদ আক্রমণকারীদের হস্তগত হইল। সিন্ধু নদের তীর হইতে নগরকোট পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল সম্ভবতঃ মামুদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

বারংবার এইরূপ পরাজয় সত্ত্বেও আনন্দপাল মনোবল হারান নাই। তিনি নন্দন নামক স্থানে (লবণ পর্বতশ্রেণীর উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত) তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়া লবণ পর্বত অঞ্চলে তাঁহার প্রভুত্ব সুদৃঢ় করিয়া তুলিলেন। আনন্দপালের পর তাঁহার পুত্র ত্রিলোচনপাল রাজত্ব লাভ করেন। ১০১৪ খ্রীস্টাব্দে মামুদ নন্দনের দুর্গ অধিকার করিয়া (ত্রিলোচনপালের পুত্র ভীমপাল বীরত্বসহকারে উহা রক্ষার চেষ্টা করেন) কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ত্রিলোচনপাল কাশ্মীরের সংগ্রামরাজের সহায়তা লাভে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। কিন্তু কাশ্মীর সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক তুঙ্গ পরাজিত হন। ত্রিলোচনপাল তাঁহার ভাগ্যের গতি পরিবর্তনের চেষ্টায় ব্যর্থ হন। মামুদ যদিও কাশ্মীরের মধ্যস্থলে অবস্থিত দুরতিক্রমণীয় পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করা বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করেন নাই, তথাপি তাঁহার সামরিক অভিযানের সাফল্যে তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল এবং পার্বত্য অঞ্চলের কোন কোন শাসক তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। সে অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হইল এবং নবদীক্ষিত লোকদের জন্য বহু মসজিদ নির্মিত হইল।

কাশ্মীরে বিফলমনোরথ হইবার পর ত্রিলোচনপাল পঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে আসিয়া সম্ভবতঃ শিবালিক পর্বত অঞ্চলে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করেন। শক্তিশালী চন্দেল্লরাজ বিদ্যাধরের সহিত তিনি মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন। মামুদ পুনরায় (১০১৯ খ্রীস্টাব্দে) ভারতে আসেন এবং রহুত (রামগঙ্গা) নদীর তীরে এক যুদ্ধে ত্রিলোচনপালকে পরাজিত করেন। কিছুকাল পরে (১০২১-২২ খ্রীস্টাব্দে) ত্রিলোচনপাল তাঁহার কয়েকজন অনুগামীর হস্তে নিহত হন। তাঁহার পুত্র ভীমপাল রাজ্যের অতীব দুর্দিনে রাজত্বের উত্তরাধিকার লাভ করেন। ১০২৬ খ্রীস্টাব্দে ভীমপালের মৃত্যু হইলে হিন্দু শাহী বংশ বিলুপ্ত হয়।

সুলতান মামুদের বিজয় অভিযান: মুলতান প্রদেশ কার্মাথিয়ানদের শাসনাধীন ছিল। তাঁহারা বাগদাদের খলিফাদের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন না। সবুক্তিগীনের সহিত তাঁহারা প্রীতির সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিতেন; কিন্তু মামুদের ভাতিন্দা অভিযানকালে তাঁহার সহিত বিরোধ ঘটে। মুলতানের রাজা দাউদ সম্ভবতঃ তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া মামুদের সৈন্যবাহিনীকে যাইতে দিতে চাহেন নাই। ১০০৬ খ্রীস্টাব্দে মামুদ পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া মুলতান পর্যন্ত অগ্রসর হন; দাউদ পলায়ন করেন, কিন্তু মুলতানের সৈন্যবাহিনী বিনা বাধায় মামুদের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। প্রচুর জরিমানা আদায় করিয়া নাগরিক জনসাধারণকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, কিন্তু কার্মাথিয়ানদের হত্যা করা হইল। সুখপাল নামে জয়পালের এক পৌত্রকে পূর্বে প্রতিভূরূপে গজনীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল; সেখানে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারই হাতে মুলতানের শাসনভার অর্পণ করা হয়। তবে কিছুকাল পরেই তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করেন। ১০০৮ খ্রীস্টাব্দে মামুদ মুলতানে আসেন এবং মুলতান দখল করিয়া সুখপালকে আটক রাখেন। দাউদকে ধরিয়াও কারারুদ্ধ করা হয়।

ভাতিন্দার (মুসলিম লেখকগণের দ্বারা ভাতিয়া নামে অভিহিত) সুদৃঢ় দুর্গটি ছিল উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে গঙ্গার উর্বর উপত্যকাপ্রদেশে প্রবেশ-পথের প্রহরীস্বরূপ। এই দুর্গ অধিকারের জন্য ১০০৪ খ্রীস্টাব্দে মামুদ গজনী হইতে যাত্রা করেন। স্থানীয় রাজা (মুসলমান লেখকগণ কর্তৃক বাজি রায় নামে অভিহিত) অসীম ধৈর্যসহকারে আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মামুদ দুর্গটি দখল করিতে সক্ষম হন। অপরিমেয় ধনসম্পদ তাঁহার হস্তগত

হয়। দুর্গবাসীদের মধ্যে যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল কেবলমাত্র তাহারাই হত্যাকাণ্ডের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

১০০৯ খ্রীস্টাব্দে মামুদ নারায়ণপুর (রাজস্থানের আলোয়ার অঞ্চলে অবস্থিত) অধিকার করিলেন। সেখানকার হিন্দু রাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। বাণিজ্যের দিক হইতে নারায়ণপুর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল এবং এরূপ শোনা যায় যে, মামুদ ও নারায়ণপুরের রাজার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে ভারত ও খুরাসানের ভিতর ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশ প্রসার হইয়াছিল।

চক্রস্বামীর বিশাল মন্দিরের জন্য থানেশ্বর নগর হিন্দুদের নিকট তীর্থস্থান রূপে গণ্য ছিল। এই মন্দিরটি দখলের অভিপ্রায়ে ১০১৪ খ্রীস্টাব্দে মামুদ গজনী হইতে রওনা হন। ত্রিলোচনপাল তীর্থস্থান রক্ষার জন্য মামুদকে ৫০টি হস্তী দিতে চাহিলেন, কিন্তু মামুদ তাঁহার পরিকল্পনা পরিবর্তনে অসম্মত হন। থানেশ্বরে আসিবার পথে তাঁহাকে একজন হিন্দু রাজার প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইল এবং তিনি জয়লাভ করিলেও যুদ্ধক্ষেত্রে হিন্দুদের অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। থানেশ্বরে অবশ্য তাঁহাকে বাধা দিবার কেহই ছিল না। তিনি থানেশ্বর নগর লুণ্ঠন করিলেন; চক্রস্বামীর মূর্তি গজনীতে লইয়া গিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল।

মামুদ দুইবার কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া লৌহকোটের (বর্তমান লোহারিন) পার্বত্য দুর্গ অধিকারের বৃথা চেষ্টা করেন। ত্রিলোচনপালকে সাহায্য দানের অপরাধে সংগ্রামরাজকে শাস্তি প্রদানই ছিল প্রথম অভিযানের (১০১৫ খ্রীঃ) উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অভিযানের (১০২১ খ্রীঃ) ব্যর্থতার ফলে মামুদ কাশ্মীর জয়ের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

১০১৮ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে মামুদ বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া পঞ্জাবে উপস্থিত হন এবং গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। তিনি 'দ্রুতগতিতে পর পর অবরোধ, আক্রমণ ও বিজয়লাভ' করিয়া চলিতে লাগিলেন। এই অভিযানে তাঁহার প্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল বৃহৎ ও সুরম্য মন্দিরাদি দ্বারা শোভিত ও সুরক্ষিত মথুরা নগরী অধিকার। সেখানকার রক্ষিবাহিনী নগরী ও মন্দিরাদি রক্ষার কোন চেষ্টাই করিল না। সেখানে সঞ্চিত অপরিমেয় ধনসম্পদ হস্তগত করিবার পর বিজেতা মামুদ বহু মন্দির ধ্বংস করেন। অতঃপর তিনি কনৌজ অভিমুখে অগ্রসর হন। কনৌজ ছিল হর্ষের আমল হইতে উত্তর

ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকেন্দ্র। গুর্জর-প্রতিহার বংশের সর্বশেষ নরপতি রাজ্যপাল আক্রমণকারীর আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র পলায়ন করিলেন। সামান্য কিছুকাল অবরোধের পরই নগর অধিকৃত হইল ; বিজয়ীর সাফল্য লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডে পর্যবসিত হইয়া উঠিল। গজনীতে ফিরিবার পথে মামুদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন।

চন্দেল্ল-রাজ গণ্ড অথবা বিদ্যাধর হিন্দুদের স্বাধীনতা ও ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন হিন্দু নরপতিকে লইয়া একটি সঙ্ঘ গঠন করেন। গুর্জর-প্রতিহার নরপতি রাজ্যপাল কনৌজে পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু মিত্রশক্তি কর্তৃক তিনি পরাজিত ও নিহত হন। মামুদ মনে করিলেন চন্দেল্ল শক্তি ধ্বংস করা আবশ্যক ; ১০১৯ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে তিনি গজনী হইতে রওনা হইলেন। শাহী-রাজ ত্রিলোচনপাল পথিমধ্যে তাঁহাকে বাধা দেন। মামুদ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া চন্দেল্ল-রাজ্য অভিমুখে অগ্রসর হন। চন্দেল্ল-রাজ (গণ্ড অথবা বিদ্যাধর) বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ তাঁহার সম্মুখীন হন, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে অকস্মাৎ রাত্রির অন্ধকারে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া যান। বিশাল ও সুসজ্জিত চন্দেল্ল বাহিনী দেখিয়া মামুদ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু স্বভাবতঃই তিনি এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। যুদ্ধে কালক্ষেপ না করিয়া তিনি গজনীতে ফিরিয়া যান।

চন্দেল্লগণের শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য মামুদ ১০২২ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় ভারতে আসেন। চন্দেল্লগণের অন্যতম দুর্ভেদ্য দুর্গ কালঞ্জরের পথে তাঁহাদের জনৈক সামন্ত রাজার অধীন গোয়ালিয়র দুর্গ দখল করিবার চেষ্টায় অনর্থক তিনি শক্তিক্ষয় করেন। অতঃপর কালঞ্জর অবরোধ করা হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে চন্দেল্ল-রাজ বার্ষিক কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া নিজেকে রক্ষা করেন, এমন কি তিনি সুলতান মামুদের গুণকীর্তন করিয়া একটি কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন।

সোমনাথের বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির অধিকারই মামুদের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য অভিযান। অনহিলবাড়ার চৌলুক্যদের রাজ্যে সমুদ্র তীরে সোমনাথের মন্দির অবস্থিত ছিল। সমসাময়িক জনৈক মুসলমান লেখক বলেন, "সুলতান মামুদ যখন বিজয় অভিযান চালাইয়া অন্যান্য মন্দির ধ্বংস করিতেছিলেন তখন হিন্দুরা বলিত যে, সোমনাথ ঐসব দেবমূর্তির প্রতি বিরূপ ছিলেন ; সোমনাথ

যদি সন্তুষ্টই থাকিতেন তাহা হইলে কেহই ঐসব দেবমূর্তি ধ্বংস বা বিনষ্ট করিতে পারিত না। স্থলতান একথা শুনিয়া এই মূর্তি ধ্বংসের জন্য অভিযান চালাইবার সঙ্কল্প করেন।" এই মন্দিরে সংগৃহীত অপরিমেয় ধনরাশি সম্ভবতঃ তাঁহার লোভ ও ঔৎস্থক্যের উদ্রেক করিয়া থাকিবে। ১০২৫ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে তিনি ৩০,০০০ অশ্বারোহী এবং বহু স্বেচ্ছাসৈনিকসহ গজনী হইতে যাত্রা করেন। মুলতান এবং রাজপুতানার মরুভূমি অতিক্রম করিয়া ১০২৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি সোমনাথ মন্দিরের সম্মুখীন হন। মন্দিরটি অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হয়।

ভারতের বাহিরে মামুদের অভিযানঃ মামুদ ইরাক ও কাস্পিয়ান সাগর হইতে গঙ্গা নদী এবং আরল সাগর ও ট্রান্সঅক্সিয়ানা হইতে রাজপুতানার মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতেন। পূর্ব হইতে পশ্চিমে ইহার সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ছিল ২০০০ মাইল এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সর্বাধিক প্রস্থ ছিল ১৪০০ মাইল। কার্যতঃ তিনিই এই সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন, কেননা সিংহাসনে আরোহণের সময় তিনি কেবলমাত্র গজনী, বুস্ত ও বলখ প্রদেশের রাজা ছিলেন। এইরূপ একটি স্থবিস্তৃত সাম্রাজ্য গঠন করিতে গিয়া স্বভাবতঃই তাঁহাকে মধ্য এশিয়া, ইরান, সিস্তান ও পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডে অসংখ্য যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তবে সে সব যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী ভারতীয় ইতিহাসের পরিধি-বহির্ভূত।

মামুদের কীর্তি-কলাপঃ স্থলতান মামুদ নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারীর ন্যায় তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতেন। সাম্রাজ্যের শাসন-পরিচালনা, আইন-প্রণয়ন ও বিচারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা তাঁহারই হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি স্বভাবতঃই তাঁহার মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন ; কার্যক্ষেত্রে কেবলমাত্র পরামর্শ ই নয়, কর্তৃত্বের হস্তান্তরও অবশ্যই প্রয়োজন হইত। তবুও স্থলতানের অভিলাষ ও আদেশই ছিল আইন স্বরূপ। তাঁহার সাম্রাজ্যে তিনিই ছিলেন ন্যায়বিচারের সর্বোচ্চ আবেদনের ক্ষেত্র। তিনিই ছিলেন নিজের প্রধান সেনাপতি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং অভিযান পরিচালনা করিতেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের সকল অংশে তিনি যে স্থষ্ঠুরূপে শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন তাহাই ছিল তাঁহার শাসন-দক্ষতার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

নিঃসন্দেহেই তিনি একজন অসাধারণ সমরকুশল ব্যক্তি ছিলেন। সামরিক গুরুত্বের দিক হইতে তিনি নূতন কিছু উদ্ভাবন করেন নাই বটে, তবে উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ পুরাতন রীতিনীতির মধ্যে তিনি এক নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহার ভিতর ছিল নেতৃত্বের গুণাবলী। আরব, আফগান, তুর্কী, হিন্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির লোকজনকে লইয়া তাঁহার সৈন্যবাহিনী গঠিত ছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার সুদক্ষ নেতৃত্বে তাহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিতভাবে গড়িয়া তোলেন। কেবলমাত্র হিন্দুদের বিরুদ্ধেই নয়, মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ জাতিগুলির এবং পুরাকাল হইতে সামরিক খ্যাতিমান ইরাণের বিরুদ্ধেও তিনি তাঁহার সামরিক কৌশল ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

মামুদের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কিছু যশ ছিল। জ্ঞানানুসন্ধিৎসা ও তত্ত্বানুরাগবশতঃ তিনি সভাপণ্ডিতদের ধর্ম ও সাহিত্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। তিনি বহু মুসলমান পণ্ডিত ও কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ; তন্মধ্যে আল-বীরুণী, ফিরদৌসী, আনসারি ও ফারুক্কির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রাজসভা মুসলমান জগতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত পণ্ডিতবর্গের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল ; মুসলমান জগতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তিনি বহু সাহিত্যগ্রন্থও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গজনীতে তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

মামুদ যথার্থ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। মুসলমান প্রজাদিগকে তিনি কখনও নৈষ্ঠিক সুন্নি মতবাদ হইতে বিচ্যুত হইতে দিতেন না। কার্মাথিয়ানদের নির্যাতন ছিল এই নীতিরই স্বাভাবিক পরিণতি। তবে হিন্দুদের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা হইত। গজনীতে হিন্দুদের জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল এবং তাহাদিগকে নির্বিবাদে তাহাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করিতে দেওয়া হইত। ভারতের হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করা তাঁহার সামরিক কর্মসূচীর অঙ্গীভূত ছিল, পুরোহিতদের সঞ্চিত অর্থের প্রতি লিপ্সাই প্রধানতঃ তাঁহাকে এ কাজে প্রলুব্ধ করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তারের জন্য মামুদ কোনরূপ নিয়মিত চেষ্টা করেন নাই ; ভৌগোলিক ও সামরিক কারণে ঘটনাক্রমেই শাহী-রাজ্য অধিকৃত হইয়াছিল। এই রাজ্যটি যতদিন স্বাধীন ছিল, ততদিন উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল

গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের দিকে মামুদ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। শাহী বংশের রাজাদের ক্ষমতা বিনষ্ট হইলে মামুদ তাঁহাদের রাজ্য স্বীয় শাসনাধীনে আনেন এবং এইভাবে তাঁহার পক্ষে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ নিরাপদ হইয়া ওঠে। মামুদ হয়ত একথা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সাম্রাজ্য ইতিমধ্যেই সুবিস্তৃত হইয়া প্রায় আয়ত্তের বাহিরে আসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি ইহার সহিত যুক্ত হইলে সাম্রাজ্যের পরিচালনা একেবারে অসাধ্য হইয়া পড়িত। তাঁহার সাম্রাজ্য বিশাল আকার ধারণ করায় শাসনকার্যে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহেই সচেতন ছিলেন। এই কারণে সাম্রাজ্যের ঐক্য সংরক্ষণের পরিবর্তে তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া দিয়া যান। অধিকন্তু, চন্দেল্ল ও চৌলুক্যদের ন্যায় শক্তিশালী রাজবংশের আধিপত্য সম্পূর্ণ বিলোপ করা যে কিরূপ কঠিন ছিল তাহাও তিনি নিশ্চয় উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিচ্ছিন্ন নগর ও মন্দিরগুলির ধ্বংসসাধন অপেক্ষা তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করা আরও অধিক কষ্টকর ছিল। তথাপি ভারতে তুর্কীশক্তির প্রতিষ্ঠাতা এবং মহম্মদ ঘুরী ও বাবরের পথপ্রদর্শক বলিয়া মামুদকে যথার্থ ই অভিহিত করা যাইতে পারে।

মামুদের উত্তরাধিকারিগণঃ গজনী ও লাহোরের ইয়ামিনি বংশঃ সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মাসুদ ও মহম্মদের মধ্যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মাসুদ যুদ্ধে জয়লাভ করেন; মহম্মদকে অন্ধ ও কারারুদ্ধ করা হয়। মাসুদের রাজত্বকালে (১০৩০-১০৪০ খ্রীস্টাব্দ) মুসলমান কর্মচারীদের অবাধ্যতা ও অযোগ্যতার ফলে পঞ্জাবের শাসন-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। মামুদের হিন্দুমন্ত্রী তিলক বিশ্বস্তভাবে মাসুদের অধীনে কাজ করেন। ১০৪০ খ্রীস্টাব্দে তিনি মার্ভের নিকট সেলজুকদের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং লাহোর অভিমুখে পলায়ন করেন। পথিমধ্যে তাঁহার সৈন্যবাহিনী তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার অন্ধ ভ্রাতা নূতন আমীর মহম্মদের হস্তে তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করে; মহম্মদের পুত্রের হস্তে তিনি নিহত হন। অত্যল্পকাল পরে মহম্মদ ও তাঁহার পুত্রগণ পরাজিত হন এবং মাসুদের পুত্র মউদুদ তাহাদিগকে হত্যা করেন। মউদুদ (১০৪০-১০৪৯ খ্রীস্টাব্দ) দক্ষ শাসক ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর একে একে

চারিজন রাজা রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বকাল যেমন স্বল্পস্থায়ী তেমনি অনুজ্জ্বল ছিল। সেলজুকদের ক্রমবর্ধিত শক্তি গজনীর রাজবংশের পক্ষে স্থায়ী বিপদস্বরূপ ছিল। ঘুর রাজ্যের রাজগণও শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত ঘুর রাজ্য হইতেই চরম আঘাত উপস্থিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহম্মদ ঘুরী

ঘুরের অভ্যুত্থানঃ গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে ঘুর নামক ক্ষুদ্র রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। সেখানে যেসব রাজা রাজত্ব করিয়াছেন তাঁহারা সাধারণতঃ আফগান বলিয়া পরিচিত ; কিন্তু বর্তমান কালের কয়েকজন ঐতিহাসিক তাঁহাদিগকে পূর্ব পারস্যের অধিবাসীরূপে বর্ণনা করেন। ১০০৯ খ্রীস্টাব্দে সুলতান মামুদ এই রাজ্যটি স্ববশে আনয়ন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গজনী ও সেলজুক শক্তির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া সংঘর্ষ চলিতে থাকে ; ইহার ফলে ঘুর রাজ্যের রাজাদের পক্ষে তাঁহাদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ঘুর ও গজনী রাজ্যের রাজাদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া উঠে। ১১৭৩ খ্রীস্টাব্দে গিয়াস্উদ্দীন মহম্মদ ঘুরী গজনী অধিকার করিয়া তাঁহার ভ্রাতা মুইজউদ্দীন ঘুরীকে গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। দুই ভ্রাতার মধ্যে সদ্ভাব কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই ; গিয়াস্উদ্দীনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতার আনুগত্য ও শ্রদ্ধা অটুট ছিল। শক্তি ও খ্যাতির দিক হইতে গিয়াস্উদ্দীন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার তুলনায় অনেক নীচে ছিলেন, সুতরাং মুইজউদ্দীন ইচ্ছা করিলে তাঁহার আনুগত্য অস্বীকার করিতে পারিতেন।

গজনী শক্তির বিলুপ্তিঃ মুইজউদ্দীন ভারতের ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত। তিনি যেন বিজেতা রূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘুর ও গজনীর রাজাদের মধ্যে চিরন্তন বিরোধের ফলে স্বভাবতঃই তাঁহার দৃষ্টি লাহোরের দুর্বল গজনী বংশীয় রাজাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মনে হয় ভারত জয় করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য রূপে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এজন্য হিন্দুস্থানের প্রবেশদ্বার স্বরূপ পঞ্জাব অধিকার করার প্রয়োজন ছিল।

মহম্মদ ঘুরী ১১৭৯ খ্রীস্টাব্দে পেশোয়ারের গজনীবংশীয় শাসনকর্তাকে পরাজিত করিয়া এই গুরুত্বপূর্ণ নগরটি অধিকার করেন। ১১৮১ খ্রীস্টাব্দে জম্মুর হিন্দুরাজার আমন্ত্রণে তিনি লাহোর আক্রমণ করেন। খসরু শাহ পরাজয় স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন এবং তাঁহার পুত্রকে জামিন স্বরূপ অর্পণ করেন। ১১৮৫ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ শিয়ালকোট অধিকার করিয়া তথায় একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। তাঁহার ঘুরে প্রত্যাবর্তনের পর খসরু শাহ এই দুর্গটি দখল করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১১৮৬ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ পুনরায় ভারতে আসেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া খসরু শাহকে বন্দী ও লাহোর অধিকার করেন। গজনীবংশীয় হতভাগ্য রাজা এবং তাঁহার পুত্রকে ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে হত্যা করা হয়।

মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানঃ মহম্মদের প্রথম ভারত অভিযান (১১৭৫ খ্রীঃ) ছিল মুলতানের বিরুদ্ধে। তিনি মুলতান নগর দখল করিয়া ইসমালিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মদ্রোহীদিগকে দমন করেন। তারপর শঠতা বলে শক্তিশালী উচ্ দুর্গটিও তাঁহার হস্তগত হয়। শোনা যায় উচের হিন্দুরাজার পত্নী আক্রমণকারীর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া তাঁহার স্বামীকে হত্যা এবং নগরী সমর্পণ করেন।

১১৭৮ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ গুজরাট অভিযান করিয়া ব্যর্থমনোরথ হন। ১১৮২ খ্রীস্টাব্দে তিনি সিন্ধুপ্রদেশের নিম্নতর অঞ্চলের সুম্রাবংশীয় রাজাকে তাঁহার প্রভুত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য করেন।

গজনীর রাজবংশের পতনের পর মহম্মদ শাকম্ভরীর চৌহান-রাজ্যের সম্মুখীন হন। চৌহানবংশীয় ৩য় পৃথ্বীরাজ ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন এবং দিল্লী ও আজমীরের প্রভুরূপে স্বভাবতঃই তিনি ছিলেন মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে গঙ্গাযমুনা উপত্যকার রক্ষক। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে উত্তর ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। হানসি, সামানা (পঞ্জাবের পাতিয়ালার অন্তর্গত) ও কুহ্‌রাম সহজেই অধিকৃত হইল। মহম্মদ আজমীঢ় অভিমুখে অগ্রসর হইলেন ; নগরটি অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হইল। বিজেতা "মন্দিরসমূহের স্তম্ভ ও ভিত্তি ধ্বংস করিয়া সেখানে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন ; ইসলামের উপদেশ ও শরীয়তের বিধি নির্দেশ উদ্ঘাটিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।" তবে সহরটি মুসলমান শাসনকর্তার বসবাসের পক্ষে সম্ভবতঃ তখনও নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায়, পৃথ্বীরাজের এক পুত্রের হস্তে উহার ভার ন্যস্ত করা হয়। দিল্লী

তোমর রাজপুতদেরই শাসনাধীন থাকে। মহম্মদ অধিকৃত অঞ্চলের শাসনভার তাঁহার দক্ষ ও বিশ্বস্ত ক্রীতদাস কুতবউদ্দীন আইবকের হস্তে অর্পণ করিয়া ভারত ত্যাগ করেন।

৩য় পৃথ্বীরাজের পতনের পর ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি প্রধানতঃ কুতবউদ্দীনের সামরিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে তিনি বরন ও মীরাট অধিকার করেন। ১১৯৩ খ্রীস্টাব্দে তোমরগণের নিকট হইতে দিল্লী অধিকার করিয়া সেখানে বিজয়ীদের মূল কর্মকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এই সময় হইতেই আমরা অষ্টম শতাব্দীতে তোমরগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই অজ্ঞাত নগরীর গুরুত্ব অনুধাবন করিতে পারি। ১১৯৪ খ্রীস্টাব্দে কোল (আলীগড়) অধিকৃত হয়। ঐ বৎসরই মহম্মদ পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং গাহড়বাল বংশীয় শক্তিশালী রাজা জয়চন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। চান্দবারের (যমুনাতীরে কনৌজ ও ইটাহ্‌-এর মধ্যে অবস্থিত) তুমুল যুদ্ধে জয়চ্চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হন। ঐশ্বর্যময়ী অস্‌নি ও বারাণসী নগরী দুইটি লুণ্ঠিত হয়, কিন্তু ১১৯৮-৯৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কনৌজ অধিকৃত হয় নাই। আজমীঢ় পুনরধিকারের জন্য রাজপুতরা কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১১৯৫ খ্রীস্টাব্দে কুতবউদ্দীন সেখানে একজন মুসলমান কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন ; পৃথ্বীরাজের পুত্রকে রণথম্ভোরে নিযুক্ত করা হয়। মহম্মদ ১১৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বেয়ানা দখল করেন এবং গোয়ালিয়রের হিন্দু রাজাকে করদানে বাধ্য করেন। আজমীঢ়ের চতুর্দিকে বসবাসকারী পরমারগণ ১১৯৬ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহ করে এবং তাহাদের সাহায্যার্থে গুজরাটের ২য় ভীম এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কুতবউদ্দীন আজমীঢ়ে চলিয়া যান এবং গজনী হইতে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী আসিতেছে এই সংবাদ পাইয়া অবরোধকারীরা পলায়ন না করা পর্যন্ত তিনি আজমীঢ় নগরে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকেন। অতঃপর কুতবউদ্দীন গুজরাট অভিমুখে অগ্রসর হন ; আবু্ পর্বতের পাদদেশে ভীমের সৈন্যবাহিনীকে পরাভূত করিয়া পুনরায় তিনি অনহিলবাড়া লুণ্ঠন করেন। ১২০২ খ্রীস্টাব্দে তিনি কালঞ্জর অধিকার করিয়া চন্দেল্লরাজ পরমর্দিকে 'গলদেশে বশ্যতার শৃঙ্খল ধারণে' বাধ্য করেন। কিন্তু তিনি যে সকল শর্ত মানিয়া লইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মন্ত্রী মানিয়া চলেন নাই। কুতবউদ্দীন কালঞ্জর

অধিকার করিয়া নগর লুণ্ঠন করিলেন ; ৫০,০০০ বন্দীকে আজীবনের মতো দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হইল, এবং মন্দিরগুলিকে মসজিদে পরিণত করা হইল। ইহার পর বিখ্যাত মহোবা নগরও অধিকৃত হয়।

বিহার ও বাঙ্গলা দখল : কুতবউদ্দীন যখন গঙ্গা-যমুনার উপত্যকায় অধিকার বিস্তারে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন মহম্মদ বক্তিয়ার খলজী নামে একজন অসমসাহসিক মুসলমান বীর ভারতের পূর্বাঞ্চলে তুর্কী প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকেন। ভারতবর্ষে তাঁহার কর্মজীবনের সূত্রপাত হয় অযোধ্যার শাসনকর্তার অধীনে একজন সামান্য সেনানায়ক রূপে। উত্তর-প্রদেশের মীর্জাপুর জেলায় তিনি কয়েকটি জায়গীর উপভোগ করিতেন। দক্ষিণ বিহার তখন একরূপ অরক্ষিত অবস্থায় ছিল এবং স্বভাবতঃই উহার প্রতি এই দুর্ধর্ষ বীরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি 'সুরক্ষিত বিহার নগর' দখল করিলেন। প্রায় সমসাময়িক কালের জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, "ঐ স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ। ঐসব ব্রাহ্মণেরা সকলেই মস্তক মুণ্ডন করিত। তাহাদের সকলকেই নিধন করা হয়। তথায় বহু গ্রন্থ ছিল এবং সে সব গ্রন্থ মুসলমানদের নজরে আসিলে তাহারা সে সব গ্রন্থের তাৎপর্য সম্পর্কে সংবাদ লাভের জন্য কয়েকজন হিন্দুকে ডাকিয়া পাঠায় ; কিন্তু হিন্দুদের সকলকেই হত্যা করা হইয়াছিল। এইসব গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সহিত পরিচিত হইলে পর জানিতে পারা যায় যে সমগ্র দুর্গ ও সহরটিই ছিল একটি বিদ্যায়তন, হিন্দুস্থানের ভাষায় তাহারা বিদ্যায়তনকে বিহার বলিয়া থাকে।" মনে হয় এই সময় দক্ষিণ বিহারে কোন শক্তিশালী শাসন-কর্তৃপক্ষ ছিল না, কেন-না কোন রাজার সহিত আক্রমণ-কারীদের যুদ্ধের কোনপ্রকার বিবরণ পাওয়া যায় না। পাল রাজবংশ সম্ভবতঃ বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেন-রাজ্যের অবস্থান ছিল পূর্বদিকে। সম্ভবতঃ ১১৯৯-১২০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ বিহারে সাফল্যের সহিত এই সকল অভিযান পরিচালিত হয় ; ইহার পর বক্তিয়ার খলজী বঙ্গদেশে অভিযান করিয়া 'নূদীয়া' অধিকার করেন। 'নূদীয়া' বা নবদ্বীপ সেন রাজাদের স্থায়ী রাজধানী ছিল না, কোন দুর্গ বা ইষ্টকনির্মিত প্রাচীরের দ্বারা ইহা সুরক্ষিত ছিল না। গঙ্গা নদীর সন্নিকটে অবস্থিত এই সহরে বেশীর ভাগ গৃহই ছিল বাঁশ দিয়া তৈয়ারী। পশ্চিমদিক হইতে সহরটিতে প্রবেশের সাধারণ পথ ছিল রাজমহলের নিকট তেলিয়াগড়ীর সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া বিস্তৃত। কিন্তু বক্তিয়ার খলজী

ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের মধ্য দিয়া চুপিচুপি অগ্রসর হন এবং ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশী ১৮ জন অশ্বারোহী লইয়া সহরে প্রবেশ করেন। আর একদল অশ্বারোহী পশ্চাৎ দিক হইতে অগ্রসর হইয়া অরক্ষিত সহরের দুই প্রান্তে যুগপৎ আক্রমণ চালায়। লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। পূর্ববঙ্গ আরও প্রায় শতাব্দীকাল সেন বংশের শাসনাধীন ছিল।

'নূদীয়া' হইতে বক্তিয়ার খলজী বাঙ্গালার ঐতিহাসিক রাজধানী গৌড়ে হানা দেওয়ার জন্য দ্রুত অগ্রসর হন। বরেন্দ্রভূমি জয় করিবার পর মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে বর্তমান মালদহ, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম (পশ্চিম বঙ্গ) জেলায় তিনি তাঁহার প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ইহার পর তিনি তিব্বত অভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁহার উদ্দেশ্য অথবা গন্তব্যস্থল কিছুই সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায় না, তবে উত্তর-পূর্ব অভিমুখে যাত্রা করিয়া তিনি দুর্গম গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হন। কিন্তু কোন ফল লাভ হয় নাই। ফিরিবার পথে কামরূপের রাজার সহিত সংঘর্ষের ফলে তাঁহার সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়। তিনি কোনপ্রকারে তাঁহার রাজধানী দেবকোটে (বর্তমান দিনাজপুর সহরের নিকট) ফিরিয়া আসেন। অল্প কিছুদিন পর এইস্থানেই আলী মর্দান খলজী নামক তাঁহার জনৈক কর্মচারীর হস্তে তিনি নিহত হন (১২০৬ খ্রীস্টাব্দ) বাঙ্গালার শাসনকর্তার পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার জন্য কিছুকাল পরে তিনি কুতবউদ্দীনকে সম্মত করাইয়াছিলেন।

মহম্মদ ঘূরীর কৃতিত্বঃ ১২০৫ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ তুর্কোম্যানদের হস্তে নিদারুণ ভাবে পরাজিত হন। ভারতে এই সংবাদ পৌছিলে খোকর এবং লবণ পর্বতের উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য কতকগুলি উপজাতি বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। মহম্মদ এবং কুতবউদ্দীন সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু গজনীতে ফিরিবার পথে হয় খোক্কর অথবা ইসমাইলী সম্প্রদায়ের শিয়াদের হস্তে সিন্ধু নদের তীরে তিনি নিহত হন (১২০৬ খ্রীস্টাব্দ)।

এশিয়ার মধ্যযুগের ইতিহাসে মহম্মদ ঘূরী ছিলেন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বল্প সম্পদের সাহায্যে তিনি যে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা আফগানিস্থান হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি নিঃসন্দেহেই একজন দক্ষ সেনানায়ক ছিলেন—অসাধারণ রণনৈপুণ্য ব্যতীত সেকালে কেহ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন

না—কিন্তু বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকদের নিকট তাঁহার রাজনৈতিক গুণাবলীই অধিকতর আকর্ষণীয়। ভারতের রাজনৈতিক দুর্বলতা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং শিথিল কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নির্ভীকতার সহিত একের পর এক আঘাত হানিতে থাকেন। ধনসম্পদের লিপ্সায় তাঁহার সুস্পষ্ট দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় নাই এবং এই কারণে তিনি আক্রমণকারীর পরিবর্তে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতারূপে ইতিহাসে পরিচিত রহিয়াছেন। শাসন-ব্যবস্থা সংগঠনের সময় তিনি পান নাই; রাজ্য জয়ের কাজ সম্পন্ন হইতে না হইতেই গুপ্তঘাতকের হস্তে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হয়। অধিকন্তু, ভারতের প্রতি তিনি মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই, খুরাসানের বিষয় লইয়া তিনি প্রায়ই ব্যাপৃত থাকিতেন। সুতরাং তাঁহাকে ভারতীয় রাজ্যের ভার 'সামরিক সামন্তদের' হস্তে ন্যস্ত রাখিতে হইয়াছিল; হিন্দু সামন্ত রাজা ও জমিদারগণের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ এবং বিদ্রোহ দমনই ছিল তাঁহাদের প্রাথমিক কর্তব্য। যাহাদের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত এত অল্পসময়ের মধ্যে উত্তরভারতে আধিপত্য স্থাপন সম্ভব হইত না সেই বক্তিয়ার খলজীর ন্যায় সামরিক অভিযানকারিগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই সম্ভবতঃ এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন অপরিহার্য ছিল। প্রতিনিয়ত যুদ্ধ ও সংঘর্ষের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও মহম্মদ চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় চারি শতাব্দীকাল পরে ফিরিস্তা তাঁহাকে "ন্যায়পরায়ণ, ধর্মভীরু এবং প্রজাবৎসল সম্রাট"রূপে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিল্লীর দাসরাজগণ

কুতুবউদ্দীন আইবক (১২০৬-১০)ঃ মহম্মদ ঘূরীর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার পরিবারের বামিয়ান শাখার আলাউদ্দীন গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তিনি গিয়াস-উদ্দীনের পুত্র মামুদ কর্তৃক বিতাড়িত হন। তাঁহার সাম্রাজ্যের ভারতীয় অংশ সম্ভবতঃ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল।

প্রায় সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দীন বলেন যে, তিনি তাঁহার ক্রীতদাস-গণকে 'কয়েক সহস্র পুত্র' বলিয়া মনে করিতেন। কুতবউদ্দীন স্বীয় কর্মদক্ষতায় প্রভুর অনুরাগভাজন হন এবং তাঁহার প্রতিনিধিরূপে তিনি ভারতের শাসনকর্তা ছিলেন। সুতরাং মহম্মদ ঘূরীর মৃত্যু হইলে কুতবউদ্দীন আইবকই ঘূর সাম্রাজ্যের ভারতীয় অংশের অধীশ্বররূপে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তুর্কী আমীর এবং সেনানায়কগণ তাঁহার 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ অনুমোদন করেন এবং ঘূর রাজ্যের অধিপতিও তাঁহাকে 'সুলতান' বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের (১২০৬ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে জুন) সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর সুলতানী রাজত্বের আরম্ভ হয়।

সেকালের অনেক বিশিষ্ট মুসলমানের ন্যায় কুতবউদ্দীন আইবকও[১] প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার প্রথম প্রভু নিশাপুরের কাজী তাঁহাকে পুঁথিগত বিদ্যা এবং অশ্বারোহণ ও অস্ত্রচালনায় সুশিক্ষিত করিয়া তোলেন। কাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট তাঁহাকে বিক্রয় করে এবং সে তাঁহাকে গজনীতে লইয়া গিয়া মহম্মদ ঘূরীর নিকট পুনরায় বিক্রয় করিয়া দেয়। তাঁহার যোগ্যতা ও গুণাবলীর জন্য মহম্মদের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ক্রমান্বয়ে তিনি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি হিন্দুস্থানে প্রভুর প্রতিনিধি-পদে নিযুক্ত হন।

মহম্মদ ঘূরীর অপর দুইজন ক্ষমতাশালী ক্রীতদাস ছিলেন মুলতান ও উচের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দীন কুবাচা এবং কীরমানের শাসনকর্তা তাজউদ্দীন ইলদিজ। প্রভুর মৃত্যুর পর তাজউদ্দীন ইলদিজ গজনী অধিকার করেন, কিন্তু খোয়ারিজমের শাহের চক্রান্তে ১২০৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি গজনী নগরী ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর কুতবউদ্দীন গজনী অধিকার করেন। তবে একমাসের মধ্যেই গজনীর অধিবাসিগণ কুতবউদ্দীনের সৈন্যদের দুর্ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইয়া তাজউদ্দীনকে ফিরিয়া আসার জন্য গোপনে আমন্ত্রণ করে। তাজউদ্দীন অতর্কিত

---

১ এই শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট বুঝা যায় না। কোন কোন লেখক বলেন যে, ইহার অর্থ 'ক্ষীণাঙ্গুল'। স্যার উলস্‌লে হেইগ বলেন যে, এই শব্দটির অর্থ 'চন্দ্রাধিপতি' এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় তাঁহার জন্ম হইয়াছিল একথা বুঝা যাইতে পারে, অথবা ইহার অর্থ 'চন্দ্রবদন'। সৌন্দর্যের উপমা হিসাবে প্রাচ্যে এই শব্দটি প্রচলিত থাকিলেও আমরা জানিতে পারি যে, তিনি সুদর্শন ছিলেন না। আর একজন লেখকের মতে, কুতবউদ্দীনের প্রকৃত নাম ছিল আইবক।

আক্রমণে গজনী পুনরধিকার করেন এবং কুতবউদ্দীন আক্রমণ প্রতিরোধ না করিয়াই লাহোরে ফিরিয়া আসেন।

এইরূপ অপমানজনক ভাবে পশ্চাদপসরণের কিছুকাল পরেই কুতবউদ্দীন চৌগান (পোলো) খেলার সময় ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন (নভেম্বর, ১২১০ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁহার স্বল্পকালীন রাজত্বকালে তিনি এমন কিছুই করেন নাই যাহাতে তাঁহার খ্যাতি অধিকতর বিস্তার লাভ করে। তিনি কোন নূতন রাজ্য জয় করেন নাই, কিম্বা সুষ্ঠুতর শাসন-প্রণালী প্রবর্তনের জন্যও তিনি কোনপ্রকার চেষ্টা করেন নাই। সমসাময়িক মুসলমান লেখকগণ তাঁহার উদার শাসন-ব্যবস্থা ও ন্যায়পরতার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই ধরণের প্রশংসা বোধকরি চিরাচরিত রীতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি যে উদার ও দানশীল ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কেননা তাঁহাকে সচরাচর 'লাখবক্স' (লক্ষদাতা) বলিয়াই অভিহিত করা হইয়া থাকে। দিল্লী ও আজমীঢ়ে তাঁহার নির্মিত দুইটি মসজিদ্ ইসলামের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও স্থাপত্য-শিল্পের প্রতি অনুরাগের পরিচয়।

ইলতুৎমিস (১২১১-৩৬): কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পর আরাম শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি আইবকের দত্তক পুত্র ছিলেন। লাহোরের তুর্কী ওমরাহগণ তাঁহাকে সুলতান রূপে মনোনীত করেন। কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পর গোলযোগ পরিহারের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহারা উদ্‌গ্রীব ছিলেন। দিল্লীর ওমরাহগণ আরাম শাহের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন নাই, পক্ষান্তরে তাঁহারা বদাউনের শাসনকর্তা ও কুতবউদ্দীনের জামাতা ইলতুৎমিসকে সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য আহ্বান জানান। ইল্‌তুৎমিস দিল্লী যাত্রা করেন এবং আরাম শাহকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া ১২১১ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইল্‌তুৎমিস উচ্চবংশের তুর্কী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে বাল্যকালেই দাসরূপে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। কুতবউদ্দীন তাঁহাকে ক্রয় করেন। স্বীয় গুণ ও কর্মদক্ষতায় তিনি কুতবউদ্দীনের প্রিয়পাত্র হন। দিল্লীর ওমরাহগণ তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবার পূর্বে তিনি পর পর গোয়ালিয়র, বরন (বুলন্দ শহর) ও বদাউনের জায়গীরদারী করিয়া আসিয়াছেন।

ইলদিজ ও কুবাচার পতন: আরাম শাহকে পরাজিত

করিয়া ইল্‌তুৎমিস এক বিঘ্নসঙ্কুল উত্তরাধিকার লাভ করেন। কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পর আলী মর্দান খল্‌জী দিল্লীর বশ্যতা স্বীকারে অসম্মত হন। নাসিরউদ্দীন কুবাচা মুলতানে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া লাহোর অধিকারের পর সমগ্র পঞ্জাবে তাঁহার ক্ষমতা বিস্তারের পরিকল্পনা করেন। মহম্মদ ঘূরীর উত্তরাধিকারী রূপে তাজউদ্দীন ইলদিজ ভারতের উপর কর্তৃত্বের দাবী করেন এবং ইল্‌তুৎমিসকে তাঁহার প্রতিনিধি রূপে গণ্য করিতে চাহেন। এমন কি, উত্তর ভারতের কয়েকজন ক্ষমতাশালী জায়গীরদারও নূতন সুলতানের আধিপত্য প্রায় প্রকাশ্যেই অস্বীকার করিতে থাকেন।

ইল্‌তুৎমিস সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সহিত অগ্রসর হইতে থাকেন। প্রথমে তিনি বিক্ষুব্ধ সামরিক জায়গীরদারগণকে স্বীয় ক্ষমতাধীনে আনেন। দিল্লী, বদাউন, অযোধ্যা ও বারাণসী প্রভৃতি জেলায় এবং শিবালিক পর্বত অঞ্চলে তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। অতঃপর তিনি অধিকতর শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত বল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার অবসর লাভ করেন।

১২১৫ খ্রীস্টাব্দের কিছু পূর্বে তাজউদ্দীন লাহোর অধিকার করিয়া পঞ্জাবের বৃহত্তর অংশে তাঁহার ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। ১২১৫ খ্রীস্টাব্দে খোয়ারিজমের শাহ তাঁহাকে গজনী হইতে বিতাড়ন করেন। তিনি লাহোরে আসিয়া পুনরায় দিল্লীর উপর আধিপত্যের দাবী করেন। ১২১৬ খ্রীস্টাব্দে ইল্‌তুৎমিস তাঁহাকে তরাইনের সন্নিকটে এক যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন। তাজউদ্দীনকে বদাউনে প্রেরণ করা হয় এবং কিছুকাল পরে সেখানে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। লাহোর নাসিরউদ্দীনের দখলে ছিল, ১২১৭ খ্রীস্টাব্দে ইল্‌তুৎমিস লাহোর অধিকার করেন। নাসিরউদ্দীনের ক্ষমতা সিন্ধুতেই সীমাবদ্ধ রহিল, কিন্তু মঙ্গোলদের আক্রমণে তাঁহার ক্ষমতা দুর্বল হইয়া পড়ে। ১২২৮ খ্রীস্টাব্দে ইল্‌তুৎমিস মুলতান এবং উচ্‌ অধিকার করেন। নাসিরউদ্দীন সিন্ধু নদে প্রাণ বিসর্জন দেন।

মঙ্গোল-ভীতি: ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ১২২১ খ্রীস্টাব্দে প্রথম মঙ্গোল-ভীতি পরিলক্ষিত হয়। মঙ্গ শব্দ হইতে মঙ্গোল নামের উৎপত্তি হইয়াছে। মঙ্গ শব্দের অর্থ সাহসী। মঙ্গোলরা ছিল নিষ্ঠুর বর্বর জাতি।

বিখ্যাত কবি আমীর খসরু একবার মঙ্গোলদের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সব দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন:

"রণোন্মত্ত ও দুর্ধর্ষ অবস্থায় ইস্পাতের (ন্যায় কঠিন) দেহ কার্পাসবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত। তাহাদের পশমের শিরস্ত্রাণে পরিবেষ্টিত অগ্নিবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হইত পশম বুঝি ধ্বকধ্বক করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। তাহারা মস্তক মুণ্ডন করিত।......রৌপ্যাধারে দু'টি ফাটলের মতো ছিল তাহাদের চক্ষু, চক্ষুগোলক ছিল শৈলগাত্রে গভীর ফাটলের মধ্যে অবস্থিত কঠিন ধূসরবর্ণ প্রস্তরগোলকের মতো। তাহাদের শরীর হইতে গলিত শব অপেক্ষাও বিশ্রী দুর্গন্ধ নির্গত হইত, তাহারা পৃষ্ঠদেশ অবধি তাহাদের মস্তক নত করিয়া রাখিত। দামামার সিক্ত চর্মের ন্যায় তাহাদের দেহত্বক ছিল কুঞ্চিত ও বলিরেখাঙ্কিত। তাহাদের নাসারন্ধ্র ছিল বিশাল এবং এক গাল হইতে আর এক গাল পর্যন্ত বিস্তৃত। তাহাদের মুখও একদিক হইতে আর একদিক পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাহাদের নাসিকারন্ধ্র পরিত্যক্ত কবর অথবা পুতিগন্ধময়জলপূর্ণ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায়। কুৎসিত দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া তাহারা শূকর ও কুকুর খাইত; পান করিত পয়ঃপ্রণালীর জল ও আহার করিত আস্বাদহীন ঘাস।"

মঙ্গোলগণ ভারতে যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা কবির নিম্নোক্ত বিবৃতিতে পরিস্ফুট হইয়াছে:

"আমাকেও বন্দী করা হইয়াছিল এবং আমাকে তাহারা হত্যা করিবে এই ভয়ে আমার শরীরে এক বিন্দু রক্ত ছিল না।"

চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে মঙ্গোলগণ এশিয়ার মধ্যে প্রবলতম রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। তিনি চীন, মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম-এশিয়া বিধ্বস্ত করেন। অশ্বক্ষুরের নীচে দলিত করিবার জন্য কোরান নিক্ষেপ করিয়া তিনি মুসলমানদের সন্ত্রস্ত করিয়া তোলেন। তিনি খোয়ারিজম্ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া সেই রাজ্যের সর্বশেষ শাহের উত্তরাধিকারী জালালউদ্দীনকে লাহোরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। ইল্‌তুৎমিসের সৌভাগ্যবশতঃ ১২২২ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুকুশের মধ্য দিয়া চেঙ্গিস খাঁ ফিরিয়া যান। চেঙ্গিস খাঁ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন এই ধরণের কাজ ইল্‌তুৎমিস সতর্কতার সহিত পরিহার করেন। সুতরাং ইল্‌তুৎমিসের সাহায্য না পাইয়া জালালউদ্দীন খোক্করদের সহিত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং তাহাদের সহযোগিতায় নাসিরউদ্দীন কুবাচার নিকট হইতে বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। অতঃপর তিনি সিন্ধু এবং গুজরাটের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলি লুণ্ঠন করিয়া ১২২৪ খ্রীস্টাব্দে ভারত হইতে চলিয়া

যান ও পারস্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। মঙ্গোলগণ সিন্ধু ও পশ্চিম-পঞ্জাব লুণ্ঠন করে, কিন্তু পঞ্জাবের প্রখর উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা আর ভারতের মধ্যস্থলে অগ্রসর হয় নাই। কুবাচার পতনের পর ইল্‌তুৎমিসের রাজ্যের সঙ্গে আফগানিস্থান হইতে অভিযানকারী মঙ্গোলদের সরাসরি যোগাযোগ ঘটে।

ইল্‌তুৎমিসের রাজ্যজয়ঃ মঙ্গোলদের বিভীষিকা হইতে মুক্ত এবং জালালউদ্দীনের হস্তে নাসিরউদ্দীন কুবাচার পরাভবে আনন্দিত হইয়া ইল্‌তুৎমিস বাঙ্গালার প্রতি দৃষ্টি দিলেন। আলী মর্দান খলজীর নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারে কতিপয় মুসলমান ওমরাহ বিদ্রোহী হইয়া ওঠেন এবং তাঁহাকে হত্যা করিয়া হিসামউদ্দীন আয়াজ নামে একজন দক্ষ কর্মচারীকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। হিসামউদ্দীন ১২১৩ খ্রীস্টাব্দের দিকে স্থলতান গিয়াসউদ্দীন খলজী উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি জাজনগর, কামরূপ, ত্রিহুত ও 'বঙ্গ' স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ১২২৫ খ্রীস্টাব্দে ইল্‌তুৎমিস তাঁহার বিরুদ্ধে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলে, গিয়াসউদ্দীন বিনা প্রতিরোধেই বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি স্থলতান উপাধি ত্যাগ করেন, দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়া লন এবং বিহারের উপর তাঁহার দাবী পরিত্যাগ করিয়া ইল্‌তুৎমিসকে কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। ইল্‌তুৎমিস এইসব সর্ত গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াসউদ্দীন পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বিহার অধিকার করেন। স্থলতানের পুত্র নাসিরউদ্দীন মামুদ তখন অযোধ্যার শাসনকর্তা ছিলেন। ১২২৭ খ্রীস্টাব্দে নাসিরউদ্দীন বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন এবং লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়া গিয়াসউদ্দীনকে হত্যা করেন। তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, কিন্তু ১২২৯ খ্রীস্টাব্দে অকাল মৃত্যুতে তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। গিয়াসউদ্দীনের দলভুক্ত ইক্তিয়ারউদ্দীন বল্‌কা বাঙ্গালা দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব অধিকার করেন। ইল্‌তুৎমিস ১২৩০-৩১ খ্রীস্টাব্দে বল্‌কাকে পরাজিত ও নিহত করেন। বঙ্গদেশ দিল্লীর অধীনে আসে, এবং মালিক আলাউদ্দীন জানি শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

রণথম্ভোরের বিখ্যাত দুর্গ জনৈক চৌহান রাজার অধিকারভুক্ত ছিল। ইল্‌তুৎমিস ১২২৬ খ্রীস্টাব্দে রণথম্ভোর এবং পর বৎসর মান্দোর (মারোয়াড়ের

অন্তর্গত) অধিকার করেন। ১২৩২ খ্রীস্টাব্দে তিনি মঙ্গলদেব নামক একজন হিন্দুরাজার নিকট হইতে গোয়ালিয়র অধিকার করিলেন। ১২৩৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি মালব আক্রমণ করিয়া ভিলসা ও উজ্জয়িনী সহর লুণ্ঠন করেন। উজ্জয়িনীর বিখ্যাত মহাকাল মন্দিরটি ধ্বংস করা হয়, কিন্তু রাজ্য অধিকার করা হয় নাই।

ইল্‌তুৎমিসের কৃতিত্ব: ইল্‌তুৎমিস ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। ১২২৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি সানন্দে বাগদাদের খলিফা প্রদত্ত সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন। ইসমাইলী সম্প্রদায়ের কতিপয় ধর্মোন্মাদ লোক সম্ভবতঃ অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তাঁহাকে ১২৩৪ খ্রীস্টাব্দে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত যেসব লোক দিল্লীতে ছিল তাহাদের প্রাণদণ্ড বিধানই ইহার একমাত্র পরিণতি হইয়া দাঁড়ায়। বিখ্যাত ফকির খাজা কুতবউদ্দীন বক্তিয়ার কাকির সম্মানার্থে ১২৩১-৩২ খ্রীস্টাব্দে ইল্‌তুৎমিস কুতব্ মিনার নির্মাণ করিয়াছিলেন। বক্তিয়ার কাকি ১২৩৫ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে মারা যান। ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যু হয় ১২৩৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে।

ইল্‌তুৎমিস দিল্লীর দাস বংশের রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সাধারণতঃ গণ্য। মহম্মদ ঘূরীর বিজিত রাজ্যগুলি তিনি সংগঠিত করিয়া তোলেন এবং ভারতে নবজাত তুর্কী সাম্রাজ্যে তিনি এমন এক ঐক্যভাবের সঞ্চার করেন যাহা কুতবউদ্দীনের রাজত্বকালে সম্ভব হয় নাই। ইল্‌তুৎমিস যদি দুর্বল রাজা হইতেন তাহা হইলে সমগ্র সাম্রাজ্য হয়ত কতকগুলি পৃথক পৃথক রাজ্যে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব প্রধান রাজাদের দ্বারা শাসিত হইত, তাঁহারা কোন কেন্দ্রীয় শক্তির কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেন না। সুতরাং, তাঁহার পূর্ববর্তী দুইজন সুলতানের ন্যায় তিনিও অসামরিক কোন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা না করিলেও একজন সুযোগ্য সাম্রাজ্য নির্মাতারূপে তিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থানলাভের অধিকারী। তাঁহার বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ-উদ্দীন। তিনি বলেন, "ধর্মে অগাধ আস্থাবান, ফকির, ভক্ত, সাধুসজ্জন এবং ধর্ম ও অনুশাসন প্রণেতাদের প্রতি এরূপ ভক্তিশীল ও দয়ালু কোন নরপতি ইতিপূর্বে কখনও বিশ্বজননীর ক্রোড় হইতে বিশাল রাজ্য হস্তগত করিতে পারেন নাই।"

রজিয়া (১২৩৬-৪০): মৃত্যুর পূর্বে ইল্‌তুৎমিস তাঁহার পুত্রদের দাবী উপেক্ষা করিয়া তাঁহার কন্যা রজিয়াকে উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করিয়া যান, কেননা সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার বহনে পুত্রগণকে তিনি অযোগ্য মনে করিতেন। কিন্তু রাজ্যের ওমরাহগণ একজন নারীর প্রভুত্ব স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ইল্‌তুৎমিসের জীবিত পুত্রদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ রুক্‌নুউদ্দীনকে স্থলতান পদে বরণ করেন। রুক্‌নুউদ্দীন ছিলেন অযোগ্য, উচ্ছৃঙ্খল ও ব্যভিচারী। স্থলতান ব্যভিচারে ও হীনকার্যে মত্ত থাকিতেন, ফলে শাসনকার্য পরিচালনার সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার অস্থিরমতি মাতা শাহ্‌ তুরকানের হস্তগত হয়। তিনি প্রথমে অন্তঃপুরের দাসী ছিলেন। ইহার পর বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দেখা দেয়। মালিক সৈফউদ্দীন হাসান কারলুগ নামক গজনী, কিরমান ও বামিয়ানের তুর্কী শাসনকর্তা নিম্ন সিন্ধু ও উচ্‌ আক্রমণ করেন, কিন্তু উচের শাসনকর্তা তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। ইল্‌তুৎমিসের এক পুত্র গিয়াসউদ্দীন মহম্মদ অযোধ্যায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বদাউন, মুলতান, হানসি ও লাহোরের শাসনকর্তাদের মধ্যেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইজ্‌উদ্দীন তুঘ্রল তুঘান খাঁ দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকার করেন নাই। ১২৩৬ খ্রীস্টাব্দ হইতে তিনি বাঙ্গালাদেশ শাসন করিতেছিলেন। শাহ্‌ তুরকানের অখ্যাতির স্থযোগ রজিয়া অতি নিপুণভাবে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য দিল্লীর উৎক্ষিপ্ত জনতাকে প্ররোচিত করেন। রজিয়াকে স্থলতান বলিয়া ঘোষণা করা হয়; মাত্র ছয় মাসাধিককাল রাজত্ব করিবার পর রুক্‌নুউদ্দীন বন্দী ও নিহত হন (১২৩৬ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর)।

রজিয়ার সম্মুখে অত্যন্ত কঠিন কার্য উপস্থিত হয়। বদাউন, মুলতান, হানসি ও লাহোরের শাসনকর্তাগণ রুক্‌নুউদ্দীনের উজীর নিজাম-উল-মুলক মহম্মদ জুনাইদির সহায়তায় দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন, কেননা রজিয়ার সিংহাসন আরোহণে তাঁহাদের সম্মতি ছিল না। তাঁহারা রজিয়াকে তাঁহার রাজধানীতে অবরোধ করেন। তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার মত শক্তি রজিয়ার ছিল না, কিন্তু রজিয়ার কূটনীতির দরুণ তাঁহাদের দলে ভাঙ্গন দেখা দেয়। তাঁহাদের একতা ভাঙ্গিয়া যায় এবং বিদ্রোহী ওমরাহগণ বিভিন্ন দিকে পলায়ন করেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনকে হত্যা করা হয়। অতঃপর "লক্ষ্মণাবতী হইতে দেবল পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যের সমস্ত মালিক ও আমীরগণ

বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করেন।” বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্তা স্বেচ্ছায় পুনরায় দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকার করেন এবং উচে জনৈক বিশ্বস্ত শাসনকর্তাকে নিযুক্ত করা হয়।

মহিলার পক্ষে শাসনদণ্ড পরিচালনা মুসলমান জগতে অবিদিত বা অননুমোদিত না হইলেও, রজিয়ার বিরুদ্ধে এজন্যই কিছু আপত্তি ছিল। তিনি রমণীর বেশভূষা পরিহার করিয়া এবং অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া গোঁড়া মুসলমানদের মনে আঘাত দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি পুরুষের বেশে রাজদরবার এবং শিবির উভয় ক্ষেত্রেই উপস্থিত হইয়া প্রকাশ্যে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর অভিযোগ ছিল এই যে, জামালউদ্দীন ইয়াকুৎ নামক আবিসিনিয়াবাসী জনৈক কর্মচারীর প্রতি তিনি কতকটা অনুগ্রহ দেখাইতেন। তখনকার দিনে তুর্কী ওমরাহগণ এমন একটি সামন্ততন্ত্র সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছিলেন যেখানে অপরের প্রবেশাধিকার ছিল না; শাসন-কর্তৃত্ব এবং পদাধিকার ছিল একমাত্র তাঁহাদেরই প্রাপ্য। তাঁহারা তাঁহাদের জাতিগত অধিকার পরিত্যাগ করিতে অথবা রাজকীয় কর্তৃত্বের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

রজিয়ার নূতন নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী যে আমীর প্রকাশ্যে প্রথম বিদ্রোহ করেন তিনি ছিলেন পঞ্জাবের শাসনকর্তা কবীর খাঁ আয়াজ। ১২৪০ খ্রীস্টাব্দে রজিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিলে বিনাযুদ্ধেই আয়াজ বশ্যতা স্বীকার করেন। দিল্লীতে ফিরিয়া আসার অল্পকাল পরেই রজিয়া আরও ভীষণতর বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। তুর্কী ওমরাহগণের প্ররোচনায় ভাতিন্দার শাসনকর্তা ইক্তিয়ারউদ্দীন আল্‌তুনিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। আমীর-ই-হাজিব ইক্তিয়ারউদ্দীন-আইতিগিন ছিলেন বিদ্রোহী তুর্কী ওমরাহগণের নেতা। বিদ্রোহীগণকে দমন করিবার জন্য বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া রজিয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি ভাতিন্দা পৌঁছিলে ইয়াকুতকে হত্যা করা হয়; রজিয়াকে বন্দিনী করিয়া আল্‌তুনিয়ার হেফাজতে রাখা হইল। ইল্‌তুৎমিসের এক কনিষ্ঠ পুত্র মুইজউদ্দীন বহরামকে সিংহাসনে বসাইবার ব্যবস্থা হইল। ১২৪০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বহরাম স্থলতান পদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং ওমরাহগণ তাঁহাদের নেতা আইতিগিনের হস্তে যাবতীয় রাজকীয় ক্ষমতা অর্পণ করিতে তাঁহাকে বাধ্য করেন। সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী রাজপ্রতিনিধিকে স্থলতান সহ্য করিতে

পারিলেন না। বহরামের প্ররোচনায় আইতিগিনকে ১২৪০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে হত্যা করা হইল। ইতিমধ্যে আল্‌তুনিয়া সাফল্যমণ্ডিত বিদ্রোহের জন্য কোনরূপ পুরস্কার না পাওয়ায় স্বভাবতঃই তাঁহার মনে তিক্ত নৈরাশ্য দেখা দেয় এবং তিনি বন্দিনী রজিয়ার পক্ষ অবলম্বন করেন। আল্‌তুনিয়া কারাগার হইতে রজিয়াকে মুক্তি দেন, তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহাকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইবার উদ্দেশ্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। বহরামের সৈন্যবাহিনীর নিকট ১২৪০ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আল্‌তুনিয়া পরাজিত হন; অতঃপর জনকয়েক দস্যুর হস্তে তাঁহার ও রজিয়ার প্রাণ যায়। রমণীগণের মধ্যে একমাত্র রজিয়াই দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি সাড়ে তিন বৎসরকাল রাজত্ব করেন। যদিও শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের নিকট তাঁহাকে পরাভব মানিতে হয়, তথাপি তিনি সুনিশ্চিত রূপেই একজন সর্বগুণসম্পন্না রমণী ছিলেন। মিনহাজউদ্দীন তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ রাজগুণে ভূষিতা, ন্যায়পরায়ণা, দয়াশীলা, বিদ্যোৎসাহিনী, সুবিচারক, প্রজাবৎসল, সমর-কুশল এবং অন্যান্য সকল প্রকার রাজোচিত প্রশংসনীয় গুণের অধিকারিণী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পরিশেষে ঐতিহাসিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, এই সমস্ত অসামান্য গুণাবলী রজিয়ার কোন্ উপকারে আসিল ?

মুইজউদ্দীন বহরাম শাহ্ (১২৪০-৪২) : "ইল্‌তুৎমিসের রাজত্বকালে নেতৃস্থানীয় তুর্কীদের মধ্যে চল্লিশ জন একটি চক্র গঠন করিয়া নিজেদের মধ্যেই সাম্রাজ্যের বড় বড় জায়গীর এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান সমস্ত পদ ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। ইল্‌তুৎমিস তাঁহার অসামান্য কর্তৃত্বভাবের বলে রাজকীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যান বটে, কিন্তু তাঁহার সন্তানদের রাজত্বকালে এই চল্লিশ জনের ক্ষমতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই যে, যদি অপর সকলের ঈর্ষা প্রতিবন্ধক হইয়া না দাঁড়াইত তবে এই চল্লিশ জনেরই একজন সিংহাসন পর্যন্ত অধিকার করিয়া বসিতেন।"

আইতিগিনের হত্যার পর বহরাম 'চল্লিশ-চক্রের' অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য বদরউদ্দীন সুঙ্‌কারকে আমীর-ই-হাজিব পদ প্রদান করেন। তবে বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধে অনতিকাল পরেই তাঁহার প্রাণবিনাশ করা হয়। মিনহাজউদ্দীন বলেন, "তাঁহার এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে আমীরদের মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। তাঁহারা সকলেই ভীতিগ্রস্ত হইয়া সুলতানকে

আতঙ্কের চক্ষে দেখিতে থাকেন, সুলতানের প্রতি তাঁহাদের মধ্যে একজনেরও আর কোন আস্থা থাকে না।" ওমরাহগণ যখন এইভাবে কেন্দ্রীয় শক্তিকে দুর্বল করিয়া ফেলিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তখন মঙ্গোলরা সিন্ধু নদ অতিক্রম করে। তাহারা হুলাগু খাঁর অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ বাহাদুর তায়েরের নেতৃত্বে লাহোর অধিকার করে (ডিসেম্বর, ১২৪১)। বহু নাগরিককে হত্যা এবং সহরের দেওয়ালগুলি ভূমিসাৎ করা হয়। লাহোরের শাসনকর্তাকে সাহায্য করিবার জন্য সুলতান এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন, কিন্তু বিশ্বাসহন্তা উজীর নিজাম-উল-মুল্কের চক্রান্তের ফলে সে বাহিনী শতদ্রু নদীর তীর হইতে দিল্লীতে ফিরিয়া আসে। রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া এই বিদ্রোহী বাহিনী সুলতানের দুর্গাবাস অবরোধ করে। ১২৪২ সালের মে মাসে দুর্গ অধিকার করিয়া সুলতানকে হত্যা করা হয়।

আলাউদ্দীন মাসুদ শাহ্ (১২৪২-৪৬): বিজয়ী ওমরাহগণ রুক্‌নউদ্দীন ফিরোজ শাহের এক অতি অল্পবয়স্ক পুত্র আলাউদ্দীন মাসুদ শাহকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। নূতন সুলতানের সিংহাসন আরোহণের কয়েক মাস পরেই নিজাম-উল-মুল্কের বিশ্বাসঘাতকতা ও ঔদ্ধত্যের জন্য তাঁহাকে হত্যা করা হয়। বিহার ও বাঙ্গালার শাসনকর্তা তুঘ্রল তুঘান খাঁ নামে মাত্র দিল্লীর কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেন ; এমনকি তিনি অযোধ্যা আক্রমণেও সাহসী হন। কবীর খাঁ আয়াজ এবং তাঁহার পুত্র আবু বকর স্বাধীনভাবেই মুলতান ও উচ্ শাসন করিতে থাকেন। ১২৪৫ খ্রীস্টাব্দে সৈফউদ্দীন হাসান কারলুগ কর্তৃক মুলতান অধিকৃত হয়। মঙ্গোলগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল কার্যতঃ খোক্করগণেরই অধিকারে আসিয়া পড়িয়াছিল। ১২৪৬ খ্রীস্টাব্দে মাঙ্গুতার নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ মুলতান অধিকার করিবার পর উচ্ অবরোধ করে, কিন্তু যখন তাহারা সংবাদ পাইল যে বলবনের নেতৃত্বে সুলতানের সৈন্যবাহিনী তাহাদের সম্মুখীন হইতে আসিতেছে তখন তাহারা পলাইয়া যায়। ফলে সিন্ধুতে সুলতানের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

নাসিরউদ্দীন মামুদ (১২৪৬-৬৫): মাসুদের অযোগ্যতা ও ঔদ্ধত্যে 'চল্লিশ-চক্রের' মনে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়। ফলে মাসুদ সিংহাসনচ্যুত (জুন, ১২৪৬) ও নিহত হন। ওমরাহগণের মনোনয়নে সিংহাসন লাভ করেন ইল্‌তুৎমিসের অন্যতম কনিষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দীন মামুদ।

তিনি তখন ১৭।১৮ বৎসর বয়সের একজন যুবকমাত্র। তাঁহার সন্তপূর্ববর্তী স্থলতানদের মত না হইয়া, তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যুও হয় স্বাভাবিক ভাবেই। ঐতিহাসিকদের লেখায় তাঁহার ধর্মভাব ও সরলতা সম্বন্ধে নানা অতিরঞ্জিত কাহিনী বিবৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সকল কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। সম্ভবতঃ নাসিরউদ্দীন অপেক্ষাকৃত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন এবং যেসব শক্তিশালী ওমরাহকে বশীভূত রাখা তাঁহার সাধ্যের অতীত ছিল তাঁহাদেরই হস্তে রাজকার্য পরিচালনার ভার সমর্পণ করিয়া কেবলমাত্র রাজকীয় উপাধি লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন।

উলুঘ খাঁ (ইনি গিয়াসউদ্দীন বলবন নামেই অধিকতর পরিচিত) ছিলেন নাসিরউদ্দীনের রাজত্বকালে নিশ্চিতরূপেই সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি জাতিতে তুর্কী ছিলেন। কথিত আছে তাঁহার পিতা নাকি ছিলেন ১০,০০০ পরিবারের নায়ক বা সর্দার। মঙ্গোলগণ তাঁহার তরুণ যৌবনে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বাগদাদে ক্রীতদাস রূপে বিক্রয় করিয়া দেয়। তাঁহার প্রভু তাঁহাকে দিল্লীতে লইয়া আসিলে ইল্‌তুৎমিস তাঁহাকে ক্রয় করেন। তাঁহার বুদ্ধি ও বিশ্বস্ততার গুণে তিনি দ্রুত পদোন্নতি লাভ করিতে থাকেন। অবশেষে তিনি 'চল্লিশ-চক্রের' অন্যতম সদস্য হইয়া উঠেন। রজিয়ার অধীনে তিনি আমীর-ই-শিকার পদ লাভ করিয়াছিলেন। যে সকল ওমরাহ রজিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করেন তিনি তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। ফলে বহরাম শাহ্ তাঁহাকে রেওয়ারী (পঞ্জাবের গুরগাঁও জেলা) ও হানসির জায়গীর প্রদান করিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে যে অভিযানের ফলে তাহারা ১২৪৬ খ্রীস্টাব্দে উচের অবরোধ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়, তিনি ছিলেন সেই অভিযানের সংগঠক। মাসুদের সিংহাসনচ্যুতি এবং নির্বিবাদে মামুদের সিংহাসনারোহণের জন্য সম্ভবতঃ তিনিই ছিলেন বহুলাংশে দায়ী।

বলবন নিজেই কার্যতঃ সাম্রাজ্যের শাসক-পদ প্রায় অধিকার করিয়া বসেন। ১২৪০ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্থলতানের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন এবং ইহার অল্পকাল পরেই আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থলতানের সহকারীর (নায়েব-ই-মামলিকৎ) পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণও শাসন-বিভাগের প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার ক্ষমতাপ্রাধান্যে অন্যান্য তুর্কী ওমরাহদের মনে স্বভাবতঃই বিদ্বেষভাব দেখা দেয়। ১২৫৩ খ্রীস্টাব্দে ইমাদউদ্দীন রইহান নামক

এক ধর্মান্তরিত হিন্দু রাজদরবার হইতে বলবনকে বরখাস্ত করিবার জন্য সুলতানকে প্ররোচিত করেন। বলবন বিনা প্রতিবাদে এই অপমান সহ্য করেন এবং বৎসরাধিক কাল ধরিয়া সুলতানের প্রধান পরামর্শদাতা রূপে রইহান দিল্লীতে শাসনকার্য চালান। কিন্তু রইহানের ঔদ্ধত্যে তুর্কী আমীরগণ অসন্তুষ্ট হন এবং সুলতানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জালালউদ্দীনের বিদ্রোহে সুলতান আতঙ্কিত হইয়া পড়েন। ইহাতে বলবনের পুনরায় ক্ষমতালাভের পথ প্রশস্ত হয়। জালালউদ্দীন লাহোরের স্বাধীন সুলতান রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে প্রভুর কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করিয়া তোলাই হইল বলবনের প্রথম কাজ। মঙ্গোলদের ক্রমাগত আক্রমণ প্রচেষ্টা এবং স্থানীয় কর্মচারীদের অবাধ্যতার ফলে মাসুদের রাজত্বের শেষভাগে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার পুনঃস্থাপন দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই। ১২৪৯ খ্রীস্টাব্দে সৈফউদ্দীন হাসান কারলুঘ পুনরায় মুলতান দখল করেন, তবে অল্পকাল পরেই মুলতান দিল্লীর শাসনাধীন হয়। কয়েক বৎসর পরে মুলতান ও উচের শাসনকর্তা কাসলু খাঁ দিল্লীর প্রতি তাঁহার আনুগত্য অস্বীকার করিয়া ইরানের মঙ্গোলশাসক হুলাগুর সামন্ত পদ গ্রহণ করেন। ১২৫৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি আর একজন বিদ্রোহী শাসনকর্তা অযোধ্যার কুতলুঘ খাঁর সহযোগিতায় দিল্লী দখল করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১২৫৯ খ্রীস্টাব্দে হুলাগুর দূত দিল্লীতে আসিয়া সম্ভবতঃ বলবনকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, দিল্লীর সীমান্তে কোনপ্রকার আক্রমণ হইবে না। কয়েক বৎসর পরে আমরা দেখিতে পাই যে, বলবনের পুত্র সিন্ধুদেশ শাসন করিতেছেন, কিন্তু পঞ্জাব হইতে মঙ্গোলগণকে অপসারণ করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া ওঠে। ১২৫৪ খ্রীস্টাব্দে লাহোরকে মঙ্গোলদের অধীন প্রদেশ রূপে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ মামুদের রাজত্বকালের শেষভাগ পর্যন্তও পঞ্জাবের বৃহত্তম অংশ ছিল মঙ্গোলদের প্রভাব-পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত।

বলবনকে কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অবাধ্য শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় নাই। বাঙ্গালা ও বিহারের শাসনকর্তা জালালউদ্দীন মাসুদ জানি দিল্লীর প্রতি আনুগত্য অস্বীকার না করিলেও, 'শাহ' উপাধি ধারণ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী মুঘিসউদ্দীন উজবাক অযোধ্যা জয় করিয়া রাজকীয় উপাধি গ্রহণ এবং স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন। তিনি কামরূপে এক

অভিযান চালাইয়াছিলেন, কিন্তু তথায় ১২৫৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর বাঙ্গালায় দিল্লীর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ১২৫৯ খ্রীস্টাব্দে কারার শাসনকর্তা আরস্লান খাঁ লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়া তথায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী তাতার খাঁও একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন। রাজধানীর নিকটবর্তী প্রদেশের শাসনকর্তাদের মধ্যে কুতলুঘ খাঁ ছিলেন একজন শক্তিশালী বিদ্রোহী। মুলতানের কাসলু খাঁনের সহিত তাহার মৈত্রীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

হিন্দু রাজাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের বারংবার চেষ্টা প্রতিরোধ করাই ছিল বলবনের সবচেয়ে কঠিন কাজগুলির মধ্যে একটি। ১২৪৭ সালে তিনি কালঞ্জর অঞ্চলের এক হিন্দু নায়ককে দমন করেন। ১২৫১ খ্রীস্টাব্দে গোয়ালিয়রের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে তিনি এক অভিযান চালান। তবে মালবে ও মধ্যভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কোন প্রচেষ্টাই হয় নাই। রণথম্ভোরেও কয়েকবার অভিযান চালান হইয়াছিল। মেওয়াটের (রাজস্থানের অন্তর্গত আধুনিক আলোয়ার) দুর্বৃত্ত উপজাতিদের দমন করা হয়। দোয়াবের বিদ্রোহী হিন্দুগণকেও তিনি স্বীয় অধীনে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মামুদের রাজত্বকালের শেষ কয়েক বৎসরের (১২৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে) কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না, কারণ এই কালের প্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থ তবাকৎ-ই-নাসিরীতে ইহার পরই অকস্মাৎ ছেদ পড়িয়াছে, আর বরনীর বৃত্তান্ত শুরু হইয়াছে বলবনের সিংহাসনে আরোহণ হইতে। সম্ভবতঃ ১২৬৫ খ্রীস্টাব্দে মামুদের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান ছিল না, সুতরাং বলবনই তাঁহার পরে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

গিয়াসউদ্দীন বলবন (১২৬৫-৮৭)ঃ বলবন তাঁহার দীর্ঘকালের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তুর্কী ওমরাহগণের ক্ষমতা খর্ব করাই রাজার প্রাথমিক কর্তব্য। ওমরাহদের স্বার্থসিদ্ধির চক্রান্তই ছিল কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার কারণ, আর তাহারই ফলে ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যুর পর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। বলবনের সিংহাসনারোহণকালে দেশের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বরনী নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন, "শাসকশক্তির প্রতি যে ভীতি সুশাসনের ভিত্তি এবং রাজশ্রী ও রাজ্যগৌরবের উৎস, তাহাই

জনচিত্ত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল, আর তাহারই অভাবে দেশ দুর্দশায় পতিত হইয়াছিল।" বলবন 'জনচিত্তে' 'শাসক শক্তির প্রতি ভীতি' উদ্রেকের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

রাজশক্তির গৌরব বিধান: বলবনের রাজত্বকালের ধারাবাহিক বিবরণ প্রদান করা কঠিন, কেননা এই সময়কার প্রধান প্রামাণ্যগ্রন্থ বরনীর তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী ধারাবাহিকতা রক্ষায় একান্ত উদাসীন। ওমরাহদের শক্তিহরণ করিবার জন্য বলবন যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন সেগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, তিনি রাজদরবারে পারস্যে প্রচলিত রীতি প্রবর্তন করিয়া রাজপদের গৌরব বৃদ্ধি করেন। আচারে আচরণে এই কথাটি তিনি সকলের নিকট প্রকট করিয়া তোলেন যে রাজা কাহারও সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তি নহেন। বলবন পৌরাণিক তুর্কীবীর আফ্রাসিয়াবের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন এবং ঘোষণা করেন যে, "রাজার অতিমানবীয় সম্ভ্রম ও পদমর্যাদাই জনসাধারণের আনুগত্যকে সুনিশ্চিত করিয়া তুলিতে পারে।" "তাঁহার রাজদরবার ছিল এক গুরুগম্ভীর সভা, সেখানে হাস্যকৌতুক অজ্ঞাত ছিল, মদ্য ও দ্যূতক্রীড়ার···কোন স্থান ছিল না, কেননা একদিক দিয়া এ দু'টি (মদ্যপান ও দ্যূতক্রীড়া) যেমন ছিল ইসলামের বিধিনিষেধ অনুসারে নিষিদ্ধ অপর দিক দিয়া—এইটিই ছিল প্রধান কারণ—এ দু'টির প্রশ্রয় দানের ফলে সৌহার্দ ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইত; অধিকন্তু তাঁহার দরবারে আচার-অনুষ্ঠানের বিন্দুমাত্র স্খলনও সহ্য করা হইত না।" স্বভাবতঃই তুর্কী ওমরাহগণ, বিশেষ করিয়া 'চল্লিশ চক্রের' সদস্যগণ, রাজশক্তির এইরূপ নিঃসঙ্গ স্থিতিতে বিক্ষুব্ধ হন, কিন্তু বলবন নিষ্ঠার সহিত এই নববিধান পালন করিয়া চলিতে থাকেন, এবং একটি নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন।

রাজদরবারে পরোক্ষভাবে ওমরাহদের প্রতিপত্তি খর্ব করিয়াই বলবন সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহাদের ক্ষমতা খর্ব করিবার সুযোগ পাইলেই তিনি সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন। তিনি অপক্ষপাতে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন; সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ওমরাহও তাঁহার নিকট কোনরূপ অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতে পারিতেন না। বস্তুতঃ 'চল্লিশ চক্র' সম্বন্ধে তিনি যে অযথা অতিমাত্রায় কঠোর ছিলেন এরূপ সন্দেহ করিলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হয় না। বদাউনের শাসনকর্তা মালিক বাক্‌বাক্ নামক জনৈক শক্তিশালী ওমরাহ তাঁহার

একজন ভৃত্যকে প্রহারে জর্জরিত করিয়া তাহার প্রাণনাশের কারণ হন। এই অপরাধের জন্য স্থলতানের আদেশে কশাঘাতে জর্জরিত করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করা হয়। অযোধ্যার শাসনকর্তা হাইবৎ খাঁ মাতাল অবস্থায় এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলেন। বলবন তাঁহাকে বেত্রদণ্ড প্রদান করিয়া তাঁহাকে নিহত ব্যক্তির পত্নীর নিকট সমর্পণ করেন। চল্লিশ চক্রের আর একজন সদস্য বিদ্রোহীদের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। অনেকের বিশ্বাস বলবন তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা ভাতিন্দা, ভাটনের, সামানা ও স্থনামের শাসনকর্তা শক্তিশালী ওমরাহ শের খাঁ স্থঙ্কারকে গোপনে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলেন। বলবন বহু সংবাদ-লেখক (বরিদ) ও গুপ্তচর নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের নিকট হইতেই তিনি ওমরাহদের মতামত ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তৃত সংবাদাদি সংগ্রহ করিতেন। যে কোন সংবাদ-লেখক বা গুপ্তচরকে কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হইলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। যে সংবাদ-লেখক স্থলতানের নিকট মালিক বাক্‌বাকের অপরাধের বিবরণ বাদ দিয়া গিয়াছিল তাহাকে বদাউনের দ্বারদেশে ফাঁসি দেওয়া হয়।

সামরিক সংস্কার ঃ সৈন্যবাহিনীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বলবন সামরিক সংস্কারের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইল্‌তুৎমিস বহু সৈন্যকে সামরিক কার্যের বিনিময়ে জমি দান করিয়াছিলেন। ঐসব সৈন্যের বংশধরগণ তাহাদের সামরিক কর্তব্য পালনে যদিও অত্যন্ত অনিয়মিত ছিল, তথাপি তাহারা তাহাদের জমি ভোগ করিতে থাকে। এমন কি তাহারা এরূপ দাবীও করে যে, তাহাদিগকে ঐ সব জমি বিনাসর্তেই চিরকালের জন্য দেওয়া হইয়াছে। জমি ভোগকারী এই সব সৈন্যদের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বলবন এক তদন্ত করিয়া তাহাদিগকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেন ঃ (১) সামরিক কার্যের অনুপযুক্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ, (২) সামরিক কার্যের উপযুক্ত যুবকবৃন্দ, এবং (৩) বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকা। বলবন আদেশ দিলেন, যেসব বৃদ্ধ, বিধবা ও অনাথ জমি ভোগ করিতেছে তাহাদের জমি ফেরৎ লইয়া তাহাদের ভরণপোষণের জন্য মাসহারা দিতে হইবে ; যুবকবৃন্দকে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর তালিকাভুক্ত করা হয়, তবে তাহাদের গ্রামের খাজনা সরকারী কর্মচারিগণ কর্তৃকই সংগৃহীত হইবে। দিল্লীর বৃদ্ধ কোতোয়ালের অনুরোধে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জমি ফেরৎ লওয়া সম্পর্কে স্থলতান তাঁহার পূর্বের আদেশ প্রত্যাহার করেন।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন : বলবন সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা কঠোরহস্তে দমন করেন। মেওয়াটের দুঃসাহসী দস্যুরা কেবলমাত্র পথিমধ্যেই পথিকদের জিনিসপত্র লুঠ করিত না, দিল্লীর অভ্যন্তরভাগেও লুঠতরাজ করিতে ছাড়িত না। বলবন দস্যুদলের উচ্ছেদসাধন করেন, যে সকল বনজঙ্গলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত সেগুলি কাটাইয়া পরিষ্কার করেন এবং দিল্লীর নাগরিক নিরাপত্তার জন্য সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। দোয়াবের হিন্দুগণও কম উৎপাত করিত না; তাহারা বাঙ্গালা ও দিল্লীর মধ্যবর্তী পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কঠোর সামরিক ব্যবস্থা দ্বারা বলবন তাহাদিগকে দমন করেন; শক্তিশালী ওমরাহ ও আফগান সৈনিক পুরুষদের জমি দান করা হয়; নিজ নিজ এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তাঁহাদের উপর ন্যস্ত থাকে। তারপর কাতেহ্‌রের (রোহিলখণ্ড) বিদ্রোহী হিন্দুগণকে নির্দয়ভাবে শাস্তি প্রদান করা হয়; শিশু ব্যতীত সকল পুরুষকেই হত্যা এবং স্ত্রীলোকদিগকে দাসীজীবন গ্রহণে বাধ্য করা হয়। ১২৬৮-৬৯ খ্রীস্টাব্দে বলবন লবণ পর্বতাঞ্চলে এক অভিযান উপলক্ষে বিরোধী হিন্দুগণকে শাস্তি দেন এবং তাঁহার সৈন্যবাহিনীর জন্য বহু অশ্ব সংগ্রহ করেন।

বাঙ্গালায় বিদ্রোহ : বলবনের রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা কঠিন আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দেখা দেয় বাঙ্গালাদেশে। বাঙ্গালার শাসনকর্তাগণ দিল্লীর আধিপত্য হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার জন্য কিভাবে বারংবার চেষ্টা করিতেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। বারণী বলেন, "বহুকাল অবধি এই দেশের (বাঙ্গালার) লোকেরা বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় দিয়া আসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষপরায়ণ ও দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা সচরাচর শাসনকর্তাদের আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করিতে সক্ষম হইত।" মুঘিসউদ্দীন তুঘ্রল খাঁ ১২৬৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে বাঙ্গালার শাসনকর্তা ছিলেন। "তিনি তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে উচ্চাভিলাষের ডিম ফুটিতে দিলেন;" তাঁহার কুমন্ত্রণাদাতাগণ তাঁহাকে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলনে প্ররোচিত করিয়া তুলিল। সম্ভবতঃ সুলতানের বার্ধক্য এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আতঙ্কের পুনরাবির্ভাবে তিনি উৎসাহ বোধ করিয়াছিলেন। তিনি সুলতান উপাধি ধারণ করিয়া স্বীয় নামাঙ্কিত মুদ্রা তৈয়ারি করিতে লাগিলেন, তাঁহার নির্দেশে তাঁহারই নামে খুৎবা পাঠ হইতে লাগিল। তিনি মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া বহু অনুগামী সংগ্রহ করিলেন।

তুঘ্রলকে বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য করিবার জন্য বলবন ১২৭৮ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক তুরমাতিকে প্রেরণ করেন; কিন্তু তুঘ্রলের হস্তে তিনি পরাজিত হন, তুঘ্রল অপরিমিত ধনরত্ন দিয়া রাজকীয় সেনাবাহিনীর বহু কর্মচারী ও সৈন্যকে প্রলোভিত করেন। বলবন মালিক তুরমাতিকে অযোধ্যার প্রবেশদ্বারে ফাঁসি দেওয়ার আদেশ দিলেন এবং নূতন একজন সেনাধ্যক্ষের—সম্ভবতঃ অযোধ্যার শাসনকর্তা শিহাবউদ্দীনের—পরিচালনাধীনে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তিনিও তাঁহার পূর্বগামীর ন্যায় সফলকাম হইতে পারিলেন না। অতঃপর বলবন নিজেই বাঙ্গালায় অভিযান চালাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খাঁকে সঙ্গে লইয়া প্রায় দুই লক্ষ সৈন্যসহ তিনি বাঙ্গালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন লক্ষ্মণাবতী প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে, তুঘ্রল ইতিপূর্বেই তাঁহার সৈন্যবাহিনী ও অনুচরবর্গ সহ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বলবন আরও অগ্রসর হইতে থাকেন এবং (ঢাকার নিকট) সোনারগাঁওয়ে আসিয়া উপনীত হন। তুঘ্রলের সৈন্যবাহিনী (সোনারগাঁওয়ের অনতিদূরে) কিলা-ই-তুঘ্রলে সন্নিবিষ্ট ছিল, তাহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল। তুঘ্রল নিজে ধৃত হইলেন, তাঁহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইল (১২৮১)।

লক্ষ্মণাবতীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তুঘ্রলের অনুগামীদের উপর বলবন ভয়ানক প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। "বড় বাজারের দুই ধারে, দুই মাইলের উপর লম্বা রাস্তায়, সারি বাঁধিয়া ফাঁসিকাঠ পোঁতা হইল, তাহার উপর লটকাইয়া দেওয়া হইল তুঘ্রলের পরিবার-পরিজন ও অনুচরবর্গকে। দর্শকদের মধ্যে কেহই আর কখনও এরূপ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে নাই; অনেকেই আতঙ্ক ও বিতৃষ্ণায় মূর্ছিত হইয়া পড়িল।" বলবন বাঙ্গালাদেশের শাসনভার তাঁহার পুত্র বুঘরা খাঁর হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে বাজারের সেই দৃশ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন: "আমার কথা বুঝিয়া দেখো। ভুলিও না যে হিন্দ অথবা সিন্ধ, মালব অথবা গুজরাট, লক্ষ্মণাবতী অথবা সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তারা যদি তরবারি উন্মোচন করিয়া দিল্লীর সিংহাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, তবে তুঘ্রল ও তাহার আশ্রিতদের প্রতি যে শাস্তি বিধান করা হইয়াছে তাহাদের, তাহাদের পত্নীদের, তাহাদের সন্তানসন্ততিদের, এবং তাহাদের যাবতীয় অনুচরদের প্রতিও ঠিক সেই শাস্তি বিধান করা হইবে।" যাহারা সুলতানের বাহিনী পরিত্যাগ করিয়া

তুঘ্রলের দলে যোগ দিয়াছিল তাহাদিগকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য স্থলতান দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় ফাঁসিকাঠ পুঁতিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর কাজীর অনুরোধক্রমে বলবন তাঁহার আদেশ পরিবর্তন করেন। বন্দীদের মধ্যে যাহারা ছিল বাজে লোক তাহাদিগকে ক্ষমা করা হইল ; যাহাদের পদমর্যাদা ইহাদের তুলনায় একটু বেশী ছিল তাহাদিগকে কিছুদিনের জন্য দেওয়া হইল নির্বাসন, যাহারা দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাদের হইল কারাদণ্ড, আর উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণকে মহিষের পিঠে চড়াইয়া দিল্লীর রাজপথগুলি ঘুরাইয়া আনা হইল।

মোঙ্গলদের আক্রমণ ঃ সর্বসময়ের জন্য মোঙ্গলদের আক্রমণের ভীতি বলবনের নীতি নির্ধারণের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। তাঁহার সভাসদগণ তাহাকে এক সময় মালব ও গুজরাট জয় করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার উত্তরে স্থলতান জানান যে, দিল্লীর অবস্থা বাগদাদের[১] অনুরূপ করিবার তাঁহার কোন অভিপ্রায় নাই। বলবন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার জন্য সামরিক শক্তি সংগঠিত করিয়া তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, স্থতরাং সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তিনি মনোযোগ দেন নাই। আভ্যন্তরীণ সংহতি রক্ষাই ছিল তাঁহার নীতির মূল লক্ষ্য।

গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত প্রদেশ মুলতান-দীপালপুর প্রথমে বলবনের জ্ঞাতি ভ্রাতা শের খাঁ স্থঙ্কারের শাসনাধীন ছিল। তাঁহার সাহসিকতা মোঙ্গল এবং সীমান্তের দুর্ধর্ষ উপজাতি খোক্করদের পক্ষে ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে একজন যোগ্য সেনানায়কের তিরোধান হয়। বলবন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ খাঁকে শের খাঁর স্থলে নিয়োগ করিয়া শূন্যস্থান পূরণ করেন। যুবরাজ একজন স্থদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাঁহার শিক্ষানুরাগেই সর্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারই যত্ন ও অনুগ্রহে আমীর খসরু ও আমীর হাসান উভয়েরই সাহিত্যসাধনা স্থরু হইয়াছিল।

বিখ্যাত কবি সাদীকে ভারতে আসিবার জন্য তিনি আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বার্ধক্যের অজুহাতে কবি ভারতে আসিতে অস্বীকৃত হন। যুবরাজ প্রায় ত্রিশ হাজার শ্লোক যুক্ত পারসিক কবিতার একখানি পুস্তক সঙ্কলন করেন।

---

১ ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে হুলাগু বাগদাদ অধিকার করিয়া বাগদাদের খলিফা মুস্তাসিমকে নির্দয় ভাবে হত্যা করেন।

মহম্মদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বুঘরা খাঁর উপর সীমান্ত-জেলা স্থনাম-সামানার ভার ন্যস্ত হয়। এইসব ব্যবস্থার ফলে মোঙ্গলদের আক্রমণ হইতে সীমান্ত রক্ষা পায়।

১২৭৯ খ্রীস্টাব্দের দিকে মোঙ্গলরা উত্তর পাঞ্জাব ছারখার করিয়া শতদ্রু নদীও অতিক্রম করে। মুলতান হইতে মহম্মদের, সামানা হইতে বুঘরা খাঁর, এবং দিল্লী হইতে মালিক বেতকার্সের সৈন্যদল লইয়া গঠিত এক বিরাট বাহিনী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে প্রচণ্ড ভাবে পরাজিত করে। কিন্তু ১২৮৬ খ্রীস্টাব্দে, আমীর খসরুর বর্ণনা অনুযায়ী, "অকস্মাৎ আকাশ হইতে বজ্রপাত হইল, পৃথিবীতে ধ্বংসের দিন দেখা দিল।" তামুর খাঁর নেতৃত্বে একদল মোঙ্গল সৈন্য মুলতান আক্রমণ করিয়া মহম্মদকে এক খণ্ডযুদ্ধে নিহত করিল। বৃদ্ধ স্থলতান যুবরাজকে অত্যধিক ভালবাসিতেন এবং তাঁহার উপরই ভবিষ্যতের সকল আশা ভরসা স্থাপন করিয়াছিলেন। স্থলতান তাঁহার স্বাভাবিক মর্যাদা লইয়া দিবাভাগে রাজকার্য পরিচালনা করিলেও, রাত্রে পুত্রের জন্য নিদারুণ শোকে ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালের শেষভাগেও তাঁহার সাম্রাজ্যের পশ্চিমদিকস্থ সীমানা বিপাশা নদীর ওপারে অধিক অগ্রসর হয় নাই। বলবন লাহোর পুনরাধিকার ও পুনর্নির্মাণ করেন।

বলবনের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ মহম্মদের মৃত্যুর পর বলবন বাঙ্গালা হইতে বুঘরা খাঁকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহাকেই উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করেন। কিন্তু বুঘরা খাঁ স্থলতানের অনুমতি না লইয়াই বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসেন। বলবন তাঁহার মৃত্যুশয্যায় মহম্মদের পুত্র কৈ-খসরুকে তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার 'বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ' তাঁহার শেষ ইচ্ছা রক্ষা করেন নাই; তাঁহারা বুঘরা খাঁর পুত্র তরুণ কৈকোবাদকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

বলবন যে একজন দক্ষ শাসক ছিলেন তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর (১২৪৬-৮৭) কার্যতঃ ভারতের বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন এবং শক্তিশালী মোঙ্গলদের আক্রমণ হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার দক্ষতার পরিচয় দান করেন। রাজ্যবিস্তারে বিরত থাকিয়া তিনি তাঁহার বাস্তববুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। রাষ্ট্রকে স্থসংহত করাই ছিল তখন প্রয়োজন এবং বলবন স্থবিবেচক রূপে রাজশক্তি ও রাষ্ট্রকে স্থসংহত করার দিকে মনোনোবিশ

করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্মমতা সময় সময় আমাদের অন্তরে বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে, কিন্তু এক অবিশ্বাসের যুগে তাঁহাকে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে হইয়াছে এ কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। তিনি রাজশক্তির মর্যাদা বিধান এবং ওমরাহদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া তুর্কী রাষ্ট্রকে এক নূতন রূপ দিয়াছিলেন। গোঁড়া সুন্নীর ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি তিনি নিয়মিত ভাবে পালন করিতেন। মোঙ্গলদের অত্যাচারে বাসভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, মধ্য এশিয়ার এইরূপ অনেক শরণার্থীর তিনি আশ্রয়স্থল ছিলেন। শিক্ষিত ও ধর্মপরায়ণ মুসলমানদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল ; তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া তিনি আহার করিতেন এবং আইন ও ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করিতেন।

কৈকোবাদ (১২৮৭-৯০) ঃ কৈকোবাদ ১২৮৭ খ্রীস্টাব্দে বলবনের উত্তরাধিকারীরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন তরলমতি উচ্ছৃঙ্খল যুবক এবং যে রাজ্যকে সংহত ও রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার দৃঢ়চেতা পিতামহের শক্তি নিঃশেষিত হইয়াছিল তাহার ভার বহন করিবার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। বুঘরা খাঁ তাঁহার পুত্রের সিংহাসন আরোহণে আপত্তি করেন নাই, তবে বাঙ্গালাদেশে তিনি নিজে নাসিরউদ্দীন মামুদ বুঘরা শাহ্ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। নিজামউদ্দীন নামক জনৈক কর্মচারীর হস্তে কৈকোবাদ একজন ক্রীড়নকে পরিণত হন। তামুর খাঁর নেতৃত্বে এক বিরাট মোঙ্গল বাহিনী পঞ্জাব আক্রমণ করে এবং প্রায় সামানা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। মালিক মহম্মদ বাক্‌বাক্ লাহোরের নিকট মোঙ্গলগণকে পরাজিত করেন এবং সহস্রাধিক লোককে বন্দীরূপে দিল্লীতে লইয়া যান। ইহাদের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া অথবা হাতীর পায়ের তলায় পিষিয়া মারিয়া ফেলা হয়। এমন কি তথাকথিত 'নূতন মুসলমানগণ'ও (মোঙ্গলদের মধ্যে যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া দিল্লীতে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল) শাস্তি হইতে রেহাই পায় নাই।

ইতিমধ্যে বুঘরা খাঁ সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্রের নির্বুদ্ধিতায় ক্ষিপ্ত হইয়া এক বিরাট বাহিনী লইয়া উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা পর্যন্ত অগ্রসর হন (১২৮৮ খ্রীস্টাব্দ)। কৈকোবাদও সৈন্য বাহিনী লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। পিতা ও পুত্রের মধ্যে সাক্ষাতের ফলে এক আপোষ হইল। 'দিল্লীর সুলতান রাজনৈতিক কারণে বাঙ্গালার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন।' বুঘরা খাঁ তাঁহার পুত্রকে অনেক বিষয়ে সৎ পরামর্শ প্রদানের পর বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন।

নিজামউদ্দীনকে বিষপ্রয়োগ করিয়া কৈকোবাদ অকস্মাৎ আপন কর্তৃত্ব পুনঃ-স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন। জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজীকে গুরুত্বপূর্ণ বরন জায়গীরটি দান করিয়া তাঁহাকে সৈনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার পদোন্নতিতে শক্তিশালী তুর্কী ওমরাহগণ অসন্তুষ্ট হন। তাঁহারা খলজী বংশের[১] লোকদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই কৈকোবাদ পক্ষাঘাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তুর্কী ওমরাহগণ কৈকোবাদের শিশু পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহাকে সামস্‌উদ্দীন কায়ুমার্স উপাধি দেওয়া হয়। জালালউদ্দীন খলজী দিল্লী অধিকার করেন এবং কৈকোবাদকে হত্যা করিয়া (১২৯০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে) সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এইভাবে তথাকথিত দাস বংশের অবসান হইল এবং বরনীর মতে, তুর্কীদের হাত হইতে সার্বভৌম ক্ষমতা চলিয়া গেল।

দাস রাজগণের বংশ তালিকা
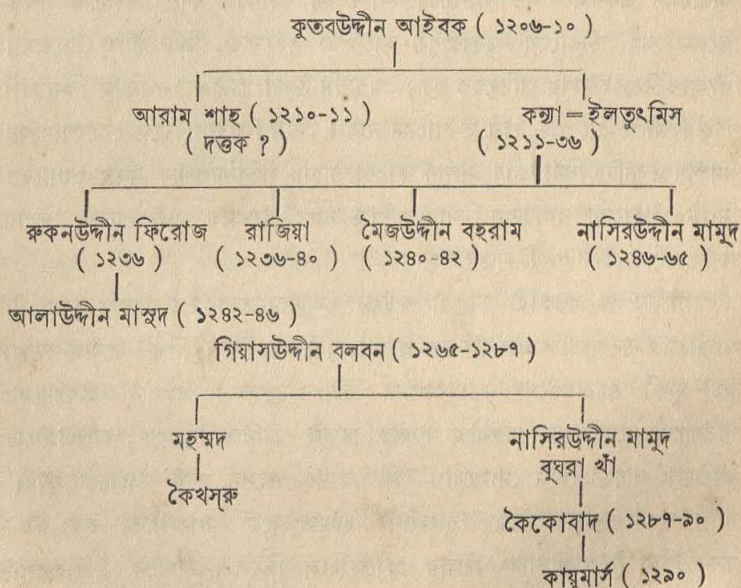
১ খলজীরা আসলে তুর্কী হইলেও তাহাদিগকে সাধারণতঃ আফগান বলিয়া মনে করা হইত। তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া আফগানিস্থানের গরমশিরে (উষ্ণ অঞ্চল) বসবাস করিয়াছিল, ফলে আফগান রীতিনীতি তাহারা অনুসরণ করিয়া চলিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দিল্লী সুলতানী রাজ্যের চরম অভ্যুদয় ও পতন

প্রথম পরিচ্ছেদ

খলজী রাজবংশ

জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজী (১২৯০-৯৬): জালালউদ্দীন খোলাখুলি ভাবে বলপ্রয়োগের দ্বারা সিংহাসন অধিকার করিলেও জনগণের বৈরভাব প্রশমিত করিতে পারেন নাই। শক্তিশালী যে তুর্কী ওমরাহগণ একজন খলজী-বংশীয়ের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত ছিলেন না, তাঁহাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত আনুগত্য হইতেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন। কিলোখ্‌রিতে তাঁহার অভিষেক হয়; অনুষ্ঠান উদযাপনের পরও তিনি কিছুকাল পর্যন্ত দিল্লীতে প্রবেশই করিতে পারেন নাই। তিনি কিলোখ্‌রিতে কৈকোবাদের অসম্পূর্ণ ভবনটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহার সভাসদগণকে নূতন প্রাসাদের নিকট তাঁহাদের বাসভবন নির্মাণ করিতে বাধ্য করেন। এই ভাবেই দিল্লীর অদূরে গড়িয়া উঠে একটি নূতন শহর।

জায়গীর ও সরকারী চাকুরী বণ্টনে স্থলতান স্বভাবতঃই তাঁহার পুত্রগণ ও আত্মীয়স্বজনদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিলেও, কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়া তুর্কী ওমরাহগণের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেন। বলবনের বংশধরদের পরিবারের মধ্যে তখন একমাত্র মালিক ছজ্জুই জীবিত ছিলেন; রাজধানীতে থাকিলে পাছে তিনি গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া বসেন তাই তাঁহাকে কারা-মাণিকপুর প্রদান করিয়া রাজধানী হইতে দূরে অপসারিত করা হয়। ফকরউদ্দীন দীর্ঘকাল যাবৎ দিল্লীর কোতোয়াল ছিলেন, তাঁহাকে ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল রাখা হয়। স্থলতানের নম্রস্বভাব এবং বলবনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাতিশয্যের দরুণ, তাঁহার প্রতি যে বিরূপ মনোভাব ছিল তাহা ক্রমশঃ দূরীভূত হয় এবং তিনি প্রবীণ ব্যক্তিদের আস্থা ও আনুগত্য লাভ করিতে

সমর্থ হন, কিন্তু যে ব্যক্তি বলবনের সিংহাসনকক্ষের সম্মুখে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছেন তিনি সাম্রাজ্য শাসনের যোগ্য কিনা সে বিষয়ে নবীনরা সন্দেহ পোষণ করিত।

জালালউদ্দীনের দুর্বলতা ক্রমশঃ সকলের নিকট প্রকট হইয়া উঠে। তাঁহার রাজত্বকালের দ্বিতীয় বৎসরে ছজ্জু কারা-মাণিকপুরে রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন, অযোধ্যার শাসনকর্তা হাতিম খাঁর সহায়তালাভেও কৃতকার্য হন। সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আরকালি খাঁর হাতে বুদাউনের নিকট বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটে, কিন্তু যখন মালিক ছজ্জু ও অন্যান্য বন্দিগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় জালালউদ্দীনের সম্মুখে আনিয়া হাজির করা হয় তখন তিনি কাঁদিয়া ফেলেন এবং তাঁহাদিগকে কেবল মুক্তিদানই করেন না, এক পানসভায় তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করেন। সুলতানের অনুগত কর্মচারিগণ যখন দয়াধর্মের এই বিপজ্জনক অভিব্যক্তির প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন, তখন তিনি বলেন যে, মুসলমানের রক্ত মোক্ষণের ফলে তিনি তাঁহার পরকাল নষ্ট করিতে পারেন না। একবার সহস্রাধিক ঠগকে[১] গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে শাস্তিপ্রদানের পরিবর্তে সুলতান তাহাদিগকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন এবং তথায় তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। কেবল একটি মাত্র ক্ষেত্রে সুলতান জালালউদ্দীন তাঁহার কোমলতা পরিহার করিয়াছিলেন। সিদিমৌলা নামে দিল্লীর একজন মুসলমান সাধুকে তাঁহার শিষ্যবৃন্দ খলিফার সিংহাসনে স্থাপন করিবার অভিপ্রায় পোষণ করিতেছে এই অভিযোগে হাতীর পায়ের তলায় পিষিয়া মারিয়া ফেলা হয়। এই শোকাবহ হত্যাকাণ্ডের পর দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং জনসাধারণের মনে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় যে সুলতানের উপর ঈশ্বরের কোপদৃষ্টি পড়িয়াছে।

রণথম্ভোরের বিরুদ্ধে প্রেরিত এক অভিযানই ছিল সুলতানের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সামরিক প্রয়াস। কিন্তু বিখ্যাত দুর্গটি দখল না করিয়াই তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন এবং এই বলিয়া তাঁহার বিক্ষুব্ধ সভাসদবর্গের মুখ বন্ধ করেন যে, পার্থিব সম্পদের লোভে তিনি একজনও সত্যধর্মাশ্রয়ীর (অর্থাৎ মুসলমানের) জীবন বিপন্ন করিতে পারেন না। তবে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে তিনি অধিকতর শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ১২৯২ খ্রীস্টাব্দে হুলাগুর এক পৌত্রের

---

১ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ঠগদের ইতিবৃত্ত অষ্টাদশ শতকেই আরম্ভ হয় নাই।

নেতৃত্বে এক বিরাট মোঙ্গল সৈন্যবাহিনী সিন্ধু অতিক্রম করিয়া সুনাম পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। সুলতান সোৎসাহে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। চেঙ্গিস খাঁর একজন বংশধর সহ কতিপয় কর্মচারী তাহাদের সৈন্যসামন্ত সমেত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সুলতানের চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়া দিল্লীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহারাই 'নব মুসলমান' নামে পরিচিত হন।

আলাউদ্দীনের দেবগিরি অভিযান (১২৯৪): জালালউদ্দীন সিংহাসন আরোহণের পর তাঁহার স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ দেন। মালিক ছজ্জুর বিদ্রোহের পর কারা-মাণিকপুর জায়গীরটি আলাউদ্দীনকে দেওয়া হয়। আলাউদ্দীন ছিলেন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি। মালিক ছজ্জুর অনুচরদের প্ররোচনায় এবং তাঁহার বিরুদ্ধে সুলতানের কানে তাঁহার স্ত্রী ও শ্বশ্রূমাতার বিষ ঢালিবার চেষ্টায় বিরক্ত হইয়া তিনি নূতন ক্ষেত্রে নিজ ভাগ্যান্বেষণের সঙ্কল্প করিলেন। ১২৯২ খ্রীস্টাব্দে সুলতানের অনুমতি লইয়া তিনি মালব আক্রমণ ও ভিলসা লুণ্ঠন করেন এবং প্রচুর ধনরত্ন লইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। সুলতান পুরস্কার স্বরূপ ইতিপূর্বে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ জায়গীর শাসন করিতেন তাহার উপর আবার তাঁহাকে অযোধ্যা শাসনের ভার অর্পণ করেন। ভিলসায় আলাউদ্দীন যাদবরাজ্য দেবগিরির বিপুল সমৃদ্ধির কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি বিন্ধ্যপর্বত লঙ্ঘন করিবেন স্থির করিলেন—এ পর্যন্ত কোন মুসলমান নরপতি অথবা সৈন্যাধ্যক্ষ সে বীর্যবত্তার কার্য সাধন করেন নাই। চান্দেরীর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ জয় করিবার উদ্দেশ্যে মালবে আর একটি অভিযান চালাইবার জন্য তিনি সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করিলেন। সুলতানের সন্দেহ দূর করিবার জন্য তিনি সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং ১২৯৪ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করেন।

যাদবরাজ রামচন্দ্র অতর্কিতে আক্রান্ত হইলেন, তাঁহার রাজধানীর সন্নিকটে মুসলমান বাহিনীর আগমন ছিল এমনই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। দেবগিরি হইতে ১২ মাইল দূরে লাসুরা নামক স্থানে তিনি আলাউদ্দীনের সম্মুখীন হন; তাঁহার পরাভব ঘটে, সে পরাভবের প্রধান কারণ ছিল সৈন্যদলের সংখ্যাল্পতা। তিনি নগরীর মধ্যস্থিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করেন, কিন্তু রসদ সংগ্রহে অসমর্থ হন। আলাউদ্দীনের সৈন্যবাহিনীতে প্রায় আট হাজার

অশ্বারোহী সৈন্য ছিল, কিন্তু অবিলম্বে আরও বিপুল সংখ্যক সৈন্য তাঁহার সহিত যোগদান করিতে আসিতেছে—এইরূপ এক গুজব রটাইয়া দিয়া তিনি তাঁহার শক্তি সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিলেন। হিন্দুরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল। আলাউদ্দীন নগর লুণ্ঠন করিয়া বহু অশ্ব ও হস্তী সংগ্রহ করিলেন। রামচন্দ্র সন্ধি করিলেন ; বিজয়ী আক্রমণকারীকে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও মহামূল্য রত্নাদি দেওয়া হইল।

রামচন্দ্রের এই পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল এই যে, আলাউদ্দীনের আক্রমণের সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শঙ্কর তাঁহার সৈন্যবাহিনীর বৃহত্তর অংশ লইয়া রাজধানী হইতে অন্যত্র গিয়াছিলেন। বিজয়গৌরবে আলাউদ্দীনের দেবগিরি ত্যাগের প্রাক্কালে শঙ্কর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণ-কারীদিগকে আক্রমণ করিলেন। আলাউদ্দীন তাঁহাকে পরাজিত করেন এবং পুনরায় দুর্গ অবরোধ ও দুর্গরক্ষী সৈন্যদলকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। তখন তিনি ইলিচপুর (বেরার) প্রদেশ এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রভূত অর্থ দাবী করিলেন, তাঁহাকে তাহা দেওয়া হইল। "লুণ্ঠিত ধনরত্নের পরিমাণ ছিল বিপুল, কিন্তু যে দুঃসাহসিক অভিযানের পুরস্কার স্বরূপ ইহা পাওয়া গিয়াছিল তাহার নজির ইতিহাসে বিরল। আলাউদ্দীনের লক্ষ্যস্থল ছিল একটি শক্তিশালী রাজ্যের রাজধানী, তাহা ছিল তাঁহার ক্ষমতাকেন্দ্র হইতে দুই মাসের পথ দূরে অবস্থিত, মাঝখানে ছিল অপরিজ্ঞাত ভূমিভাগ। সেখানকার লোকেদের পক্ষে তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করাই ছিল স্বাভাবিক।"

আলাউদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণ (১২৯৬): ধনসম্পদ লইয়া আলাউদ্দীন পথিমধ্যে কোনরূপ বাধাবিপত্তির সম্মুখীন না হইয়া নিরাপদে কারায় ফিরিয়া আসিলেন। কারায় তাঁহার অনুপস্থিতিকালে সুলতানের বিশ্বস্ত কর্মচারিগণ সুলতানকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, আলাউদ্দীন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং এজন্য তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়। কিন্তু সুলতান ঘোষণা করিলেন যে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। আলাউদ্দীনের ভ্রাতা উলুঘ খাঁ দিল্লীতে আলাউদ্দীনের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন ; তিনি মধুর বচনে আলাউদ্দীনের প্রতি সুলতানের বিশ্বাস রক্ষায় তৎপর ছিলেন। আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্য হইতে যে বিপুল ধনসম্পদ লইয়া আসিয়াছেন তাহা সুলতানকে দিবার জন্য তিনি আগ্রহান্বিত এইরূপ এক বিবরণ

প্রদান করিয়া উলুঘ খাঁ জালালউদ্দীনকে তাঁহার বিজয়ী ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কারায় যাইতে অনুরোধ করেন। কর্মচারীদের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া স্থলতান কারায় যাইয়া আলাউদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের সাক্ষাৎকালে এক শোচনীয় ঘটনা ঘটিল : পূর্বের ব্যবস্থা অনুযায়ী আলাউদ্দীনের একটি সঙ্কেতে দুইজন দুর্বৃত্ত স্থলতানকে হত্যা করিল। তাঁহার মস্তক একটি বর্শা ফলকে বিদ্ধ করিয়া আলাউদ্দীনের শাসনাধীন অঞ্চলে প্রকাশ্যস্থানে প্রদর্শন করা হইতে লাগিল। অতঃপর ১২৯৬ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে জুলাই আলাউদ্দীন স্থলতানরূপে ঘোষিত হন।

জালালউদ্দীনের জ্যেষ্ঠপুত্র আরকলি খাঁ একজন শক্তিমান পুরুষ ছিলেন, কিন্তু আলাউদ্দীনের উচ্চাভিলাষ বানচাল করিয়া দেওয়ার যে সুযোগ-সুবিধা তাঁহার ছিল তাহা বৃদ্ধ স্থলতানের মহিষী বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। আরকলি খাঁ তখন ছিলেন মুলতানে। পাছে আলাউদ্দীন দিল্লীতে আসিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন এই ভয়ে রাজমহিষী অবিলম্বে শূন্য সিংহাসন পূরণ করা প্রয়োজন মনে করিলেন। তাই তিনি মৃত স্থলতানের এক কনিষ্ঠ-পুত্রকে রুক্‌ন্‌উদ্দীন ইব্রাহিম নামে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। তাহার এই অবিবেচনাপ্রসূত কার্যে ন্যায্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিল; আরকলি খাঁর অনুচরবর্গ রাজ্ঞীর মনোনীত ব্যক্তির দাবি স্বীকার করিতে অসম্মত হইল। আলাউদ্দীন জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পথিমধ্যে মুক্তহস্তে মোহর ছড়াইতে ছড়াইতে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। দিল্লী হইতে প্রেরিত একদল সৈন্য বদাউনে তাঁহার সম্মুখীন হইল; কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষদের বশীভূত করিয়া ফেলা হইল, ফলে যুদ্ধই হইল না। আলাউদ্দীন দিল্লীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলে রুক্‌ন্‌উদ্দীন মুলতানে পলায়ন করেন। অতঃপর আলাউদ্দীন ১২৯৬ খ্রীস্টাব্দের ৩রা অক্টোবর বলবনের লালপ্রাসাদে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। উলুঘ খাঁর নেতৃত্বে বহুসংখ্যক সৈন্য মুলতানে প্রেরিত হইল। উলুঘ খাঁ মুলতান সহর দখল করিয়া জালালউদ্দীনের পুত্রগণকে ও তাঁহাদের বিশ্বস্ত কর্মচারীদের অন্ধ করিয়া দিলেন। পরলোকগত স্থলতানের পত্নীকে আটক রাখা হইল। যেসব ওমরাহ স্বর্ণ রত্নাদির লোভে আলাউদ্দীনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইল, কেন-না আলাউদ্দীনের মনে এই দৃঢ় প্রতীতি

ছিল যে, যাহারা এক প্রভুকে ত্যাগ করিয়াছে তাহাদের প্রতি নির্বিচারে বিশ্বাসস্থাপন করা যায় না।

গুজরাট জয় (১২৯৭): আলাউদ্দীন যখন দেখিলেন দিল্লীতে তাঁহার কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তখন তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর সুলতানী রাজ্যে কোন নূতন প্রদেশ সংযোজনার কোনরূপ যথার্থ প্রচেষ্টা হয় নাই। এজন্য বলবনের সতর্ক নীতি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীদের অক্ষমতাই ছিল দায়ী। আলাউদ্দীন এই ঐতিহ্য ভঙ্গ করিলেন এবং পুনরায় দিল্লীর অগণিত বাহিনী ঝঞ্ঝামদমত্ত বেগে দিগ্বিজয় ও লুণ্ঠনের পালা শুরু করিয়া দিল।

আলাউদ্দীনের আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য হইল সুসমৃদ্ধ গুজরাট প্রদেশ। সেখানে তখন বাঘেলা (চৌলুক্য) রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। দেবগিরিতে অভিযানকালে আলাউদ্দীনের প্রধান সহায় ছিলেন উলুঘ খাঁ ও নসরৎ খাঁ; ১২৯৭ সালে তাঁহাদিগকেই এক বিপুল বাহিনীর পুরোভাগে গুজরাটে প্রেরণ করিয়া রাজধানী অবরোধ ও অধিকার করা হইল। কন্যা দেবলাদেবীকে লইয়া কর্ণ দেবগিরিতে পলায়ন করিলেন, সেখানে রামচন্দ্রের রাজদরবারে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। কর্ণের পত্নী কমলাদেবী আক্রমণকারীদের হস্তে বন্দিনী হইয়া শেষ অবধি আলাউদ্দীনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। নসরৎ খাঁ বর্ধিষ্ণু বন্দর কাম্বে লুণ্ঠন করেন। সেখানেই তিনি বিখ্যাত ক্রীতদাস কাফুরের সন্ধান পান; এই কাফুরই পরে আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুজরাটের শাসনভার একজন মুসলমান শাসনকর্তার উপর ন্যস্ত করা হয়। বিজয়ী সেনাদল দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিল, কিন্তু লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির বণ্টন ব্যাপারে বৈষম্য প্রদর্শনের ফলে 'নব মুসলমানগণ' পথিমধ্যেই বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত বিদ্রোহ দমন করা হয়, বিদ্রোহীদের নির্দোষ স্ত্রী-পুত্রগণও অত্যাচারের হাত হইতে রেহাই পায় নাই।

কতকগুলি অদ্ভুত পরিকল্পনা: বারংবার সাফল্যের ফলে আলাউদ্দীন এতটা গর্বিত হইয়া উঠিলেন যে তিনি সাময়িকভাবে রাজনৈতিক বাস্তবতা বোধ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি নিজেকে বিশ্ববিজেতা হিসাবে আলেকজাণ্ডারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে, এমন কি মহম্মদের ন্যায় এক ধর্ম প্রতিষ্ঠায় সমর্থ বলিয়া মনে করিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার দরবারে অন্ততঃ এমন একজন ব্যক্তিও ছিলেন যাঁহার সত্যভাষণের সাহস ছিল। তাঁহার বিশ্বস্ত কর্মচারী দিল্লীর কোতোয়াল আলা-উল-মুল্‌ক্‌ তাঁহাকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। তিনি আরও বলিলেন যে, ভারতের একটা বিরাট অংশ যতদিন অবিজিত থাকিবে এবং রাজ্যে মোঙ্গলদের প্রতিনিয়ত আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিবে ততদিন বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন দেখা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। তিনি সুলতানকে মদ্যপান ও মৃগয়া পরিহার করিতে এবং রাজকার্যে অধিকতর কালক্ষেপ করিবার জন্য পরামর্শ দেন। আলাউদ্দীন কোতোয়ালের সদুপদেশের মর্ম অনুধাবন করিলেন, এবং তাঁহার প্রচলিত মুদ্রায় তিনি 'দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার' রূপে নিজেকে বর্ণনা করিলেও কার্যতঃ মহম্মদ অথবা আলেকজাণ্ডারকে অনুকরণ করিবার তিনি চেষ্টা করেন নাই।

রণথম্ভোর জয় (১২৯৯-১৩০১): রণথম্ভোরের বিরাট দুর্গ এই সময় চৌহান বংশীয় রাজা হামীরের অধীনে ছিল। তিনি তৃতীয় পৃথ্বীরাজের বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন। দুর্গের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থিতির দরুণ তাহা রাজপুতদের হাতে ফেলিয়া রাখা দিল্লীর সুলতানদের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। অধিকন্তু, হামীর কতিপয় বিদ্রোহী 'নব মুসলমানকে' আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং ১২৯৯ খ্রীস্টাব্দে আলাউদ্দীন রণথম্ভোর অধিকারের জন্য উলুঘ খাঁ ও নসরৎ খাঁকে প্রেরণ করিলেন। রাজপুতরা নসরৎ খাঁকে বধ করে, উলুঘ খাঁ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন। এই সংবাদ শুনিয়া আলাউদ্দীন স্বয়ং অভিযান পরিচালনার জন্য দিল্লী হইতে যাত্রা করেন; পথিমধ্যে তিনি শিকারের আনন্দ উপভোগের জন্য কয়েকদিন যাত্রা স্থগিত রাখেন। এই সময় তাঁহার ভাগিনেয় আকত খাঁ তাঁহার জীবননাশের চেষ্টা করে, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। আকত খাঁ ধৃত ও নিহত হন। অতঃপর আলাউদ্দীন রণথম্ভোরে উপস্থিত হইলেন। দুর্গের অবরোধ কার্য চলিতেছে এমন সময় আলাউদ্দীন সংবাদ পাইলেন যে, তাহার দুই ভাগিনেয় আমীর ওমর এবং মঙ্গু খাঁ বদাউন ও অযোধ্যায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। সুলতানের কর্মচারিগণ বিদ্রোহ দমন করেন; বিদ্রোহিগণকে রণথম্ভোরে প্রেরণ করা হয়, সেখানে তাঁহাদের চক্ষু নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। ইহার পরে হাজি মৌলা নামে একজন বিক্ষুব্ধ কর্মচারীর নেতৃত্বে দিল্লীতে এক ভীষণ বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। আলাউদ্দীন এই সংবাদ

অবগত হইলেন, কিন্তু ইহাতে তিনি কোনরূপ বিচলিত না হইয়া দুর্গ অবরোধ অব্যাহত রাখেন। যাহা হউক, মালিক হামিদ্উদ্দীন নামে জনৈক বিশ্বস্ত ওমরাহ হাজি মৌলাকে পরাজিত ও নিহত করেন। একবৎসরব্যাপী অবরোধের পর হামীরের একজন বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীর সহায়তায় রণথম্ভোর অধিকৃত হয়। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী ধূর্ত সুলতানের নিকট হইতে পুরস্কারের পরিবর্তে মৃত্যুই লাভ করেন। হামীরকে হত্যা করা হয় এবং উলুঘ খাঁর উপর দুর্গের ভার দেওয়া হয়।

বিদ্রোহ নিবারণের বিধিব্যবস্থা: অল্পসময়ের মধ্যে পর পর তিনটি বিদ্রোহের ফলে আলাউদ্দীনের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল যে, ভবিষ্যতে এইরূপ গোলযোগ প্রতিরোধের জন্য অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। তাঁহার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাদের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, প্রধানতঃ চারিটি কারণে বিদ্রোহের সৃষ্টি হইয়া থাকে: (১) গুপ্তচর প্রয়োগের অভাবে সুলতান সাম্রাজ্যের অবস্থা এবং জনসাধারণের মনোভাব সম্বন্ধে সংবাদ পাইতেন না, (২) অত্যধিক মদ্যপানের ফলে লোকের বিচারশক্তি লোপ পাইত ও রাজদ্রোহ প্রশ্রয় লাভ করিত, (৩) অভিজাত পরিবারবর্গের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের দরুণ পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ও ষড়যন্ত্রের সুযোগ সৃষ্টি হইত, এবং (৪) জনসাধারণের অবস্থা সচ্ছল থাকায় স্বপ্নবিলাসে ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতে তাহাদের সময়ের অভাব হইত না।

রণথম্ভোর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আলাউদ্দীন কতকগুলি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। প্রথম আঘাত আসিয়া পড়িল ওমরাহ ও রাজ-কর্মচারীদের সঞ্চিত ধনসম্পদের উপর। ধর্মস্থানে উৎসর্গীকৃত যাবতীয় বৃত্তি রদ করা হইল, প্রায় সমস্ত নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং কর-সংগ্রহকারি-গণকে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে স্বর্ণ সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল। দ্বিতীয়তঃ, গুপ্তচর প্রথার এক ব্যাপক আয়োজন করা হইল। গুপ্তচরগণ রাজকর্মচারী ও ওমরাহদের আচরণ ও আলাপ আলোচনার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিত এবং গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত প্রত্যেকটি বিষয়ই সুলতানের গোচরে আনিত। "এইরূপ বিবরণ দানের পদ্ধতি এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, ওমরাহগণ প্রকাশ্য স্থানে মুখের কথায় কিছু বলিতে সাহস করিতেন না, কিছু

বলিবার প্রয়োজন হইলে তাহা আকার-ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতেন।" তৃতীয়তঃ, মদ্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ হইল। আলাউদ্দীন নিজেও মদ্যপান ত্যাগ করিলেন: "মদের ভাঁড় ও পিপাগুলি প্রাসাদের মদ্যভাণ্ডার হইতে আনিয়া এমনই প্রভূত পরিমাণে বাহিরে ঢালিয়া ফেলা হয় যে, তাহাতে বর্ষাকালের ন্যায় স্থানটি কর্দমাক্ত হইয়া যায়।" কিন্তু মদ্যপান এতটা প্রচলিত ছিল যে সম্পূর্ণরূপে উহা বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। কিছুদিন পর আলাউদ্দীন তাঁহার মূল আদেশ সংশোধন করিয়া ওমরাহগণকে ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ বাড়ীতে মদ্যপান করিতে অনুমতি দেন, কিন্তু প্রকাশ্যস্থানে মদ্য বিক্রয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে মদ্যপান পূর্বের ন্যায় নিষিদ্ধই রহিল। চতুর্থতঃ, সুলতানের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত ওমরাহগণকে তাঁহাদের গৃহে সামাজিক উৎসবাদির অনুষ্ঠান এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে নিষেধ করা হইল। এই অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা এড়াইয়া চলাও যাইত না, কারণ সুলতানের গুপ্তচরদের সর্বত্রই দৃষ্টি থাকিত।

বর্ধিষ্ণু হিন্দু প্রধানগণের এবং রাজস্ব সংগ্রহকারীদের সম্পদ ও প্রভাব হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে রচিত বিশেষ আইন দ্বারা তাহাদিগকে দরিদ্র ও দুর্বল করিয়া ফেলা হইল। সুলতান কাজী মুঘিস্‌উদ্দীন নামক একজন বিখ্যাত মুসলমান ধর্মশাস্ত্রবিদের মতামত গ্রহণ করিলে তিনি সাম্রাজ্যে হিন্দুদের স্থান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেন: "তাহাদিগকে বলে খাজনাদার। রাজস্ব-আধিকারিক যখন তাহাদের নিকট রৌপ্য তলব করিবেন, তখন তাহাদের উচিত বাক্যব্যয় না করিয়া যৎপরোনাস্তি নম্রতা ও শ্রদ্ধার সহিত স্বর্ণ প্রদান করা। যদি রাজস্ব-সমাহর্তার এই অভিলাষ হয় যে তিনি কোন হিন্দুর মুখে থুথু ফেলিবেন তবে বিনা দ্বিধায় তাহাকে মুখব্যাদান করিতে হইবে। আল্লাহ্‌ স্বয়ং তাহাদের সম্পূর্ণ অধঃপাতের আদেশ দিয়াছেন, কেননা তাহারাই পয়গম্বরের সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক শত্রু। পয়গম্বর বলিয়াছেন যে তাহাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা তাহাদিগকে হয় হত্যা করিতে, নয় দাসত্বে পরিণত করিতে হইবে, এবং তাহাদের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইবে।"

আলাউদ্দীন হিন্দুগণকে হত্যা করিতে অথবা দাসত্বে পরিণত করিতে পারেন নাই, কেননা সাম্রাজ্যের জনশক্তির মধ্যে তাহাদের ছিল বিপুল সংখ্যাধিক্য; তবে তিনি তাহাদের বিষয়সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য কার্যকর পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে মোট উৎপাদনের অর্ধাংশ সুলতানের কোষাগারে

জমা দিতে হইত। গোচারণ ও গৃহকর ধার্য করিয়া করভার আরও বৃদ্ধি করা হয়। এতটা কড়াকড়িভাবে এইসব ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হইয়াছিল যে, "চৌধুরী, খুত ও মুকদ্দমেরা (হিন্দু রাজস্ব কর্মচারিগণ) ঘোড়ায় চড়িতে পারিত না, অস্ত্রশস্ত্র রাখিতে, উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করিতে, অথবা পান খাইতে পারিত না।" বরনী বলেন যে, খুত ও মুকদ্দমদের পত্নীরা প্রতিবেশী মুসলমানদের গৃহে দাসীবৃত্তি করিতে বাধ্য হইত। সহকারী উজীর সরাফ কাই নাকি সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশকে একখানি গ্রামের মতো একই রাজস্ব আইনের আওতায় আনিয়া ছিলেন। তাঁহার কঠোর শাসন-ব্যবস্থায় ভূম্যধিকারীদের অবস্থার এরূপ অবনতি হইল যে, রাজস্ববিভাগের একজন চাপরাশিও জনকুড়ি জোতদার, মণ্ডল ও দালালকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহাদের উপর ঘুঁসি ও লাথি চালাইতে পারিত। বরনী আরও বলেন যে, রাজস্ববিভাগের কর্মচারিগণ জনসাধারণের এমনই ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিল যে তাহাদের সহিত কেহই কন্যার বিবাহ দিতে চাহিত না।

চিতোর জয় (১৩০৩): ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মেবারের গুহিলোট রাজপুত ও দিল্লীর স্থলতানদের মধ্যে অনেকবার সংঘর্ষ হইয়াছে, কিন্তু আলাউদ্দীনের পূর্ববর্তী কোন স্থলতান প্রকৃতির দ্বারা স্থরক্ষিত এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি অধিকার করিবার জন্য কোনরূপ প্রকৃত চেষ্টা করেন নাই। আলাউদ্দীন স্বয়ং মেবার আক্রমণ করিয়া চিতোর অবরোধ করেন এবং ১৩০৩ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট তারিখে দুর্গ অধিকার করিলেন। রাজপুত কাহিনীর বিখ্যাত লেখক টড সাহেবের মতে, রাণা ভীমসিংহের স্থন্দরী পত্নী পদ্মিনীকে লাভ করাই ছিল আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি যে, রাণার নাম ছিল রতন সিংহ এবং পদ্মিনীর কাহিনী কাল্পনিক বলিয়া মনে করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে, কেননা সমসাময়িক সাক্ষ্য প্রমাণাদি এ বিষয়ে নীরব। যাহা হউক, দিল্লীর সন্নিকটে অবস্থিত একটি শক্তিশালী রাজ্য অধিকার করিবার স্বাভাবিক অভিপ্রায়েই হয়ত আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করিয়া থাকিবেন। চিতোর আক্রমণকালে কবি আমীর খসরু স্থলতানের সঙ্গে ছিলেন এবং তিনি চিতোর আক্রমণ সম্পর্কে এক মূল্যবান বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন। রাজপুতগণ অবিচলিতচিত্তে বাধা প্রদান করিয়াও চিতোর দুর্গ রক্ষা করিতে পারিল না। চিতোরের নাম রাখা হইল খিজিরাবাদ এবং ইহার শাসনভার স্থলতানের জ্যেষ্ঠপুত্র

খিজির খাঁর উপর অর্পিত হইল। কয়েক বৎসর পরে আলাউদ্দীন চিতোরের শাসনভার মালদেব নামক রাজপুত রাজার হস্তে অর্পণ করেন। মালদেবের হস্ত হইতে রাণা হামীর পুনরায় চিতোর অধিকার করিলেন।

মালব জয়ঃ রাজপুতানার দুইটি শক্তিশালী দুর্গ—রণথম্ভোর ও চিতোর—অধিকারের ফলে আলাউদ্দীনের দৃষ্টি পার্শ্ববর্তী মালব প্রদেশের প্রতি নিবদ্ধ হয়। মালব জয় করিবার জন্য ১৩০৫ খ্রীস্টাব্দে আইন-উল-মুল্‌ক মুলতানীকে প্রেরণ করা হইল। একজন হিন্দু রাজা তাঁহাকে বাধা দেন। পরমারদের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তাহা এখনও জানা যায় নাই। মুসলমানদের জয় হয়, এবং মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, ধার ও চন্দেরী প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সহর অধিকৃত হইল। আইন-উল-মুল্‌ক মালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন।

কাফুরের দাক্ষিণাত্যে প্রথম অভিযান (১৩০৬-৭)—দেবগিরিঃ ১৩০৫ খ্রীস্টাব্দের দিকে কাশ্মীর, নেপাল ও আসাম ব্যতীত সমগ্র উত্তর-ভারতে আলাউদ্দীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দাক্ষিণাত্যের সমৃদ্ধ সহরগুলিতে সঞ্চিত ঐশ্বর্যসম্পদ তাঁহার কল্পনা প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। রণথম্ভোরের পতনের অব্যবহিত পরেই দাক্ষিণাত্যে অভিযান চালাইবার জন্য উলুঘ খাঁ কিছু আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু অভিযান আরম্ভ করিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। আলাউদ্দীন যখন মেবার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন তেলিঙ্গানা জয়ের উদ্দেশ্যে ছজ্জুর নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। ছজ্জু বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার মধ্য দিয়া কাকতীয় রাজ্যের রাজধানী বরঙ্গল অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তথায় তাঁহার সৈন্যগণ পরাজিত হওয়ায় অভিযানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

১৩০৬ খ্রীস্টাব্দে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ মালিক কাফুরকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হইল। মালিক কাফুর তখন অত্যন্ত সম্মানিত 'নায়েব' (রাষ্ট্রসহকারী) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রামচন্দ্র পর পর তিন বৎসর দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ করিতে পারেন নাই, অধিকন্তু তিনি গুজরাটের পলাতক প্রাক্তন নরপতি কর্ণকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন ; তাই তাঁহাকে বশীভূত করার নির্দেশ দিয়া মালিক কাফুরকে পাঠান হয়। অভিযানের আর-একটি উদ্দেশ্য ছিল রাজা কর্ণের কন্যা দেবলা দেবীকে দিল্লীতে আনয়ন করা, কেননা তাঁহার জননী

কমলা দেবী তখন আলাউদ্দীনের অন্তঃপুরিকাগণের অন্যতমা রূপে কন্যাকে নিজের কাছে লইয়া আসিতে চাহেন।

কর্ণ বাগলানা অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। মালিক কাফুর মালবের মধ্য দিয়া অগ্রসর হন এবং গুজরাটের শাসনকর্তা আল্প্ খাঁকে তাঁহার সহিত যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ জানান। কর্ণের
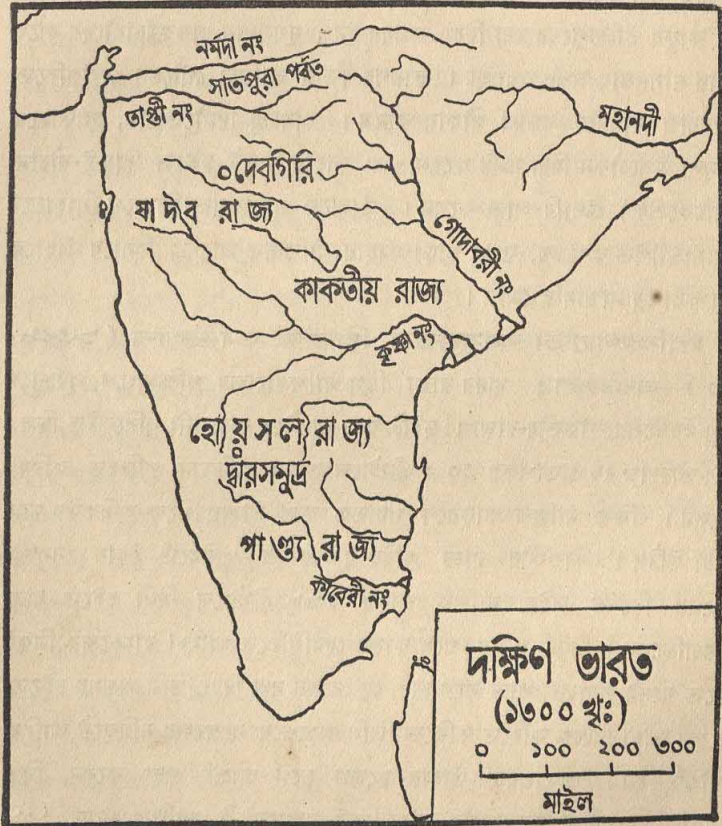
কন্যাকে দিল্লীতে প্রেরণের জন্য কাফুর যে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন তাহা কর্ণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং কাফুরের সৈন্যবাহিনীর সহিত আল্প্ খাঁর সহযোগিতার প্রচেষ্টাও বানচাল করিয়া দেন। কিন্তু কর্ণ স্বীয় দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন; তিনি রামচন্দ্রের পুত্র শঙ্করের সহিত দেবলা দেবীর বিবাহের আয়োজন

করিয়া তাঁহাকে রক্ষীদলের সঙ্গে দেবগিরিতে প্রেরণ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আল্‌প্‌ খাঁর সৈন্যবাহিনী রক্ষীদলকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া দেবলা দেবীকে আটক করে। অতঃপর দেবলা দেবীকে দিল্লীতে প্রেরণ করিয়া খিজির খাঁর[১] সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। প্রায় একই সময় আল্‌প্‌ খাঁর সৈন্যবাহিনী কর্ণকে তাঁহার পার্বত্য আশ্রয়স্থানে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে দেবগিরিতে পলায়ন করিতে বাধ্য করে। কর্ণের অবস্থা পরে কি হইল তাহা আমরা জানি না।

কাফুর ইলিচপুরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হন; মুসলমান রাজকর্মচারীদের হাতে উহার শাসনভার অর্পণ করা হয়। তারপর তিনি আসিয়া পৌছেন দেবগিরিতে, যাদবরাজ সবিনয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন। রামচন্দ্র দিল্লীতে যান, সুলতানকে বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া সন্তুষ্ট করেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে 'রায়-ই-রায়ান' (নায়কশ্রেষ্ঠ) উপাধি লাভ করেন। তাঁহাকে সামন্ত নরপতি রূপে সিংহাসনে পুনঃসংস্থাপিত করা হয়, তাহা ছাড়া তাঁহার ব্যক্তিগত জায়গীর হিসাবে তাঁহাকে দান করা হয় নাভাসরি জেলা।

দাক্ষিণাত্যে কাফুরের দ্বিতীয় অভিযান (১৩০৮-১০)—বরঙ্গল: যাদব-রাজ্য ছিল দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে, পূর্বভাগে ছিল বরঙ্গলের কাকতীয়-রাজ্য। দুইটি সুদৃঢ় প্রাচীরে রাজধানী পরিবেষ্টিত ছিল। কাকতীয়রাজ ২য় প্রতাপরুদ্র ১৩০৩ খ্রীস্টাব্দে ছজ্জুর অভিযান প্রতিহত করিয়াছিলেন। কিন্তু মালিক কাফুরকে পরাভূত করা তাঁহার পক্ষে অধিকতর দুরূহ হইয়া উঠিল। কাকতীয় রাজ্য অধিকার করার পরিবর্তে ইহার ধনসম্পদ লুণ্ঠনের নির্দেশ লইয়া মালিক কাফুর ১৩০৮ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। তেলিঙ্গনার পথে কাফুর দেবগিরিতে থামিয়া রামচন্দ্রের নিকট হইতে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করেন। যে দেশের মধ্য দিয়া তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন তাহা বিধ্বস্ত করিতে করিতে তিনি অবশেষে বরঙ্গলের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রতাপরুদ্র তাঁহার দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু দীর্ঘকাল অবরোধের পর দুর্গের বহির্দেশের রক্ষাবেষ্টনী ভাঙ্গিয়া পড়ে, ১৩১০

---

১ আমীর খসরু রচিত একটি কাব্যে দেবলা দেবীর সৌন্দর্য এবং খিজির খাঁর প্রতি তাঁহার প্রেমের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কুতবউদ্দীন মোবারক খিজির খাঁকে হত্যা করিয়া দেবলা দেবীকে বলপূর্বক বিবাহ করেন। পরে কুতবউদ্দীন মোবারককে হত্যা করিয়া রাজ্যাপহারক খসরু দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে এবং দেবলা দেবীকে স্বীয় অন্তঃপুরে লইয়া যায়।

খ্রীস্টাব্দে তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন। অশ্ব, হস্তী ও মণিমুক্তাসহ প্রভূত সামগ্রী দান করিয়া তিনি বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হন।

দাক্ষিণাত্যে কাফুরের তৃতীয় অভিযান (১৩১০-১১)—হোয়সল ও পাণ্ড্যরাজ্য: দেবগিরি ও বরঙ্গল জয়ের ফলে আলাউদ্দীন বহু ধনসম্পদের অধিকারী হইলেন। ইহাতে তাঁহার মনে এক নূতন আস্থার উদ্রেক হইল এবং সমগ্র দক্ষিণ-ভারত স্বীয় অধিকারে আনিবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। ১৩১০ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় এক বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ মালিক কাফুর ও খাজা হাজীকে বিন্ধ্য পর্বতের পরপারে প্রেরণ করা হইল। কাফুর আর একবার দেবগিরির মধ্য দিয়া অগ্রসর হন। ১৩০৯ কিংবা ১৩১০ সালে রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর শঙ্কর রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আনুগত্য সম্ভবতঃ সন্দেহাতীত ছিল না; তাই কাফুর গোদাবরী তীরে জালনা নামক স্থানে একদল সৈন্য মোতায়েন রাখিয়া স্বীয় পৃষ্ঠরক্ষার ব্যবস্থা করেন। অতঃপর তিনি হোয়সলরাজ ৩য় বীর বল্লালের রাজধানী দ্বারসমুদ্র অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকেন। মহীশূরের হাসান জেলায় হলেবিদে রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ্যটির অবস্থান ছিল কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে। অন্যান্য অঞ্চলসহ বর্তমান কালের সমগ্র মহীশূর রাজ্যটিই ছিল উহার অন্তর্ভুক্ত। ১২৯৪ খ্রীস্টাব্দে রামচন্দ্রের ন্যায় বীর বল্লালকেও অতর্কিত আক্রমণ করিয়া পরাজিত করা হয় এবং আক্রমণকারীরা তাঁহার রাজধানী অধিকার করে। কতকগুলি মন্দির লুণ্ঠন করা হয়। হোয়সলরাজ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রভূত অর্থ দেন এবং দিল্লীর অধীন করদ নৃপতি হইয়া দাঁড়ান।

দ্বারসমুদ্র হইতে কাফুর সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত পাণ্ড্য রাজ্যের দিকে অগ্রসর হন। কুলশেখরের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র সুন্দর পাণ্ড্য ও বীর পাণ্ড্যর মধ্যে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন লইয়া বিরোধ দেখা দিয়াছিল। ১৩১০ খ্রীস্টাব্দে বীর পাণ্ড্যর হস্তে পরাজিত হইয়া সুন্দর পাণ্ড্য দিল্লী যান এবং তাঁহার সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হোয়সল ও পাণ্ড্যগণ কর্তৃক শাসিত অজ্ঞাত ও দুরতিক্রমণীয় অঞ্চলের মধ্য দিয়া কাফুর কিভাবে অভিযান চালাইয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমীর খসরুর 'তারিখ-ই-আলাই' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ১৩১১ খ্রীস্টাব্দের প্রথম ভাগে কাফুর মাদুরায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখেন নাগরিকেরা নগরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই

বিখ্যাত সহরটি ধ্বংস করিয়া তিনি ৫০০ মণ মণিমুক্তা সহ প্রভূত ধনসম্পদ হস্তগত করেন। কাফুর রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রসর হন। তথায় হিন্দুদের তীর্থকেন্দ্রে বিরাট মন্দিরটি ধ্বংস করিয়া তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করিলেন। মাদুরায় একজন মুসলমান শাসনকর্তাকে রাখিয়া তিনি দিল্লী যাত্রা করেন। ১৩১১ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি দিল্লীতে পৌছেন এবং যথোচিত সংবর্ধনা লাভ করিলেন।

দাক্ষিণাত্যে কাফুরের চতুর্থ অভিযান (১৩১১)—যাদব ও হোয়সল রাজ্য: মুসলমানদের অধীনে থাকিয়া দেবগিরির শঙ্কর সর্বদাই অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। কাফুরের দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পর তিনি করদান বন্ধ করেন। ১৩১৩ খ্রীস্টাব্দে কাফুর পুনরায় দেবগিরিতে উপস্থিত হইয়া শঙ্করকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া কাফুর গুলবর্গা, রায়চুর ও মুদগল অধিকার করেন; কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চল তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। অতঃপর তিনি পশ্চিমদিকে অগ্রসর হন এবং হোয়সল রাজ্য পুনরায় লুণ্ঠন করিয়া দাভোল ও চৌল নামক দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর অধিকার করেন। এইভাবে সমগ্র দক্ষিণ ভারত দিল্লীর পদানত হইল এবং তুর্কী সাম্রাজ্য আয়তনে বৃহত্তম পরিণতি লাভ করিয়া ক্ষমতার শীর্ষস্থানে আরোহণ করিল।

মোঙ্গল আক্রমণ: বিজয়ী হিসাবে আলাউদ্দীনের সাফল্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আতঙ্কের কথা আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না। বলবনের রাজত্বকালের ন্যায় এই যুগেও মোঙ্গলদের পরাক্রম আতঙ্কের বস্তু ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে আলাউদ্দীন তাঁহার রাজ্যবিস্তারের নীতি পরিত্যাগ করেন নাই তাহাতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, দাসরাজবংশের শক্তিশালী সুলতান অপেক্ষা তিনি অধিকতর কর্মক্ষম ও অসমসাহসিক নরপতি ছিলেন।

বলবনের শাসনকালে যেমন ছিলেন শের খাঁ সুঙ্কার, তেমনি আলাউদ্দীনের শাসনকালের প্রথমভাগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সুদক্ষ প্রহরী ছিলেন জাফর খাঁ। এমন কি, জাফর খাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁহার নাম দুর্ধর্ষ আক্রমণকারীদের নিকট এক ভীতির বস্তু ছিল। আলাউদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণের অল্পকাল পরেই তিনি জলন্ধরে মোঙ্গলদের এক আক্রমণ প্রতিহত করেন। ১২৯৯ খ্রীস্টাব্দে কুৎলুঘ খাজার নেতৃত্বে দুই লক্ষ মোঙ্গল সৈন্য যমুনার তীরে শিবির স্থাপন করিয়া দিল্লীর

পক্ষে বিপদাশঙ্কার সৃষ্টি করে। আলাউদ্দীনের পক্ষে উহা ছিল এক অভূতপূর্ব সঙ্কট, কেননা মোঙ্গলরা এইবার কেবলমাত্র লুণ্ঠনের জন্য নয়, রাজ্যজয়ে বদ্ধপরিকর ছিল। জাফর খাঁ মোঙ্গলদিগকে পরাজিত করিলেন বটে, তবে তিনি নিজের প্রাণ হারাইলেন। এইরূপ একজন সুদক্ষ কর্মচারীর মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশের পরিবর্তে আলাউদ্দীন একজন শক্তিশালী সামরিক নেতার অপসারণে স্বস্তিই অনুভব করিলেন, কেননা জাফর খাঁ তাঁহার পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারিতেন।

আলাউদ্দীন যখন চিতোরের অবরোধকার্যে নিযুক্ত ছিলেন (১৩০৩) তখন তর্গীর নেতৃত্বে এক লক্ষ কুড়ি হাজার মোঙ্গল সৈন্য ভারতে উপস্থিত হয় এবং দিল্লীর সন্নিকটে শিবির স্থাপন করে। আক্রমণকারীদের অভিযান আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই আলাউদ্দীন দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিয়াছিলেন, তবে মোঙ্গল সৈন্যগণ উত্তর-ভারতের জায়গীরদারদের সৈন্যসামন্ত লইয়া রাজধানীতে সুলতানের সহিত যোগদানে সাফল্যের সহিত বাধা দিয়াছিল। শক্তিশালী যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্যবাহিনীর অভাবে মোঙ্গলদিগকে আক্রমণ করিতে না পারিয়া আলাউদ্দীন সিরি দুর্গে আত্মগোপন করেন এবং তাহাদিগকে দিল্লী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ লুণ্ঠন করিতে দেন। সৌভাগ্যবশতঃ মোঙ্গলগণ অকস্মাৎ অবরোধ তুলিয়া লইয়া অপ্রত্যাশিতভাবে পশ্চাদপসরণ করে, সম্ভবতঃ ইহার কারণ ছিল সুশৃঙ্খলে অবরোধ চালাইয়া যাওয়া সম্বন্ধে তাহাদের অনভিজ্ঞতা।

এই বিপজ্জনক অভিজ্ঞতার ফলে আলাউদ্দীন পঞ্জাব রক্ষার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হন। তিনি পুরাতন দুর্গগুলির সংস্কার এবং নূতন দুর্গ নির্মাণ ও তথায় সৈন্য মোতায়েন করেন। সৈন্যদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। ১৩০৫ খ্রীস্টাব্দে পঞ্জাবের শাসনভার গাজী মালিকের (পরবর্তীকালে গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক নামে পরিচিত) হস্তে অর্পিত হয়; তিনি বহু বৎসর দক্ষতার সহিত সীমান্ত রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৩০৪ খ্রীস্টাব্দে মোঙ্গলদের আর একবার আক্রমণ হয়। আক্রমণকারীরা যে সকল অঞ্চল অতিক্রম করিয়া আসে তাহা বিধ্বস্ত করিতে করিতে আমরোহা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। মালিক কাফুর ও গাজী মালিককে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। দুইজন দলপতি সহ প্রায় আট হাজার মোঙ্গলকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করা হইল। দলপতিগণকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলিয়া

পিষিয়া মারা হইল ; সাধারণ সৈনিকদের মস্তক ছেদন করিয়া তাহাদের মুণ্ডগুলি সিরি দুর্গের দেওয়ালে গাঁথিয়া রাখা হইল। গাজী মালিক পঞ্জাবের শাসনকর্তার পদের দ্বারা পুরস্কৃত হইলেন।

১৩০৬ খ্রীস্টাব্দে কবকের নেতৃত্বে মোঙ্গলদের এক সৈন্যবাহিনী মুলতানের সন্নিকটে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের দিকে অগ্রসর হয় এবং পথিমধ্যস্থ দেশগুলি লুণ্ঠন করে। স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তনের সময় গাজী মালিক তাহাদের পশ্চাদপসরণের পথ আটকাইয়া দাঁড়ান এবং কবকসহ প্রায় পঞ্চাশ হাজার আক্রমণকারীকে নিহত ও বন্দী করেন। বন্দীদের অনেকের হাতীর পায়ের তলায় প্রাণ যায়, অনেকের মস্তক ভূলুণ্ঠিত হয় ; তাহাদের পত্নী-পুত্রকন্যাগণকে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয় দাসদাসীরূপে।

১৩০৭-৮ খ্রীস্টাব্দে ইকবালমন্দ নামে একজন মোঙ্গল সেনাধিপতি সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন, কিন্তু তিনি পরাজিত ও নিহত হন। আলাউদ্দীনের রাজত্ব-কালের অবশিষ্টকাল মোঙ্গলরা আর তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে সাহসী হয় নাই।

নব মুসলমানদের হত্যাকাণ্ড : আলাউদ্দীন এবং তাঁহার সভাসদগণ নব মুসলমানদিগকে (যে সব মোঙ্গল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া স্থায়ী ভাবে ভারতে বসবাস করিতে থাকে) সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন ; তাহারা উচ্চ বেতনের চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধালাভে বঞ্চিত ছিল। নব মুসলমানগণও বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র দ্বারা ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিত। আলাউদ্দীনের শাসনকালের শেষভাগে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য তাহারা এক ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়া যায়। দিল্লী এবং অন্যান্য প্রদেশে যেসব নব মুসলমান বাস করিত তাহাদের সকলকে হত্যা করিবার জন্য আলাউদ্দীন নির্দেশ দেন এবং প্রায় ত্রিশ হাজার নব মুসলমানকে হত্যা করা হয়।

বাজারদর নিয়ন্ত্রণ : এক বিরাট ও ব্যাপ্তিশীল সাম্রাজ্যের জন্য এক বিপুল স্থায়ী বাহিনীর প্রয়োজন ছিল, আবার এইরূপ এক বাহিনী পরিপোষণের জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হইত। আলাউদ্দীন সামরিক ব্যয়ভার হ্রাসের চেষ্টা করেন। এক-একজন সৈন্যের বেতন তিনি ২৩৪ তঙ্কা ধার্য করেন। সৈন্যগণ যাহাতে তাহাদের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে সেজন্য তিনি দ্রব্যাদির দর নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেন এবং এতদ্দ্বারা পরোক্ষভাবে জীবনযাত্রার

ব্যয়ভার হ্রাস করেন। সুলতান নিত্যব্যবহার্য যাবতীয় দ্রব্যের দর ধার্য করিয়া দেন ; একদল কর্মনিষ্ঠ সহকারীর সহযোগিতায় শাহ্‌না-ই-মণ্ডী (বাজারের তত্ত্বাবধায়ক) নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সুলতানের আদেশ কার্যে প্রয়োগ করিতেন। দোয়াবের 'খালসা' গ্রামসমূহে নগদ টাকার পরিবর্তে রাজস্ব হিসাবে শস্যাদি আদায় করা হইত। খাদ্যাভাব দেখা দিলে সরকার যাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে দিল্লীর রাজ-শস্যাগারে খাদ্যশস্য মজুত রাখা হইত। শাহ্‌না-ই-মণ্ডীর দপ্তরে সকল ব্যবসায়ীর নাম তালিকাভুক্ত করিতে হইত এবং শাহ্‌না-ই-মণ্ডীই শস্যের আমদানী-রপ্তানী তত্ত্বাবধান করিতেন। কেহই শস্যাদি মজুত করিতে অথবা বর্ধিত মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিত না। বরনী বলেন, অনাবৃষ্টির সময় শাহ্‌না-ই-মণ্ডী প্রস্তাব করিয়াছিলেন শস্যমূল্য সামান্য কিছু বৃদ্ধি করা হউক, এই অপরাধের জন্য তাঁহাকে ২১ কোড়া (বেত্রাঘাত) খাইতে হয়। নিয়মকানুন যে কতটা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হইত তাহার কিছুটা আভাস ইহাতেই পাওয়া যায়। এইসব নিয়মকানুনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যৌক্তিকতা সম্পর্কে আমাদের মতামত যাহাই হউক না কেন, এতদ্দ্বারা সাময়িকভাবে সুলতানের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল। বরনী বলেন যে অনাবৃষ্টির সময়েও শস্যাভাব দেখা দেয় নাই। গম, যব, চাউল, বস্ত্র, চিনি, ঘি, তৈল, লবণ ও অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল , এমন কি, অশ্ব ও গবাদি পশুর মূল্যও এই সকল নিয়মকানুনের আওতায় আনা হয়। ক্রীতদাস ও পরিচারিকাদের মূল্যও স্বভাবতঃই হ্রাস পায়। দালালদের উপর নিয়মকানুন এমনই কড়াকড়িভাবে প্রযুক্ত হইত যে, তাহারা আর দরদস্তুরের কোনরূপ হেরফের করিতে পারিত না। কোন দোকানদার পরিমাণে কম জিনিস দিয়া কোন ক্রেতাকে ঠকাইলে দোকানদারের শরীর হইতে সমপরিমাণ মাংস কাটিয়া লওয়া হইত। জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস পাওয়ার ফলে আলাউদ্দীন রাজকোষ হইতে অত্যধিক অর্থ ব্যয় না করিয়াও এক বিরাট স্থায়ী সৈন্যবাহিনী রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আলাউদ্দীনের শেষ জীবন : আলাউদ্দীন তাঁহার রাজত্ব-কালের শেষ দিকে ভগ্নস্বাস্থ্য এবং পত্নী ও পুত্রকন্যাদের অবহেলার দরুণ মালিক কাফুরের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া পড়েন। মালিক কাফুরের ষড়যন্ত্রের ফলে রাজদরবার ও অন্তঃপুরে এক বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। খিজির খাঁকে

গোয়ালিয়রের কারাতুর্গে প্রেরণ করা হয় এবং তাঁহার মাতা পুরাতন দিল্লীতে বন্দিনী হইয়া থাকেন। খিজির খাঁর দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এই সন্দেহে গুজরাটের শাসনকর্তা আল্প্ খাঁকে হত্যা করা হয়। এই সমস্ত অত্যাচারমূলক ব্যবস্থার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠে। গুজরাটে আল্প্ খাঁর সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দেবগিরিতে রামচন্দ্রের জামাতা হরপাল মুসলমানদের কতকগুলি সামরিক ঘাঁটি অধিকার করিয়া নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্য কিছুই করা হইল না। ১৩১৬ খ্রীস্টাব্দের ২রা জানুয়ারী আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয়। অনেকের মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, কাফুরই বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেন। একজন মুসলমান ঐতিহাসিকের ভাষায় "ভাগ্য, চিরকাল যেমন হইয়া আসিতেছে তেমনই, নিজেকে চঞ্চল প্রতিপন্ন করিল; নির্বন্ধ নিজস্ব ছুরিকাঘাতে তাঁহার ধ্বংসসাধন করিল।"

আলাউদ্দীনের কৃতিত্ব: আলাউদ্দীন ছিলেন তৎকালীন যুগের শক্তিমান পুরুষের এক দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার স্বভাব ছিল নির্মম, শত্রু-মিত্র কেহই তাঁহার অনুকম্পা প্রত্যাশা করিতে পারিত না। সেই বিশ্বাসঘাতকতা ও সংঘর্ষের যুগে নিষ্ঠুরতার কিছুটা প্রয়োজন অবশ্যই ছিল, কিন্তু আলাউদ্দীন সম্ভবতঃ সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সাফল্যের মধ্যেই প্রতিক্রিয়ার বীজ নিহিত ছিল: রক্তমোক্ষণ ও অস্ত্রবল প্রয়োগের নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি সাম্রাজ্যের যে বিরাট সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার চক্ষের সম্মুখেই প্রায় ধ্বসিয়া পড়ে এবং তিনি অসহায়ভাবে 'সক্রোধে নিজের মাংস কামড়াইতে থাকেন।'

কিন্তু আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের ইতিহাসের দুইটি জিনিস স্থায়ী বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। প্রথমতঃ, দিল্লীর মুসলমান সুলতানদের মধ্যে তিনিই প্রথম ভারতের বৃহত্তর অংশ লইয়া একটি সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। বহু শতাব্দীর বিচ্ছিন্নতার পর দেশে পুনরায় রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধন ঘটে এবং বিন্ধ্যের পরপারে ভারতবর্ষের যে অংশ তাহার সহিত উত্তরাঞ্চলের যোগসাধন হয়। তবে দাক্ষিণাত্য তখনও ছিল অনিচ্ছুক অংশীদারের মতো, কেননা স্থানীয় রাজবংশসমূহের সহিত সেখানকার ছিল গভীর নাড়ীর টান, আর এদিকে মঠমন্দির ধ্বংসের ফলে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জনচিত্তে বিদ্বেষভাব পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। তবে

আলাউদ্দীন বাহমনী রাজ্য স্থাপনের, এবং উহারই মারফৎ দাক্ষিণাত্যে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করিয়া যান। দ্বিতীয়তঃ, যে তুর্কী সাম্রাজ্য এতকাল কতকগুলি 'সামরিক জায়গীরের' সমবায় ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই ছিল না, আলাউদ্দীন তাহার শাসন ব্যবস্থায় এক প্রকারের সংহতি আনয়ন করেন। তিনি একজন প্রকৃত সাম্রাজ্যস্রষ্টা ছিলেন, কেননা সাম্রাজ্য সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি একমাত্র সামরিক শক্তির প্রতিই তাঁহার মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি জানিয়া শুনিয়াই নিজেকে রক্ষণশীল উলেমাদের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখেন এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ঐহিক ব্যাপারে ঐহিক বিবেচনাকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। একজন উৎসাহী কাজীর নিকট তিনি এইরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন, "ইহা আইনসম্মত অথবা বে-আইনী (অর্থাৎ ইহা ইসলামের বিধিসম্মত কি না) কিনা, তাহা আমি জানি না; আমি রাষ্ট্রের পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক, অথবা জরুরী অবস্থার পক্ষে যাহা উপযুক্ত মনে করি, সেরূপ নির্দেশই দিয়া থাকি।" ইহা ছিল একটা নূতন নীতির সংজ্ঞা নির্দেশ এবং মহম্মদ তুঘলুক যে নীতি অনুসরণ করিতেন তাহারই একটা পূর্বাভাস।

আলাউদ্দীন সম্ভবতঃ নিরক্ষর ছিলেন। বরনী বলেন শিক্ষার সহিত তাঁহার 'কোন পরিচয় ঘটে নাই', কিন্তু ফিরিস্তা বলেন যে সিংহাসন লাভের পর তিনি ফারসী পড়িতে শিখিয়াছিলেন। তবে সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। আমীর খসরু এবং মীর হাসান দেহ্লভি উভয়েই তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। দুর্গ এবং মসজিদ নির্মাণেও আলাউদ্দীনের সবিশেষ উৎসাহ ছিল।

কুতবউদ্দীন মোবারক খলজী (১৩১৬-২০): আলাউদ্দীন তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে খিজির খাঁকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার নাবালক পুত্র শিহাবউদ্দীন ওমরকে উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করিয়া যান। খুব সম্ভব মালিক কাফুরের প্রভাবেই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আলাউদ্দীনের নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া কাফুরই প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের শাসক হইয়া দাঁড়াইলেন। খিজির খাঁ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাদি খাঁকে অন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আলাউদ্দীনের বিধবা পত্নীকে কাফুর বলপূর্বক বিবাহ করেন, তারপর তাঁহাকে নিক্ষেপ করেন কারাগারে। আলাউদ্দীনের তৃতীয় পুত্র মোবারককেও অন্ধ করিয়া ফেলার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি

কাফুরের লোকজনদিগকে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করিয়া ঘৃণিত খোজাকে হত্যা করিবার জন্য প্ররোচিত করেন। কাফুরের মৃত্যুর পর মোবারক শিহাবউদ্দীন ওমরের নামে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। কিন্তু ১৩১৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নাবালক শিহাবউদ্দীন ওমরকে অন্ধ করিয়া ফেলা হয় এবং সুলতানরূপে মোবারক আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মোবারক সুষ্ঠুভাবেই রাজকার্য শুরু করিয়াছিলেন। তিনি বহু বন্দীকে মুক্তিদান করেন, মালিকদের বাজেয়াপ্ত জমিজমা ফিরাইয়া দেন, তাঁহার পিতা ব্যবসায়ীদের মালপত্রের উপর ধার্য আবশ্যিক শুল্কের মতো যে সব বিশেষ কঠোর বিধান প্রয়োগ করিতেন সেগুলি রদ করেন। মালিক কাফুরের হত্যাকারীর দল অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দাবী করিতে থাকে, তিনি তাহাদের শাস্তি বিধান করেন। শাসন-ব্যবস্থার কঠোরতা হঠাৎ শিথিল হওয়ায় অরাজকতা বৃদ্ধি পাইল, সুলতানের ব্যভিচারের ফলে অবস্থার আরও অবনতি হইল। দেখিতে দেখিতে তিনি তাঁহার প্রিয়পাত্র খসরু নামক এক হীনচেতা ব্যক্তির হস্তে ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন। খসরু পূর্বে ছিল নীচ জাতীয় হিন্দু, পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আইন-উল-মুলক্ কর্তৃক গুজরাটের বিদ্রোহ দমিত হইল এবং প্রদেশটির শাসনভার সুলতানের শ্বশুর জাফর খাঁর হস্তে ন্যস্ত করা হয়। দেবগিরিতে বিদ্রোহ দমন করিবার উদ্দেশ্যে মোবারক স্বয়ং ১৩১৭ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন। সুলতান দেবগিরির সন্নিকটবর্তী হইতে না হইতেই হরপাল পলায়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া যন্ত্রণা দিতে দিতে প্রাণবধ করা হইল। প্রাক্তন যাদব রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, এমনকি গুলবর্গা ও দ্বারসমুদ্রে মুসলমান কর্মচারিগণকে নিয়োগ করা হইল। যেসব মন্দির ধ্বংস করা হইয়াছিল সেগুলির মালমসলা দিয়া দেবগিরিতে একটি বৃহৎ মসজিদ নির্মিত হইল। খসরুকে মাদুরায় এক অভিযানে প্রেরণ করা হয়।

মোবারকের জীবননাশের এক ভীষণ ষড়যন্ত্র কার্যে পরিণত হইবার পূর্বেই উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িল; ষড়যন্ত্রকারী এবং তাহাদের আত্মীয়স্বজনদের প্রাণ গেল। খিজির খাঁ ও শিহাবউদ্দীন ওমরকে হত্যা করা হইল এবং খিজির খাঁর দুর্ভাগিনী পত্নী দেবলা দেবীকে সুলতানের অন্তঃপুরে আনয়ন করা হইল। সাফল্যে আত্মহারা হইয়া মোবারক 'জঘন্যতম ব্যভিচার এবং যৎপরোনাস্তি বিরক্তিজনক ভাঁড়ামির স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন।' তাঁহার বাহাদুরির অন্ত

ছিল না, তিনি 'আল-ওয়াসিক বিল্লা' উপাধি ধারণ করিয়া ধর্মাধ্যক্ষ সাজিয়া বসিলেন ; এইভাবে খিলাফতের প্রতি চিরাচরিত আনুগত্য পরিহার করা হইল।

জাফর খাঁকে গুজরাট হইতে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহার স্থলে খসরুর ভ্রাতা হিসামউদ্দীনকে নিয়োগ করা হয়। এই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি গুজরাটে উপস্থিত হইবার অল্পকাল পরেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু স্থানীয় ওমরাহগণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করেন। মোবারক তাহাকে শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে পুনরায় তাহাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। ইহার পর দেবগিরির শাসনকর্তা মালিক ইয়াকলাকি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। দিল্লী হইতে প্রেরিত সৈন্যবাহিনী তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করিল। দিল্লীতে তাঁহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত লঘু শাস্তি দেওয়া হইল, কিন্তু অত্যল্পকাল পরেই তাঁহার প্রতি পুনরায় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে সামানার শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়।

ইতিমধ্যে খসরু মাদুরায় বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া তেলিঙ্গানায় আসিয়া উপস্থিত হন। বরঙ্গলের দুর্গ অবরোধ করিয়া হিন্দুদের এমনই দুরবস্থার মধ্যে ফেলা হইল যে তাহারা অপমানজনক সর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। পাঁচটি জেলা ছাড়িয়া দিয়া তাহারা গুরুভার বার্ষিক করদানে স্বীকৃত হইল। খসরু দক্ষিণ ভারতে নিজেকে একজন স্বাধীন নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার সম্ভাবনা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই দুরভি-সন্ধির সংবাদ সুলতানকে জানান হইল, কিন্তু নির্বোধের ন্যায় তাহা উপেক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার এই প্রিয়পাত্রকে অবিলম্বে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পর খসরু তাঁহার স্বজাতীয়দের এক বিরাট দলকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া সর্বদা তাহাদের সঙ্গে করিয়া চলাফেরা করিতে লাগিলেন। সুলতানকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি এমনই মোহান্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে প্রকৃত বন্ধুদের কথায়ও কর্ণপাত করিলেন না। ১৩২০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে খসরুর লোকের হাতেই মোবারক প্রাণ হারাইলেন।

খসরু (১৩২০)ঃ এবার খসরু, নাসিরউদ্দীন খসরু শাহ উপাধি লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বহু রাজভক্ত ওমরাহ এবং কর্মচারীর

প্রাণ গেল, খলজী বংশেও বাতি দিতে আর কেহ রহিল না। দেবলা দেবীকে টানিয়া আনা হইল খসরুর হারেমে। খসরুর আত্মীয়-স্বজন এবং স্বজাতীয় লোকদের মধ্যে বিশেষ অনুগ্রহ বিতরণ করা হইতে লাগিল। এই সব নীচ-বংশজাত ভাগ্যান্বেষীরা মসজিদগুলির পবিত্রতা নষ্ট করিয়া বেড়াইতে লাগিল, রাজদরবারেই শুরু করিয়া দিল মূর্তিপূজাদির অনুষ্ঠান। ইহাতে মুসলমান অভিজাত শ্রেণী বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে দীপালপুরের শাসনকর্তা গাজী মালিক বিশ্বাসঘাতক কাফেরের শাস্তি বিধানের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। বহু শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী ওমরাহ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে সমর্থন করিতে লাগিলেন। ১৩২০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি খসরুকে দিল্লীর নিকট পরাজিত করেন। তাঁহাকে বন্দী করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। সমবেত ওমরাহগণ বিজেতাকে সুলতানরূপে অভিনন্দিত করিলেন, তাঁহার নাম হইল গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক শাহ। বরনী বলেন, "ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হইল এবং ইহাতে নবজীবনের সঞ্চার হইল। জনসাধারণের মনে সন্তোষ এবং অন্তরে পরিতৃপ্তি দেখা দিল।"

খলজী বংশ
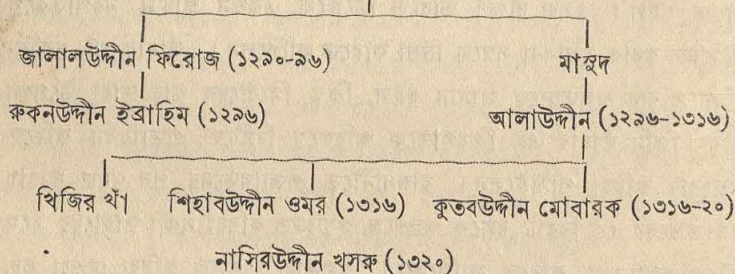
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তুঘলুক[1] বংশ

গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক (১৩২০-২৫)

এই নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন ছিলেন তুর্কিদের করৌনা শাখার অন্তর্গত। করৌনা তুর্করা ছিল সামান্য অবস্থার লোক। ফিরিস্তা বলেন যে, গিয়াসউদ্দীনের পিতা ছিলেন বলবনের একজন তুর্কী ক্রীতদাস এবং মাতা ছিলেন পঞ্জাবের এক জাঠ রমণী। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে তাঁহার সাফল্যের দরুণই তিনি আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে প্রাধান্য লাভ করেন। সিংহাসনে আরোহণকালে তিনি পরিণতবয়স্ক এবং অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিলেন। জমি ও চাকুরী দিয়া তিনি পুরাতন কর্মচারিগণকে সন্তুষ্ট করেন। খলজী পরিবারের যেসব বালিকা জীবিত ছিল তাহাদের উপযুক্ত বিবাহের ব্যবস্থা করা হইল। খসরু তাঁহার প্রিয়পাত্র ও সমর্থকগণকে যে অর্থদান করিয়াছিল তাহা বাজেয়াপ্ত করা হইল, কিন্তু বিখ্যাত সাধু শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার নিকট হইতে কিছুই পুনরুদ্ধার করা গেল না। তিনি বলিলেন, রাজ্যাপহারকের নিকট হইতে তিনি যে প্রভূত অর্থ লাভ করিয়াছিলেন তাহার সবই দানধর্মে ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন। সুলতান শেখ নিজামউদ্দীনের ধর্মমত ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দিলেন, কিন্তু দরবারের ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌গণ তাঁহাকেই সমর্থন করেন। সুলতান এবং শেখের মধ্যে মনান্তর ঘুচিল না।

গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক একজন সতর্ক শাসনকর্তা ছিলেন। কৃষিকার্যে তিনি উৎসাহ দেন। সেচের জন্য অনেক খাল খনন করা হয়। রাজপ্রাপ্য কখনও মোট উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ অথবা একাদশ অংশের অধিক ছিল না। কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে আলাউদ্দীনের অনুসৃত নির্যাতনের নীতিই অনুসৃত হইত: "হিন্দুদের হাতে কেবল ততটুকুই রাখিতে দেওয়া উচিত যাহাতে

---

১ কোন কোন লেখকের মতে 'তুঘলুক' একটি উপজাতির নাম। আবার অন্যান্যের মতে ইহা একটি ব্যক্তিগত নাম।

তাহারা যেমন একদিকে ধনবলে উদ্ধত হইয়া উঠিতে না পারে, আবার অপরদিকে নৈরাশ্যের বশে জমিজমা ও কারবার ছাড়িয়া চলিয়া না যায়।" রাজস্ব সংগ্রহ এবং হিসাবনিকাশ পরীক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। বিচার ও পুলিশ বিভাগের সংস্কার সাধন করা হয়। ডাক আনা-নেওয়ার জন্য স্থন্দর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সেনাবিভাগে কঠোর শৃঙ্খলার প্রবর্তন এবং সামরিক কর্মচারীরা ও সৈন্যেরা যাহাতে সরকারকে প্রতারিত করিতে না পারে তজ্জন্যও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

কাকতীয় বংশের পতন: দাক্ষিণাত্যে বরঙ্গলের ২য় প্রতাপরুদ্র নূতন স্থলতানী বংশের আধিপত্য স্বীকার করিলেন না। ১৩২১ খ্রীস্টাব্দে কাকতীয় রাজাকে বশীভূত করিবার জন্য স্থলতানের জ্যেষ্ঠপুত্র ও উত্তরাধিকারী জুনা খাঁর নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হইল। বরঙ্গলে উপস্থিত হইয়া তিনি দুর্গ অবরোধ করিলেন। তুমুল যুদ্ধের পর হিন্দুরা সন্ধির প্রস্তাব করিল, কিন্তু তাহাদের সর্তাদি প্রত্যাখ্যান করা হইল। যুবরাজের শিবিরের কয়েকজন দুষ্ট লোক গুজব রটাইয়া দিল যে, স্থলতান দিল্লীতে মারা গিয়াছেন। জুনা খাঁর এই কাহিনীতে বিশ্বাস জন্মিল। তিনি অবরোধ তুলিয়া লইলেন। দিল্লীর পথে তিনি সত্য আবিষ্কার করেন।

দুই বৎসর পরে তিনি বরঙ্গলে আর একবার অভিযান চালান এবং প্রতাপরুদ্রকে তাঁহার পরিবার, পোষ্যবর্গ এবং প্রধান প্রধান কর্মচারিগণের সঙ্গে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। হিন্দুরাজাকে দিল্লীতে প্রেরণ করা হইল। এইভাবেই প্রাচীন কাকতীয় রাজবংশের কলঙ্কময় অবসান ঘটিল। বরঙ্গলের নাম হইল স্থলতানপুর। তেলিঙ্গনার শাসনভার মুসলমান কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত হইল।

তেলিঙ্গনা অধিকারের পর জুনা খাঁ উড়িষ্যায় (জাজনগরে) হানা দিয়া কতকগুলি হস্তী সংগ্রহ করেন।

বাঙ্গালায় বিদ্রোহ: বঘরা খাঁ এবং তাঁহার পুত্র রুকনউদ্দীন কৈকায়ুস ১৩০১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন স্থলতানরূপে বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন। অতঃপর একজন প্রাক্তন দাস বাঙ্গালার শাসন, ক্ষমতা অধিকার করিয়া সামসউদ্দীন ফিরোজ শাহ নামে ১৩২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালাদেশে শাসনকার্য চালান। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র শিহাবউদ্দীন বুঘ্‌দাহ্‌, সম্ভবতঃ লক্ষ্মণাবতীতে

রাজপদে অভিষিক্ত হন ; তবে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন লইয়া তাঁহার দুই ভ্রাতা নাসিরউদ্দীন ও গিয়াসউদ্দীনের সহিত তাঁহার বিরোধ দেখা দেয়। গিয়াসউদ্দীন সোনারগাঁওয়ের (পূর্ববঙ্গ) শাসনকর্তারূপে কিছুকাল ধরিয়া কার্যতঃ স্বাধীনতাই উপভোগ করিতেছিলেন। তিনি শিহাবউদ্দীনকে পরাভূত করিয়া লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসন অধিকার করেন। এইসব গোলযোগের প্রতি স্থলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলুকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৩২৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্বয়ং বাঙ্গালা অভিমুখে অগ্রসর হন। ত্রিহুতে নাসিরউদ্দীনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে নাসিরউদ্দীন লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়াছিলেন। গিয়াসউদ্দীনকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়। নাসিরউদ্দীন উত্তর-বঙ্গের সামন্ত নরপতি হইলেন। পূর্ববঙ্গ সরাসরি দিল্লীর শাসনাধীন হইয়া পড়ে ; বহরাম খাঁর হস্তে প্রদেশটির শাসনভার ন্যস্ত হয়। প্রভূত লুণ্ঠিত সামগ্রী লইয়া স্থলতান দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন।

গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যু (১৩২৫): বাঙ্গালা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর গিয়াসউদ্দীন তুঘলুককে তাঁহার পুত্র জুনা খাঁ দিল্লীর সন্নিকটস্থ আফগানপুরে অভ্যর্থনা করেন। এই উপলক্ষে একটি শিবির নির্মিত হইয়াছিল, উহা 'এমনভাবে পরিকল্পিত হইয়াছিল যেন বিশেষ একটি অংশে হস্তীগাত্রের স্পর্শমাত্রেই সমগ্র শিবিরটি ভাঙ্গিয়া পড়ে।' পুত্রের অনুরোধে স্থলতান বাঙ্গালা হইতে যে সকল হস্তী লইয়া আসিয়াছিলেন সেগুলিকে শিবির প্রদক্ষিণ করাইবার অনুমতি দান করেন। শিবিরের পল্‌কা দিকটায় হাতীর গায়ের ধাক্কা লাগিতে না লাগিতেই হুড়মুড় করিয়া শিবির ভাঙ্গিয়া পড়ে, বৃদ্ধ স্থলতান চাপা পড়িয়া মারা যান। ইবন বতুতার মতে, দেখিতে দুর্ঘটনার মতো মনে হইলেও ইহা ছিল জুনা খাঁর সতর্ক পরিকল্পনার পরিণতি। স্থলতানের মৃত্যুর অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার শত্রু নিজামউদ্দীন আউলিয়া এবং তাঁহার অনুগ্রহভাজন কবি আমীর খসরুরও মৃত্যু ঘটে।

শাহজাহানের দিল্লীর সামান্য কয়েক মাইল দক্ষিণে গিয়াসউদ্দীন নির্মিত দুর্গ-রাজধানী তুঘলুকাবাদের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। ইবন বতুতা বলেন, "এইখানেই ছিল তুঘলুকের ধনসম্পদ ও সৌধমালা এবং স্বর্ণমণ্ডিত ইষ্টকে নির্মিত সেই বিরাট প্রাসাদ—যাহা সূর্যোদয়ে এমনই দীপ্তিমান হইয়া উঠিত যে কেহই সেদিকে দৃষ্টিতে চাহিতে পারিত না। সেখানে তিনি বিপুল সম্পদ

সঞ্চিত করিয়াছিলেন ; লোকে বলিত সেখানে তিনি এক চৌবাচ্চা তৈয়ারী করিয়া তাহা গলিত স্বর্ণে পরিপূর্ণ করিয়া তোলেন, তাহা এক প্রকাণ্ড স্বর্ণস্তূপে পরিণত হয়··· ।”

মহম্মদ তুঘলুকের চরিত্র : গিয়াসউদ্দীন তুঘলুকের পর জুনা খাঁ মহম্মদ তুঘলুক নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এক বিচিত্র ব্যক্তি ছিলেন। বরনী তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন। তিনি বলেন, “আমি একথা না বলিয়া পারি না যে, সুলতান মহম্মদ ছিলেন সৃষ্টির অন্যতম আশ্চর্য। তাঁহার পরস্পর-বিরোধী গুণাবলী জ্ঞান ও সহজ বুদ্ধির অগোচর ছিল।” বরনী কর্তৃক মহম্মদ তুঘলুকের চরিত্রচিত্রণকে কেহ কেহ এক প্রকারের প্রহসন—অদ্ভুতরসাশ্রিত ব্যাজস্তুতি মনে করেন। যাহা হউক, সুলতান অবশ্যই একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন নিপুণ ক্রীড়াবিদ ও সুদক্ষ যোদ্ধপুরুষ। তাঁহার বদান্যতা একটা কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছিল। বরনী বলেন যে, হাতিমের ন্যায় দানবীরেরা এক বৎসরে যাহা দান করিতেন, তাহা ছিল তাঁহার এককালীন দান মাত্র। মদ্যপান ও ব্যভিচারের যুগে একমাত্র তিনিই ছিলেন এই সকল পাপাচার হইতে মুক্ত। রক্ষণশীল মুসলমান ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌গণের রাজনৈতিক প্রভাবে হস্তক্ষেপের ফলে তিনি তাঁহাদের অসন্তুষ্টির কারণ হইলেও, নিজে ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ সুন্নী ; তবে তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা ঔরঙ্গজেবের গোঁড়ামির পর্যায়ে পৌঁছে নাই। বরনী তাঁহার বিরূপ সমালোচক হইয়াও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি ভগবদ্ভক্ত ছিলেন এবং বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সম্মান করিয়া চলিতেন। তিনি সংস্কৃতিবান ও বিদ্বান ছিলেন—তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ, দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ ছিল। প্রাচীন পারসিক সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল এবং ফারসী ভাষায় তিনি চমৎকার কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর ছিল অতি চমৎকার। তাঁহার এই সকল চমৎকার গুণের সঙ্গে পিতার প্রতি তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এবং যে নির্মম নৃশংসতা তাঁহার রাজত্বকালের ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করিয়াছে তাহার সামঞ্জস্য বিধান করা সুকঠিন।

তাঁহার চরিত্রগত এই স্ববিরোধে বিমূঢ় হইয়া এলফিনস্টোন সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি কিয়ৎপরিমাণে উন্মত্ততা রোগের বশীভূত ছিলেন কিনা।

তাঁহার কতকগুলি দুঃসাহসিক সামরিক কার্য এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে অবিবেচনাপ্রসূত বলিয়া অভিহিত করা যায় বটে, কিন্তু অল্প পরেই আমরা দেখিতে পাইব যে, এইরূপ অভিমত যুক্তিযুক্ত কিনা তাহাতে ঘোর সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ একথা বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে, তাঁহার ভ্রমপ্রমাদের কারণ ছিল তাঁহার উগ্র স্বভাব এবং বিরুদ্ধ মতামত সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা। তাঁহার চরিত্রে সতর্কতার অভাব ছিল এবং তিনি পরিণাম বিবেচনা না করিয়াই কাজ করিতেন। বিজ্ঞ এবং স্থিরমস্তিষ্ক রাজনীতিবিদের যাহা প্রধান গুণ সেই বাস্তব-বুদ্ধির তাঁহার অভাব ছিল। এই কারণেই তিনি বিশাল ও গোলযোগপূর্ণ সাম্রাজ্যের ভার বহনে ব্যর্থ হন। তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের জন্য তাঁহাকেই সাধারণতঃ আংশিকভাবে দায়ী করা হয়। একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার মোটের উপর দীর্ঘ শাসনের বিপর্যয়কর পরিণতি দেখা দিয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রাজনৈতিক অধঃপতনের এমন অনেক গভীর কারণ ছিল যাহার উপর ব্যক্তিবিশেষের কোনরূপ হাত ছিল না।

প্রথম দিকের নানা বিদ্রোহঃ ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মহম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতারা ইহাতে কোনরূপ বাধা দেন নাই। মুক্তহস্ত বদান্যতা এবং সরকারী চাকুরী বণ্টনের দ্বারা তিনি যুগপৎ জনচিত্ত ও ওমরাহদের হৃদয় জয় করিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণও তাঁহার কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু সেযুগে প্রত্যেক রাজত্বকালেই বিদ্রোহ ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। মহম্মদের রাজত্বকালে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তাঁহারই জ্ঞাতিভ্রাতা বহাউদ্দীন গুড়শাস্প (১৩২৬-২৭)। তিনি ছিলেন গুলবর্গার সন্নিকটে সাগরের জায়গীরদার। তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া আসা হইলে, সেখানে জীবন্ত অবস্থায় তাঁহার গাত্রত্বক মোচন করিয়া তাঁহার প্রাণবধ করা হয়।

১৩২৭-২৮ খ্রীস্টাব্দে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের পর কোণ্ডানার (পুণার সন্নিকটস্থ বর্তমান সিংহগড়) হিন্দু নৃপতি বিদ্রোহী হইয়া উঠেন, কিন্তু দীর্ঘকাল তাঁহার দুর্গ অবরোধের পর তিনি সুলতানের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। ইহার পর মূলতানের বহরাম আইবা বিদ্রোহ করেন। তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী ওমরাহ এবং মূলতান, উচ ও সিন্ধুর সীমান্তবর্তী জায়গীরগুলির ভার

তাঁহারই উপর ন্যস্ত ছিল। সুলতান তখন দেবগিরিতে ছিলেন, তিনি দিল্লী হইয়া দ্রুতগতিতে মুলতান যাত্রা করেন। বহরাম পরাজিত ও বন্দী হন; তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হয়।
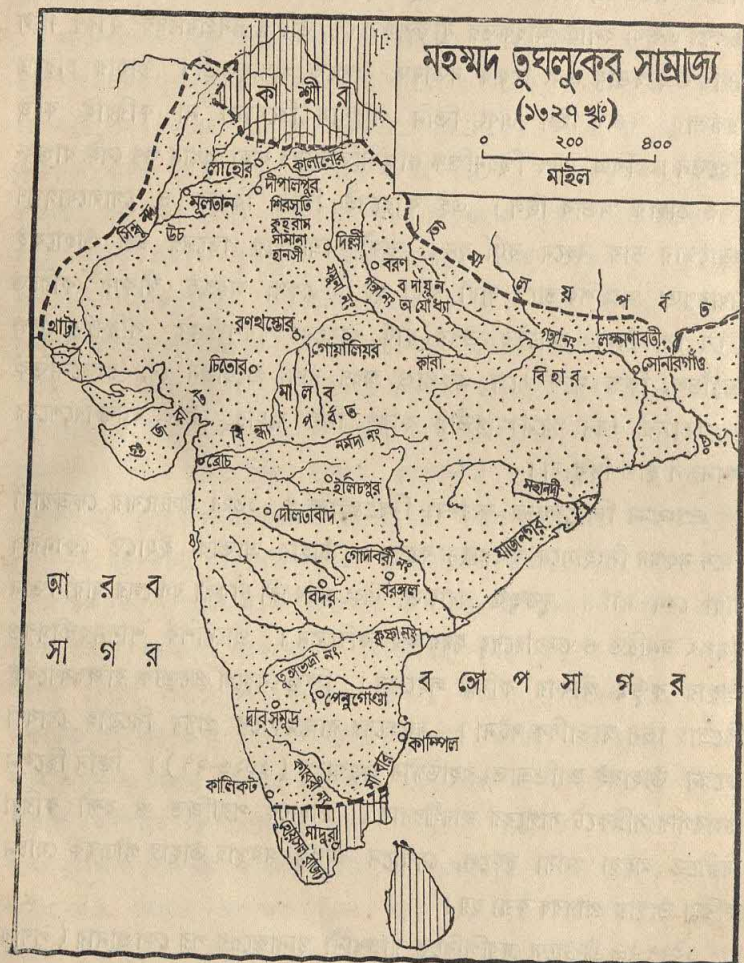
মহম্মদ তুঘলুকের রাজত্বকালের শেষভাগে সাম্রাজ্যের পতন সুরু হওয়ার পূর্বে তুর্কী সাম্রাজ্য আনুমানিক কতটা বিস্তৃত ছিল তাহা এই মানচিত্রে দেখান হইয়াছে

দোয়াবে গুরুভার কর ধার্য (১৩২৬-২৭): বরনী বলেন যে, দোয়াবে ধার্য করের পরিমাণ 'দশ এবং বিশ গুণ বৃদ্ধি পায়।' তিনি

নিম্নলিখিত ভাবে ইহার ফলাফল বর্ণনা করিয়াছেন : "স্থলতানের এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে গিয়া তাঁহার কারকুনরা এরূপ কর ধার্য করিল যে রায়তদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। এত কঠোরভাবে কর দাবী হইত যে, রায়তগণ হৃতবল ও দরিদ্র হইয়া উৎসন্নে যাইতে বসিল। যাহাদের অবস্থা সচ্ছল এবং হাতে বিষয় সম্পত্তি ছিল তাহারা হইয়া উঠিল বিদ্রোহী। জমিজমা নষ্ট হইয়া গেল, কৃষিকার্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইল। দূরদূরান্তরের রায়তরা দোয়াবের লোকদের দুর্ভাগ্যের কথা অবগত হইয়া, পাছে তাহাদের নিকট হইতেও অনুরূপ কর দাবী করা হয় এই ভয়ে বশ্যতা পরিহার করিয়া বনে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। কৃষিকার্যের অবনতি, প্রজাদের দুর্দশা ও দূর প্রদেশ হইতে শস্যের আমদানী হ্রাসের ফলে দিল্লী ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং দোয়াবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।......এই সময় হইতেই মহম্মদের সাম্রাজ্যের গৌরব অস্তমিত হইতে থাকে।" এই বর্ণনা হয়তো অতিরঞ্জিত, তবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে দোয়াবের অধিবাসীদের উপর এমনই উৎপীড়ন হইতে থাকে যে নৈরাশ্যে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বরনী বলেন যে স্থলতান বরনে বিদ্রোহীগণকে বন্য পশুর মত শিকার করিয়াছিলেন। এ কাহিনী বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। কৃষকগণকে বশীভূত রাখিবার জন্য মহম্মদ যে নির্দয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন ইহা হয়ত তাহার এক অতিরঞ্জিত বর্ণনা।

রাজধানী স্থানান্তর (১৩২৬-২৭): মহম্মদের বহু-নিন্দিত রাজনৈতিক পরীক্ষাগুলির মধ্যে দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানীর স্থানান্তর ছিল অন্যতম। দেবগিরির নূতন নাম হইল দৌলতাবাদ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত তখনও মোঙ্গোলদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল; স্থতরাং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে নিরাপদ দূরত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাজধানী স্থাপনই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। দক্ষিণ ভারতের যেসব হিন্দু রাজ্য তিনি সম্প্রতি স্বীয় বশে আনিয়াছিলেন সেগুলি দেবগিরি হইতে নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজসাধ্য ছিল। নূতন রাজধানীর ভৌগোলিক গুরুত্ব স্থস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া বরনী বলিয়াছেন :—"এই স্থানটি সাম্রাজ্যের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল; এখান হইতে দিল্লী, গুজরাট, লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁও, সোনারগাঁও, তেলাঙ্গ, মা'বার, দোরসমুদ্র ও কম্পিলার দূরত্ব ছিল প্রায় সমান।" তবে, কাহিনীকার ইবন বতুতা বলেন যে, দিল্লীর নাগরিকেরা তাঁহাকে গালিগালাজ করিয়া বেনামী চিঠিপত্র দিত বলিয়া

সুলতান তাহাদের উপর রুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজধানী স্থানান্তরের ন্যায় একটি গুরুতর সিদ্ধান্ত সামান্য কারণে গৃহীত হইয়াছিল এইরূপ কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

সুলতান যখন রাজধানী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত করেন তখন দিল্লীর অধিবাসিগণকে—পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু সকলকে তাহাদের সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া দৌলতাবাদে যাইবার আদেশ দেওয়া হয়। এইভাবে স্থানত্যাগে বাধ্য হইলে লোকজনকে স্বভাবতঃই যে সকল দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হয় তাহা যাত্রীদের সুবিধার্থ সুলতান যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে কিছুটা লাঘব হইয়াছিল। দিল্লী-দৌলতাবাদের পথে সাময়িক ভাবে ব্যবহারের জন্য বিস্তর কুটির নির্মিত হয়, সে সব কুটির হইতে যাত্রিগণকে বিনামূল্যে খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হইত। ছায়ার জন্য পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ করা হয়। ইবন বতুতা বলেন যে, একজন অন্ধ আর একজন খোঁড়া দিল্লী ছাড়িয়া যাইতে অনিচ্ছুক বলিয়া তাহাদিগকে সুলতানের কাছে ধরিয়া আনা হয়; খোঁড়া লোকটিকে তখনই হত্যা করা হইল এবং অন্ধ লোকটিকে দৌলতাবাদে টানিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হইল, ফলে তাহার একখানি মাত্র পা শেষ পর্যন্ত দৌলতাবাদে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। খুব সম্ভব এই সব কাহিনী কেবল বাজার গুজব মাত্র।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজধানীর পরিবর্তন প্রায়ই হইত, সুতরাং মহম্মদকে কেবল দিল্লী ত্যাগের সিদ্ধান্তের জন্য দোষারোপ করা যায় না। তবে দেবগিরিতে নূতন রাজধানী স্থাপনের কতকগুলি স্পষ্ট অসুবিধাও ছিল। ইহার ফলে মোঙ্গোলদের বিরুদ্ধে সুলতানের প্রতিরোধ-শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। দেবগিরি হইতে বাঙ্গালার ন্যায় বহুদূরে অবস্থিত প্রদেশগুলির উপর যথাযথভাবে দৃষ্টি রাখা সম্ভব হইত না। এছাড়া দিল্লীর মুসলমান অধিবাসীদের বিরুদ্ধতা—দাক্ষিণাত্যে হিন্দু পরিবেশের মধ্যে বসবাসে তাহাদের অনিচ্ছা—একটি গুরুতর বিবেচ্য বিষয় ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই মহম্মদ তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। ফলে পুনরায় তিনি দিল্লীতে রাজদরবার স্থাপন করেন। দিল্লীর যেসব অধিবাসী তখন দেবগিরিতে বাস করিতেছিল তাহাদিগকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল। দৌলতাবাদ নগর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিল, আবার দিল্লীর পূর্ব সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিতেও বহু বৎসর কাটিয়া গেল।

আধুনিক কালের কোন কোন লেখকের মতে মহম্মদ তুঘলুক দেবগিরিকে কেবলমাত্র দ্বিতীয় রাজধানী করিতে চাহিয়াছিলেন। দিল্লীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকেই তিনি সেখানে যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে জোর করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণের কাহিনীই পল্লবিত হইয়া দিল্লীর যাবতীয় অধিবাসীকেই নির্বিচারে অপসারণ করার কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। ইবন বতুতার পরিদর্শনকালে দিল্লীর যে সমৃদ্ধি ছিল তাহাতে দিল্লী হইতে নির্বিচারে লোকাপসরণ হইয়াছিল এ কথা স্বীকার করা যায় না।

মোঙ্গোলদের আক্রমণ (১৩২৮-২৯): রাজধানী পরিবর্তনের পরই মোঙ্গোলরা আসিয়া প্রবল ভাবে আক্রমণ করে। সম্ভবতঃ স্থলতান দিল্লী ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় সাহস পাইয়াই তার্মাশিরিন নামে একজন পরাক্রান্ত মোঙ্গোল দলপতি আসিয়া পঞ্জাবে প্রবেশ করেন, এবং তারপর লাহোর ও মূলতান হইতে দিল্লীর উপকণ্ঠ অবধি সমগ্র সমভূমি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় মহম্মদ সীমান্ত রক্ষার কাজে যথোচিত দৃষ্টি রাখেন নাই; আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার উপযুক্ত প্রত্যন্ত-রক্ষীরও অভাব ছিল। মনে হয় তার্মাশিরিনকে মূল্যবান উপহার ও উপঢৌকনের দ্বারা নিবৃত্ত করা হইয়াছিল। এই ভাবেই বল্‌বন ও আলাউদ্দীনের নিরলস প্রতিরোধ-নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে; যুদ্ধের পরিবর্তে উৎকোচ প্রদানের দ্বারা মহম্মদ নিজের দুর্বলতাই প্রকাশ করেন। সম্ভবতঃ দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের ফলেই (আক্রমণের সময় তাঁহার ওমরাহ্‌ ও কর্মচারীর দল সেখানেই ছিলেন) তিনি অস্থবিধায় জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন; দোয়াবের বিদ্রোহও তাঁহার অস্থবিধার আর-একটি কারণ ছিল।

নিদর্শক মুদ্রা প্রবর্তন (১৩২৯-৩০): জনৈক আধুনিক মুদ্রাবিদ্‌ মহম্মদকে 'মুদ্রাসংস্কারকদের মধ্যে একজন রাজা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ধাতব মুদ্রার সংস্কার করিয়া বিবিধ প্রকারের মুদ্রা বাহির করেন; সেগুলি পরিকল্পনায় যেরূপ, সম্পাদনায়ও সেইরূপ ছিল চমৎকার কলানৈপুণ্যের পরিচায়ক। তবে তাঁহার সর্বাপেক্ষা কৌতূহলপ্রদ পরীক্ষা হইল নিদর্শক মুদ্রা প্রবর্তন। পরীক্ষাটি অবশ্য তাঁহার পক্ষে ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং শেষ অবধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ত্রয়োদশ শতকে চীন ও পারস্য দেশে নিদর্শক মুদ্রার প্রচলন ছিল। সম্ভবতঃ

মহম্মদ তাহা অবগত ছিলেন। বরনী বলেন তাঁহার পক্ষে সে দৃষ্টান্ত অনুসরণের দুইটি কারণ ছিল—সামরিক বিভাগের ক্রমবর্ধমান ব্যয় নির্বাহ এবং তাঁহার মুক্ত-হস্তে দানের ফলে রাজকোষে যে অভাবের সৃষ্টি হইতেছিল তাহা পরিপূরণের প্রয়োজনীয়তা। জনৈক আধুনিক লেখক বরনীর এই অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন, "সুলতানের অভিপ্রায় ছিল প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যাবৃদ্ধি করা, শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করা নয়।"

মন্ত্রীদের মতামত না লইয়াই সুলতান তামা ও পিতলের নিদর্শক মুদ্রা বাহির করার নির্দেশ দিয়া ঘোষণা করেন যে, সকল প্রকারের লেনদেনের কারবারেই তাহা স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রার ন্যায় ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু মেকীর চল বন্ধ করিবার কোন ব্যবস্থাই তিনি করিলেন না। বরনী বলেন, ইহার ফলে প্রত্যেক হিন্দুর গৃহই এক-একটি টাঁকশাল হইয়া দাঁড়াইল। সকলেই ঘরে ঘরে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা মজুত করিয়া জাল টাকাকড়িতে খাজনা দিতে সুরু করিল। বিদেশী বণিকরা ভারত হইতে তামার নিদর্শক মুদ্রায় মালপত্র কিনিয়া অন্যত্র তাহা বেচিয়া সোনা পাইতে লাগিল। বিদেশী বণিকরা নিদর্শক মুদ্রা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় দেশের আমদানি কারবার প্রায় বন্ধ হইয়াই আসিল। অবস্থা যখন চরমে আসিয়া পৌঁছিল তখন সুলতান নিদর্শক মুদ্রা তুলিয়া লইয়া, সকলকে রাজকোষ হইতে তামা ও পিতলের মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা ফিরাইয়া লইতে আদেশ দিলেন। রাজকোষের ক্ষতি করিয়া লোকে অসম্ভব লাভ করিল, রাজকোষে সঞ্চিত অর্থের প্রভূত অপচয় ঘটিল। "পরিকল্পনাটির ব্যর্থতার কারণ ইহার আভ্যন্তরীণ ত্রুটিবিচ্যুতি ঠিক ততটা নয় যতটা হইল লোকের কুসংস্কার ও অজ্ঞতা এবং দুর্নীতি নিবারণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব।…সুলতানের এই সাহসিক প্রচেষ্টাকে উন্মাদের কার্য বলিয়া অভিহিত করা অলীক অপবাদ রটনা করা মাত্র…।"

খোরাসান জয়ের পরিকল্পনা: সিংহাসনে আরোহণের কয়েক বৎসরের মধ্যেই মহম্মদ তুঘলুক খোরাসান, ইরাক ও ট্রান্স-অক্সিয়ানা জয়ের এক বিরাট পরিকল্পনা স্থির করেন। তার্মাশিরিনের আক্রমণের পর তিনি খোরাসান আক্রমণের জন্য এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার বিপুল বদান্যতায় আকৃষ্ট হইয়া জনকয়েক খোরাসানী ওমরাহ্ তাঁহার রাজসভায় আসিয়াছিলেন; সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই প্ররোচনায় তিনি ইহাতে

প্রবৃত্ত হন। খোরাসান অভিযানের পরিকল্পনা মোঙ্গোলদের দমন করিবার ব্যবস্থা হিসাবেও হইয়া থাকিতে পারে। ইলতুৎমিসও একবার খোরাসান জয়ের অভিপ্রায়ে বাহির হইয়াছিলেন।

বরনী বলেন, ৩,৭০,০০০ লোককে সৈন্যদলে ভর্তি করিয়া পূরা একটি বৎসর তাহাদের ব্যয়ভার বহন করা হইল, কিন্তু দলটি দিল্লীর বাহিরেও পা বাড়ায় নাই; তারপর যখন দেখা গেল এত বড় একটি বাহিনী পুষিতে গিয়া রাজকোষের উপর মারাত্মক চাপ পড়িতেছে তখন দলটি ভাঙিয়া দেওয়া হইল। বৈদেশিক আক্রমণের পক্ষে খোরাসানের রাজনৈতিক অবস্থা যদিও প্রতিকূল ছিল না তবুও গন্তব্য পথে অনেক দুরতিক্রমণীয় বাধা ছিল, জয়াভিলাষী মহম্মদ সেদিকে যথোচিত দৃষ্টিপাত করেন নাই। "তাঁহার এবং খোরাসান ও ইরাকের মধ্যে ছিল বিশাল পর্বতমালার ব্যবধান, ছিল বৈরভাবাপন্ন উপজাতিদের বাস; তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিবার মতো সহায়সম্বল তাঁহার ছিল না। হিন্দুকুশ অথবা হিমালয়ের তুষারাচ্ছন্ন উপত্যকার মধ্য দিয়া একটি বিরাট বাহিনী পরিচালনা করিয়া লইয়া যাইতে তদপেক্ষা দৃঢ়চেতা সৈন্যাধ্যক্ষদেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হইবার কথা ছিল—বিশেষতঃ দেশ যখন ছিল এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে নিপীড়িত...পরিবহনের বাধাবিঘ্নও ছিল তদ্রূপ দুর্বার, এবং পদে পদে ছিল প্রত্যন্তভাগের উপজাতিদের দ্বারা রসদবাহী শকটাদি লুণ্ঠনের সম্ভাবনা।"

নগরকোট জয় (১৩৩৭)ঃ পঞ্জাবের কাঙ্ড়া জেলার একটি পর্বতের উপর অবস্থিত নগরকোট দুর্গ তখনকার দিনে অভেদ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। ১৩৩৭ সালে মহম্মদ ইহার বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। দুর্গপ্রাকার ধূলিসাৎ করা হইল, কিন্তু সেখানকার হিন্দু রাজাকে তাঁহার বিনষ্ট সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হইল।

কারাজল অভিযান (১৩৩৭-৩৮)ঃ নগরকোট ও কারাজলের বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালিত হয় তাহা ছিল হিমালয়ের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির উপর দিল্লীর কর্তৃত্ব স্থাপনের ব্যাপক পরিকল্পনার অংশমাত্র। কোন কোন লেখক কারাজল অভিযানকে চীন অথবা পশ্চিম-তিব্বত জয়ের উদ্দেশ্যে পরিচালিত অদূরদর্শিতাপ্রসূত এক দুঃসাহসিক বিপর্যয় কাণ্ড বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সমসাময়িক কোন ঐতিহাসিকই ইহাকে চীন অথবা তিব্বত জয়ের উদ্দেশ্যে পরিচালিত অভিযান বলিয়া উল্লেখ

করেন নাই। প্রত্যক্ষদর্শী ইবন বতুতা বলেন যে, কারাজল অভিযানের ফলে জনৈক পার্বত্য হিন্দু দলপতি বশ্যতা স্বীকার করেন। এক বিরাট সৈন্য-বাহিনী দিল্লী হইতে যাত্রা করে, কিন্তু পথঘাটের নানাপ্রকার অসুবিধা এবং পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বর্ষাকালে স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক অবনতির যোগ ঘটায়। সুলতানের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইল। হিন্দু দলপতিকে রাজ-কর প্রদানে বাধ্য করিবার পর সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু সৈন্যদের অগ্রগতি অপেক্ষা পশ্চাদপসরণে ক্ষতি কম হইল না। ইহার পর সুলতান এরূপ বিপুল বাহিনী আর কখনও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

চীনের সহিত সম্পর্ক: ১৩৪১ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ তুঘলুকের নিকট চীনের মোঙ্গোল সম্রাট তোঘান তৈমুর একদল দূত প্রেরণ করেন। তোঘান তৈমুর হিমালয় অঞ্চলে বৌদ্ধ মন্দিরসমূহ পুনর্নির্মাণের জন্য মহম্মদ তুঘলুকের অনুমতি চাহেন। কারাজল অভিযানের সময় সুলতানের সৈন্যবাহিনী এইসব মন্দির ধ্বংস করিয়াছিল। চীনা দূতের দল সুলতানের জন্য বহু মূল্যবান উপহার লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে সুলতান সন্তুষ্ট হন। মুসলমান আইন অনুসারে জিজিয়া কর না দিলে মন্দিরগুলি পুনর্নির্মিত হইতে পারে না একথা জানাইবার জন্য তিনি ইবন বতুতাকে চীনে প্রেরণ করিলেন। ইবন বতুতা মোঙ্গোল সম্রাটের জন্য যেসব উপহার লইয়া গিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত উপহার অপেক্ষাও চমকপ্রদ ছিল। ১৩৪২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি চীনে যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রায় চারি বৎসর পরে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন।

ইবন বতুতা: ইবন বতুতার জীবনকাহিনী মুসলমান জগতের ইতিহাসে একটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায়। ১৩০৪ খ্রীস্টাব্দে তাঞ্জিয়ারে তাঁহার জন্ম হয়। ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করেন, কিন্তু ১৩৫৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। ১৩৩৩ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধুতে পৌছিবার পূর্বে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, মক্কা, আলেপ্পো, দামাস্কাস, কাফ্‌ফা, কনস্টান্টিনোপল, বুখারা ও কাবুল পরিদর্শন করেন। দিল্লীতে আসিয়া তিনি সুলতানের নিকট হইতে একটি জায়গীর লাভ করেন এবং পরে রাজধানীর কাজী নিযুক্ত হন। তিনি আট বৎসর সুলতানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন;

দরবারেও তাঁহার বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি হয়। একবার তিনি স্থলতানের কৃপা-দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া কর্মচ্যুত হন। ১৩৪১ খ্রীস্টাব্দে তিনি পুনরায় স্থলতানের কৃপাদৃষ্টিতে পড়েন; কয়েকমাস পরেই তাঁহাকে চীনে প্রেরণ করা হয়। দীর্ঘদিন ধরিয়া দক্ষিণ-ভারত ও বাঙ্গালা পরিভ্রমণের পর যাভা, স্থমাত্রা এবং ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ হইয়া তিনি চীন যাত্রা করেন। তিনি চীনে উপনীত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যে উদ্দেশ্য লইয়া তথায় গিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি কালিকটে প্রত্যাবর্তন করিয়া জাহাজযোগে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। ১৩৭৭-৭৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইবন বতুতা বৃদ্ধ বয়সে 'সফরনামা' নামক একখানি গ্রন্থে তাঁহার পর্যটন-কালের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া যান। বর্তমান পুস্তকখানি ঐ গ্রন্থেরই ইবন জুজ্জি[১] প্রণীত সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

ইবন বতুতা বহুক্ষেত্রে ইতিহাসের সঙ্গে গালগল্প মিশাইয়া ফেলিয়াছেন বটে, তবুও তিনি ছিলেন একজন নিরপেক্ষ দর্শক; মহম্মদ তুঘলুকের আমলের বিস্তর ঐতিহাসিক সমস্যা সমাধানে তাঁহার সাক্ষ্য প্রমাণ কাজে লাগিয়াছে। অবশ্য তাঁহার ঘটনাপঞ্জী অথবা ভৌগোলিক বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করা সমীচীন নহে। কিন্তু দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি সাধারণভাবে যেসব মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বরনীর ন্যায় ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক বর্ণিত বিদ্রোহ ও রাজসভার ষড়যন্ত্র কাহিনীর মূল্যবান পরিশিষ্টরূপে তথ্যনির্ণয়ে প্রচুর সহায়তা করিয়াছে।

বিদ্রোহ: মহম্মদ তাঁহার শাসনকালের প্রথম দশ বৎসরে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র ভীষণ অসন্তোষের সৃষ্টি করেন। গুরুভার কর ধার্যের পর দুর্ভিক্ষ ও বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং কর আদায়ের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। রাজধানী স্থানান্তরের ফলে মুসলমানদের একটি শক্তিশালী অংশ বৈরভাবাপন্ন হইয়া ওঠে। নিদর্শক মুদ্রা প্রচলনের ফলে ঘটে ব্যাপক বিভ্রান্তি। উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃই স্থলতানের অখ্যাতির স্থযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিভিন্ন দিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

১৩৩৫ খ্রীস্টাব্দে জালালউদ্দীন আহ্‌সান শাহ্‌ মা'বারে (দক্ষিণ ভারতের

---

১ ডেফ্রিমারি ও সাঙ্গুইনেট্টি কৃত ফরাসীভাষায় অনূদিত ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডে ভারতের বিষয় পর্যালোচিত হইয়াছে।

সমুদ্র উপকূলবর্তী ক্ষুদ্র অঞ্চল ; মাদুরায় ইহার রাজধানী অবস্থিত ছিল) বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। উত্তর ভারতের গোলযোগ এবং দিল্লী হইতে মা'বারের দূরত্বের জন্যই সম্ভবতঃ এই শক্তিশালী আমীর স্বাধীনতা লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠেন। সুলতান স্বয়ং দক্ষিণ-ভারতে যাত্রা করিলেন। দৌলতাবাদে তিনি জনসাধারণের কর বৃদ্ধি করেন এবং মুসলমান ওমরাহ ও কর্মচারীদের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ দাবী করিলেন। কেহ কেহ রাজকীয় দাবী পূরণ করিতে না পারিয়া শাস্তির হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আত্মহত্যা করে। অতঃপর মহম্মদ বরঙ্গল অভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে অকস্মাৎ মহামারীর প্রকোপে সুলতানের সৈন্যশিবিরে বহু প্রাণহানি ঘটে, তিনি দৌলতাবাদে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। জালালউদ্দীনকে নিরুপদ্রবেই থাকিতে দেওয়া হইল ; দিল্লীর সাম্রাজ্য হইতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ১৩৭৭-৭৮ খ্রীস্টাব্দে মা'বার বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

দিল্লী হইতে সুলতানের অনুপস্থিতিকালে পঞ্জাবে আমীর হালাযুন বিদ্রোহী হন এবং লাহোরের শাসনকর্তাকে হত্যা করিয়া নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কুলচাঁদ নামে একজন খোক্কর দলপতি তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। খাজা জাহান এক সৈন্যবাহিনী লইয়া লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন ; দাক্ষিণাত্য হইতে সুলতান কর্তৃক প্রেরিত দুইজন কর্মচারীও তাঁহার বলবৃদ্ধি করেন। হালাযুন পরাজিত হইলেন, লাহোর অধিকৃত হইল।

১৩৩৫-৩৬ খ্রীস্টাব্দে দৌলতাবাদের শাসনকর্তার পুত্র মালিক হোসাং বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সম্ভবতঃ সুলতানের মৃত্যুর মিথ্যা গুজব শুনিয়াই তিনি বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন। সুলতান জীবিত আছেন এবিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হইলে আত্মসমর্পণ করেন। মহম্মদ তাঁহাকে মার্জনা করিলেন—সুলতানের পক্ষে এরূপ ঔদার্য প্রদর্শন খুবই বিরল ব্যাপার ছিল।

বাঙ্গালার মুসলমান শাসনকর্তাগণ স্বভাবতঃই সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিলেন। গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক যাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন সেই গিয়াসউদ্দীনকে ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে বহরাম খাঁর সহিত পূর্ব বাঙ্গালার যুগ্ম শাসনকর্তারূপে স্বীকার করা হয়। সমগ্র বাঙ্গালায় নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া তিনি মহম্মদের এই ঔদার্যের প্রতিদান

দেন। কিন্তু বহরাম খাঁর হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর বহরাম খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার বর্মবাহক মালিক ফকরউদ্দীন নিজেকে পূর্ববঙ্গের অধীশ্বররূপে ঘোষণা করেন। লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা কাদের খাঁ তাঁহাকে পরাজিত করেন এবং কিছুকালের জন্য সোনারগাঁওয়েরও অধিপতি হইয়া দাঁড়ান। কিন্তু কাদের খাঁর সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করে। ফকরউদ্দীন সোনারগাঁও অধিকার করার পর লক্ষ্মণাবতী অধিকারেরও চেষ্টা করেন, সেখানে কাদের খাঁর একজন কর্মচারী তাঁহাকে বাধা দেন। আলী মোবারক নামে এই কর্মচারী দিল্লীতে আবেদন জানান, কিন্তু সেখান হইতে বিশেষ কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। তখন আলী মোবারক নিজেকে লক্ষ্মণাবতীর স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ফকরউদ্দীন এবং আলী মোবারকের মধ্যে আরও কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। ফকরউদ্দীন ১৩৪৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার শাসনকালেই ইবন বতুতা বাঙ্গালাদেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে সাধু সজ্জন, বৈদেশিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গকামী বিচক্ষণ শাসক রূপে অভিহিত করিয়াছেন। "১৩৩৯-৪০ খ্রীস্টাব্দে অথবা উহারই কাছাকাছি কোন সময়ে সুলতান মহম্মদ তুঘলুকের নিমজ্জমান সাম্রাজ্য হইতে বাঙ্গালাদেশ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং এই অর্ধোন্মাদ সুলতানের মারাত্মক প্রতিশোধের কবল হইতে তাঁহার শাসনকালের অবশিষ্ট বারো বৎসর মুক্ত থাকে।"

বাঙ্গালা হাতছাড়া হইয়া যাইবার পর কারায় নিজাম মৈনের বিদ্রোহ দেখা দেয়। লোকটি ছিল আফিমখোর ও নীচকুলোদ্ভব, তাহার রাজস্বও বাকি পড়িয়াছিল। তাহাকে অনায়াসেই ধরিয়া আনিয়া তাহার গায়ের চামড়া তুলিয়া ফেলা হয় (১৩৩৭-৩৮)। বিদরের শাসনকর্তা নসরৎ খাঁ ১৩৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। দেবগিরি হইতে অগ্রসর হইয়া রাজকীয় সৈন্যবাহিনী তাঁহাকে পরাজিত করে, নসরৎ খাঁ আত্মসমর্পণ করেন। তিনি তাঁহার জায়গীর হারাইলেন, কিন্তু পরে তিনি সুলতানের মার্জনা লাভ করেন এবং দিল্লীতে রাজকীয় বাগিচার তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হন। ১৩৩৯-৪০ খ্রীস্টাব্দে কর আদায়ের জন্য গুলবর্গায় প্রেরিত আলী শাহ্ নামক জনৈক কর্মচারী বিদ্রোহী হন। গুলবর্গার হিন্দু অধিপতিকে হত্যা করিয়া তিনি বিদর অধিকার করেন,

কিন্তু রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর হস্তে পরাজিত হইয়া শেষ পর্যন্ত তিনি গজনীতে নির্বাসিত হন।

১৩৪০-৪১ খ্রীস্টাব্দে দেখা দেয় অযোধ্যার শাসনকর্তা আইন-উল-মুল্কের প্রবল বিদ্রোহ। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা কর্মচারী; আলাউদ্দীনের শাসনকাল হইতেই তিনি বিশিষ্ট পদ অধিকার করিয়া আসিয়াছেন। ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্র ও আইনে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল; তাঁহার রচিত 'মুনসাৎ-ই-মাহ্রু' নামক গ্রন্থে ফিরোজ তুঘলুকের শাসন-ব্যবস্থার সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। আমীর খসরু তাঁহাকে একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ও সুলেখকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সুলতান ১৩৪০-৪১ খ্রীস্টাব্দে আইন-উল-মুল্ককে অযোধ্যা হইতে দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করেন। দুষ্ট লোকেরা তাঁহাকে বুঝায় এই স্থানান্তরই হইল তাঁহার সর্বনাশের প্রথম পদক্ষেপ। তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, কিন্তু পরাজিত ও ধৃত হন। তাঁহাকে বহু অপমান সহ্য করিতে হয় এবং তিনি শাসনকার্য হইতে পদচ্যুত হন, কিন্তু অন্যের প্ররোচনায় তিনি বিদ্রোহী হইয়াছিলেন একথা বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রাণবধ করা হয় না। পরবর্তী বিদ্রোহী ছিলেন শাহু আফগান। তিনি মূলতানের শাসনকর্তাকে হত্যা করিয়া নগর দখল করেন। সুলতান স্বয়ং সিন্ধু অভিমুখে যাত্রা করেন। স্বয়ং সুলতানের পরিচালনায় এক বিরাট বাহিনীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া শাহু ভীত হইয়া সুলতানের নিকট মার্জনাভিক্ষা করিয়া একখানি পত্র লেখেন, তারপর পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন। সুলতান দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের পর সান্নাম ও সামানা অভিমুখে যাত্রা করেন। এখানে তিনি দুর্ধর্ষ পার্বত্যবাসীদের দলপতি, জাঠ ও ভট্টি রাজপুত-গণকে বশীভূত করেন। কতিপয় বিদ্রোহী নেতাকে দিল্লীতে আনিয়া তাহাদিগকে জোর করিয়া ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়।

বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা ও তেলিঙ্গানায় বিদ্রোহ: দক্ষিণ ভারতের হিন্দুগণ স্বভাবতঃই উত্তর ভারতের গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। ১৩৩৬ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বিজয়নগরের প্রথম রাজা ১ম হরিহর দিল্লীর প্রতি মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করিলেও, গোপনে গোপনে কাকতীয়-রাজ প্রতাপরুদ্রের পুত্র কৃষ্ণ নায়ক এবং ৩য় বীরবল্লালের পুত্র বিরূপাক্ষ কর্তৃক সংগঠিত বিদ্রোহে সাহায্য করিতে থাকেন। সম্ভবতঃ ১৩৪৩-৪৪ খ্রীস্টাব্দে

এই বিদ্রোহ হইয়াছিল। হিন্দুদের ক্রমবর্ধিত বিদ্রোহে সুলতানের কর্মচারিগণ দাক্ষিণাত্যে গুরুতর রকমের কোন বাধা দেন নাই। বিরূপাক্ষ বল্লাল মাদুরার সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া ১৩৪৬ খ্রীস্টাব্দে প্রাণ হারান।

দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে মুসলমান আমীরগণের বিদ্রোহঃ সুলতান দেবগিরির শাসনভার তাঁহার শিক্ষক কুতলুগ খাঁর উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কুতলুগ খাঁর কর্মচারিগণ যথাযথভাবে রাজস্ব আদায় করিতে না পারায় তাঁহাকে ১৩৩৫ খ্রীস্টাব্দে ফিরাইয়া আনা হয়। তিনি ছিলেন উদার ও জনপ্রিয় শাসনকর্তা; অকস্মাৎ তাঁহার অপসারণের ফলে প্রদেশে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। সুলতান যেসব নূতন কর্মচারীকে প্রেরণ করেন তাঁহাদের অবলম্বিত কঠোর ব্যবস্থার দরুণ জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। ফিরিস্তা বলেন যে জনসাধারণ সর্বত্রই বিদ্রোহী হইয়া ওঠে; ফলে দেশ ধ্বংস হয় ও জনহীন হইয়া পড়ে।

দেবগিরির গোলযোগের পর বৈদেশিক আমীরগণ (আমীরান-ই-সদা) বিদ্রোহ করেন। তাঁহারা এতকাল সুলতানের নিকট বিশেষ আদরযত্ন পাইয়া আসিয়াছেন। দেবগিরির বিদ্রোহের পর সুলতানের মনে এই দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, "যেখানেই বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে সেখানেই তাহার মূলে আছেন আমীরান-ই-সদা; তাঁহারা অর্থ অপহরণ ও লুণ্ঠনকার্যের জন্য বিদ্রোহীদের সহিত হৃদ্যতা রক্ষা করিয়া চলেন।" নীচ বংশজাত ভুঁইফোড় মালবের শাসনকর্তা আজিজ খুম্মারকে তিনি যতটা সম্ভব বৈদেশিক ওমরাহদের বর্জন করিয়া চলিবার নির্দেশ দিলেন। আজিজ বহু বৈদেশিক আমীরকে ছলনার সাহায্যে হত্যা করিয়া সুলতানের প্রশংসাভাজন হইয়া উঠেন। গুজরাটের বৈদেশিক আমীরগণ তখন প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। গুজরাটের শাসনকর্তা বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হন। বিদ্রোহিগণ আজিজকে বন্দী করিয়া হত্যা করেন। সুলতান ইতিপূর্বেই (১৩৪৫) দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। রাজকীয় সৈন্যবাহিনী দাভৈর নিকট বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করে, অতঃপর বিদ্রোহীরা দেবগিরি অভিমুখে পলাইয়া যায়। মালিক মকবুল তাহাদিগকে আর একবার নর্মদা নদীর তীরে পরাজিত করেন। যেসব বিদ্রোহী অবশিষ্ট রহিল তাহাদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। সুলতান কাম্বেতে থামেন এবং তথায় তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠন করেন।

দেবগিরির বৈদেশিক আমীরগণ গুজরাটের বিদ্রোহের ধারা আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে প্রশমিত করিবার পরিবর্তে স্থলতান তাঁহাদের আচরণ সম্পর্কে তদন্তের জন্য কয়েকজন অযোগ্য কর্মচারীকে প্রেরণ করিলেন। বিদেশী আমীরদের কয়েকজনকে স্থলতানের শিবিরে উপস্থিত হইতে বলা হইলে তাঁহাদের মনে সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইল। ইসমাইল মুখ আফগান রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করিলেন, তাঁহার নেতৃত্বে বিদেশী আমীরেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দেবগিরি অধিকার করিলেন। বেরার, খান্দেশ ও মালবে গোলযোগ বিস্তৃত হইয়া পড়িল। স্থলতান দেবগিরিতে উপস্থিত হইয়া পরিস্থিতি প্রায় আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন, এমন সময় গুজরাটে অকস্মাৎ তাঘির বিদ্রোহের ফলে তাঁহার হিসাবপত্র বানচাল হইয়া গেল। তিনি অবিলম্বে গুজরাটে গমন করিয়া তাঘিকে সিন্ধুর থাট্টা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। গুজরাট স্থলতানের নিয়ন্ত্রণে আসিল, কিন্তু দেবগিরির বিদ্রোহীরা স্থলতানের অনুপস্থিতির স্থযোগে বাহ্মনী রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। তাঘিকে বিনাশ না করা পর্যন্ত স্থলতান দেবগিরিতে গমন না করিবার সিদ্ধান্ত করেন। তিনি তিন বৎসর গুজরাটে অবস্থান করিয়া প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার এবং গিরনার (বর্তমান জুনাগড়) জয় করেন। অতঃপর তাঘির পশ্চাদ্ধাবনের জন্য তিনি সিন্ধু অভিমুখে অগ্রসর হন। থাট্টা দখলের জন্য প্রস্তুতি হইয়াছিল, কিন্তু ১৩৫১ খ্রীস্টাব্দের ২০শে মার্চ তারিখে স্থলতান হঠাৎ মারা যান। বদাউনী বলেন, "এইভাবেই রাজা জনসাধারণের নিকট হইতে মুক্ত হইলেন এবং জনসাধারণও রাজার নিকট হইতে মুক্তি পাইল।" একথা সঠিক ভাবেই বলা যাইতে পারে যে, "মহম্মদ তুঘলুকের নিকট দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ ছিল এক বেদনাদায়ক ক্ষতের মত। শেষ পর্যন্ত ইহাই তাঁহার কাল হইয়া দাঁড়ায়।"

ফিরোজ তুঘলুকের সিংহাসন আরোহণ (১৩৫১)ঃ থাট্টা অবরোধকালে মহম্মদ তুঘলুকের মৃত্যুর ফলে সৈন্যবাহিনী বিব্রত হইয়া পড়ে। দেশ ছিল বিদ্রোহিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ, তাঘির সহিত সংশ্লিষ্ট ভাড়াটিয়া মোঙ্গোল সৈন্যগণ রাজকীয় শিবির লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন; সৈন্যবাহিনী নিরাপদে দিল্লীতে আসিয়া পৌছিতে পারিবে কিনা তাহা অনিশ্চিত হইয়া দাঁড়াইল। এই সঙ্কটকালে শিবিরে যে আমীরগণ উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা

পরলোকগত স্থলতানের জ্ঞাতিভ্রাতা ফিরোজ তুঘলুককে রাজপদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইলেন। ফিরোজ তুঘলুক কতকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেই তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মতিদান করেন। মনে হয় উত্তরাধিকারী রূপে মহম্মদ কোন পুত্রসন্তান রাখিয়া যান নাই, ফিরোজকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু খাজা জাহান একটি বালককে মহম্মদের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসাইলেন। এই বালককে মিছামিছি খাড়া করা হইয়াছিল কিনা তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। যাহা হউক, ফিরোজ দিল্লীতে উপস্থিত হইবার পর খাজা জাহান আত্মসমর্পণ করেন এবং উত্তরাধিকার লইয়া কোনরূপ গুরুতর গোলযোগ হয় নাই।

ফিরোজ তুঘলুকের চরিত্র: ফিরোজ ছিলেন গিয়াসউদ্দীন তুঘলুকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রজবের পুত্র। তাঁহার মাতা ছিলেন একজন রাজপুত দলপতির কন্যা। মহম্মদ তুঘলুক তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন। তিনি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজনীতি ও শাসন পরিচালনায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাব ছিল নির্জনতাপ্রিয় ধার্মিকের মতো। সে যুগে রাজপদ লাভের জন্য যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সাহস ও নিষ্ঠুর রণোন্মাদনার প্রয়োজন হইত তাঁহার চরিত্রে সে সকল গুণের একান্ত অভাব ছিল। বরনী ও আফিফের ন্যায় সমসাময়িক লেখকগণ তাঁহাকে একজন আদর্শ মুসলমান নরপতি রূপে বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহার নম্রস্বভাব, দয়াদাক্ষিণ্য, নিজ ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অনুরাগ এবং সত্যনিষ্ঠার তাঁহারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তবে তাঁহার এইরূপ যথার্থ গুণকীর্তনে বিভ্রান্ত হইয়া আমরা যেন তাঁহার রাজনৈতিক ব্যর্থতার কথা ভুলিয়া না যাই; আবার একথাও যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষেত্রে তিনি কোরাণের যে অনুশাসন প্রবর্তন করিবার জন্য প্রয়াসী ছিলেন তাহা সাম্রাজ্যের বিপুল সংখ্যক হিন্দু প্রজাদের পক্ষে কল্যাণের পন্থা ছিল না।

বাঙ্গালায় অভিযান (১৩৫৩-৫৪, ১৩৫৯-৬০): সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরোজ স্থির করিলেন যে, বাঙ্গালাকে পুনরায় দিল্লীর অধীনে আনিবেন। উত্তর বঙ্গের স্বাধীন নরপতি আলী মোবারকের এক পালিত ভ্রাতা সামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌ দক্ষিণবঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৩৪২ খ্রীস্টাব্দে এই দুঃসাহসিক বীর লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন এবং ১৩৫২ খ্রীস্টাব্দে ফকউদ্দীনের পুত্র পূর্ববঙ্গের ইক্তিয়ারউদ্দীন

গাজী শাহকে গদীচ্যুত করেন। ইলিয়াস ত্রিহুত আক্রমণ করিলে স্থলতান এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন (১৩৫৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর)। স্থলতানের অগ্রগতিতে ইলিয়াস স্থদৃঢ় একডালা (দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত) দুর্গে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। একডালা দখল করিতে না পারায় স্থলতানকে পশ্চাদপসরণ করিতে হয়, এবং ১৩৫৪ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দিল্লীতে আসিয়া উপনীত হন।

পূর্ববঙ্গের ফকরউদ্দীনের জামাতা জাফর খাঁর অনুরোধক্রমে ১৩৫৯ খ্রীস্টাব্দে বাঙ্গালার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল। ইলিয়াস্ শাহ্ অন্যায়ভাবে যে পদ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, সেই পদে অভিষিক্ত হওয়াই ছিল জাফর খাঁর অভিলাষ। বাঙ্গালা দেশে আসিবার পথে ফিরোজ শাহ্ জৌনপুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ফিরোজ আসিয়া বাঙ্গালায় উপস্থিত হইতেই ইলিয়াস্ শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী সিকান্দর একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৩৫৪ খ্রীস্টাব্দের ন্যায় এবারেও দুর্গ অবরোধের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়; কিন্তু দীর্ঘদিন ধরিয়া দুর্গ রক্ষা করিবার পর সিকান্দর জাফর খাঁর নিকট সোনারগাঁও সমর্পণ করিতে সম্মত হন এবং মূল্যবান উপহার প্রদান করিয়া স্থলতানকে সন্তুষ্ট করেন। কিন্তু জাফর খাঁ দিল্লী ছাড়িয়া বাঙ্গালার অস্বাস্থ্যকর জলাভূমিতে আসিতে অসম্মত হন। সিকান্দরের রাজা উপাধি স্বীকার করিয়া ফিরোজ তাঁহাকে মণিমুক্তাখচিত একটি মুকুট প্রদান করেন। "আফগানদের অভ্যুত্থান না হওয়া পর্যন্ত প্রায় দুই শতাব্দীর মধ্যে দিল্লীর জন্য বাঙ্গালাকে আর বিব্রত হইতে হয় নাই।"

উড়িষ্যায় অভিযান (১৩৬০): বাঙ্গালা হইতে ফিরোজ প্রত্যাবর্তন করেন জৌনপুরে; তথায় স্বল্পকাল অবস্থানের পর তিনি জাজনগরে (উড়িষ্যা) অভিযান চালান। সেখানকার হিন্দু রাজা রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করেন। ফিরোজ পুরী অধিকার করিয়া প্রধান মন্দিরটি অপবিত্র করেন; জগন্নাথ দেবের মূর্তি হয় সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, নয় মুসলমানদের পদতলে বিমর্দিত করিবার জন্য দিল্লীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। হিন্দু রাজা করস্বরূপ প্রতি বৎসর দিল্লীতে কুড়িটি হস্তী প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেন।

নগরকোট জয় (১৩৬১): মহম্মদ তুঘলুকের নগরকোট অধিকারের ফল স্থায়ী হয় নাই। ১৩৬১ খ্রীস্টাব্দে ফিরোজ এই দুর্ভেদ্য দুর্গের

বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। পথিমধ্যে শিরহিন্দে তিনি একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করেন। দীর্ঘদিন অবরোধের পর ফিরোজ নগরকোটের হিন্দু অধিপতিকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।

সিন্ধু অভিযান (১৩৬২-৬৩): মহম্মদ তুঘলুকের প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশের জন্য থাট্টার অধিবাসিগণকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ফিরোজ ১৩৬২ খ্রীস্টাব্দে ৯০,০০০ অশ্বারোহী ও ৪৮০ হস্তী সহ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া দিল্লী হইতে যাত্রা করিলেন। সিন্ধু নদে বহুসংখ্যক নৌকাও সংগৃহীত হইল। থাট্টার অধিপতি পরাক্রমের সহিত নগর রক্ষা করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে সুলতানের শিবিরে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। ফিরোজ সাময়িকভাবে অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে গুজরাটে পরিচালিত করিবার সিদ্ধান্ত করেন। পথিমধ্যে পরিচালকদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সৈন্যবাহিনী কচ্ছের খাঁড়ির মধ্যে আসিয়া পড়ে, ফলে তাহাদের ভয়ানক ক্ষতি হয়। কয়েক মাসের মধ্যে দিল্লীতে সৈন্যবাহিনীর কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই। শেষ অবধি সুযোগ্য ও অনুগত মন্ত্রী মকবুল অনেক কষ্টে বিদ্রোহ দমন করেন। অবশেষে ক্লান্ত সৈন্যবাহিনী গুজরাটের উর্বর সমতলভূমিতে আসিয়া পৌছিল। গুজরাটে প্রচুর খাদ্য ও অর্থ পাওয়া গেল। বাহমনী রাজ্যের একজন বিক্ষুব্ধ কর্মচারী দাক্ষিণাত্য পুনরুদ্ধারের জন্য ফিরোজকে আমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু তিনি থাট্টাকে শাস্তি প্রদানের জন্য যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহাতেই অটুট থাকেন। সৈন্যবাহিনী পুনরায় সিন্ধু অভিমুখে অগ্রসর হইল, দিল্লী হইতে আরও সৈন্য আসিয়া যোগ দিল, থাট্টার শাসক বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন।

বিদ্রোহ: দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের পর ফিরোজ ঘোষণা করিলেন যে, বিদ্রোহ দমন ব্যতীত তিনি আর কখনও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন না। এই প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করিয়াছিলেন। বাহমনী রাজ্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ আসিলে (১৩৬৫-৬৬) তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। গুজরাটের শাসনকর্তা সামসউদ্দীন দামঘনি বিদ্রোহ করিয়া স্থানীয় ওমরাহদের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। তবে সুলতান স্বয়ং হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়া কাতেহ্‌রে নির্মমভাবে এক বিদ্রোহ দমন করেন।

ফিরোজ তুঘলুকের শেষ জীবন: ১৩৭৪ খ্রীস্টাব্দে স্থলতানের জ্যেষ্ঠপুত্র ফতে খাঁর মৃত্যুতে তিনি কঠিন আঘাত পান। তিনি ক্রমশঃ বার্ধক্যে পঙ্গু হইয়া পড়িতে থাকেন এবং তাঁহার মন্ত্রী খান-ই-জাহানের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া দাঁড়ান। সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রী স্থলতান ও তাঁহার জীবিত জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ খাঁর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যুবরাজ মন্ত্রীর পতন ঘটাইলেন। ফিরোজ রাজকার্য পরিচালনায় মহম্মদ খাঁর উপর সহযোগিতার ভার অর্পণ করেন, এমন কি ১৩৮৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁহাকে রাজকীয় উপাধিও দেন। মহম্মদ খাঁ (অথবা নাসিরউদ্দীন মহম্মদ শাহ) শাসনকার্যে অবহেলা করিয়া বিলাসে মগ্ন হইয়া পড়েন। এক বিদ্রোহের ফলে বৃদ্ধ স্থলতান পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং মহম্মদ সিরমুরে পলায়ন করেন। ফিরোজ অতঃপর ফতে খাঁর পুত্র তুঘলুক খাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ইহার কয়েকমাস পরে ১৩৮৮ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ৮৩ বৎসর বয়সে ফিরোজ পরলোকগমন করেন।

ধর্মীয় নীতি: হিন্দু রমণীর গর্ভজাত সন্তান এবং মহম্মদ তুঘলুকের উদারনৈতিক ভাবধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও, ফিরোজ ছিলেন ধর্মান্ধ মুসলমান; তিনি কেবলমাত্র হিন্দুদের নির্যাতন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না, শিয়া ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মুসলমানরাও তাঁহার হস্তে নির্যাতিত হইয়াছে। তাঁহার আত্মজীবনী 'ফতুহাৎ-ই-ফিরোজ শাহী' নামক গ্রন্থে তিনি সগর্বে বলিয়া গিয়াছেন যে, নাস্তিকতাবাদের যেসব নেতা অন্য সকলকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিতেন তিনি তাঁহাদের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছেন; হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করিয়া সেই স্থানে মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন। ধর্মান্তরিতকরণে রাষ্ট্র সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিল। তিনি বলিয়াছেন, "পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী আমার প্রজাগণকে পয়গম্বরের ধর্ম গ্রহণে আমি উৎসাহ দিয়াছি এবং যাহারা এই মতবাদ বিশ্বাস করিয়া মুসলমান হইবে তাহাদের প্রত্যেককেই জিজিয়া কর হইতে রেহাই দেওয়া হইবে একথা আমি বারংবার ঘোষণা করিয়াছি। জনসাধারণ এই সংবাদ অবগত হইল এবং বহু হিন্দু উপস্থিত হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল।" দিল্লীর স্থলতানদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্রাহ্মণদের উপর জিজিয়া কর ধার্য করেন। শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানগণকেও শাস্তি প্রদান এবং তাহাদের পবিত্র গ্রন্থাদি প্রকাশ্যে ভস্মীভূত করা হয়, মুলহিদগণকে (Mulhids) কারারুদ্ধ ও

নির্বাসিত করা হয় এবং তাহাদের 'ঘৃণ্য কার্যাবলী' নিষিদ্ধ করা হইল। মেহদিসদের (Mehdwis) উপরও অনুরূপ ব্যবহার হইত। এমন কি সুফি সম্প্রদায়ের মুসলমানরাও নির্যাতন হইতে রেহাই পায় নাই। সিকান্দর লোদীর আমলের পূর্ব পর্যন্ত এই ধরণের অবিবেচনাপ্রসূত ধর্মোন্মাদনার পরিচয় আর আমরা পাই না।

সাড়ম্বরে খলিফার বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজেকে তাঁহার প্রতিনিধি ঘোষণার দ্বারা ফিরোজ তাঁহার ধর্মপ্রাণতা প্রমাণিত করেন। তাঁহার আমলের মুদ্রায় খলিফার নামের পাশাপাশি তাঁহার নাম উৎকীর্ণ হইত। মুসলমান জগতের এই নামশেষ নেতৃপুরুষের নিকট হইতে দুইবার তিনি হুকুমনামা ও অঙ্গাবরণ লাভ করিয়াছিলেন।

শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার ঃ ফিরোজ শাসন-ব্যবস্থার বহু সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। আফিফের 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' নামক সমসাময়িক গ্রন্থে তৎসমুদয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আলাউদ্দীন খলজী কর্তৃক বিলুপ্ত জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন ছিল বিশেষ অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। ইহাতে আমীর ওম্‌রাহ্‌গণ নিজ নিজ এলাকায় কার্যতঃ স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ স্পষ্টতঃই শিথিল হইয়া পড়িল। ভূমি রাজস্ব সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি মোটের উপর জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছিল। স্বত্ব ও মালিকানা সম্পর্কে তদন্তের পর জমির উপর কর ধার্য করা হইত, কর সংগ্রহের ব্যাপারে যেসব দুর্নীতি ছিল তাহাও দমন করা হয়। কিন্তু আকবর ও ফিরোজ তুঘলুকের মধ্যে স্যার হেনরি ইলিয়ট যে তুলনা করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত। আকবরের ন্যায় উদার রাজনীতিজ্ঞান ফিরোজের ছিল না, তবে কোনও কোনও বিষয়ে ফিরোজ আকবর অপেক্ষা জনসাধারণের কম কল্যাণকামী ছিলেন না। ফিরোজ তাঁহার আত্মজীবনীতে বহু বে-আইনী কর তুলিয়া দেওয়ার জন্য সগর্বে প্রশংসা দাবী করিয়াছেন। বস্তুতঃ কোরাণের অনুশাসন অনুযায়ীই কর ধার্য করা হইত, এবং এ বিষয়ে যে মূলনীতির অনুসরণ করা হইত তাহা ছিল এই যে ইসলামের বিধিবিধানের দ্বারা অনুমোদিত নহে এরূপ কোন করই রাষ্ট্র ধার্য করিতে পারিবে না। বিচার বিভাগে অবশ্য ইসলামের বিধিই ছিল সর্বত্র প্রযোজ্য। নিপীড়ন ও অমানুষিক ধরণের শাস্তি তুলিয়া দিয়া ফিরোজ জনসাধারণের অশেষ উপকার করিয়াছিলেন। এইরূপ

কতকগুলি সংস্কারের জন্য সুলতান সম্ভবতঃ তাঁহার দক্ষ উজীর খান-ই-জাহান মকবুলের নিকট ঋণী ছিলেন। মকবুল ছিলেন তেলেঙ্গানার একজন ধর্মান্তরিত হিন্দু।

সৈন্যবাহিনী: ফিরোজ অপাত্রে ঔদার্য প্রদর্শনের দ্বারা রাজ্যের সামরিক সংগঠন দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আফিফ বলেন যে, তিনি এই মর্মে এক আদেশ জারী করিয়াছিলেন: "কোন সৈন্য বৃদ্ধ ও অক্ষম হইয়া পড়িলে তাহার পুত্র তাহার স্থান অধিকার করিবে, যদি তাহার কোন পুত্র না থাকে তবে জামাতা এবং জামাতা না থাকিলে ক্রীতদাস তাহার প্রতিনিধিত্ব করিবে।" দুর্নীতির দরুণ প্রচলিত অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর বার্ষিক পরিদর্শন ফলপ্রসূ হইত না। অন্ততঃ দুই-চারিটি ক্ষেত্রে সুলতানের নিজের কার্যকলাপও ছিল সে সকল দুর্নীতির পরিপোষক।

দাসপ্রথা: ক্রীতদাসের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুলতানের প্রাসাদেই চল্লিশ হাজার ক্রীতদাস ছিল, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রীতদাসের সংখ্যা একলক্ষ আশী হাজার ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। ক্রীতদাসদের যথাযথ পরিচালনার জন্য একটি পৃথক বিভাগ স্থাপন করা হয়। দাসপ্রথা সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপদের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

জনকল্যাণমূলক কার্য: নগর ও মসজিদ নির্মাণে ফিরোজ অতি উৎসাহী ছিলেন। জৌনপুর, ফিরোজাবাদ ও ফতেহাবাদ প্রভৃতি নগর তিনিই স্থাপন করেন। মুসলমানদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থানে বহু মসজিদ, মঠ ও সরাইখানা নির্মিত হইয়াছিল। দিল্লীর সন্নিকটে কয়েকটি নূতন উদ্যান নির্মাণ করা হয়। যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত খিজরাবাদের নিকটবর্তী একটি গ্রাম এবং মীরাট হইতে অশোকের দুইটি শিলাস্তম্ভ দিল্লীতে আনা হইয়াছিল। শতদ্রু হইতে ঘাঘর পর্যন্ত (৯৬ মাইল দীর্ঘ) একটি, শিরমুর পর্বত হইতে আরাসানি পর্যন্ত একটি, ঘাঘর হইতে ফিরোজাবাদ পর্যন্ত একটি, এবং যমুনা হইতে ফিরোজাবাদের কিছুটা দূরবর্তী এক স্থান পর্যন্ত আর একটি বড় খাল খনন করায় কৃষির উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই খালগুলি দ্বারা সেচব্যবস্থার যে উন্নয়ন হইয়াছিল তাহাতে দোয়াব ও দিল্লী অঞ্চলের উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। কর্ষিত ভূমির বিস্তৃতির ফলে রাজস্ব স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পায়। এই সব কল্যাণমূলক ব্যবস্থার সহিত অন্যান্য সংস্কার-প্রচেষ্টাও যুক্ত ছিল এবং এইগুলিকে

যথার্থই 'পিতামহীসুলভ আইন' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা সুলতান প্রতিষ্ঠিত বিবাহ-সংস্থা এবং কর্মসংস্থান-কেন্দ্রের উল্লেখ করিতে পারি।

শিক্ষার উন্নতিসাধন: গোঁড়া সুন্নী হিসাবে ফিরোজ স্বভাবতঃই ইসলামের অনুমোদিত প্রথায় শিক্ষাবিস্তারের প্রতি আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি বহু মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া মাদ্রাসাগুলিকে মুক্তহস্তে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বহু ধর্মজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল। ফিরোজের নামের সহিত জড়িত বরনী ও আফিফের বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ দুইটি তাঁহার শাসনকালেই রচিত হইয়াছিল। নগরকোট জয়ের পর এক বিশাল গ্রন্থাগার সুলতানের হস্তগত হয়। ঐ গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁহার নির্দেশক্রমে ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়। যে কয়জন শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি সুলতানের দাক্ষিণ্য লাভ করেন তন্মধ্যে জালালউদ্দীন রুমি ছিলেন অন্যতম।

ফিরোজের উত্তরাধিকারী: ফিরোজের পরে তাঁহার পৌত্র ২য় গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক শাহ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। তুঘলুক শাহ তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র আবুবকরের অনুগামীদের হস্তে ১৩৮৯ খ্রীস্টাব্দে নিহত হইলেন। আবুবকরকে সিংহাসনে স্থাপন করা হইল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই নাসিরউদ্দীন মহম্মদ শাহ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। বৃদ্ধ সুলতানের মৃত্যুর পর হইতেই তিনি সিংহাসন অধিকারের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। আবুবকর ধৃত হইয়া মীরাটের দুর্গে বন্দী হন, কিছুকাল পরেই তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। দোয়াব ও মেওয়াটে বিদ্রোহ দেখা দেয়; কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান কর্মচারীর আনুগত্যে বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব ছিল না। এইসব গোলযোগের মধ্যে ১৩৯৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে নাসিরউদ্দীনের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী আলাউদ্দীন সিকান্দর শাহেরও দুই মাসের মধ্যে মৃত্যু হইল।

পরবর্তী সুলতান হইলেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাসিরউদ্দীন মহম্মদ শাহ। দিল্লীতে তুঘলুক বংশের তিনিই ছিলেন শেষ সুলতান। কয়েকজন শক্তিশালী ওমরাহ তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার না করিয়া নসরৎ শাহ নামে ফিরোজ তুঘলুকের আর একজন পৌত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতানরূপে দাঁড় করাইলেন। ফলে সাম্রাজ্য দ্রুত বিভক্ত হইয়া পড়িল। সুলতান-উস-শর্ক (পূর্বাঞ্চলের অধিপতি) এই উচ্চ উপাধি

ধারণকারী মালিক সারোয়ার নামে জনৈক শক্তিশালী খোজা জৌনপুরে নিজেকে স্বাধীন নৃপতিরূপে ঘোষণা করেন এবং শর্কী বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। গুজরাটের শাসনকর্তা জাফর খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্তাগণও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। নসরৎ শাহের দলীয় লোকেরা পঞ্জাব ও দোয়াবের কয়েকটি অঞ্চলে সময় সময় নাসিরউদ্দীন মহম্মদ অপেক্ষাও অধিকতর ক্ষমতা প্রয়োগ করিত।

তৈমুরের আক্রমণ (১৩৯৮-৯৯)ঃ দিল্লীর স্থলতানী রাজ্য যখন এইভাবে বিনাশের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন। ১৩৩৬ খ্রীস্টাব্দে সমরখন্দের সন্নিকটে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ৩৩ বৎসর বয়সে তিনি চাঘাতাই তুর্কীদের দলপতি হন। তিনি পারস্য, আফগানিস্থান ও মেসোপটেমিয়া জয় করেন; পাষাণহৃদয় যোদ্ধপুরুষ রূপে তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী খ্যাতি দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার ভারত অভিযানের অজুহাত ছিল পৌত্তলিকতার প্রতি দিল্লীর স্থলতানদের সহিষ্ণু মনোভাব, তবে তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ ছিল লুণ্ঠন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে হিন্দুস্থানকে অন্তর্ভুক্ত করিবার কোন অভিপ্রায় তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয় না।

তৈমুর ভারতে পদার্পণের পূর্বেই তাঁহার পুরোবর্তী বাহিনী মূলতান অধিকার করে। ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তিনি সিন্ধু নদ অতিক্রম করেন, অতঃপর চন্দ্রভাগা অতিক্রম করিয়া মূলতান হইতে প্রায় ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত তরম্বা নামক একটি প্রাচীন নগর হইতে প্রভূত মুক্তিপণ আদায় করেন। দিল্লী অভিমুখে তাঁহার অভিযানকালে দিপালপুর ও ভাটনের ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোঙ্গোলদের অত্যাচারের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার মতো এক প্রলয়ঙ্কর দৃশ্য পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া তৈমুর ডিসেম্বর মাসে দিল্লীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। দিল্লী অধিকারের প্রাক্কালে তৈমুর তাঁহার শিবিরে বন্দী ১০০,০০০ হিন্দুকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিলেন, কারণ তাঁহার মনে আশঙ্কা হইল যে যুদ্ধের দিনে 'তাহারা তাহাদের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাদের শিবির লুণ্ঠন ও শত্রুপক্ষে যোগদান' করিতে পারে। জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন যে, তাঁহার এই আদেশ এরূপ কঠোরভাবে পালন করা হইল যে, জীবনে একটি ক্ষুদ্র পাখীও মারেন নাই এইরূপ একজন ধার্মিক মৌলানা পনেরো জন হিন্দুকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

স্থলতান নাসিরউদ্দীন মহম্মদ তাঁহার মন্ত্রী মাল্লুর সহযোগিতায় আক্রমণকারীকে যেভাবে বাধাদান করেন তাহাতে বলবীর্যের কোন পরিচয়ই ছিল না। ১০,০০০ অশ্বারোহী, ৪০,০০০ পদাতিক ও ১২০টি হস্তী লইয়া তাঁহাদের সৈন্যবাহিনী গঠিত ছিল। তৈমুর এই সৈন্যবাহিনীকে ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে পরাজিত করেন। মাল্লু বরনে পলায়ন করেন, স্থলতান গুজরাটে পলাইয়া গিয়া বিদ্রোহী শাসনকর্তা মজঃফর শাহের আশ্রয়প্রার্থী হন। তৈমুর ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে দিল্লী অধিকার করেন এবং মুসলমান উলেমাদের মধ্যস্থতায় দিল্লীর অধিবাসিগণকে প্রাণে না মারিতে সম্মত হন। কিন্তু তৈমুরের সৈন্যবাহিনী ধনদৌলতের সন্ধানে যে অত্যাচার চালাইয়াছিল তাহাতে হিন্দুরা বাধাপ্রদান করিতে বাধ্য হয়, বাধাপ্রদানের ফলে আক্রমণকারীরা পাইকারী হারে হত্যা ও ধ্বংসকার্য চালাইতে থাকে। দিল্লী, সিরি, জাহানপনা ও পুরাতন দিল্লী—এই চারিটি সহর কয়েকদিনের মধ্যেই শ্মশান হইয়া উঠে। জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন—"হিন্দুদের স্তূপীকৃত ছিন্ন মস্তক দিয়া উচ্চ মঞ্চ নির্মিত হইল, তাহাদের রাশি রাশি শবদেহ হইয়া উঠিল হিংস্র পশু ও পক্ষীর খাদ্য।···যাহারা প্রাণে বাঁচিয়া ছিল তাহারা হইল বন্দী।" একথাও জানা যায় যে, "অন্ততপক্ষে কুড়িজন ক্রীতদাস মিলে নাই এমন কোন দীন ব্যক্তি ছিল না।" সমরখন্দে একটি বিরাট মসজিদ নির্মাণের জন্য ভারতের কতিপয় রাজমিস্ত্রীকে তথায় প্রেরণ করা হইল।

দিল্লীতে তৈমুরের সহিত সৈয়দ খিজির খাঁ যোগদান করেন। খিজির খাঁ ১৩৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দে মূলতানের শাসনকর্তার পদ হইতে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন। কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত তিনি তৈমুরের সঙ্গে গিয়াছিলেন। তৈমুর ১৩৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হন এবং মীরাট, কাঙ্গরা ও জম্মু অধিকার করেন। এই অভিযানকালে যেসব হিন্দুকে হত্যা করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যাও নিশ্চয়ই প্রচুর হইয়া থাকিবে। খিজির খাঁ মূলতান, লাহোর ও দিপালপুরের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইলেন। ভারতে ইহার পূর্বে যে কোন বিজয়ীর একবারের আক্রমণে যে দুঃখদুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখদুর্দশার সৃষ্টি করিয়া তৈমুর ১৩৯৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে সিন্ধু অতিক্রম করেন।

স্থলতানী রাজ্যের বিলোপঃ তৈমুর দিল্লীকে শ্মশান করিয়া

রাখিয়া যান। বদাউনী বলেন,—"সহরটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, যে সব অধিবাসী অবশিষ্ট ছিল তাহাদেরও মৃত্যু হয়, পূরা দুই মাসের মধ্যে দিল্লীতে একটি পাখী উড়িতেও দেখা যায় নাই।" দোয়াব অঞ্চলে কিছুকাল আশ্রয়-লাভের পর নসরৎ শাহ দিল্লীর শাসন-ক্ষমতা অধিকার করেন ; কিন্তু অল্পকালের মধ্যে মাল্লু তাঁহাকে মেওয়াটে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন, কিছুকাল পরেই তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ এবং উত্তর ভারতের জায়গীরদারগণ স্বাধীন হইয়া গেলেন। মাল্লু দোয়াবে কয়েকটি সামরিক অভিযান করিয়া সফল হন এবং ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্থলতান নাসিরউদ্দীন মহম্মদকে বুঝাইয়া-স্থঝাইয়া দিল্লীতে ফিরাইয়া আনেন। স্থলতানের কর্তৃত্ব দিল্লী, রোটাক, সম্বল ও দোয়াবেই সীমাবদ্ধ থাকে।

১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নাসিরউদ্দীন মহম্মদের মৃত্যু হয়। তিনিই ছিলেন তুঘলুক বংশের শেষ প্রতিনিধি। অতঃপর ওমরাহগণ দৌলত খাঁকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইলেন। খিজির খাঁ ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সিরিতে দৌলত খাঁকে অবরোধ ও পরাজিত করিয়া হিসারে বন্দী করেন।

তুঘলুকগণের বংশতালিকা
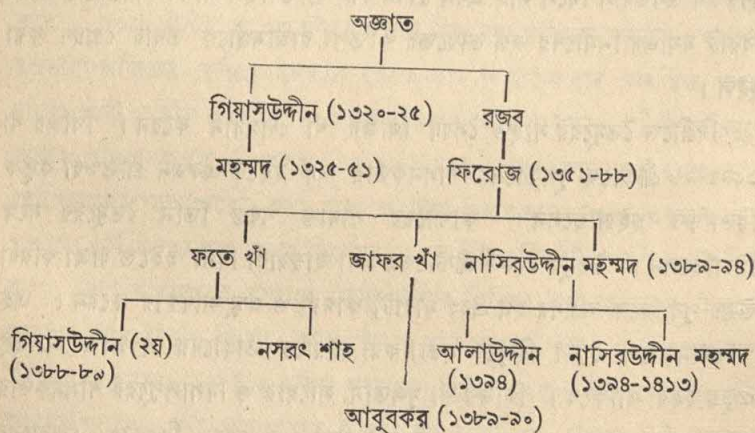
স্থলতানী রাজ্যের পতনের কারণঃ নাসিরউদ্দীন মহম্মদের মৃত্যুকালে স্থলতানী রাজ্যের পরিধি এই উক্তিটি দ্বারা বর্ণিত হইত—"বিশ্বের অধিপতির শাসন দিল্লী হইতে পালাম (দিল্লীর নয় মাইল দূরবর্তী

একটি ছোট সহর) পর্যন্ত বিস্তৃত।" মহম্মদ তুঘলুকের শাসনকালের প্রথম দিকে সাম্রাজ্যের যে বিশাল আয়তন ছিল তাহার সহিত ইহার তুলনা বেদনাদায়ক। মহম্মদের আমলেই সাম্রাজ্য ধ্বংস পাইতে আরম্ভ করে—তাঁহার চরিত্র ও নীতি এজন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। তুর্কী সাম্রাজ্য ছিল প্রাচ্যদেশীয় স্বেচ্ছাতন্ত্রের একটি পূর্ণ নিদর্শন, কিন্তু স্বেচ্ছাতন্ত্র রাষ্ট্রশীর্ষে শক্তিমান পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়। মহম্মদ দুর্বল ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার দক্ষতার অভাব ছিল ; ব্যবহারিক কার্যের অনুপযোগী শক্তি নিষ্ঠুর অত্যাচারের ক্ষমতায় পরিণত হইয়া গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল। ফিরোজ যদি দৃঢ় ও দক্ষ শাসক হইতেন তাহা হইলে সাম্রাজ্যের ভাগ্য হয়ত পুনরুদ্ধার করা যাইত, কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বলচিত্ত ধর্মান্ধ ; তিনি যুদ্ধে ভীত ছিলেন ও অসঙ্গত উদারতা প্রদর্শন করিতেন। ফিরোজের উত্তরাধিকারিগণ আমাদিগকে ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী মোগলদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকেন। তাঁহারা বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করিতে এবং তৈমুরের আক্রমণের আঘাত সহ্য করিতে পারেন নাই।

কিন্তু একমাত্র রাজতন্ত্রের উপরই সাম্রাজ্যের পতনের কারণ আরোপ করিলে চলিবে না। মুসলমান আমীর ও মালিকগণ তাঁহাদের ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলিষ্ঠ পূর্বপুরুষদের ন্যায় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন না। তাঁহারা ভোগবিলাসী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, যুদ্ধবিগ্রহ অপেক্ষা চক্রান্তজাল রচনায়ই ছিল তাঁহাদের অধিকতর পারদর্শিতা। ইহা লক্ষণীয় যে চতুর্দশ শতাব্দীতে কুতবউদ্দীন, ইলতুৎমিস, বলবন, আলাউদ্দীন, কাফুর ও গিয়াসউদ্দীন তুঘলুকের ন্যায় ব্যক্তির আর আবির্ভাব ঘটে নাই। ফিরোজ তুঘলুকের শাসনকালে ক্রীতদাসের যে প্রভূত সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা ছিল মুসলমান রাষ্ট্র ও মুসলমান সমাজের অন্তর্নিহিত অসারতারই পরিচায়ক ; ৪০,০০০ ক্রীতদাসের মধ্য হইতে কোন ইল্‌তুৎমিস অথবা বলবন অথবা কাফুরের উদ্ভব ঘটে নাই।

তৃতীয়তঃ, সে যুগের সেই শিথিল পরিবহন-ব্যবস্থার মধ্যে একটি মাত্র কেন্দ্র হইতে শাসনকার্য পরিচালনার পক্ষে সাম্রাজ্যের আয়তন অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। দক্ষিণ ভারত জয় অসামান্য বীরত্বসূচক কার্যই হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা মারাত্মক ভ্রম রূপে প্রতিপন্ন হয়। আলাউদ্দীনের আমলে দাক্ষিণাত্য আক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া পরে দিল্লী হইতে দক্ষিণাঞ্চলের চূড়ান্ত বিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রায় নিয়মিত বিদ্রোহ দেখা দিতে

থাকে ; ফলে সাম্রাজ্যের বিশেষ শক্তিক্ষয় হয়। সাম্রাজ্য একটি অখণ্ড রাজ্যে পরিণত না হইয়া মুসলমান শাসনকর্তা ও হিন্দু সামন্তদের দ্বারা শাসিত কতকগুলি খণ্ড খণ্ড রাজ্যের সমষ্টিই হইয়া রহিল ; সামরিক শক্তিপ্রয়োগ ব্যতীত ইহাদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য রক্ষার অন্য কোন উপায়ই ছিল না।

পরিশেষে, হিন্দুদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ পরবর্তী কালে ঔরঙ্গজেবের পক্ষে যেমন বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সুলতানী রাজ্যের পক্ষেও তদপেক্ষা কম বিপর্যয়কর হয় নাই। রাজপুতদের বশে আনিতে পারা যায় নাই ; রণথম্ভোরের ন্যায় একটি দুর্গকে স্থায়ী ভাবে আয়ত্তে আনিতে মুসলমানদের এক শতাব্দী সময় লাগিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের হিন্দুগণ মুসলমান আধিপত্য চূড়ান্ত ঘটনা বলিয়া মানিয়া লয় নাই। রাজধানীর অদূরবর্তী দোয়াবের হিন্দুগণ স্থানীয় সরকারী কর্মচারী অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা দেখিবা মাত্রই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত। ইহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, সুলতানী রাষ্ট্র হিন্দুদের প্রতি কোন সুসমঞ্জস নীতি গ্রহণ করে নাই। তাহাদের তুষ্টিসাধন এবং শাসনকার্যে তাহাদিগকে অংশীদার করিয়া লইবার জন্য কিছুই করা হয় নাই, অধিকন্তু তাহাদের ধনসম্পদ ও ধর্মের জন্য তাহাদিগকে অনেক সময় নির্যাতন ভোগ করিতে হইত। সময়ের গতি এবং স্বাভাবিক প্রতিবেশীসুলভ যোগাযোগের ফলে রাজ্যজয়কালের তিক্ততা অনেকটা হ্রাস পাইলেও, শাসকবর্গ বৈরভাবাপন্ন দেশে সামরিক শিবিরের মধ্যেই বসবাস করিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সৈয়দ ও লোদী বংশ

খিজির খাঁ (১৪১৪-২১) : খিজির খাঁ যে সৈয়দ বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবী করিতেন কিন্তু তাহা সন্দেহের অতীত ছিল না। দৌলত খাঁর পরাজয়ের পর তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেও সুলতান উপাধি ধারণ করেন নাই। তৈমুরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী শাহ রুকের প্রতিনিধিরূপেই রাজ্য শাসন করিতেছেন—ইহাই ছিল তাঁহার দাবী। সম্ভবতঃ শাহ রুকের

নিকট মাঝে মাঝে তিনি কর প্রেরণ করিতেন। তিনি দোয়াবের উচ্ছৃঙ্খল হিন্দুদিগকে দমন করিবার জন্য প্রায়ই অভিযান প্রেরণ করিতেন, কিন্তু স্থলতানী রাজ্য হইতে যে সকল প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল সেগুলি পুনরধিকারের কোন চেষ্টাই তিনি করেন নাই। খিজির খাঁর কর্তৃত্ব দিল্লী, দোয়াব ও পঞ্জাবেই সীমাবদ্ধ ছিল।

পরবর্তী সৈয়দগণ (১৪২১-৫১)ঃ খিজির খাঁর পরে তাঁহার পুত্র মোবারক সিংহাসন লাভ করেন। তিনি শাহ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি তের বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। খোক্কর উপজাতি এবং দোয়াবের হিন্দুদের বিরুদ্ধে কয়েকবার অভিযান প্রেরণের কাহিনীতেই তাঁহার রাজত্বকালের ইতিহাস পর্যবসিত। ১৪৩৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হন; ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে তাঁহার উজীর সারোয়ার-উল-মূলক ছিলেন প্রধান। নূতন স্থলতান মহম্মদ শাহ্ ছিলেন মোবারকের ভ্রাতুষ্পুত্র; তিনি অন্যান্য আমীর-ওমরাহগণের সহায়তায় সারোয়ারের শাস্তিবিধানে সমর্থ হন। মালবের মহম্মদ খলজী দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু গুজরাটের আহম্মদ শাহ কর্তৃক তাঁহার রাজধানী আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে তিনি অবিলম্বে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। লাহোর ও শিরহিন্দের আফগান শাসনকর্তা বহলুল লোদী মালবের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে স্থলতানকে সাহায্য করেন। বহলুল লোদীর এই সহায়তার জন্য স্থলতান তাঁহাকে খান-ই-খান উপাধি দ্বারা পুরস্কৃত করেন এবং প্রকাশ্যে তাঁহাকে স্বীয় পুত্র বলিয়া সম্বোধন করেন। কিন্তু বহলুল লোদী ছিলেন উচ্চাভিলাষী; খোক্করগণ তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য প্ররোচিত করে। তিনি দিল্লী আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হইয়া পশ্চাদপসরণ করেন। কিন্তু স্থলতানের কর্তৃত্ব সর্বত্রই লঙ্ঘিত হইতে থাকে: "দিল্লী হইতে কুড়ি ক্রোশ দূরে অবস্থিত আমীরগণও (স্থলতানের) আনুগত্য অস্বীকার করিয়া বাধাপ্রদানের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন।" ১৪৪৫ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ শাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন আলম শাহ স্থলতান হন। তিনি নিতান্তই দুর্বল ও অকর্মণ্য ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাসঘাতক উজীরের সহায়তায় বহলুল লোদী ১৪৫১ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী অধিকার করেন। আলম শাহ বিনা বাধায় স্থলতান পদ পরিত্যাগ করিয়া বদাউনে গিয়া বসবাস স্থরু করেন, কয়েক বৎসর পরে তথায় শান্তিতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

সৈয়দগণের বংশ তালিকা
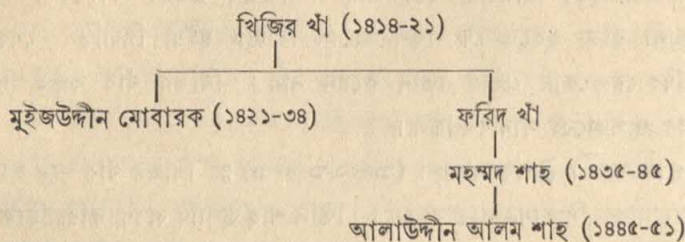
বহলুল লোদী (১৪৫১-৮৯): বহলুল লোদী যখন বিলীয়মান সৈয়দ বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করেন তখন পঞ্জাবের বৃহত্তর অঞ্চলের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং দরিয়া খাঁ লোদী নামক তাঁহার জনৈক আত্মীয় সম্বল অর্থাৎ দিল্লীর পূর্বদিকে অবস্থিত দেশ শাসন করিতেন। দোয়াব প্রকৃতপক্ষে ছিল স্বাধীন দলপতিদের অধীন। অন্যান্য প্রদেশগুলিও অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল।

বহলুল লোদী একজন যোগ্য ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন, তবে সুলতানী রাজ্যকে যে উহার পূর্বের ক্ষমতা ও মর্যাদার আসনে ফিরাইয়া আনা যাইবে না ইহা উপলব্ধি করিবার মতো বাস্তব বুদ্ধি তাঁহার ছিল। স্বাধীন প্রদেশগুলিকে পুনরায় জয় করা যায় নাই, বলবন রাজতন্ত্রের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন তাহারও পুনঃপ্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই। উদ্ধত আফগান ওমরাহগণ সুলতানকে তাঁহাদের সমকক্ষই জ্ঞান করিতেন, বহলুলকেও তাঁহাদের একজন মুখপাত্র হিসাবে থাকিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছে। জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন—"সামাজিক সভাসমিতিতে তিনি কখনও সিংহাসনে বসিতেন না, আমীর ও ওমরাহগণকেও তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে দিতেন না। এমন কি জনসাধারণের বক্তব্য শ্রবণকালেও তিনি সিংহাসনে বসিতেন না, গালিচার আসনে উপবেশন করিতেন······আমীর ও ওমরাহগণ যদি কখনও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, এমন কি তিনি নিজে তাহাদের গৃহে গৃহে যাইতেন, কটিদেশ হইতে তরবারি উন্মুক্ত করিয়া বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের সম্মুখে স্থাপন করিতেন; কেবল তাহাই নহে,

তিনি অনেক সময় স্বীয় শিরস্ত্রাণ খুলিয়া তাহাদের নিকট মার্জনা ভিক্ষা পর্যন্ত করিতেন।......তাঁহার সমস্ত আমীর ও সৈন্যদের সহিত তিনি ভ্রাতৃভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন।"

বহলুল প্রথমেই যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে হামিদ খাঁর ক্ষমতাচ্যুতি ছিল অন্যতম। হামিদ খাঁ ছিলেন সৈয়দ বংশের শেষ সুলতানের বিশ্বাসঘাতক উজীর এবং তাঁহারই সহায়তায় বহলুল দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। সিংহাসন লাভের অত্যল্পকাল পরেই তিনি সুলতানের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করিলেন, কিন্তু দিল্লী হইতে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে জৌনপুরের মামুদ শাহ রাজধানী আক্রমণ করেন। আলম শাহের কয়েকজন বৃদ্ধ আমীরের সহায়তায় মামুদ শাহের শক্তিবৃদ্ধি হইল। এই সংবাদ শুনিবামাত্রই বহলুল দিল্লীতে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং মামুদ শাহ পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইলেন। বহলুল লোদীর এই জয়লাভের ফলে লোদী বংশের শাসন সম্পর্কে উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয় এবং নূতন সুলতানের কর্তৃত্ব সুসংহত হয়।

জৌনপুর হইতে এই আক্রমণের ফলে বহলুল বুঝিতে পারিলেন যে, দিল্লীর সিংহাসনের নিরাপত্তার জন্য দোয়াব দখলে রাখা এবং জৌনপুর জয় করা প্রয়োজন। কয়েকটি শাস্তিমূলক অভিযান চালাইয়া তিনি মেওয়াট ও দোয়াবের বিদ্রোহী নায়কদিগকে দমন করিলেন। অতঃপর তিনি জৌনপুরের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, ফলে জৌনপুর ১৪৭৯ খ্রীস্টাব্দে সুলতানী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। কিছুদিন পরে নূতন প্রদেশের শাসনভার সুলতানের জ্যেষ্ঠপুত্র বরবক শাহের উপর অর্পিত হইল। কালপি (উত্তরপ্রদেশের জালাউন জেলা), ঢোলপুর ও গোয়ালিয়র অধিকৃত হইল।

সিকান্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)ঃ বহলুল লোদীর মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র নিজাম খাঁ ১৪৮৯ খ্রীস্টাব্দে সিকান্দর শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বরবক শাহ জৌনপুরে সুলতান উপাধি ধারণ করেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার অধীনতা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন। জৌনপুরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হইলে বরবক শাহ বশ্যতা স্বীকার করেন। সিকান্দর তাঁহাকে জৌনপুরের শাসনকর্তা রূপেই রাখেন, তবে তাঁহার উচ্চাভিলাষ দমনের জন্য কয়েকজন বিশ্বস্ত আফগান ওমরাহকে প্রদেশের শাসনকার্যে তাঁহার সহিত যুক্ত রাখা হইল। কিন্তু জৌনপুরের

শক্তিশালী জমিদারগণ বরবক শাহকে অগ্রাহ্য করেন এবং সিকান্দরও তাঁহার অযোগ্যতার দরুণ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। জমিদারদিগকে দমন করিবার জন্য সিকান্দর স্বয়ং যখন জৌনপুরে উপস্থিত হইলেন তখন তাহারা শর্কী স্থলতান হোসেন শাহকে সিংহাসন পুনরধিকারের জন্য আমন্ত্রণ করিল। বহলুল লোদীই হোসেন শাহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। হোসেন শাহ বিপুল সংখ্যক সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং জীবনের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর তিনি অজ্ঞাতভাবে বাঙ্গালায়ই অতিবাহিত করেন। সিকান্দর লোদীর সৈন্যবাহিনী বিহার অধিকার করিল। অতঃপর স্থলতান বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, কিন্তু এক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে আর যুদ্ধ হয় নাই।

জৌনপুর অধিকার ও বিহার জয় সামরিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে কম কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল না। স্থলতানের সাম্রাজ্য এখন বাঙ্গালা দেশের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। সিকান্দর ছিলেন একজন শক্তিশালী শাসনকর্তা। তিনি দৃঢ়হস্তে বিদ্রোহ দমন করিতেন, তাহার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। এমন কি, তিনি উদ্ধত আফগানদিগকেও রেহাই দেন নাই। শাসন-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রবর্তন না করিলেও, তিনি হিসাব নিকাশের যথাযথ পরীক্ষার উপর নজর রাখিতেন এবং হিসাবের গরমিল ও তহবিল তছরূপের ক্ষেত্রে তিনি এরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করিতেন যাহা ফিরোজ তুঘলুককে হয়ত ভীতচকিত করিয়া তুলিত। দক্ষ গুপ্তচর বাহিনীর সাহায্যে স্থলতান সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং তাঁহার প্রজাবৃন্দের মনোভাব অবগত হইতেন। কৃষি কর বিলোপ এবং ব্যবসা বাণিজ্যের বাধা নিষেধ প্রত্যাহারের ফলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইল।

কিন্তু এক বিষয়ে সিকান্দরের অনুসৃত নীতির মধ্যে উচ্চ রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় ছিল না। কারণ তিনিও ফিরোজ তুঘলকের ন্যায় ধর্মান্ধতার বশে হিন্দুদের উৎপীড়ন করিয়া তাহাদের বন্ধুত্ব হারাইয়াছিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণ কয়েকজন মুসলমানের সম্মুখে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার ধর্ম ইসলাম অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, এই অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণ প্রাণ হারান। মথুরার মন্দিরগুলি বিনষ্ট করিয়া ফেলার আদেশ দেওয়া হইল। দেবদেবীর মূর্তিগুলি কসাইদিগকে দেওয়া হইল, কসাইরা ঐগুলি মাংসের ওজন রূপে ব্যবহার

করিত। হিন্দুদিগকে যমুনা নদীতে স্নান করিতে দেওয়া হইত না, হিন্দু তীর্থ-যাত্রীদিগকে ক্ষৌরকার্য না করিবার জন্য নাপিতগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

দরিদ্র ও পণ্ডিত উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের প্রতিই সিকান্দর লোদী সদাশয় ছিলেন। মুসলমান পণ্ডিত ও সাধু ব্যক্তিদের প্রতি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতার ফলে জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পাইল। চিকিৎসা বিষয়ে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের তিনি ফার্সি ভাষায় অনুবাদের আদেশ দেন। তিনি নিজেও ফার্সি ভাষায় অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। শিল্পকলারও তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মোগলদের আমলে যে স্থানটি ভারতের জাঁকজমকের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল তিনি সেই আগ্রা সহর স্থাপন করেন। ১৫০৪ খ্রীস্টাব্দে এই সহরটির পত্তন হইয়াছিল। এটাওয়া, বিয়ানা, কোল, গোয়ালিয়র ও ঢোলপুরের উগ্র জায়গীরদারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযান চালাইবার পক্ষে এখানে একটি সুবিধাজনক সামরিক ঘাঁটি স্থাপনই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। সিকান্দর লোদী তাঁহার শেষজীবনে প্রায়ই আগ্রায় বসবাস করিতেন।

ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-২৬): সিকান্দর লোদীর পর তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদী সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইব্রাহিম যতটা না অত্যাচারী অথবা অযোগ্য ছিলেন, তদপেক্ষা অধিক ছিলেন কৌশলহীন। তিনি আফগান ওমরাহদের ঔদ্ধত্য চূর্ণ করিবার সিদ্ধান্ত করেন। আফগান ওমরাহরা তাঁহাদের জায়গীরগুলিকে 'নিজেদের অধিকার এবং সুলতানের পক্ষ হইতে কোনরূপ উদারতা অথবা দাক্ষিণ্যের পরিবর্তে তাঁহাদের তরবারির শক্তিদ্বারা ক্রীত' বলিয়া মনে করিতেন। ফিরিস্তা বলেন, "তাঁহার পিতা ও পিতামহের অনুসৃত রীতিনীতির পরিবর্তে তিনি ঠিক বিপরীত নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কর্মচারীদের মধ্যে (নিজ সম্প্রদায়ের বা অন্য সম্প্রদায়েরই হউক) কোনরূপ পার্থক্যের সৃষ্টি করেন নাই এবং তিনি প্রকাশ্যেই বলিতেন যে, রাজাদের কোন আত্মীয়স্বজন বা জাতি থাকা উচিত নহে, সকল লোককেই রাষ্ট্রের প্রজা ও ভৃত্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং যে আফগান ওমরাহগণ এ পর্যন্ত সুলতানের সম্মুখে বসিতে পারিত তাহাদিগকে দুই কর একত্র করিয়া সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত।" গর্বিত রাজা সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের যে অধিকার তাহার সহিত একটি আদর্শহীন ও

বিশেষ শক্তিশালী অভিজাত সম্প্রদায়ের দাবীর সংঘাত মীমাংসার জন্য বৃথাই চেষ্টা করা হইতেছে এবং এই চেষ্টার মধ্যে মহাবিপদের আশঙ্কা নিহিত রহিয়াছে। তিনি রাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চস্তরে পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গোলযোগপূর্ণ তিনটি শতাব্দীর রীতিনীতি অতিক্রম করিয়া যাইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না; ওমরাহগণ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না যে, তাঁহাদের অতিরিক্ত দাবীগুলি এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহার ফলে রাজতন্ত্র ও অভিজাত-তন্ত্রের সর্বোৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বিনষ্ট করিয়া উভয়েরই অপকৃষ্টতার পরিপুষ্টি সাধিত হইতেছে। ইহার ফলে ইব্রাহিম লোদী ও ওমরাহদের মধ্যে তিক্ত বিরোধ চলিতে লাগিল এবং পরিণামে পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে আফগানশক্তি ধ্বংস হইল।

অভিজাতগণ প্রথমে তাঁহাদের পথের কণ্টকস্বরূপ এই সুলতানের ভ্রাতা জালালকে জৌনপুরের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া তাঁহার ক্ষমতা খর্ব করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কয়েকজন অভিজ্ঞ ওমরাহের পক্ষে নিজেদের ভুল বুঝিতে দেরী হইল না; তখন অধিকাংশ বন্ধুর দ্বারা পরিত্যক্ত জালালকে আশ্রয়ের সন্ধানে গোয়ালিয়রে পলায়ন করিতে হইল। ইব্রাহিম গোয়ালিয়র অধিকার করিলেন, সেখানকার হিন্দুরাজাকে তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করিতে হইল। জালাল গোণ্ডোয়ানায় ধৃত হইয়া প্রাণ হারাইলেন।

অতঃপর ইব্রাহিম কয়েকজন বিশিষ্ট ওমরাহকে শাস্তি প্রদান করিয়া অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক আতঙ্কের সৃষ্টি করিলেন। এক বিরাট বিদ্রোহ দেখা দিলে সুলতানের সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহীগণকে কঠোরভাবে দমন করে। অতঃপর মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করা হইল, কিন্তু রাণা সংগ্রাম সিংহ বীরত্বের সহিত তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিলেন। আফগান আমীরদের অসন্তোষ ক্রমশঃ চূড়ান্ত পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইল। দৌলত খাঁ লোদী বাবরকে ভারত আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। ইব্রাহিম লোদী ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

লোদী বংশের তালিকা

বহলুল লোদী (১৪৫১—৮৯)

- বরবক শাহ (জৌনপুর)
- সিকান্দর লোদী (১৪৮৯—১৫১৭)
  - ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭—২৬)

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রাদেশিক রাজ্যসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

উত্তর ভারতের রাজ্যসমূহ

দিল্লীর সুলতানী রাজ্যের পতনের স্বাভাবিক পরিণতিরূপেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এইসব রাজ্যের প্রতিটিরই নিজস্ব এক ইতিহাস ছিল।

কাশ্মীর ঃ কাশ্মীর উপত্যকা কখনও দিল্লীর সুলতানী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তবে শাহ মীর্জা নামে একজন বীরপুরুষের হাতে তথায় হিন্দুশাসনের অবসান ঘটিয়াছিল। তিনি সামস্উদ্দীন শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া ১৩৪৬ খ্রীস্টাব্দে কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম উত্তরাধিকারী শিহাবউদ্দীন (১৩৫৯-৭৮) ছিলেন সাহসী যোদ্ধা ও সুদক্ষ শাসক। সিকান্দর (১৩৯৩-১৪১৬) ছিলেন নিষ্ঠুর অত্যাচারী ও পৌত্তলিকতা বিরোধী। কাশ্মীরের হিন্দুদিগকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও নির্বাসন, ইহার মধ্যে যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে বলা হইল। কাশ্মীরের বর্তমান মুসলমান সংখ্যাধিক্যের কারণ নিহিত রহিয়াছে এই নির্দেশের মধ্যে। তবে জয়নুল আবেদীন

(১৪২০-৭০) তাঁহার ধর্মীয় নীতিতে আকবরের মতই উদার ছিলেন। নির্বাসিত বহু হিন্দুকে তিনি ফিরাইয়া আনেন এবং বহু ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে পুনরায় তাহাদের পূর্বপুরুষের ধর্মগ্রহণে অনুমতি দেন। তিনি ছিলেন একজন দয়ালু শাসক, পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত ও রাজতরঙ্গিণী সংস্কৃত হইতে ফার্সিভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ "একদল রাজনৈতিক ক্রীড়নকে পরিণত হয় এবং দলবিশেষ এবং শক্তিশালী মালিকদের হস্তে তাঁহাদের উত্থান ও পতন চলিতে থাকে।"

১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে শাহ মীর্জার বংশ উৎসাদিত হয় এবং চাক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গাজী শাহ সিংহাসন অধিকার করেন। এই বংশের শেষ রাজা ১৫৮৯ খ্রীস্টাব্দে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন।

জৌনপুর ঃ তুঘলুক বংশের শেষ সুলতানের রাজত্বকালে খোজা মালিক সারওয়ার ১৩৯৪ খ্রীস্টাব্দে জৌনপুরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁহার কর্তৃত্ব পশ্চিমে আলীগড় এবং পূর্বে ত্রিহুত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ইব্রাহিম শাহ (১৪০২-৩৬) শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার একজন রুচিসম্পন্ন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শনের জন্য রাজা গণেশকে শাস্তিপ্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, কিন্তু তাঁহার অভিযান ব্যর্থ হয়। তাঁহার পুত্র মামুদ শাহ (১৪৩৬-৫৮) মালব ও দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হোসেন শাহ (১৪৫৮-৭৯) উড়িষ্যায় এক সফল অভিযান চালাইয়াছিলেন, কিন্তু বহলুল লোদীকে প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হন নাই। শর্কী বংশের রাজত্বকালে জৌনপুর মুসলমান স্থাপত্যশিল্প ও শিক্ষার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং 'ভারতের শিরাজ' বলিয়া অভিহিত হইতে থাকে।

মালব ঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে দিলওয়ার খাঁ ঘুরী নামে একজন আফগান কর্তৃক স্বাধীন মালব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র হোসাং শাহ (১৪০৬-৩৫) তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। গুজরাটের ১ম মজঃফর শাহ তাঁহাকে একবার পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। পরে তিনি দুইবার গুজরাটের বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযান এবং উড়িষ্যার বিরুদ্ধে একবার সফল অভিযান চালাইয়াছিলেন। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সামরিক প্রচেষ্টাসমূহ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে মালবের সিংহাসন খলজী বংশীয়দের করতলগত হয়।

১ম মামুদ খলজী (১৪৩৬-৬৯) গুজরাটের ১ম আহম্মদ শাহের আক্রমণ প্রতিহত করেন, দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টাও একবার করেন। মেবারের রাণা কুম্ভের বিরুদ্ধে তিনি বারংবার যুদ্ধ করেন, এমনকি বাহমনী রাজ্যের বিরুদ্ধেও তিনি একবার অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। মিশরের ভুয়া খলিফার নিকট হইতে তিনি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভও করিয়াছিলেন। মালবের মুসলমান সুলতানদের মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার রাজত্ব-কালেই এই স্বাধীন সুলতানীরাজ্যের খ্যাতি সর্বাধিক বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই বংশের শেষ রাজা ২য় মামুদ খলজী (১৫১০-৩১) ছিলেন দুর্বল এবং রাজপুত প্রজাদের উপর নির্ভরশীল। মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন। ১৫৩১ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটের বাহাদুর শাহ মালব অধিকার করেন।

চারি বৎসর পরে সম্রাট হুমায়ুন মালব অধিকার করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পর খলজী বংশীয়দের একজন প্রাক্তন কর্মচারী মাল্লু খাঁ মালবের রাজধানী মাণ্ডুতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দে মালব শের শাহের শাসনাধীন হয়। সুজা-য়াৎ খানের পুত্র বাজবাহাদুরের নিকট হইতে ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে আকবর মালব জয় করিয়া লন। সুজা-য়াৎ খান ছিলেন ইসলাম শাহ সুরের অধীনে মালবের শাসনকর্তা।

গুজরাটঃ দিল্লীর সুলতানী রাজ্যের ধ্বংসের পরে যেসব প্রাদেশিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তন্মধ্যে সমৃদ্ধিশালী গুজরাট প্রদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। ১৩৯৬ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটের শাসনকর্তা জাফর খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং কয়েক বৎসর পরে তিনি সুলতান মজঃফর শাহ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন এক ধর্মান্তরিত রাজপুতের পুত্র। তিনি ইদর জয় করেন, মালবের হোসাং শাহকে পরাজিত ও বন্দী করেন এবং জৌনপুরের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। তাঁহার পৌত্র ১ম আহম্মদ শাহ (১৪১১-৪২) মালব, খান্দেশ এবং ডুঙ্গরপুরের ন্যায় কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি আহম্মদাবাদ নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ মামুদ বেগারা (১৪৫৮-১৫১১) এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি মালবের ১ম মামুদ খলজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং গিরনার ও চম্পানীর জয় করেন। তাঁহার রাজ্য পশ্চিমে আরব সাগর (কারণ জুনাগড় ও চৌল তাঁহার অধিকৃত ছিল), দক্ষিণে খান্দেশ, পূর্বে মাণ্ডু এবং উত্তরে রাজপুতানার জালোর ও

নাগোর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তাঁহার রাজত্বকালেই গুজরাট রাজ্য আয়তনে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। ১৫০৮ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটের সৈন্যবাহিনী মিশরের স্থলতান কর্তৃক প্রেরিত নৌবাহিনীর সহায়তায় চৌল বন্দরে পর্তুগীজদিগকে নৌ-অভিযানে পরাভূত করে। এই জয়ে স্থায়ী কোন ফল লাভ হয় নাই। ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি দিউ নামক স্থানে গুজরাটের সৈন্যবাহিনী এবং ইহাদের মিত্রপক্ষ মিশরের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন। দিউতে একটি কারখানা স্থাপনের স্থান দিয়া মামুদ পর্তুগীজদের সহিত শান্তি স্থাপন করিলেন।

মামুদ বেগারার পরে ২য় মজঃফর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই রাজপুত রাজ্যের বিরুদ্ধে বাহাদুর শাহ (১৫২৬-৩৭) চিরাচরিত যুদ্ধ চালাইতে থাকেন এবং রাণার মৃত্যুর পরে চিতোর ধ্বংস করেন। বাহাদুর শাহ দাক্ষিণাত্যেও এক অভিযান প্রেরণ এবং মালব জয় করেন। তাঁহার রাজত্বকালের শেষভাগে সম্রাট হুমায়ুন গুজরাট আক্রমণ করিয়া ইহার একটি অংশ অধিকার করিলেন; কিন্তু পূর্বপ্রান্তে শের শাহের অভ্যুত্থানের ফলে মোগল সম্রাট পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন। বাহাদুর শাহই ছিলেন গুজরাটের শেষ স্বাধীন শাসনকর্তা। পর্তুগীজরা তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় হত্যা করে। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ শক্তিশালী ও উদ্ধত আমীরদের হস্তে ক্রীড়নকমাত্র ছিলেন। দিউ হইতে পর্তুগীজদিগকে বিতাড়নের জন্য কয়েকবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা হইয়াছিল। ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে আকবর গুজরাট জয় করেন।

রাজপুতানাঃ আলাউদ্দীন খলজী কর্তৃক চিতোর জয়ের কাহিনী পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের শেষভাগে সম্ভবতঃ হামির কর্তৃক মেবারে গুহিলোত-প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাণা কুম্ভের (১৪৩৩-৬৮) শাসনাধীনে মেবার একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। মালব ও গুজরাটের স্থলতানদের বিরুদ্ধে তিনি বারংবার যুদ্ধ করেন এবং তাঁহার সাফল্যের স্মারক হিসাবে তিনি চিতোরে একটি বিরাট স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি বহু মন্দির ও দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাণা সঙ্গের (১৫০৯-২৮) রাজত্বকালে মেবারের প্রতিপত্তি শীর্ষস্থানে পৌঁছিয়াছিল। মালব ও গুজরাটের

স্থলতানদের সহিত যেসব সংঘর্ষ হয় তাহা সাধারণতঃ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। তিনি মালবের ২য় মামুদ খলজীকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন, তবে মহানুভবতার সহিত তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইব্রাহিম লোদী কর্তৃক প্রেরিত এক অভিযান রাণা সঙ্গ প্রতিহত করেন, কিন্তু বাবরকে পরাজিত করিবার প্রচেষ্টায় তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন (১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে)।

রাঠোর বংশীয় রাজগণ যোধপুর ও বিকানীরে রাজত্ব করিতেন, তাঁহারা অতি প্রাচীন বংশের লোক বলিয়া দাবী করেন। টডের মতে রাঠোরদিগের সঙ্গে কনৌজের গাহড়বালদের সম্পর্ক আছে। মারবারের আধুনিক ইতিহাস প্রকৃত পক্ষে চুণ্ডার (১৩৯৪-১৪২১) রাজত্বকাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার উত্তরাধিকারী যোধা (১৪৩৮-৮৮) মান্দোর দুর্গ ও যোধপুর সহর নির্মাণ করিয়াছিলেন। শের শাহের বিরোধী মালদেবের রাজত্বকালেই মারবার ক্ষমতার শীর্ষস্থানে উঠিয়াছিল। অম্বরের (জয়পুরের) কচ্ছপঘাট শাসকগণ সূর্যবংশীয় বলিয়া দাবী করেন। টডের মতে অম্বর রাজ্যটি দশম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে এই রাজ্য কতকটা রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করে ; কিন্তু অম্বরের শাসকবর্গ মোগল সাম্রাজ্যের সহিত নিজেদের যুক্ত না করা পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই। অম্বরের রাজা বিহারীমল্ল ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন।

বাঙ্গালা : ফিরোজ শাহ তুঘলুকের অভিযান ব্যর্থ হওয়া পর্যন্ত দিল্লীর স্থলতানী রাজ্যের সহিত বাঙ্গালার সম্পর্ক আমরা পর্যালোচনা করিয়াছি। দুর্বল স্থলতান ফিরোজ যে সিকান্দর শাহকে বাঙ্গালার স্বাধীন নরপতি রূপে রাখিয়া যাইতে বাধ্য হন তিনি স্থখে সমৃদ্ধিতেই রাজত্ব করিয়া যান। অতঃপর তাঁহার পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন যোগ্য ও দয়ালু রাজা। তিনি চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, বিখ্যাত কবি হাফিজের সহিত তাঁহার পত্রালাপ ছিল।

তাঁহার উত্তরাধিকারীদের আমলে রাজা গণেশ (ফার্সী পাণ্ডুলিপিতে অশুদ্ধভাবে 'কানস্' বলিয়া উল্লিখিত) নামে একজন ব্রাহ্মণ জমিদার অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া ওঠেন এবং শেষ পর্যন্ত সিংহাসন অধিকার করেন (১৪১৪)। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তিনি দুইজন ক্ষমতাহীন স্থলতানের নামে

রাজকার্য করিতেন। বাঙ্গালাদেশে হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বিরক্ত হইয়া কুতব-উল-আলম নামক একজন মুসলমান ফকির সিংহাসন বে-দখলকারীকে শাস্তি প্রদানের জন্য জৌনপুরের ইব্রাহিম শাহ শর্কীকে আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। গণেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহ নামে পরিচিত হন। তিনি হিন্দুদের নির্যাতন করিতেন। ১৪৪২ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী আততায়ীর হাতে প্রাণ হারাইলে রাজা গণেশের বংশ লুপ্ত হয় এবং তাহার অল্পদিনের মধ্যেই ইলিয়াস শাহের পুরাতন রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে। জৌনপুরের অধিপতিরা বাঙ্গালার উপর আক্রমণ চালাইতে থাকেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হাবসী (আবিসিনিয়ান) ক্রীতদাসগণ গৌড়ে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইহার পরিণামে অরাজকতা ও কুশাসন অনিবার্যরূপে দেখা দেয়।

সৈয়দ বংশধর হোসেন শাহ হাবসীদের ক্ষমতা চূর্ণ করেন। তাঁহাকে যথার্থ ই মধ্যযুগের বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া অভিহিত করা যায়। স্বীয় রাজ্য হইতে বহলুল লোদী কর্তৃক বিতাড়িত জৌনপুরের হোসেন শাহকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন। উড়িষ্যা ও আসামের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান প্রেরণ করেন, তবে কতটা পরিমাণ অঞ্চল তিনি জয় করিয়াছিলেন তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। কেবলমাত্র একথাই জানা যায় যে, 'উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের করদ রাজগণ' তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে কোথাও বিদ্রোহ বা রাজদ্রোহ হয় নাই। তিনি প্রজারঞ্জক শাসক এবং হিন্দুধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন।

হোসেন শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২) ছিলেন একজন যোগ্য ও ক্ষমতাশালী রাজা। বাবরের আত্মজীবনীতে তাঁহাকে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক পাঁচজন মুসলমান রাজার অন্যতম রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি ত্রিহুত জয় করেন, পাণিপথের যুদ্ধের পর দিল্লী ছাড়িয়া আসিয়াছেন এরূপ বহু আফগান ওমরাহকে আশ্রয় দেন, এবং গুজরাটের বাহাদুর শাহের সহিত কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁহারই রাজত্বকালে পর্তুগীজরা প্রথম বাঙ্গালায় পদার্পণ করে। নসরৎ শাহ শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী গিয়াসউদ্দীন মহম্মদ শাহ (১৫৩৩-৩৮) ছিলেন বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন রাজা। অতঃপর শের শাহ গৌড় অধিকার করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহ

খান্দেশঃ খান্দেশ রাজ্য তাপ্তী উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। গুরুত্ব-পূর্ণ নগর বুরহানপুর ও দুর্ভেদ্য দুর্গ অসীরগড় খান্দেশের অন্তর্গত ছিল। ফিরোজ শাহ তুঘলুকের মৃত্যুর পর খান্দেশের শাসনকর্তা মালিক রাজা ফরুকী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। গুজরাটের সুলতান ও বাহমনী সুলতানদের সহিত খান্দেশের সুলতানদের অনেকবার সংঘর্ষ হয়। ১৬০১ খ্রীস্টাব্দে অসীরগড় দুর্গ আকবরের অধিকারে আসে এবং খান্দেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

বাহমনী রাজ্যের অভ্যুত্থানঃ মহম্মদ তুঘলুকের রাজত্বকালে দেবগিরিতে বিদেশী ওমরাহগণ যে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বিদ্রোহীদের নায়ক ইসমাইল মুক্ সাহসী সৈনিক হাসানের অনুকূলে তাঁহার পদ ত্যাগ করেন। আবদুল মজঃফর আলাউদ্দীন বাহমন নাম ধারণ করিয়া হাসান সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৩৪৭ খ্রীস্টাব্দে তথাকথিত বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গু নামক একজন ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর সহিত হাসানের সম্পর্ক ছিল বলিয়া ঐতিহাসিক ফিরিস্তা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নয়। হাসান পারস্যের রাজপরিবারের বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবী করিতেন এবং তিনি যে 'বাহমন শাহ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, উহার একমাত্র কারণ ছিল তাঁহার সেই দাবীর প্রতিষ্ঠা করা। তিনি গুলবর্গায় তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। মহম্মদ তুঘলুকের মৃত্যুর পর হাসান নির্বিবাদে রাজ্যের বিস্তার ও সংহতি সাধনের দিকে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন, কারণ পুনরায় দাক্ষিণাত্য জয় করিবার জন্য ফিরোজ তুঘলুকের কোন চেষ্টা বা অভিপ্রায় ছিল না। গোয়া, দাভোল, কোলাপুর ও তেলেঙ্গানা জয় করা হইল; হাসানের মৃত্যুকালে (১৩৫৮) তাঁহার রাজ্য দৌলতাবাদ হইতে ভোনগির (অন্ধ্র প্রদেশের অন্তর্গত) এবং বেনগঙ্গা হইতে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কর্ণাটের কয়েকজন হিন্দু অধিপতির বিরুদ্ধে এক অভিযান

প্রেরণ করিয়া প্রচুর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করা হয়। হাসান নিজেই মালব ও গুজরাটের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন, কিন্তু উদ্দেশ্য সাধন না করিয়াই তিনি পশ্চাদপসরণ করেন। তাঁহার শাসন-ব্যবস্থা দিল্লীর

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহের উৎপত্তি
(১৩৩৬ – ৪৭)

সুলতানী রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থারই অনুরূপ ছিল। সমগ্র রাজ্যটিকে গুলবর্গা, দৌলতাবাদ, বেরার ও বিদর—এই চারিটি তরফে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটির
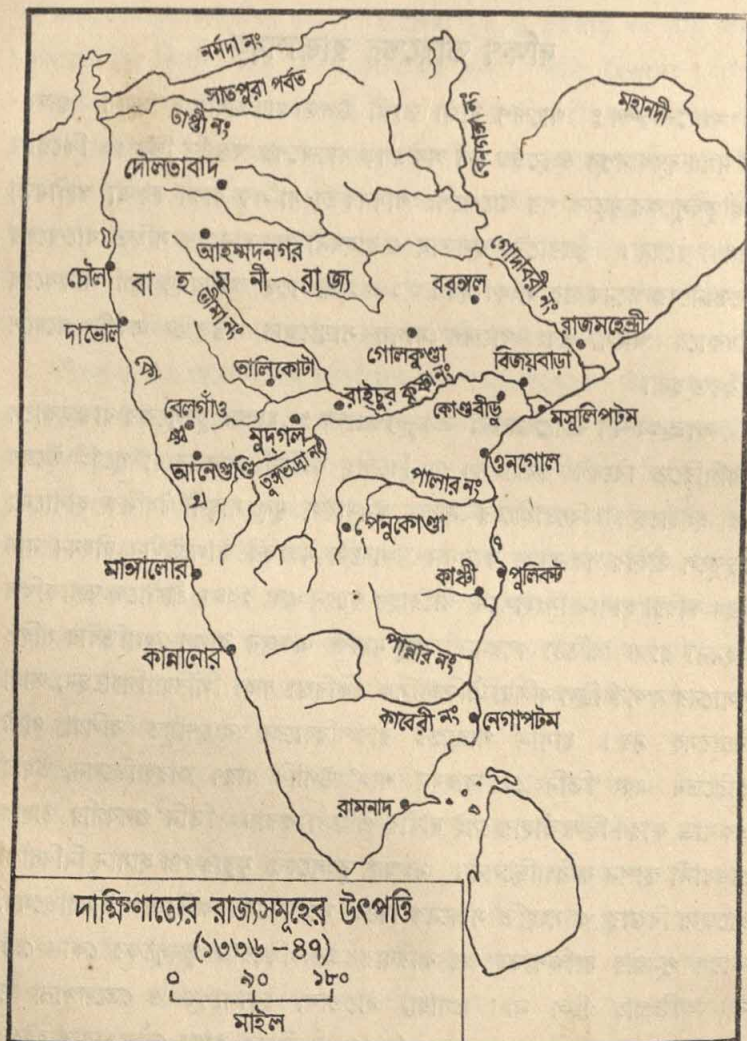
শাসনভার এক-একজন বিশ্বস্ত ও সাহসী মুসলমান ওমরাহের উপর অর্পিত হইয়াছিল।

বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ: হাসানের উত্তরাধিকারী ১ম মহম্মদ শাহের (১৩৫৮-৭৭) রাজত্বকালে বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘ সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। বিজয়নগরের রাজা ১ম বুক্ক ও বরঙ্গলের কাহ্নাইয়া মহম্মদের মুদ্রা সংস্কারে বাধা দান এবং রায়চুর দোয়াব ছাড়িয়া দেওয়ার দাবী জানাইয়া তাঁহার অসন্তোষের উদ্রেক করিয়াছিলেন। হিন্দুগণ পরাজিত হয়। কাহ্নাইয়াকে বশ্যতা স্বীকার, বহু উপঢৌকন প্রদান এবং গোলকুণ্ডা ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে হইয়াছিল। কৌথালের বিরাট যুদ্ধে (১৩৬৭) বুক্কর পরাজয়ের পরে তাঁহার রাজ্যের মধ্যেই চারি লক্ষের অধিক হিন্দুকে হত্যা করা হইয়াছিল।

মহম্মদের পুত্র ও উত্তরাধিকারী মুজাহিদ (১৩৭৭-৭৮) বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। তিনি বুক্কের রাজধানী এবং আদোনি অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুইটি স্থানের একটিও অধিকার করিতে পারেন নাই। উর্বর রায়চুর দোয়াবের প্রশ্ন লইয়াই যথারীতি বিরোধের সৃষ্টি হয়। ২য় মহম্মদ শাহ (১৩৭৮-৯৭) ছিলেন শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি এবং রাজ্যজয়ের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অপেক্ষা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রতিই ছিল তাঁহার অধিকতর অনুরাগ।

ফিরোজ শাহ (১৩৯৭-১৪২২) পুনরায় আক্রমণের নীতি অনুসরণ করেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি সহ তিনি ছিলেন ঘোর মদ্যপায়ী এবং তাঁহার বিশাল অন্তঃপুরে বহু নারী ছিল। ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগরের ২য় হরিহর ৩০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৯০০,০০০ পদাতিক সৈন্য লইয়া রায়চুর দোয়াব আক্রমণ করেন। জনৈক মুসলমান সামরিক কর্মচারী কর্তৃক এক কৌশল অবলম্বনের ফলে হিন্দুদের শিবিরে গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং হরিহর পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হন। বহু অর্থ উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করিয়া হিন্দু রাজাকে সন্ধি করিতে এবং বন্দী ব্রাহ্মণদের মুক্ত করিতে হয়। খান্দেশ, গুজরাট ও মালবের মুসলমান নরপতিদের সহিত ফিরোজ শাহের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না ; তাঁহারা বিজয়নগরের রাজাকে উদ্ধত বাহমনী সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্ররোচিত করেন। ১৪০৬ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় যুদ্ধ হয়, মুদ্‌গলের জনৈক স্বর্ণকারের এক সুন্দরী কন্যাকে ২য় বুক্ক হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ইহাই হইয়া দাঁড়াইল যুদ্ধের অজুহাত।

বিজয়নগর সহর আক্রমণ ব্যর্থ হয় এবং হিন্দুদের হস্তে ফিরোজ স্বয়ং পরাজিত ও আহত হন। কিন্তু বাহমনী রাজ্যের জনৈক সেনাপতি তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত এলাকা জয় করেন এবং ২য় বুক্ক অপমানজনক সর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। তিনি তাঁহার এক কন্যাকে ফিরোজ শাহের অন্তঃপুরে প্রেরণ করেন, বাঁকাপুর ছাড়িয়া দেন এবং প্রচুর ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। ১৪১৭ খ্রীস্টাব্দে ফিরোজ তেলেঙ্গানা অধিকার করেন। ১৪২০ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগরের সহিত পুনরায় যুদ্ধ হয়; হিন্দুরা ফিরোজকে পরাজিত এবং তাঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত করে। এই শক্তিশালী রাজা তাঁহার শাসনকালের শেষভাগে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ও দুর্বল হইয়া পড়েন।

তাঁহার ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী আহম্মদ শাহ (১৪২২-৩৫) নবোদ্যমে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। স্বয়ং রাজার নেতৃত্বে এক বিরাট হিন্দু সৈন্যবাহিনী তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে শিবির স্থাপন করে, কিন্তু অতর্কিত আক্রমণের ফলে এক গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং হিন্দু রাজা বিজয়নগরে পলায়ন করেন। আহম্মদ শাহ নির্দয়ভাবে বিজয়নগর রাজ্য বিধ্বস্ত করেন, সহস্র সহস্র নিরপরাধ বেসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করেন এবং হিন্দুদের ধর্মীয় মনোভাবে আঘাত করিতে পারে এরূপ কোন কাজ করিতেই তিনি বাদ রাখেন নাই। অতঃপর বিজয়নগর সহর অবরোধ করা হইল। ২য় দেবরায় কর প্রদান করিয়া সন্ধি করিলেন (১৪২৩)। আহম্মদ শাহ অতঃপর বরঙ্গলের দুর্গ অধিকার করেন এবং শেষ পর্যন্ত কাকতীয় রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করেন। তিনি মালবের সুলতান হুসাং শাহকেও পরাজিত করেন এবং মাহিম দ্বীপের অধিকার লইয়া গুজরাটের সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন (বর্তমান বোম্বাই দ্বীপেই ছিল উহার অবস্থান)। তিনি গুলবর্গা হইতে বিদরে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক এই নিষ্ঠুর অত্যাচারীর বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "তাঁহার স্বভাব ছিল দয়াগুণ ও সদাচারে ভূষিত এবং সংযম ও ভক্তির মাণিক্যে অলঙ্কৃত।" কিন্তু তিনি ছিলেন কুসংস্কার আর গোঁড়ামির অবতার, তবে তাঁহার বিদ্যানুরাগ খাঁটিই ছিল।

মুসলমানদের নিকট বারংবার পরাজিত হইয়া ২য় দেব রায় তাঁহার সামরিক নীতি পরিবর্তনে বাধ্য হন। পদাতিক বাহিনীর নৈপুণ্য ও ধনুর্বিদ্যার কৌশলই মুসলমানদের সাফল্যের কারণ, একথা তাঁহাকে বুঝান

হইল। তিনি মুসলমানদিগকে চাকুরীতে গ্রহণ করিলেন, তাহাদিগকে জায়গীর দিলেন এবং তাহাদের উপাসনার জন্য বিজয়নগরে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া দিলেন। পুনঃসংগঠিত সৈন্যবাহিনী লইয়া তিনি ১৪৪৩ খ্রীস্টাব্দে রায়চুর দোয়াব আক্রমণ করেন এবং প্রারম্ভিক কিছুটা সাফল্য লাভও করিলেন ; কিন্তু আহম্মদ শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী সুলতান আলাউদ্দীন আহম্মদ (১৪৩৫-৫৭) তাঁহাকে সন্ধি ভিক্ষা করিতে এবং নিয়মিত কর প্রদানে বাধ্য করেন। কোঙ্কনের কতিপয় হিন্দু সর্দারকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা হয়। বিলাসপ্রিয় হইলেও আলাউদ্দীন ছিলেন কঠোর শাসক, শ্রেষ্ঠ সংগঠক এবং বিদ্যোৎসাহী।

তাঁহার পুত্র হুমায়ুন (১৪৫৭-৬১) তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। হুমায়ুন ছিলেন রক্তপিপাসু অত্যাচারী এবং তাঁহাকে যথার্থই 'নরহত্যাকারী উন্মাদ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে 'জালিম' (অত্যাচারী) রূপে তাঁহার নাম দীর্ঘকাল লোকের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। তাঁহার নাবালক পুত্র ও উত্তরাধিকারী নিজাম শাহের (১৪৬১-৬৩) রাজত্বকালে উড়িষ্যা ও তেলেঙ্গানার হিন্দু নৃপতি এবং মালবের মামুদ খলজী কর্তৃক বাহমনী রাজ্য আক্রমণের ভয় দেখা দেয়।

মামুদ গাওয়ান : সুলতান মুজাহিদ্ পারসিক ও তুর্কীদের প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া যান। তিনি যে বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত বাহমনী রাজ্য ধ্বংসের কারণ হইয়া উঠে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাহমনী রাজ্য হইয়া উঠে চক্রান্তজাল রচনার লীলাভূমি ; 'দক্ষিণী'-দল আর 'বিদেশী'-দল প্রায়শঃই বিরোধী পক্ষ সমর্থন করিতে থাকে। আহম্মদ শাহের রাজত্বকালেই এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের মধ্যে সর্বপ্রথম বিভেদ রেখা সুস্পষ্টরূপে টানা হয়। ধর্মীয় আচার-নীতির পার্থক্যের ফলে রাজনৈতিক বিরোধ আরও তিক্ত হইয়া ওঠে ; 'দক্ষিণী'-দল ছিল 'সুন্নী', কিন্তু 'বৈদেশিক'দের অধিকাংশই ছিল 'শিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত।

নিজাম শাহ ও ৩য় মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৬৩-৮২) খাজা মামুদ গাওয়ান নামক জনৈক 'বৈদেশিক' শাসন পরিচালনা কার্যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি প্রধানমন্ত্রী রূপে বিশ্বস্তভাবে

রাজ্যের শাসন পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সামরিক অভিযানও জয়যুক্ত হইয়াছিল। তিনি কোঙ্কনের হিন্দু রণনায়কদের পরাজিত এবং গোয়া অধিকার করেন। তাঁহারই শাসনকালে অন্ধ্র ও উড়িষ্যার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। বিজয়নগরের বিরুদ্ধে এক অভিযানকালে বিখ্যাত সহর কাঞ্চী লুণ্ঠিত হয়। তবে, এই 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী মন্ত্রী' (জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিকের উক্তি) দাক্ষিণাত্যের দেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের ষড়যন্ত্র হইতে মুক্ত ছিলেন না। তাহারা ৩য় মহম্মদ শাহের কানে নানাকথা তুলিয়া তাঁহাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিলে তিনি গাওয়ানের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন (১৪৮১)। মেডোস টেলর মন্তব্য করেন যে, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাহমনী রাজ্যের সমস্ত সংহতি ও ক্ষমতা তিরোহিত হয়। মামুদ গাওয়ান সরল জীবন যাপন করিতেন। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং ধর্মীয় রীতি-নীতি নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। তিনি একজন দক্ষ শাসকও ছিলেন। কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি সেই যুগের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই: তিনি হিন্দুগণকে নির্যাতন করিতেন।

বাহমনী রাজ্যের পতন: এই দক্ষ মন্ত্রীর হত্যার পরে বাহমনী রাজ্য বেশীদিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই। মামুদ শাহ (১৪৮২-১৫১৮) ছিলেন নির্বোধ প্রকৃতির ব্যক্তি। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ তাঁহার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ শাসন এলাকায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন। ইউসুফ আদিল শাহ বিজাপুরে (১৪৯০) আদিলশাহী রাজ্য, আহম্মদ নিজাম শাহ আহম্মদনগরে (১৪৯০) নিজামশাহী রাজ্য, ফতুল্লা ইমাদ শাহ বেরারে (১৪৯০) ইমাদশাহী রাজ্য এবং কুলী কুতুব শাহ গোলকুণ্ডায় (১৫১২) কুতুবশাহী রাজ্য স্থাপন করেন। বাহমনী রাজ্য বিদরেই সীমাবদ্ধ রহিল। বাহমনী রাজ্যের শেষ সুলতান কলিমুল্লা ১৫২৫ খ্রীস্টাব্দে যখন বিজাপুরে পলায়ন করিয়া গেলেন তখন তাঁহার ক্ষমতাশালী মন্ত্রী আমীর বরিদ কর্তৃক বিদরে বরিদশাহী বংশ প্রতিষ্ঠিত হইল।

বাহমনী রাজবংশের তালিকা
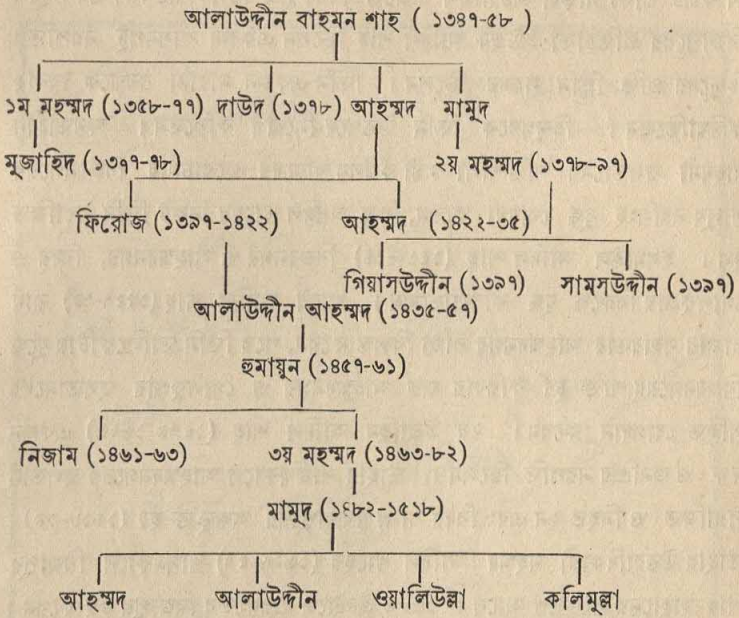
নিকিতিন ঃ ১৪৭০ খ্রীস্টাব্দে আথানাসিয়াস নিকিতিন নামক জনৈক রুশ ব্যবসায়ী বিদর পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বাহমনী রাজ্যের রাজধানী তখন বিদরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি বলেন, "খোরাসানের অধিবাসীরা দেশশাসন ও যুদ্ধ করিয়া থাকে।" সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রচুর ঃ সুলতান যখন শিকারে বহির্গত হইতেন তখন ষাটহাজার সৈন্য ও ২০০টি হস্তী তাঁহার সঙ্গে যাইত। আমীর-ওমরাহগণ বিলাসে জীবনযাপন করিতেন। "তাঁহারা রৌপ্যনির্মিত পালঙ্কে যাতায়াত করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইহার অগ্রভাগে থাকিত স্বর্ণসজ্জায় সজ্জিত কুড়িটি অশ্ব এবং পশ্চাৎভাগে অশ্বারোহী তিনশত, পদব্রজে পাঁচশত লোক, শিঙ্গাবাদক, দশজন মশালধারী ও দশজন গীতবাদ্যকার থাকিত।" জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে পর্যটক বলেন, "দেশটি নিরতিশয় জনবহুল ; কিন্তু পল্লীবাসীদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। পক্ষান্তরে অভিজাত ব্যক্তিগণ প্রভূত বিত্তশালী, তাঁহারা বিলাসব্যসনে দিন যাপন করিয়া থাকেন।"

বিজাপুর ঃ বাহমনী রাজ্যের পতনের পর উহার ধ্বংসাবশেষের উপর যে কয়টি রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তন্মধ্যে বিজাপুরই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বিজাপুরের প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ আদিল শাহ ছিলেন একজন শাসনপটু নরপতি। হিন্দুদের প্রতি তিনি সহৃদয় ছিলেন। তিনি একজন মারাঠা রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হিন্দুগণকে তিনি উচ্চপদে নিয়োগ করিতেন। ক্ষমতাহীন বাহমনী স্থলতানের শক্তিশালী মন্ত্রী কাসিম বরিদের প্ররোচনায় বিজয়নগরের শালুব নরসিংহ যুদ্ধ ঘোষণা করেন, কিন্তু আদিল শাহের নিকট তিনি পরাজিত হন। ইসমাইল আদিল শাহ (১৫১০-৩৪) বিজয়নগর ও আহম্মদনগর, বিদর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আলী আদিল শাহ (১৫৫৭-৭৯) রাম রাজার সহায়তায় আহম্মদনগর রাজ্য বিধ্বস্ত করেন, পরে তিনি তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডার স্থলতানদের সহিত যোগদান করেন। ২য় ইব্রাহিম আদিল শাহ (১৫৭৯-১৬২৬) একজন দক্ষ ও জনপ্রিয় নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে আহম্মদনগরের স্থলতান পরাজিত ও নিহত হন এবং বিদর রাজ্য বিজাপুরের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৬১৮-১৯)। তাঁহার উত্তরাধিকারী মহম্মদ আদিল শাহের (১৬২৬-৫৭) শাসনকালে বিজাপুর শাহ জাহানের সংস্পর্শে আসে। ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে ঔরঙ্গজেব বিজাপুর জয় করেন।

গোলকুণ্ডা ঃ তেলিঙ্গানায় গোলকুণ্ডা রাজ্যের উদ্ভব হয়। তেলিঙ্গানা পূর্বে হিন্দুরাজ্য বরঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গোলকুণ্ডা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলী কুতুব দীর্ঘকাল দক্ষতার সহিত শাসনকার্য চালাইয়াছিলেন (১৫১২-৪৩)। তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম তালিকোটার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হিন্দু প্রজাদের সম্পর্কে তিনি আপোষমূলক নীতি অনুসরণ করেন। ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরে গোলকুণ্ডা মোগলদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে ঔরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা অধিকার করেন।

আহম্মদনগর ঃ আহম্মদনগরের স্থলতানগণ প্রায়ই বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত থাকিতেন। ১ম বুরহান্ নিজাম শাহ (১৫০৯-৫৩) বিজয়নগরের সদাশিবের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করেন এবং শোলাপুর অধিকার করেন্। পরে তিনি বিজাপুর নগর আক্রমণ করিলে তাহা ব্যর্থ হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী ১ম হোসেন নিজাম শাহ (১৫৫৩-৬৫) আলী আদিল শাহের সঙ্গে যোগদান করিয়া তালিকোটার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ দুর্বল হইয়া পড়িলেন। ১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দে

বেরার আহম্মদনগরের অন্তর্ভুক্ত হইল। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে আহম্মদনগর ধীরে ধীরে মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান : মহম্মদ তুঘলুকের রাজত্বকালে যখন গোলযোগের সূত্রপাত হইতেছিল তখনই বিরাট বিজয়নগর রাজ্য স্থাপিত হয়। সিউয়েল "একটি বিস্মৃত সাম্রাজ্য" (*A Forgotten Empire*) নামক গ্রন্থে বিজয়নগরের উদ্ভব সম্পর্কে কয়েকটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, সঙ্গম নামক এক ব্যক্তির পঞ্চপুত্রের মধ্যে বিশেষ করিয়া হরিহর ও বুক্কের চেষ্টায় তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে বিজয়নগর শহর স্থাপিত হয়। তবে হোয়সলরাজ ৩য় বীর বল্লাল কর্তৃক ১৩৩৬ খ্রীস্টাব্দে তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তর তীরে বিজয়নগর রাজ্যের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ আনেগুন্দি নগরী স্থাপিত হওয়াই অধিকতর সম্ভবপর। হরিহর ও বুক্ক সম্ভবতঃ ছিলেন হোয়সল রাজ্যের উত্তরভাগের প্রত্যন্তরক্ষী; উক্ত পদাধিকারবলেই তাঁহাদিগকে বাহমনী রাজ্য-সংস্থাপকের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল মনে হয়। ৩য় বীর বল্লালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বিরূপাক্ষ বল্লালের মৃত্যুর (১৩৪৬) ফলে এযাবৎ হোয়সল বংশের অধীন এই রাজ্যখণ্ডটি হরিহর ও বুক্কের হস্তগত হইয়া পড়ে। হরিহর সম্ভবতঃ উত্তরে কৃষ্ণা নদী হইতে দক্ষিণে কাবেরী নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করেন; তবে তিনি অথবা বুক্ক কেহই রাজা উপাধি ধারণ করেন নাই। কিংবদন্তী অনুযায়ী হরিহর ও বুক্ক, মহাপণ্ডিত ও ধর্মগুরু মাধব বিদ্যারণ্য এবং তাঁহার ভ্রাতা বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়নের অনুপ্রেরণা ও সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন।

সঙ্গম রাজবংশ : বিজয়নগরের প্রথম রাজবংশ (যাহা সাধারণতঃ সঙ্গম বংশ নামে পরিচিত) ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই বংশের রাজাদের অনুসৃত বৈদেশিক নীতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল বাহমনী রাজ্যের সহিত তাঁহাদের দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ। পূর্বেই এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে। বুক্ক ১৩৭৪ খ্রীস্টাব্দে চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। বুক্কের মৃত্যুর পর রাজপদ লাভ করেন ২য় হরিহর; বিজয়নগরের রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার ক্ষমতা কানাড়া, মহীশূর, ত্রিচিনপল্লী, কাঞ্চী ও চিংলিপুট পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী ১ম দেবরায় (১৪০৬-২২) এবং ২য় দেবরায় (১৪২২-৪৬) বাহমনী সুলতানদের নিকট পরাজিত হন। তবে ২য় দেবরায় শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য তত্ত্বাবধানের জন্য একজন কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন।

শালুব রাজবংশ: পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ২য় দেবরায়ের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার ফলে বিজয়নগর রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দেখা দিলে পর ঘটে প্রতিবেশীর আক্রমণ; বাহমনী সুলতান কৃষ্ণ-তুঙ্গভদ্রা দোয়াব পর্যন্ত অগ্রসর হন, এবং উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম গজপতি পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলি আক্রমণ করেন। এইসব আক্রমণ শক্তিশালী শালুব নায়ক নরসিংহ প্রতিহত করিয়াছিলেন। নরসিংহের পৈতৃক জায়গীর ছিল চন্দ্রগিরিতে (চিত্তুর জেলা)। ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দের দিকে তিনি সঙ্গম বংশের শেষ নৃপতি ২য় বিরূপাক্ষকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন। ইহা 'প্রথম বেদখল' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; রাজ্যের বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য সম্ভবতঃ এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়াছিল। নরসিংহ শালুব ছিলেন একজন দক্ষ ও জনপ্রিয় রাজা। বাহমনী সুলতান এবং উড়িষ্যার রাজা যেসব অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন উহার অধিকাংশই তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত ছয় বৎসরের রাজত্বকালের মধ্যে পুনরুদ্ধার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র পর পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেও, শক্তিশালী সেনাপতি নরস নায়ক রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। ১৫০৫ খ্রীস্টাব্দে নরস নায়কের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বীর নরসিংহ, নরসিংহ শালুবের অপদার্থ পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজেই সিংহাসন অধিকার করেন। ইহা 'দ্বিতীয়বারের বেদখল' বলিয়া পরিচিত।

তুলুব রাজবংশ ও কৃষ্ণদেব রায়: বীর নরসিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশ তুলুব রাজবংশ রূপে পরিচিত। তাঁহার সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-৩০) সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ এবং ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগের অন্যতম বিখ্যাত রাজা। তাঁহার সিংহাসন আরোহণকালে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে রাজ্যের অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছিল। বাহমনী বংশের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী বিজাপুর বিজয়নগরের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিয়া আসিতেছিল। উড়িষ্যার রাজা তখনও দক্ষিণে নেল্লোর পর্যন্ত পূর্ব উপকূল অধিকার করিয়াছিলেন। পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজরা গোয়া অধিকার করিয়াছিল। কৃষ্ণদেব রায় এইসব সমস্যা সম্পর্কে সাফল্যের সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। প্রথমে তিনি মহীশূরে কয়েকজন বিদ্রোহী দলপতিকে দমন

করেন। ১৫১২ খ্রীস্টাব্দে রায়চুর দোয়াব অধিকৃত হইল। গোলকুণ্ডা ও বিদরের স্থলতানগণ উড়িষ্যারাজকে সহায়তা করিলেও কৃষ্ণদেব রায় উড়িষ্যার রাজার বিরুদ্ধে কয়েকবার অভিযান প্রেরণ করিয়া সফল হন। কৃষ্ণদেব রায় বর্তমান ওয়ালটেয়ার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। উড়িষ্যার রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সহিত তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দেন এবং কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যের সীমানা বলিয়া স্বীকার করেন। ১৫২০ খ্রীস্টাব্দে বিজাপুরের স্থলতান রায়চুর দোয়াব পুনরধিকারের চেষ্টা করিলে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। কৃষ্ণদেব রায় বিজাপুর রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া গুলবর্গার দুর্গ ধ্বংস করিয়া ফেলেন। তাঁহার ক্ষমতা পশ্চিম দিকে দক্ষিণ কোঙ্কণ, পূর্বে বিশাখাপত্তন এবং দক্ষিণ ভারতীয় উপদ্বীপের দক্ষিণ-প্রান্ত (কন্যাকুমারিকা) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্ভবতঃ ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপও তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল।

বিজয়নগরের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি বৈদেশিক পর্যটকদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। পাএস-এর (Paes) বিবরণীতে আমরা পাঠ করি, "সর্বাপেক্ষা ভয়ের পাত্র এবং সম্ভবপর সকল রাজকীয় গুণে বিভূষিত নরপতি তিনি···। সময় সময় অকস্মাৎ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিলেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শাসক এবং অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। তাঁহার বিপুল সৈন্যবাহিনী এবং বিস্তৃত রাজ্যের জন্য তিনি যে কোন রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।" গোয়ার পর্তুগীজদের সহিত তিনি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ভাটকলে আলবুকার্ককে একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদেব রায় কেবলমাত্র শক্তিশালী বিজেতা ও দক্ষ শাসকই ছিলেন না, তিনি পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব, কিন্তু তাঁহার অনুস্থত নীতির মধ্যে পরধর্মদ্বেষের চিহ্নমাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। যে উদার ও কল্যাণকামী একনায়কত্ব ভারতের চিরাচরিত রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হইয়াছিল তিনি ছিলেন তাহারই প্রতীক।

তালিকোটার যুদ্ধ : কৃষ্ণদেব রায়ের পর সিংহাসনের অধিকারী হন তাঁহার ভ্রাতা অচ্যুত রায় (১৫৩০-৪২)। তাঁহার দুর্বলতার দরুণ বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়, ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি হ্রাস পায়। তাঁহার মৃত্যুর অত্যল্প-কাল পরেই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব সিংহাসন লাভ করেন, কিন্তু শাসনকর্তৃত্ব প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মন্ত্রী রাম রায়ের করায়ত্ত হইয়া পড়ে। বিজয়নগরের ক্ষমতা ও

প্রতিপত্তি পুনঃস্থাপনের আশায় এই দক্ষ অথচ অকৌশলী মন্ত্রী মুসলমান সুলতানদের আভ্যন্তরীণ কলহে হস্তক্ষেপ করেন। ১৫৪৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিজাপুরের বিরুদ্ধে আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডার সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। ১৫৫৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি আহম্মদনগরের বিরুদ্ধে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহিত যোগদান করিলেন। আহম্মদনগর রাজ্য বিধ্বস্ত হইল, এবং বিজয়নগরের বিজয়ী সেনাবাহিনী 'মসজিদগুলি ধ্বংস করিল, এমন কি পবিত্র কোরাণেরও মর্যাদা রক্ষা করিল না।' ইসলামের এই অবমাননা এবং রাম রায়ের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের ফলে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজা সকলেই (কেবল বেরারের সুলতান বাদে) বিজয়নগরের বিরুদ্ধে মিলিত হন। বিজাপুর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিদরের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনীকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করিল। আহম্মদনগরের সুলতান রাম রায়কে স্বহস্তে বন্দী করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। ফিরিস্তা বলেন, "মুসলমান সৈন্যবাহিনী এত ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন চালাইয়াছিল যে প্রত্যেকটি সৈন্য স্বর্ণ, মণিমাণিক্য, অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব ও ক্রীতদাসে প্রভূত ধনী হইয়া উঠিয়াছিল।" বিজয়নগর সহরটিকে নিষ্ঠুরভাবে বিধ্বস্ত করা হইল। ঐতিহাসিক সিউয়েল বলেন, "অতি আকস্মিকভাবে এতটা ঐশ্বর্যশালী একটি নগরী এইভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে, বিশ্বের ইতিহাসে সম্ভবতঃ এরূপ ঘটনাও আর কখনও ঘটে নাই।"

তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর দুর্বল হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু ইহা দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিনষ্ট করিতে পারে নাই। সুলতানদের সাময়িক মিলন স্থায়ী মৈত্রীবন্ধনে পরিণত হয় নাই। তাঁহাদের পারস্পরিক ঈর্ষা ও বিদ্বেষের ফলে বিজয়নগরের হৃত গৌরব কিছুটা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছিল। "তালিকোটার যুদ্ধ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বিপদ আনিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বিজয়নগরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই।"

আরবিড়ু রাজবংশঃ রাম রায়ের শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা তিরুমল পেনুগোণ্ডায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও মর্যাদা কিছুটা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে তিনি রাজা সদাশিবকে পদচ্যুত করিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি আরবিড়ু বংশীয় ছিলেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী ২য় রঙ্গ ছিলেন একজন যোগ্য

রাজা। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা ২য় ভেঙ্কট (১৫৮৬-১৬১৪) উত্তরাধিকারী হন এবং তিনি চন্দ্রগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। যদিও তিনি ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে মহীশূর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিয়া বিভেদের উৎসাহ দিয়াছিলেন তথাপি তিনি রাজ্যের সংহতি রক্ষায় সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হয় এবং সাম্রাজ্য ধ্বসিয়া পড়ে। এই বংশের উল্লেখযোগ্য শেষ রাজা ৩য় রঙ্গ তাঁহার অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে দমন করিতে এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হন নাই। ৩য় রঙ্গ ১৬৭২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। বিজয়নগরের হিন্দু প্রজা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ যদি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত থাকিতেন তাহা হইলে মুসলমানগণ সুদূর দক্ষিণে তাহাদের ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিত না।

বৈদেশিক পর্যটকগণ : নিকোলো কোন্তি (Nicolo Conti) নামক ইতালীয় পর্যটক ১৪২০ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগর পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বিজয়নগর সহরের বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, "নগরীর পরিধি ছিল ষাট মাইল বিস্তৃত, ইহার প্রাচীর পর্বত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়া উপত্যকার পাদদেশে গিয়া থামিয়াছে।...অস্ত্রধারণে সক্ষম এইরূপ প্রায় নব্বই হাজার লোক এই নগরীতে ছিল।" আবদুর রজ্জাক নামক ইরাণী রাজদূত ১৪৪২-৪৮ সালে বিজয়নগর পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "বিজয়নগর রাজ্যের জনসংখ্যা এত বেশী ছিল যে অল্প পরিসরে ইহার সম্যক ধারণা দেওয়া যায় না। রাজার কোষাগারে স্বর্ণভর্তি বহু প্রকোষ্ঠ ছিল। দেশের উচ্চ অথবা নীচ সকল অধিবাসী, এমনকি বাজারের শিল্পকারগণও তাহাদের কান, গলা, হাত ও আঙ্গুলে মণিমাণিক্য ও স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিত।" নগরীর বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি বলেন, "বিজয়নগরের ন্যায় আর একটি নগরী বিশ্বের অন্য কোন স্থানে আছে বলিয়া দেখা যায় নাই বা শোনা যায় নাই। একটির মধ্যে আর একটি, এইভাবে সাতটি সুরক্ষিত প্রাচীর দ্বারা নগরী পরিবেষ্টিত ছিল।" পর্তুগীজ পর্যটক পাএস সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "বিশ্বের মধ্যে এই নগরী ছিল সর্বাধিক সমৃদ্ধিশালী ; চাউল, গম, শস্য, ভুট্টা, যব, শিম, মুগ, ডাল, অশ্বের খাদ্য এবং অন্যান্য বহুজাতীয় বীজ এই নগরে প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকিত। রাস্তাঘাট ও বাজারে অগণিত ভারবাহী ষাঁড় দেখা যাইত।" এডোয়ার্ডো বারবোসা (Edoardo Barbosa) নামক আর

একজন পর্যটক বলেন যে, বিজয়নগর "বহুদূর বিস্তৃত ও বহু জনসংখ্যা অধ্যুষিত ছিল ; বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবসাবাণিজ্যের ইহা প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল ; দেশীয় হীরক, পেগুর পদ্মরাগ মণি (চুনি), চীন ও আলেকজান্দ্রিয়ার রেশম এবং মালাবারের সিন্দুর, কর্পূর, কস্তুরী, মরিচ ও চন্দনের ব্যবসাবাণিজ্য এখানে হইত।"

বিজয়নগর রাজ্যের পর্যালোচনা: বিভিন্ন দেশের পর্যটকগণ যেসব বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সেচ ব্যবস্থার উৎসাহ প্রদানের ফলে কৃষিকার্যের অবস্থা সমৃদ্ধ ছিল। শ্রমশিল্পের মধ্যে বিশেষভাবে খনির কাজ ও বস্ত্রবয়নের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রমশিল্পের এরূপ উন্নতি হইয়াছিল যে রাজ্যের মধ্যে কারিগর ও বণিকদের বিবিধ শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল। জনগণের অর্থনৈতিক জীবনে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ছিল সমধিক গুরুত্ব। পশ্চিম উপকূলে সর্বপ্রধান বন্দর ছিল কালিকট। ইউরোপ ও দূর প্রাচ্যের সহিত ইহার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। বিজয়নগরের নিজস্ব নৌবহর ছিল এবং জাহাজ নির্মাণের শিল্পবিদ্যা সুবিদিত ছিল।

মধ্যযুগের সকল রাজার ন্যায় বিজয়নগরের রাজাও ছিলেন স্বেচ্ছাচারী শাসক। অসামরিক, সামরিক ও বিচার বিভাগের উপর তাঁহার অবিসংবাদী কর্তৃত্ব ছিল। রাজা নিয়মতন্ত্রের শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হইলেও প্রজাবৃন্দের হিতসাধনের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকিতেন। কৃষ্ণদেব রায় বলিতেন, "সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজার ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা উচিত।" শাসনকার্য পরিচালনায় মন্ত্রিবৃন্দ রাজাকে সহায়তা করিতেন। উচ্চবংশের ব্যক্তিগণকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করা হইত, কখনও কখনও বংশপরম্পরায় মন্ত্রী নিয়োগ হইত। রাজ্যটি কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল, প্রত্যেকটি প্রদেশ এক একজন রাজ-প্রতিনিধির (নায়কের) অধীনে থাকিত। রাজপ্রতিনিধিদের অসীম ক্ষমতা ছিল, কিন্তু রাজারা যতদিন ক্ষমতাশালী থাকিতেন ততদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তাঁহাদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হইত। প্রত্যেক গ্রামের নিজস্ব পরিষদ ছিল এবং প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বয়ংশাসিত এক একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র। রাজার আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব। নূনিজ (Nuniz) বলেন যে, কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের নয় ভাগ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দিতে হইত, তাঁহারা আবার

উহার অর্ধেক দিতেন রাজাকে। গুরু করভার এবং প্রাদেশিক শাসকবৃন্দ ও স্থানীয় কর্মচারীদের উৎপীড়ন ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক দুঃখদুর্দশার সৃষ্টি করিত, কখনও কখনও রাজা দয়াপরবশ হইয়া তাহা লাঘব করিতেন। তবে মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, রাজসভা ও অভিজাত শ্রেণীর জাঁকজমকের তুলনায় জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা ছিল বড়ই মর্মান্তিক।

প্রতিরক্ষা ও আক্রমণের জন্য বিজয়নগরে এক বিরাট বাহিনী পোষণ করিতে হইত। পাএস বলেন যে, কৃষ্ণদেব রায়ের ৭০০,০০০ পদাতিক সৈন্য, ৩২,৬০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৬৫১ রণহস্তী ছিল। এতদ্ব্যতীত শিবিরের অনুযাত্রিক্-দল তো ছিলই। চতুর্দশ শতাব্দীতেও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হইত। সামরিক বিভাগ প্রধান সেনাপতির (দণ্ডনায়কের) পরিচালনাধীন ছিল।

দক্ষিণ ভারতে মুসলমানদের আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া বিজয়নগর রাজ্য এক মহান ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে। বিজয়নগরের রাজারা কেবলমাত্র হিন্দুদের বহুল প্রচলিত ভাষা সংস্কৃতেরই পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই—তেলেগু, তামিল ও কানাড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষারও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যে যাঁহারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন সেই মাধব ও সায়নের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কৃষ্ণদেব রায় সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষায় পুস্তক লিখিয়াছেন; তাঁহার সভায় আটজন তেলেগু কবি ছিলেন। আরবিড়ু বংশের রাজগণও তেলেগু সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। এই বিরাট হিন্দুরাজ্যে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইত না। বারবোসা বলেন, "রাজা জনসাধারণকে এতটা স্বাধীনতা দিয়াছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি—সে খ্রীস্টান, ইহুদী, মুর অথবা হিন্দু যাহাই হউক না কেন—এখানে অবাধে যাতায়াত করিতে এবং কাহারও কোনরূপ সন্দেহ ও বিদ্বেষের দৃষ্টিতে না পড়িয়া তাহার ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী এখানে বসবাস করিতে পারে।" ধর্মের প্রতি রাজাদের নিষ্ঠা ও অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহাদের নির্মিত বিশাল মন্দিরগুলির মধ্যে। পাশ্চাত্ত্যের বিশেষজ্ঞগণ এই মন্দিরগুলিকে হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের নিখুঁত নিদর্শন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিজয়নগর শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও পণ্ডিত ও শিল্পীদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

বিজয়নগরের রাজবংশসমূহের তালিকা
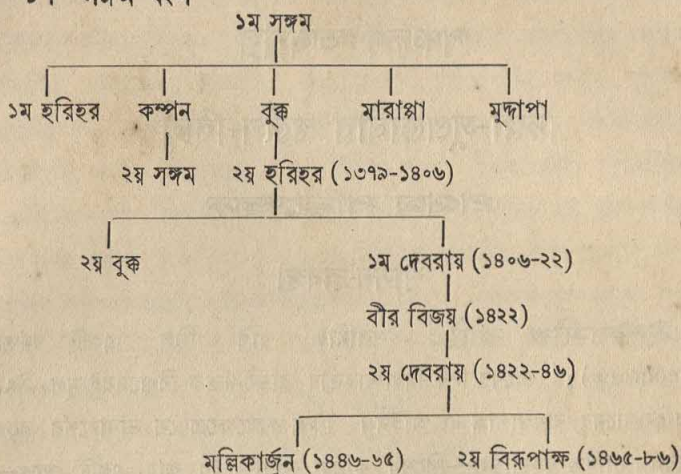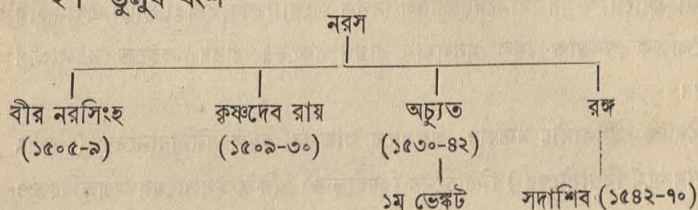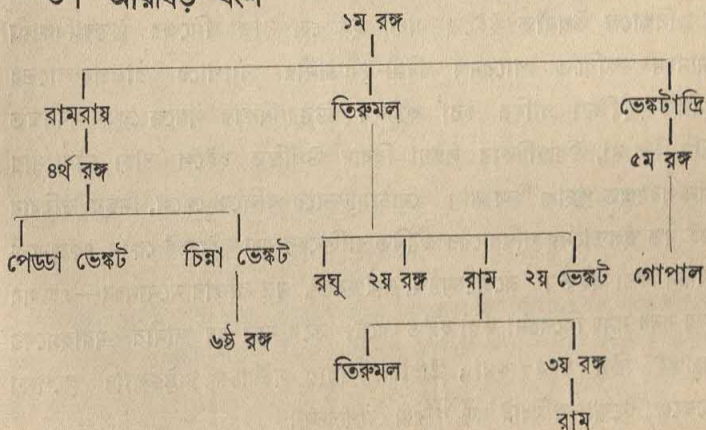
পঞ্চদশ অধ্যায়

দিল্লী-সুলতানীর স্বরূপ-বিচার

প্রথম পরিচ্ছেদ

শাসন-ব্যবস্থা

ইসলামীয় রাষ্ট্র: ইসলামীয় রাষ্ট্র ছিল একটি ধর্মতন্ত্র (theocracy); ভাবের দিক দিয়া যাবতীয় রাজনৈতিক বিধানেরই মূল উৎস ছিল ইসলামের ব্যবস্থাশাস্ত্র বা আইন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে ভাবাদর্শের বহুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল—বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের ন্যায় একটি দেশে—কেননা এখানে অ-মুসলমানদেরই ছিল বিপুল সংখ্যাধিক্য, তাহা ছাড়া এখানকার রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল মুসলমান ব্যবস্থাপকদের ধারণা হইতে বহুলাংশে স্বতন্ত্র।

নৈষ্ঠিক ইসলামীয় মতবাদ অনুসারে রাজপদ হইল নিষ্ঠাবানদের (অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের) নির্বাচনের বিষয়ীভূত। কিন্তু ইসলামের জন্মভূমিতেও দেখা যায় এই মতবাদ কার্যকর হয় নাই; তাই বিখ্যাত ব্যবস্থাপক মওয়ার্দি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হন যে, রাজা নিজের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করিতে পারেন। দিল্লী-সুলতানীর ব্যাপারে রাজপদ-লাভের মূলনীতি খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোন সর্বসম্মত বিধান ছিল না, উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা মীমাংসার কোন সর্বসম্মত পন্থাও ছিল না। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, নিছক সুবিধার জন্যই মৃত সুলতানের পরিবারের জীবিত ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই কোন একজনকে নির্বাচন করা হইত। বয়োজ্যেষ্ঠত্ব, কর্মক্ষমতা, মৃত রাজার মনোনয়ন—এই সব বিষয় সময় সময় বিবেচনা করা হইত বটে; তবে মনে হয় আমীর-ওমরাহগণের সিদ্ধান্তই ছিল চরম কথা; তাঁহারা আবার সচরাচর রাষ্ট্রকল্যাণ অপেক্ষা নিজেদের সুযোগ-সুবিধাই বড় করিয়া দেখিতেন।

ভারতের তুর্কী রাজগণ ও খলিফার সম্বন্ধ : সমগ্র মুসলমান জগৎ খলিফার ধর্মগত ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ—এই মতবাদ ত্রয়োদশ শতকের দিকে একটি অবাস্তব অথচ সুবিধাজনক রাজনৈতিক কল্পনায় পর্যবসিত হইয়াছিল ; ইসলামে আস্থাবানদের অধিকাংশই স্বাধীন মুসলমান নরপতিদের নামে 'খুৎবা'[১] পাঠ করিতে শুরু করিয়াছিলেন। আব্বাসবংশীয় খলিফাদের অধীনে "ইসলাম……বহু বিচ্ছিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেগুলি যে কোন দিক দিয়া খলিফাদের অধীন ছিল তাহা নয়, প্রত্যেকটিরই ছিল নিজ নিজ স্বতন্ত্র ইতিহাস।" ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ মোঙ্গোল বীর হুলাগু বাগদাদ অধিকার করিয়া খলিফার প্রাণনাশ করেন। খলিফা-পদ লোপ পায়। "কিন্তু মিশরে বিরাজ করিতে থাকে তার ছায়া—এক অলীক খলিফা-কুল, নামশেষ ছায়া মাত্র, কায়া নয় ; যেন এক মরীচিকা।" বাগদাদের শেষ খলিফার পিতৃব্য আসিয়া মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করেন ; নীল নদের উপত্যকার মেম্‌লুক সুলতানগণ তাঁহাকে ধর্মাধিপতিরূপে স্বীকার করিয়া লন। তদবধি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ঘটিতে থাকে মিশরীয় খলিফাদের আবির্ভাব। অবশেষে যোড়শ শতকে মিশরের শেষ খলিফা কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌লের ওসমান (অটোমান)-বংশীয় সুলতানের হাতে নিজের যাবতীয় অপ্রাকৃত বা কল্পিত অধিকার সমর্পণ করিয়া দেন।

ঐতিহ্য—বিশেষ করিয়া তাহার সহিত যদি আবার ধর্মের জট পাকাইয়া যায়—সহজে বিলয় প্রাপ্ত হইতে চায় না। বাগদাদের পতনের পর খলিফাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান ঘটে, কিন্তু তাঁহাদের রাজনৈতিক মর্যাদা বিনষ্ট হয় না। ইসলামে বিশ্বাসীদের কাহারও মন হইতে এ কথা মুছিয়া যায় না যে পয়গম্বরের উত্তরাধিকারীর প্রতি আনুগত্য স্বীকারই তাহার ধর্ম। "তিনিই হইলেন যাবতীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎস ; রাজন্যবর্গ এবং বিভিন্ন উপজাতির অধিনায়কগণ তাঁহারই অধস্তন ; একমাত্র তাঁহারই অনুমোদন হইল ইহাদের সকলের ক্ষমতার ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি।" দিল্লীর সুলতানগণের সহিত বাগদাদ ও মিশরের খলিফাদের সম্বন্ধ-বিচারের ইহাই হইতেছে পটভূমি।

---

১ 'খুৎবা' বলিতে বুঝায় প্রতি শুক্রবারে 'জুহ্‌র' (মধ্যাহ্নকালীন) নমাজের সময় প্রদত্ত ধর্মভাষণ। "শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের মতে খুৎবা পাঠের সময় তৎকালীন খলিফার নাম আবৃত্তি করাই বিধিসঙ্গত ; কিন্তু স্বাধীন মুসলমান রাজ্যগুলিতে খলিফার নামের পরিবর্তে যে সুলতান বা আমীরের নাম উচ্চারণ করা হয়, এই ব্যাপারটির মধ্যে তাৎপর্য রহিয়াছে।"

গজনীর স্থলতান মামুদ যখন সামানী বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তখন বাগদাদের আব্বাসবংশীয় খলিফা তাঁহার পদাধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। পয়গম্বরের উত্তরাধিকারীর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি আদায় করিয়া মামুদ নিজে তাঁহার কর্তৃত্ব শুদ্ধ ও সুদৃঢ় করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, কিংবা পতনোন্মুখ আব্বাসবংশীয়দের পক্ষেই সেই সুযোগে জগৎকে একথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত বোধ হইয়াছিল যে খলিফার মর্যাদা অতীতের কল্পকথা মাত্র নয়, তাহা সঠিক বলা যায় না। মহম্মদ ঘূরী দিল্লীতে প্রথমদিকে যে সকল মুদ্রা বাহির করিয়াছিলেন সেগুলি ছিল খলিফার নামাঙ্কিত। দিল্লীর স্থলতানদের মধ্যে ইলতুৎমিসই প্রথম খলিফার নিকট হইতে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লাভ করেন। ১২২৯ খ্রীস্টাব্দে খলিফা আল-মুস্তানসিরের দূতগণ দিল্লীতে আসিয়া তাঁহাকে দিল্লীর স্থলতান বলিয়া স্বীকৃতি দান করেন। বাগদাদের শেষ খলিফা আল-মুস্তাসিমের নাম তাঁহার মৃত্যুর (১২৫৮) পর প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দিল্লীর মুদ্রায় উল্লিখিত হইয়া আসিয়াছে। মিষ্টভাষী সভাকবি আমীর খসরু অবশ্য আলাউদ্দীন এবং কুতব-উদ্দীন মুবারক খলজীকে খলিফা রূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু তৎকালীন লিপিমালা ও মুদ্রাসমূহে এরূপ কোন আভাসই পাওয়া যায় না যে আলাউদ্দীন সে সম্ভ্রম আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার পুত্র প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে তিনিই হইলেন 'ইমাম-শ্রেষ্ঠ, খলিফা'। মহম্মদ তুঘলুক তাঁহার রাজত্বকালের শেষভাগে সাম্রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক বিদ্রোহ ও বিক্ষোভে বিব্রত বোধ করিয়া রাজকীয় কর্তৃত্বের দৃঢ়তা সম্পাদনের অভিপ্রায়ে খলিফার সমর্থন লাভের সেই পুরাতন পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৩৪৩ খ্রীস্টাব্দে মিশরের খলিফা ২য় আল-হকীমের দূতগণ দিল্লীতে আসিয়া উপনীত হন। বরনী স্থলতানের ক্রিয়াকলাপ এইরূপ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন: "তাঁহার মুদ্রাসমূহ হইতে তিনি নিজের নাম ও উপাধি উঠাইয়া দিয়া সেখানে বসাইলেন খলিফার নাম ও উপাধি ; খলিফার উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল চাটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করা যায় না।" ফিরোজ তুঘলুক তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন: "ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি যে মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম গৌরব অর্জন করিয়াছি তাহা হইতেছে এই যে, পূত পয়গম্বরের প্রতিনিধি খলিফার প্রতি আমার আনুগত্য ও সদ্ভাব, মৈত্রী ও বশ্যতার বলে আমার কর্তৃত্ব সমর্থিত হইয়াছে ; কেননা

কেবল তাঁহারই অনুমোদনে রাজন্যবর্গের শক্তি দৃঢ়তা লাভ করে; খলিফার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সেই পূত সিংহাসন হইতে অনুমোদন লাভ না করা পর্যন্ত কোন রাজাই নিরাপদ হইতে পারেন না।" ফিরোজের পরবর্তী কোন সুলতানই 'সেই পূত সিংহাসন হইতে অনুমোদনের' উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, এই ধর্মপ্রাণ নরপতির মৃত্যুর পর মিশর হইতে দৌত্যকার্যের জন্য দিল্লীতে কাহারও শুভ পদার্পণ ঘটে নাই।

ইসলামীয় রাষ্ট্রে হিন্দুদের অবস্থা: ইসলামীয় রাষ্ট্রে অ-মুসলমান প্রজাদের বলিত 'জিম্মী' (অর্থাৎ স্বীকৃতি-প্রদত্ত জনসঙ্ঘ)। মুসলমানগণ কোন অ-মুসলমান দেশ জয় করিলে বিজিত জাতিকে তিনটি পন্থার একটি বাছিয়া লইতে বলা হইত: ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, জিজিয়া কর প্রদান, মৃত্যু বরণ। নিজ ধর্মের প্রতি যাহাদের অনুরাগ থাকিত তাহারা স্বভাবতঃই জিজিয়া কর প্রদান করিয়া বিজেতাদের সঙ্গে আপোষ করিত। জনৈক মুসলমান ব্যবহারবিদ বলিয়াছেন, "যে জিজিয়া কর প্রদান করে এবং মুসলমান রাষ্ট্রের নির্দেশ মানিয়া চলে তাহাকেই বলে জিম্মী।" সাধু-সন্ন্যাসী, বিত্তহীন অথবা ক্রীতদাসের উপর জিজিয়া কর ধার্য করার নিয়ম ছিল না। জিজিয়া কর প্রদান ছিল এক অবমাননাকর ও হীনতাজনক ব্যাপার। কয়েক শতাব্দী যাবৎ ব্রাহ্মণগণ জিজিয়া কর প্রদানের দায় হইতে মুক্ত ছিলেন, ফিরোজ তুঘলুক তাঁহাদেরও রেয়াৎ করিলেন না।

ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বহু মৌলবী-মৌলানা হিন্দুদের মুটেমজুরের পর্যায়ে পরিণত করিয়া তুলিতে চাহিতেন। কাজী মুঘিস-উদ্দীনের মতামত পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্রের জনৈক মিশরীয় ব্যাখ্যাকার ভারত ভ্রমণের সময় আলাউদ্দীন খলজীকে লিখিয়াছিলেন: "আমি শুনিতে পাইলাম ...আপনি হিন্দুদের এমনই দুর্দশায় আনিয়া ফেলিয়াছেন যে তাহাদের পত্নীপুত্রেরা মুসলমানদের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া খায়। এইরূপ কাজের ফলে আপনি ধর্মের যথেষ্ট সেবা করিতেছেন। আপনার এই একমাত্র পুণ্যকার্যের জন্য আপনার সকল পাপেরই মার্জনা হইবে···।"

তবে এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে যে এই অনমনীয় মনোভাব ব্যবহার-শাস্ত্র এবং শাসন-নীতির সর্বত্রই প্রতিফলিত হইয়াছে। আলাউদ্দীন খলজী হিন্দুদের আর্থিক দুর্গতি ঘটাইয়াছিলেন; ফিরোজ তুঘলুক ও সিকান্দর লোদী

তাহাদের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু তাই বলিয়া কোন সময়ই হিন্দুদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য কোনরূপ নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা অনুসারে অত্যাচার অথবা নিয়মিত প্রচেষ্টা হয় নাই। স্থলতানদের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ আনিতে হইলে বলিতে হয় যে তাঁহারা কখনও রাজকার্য পরিচালনায় হিন্দুদের সহযোগিতা লাভের কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই।

রাজতন্ত্র ঃ ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্র ও ব্যবহারবিধি অনুসারে সার্বভৌমত্ব হইতেছে ব্যবস্থাশাস্ত্র বা আইনের (শর্) মধ্যে অন্তর্নিহিত, এই ব্যবস্থাশাস্ত্রের মূল হইল কোরান। রাজা হইলেন সেই আইনের অবিসংবাদী ব্যাখ্যাতা। মুসলমান নরপতিদের নিরঙ্কুশ শক্তি খানিকটা সংযত থাকিবার একটি কারণ ছিল এই যে তাঁহারা নির্বিরোধে এই আইন ভঙ্গ করিতে পারিতেন না। দিল্লীর স্থলতানদের মধ্যে আলাউদ্দীন খলজী এবং মহম্মদ তুঘলুক এই আইন এবং উহার সনাতন ব্যাখ্যাতা স্থন্নী ধর্মশাস্ত্রবিদ্দের কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টায় আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

আমীর-ওমরাহ্দের পদমর্যাদাগত অধিকার ছিল রাজকীয় শক্তির নিরঙ্কুশ প্রয়োগের পথে আর-একটি বাধা। "ইলতুৎমিস-পরিবারের ইতিহাসে গঠনতন্ত্রগত কৌতূহলের প্রধান বিষয় হইল প্রকৃত কর্তৃত্ব লাভের জন্য রাজা এবং অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে সংঘাত।" নাসির-উদ্দীন মামুদের রাজত্বকালের ইতিহাসে দেখিতে পাই অভিজাতশ্রেণীরই জয়জয়কার। আবার স্থলতান-পদ লাভের পর বলবন অভিজাতশ্রেণীকে স্ববশে আনয়ন করিয়া রাজশক্তি ও রাজমহিমার ধ্বজা উত্তোলন করেন। এই যে নূতন ধারার সৃষ্টি হয় তাহা মহম্মদ তুঘলুকের আমল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। মহম্মদ তুঘলুক প্রজাদের স্থলতানের মহিমা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তাঁহার মুদ্রাসমূহে এই বাণী উৎকীর্ণ করাইয়া দিতেন যে "স্থলতান হইলেন আল্লাহ্-তা'আলার ছায়াস্বরূপ"। ফিরোজ তুঘলুকের শিথিল শাসনে শুরু হয় ইহার প্রতিক্রিয়া ; শরীয়তের প্রতি সাড়ম্বরে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শনের দ্বারা তিনি মৌলবী-মৌলানা শ্রেণীর লোকদের সন্তুষ্টিবিধান করেন, আবার সামরিক শ্রেণীর লোকদেরও নির্বিবাদে তাহাদের স্থযোগ-স্থবিধা উপভোগের পথ খুলিয়া রাখেন। লোদী স্থলতানদের আমলে আমীর-ওমরাহ্গণ স্বয়ং স্থলতানের সমান পদমর্যাদা দাবী করিতে থাকেন। উদ্ধতস্বভাব ইব্রাহিম সে দাবীর বিরুদ্ধতা করিয়া প্রাণ হারান।

দিল্লীর সুলতানদের পরিচালন, সহায়তা অথবা সংযত করার মতো কোনরূপ সর্বসম্মত গঠনতান্ত্রিক ব্যবহার-বিধি বা আইনের বিধান ছিল না। সব কিছুই নির্ভর করিত রাজার ব্যক্তিত্বের উপর। কোনরূপ নিয়মিত মন্ত্রিসভা ছিল না, আধুনিক অর্থে মন্ত্রিসভা তো নয়ই। রাজকার্য পরিচালনায় সহায়তা-লাভের জন্য সুলতান আপন অভিরুচি অনুযায়ীই মন্ত্রী ও কর্মচারীদের নিয়োগ করিতেন। সুলতান বলশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইলে ইঁহারা সকলে "সামান্য কর্মসচিবের ন্যায় খুঁটিনাটি ব্যাপারে রাজকীয় অভিরুচি পালন করিয়া চলিতেন; কিন্তু কেবলমাত্র বিনীত অনুরোধ এবং প্রচ্ছন্নভাবে সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করা ছাড়া আর কোনও উপায়েই ইঁহারা প্রভু কর্তৃক অনুসৃত পন্থা পরিবর্তনের জন্য কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন না।" পক্ষান্তরে সুলতান দুর্বলচেতা হইলে ইঁহারা তাঁহাকে হস্তপুত্তলিকা করিয়া রাখিতেন।

উচ্চপদস্থ মন্ত্রী ও কর্মচারী: সুলতানী তন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর পদবী ছিল 'ওয়াজীর' (উজীর); তাঁহার উপর যে বিভাগের ভার অর্পণ করা হইত তাহাকে বলিত 'দিওয়ান-ই-ওয়াজারৎ'। এই বিভাগের প্রধান কাজ ছিল রাজ্যের আয়ব্যয়-সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা করা। 'দিওয়ান-ই-রসলৎ' (ইহার কাজ ছিল ধর্মসংক্রান্ত বিষয় ও দানখয়রাতের ব্যবস্থা করা) এবং 'দিওয়ান-ই-কাজা' (বিচার-বিভাগ) ছিল 'সদর্-উস-সুদুর'-এর পরিচালনাধীন। 'আরিজ-ই-মামালিক' (সামরিক বিভাগের নিয়ামক) পদ পরিচালনা করিতেন 'দবীর-ই-আর্জ্'। 'দিওয়ান-ই-ইন্শা' (ইহার উপর ন্যস্ত ছিল রাজকীয় পত্রাদি বিলিব্যবস্থার ভার) পরিচালিত হইত 'দবীর-ই-খাস' নামক কর্মচারীর দ্বারা। রাজকীয় গৃহকার্য নির্বাহের ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত ছিল তাঁহাদের মধ্যে 'ভকীল-ই-দার' (ইনি ছিলেন এই বিভাগের নিয়ামক) এবং 'আমীর-ই-হাজিব' বা 'বারবেক' (প্রধান গৃহকর্মকর্তা)—এই দুইজনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আয়-ব্যয়: রাজ্যের আয়ের পথ ছিল প্রধানতঃ এই কয়টি: (১) ভূমি-রাজস্ব, (২) 'জাকাৎ' অর্থাৎ ধর্মকার্য-নির্বাহের জন্য রাজকর, (৩) 'জিজিয়া', (৪) যুদ্ধবিগ্রহে লুণ্ঠিত সম্পদ, (৫) খনি ও সঞ্চিত অর্থভাণ্ডার, (৬) উত্তরাধিকারী-বিহীন সম্পত্তি। ভূমি-রাজস্বের মধ্যে প্রধান ছিল 'খারজ'। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দীন খলজী এবং গিয়াস-উদ্দীন তুঘলুক ভূমি-রাজস্ব সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ আলাউদ্দীনই জমি পরিমাপের বিধি প্রবর্তন

করিয়াছিলেন ; উহার ফলে রাজ্য ও কৃষকের মধ্যে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত বণ্টন-ব্যবস্থা হয়। আলাউদ্দীনের আমলে কৃষকদের উৎপন্ন ফসলে রাজকর দিতে উৎসাহ দান করা হইত, তবে মনে হয় নগদ টাকা লইতেও বাধা ছিল না। ত্রয়োদশ শতকে রাজ্যের দাবী সম্ভবতঃ ছিল উৎপন্ন শস্যের এক-পঞ্চমাংশ। আলাউদ্দীন তাহা বাড়াইয়া উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক করিয়া দেন। তাঁহার পুত্রের আমলে এই মারাত্মক হার কমাইয়া দেওয়া হয়। গিয়াস-উদ্দীন তুঘলুক নির্দেশ দেন রাজ্যের দাবী যেন শতকরা দশভাগের বেশি বৃদ্ধি করা না হয়।

বিচার ঃ 'সদর-উস-সুদূর' ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতি ('কাজী-ই-মামালিক')। তিনি নিম্নতন আদালতসমূহ হইতে আবেদন শ্রবণ এবং স্থানীয় 'কাজী'দের নিয়োগ করিতেন। সমস্ত বড় বড় শহরেই—দিল্লীতেও—বিচারকার্য নির্বাহের জন্য থাকিতেন একজন করিয়া 'কাজী'। কাজীরা যে সকল সকল দণ্ডাদেশ প্রদান করিতেন তাহা নির্বাহের জন্য থাকিতেন 'আমীর-ই-দাদ' নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কেবল হিন্দুদের মধ্যেই যে সব মামলা হইত সে সব মামলার বিচার সচরাচর পঞ্চায়েৎরাই করিতেন। মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে মামলা হইলে তাহার বিচার করিতেন কাজীরা। শহরে শহরে আরক্ষা-বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা রূপে থাকিতেন এক-একজন 'কোতোয়াল', তবে শাসক (ম্যাজিস্ট্রেট) রূপে অপরাধীকে কারাগারে প্রেরণের ভারও কোতোয়ালের উপরই থাকিত। ফৌজদারী দণ্ডবিধি ছিল নিরতিশয় কঠোর ; যন্ত্রণা প্রদান ও অঙ্গচ্ছেদ ছিল চল্‌তি ব্যাপার। ফিরোজ তুঘলুক কতকগুলি বিশেষ অমানুষিক শাস্তি তুলিয়া দিয়াছিলেন।

প্রাদেশিক শাসন ঃ শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বৃহৎ সাম্রাজ্য মাত্রই নানা প্রদেশে বিভক্ত থাকে। মহম্মদ তুঘলুকের অধীনে ২৩টি প্রদেশের কথা আমরা জানিতে পারি : (১) দিল্লী, (২) দেবগিরি, (৩) মূলতান, (৪) কুহ্‌রম, (৫) সামানা, (৬) সেওয়ান, (৭) উচ, (৮) হান্সী, (৯) সির্সুতি, (১০) মা'বার, (১১) তেলাঙ্গ, (১২) গুজরাট, (১৩) বদাউন, (১৪) অযোধ্যা, (১৫) কনৌজ, (১৬) লক্ষ্মণাবতী, (১৭) বিহার, (১৮) কারা, (১৯) মালব, (২০) লাহোর, (২১) কালানোর, (২২) যাজনগর, (২৩) দোরসমুদ্র। স্পষ্টতঃই কতকগুলি প্রদেশ জেলার চেয়ে বড় ছিল না, আবার লক্ষ্মণাবতীর মতো কোন-কোনটি ছিল অতি বৃহৎ এবং তাহাদের সুশাসন ছিল প্রায় অসম্ভব।

পারসিক তথ্যপঞ্জীসমূহে প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে সচরাচর 'ওয়ালি' বা 'মুকতি' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এ দু'টি নাম একার্থবাচক কিনা তাহা বলা কঠিন। আধুনিক একটি মত এই যে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরই 'ওয়ালি' নামে অভিহিত করা হইত। সম্ভবতঃ এক-একটি বড় বড় প্রদেশ কয়েকটি 'শিক্'-এ বিভক্ত থাকিত, এবং প্রত্যেকটি 'শিক্' থাকিত 'শিক্দার' নামে এক-একজন কর্মচারীর অধীন। ইহার ঠিক নিম্নতর বিভাগ ছিল 'পরগণা', অর্থাৎ কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি। পরগণায় পরগণায় এবং গ্রামগুলিতেও হিন্দু নায়কগণ এবং নিম্নপদস্থ হিন্দু কর্মচারীরা সম্ভবতঃ যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রভাবের অধিকারী ছিলেন; কিন্তু প্রাদেশিক রাজধানীতে মুসলমানদেরই ছিল ক্ষমতা ও পদমর্যাদার একচেটিয়া অধিকার। সুলতানী আমলে কোন হিন্দুই কখনও প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন নাই।

মোটের উপর সরাসরি ভাবে সুলতানের কর্তৃত্বাধীন এই সব প্রদেশ ছাড়া হিন্দু রাজাদের অধীন নানা সামন্ত রাজ্যও ছিল; কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি এই সকল রাজ্যের আনুগত্য সাধারণতঃ একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের অধিক আর-কিছুই ছিল না।

সৈন্যবাহিনী: সে যুগে স্থিতিশীল শাসনতন্ত্র রক্ষা করিতে হইলে সর্বাগ্রে যাহার প্রয়োজন হইত তাহা হইল এক বিপুল এবং কর্মক্ষম সৈন্যবাহিনী। সৈন্যবাহিনীর মেরুদণ্ড ছিল অশ্বারোহী সৈন্যের দল। সুতরাং অশ্বের চাহিদাও ছিল প্রচুর। হিন্দুদের দেখাদেখি হস্তীরও আদর খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। পদাতিক সৈন্যদের বলিত পাইক; তাহাদের স্থান ছিল নীচে। এক ধরণের গাদা-বন্দুকের বেশ চল ছিল। 'আরিজ-ই-মামালিক' সৈন্যবাহিনী প্রতিপালনের যাবতীয় কাজকর্মের জন্য দায়ী থাকিতেন। তাঁহার অধিকার বা কর্মবিভাগে প্রত্যেকটি সৈনিকের নামধাম প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের বর্ণনাত্মক তালিকা (হুলিয়া) রাখিতে হইত। সৈন্যেরা যাহাতে ভাল ঘোড়া বদলাইয়া খারাপ ঘোড়া রাখিতে না পারে সেজন্য আলাউদ্দীন খলজী প্রত্যেকটি ঘোড়ার গায়ে দাগ দিবার ব্যবস্থা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পোষিত নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ছাড়াও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অধীনে থাকিত প্রাদেশিক সৈন্যদল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাহিত্য ও শিল্পকলা ঃ ধর্মান্দোলন

শিল্পকলা সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান ভাবধারার মিলন ঃ স্যর জন মার্শাল বলেন, সুলতানী আমলের স্থাপত্যশিল্প হিন্দু ও মুসলমান প্রতিভার মিলনের ফলে উদ্ভব লাভ করিয়াছিল। সে স্থাপত্যশিল্পের কতখানি ভারতবর্ষের দান এবং কতখানি ইসলাম হইতে সঞ্জাত তাহা নির্ণয় করা এক দুরূহ ব্যাপার। এই অসুবিধার একটা কারণ হইল এই যে "মুসলমানেরা যেখানেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করে—তা' সে এশিয়া, আফ্রিকা অথবা ইউরোপ যেখানেই হউক না কেন—সেখানেই তাহারা স্থানীয় স্থাপত্যশিল্পের সঙ্গে নিজেদের প্রয়োজনের সঙ্গতি সাধন করিয়া লইয়াছে।" ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বে সারাসেনীয় স্থাপত্যশিল্প এইভাবেই একটি বহুবিচিত্র বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল, এখানে আসিয়া তাহা অভিনব উপাদানরাশি আত্মসাৎ করিয়া অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করে। হিন্দুদের নিকট হইতে গৃহীত এই সকল উপাদানের মধ্যে শক্তিমত্তা ও চারুতাকে মার্শাল সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দান করিয়াছেন।

দিল্লীতে অনুসৃত পদ্ধতি ঃ হিন্দু-সারাসেনীয় পদ্ধতির স্থাপত্য শিল্প স্বভাবতঃই পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য লইয়া বিকাশ লাভ করে ভারতবর্ষে মুসলমান শক্তি ও সভ্যতার কেন্দ্র দিল্লী নগরীতে। দিল্লী-জয়ের স্মারকচিহ্নস্বরূপ ১১৯৩ খ্রীস্টাব্দে কুতব-উদ্দীন আইবক যে কুয়াৎ-উল-ইসলাম মসজিদ নির্মাণ করেন তাহার প্রারম্ভিক পরিকল্পনা ও রূপায়ণ ছিল মূলতঃ হিন্দু স্থাপত্যশিল্পেরই একটি নিদর্শন, কিন্তু পরবর্তী কালে তাহাতে কয়েকটি বিশিষ্ট ইসলামী উপাদান যোগ করিয়া দেওয়া হয়। ইলতুৎমিস ও আলাউদ্দীন উহার আয়তনের প্রসার করেন। কুতব-মিনারের নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন কুতব-উদ্দীন, সমাপ্ত করেন ইলতুৎমিস। 'বিশ্বাসীদের' (মুসলমানদের) নমাজে যোগদানের জন্য মু'আজ্জিন এই স্তম্ভশীর্ষ হইতে আবাহন করিতে পারিবেন—ইহাই ছিল কুতব-মিনার নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু অচিরেই উহা লোকচক্ষে হইয়া দাঁড়ায় একটি বিজয়স্তম্ভ। ফার্গুসন এটিকে সমগ্র জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা

নিখুঁত স্তম্ভরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মার্শাল বলেন, "এই কঠোরদর্শন সুবিশাল সৌধ অপেক্ষা মুসলমান শক্তির অধিকতর মর্মগ্রাহী অথবা অধিকতর যথাযথ প্রতীক যে আর কিছুই হইতে পারে না তাহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই।" এটি অবশ্য ছিল সম্পূর্ণরূপেই মুসলমান স্থাপত্য শিল্পের একটি নিদর্শন ; এই ধরণের স্তম্ভ হিন্দুদের অপরিজ্ঞাত ছিল। কুতব-উদ্দীনই নির্মাণ করেন আজমীরের সুবিখ্যাত মসজিদ আড়াই-দিন-কা-ঝোঁপরা, পরে ইলতুৎমিস উহাতে একটি গবাক্ষজাল সংযুক্ত করিয়া উহার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন।

ইলতুৎমিসের মৃত্যু ও আলাউদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণের মধ্যে দিল্লীতে কোন বিখ্যাত সৌধ নির্মিত হয় নাই। ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে হিন্দু-প্রভাবের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, আলাউদ্দীনের আমলে তাহা চরমে আসিয়া পৌঁছে। নিজামউদ্দীন আউলিয়ার কবরের উপর আলাউদ্দীন যে মসজিদ নির্মাণ করেন তাহা "সম্পূর্ণরূপে মুসলমান ভাবধারা অনুযায়ী নির্মিত ভারতের সর্বপ্রথম মসজিদ"-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আলাউদ্দীনের আমলে নির্মিত আর-একটি চিত্তাকর্ষক সৌধ হইতেছে আলাই দরওয়াজা— 'ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের মণিমাণিক্যের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ'। আলা-উদ্দীনের অপর দু'টি কীর্তি সিরি নগরী নির্মাণ এবং হাউজ-ই-খাস সরোবর খনন। সিরির ধ্বংসাবশেষ হইতে আমরা সে যুগের সামরিক স্থাপত্য সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আভাস লাভ করিতে পারি।

খলজী আমলের স্থাপত্য শিল্পের বিশেষত্ব হইল অলঙ্করণের প্রভূত প্রয়োগ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ের অজস্রতা ; তুঘলুক আমলের সৌধাবলী 'শুচিশুদ্ধ শান্তরসে' মনোরম। এই ভাবটিই ক্রমশঃ 'কঠোর শুচিতাগ্রস্ত সারল্যে' পর্যবসিত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের মূলে খানিকটা আর্থিক কারণ ছিল বটে, তবে মহম্মদ তুঘলুক ও ফিরোজ শাহের নৈষ্ঠিক ধর্মভাবও যে ইহার উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে নাই এমন নয়। গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক তুঘলুকাবাদ শহর নির্মাণ করেন। উহার ধ্বংসাবশেষ এখন দর্শকের চিত্তে 'সঞ্চার করে অটল শক্তি এবং বিষণ্ন মহিমার ভাব।' এই নগর-প্রাকারের তলদেশে সুলতান নিজের জন্য যে সমাধিভবন নির্মাণ করিয়া যান তাহা সারল্য ও শক্তিতে অপরূপ। মহম্মদ তুঘলুক নির্মাণ করেন আদিলাবাদের দুর্গ এবং জাহানপনাহ্ নগর। ফিরোজ শাহ্‌ও ছিলেন একজন খ্যাতিমান

সৌধনির্মাতা। দিল্লীতে তিনি নির্মাণ করেন ফিরোজাবাদ নামে এক দুর্গাবাস।

সৈয়দ এবং লোদী সুলতানদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধ নির্মাণের উপযুক্ত অর্থবল ছিল না। এই আমলের স্থাপত্য শিল্পের সর্বোত্তম নিদর্শনসমূহ হইতেছে রাজারাজড়া আর আমীর-ওমরাহ্‌দের বিবিধ সমাধিভবন। ততদিনে তুঘলুক আমলের প্রতিক্রিয়ায় সমাপ্তির ছেদ পড়িয়াছিল; লোদী আমলের স্থাপত্যশিল্পে 'হিন্দু প্রতিভার ইন্দ্রজাল-স্পর্শে' ঘটিয়াছিল 'প্রাণের ও ভাবের' সঞ্চার। এই ধারারই অনুবৃত্তি দেখিতে পাই মোগল যুগে: লোদী সুলতানদের স্থাপত্য শিল্প মোগলদের স্থাপত্য শিল্পের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

বিবিধ প্রাদেশিক রীতি: বহু প্রাদেশিক নরপতিও শিল্প-কলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; কোন কোন প্রদেশে বিশিষ্ট শিল্পরীতিরও উদ্ভব ঘটে। বঙ্গদেশে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষ এখনও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। সিকান্দর শাহ্‌ কর্তৃক নির্মিত পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদীনা মসজিদ ছিল ইসলামী জাহানের অন্যতম বৃহত্তম মসজিদ। গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা 'ইষ্টক ও রক্তাক্ত মৃত্তিকা দিয়া কতখানি অসম্ভব সাধন করা যাইতে পারে তাহার এক অপূর্ব নিদর্শন।' তবুও মোটের উপর দেখিতে গেলে বঙ্গদেশীয় রীতি গুজরাটের রীতির তুলনায় অপকৃষ্ট। সেই পশ্চিমাঞ্চলিক প্রদেশে মামুদ বেগারাহের আমলে স্থাপত্য শিল্প উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। আহ্‌মদাবাদে আহ্‌মদ শাহের জামি মসজিদ এবং চম্পানীরে মামুদ বেগারাহের বিশাল মসজিদ ছিল ইসলামী জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌধাবলীর পর্যায়ভুক্ত। তখনও যে হিন্দু ঐতিহ্য সঞ্জীবিত ছিল, গুজরাটী রীতির উপর তাহারই ছিল অসাধারণ প্রভাব; কিন্তু মালবে মুসলমান-প্রভাবই ছিল সর্বপ্রধান। মার্শালের মতে, "ভারতবর্ষের দুর্গরক্ষিত নগরসমূহের মধ্যে মাণ্ডু হইল সর্বাপেক্ষা মহিমান্বিত।" দিল্লী ও মাণ্ডুতে অনুসৃত রীতির মধ্যে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে। বিশাল জামি মসজিদ এবং হিন্দোলা মহল নামে পরিচিত প্রকাণ্ড দরবার-গৃহ 'মহৎ ভাবের দ্যোতনায়' দিল্লীর সৌধাবলীর মধ্যেও অতুলনীয়। উত্তর-ভারতে স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ-সাধনের আর একটি কেন্দ্র ছিল জৌনপুর। জৌনপুরী রীতির সর্বাপেক্ষা সুচারু নিদর্শন হইল অতাল মসজিদ; ১৪০৮ খ্রীস্টাব্দে ইব্রাহিম শাহ্‌ শর্কী ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন।

দাক্ষিণাত্যে মুসলমান শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য প্রভূত চেষ্টা হয়; "ভারতবর্ষের আর কোথাও দেশীয় শিল্পরীতির আত্মীকরণ দাক্ষিণাত্যের ন্যায় মন্থরগতিতে প্রবাহিত হয় নাই।" বাহ্মনী সুলতানদের সামরিক স্থাপত্যে ইউরোপীয় ও পারসিক প্রভাব খুঁজিয়া বাহির করা খুবই সহজ কাজ। দৌলতাবাদে মহম্মদ তুঘলুকের রাজধানী হইতেছে 'মধ্যযুগের জগতে পরিরক্ষণ-ব্যবস্থার সর্বোত্তম নিদর্শনের মধ্যে একটি।' বাহ্মনী সুলতানদের নির্মিত বিবিধ মসজিদ ও সমাধিভবন গুলবর্গা ও বিদরে ইতস্ততঃ সর্বত্রই সমাকীর্ণ হইয়া আছে।

হিন্দু স্থাপত্য শিল্পঃ একদিকে যখন মুসলমানগণ ভারতময় বিরাট বিপুল সৌধাবলী নির্মাণ করিয়া চলিতেছিল, আর একদিকে তখন স্বাধীন হিন্দু রাজারা তাঁহাদের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বিরত হন নাই। উত্তর ভারতে এই যুগের হিন্দু স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ দেখিতে পাওয়া যায় রাজপুতানায়। মেবারের রাণা কুম্ভ চিতোরে এক প্রকাণ্ড বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। বিজয়নগরের ক্ষমতাশালী রাজারা শিল্পকলার বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারা নির্মাণ করেন বিবিধ সভাগৃহ, সরকারী কর্মশালা, রাজপ্রাসাদ, মন্দির এবং জলপ্রণালী; এগুলির নির্মাণকৌশল বিদেশী পর্যটকদের চিত্তে বিমুগ্ধ বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিল। কৃষ্ণ দেব রায় যে সুবিখ্যাত বিঠলা মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন ফার্গুসন তাহাকে 'এই শ্রেণীর সৌধাবলীর মধ্যে দক্ষিণ-ভারতের সর্বাপেক্ষা মনোহর সৌধ'-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

সাহিত্যঃ পারসিক কাব্যঃ জনৈক প্রথিতযশা ইউরোপীয় সমালোচক বলেন, "ভারতবর্ষে রচিত পারসিক সাহিত্যে সত্যকার পারসিক রসের সন্ধান বড়-একটা পাওয়া যায় না····· ·তাহা হইল একমাত্র পারস্যদেশে রচিত সাহিত্যেরই সম্পদ।" তবে এ কথা বলিলে বোধহয় ভুল হইবে না যে মুসলমান যুগে যে বিপুলসংখ্যক পারসিক কবি ভারতবর্ষে বসিয়া কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ জনকয়েকের হাত দিয়া প্রকৃত সৌন্দর্য-মণ্ডিত কাব্যই বাহির হইয়াছে এবং সাধারণ ভাবে তাহা পারসিক সাহিত্যের উপর গভীর রেখাপাত না করিয়াও পারে নাই। ইঁহাদের মধ্যে আমীর খসরু ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

সম্ভবতঃ ১২৫৩ খ্রীস্টাব্দে আমীর খসরুর জন্ম হইয়াছিল। সভাসদ ও কবি হিসাবে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব ঘটে বলবনের রাজত্বকালে। তাঁহার প্রথম-জীবনের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে বলবনের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ খাঁ ছিলেন অন্যতম। পরিশেষে জালালউদ্দীন খলজীর সিংহাসনে আরোহণকালে তিনি সভাকবি রূপে স্বীকৃত হন। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালেও এ সম্মান অব্যাহত রাখিতে তিনি কৃতকার্য হন। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের বিশ বৎসর আমীর খসরুর সাহিত্যিক জীবনে ছিল সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সময়, সুতরাং ভারতে পারসিক সাহিত্যের ইতিহাসেও একটি প্রধান যুগ। আমীর খসরু নিজাম-উদ্দীন আউলিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল অবধি তিনি রাজকীয় প্রসাদ উপভোগ করিয়া যান।

কিংবদন্তী আছে আমীর খসরু নিরানব্বইখানা গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। বাস্তবিকই তিনি এতগুলি গ্রন্থ রচনা করুন আর না-ই করুন, এ' কথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে তাঁহার কতকগুলি গ্রন্থ হারাইয়া গিয়াছে, কিংবা অন্ততঃ এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ হইতে, সেগুলির কাব্যরস ছাড়াও, আমরা ঐতিহাসিক তথ্য চয়ন করিতে পারি। তাঁহার একখানি গদ্যগ্রন্থে আলাউদ্দীনের আমলের যুদ্ধবিগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে। আর-একখানি গ্রন্থে তিনি ভারতবর্ষের তৎকালীন সাংস্কৃতিক, ধর্মগত, এবং সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি এ কথা স্পষ্ট করিয়াই দেখাইয়াছেন যে তাঁহার সময় বিজিত হিন্দুদের মধ্যে জ্ঞানানুশীলনের ধারা প্রবল বেগেই বহিয়া চলিতেছিল। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমীর খসরু হিন্দুদের এই মৌলিক ভাবটি বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে হিন্দুরা যে সব মূর্তি ও অন্যান্য বস্তুর পূজা করিয়া থাকে সে সব কেবল বিশ্ববিধাতার শক্তি ও মহিমার প্রতীক মাত্র। নৈষ্ঠিক মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ইহা কতই না স্বতন্ত্র! ইহা হইতে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে বিজেতা জাতির মধ্যে ধীশক্তিতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁহারা তখন সবেমাত্র তাঁহাদের এই নববাসভূমির অপরিচিত অধিবাসীদের বুঝিতে শুরু করিয়াছিলেন এবং আকবরের আমলে বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে সহনশীলতা ও সদ্ভাব, সহযোগিতা ও সহানুভূতির যে ঐক্য-বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই যুগে ধীরে ধীরে তাহারই সূত্রপাত ঘটিতেছিল।

মীর হাসান দেহ্‌লভী নামে ভারতের আর-একজন খ্যাতনামা পারসিক

কবি ছিলেন আমীর খসরুর সমসাময়িক ব্যক্তি। মহম্মদ তুঘলুকের রাজত্ব-কালে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার রচনাবলী 'গীতিমধুর ও পরম হৃদয়গ্রাহী' রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সাহিত্যঃ পারসিক ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক তথ্যপঞ্জীঃ এই সময় পারসিক ভাষায় কতকগুলি মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যপঞ্জী রচিত হয়। তন্মধ্যে সুলতানী আমলের ইতিহাস রচনায় আধুনিক ঐতিহাসিকগণ যে-সকল প্রামাণ্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন সেগুলি হইতেছে মিন্‌হাজ-উদ্দীনের 'তবকাৎ-ই-নাসিরী', বরনীর 'তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী', শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফের 'তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী' এবং ইয়াহীয়া বিন আহমদের 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'।

উর্দু ভাষার উদ্ভবঃ "যে সকল প্রয়োজনে মুসলমান ও হিন্দুদের পরস্পরের সাহচর্যে আসিতে হইত তাহারই মধ্যে এক সাধারণ ভাষার অভিব্যক্তি লাভের বীজ অন্তর্নিহিত ছিল।" এই সাধারণ ভাষারই নাম হইয়া দাঁড়ায় উর্দু। "উর্দু মূলতঃ ছিল দিল্লী ও মীরাট অঞ্চলে বহু শতাব্দী যাবৎ কথিত পশ্চিমা হিন্দীর এক প্রাদেশিক রূপ মাত্র; ইহা সরাসরি সৌরসেনী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত।" এই মৌলিক হিন্দু ভাষাটি মুসলমানদের আগমনের পর ক্রমশঃ পারসিক প্রভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, ফলে তাহাতে বিবিধ অভিনব বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে আমীর খসরুই প্রথম উর্দুকে কবিকল্পনা রূপায়ণের বাহনরূপে ব্যবহার করেন।

হিন্দু সাহিত্যঃ হিন্দুদের রাজনৈতিক অধঃপতনের ফলে তাহাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা বিনষ্ট হইয়া যায়, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে। রামানুজ, পার্থসারথি মিশ্র, দেব সূরি, জীব গোস্বামী, বিজ্ঞানেশ্বর, জীমূতবাহন, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম, দর্শন ও ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। মুসলমান পণ্ডিতগণ পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ পারসিক ভাষায় অনূদিতও হয়। সুলতানী আমলের শেষভাগে ধর্মান্দোলনের ফলে বিভিন্ন প্রদেশে লৌকিক সাহিত্যেরও উন্নতির পথ খুলিয়া যায়।

ভক্তি আন্দোলনঃ রামানন্দঃ মধ্যযুগে যে বিরাট ধর্মান্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে এবং আধ্যাত্মিক ও সামাজিক

জীবনের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে তাহার উদ্ভবক্ষেত্র ছিল দাক্ষিণাত্য। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও সংস্কারক শঙ্করাচার্যের কর্মের মধ্যেই উহার মূল অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। শঙ্করাচার্যের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল পতনোন্মুখ বৌদ্ধধর্মের মূলোচ্ছেদ করিয়া হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন সাধন। তিনি বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন; কিন্তু জ্ঞানযোগের উপর তাঁহার গুরুত্ব আরোপ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের বিশেষ সন্তোষবিধান করিলেও জনচিত্তে সহৃদয় স্পন্দন জাগাইতে সমর্থ হয় নাই। জনচিত্তকে হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইলে জনগণের বোধগম্য প্রণালীতেই উহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভূত হইতে থাকে। জনগণের জীবনে হিন্দুধর্মকে সজীব ও সক্রিয় করিয়া তুলিবার প্রয়োজনও ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল, কেননা দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-সমাজের ধারক ও রক্ষকদের নিকট তৎপূর্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিল শক্তিপরীক্ষায় ইসলামের বলিষ্ঠ আহ্বান।

ভক্তিধর্ম একটি বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার কাজ করিল। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গুরু রামানুজ জনসম্মুখে ইহার মাহাত্ম্য উদ্ঘাটন করেন। সম্ভবতঃ ১১৩৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তি ঘটে। রামানুজ-সম্প্রদায়ভুক্ত রামানন্দ ছিলেন 'দাক্ষিণাত্য ও উত্তরাপথের মধ্যে ভক্তি-আন্দোলনের সেতুস্বরূপ।' তিনি চতুর্দশ শতকের শেষপাদ হইতে পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি জীবিত ছিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তৎকালীন যুগে ধর্ম-সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ দান ছিল অর্চনাবিধির সরলতা সম্পাদন এবং বর্ণাশ্রম-ধর্মের চিরাচরিত কঠোরতা হ্রাস। অনেকের মতে এই সকল অভিনব ভাব অন্ততঃ কিয়দংশেও ছিল ইসলামের প্রভাবসঞ্জাত। বারাণসীতে ইসলামের সহিত রামানন্দের সংস্পর্শের ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি অতীব সুফলপ্রসূ আন্দোলনের উদ্ভব ঘটিয়াছিল।

কিন্তু রামানন্দের সাফল্য লইয়া অতিরঞ্জন করা আমাদের পক্ষে উচিত হইবে না। তাঁহার শিক্ষার ফলে যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ঘুচাইবার সূত্রপাত হইয়াছিল এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মুসলমানগণ রাম-সীতা মন্ত্র গ্রহণ করে নাই। তাঁহার মুসলমান শিষ্য বলিতে কেবল কবীরের নামই শোনা যায়; তাহা-ও আবার একটি কিংবদন্তী অনুসারে কবীর মুসলমান রূপে জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামানন্দ কর্তৃক প্রবর্তিত উদার আন্দোলনও

ধীরে ধীরে হিন্দু ভাবধারায় পরিপ্লুত হইয়া পড়ে। এই ধর্মগুরুর বর্তমান অনুবর্তীদের প্রায় সকলেই এখন নিরতিশয় কঠোরতার সহিত বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধিবিধান পালন করিয়া চলেন।

কবীরঃ রামানন্দের কর্মের সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ দিকটি দেখিতে পাওয়া যায় কবীরের শিক্ষায়। মধ্যযুগে তিনিই বোধহয় ছিলেন ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান উদারপন্থী সংস্কারক। তিনি ছিলেন পঞ্চদশ শতকের লোক। মেকলিফ বলেন, "কবীর যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সকল ধর্মের লোকই তাহা গ্রহণ করিতে পারে। সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া তাহা অধ্যয়ন করিলে সকলের পক্ষেই মুক্তির পথ সুগম হইবে। ঈশ্বরের নামোচ্চারণে কবীরের এমনই নিষ্ঠা ছিল যে তাহার সহিত তুলনায় তিনি বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধিনিষেধ এবং হিন্দু ও মুসলমানের বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিতেন।" তিনি সামান্য গৃহস্থ লোকের অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। রহস্যবাদ তাঁহার দোঁহার সর্বপ্রধান বিশেষত্ব হইলেও, সংস্কারক রূপে তাঁহার ছিল স্বচ্ছ ব্যবহারিক দৃষ্টি। মধ্যযুগের ধর্মসংস্কার-প্রচেষ্টায় যাঁহারা নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই জ্ঞাতসারে ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যসাধনে ব্রতী হন। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন: "হিন্দুরা রামকে ডাকে, মুসলমানরা ডাকে রহিমকে, তবুও উভয়ে উভয়ের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া উভয়ের প্রাণনাশ করে, সত্যের সন্ধান কেহই জানে না।"

চৈতন্যঃ পঞ্চদশ শতকে বাঙ্গালা দেশে ধর্ম-জীবনের স্রোত নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল: "জাতিভেদ প্রথার বিধিনিষেধ কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিয়াছিল···জাতিভেদের ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উচ্চবর্ণের স্বেচ্ছাচারে সমাজের নিম্নতন স্তরের লোকেরা আর্তনাদ করিতেছিল; উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মুখের উপর শিক্ষা-দীক্ষার দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল···নববিধানের (পৌরাণিক) ধর্ম ব্রাহ্মণকুলের একচেটিয়া সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছিল···।" চৈতন্য (আবির্ভাব ১৪৮৫, তিরোভাব ১৫৩৩) প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম ছিল এই বিধানের বিরুদ্ধেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় যে সকল ক্রিয়াকলাপ একান্ত অপরিহার্য জ্ঞান করিতেন, এই সুপ্রসিদ্ধ লোকগুরু তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন; তিনি শিক্ষা দিতে থাকেন যে প্রেমভক্তিই প্রকৃত পূজা। শিষ্য গ্রহণে তিনি জাতিভেদ মানিয়া

চলিতেন না, তাঁহার শিক্ষার ফলে যে নূতন ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে মুসলমানেরও স্থান হইল। ইহার দুই শতাব্দী পরে ইংলণ্ডে মেথডিজ্‌ম্‌-এর (Methodism) ন্যায় বৈষ্ণবধর্মও নিম্নশ্রেণীর লোকেদের সম্মুখে এক নবীন আধ্যাত্মিক জীবন ও জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিয়া ধরিল। বৈষ্ণবধর্ম উড়িষ্যা ও আসামকে বাঙ্গালা দেশের একটি চির-অম্লান উপহার-বিশেষ।

মহারাষ্ট্রের সংস্কারকগণ: মহারাষ্ট্রেও জনকয়েক উদারহৃদয় সংস্কারক হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে সেতু রচনার কাজে হস্তক্ষেপ করেন। রানাডে বলেন, তাঁহারা "জনগণকে এই কথা বুঝাইতে সচেষ্ট হন যে রাম ও রহিম এক ও অভিন্ন। জনগণ যাহাতে আচার-অনুষ্ঠান ও জাতিভেদ-প্রথার কঠিন নিগড় ভাঙ্গিয়া মুক্তিলাভ করে এবং মানবপ্রেম ও ভগবদ্বিশ্বাসে একত্র সম্মিলিত হয় তাহাও ছিল তাঁহাদের প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত।" মহারাষ্ট্র দেশে পন্ধরপুর নামক স্থানে ভীমা নদীতীরে বিঠোবা-মন্দির ছিল ভক্তি-আন্দোলনের কেন্দ্র। এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত মহাপুরুষগণের মধ্যে জ্ঞানেশ্বর ও নামদেব (ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতক), একনাথ ও তুকারাম (পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক) এবং রামদাসের (সপ্তদশ শতক) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নামদেবের একটি বিশিষ্ট বাণী হইল: "ব্রত, উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধনের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন হয় না; তীর্থযাত্রারও আবশ্যক করে না। হৃদয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, সতত জপ করিবে হরিনাম।"

এই সকল ধর্মসংস্কারকের রচনা ও উপদেশাবলী "শিবাজীর ন্যায় কর্মবীরগণের রাজনৈতিক লক্ষ্যের আধ্যাত্মিক পটভূমি রচনা করিয়াছিল।......প্রাচীনকালের অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার ও তত্ত্বদর্শন এতাবৎ কাল ছিল একমাত্র সংস্কৃত ভাষায়ই সীমাবদ্ধ, ফলে জনসাধারণের অনধিগম্য; ইঁহারাই তাহা জনসাধারণের নিকট বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী নানা রূপে রূপায়িত করিয়া মারাঠী পদ্যে, প্রায়ই স্বরলয়-সংযোগে, প্রকাশ করেন, এবং উৎপীড়িত জনগণের পক্ষ লইয়া নিজ নিজ ইষ্টদেবতার মাধ্যমে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের চরণে অন্তরের এই আকুল আকুতি নিবেদন করেন যে মুসলমানের অত্যাচারের কবল হইতে তাহারা যেন পরিত্রাণ লাভ করে।" ইহাই হইল রাজনৈতিক ইতিহাসে মারাঠা ধর্মসংস্কারকগণের তাৎপর্য। তাঁহাদেরই চেষ্টার ফলে "দেশময় শুরু হইয়া যায় এক নব জাতীয় জীবনের হৃৎস্পন্দন।"

শিখধর্ম : শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক ১৪৬৯ খ্রীস্টাব্দে লাহোর জেলার তালবন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে লোকান্তরিত হন। তাঁহার সঠিক জীবনবৃত্তান্ত বর্ণন করা কঠিন, তবে কয়েকটি তথ্য সাতিশয় সুস্পষ্টরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। তাঁহার প্রথম জীবনে তিনি লাহোরের রাজ্যপাল দৌলৎ খাঁ লোদীর অধীনে সামান্য কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু সুগভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের পর তিনি এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হন যে "হিন্দু বলিয়াও কেহ নাই, মুসলমান বলিয়াও কেহ নাই।" অতঃপর তিনি ধর্মগুরু রূপে অবতীর্ণ হন। তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্যটন করেন, এমন কি সুদূর মক্কা ও বাগদাদ গমনেও বিরত হন না। শেষজীবনে তিনি আসিয়া (পঞ্জাবের) কর্তারপুরে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে থাকেন। সেখানেই তিনি ধর্মোপদেশ দান ও নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

গুরু নানকের বাণীর সারতত্ত্ব তিনটি ভাবধারায় অভিব্যক্ত : এক সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর, গুরু, এবং নাম। কোন কোন লেখক এইরূপ চিন্তাধারা পরিপোষণের পক্ষপাতী যে তিনি ছিলেন 'এক বিপ্লবী, যে সমাজের ক্রোড়ে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল তাহার সযত্ন-রক্ষিত যাবতীয় বিধিবিধান ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া এক সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টির পর পুরাতনের সেই ধ্বংসাবশেষের উপর এক নববিধান সৃষ্টিই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়।' কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত অভিমত হইল এই যে প্রাচীন প্রথার ধ্বংসসাধনের কোন চেষ্টাই গুরু নানক করেন নাই, তাঁহার চেষ্টা ছিল যুগধর্মের প্রয়োজন অনুসারে উহার সংস্কার-সাধন।

গুরু নানক যদি তাঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তির প্রাক্কালে নিজ পদের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার শিষ্যবর্গ সম্ভবতঃ রামানন্দ ও কবীরের ন্যায় অন্যান্য সংস্কারকগণের শিষ্যবর্গের মতই বিশাল হিন্দু-সমাজে অন্তর্লীন হইয়া যাইত। শিখজাতির ইতিহাসে অঙ্গদের গুরুপদে মনোনয়ন হইল একটি গভীর তাৎপর্যের বিষয়, কেননা ইহারই ফলে শিখ-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। অঙ্গদের (১৫৩৮-৫২) অধীনেই শিখগণ একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। কিংবদন্তী অনুসারে তিনিই ছিলেন গুরুমুখী বর্ণমালার উদ্ভাবক। তাঁহার পরবর্তী গুরু অমরদাসের (১৫৫২-৭৪) নেতৃত্বে শিখ মতবাদের বিশেষ প্রসার সাধিত হয়। স্বকীয় সামাজিক রীতিনীতি ও আদর্শের ধারক ও বাহক রূপে শিখজাতি হইয়া দাঁড়ায় একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়।

চতুর্থ গুরু রামদাস (১৫৭৪-৮১) অমৃতসরের ভিত্তি স্থাপন করেন। এখন হইতে গুরুপদ হইয়া দাঁড়ায় বংশানুক্রমিক, রামদাস তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অর্জনকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

পঞ্চম গুরু অর্জন (১৫৮১-১৬০৬) ছিলেন সংগঠনকার্যে সবিশেষ কুশলী। শিষ্যবর্গের নিকট দক্ষিণা আদায়ের জন্য তিনি 'মসন্দ' প্রথার প্রবর্তন করেন। এইভাবেই শিখজাতি ক্রমশঃ নিজেদের জন্য এক প্রকারের শাসনতন্ত্র গড়িয়া তোলে; ফলে তাহারা রাষ্ট্রের মধ্যেই নিজেদের স্বতন্ত্র এবং কতকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। গুরু অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি সম্ভবতঃ ছিল শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেব' সঙ্কলন (১৬০৪)। অর্জনের রাজনৈতিক ও ধর্ম-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ সম্রাট জাহাঙ্গীরের চিত্তে সন্দেহের উদ্রেক করে, ফলে নিষ্ঠুর ভাবে শিখগুরুর প্রাণনাশ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে শান্তির পথে শিখধর্মের অভিব্যক্তি বন্ধ হইয়া যায়, তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী হরগোবিন্দের (১৬০৬-১৬৪৫) নেতৃত্বে শুরু হয় এক সামরিক শ্রেণীরূপে শিখজাতির অভিব্যক্তিলাভের পথে অগ্রগতি।

ধর্মসংস্কারান্দোলনের ফলাফলঃ এই সংস্কার আন্দোলনের দু'টি প্রধান ফল বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, ধর্মগুরুগণ হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ দূরীকরণের চেষ্টায় যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন, ফলে তাঁহারা আকবরের উদারনীতি অনুসরণের পথ সুগম করিয়া দিয়া যান। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন প্রদেশের লৌকিক ভাষায় উন্নতির গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। ধর্মসংস্কারকগণের প্রায় সকলেই লৌকিক ভাষাকেই তাঁহাদের উপদেশ বিতরণের বাহনরূপে ব্যবহার করেন, ফলে এই ভাষাগুলি নবীন মর্যাদায় বিভূষিত হইয়া উঠে। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবগণ অবহেলিত লৌকিক ভাষায় গীতিকাব্যের এক বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি করেন। মহারাষ্ট্রে ধর্মসংস্কারকগণের রচিত পদাবলী মারাঠী সাহিত্যের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া উঠে। পঞ্জাবে গুরুগণ লৌকিক ভাষায়ই তাঁহাদের উপদেশাবলী সঙ্কলন করেন, সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব বর্ণমালারও উদ্ভাবন ঘটে।

ষোড়শ অধ্যায়

সাম্রাজ্য লাভের জন্য আফগান-মোগল সংঘর্ষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাবর

মধ্য-এশিয়ায় কর্মজীবন: ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ছিলেন চাঘতাই তুর্কী।[১] পিতৃপুরুষগণের দিক দিয়া তিনি ছিলেন তৈমুরের বংশধর, মাতার দিক দিয়া তিনি চিঙ্গিজ খাঁর বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবী করিতে পারিতেন। তাঁহার পিতা উমর শেখ মীর্জা ছিলেন ফরগণার রাজা। ১৪৮৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ফরগণায় বাবরের জন্ম হয়। ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন, এবং মাত্র একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বাবর পৈতৃক রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেন।

অল্পবয়সেই বাবর বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও কর্মপটুতার পরিচয় দান করেন। অল্পকালের মধ্যেই পর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ও খুল্লতাতের মৃত্যু হয়; সমরকন্দ অধিকারের জন্য জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়; ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দে বাবর তাহা অধিকার করিয়া ফেলেন—মাত্র পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার কণ্ঠদেশে শোভা পাইতে থাকে বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই বাবর যখন ফরগণার উপর স্বীয় কর্তৃত্ব রক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন তখন মধ্য-এশিয়ার এই প্রধান নগরটি তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া যায়। অনতিকালের মধ্যেই তিনি পুনরায় সমরকন্দ অধিকার করেন। কিন্তু ইহার ফলে তাঁহাকে উদীয়মান উজবেগ রণনায়ক সৈবানী খাঁর সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া পড়িতে হয়। সৈবানী খাঁ তাঁহাকে সর-ই-পুল ও আখ্‌সি'র যুদ্ধে পরাভূত করেন, বাবরকে সমরকন্দ ও ফরগণা ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হয়।

এই সকল পরাজয়ের ফলে শুরু হইল বাবরের ভ্রাম্যমান জীবন। তিনি

---

১ চাঘতাই ছিলেন চিঙ্গিজ খাঁর দ্বিতীয় পুত্র।

তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, তাঁহাকে "দাবাখেলার রাজার মতো এক ঘর হইতে আর-এক ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতে লাগিল।" এইরূপ ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতেই ১৫০৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি আসিয়া এক সিংহাসন-অপহারককে সরাইয়া কাবুল অধিকার করিয়া বসেন। ঘটনাচক্রে এইভাবেই উত্তর-পশ্চিম হইতে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় দক্ষিণ-পূর্বে। কিন্তু বাবর আর-একবার মধ্য-এশিয়ায় তাঁহার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করেন। সৈবানী খাঁর ক্রিয়াকলাপে সকলেরই ভয় হইয়াছিল চিঙ্গিজ খাঁ ও তৈমুরের ন্যায় তিনিও না দিগ্বিজয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। নববলে বলীয়ান পারসিক সাম্রাজ্যের সাফাবী-রাজ শাহ্ ইসমাইল তাঁহার ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। শাহ্ ইসমাইলের হাতে সৈবানী খাঁ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া প্রাণ হারাইলেন। শোনা যায় বাবর তখন শাহ্ ইসমাইলকে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। পারস্যরাজ তাহা গ্রহণ করেন বশ্যতা-স্বীকারের নিদর্শন-রূপে। শাহ্ ইসমাইল ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ের মুখপাত্র। তিনি বাবরকে সমরকন্দ ও বুখারায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সম্মত হন, তবে সম্ভবতঃ বাবরকে শিয়ামত সম্প্রসারণে সহায়তা করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। সৈবানী খাঁর মৃত্যুতে দুর্বল হইয়া পড়িলেও উজবেগরা বাবরকে বাধাদান করে, ফলে তিনি সমরকন্দ অধিকারে অসমর্থ হন। ঘজ-দাবান নামক স্থানের যুদ্ধে পারসিক বাহিনী পরাভূত হয় এবং সেজন্য বাবরের প্রতি পক্ষত্যাগের দোষারোপ করে।

ভারতবর্ষের বাহিরে বাবরের ক্রিয়াকলাপ ভারতবর্ষেও তাঁহার ক্রিয়াকলাপকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। পাণিপথ ও খানুয়ায় তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই দুঃখদুর্দশার মধ্যে মানুষ সুশিক্ষিত যোদ্ধপুরুষ রূপে; পারসিকদের সাহচর্যের ফলে তিনি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিলেন, উজবেগদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে লাভ করিয়াছিলেন 'তুলুঘ্মা'র (অর্থাৎ পার্শ্বভাগ আক্রমণের) শিক্ষা। উজবেগদের এই সমরকৌশলের মূলকথা ছিল শত্রুপক্ষের পার্শ্বভাগ ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া যুগপৎ সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে অশ্বারোহী বাহিনীর বিদ্যুৎগতি আক্রমণ। সুশিক্ষিত অশ্বারোহী বাহিনী ও নূতন আগ্নেয়াস্ত্রের ফলপ্রসূ সম্মিলন এবং পাণিপথ ও খানুয়ায় যে অদ্ভুত কৌশলের বলে তিনি বিজয়গৌরব অর্জন করেন তাহা ছিল তাঁহার মধ্য-এশিয়ায় লব্ধ অভিজ্ঞতার ফল। আর-একটি বিষয় যাহা প্রায়ই ধর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয় না তাহা হইল তাঁহার উত্তর-

পুরুষদের আমলে মোগলদের মধ্য-এশীয় রাজনীতির উপর বাবরের ঝটিকাক্ষুব্ধ যৌবনকাল ও রোমাঞ্চকর কীর্তিকলাপের প্রভাব।

আফগানিস্তানে বাবর : মধ্য-এশিয়ায় প্রতিষ্ঠালাভের জন্য বাবরের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা ১৫১২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের দিকে সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। তিনি কাবুলে ফিরিয়া আসেন। ১৫২২ খ্রীস্টাব্দে কান্দাহার অধিকৃত হয়। ইতিপূর্বেই ভারতের ঐশ্বর্যসম্ভার তাঁহার বীরহৃদয়কে প্রলোভিত এবং কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণ এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে যে কৌশলের প্রয়োজন তাহার নিশ্ছিদ্রতা সম্পাদনের জন্য সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন।

বাবরের প্রথম ভারত-অভিযান হয় ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে। ইউসুফজাইরা ছিল উহার লক্ষ্যীভূত। ১৫২০ খ্রীস্টাব্দে বজৌরের বিরুদ্ধেও এক অভিযান পরিচালিত হয়। তৈমুর-বংশোদ্ভূত বলিয়া পঞ্জাবকে তিনি নিজ স্বত্বাধিকারভুক্ত জ্ঞান করিতেন। ১৫২৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি খাইবার গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হন, তারপর অতিক্রম করেন বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা, পরিশেষে দীপালপুরে উপনীত হইয়া নগরটি বিধ্বস্ত করেন। কিন্তু শেষ অবধি তাঁহাকে লাহোরে পশ্চাদপসরণ করিতে হয়। সেখান হইতে তিনি কাবুলে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার আশা ছিল লোদী-রাজ্যের দুইজন অসন্তুষ্ট ওমরাহ্—দৌলৎ খাঁ লোদী ও আলম খাঁ লোদী—তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিবেন। কিন্তু তাঁহারা যখন দেখিলেন বাবরের উদ্দেশ্য লুণ্ঠন নয়, দেশজয়, তখন তাঁহারা বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। আগাগোড়া অবস্থাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করিল। দিল্লীর পতনোন্মুখ আফগান রাজ্যের মূলোচ্ছেদের জন্য বাবর প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬) : ১৫২৫ খ্রীস্টাব্দের নবেম্বর মাসে বাবর ১২,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী লইয়া কাবুল হইতে যাত্রা করিয়া পঞ্জাবে আসিয়া প্রবেশ করেন। দৌলৎ খাঁ লোদীর সঙ্গে তাঁহার সংঘর্ষ হয়। দৌলৎ খাঁ পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। বাবর পঞ্জাব হইতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য দিল্লী হইতে বহির্গত হন ইব্রাহিম লোদী। ইব্রাহিম লোদীর বর্ণনা-প্রসঙ্গে বাবর বলিয়াছেন তিনি ছিলেন "নিজের সকল প্রকার গতিবিধি সম্বন্ধে একান্ত অমনোযোগী একজন অনভিজ্ঞ যুবাপুরুষ; তাঁহার অগ্রগতিতে কোন শৃঙ্খলা ছিল না, স্থিতি অথবা

পশ্চাদপসরণের মূলেও কোন পরিকল্পনা ছিল না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন।" এইরূপ কোন ব্যক্তি বাবরের ন্যায় একজন সুশিক্ষিত যোদ্ধপুরুষকে পরাজিত করিবেন, ইহা ছিল একান্তই দুরাশা।

পাণিপথের ক্ষেত্রে, যেখানে ভারতের ভাগ্য বারবার নির্ণীত হইয়াছে সেখানে, এই চূড়ান্ত যুদ্ধ হয় ১৫২৬ সালের ২১শে এপ্রিল। বস্তুতঃ, খাইবার গিরিবর্ত্মের মুখেই যদি উত্তর-পশ্চিম হইতে আগত শত্রুর গতিরোধ করা না যাইত, তবে শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগই রণক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইত। শীতকালে পঞ্জাবের নদনদীতে বহুক্ষেত্রেই জল খুব কম থাকিত বলিয়া সেগুলি হাঁটিয়াই পার হওয়া যাইত, তাই সেখানে বিপক্ষের আক্রমণ হইতে নদনদীর তীরভাগ রক্ষা করা ছিল কঠিন। শত্রুপক্ষ সহজেই কোন-এক ফাঁক দিয়া নদী পার হইয়া আসিতে পারিত। স্বভাবতঃই ইহার পর যেখানে সুবিধা বুঝিয়া চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য দাঁড়াইতে পারা যাইত তাহা হইল শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ সমভূমি; সেখানে সংখ্যাবাহুল্যে প্রকৃত ফললাভের আশা থাকিত, রক্ষিবাহিনীর পক্ষে দিল্লী ও আগ্রা পশ্চাতে রাখিয়া যুদ্ধ করারও অনেক সুবিধা ছিল।

পাণিপথে ইব্রাহিম প্রায় ৪০,০০০ সৈন্য লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই বিরাট বাহিনী উস্তাদ আলী ও মুস্তাফা এই দুইজন বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরিচালিত বাবরের আগ্নেয়াস্ত্রগুলির চমৎকার লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়াইল। ভূমিভাগ সমতল হওয়ায় অশ্বারোহী বাহিনী নিয়োগের এবং বাবরের পার্শ্বভেদ-কৌশল প্রয়োগের পক্ষে অতি প্রশস্ত ছিল। বাবর তাঁহার ক্ষীণবল সম্মুখব্যূহ শকটশ্রেণীর দ্বারা দৃঢ়ীভূত করেন, উদ্দেশ্য আফগানদের সম্মুখভাগ এক বিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে লক্ষ্যগোচর রাখা যাহাতে তাঁহার পক্ষে তাহাদের উভয় পার্শ্বভাগ আক্রমণের সুবিধা হয়। ইব্রাহিম সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন; আফগান-পক্ষে নিহতদের মোট সংখ্যা ভয়াবহ হইয়া উঠে। বাবরের রণনৈপুণ্য এবং অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনীর অভূতপূর্ব সমাবেশের ফলে বাবর পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন। অতঃপর অবিলম্বেই দিল্লী ও আগ্রা অধিকৃত হয়। অনুবর্তীদের প্রতি বাবরের অকৃপণ দাক্ষিণ্য এবং সমরকন্দ, কাশগড়, খোরাসান, পারস্য ও কাবুলে বন্ধুবর্গকে মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণের ফলে তাঁহার যশ দূরদেশ

অবধি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, সকলের চিত্তে জাগে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণের বাসনা; ফলে তাঁহার পক্ষে সৈন্য-সংগ্রহের সুবিধা হয়। তিনি তাঁহার অনুবর্তীদের ভারতে বসবাস করিতে সম্মত করাইতেও সমর্থ হন।

রাজপুত ও আফগানদের বিরুদ্ধতা—খানুয়া ও ঘর্ঘরার যুদ্ধঃ হিন্দুস্থানে নিজ অধিকার সুদৃঢ় করিয়া তুলিবার জন্য বাবরকে দুই বিরুদ্ধ দলের সহিত শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল; সে দু'টির একটি হইল পূর্বাঞ্চলের আফগানগণ, আর-একটি দল হইল মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে রাজপুত জাতি। বাবরের জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন আক্রমণকারী বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলে, নাসির খাঁ লোহানী এবং মারুফ ফার্মুলীর নেতৃত্বাধীন পূর্বাঞ্চলের আফগানগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। পাণিপথে ইব্রাহিমের পরাভবের আট মাসের মধ্যেই আটক হইতে বিহার অবধি সমগ্র ভূভাগ বাবরের পদানত হইয়া পড়ে। মূলতানও তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়।

দক্ষিণে বাবরের রাজ্যসীমার বিস্তার ঘটে কাল্পি ও গোয়ালিয়র অবধি। কিন্তু রাজপুতানা হইতে যে বিপৎপাতের সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহার সম্মুখীন না হইয়া কোন উপায় ছিল না। বাবর বেশ জানিতেন যে এবার তাঁহাকে এক অভিজ্ঞ যোদ্ধপুরুষের সম্মুখীন হইতে হইবে। রাণা সঙ্গের সহিত বাবরের পূর্ব হইতেই দৌত্যালাপ চলিয়া আসিতেছিল। বাবরের অভিযোগ হইল এই যে, বাবরের দিল্লী অভিমুখে অভিযানের সময় রাণা আগ্রার দিক হইতে আক্রমণ করিবেন এইরূপ কথা ছিল। এদিকে আবার রাণার অভিযোগ হইল এই যে, বাবর পূর্বের চুক্তি ভঙ্গ করিয়া কাল্পি, ঢোলপুর এবং বায়ানা অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। (পশ্চিমাঞ্চলের) আফগানগণ সুলতান মামুদ লোদীকে দিল্লীর সিংহাসনের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী রূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন; রাণা সঙ্গ তাঁহাকেই সুলতান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন।

বাবর ও রাণার মধ্যে এই বিতর্ক খানুয়ার যুদ্ধে (২৭শে মার্চ, ১৫২৭) চরম পরিণতি লাভ করিল। রাজপুত অশ্বারোহী বাহিনী মুস্তাফার ধ্বংসকারী অনল-বর্ষণ সহিতে পারিল না। রাজপুতগণ সংখ্যাধিকতার বলে দুরূহ চাপ প্রয়োগ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু শেষ অবধি কামানের বলেই জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল। রাজপুত ও তাহাদের সহযোগী আফগানদের সম্পূর্ণ পরাভব ঘটিল। খানুয়ার যুদ্ধের ফলে তুর্ক-আফগান সুলতানীর

ধ্বংসাবশেষের উপর উত্তর-ভারতে রাজপুত জাতির প্রাধান্য লাভের সম্ভাবনা বিনষ্ট হইয়া গেল। মালব রাজ্যে চন্দেরীর গুরুত্বপূর্ণ দুর্গের অধিনায়ক মেদিনী রায় ছিলেন রাণা সঙ্গের একজন বিশেষ খ্যাতিমান সামন্ত ; ইহার পর তাঁহাকেও পরাভূত করা হইল। ১৫২৮ সালে ভগ্নহৃদয়ে রাণা প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজপুত আতঙ্ক হইতে মুক্তিলাভ করার পর বাবর পূর্বাঞ্চলের আফগানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তাহাদের মধ্যে তখন দলাদলি চলিতেছিল। লোহানী আফগান ও লোদী আফগানদের মধ্যে বৈরভাব আফগান-স্বার্থের পক্ষে পরম প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৫২৯ সালে সুলতান মামুদ লোদী বহুসংখ্যক আফগানকে ঐক্যবদ্ধ করেন। বাবার এলাহাবাদ, বারাণসী এবং গাজীপুরের পথ ধরিয়া পূর্বাঞ্চলে অগ্রসর হন। জালাল-উদ্দীন বাহার খাঁ লোহানী তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। বিহার বাবরের পদানত হইয়া পড়ে। বাঙ্গালার সুলতান নসরৎ শাহের সেনাদল আফগানদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছিল ; তাহারা আসিয়া ঘর্ঘরা-তীরে তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়। মুহুর্মুহুঃ অনল-বর্ষণে বাবর সুকৌশলে নিজের পথ মুক্ত করিয়া চলিতে থাকেন। বাঙ্গালার সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। নসরৎ শাহ্ মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করেন। অন্যান্য আফগান রণনায়কগণকেও বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। এইভাবে ঘর্ঘরার যুদ্ধের (৬ই মে, ১৫২৯) ফলে—অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও—আফগানদের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা বিনষ্ট হইয়া যায়।

ইতিহাসে বাবরের স্থান-নির্ণয়ঃ ১৫৩০ সালের ২৬শে ডিসেম্বর বাবর মৃত্যুমুখে পতিত হন। শোনা যায়, তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুনকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য রাজপরিবারের মধ্যে এক চক্রান্ত হইয়াছিল। বাস্তবিকই যদি এরূপ কোন চক্রান্ত হইয়া থাকে তবে তাহা সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হয়, কেননা হুময়ুন নিরুপদ্রবেই বাবরের উত্তরাধিকার লাভ করেন।

বাবরের রাজ্যশাসনের প্রতিভা ছিল না। তিনি ছিলেন একজন যোদ্ধপুরুষ মাত্র। তিনি আসিয়া যে জোড়াতালি-দেওয়া পুরাতন শাসন-ব্যবস্থা দেখিতে পান তাহাই চালাইয়া যাইতে থাকেন। পুত্রের জন্য তিনি রাখিয়া যান এমনই বিরাট (অক্ষুনদী হইতে বিহার অবধি বিস্তৃত) অথচ আভ্যন্তরীণ সংহতিবিহীন এক সাম্রাজ্য যে তাহা কেবলমাত্র সামরিক যন্ত্রের বলে একত্র ধরিয়া রাখার

কোন উপায়ই ছিল না। লেন পুল যথার্থই তাঁহাকে "মধ্য-এশিয়া ও ভারত, লুণ্ঠনকারী দল ও সাম্রাজ্যতন্ত্র, তৈমুরলঙ ও আকবরের মধ্যে সংযোগসূত্র" রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আত্মজীবনী: বাবরের ছিল চমৎকার সাহিত্যরুচি। তিনি পারসী ও তুর্কী দুই ভাষায়ই সুন্দর লিখিতে পারিতেন। তাঁহার কর্মজীবন সংক্রান্ত তথ্য আহরণের সর্বপ্রধান উৎস আমাদের নিকট হইল তাঁহার স্বলিখিত আত্মজীবনী[১]। মূল গ্রন্থখানি তুর্কী ভাষায় রচিত এবং তাঁহার পুত্র হুমায়ুন কর্তৃক অনুলিখিত হয়, আকবরের আমলে হয় উহার পারসী অনুবাদ। এল্‌ফিন্‌স্টোন যথার্থই বলিয়াছেন, "তাঁহার জীবনস্মৃতিতে একজন শ্রেষ্ঠ তাতার নরপতির জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তাঁহার মতামত এবং অন্তরাবেগের স্বাভাবিক প্রগল্‌ভতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে ; তাহাতে যেমন কিছু গোপন করিবার, কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া বলিবার চেষ্টা নাই, তেমনই তাহাতে অকপটতা এবং স্পষ্টবাদিতার আতিশয্য প্রদর্শনেরও বিন্দুমাত্র দুশ্চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। পুস্তকখানির রচনাশৈলী সরল, বলিষ্ঠ, সাবলীল এবং আলেখ্যের ন্যায় মনোমুগ্ধকর ; উহাতে তাঁহার দেশবাসী এবং সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের আকৃতি-প্রকৃতি, চালচলন, বৃত্তি এবং ক্রিয়াকলাপ মুকুরে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায় স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। এইদিক দিয়া এইখানিই হইল এশিয়ার মধ্যে প্রায় একমাত্র যথার্থ ইতিহাস—প্রত্যেকটি ব্যক্তির আকৃতি, পরিচ্ছদ, রুচি, এবং অভ্যাসের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন, বর্ণনা করিয়াছেন বিভিন্ন দেশ, জলবায়ু, প্রাকৃতিক দৃশ্য, উৎপন্ন দ্রব্য, চারুশিল্প ও শ্রমশিল্পজাত বস্তুপুঞ্জ। তবুও পুস্তকখানির যে প্রধান গুণ পাঠকের মনোহরণ করে তাহা হইল লেখকের চরিত্র। এশিয়ার সাড়ম্বর ইতিহাসের ভাবলেশ-শূন্যতার মধ্যে যখন দেখিতে পাই একজন রাজা দিনের পর দিন অশ্রু বিসর্জন করিতে পারেন এবং আমাদের একথা জানাইতে কুণ্ঠা বোধ করেন না যে তিনি তাঁহার বাল্যের ক্রীড়াসঙ্গীর জন্য অশ্রু বিসর্জন করিয়াছেন, তখন চিত্ত ভাবলেশহীনতার কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।"

---

১ মিসেস বীভারেজ-কৃত ইংরেজী তর্জমা অতি সুখপাঠ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হুমায়ুন ও শের শাহ্

হুমায়ুনের বাধাবিঘ্ন : হুমায়ুনের জন্ম হয় ১৫০৮ সালে ; ১৫৩০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহাকে প্রচণ্ড বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। হিন্দুস্থান জয়ের কাজ তখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদল ছিল চাঘতাই তুর্কী, মোগল, পারসিক, আফগান এবং ভারতীয় ভাগ্যান্বেষীদের লইয়া গঠিত একটি মিশ্র বাহিনী। বাবরের অধিকার ছিল কেবলমাত্র সামরিক বলাধিকার। পূর্বাঞ্চলের আফগান রণনায়কগণ তখনও ছিলেন সংখ্যায় অগণন এবং শক্তিমান, বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত। রাজপুতরাও যে কখন মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় তাহার স্থিরতা ছিল না। মালবে চলিতেছিল শোচনীয় বিশৃঙ্খলা। গুজরাটে বাহাদুর শাহ্ দ্রুতগতিতে শক্তিবৃদ্ধি করিয়া চলিতেছিলেন। এদিকে হুমায়ুন আবার কেবল কাবুল ও কান্দাহারের উপর তাঁহার ভ্রাতা কামরানের অধিকার মঞ্জুর করিয়াই নয়, সহসা উদারতার বশে তাঁহাকে পঞ্জাব ও হিস্সর ফিরোজা অঞ্চল (প্রকৃত পঞ্জাবের পূর্বে অবস্থিত) দান করিয়া নিজের অসুবিধা আরও বাড়াইয়া তুলিলেন। আস্কারীকে তিনি দান করিলেন সম্ভল, হিন্দালকে দিলেন মেওয়াট। কামরানের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ততটা ছিল না যতটা ছিল প্রতিযোগীর মনোভাব ; ফলে তাঁহাকে যে রাজ্যখণ্ডটি দান করা হইল তাহাতে হুমায়ুন সৈন্য-সংগ্রহের সর্বোত্তম ক্ষেত্র হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া বসিলেন। তাঁহার এই সব ভ্রাতারা তাঁহাকে তাঁহার জীবনের চরম সঙ্কটের সময় সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া যান, ফলে তাঁহার পতন ত্বরান্বিত হয়।

হুমায়ুন এবং আফগানগণ : বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কালঞ্জরের দুর্গ তখন ছিল আফগানদের পক্ষপাতী জনৈক হিন্দু রণনায়কের অধীন। হুমায়ুনের প্রথম সামরিক অভিযান পরিচালিত হয় তাঁহারই বিরুদ্ধে। তাঁহার নিকট হইতে প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া হুমায়ুন সুলতান মামুদ লোদী, বিবান খাঁ ও বায়েজিদের অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ আফগানদের সম্মুখীন হইবার জন্য

পূর্বাঞ্চলে অগ্রসর হন। দৌরুয়ার যুদ্ধে আফগানদের পরাজয় হয়। বায়েজিদ নিহত হন, স্থলতান মামুদ ও আফগানগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। একদল আফগান তখন বলিতে থাকে যে তাহাদের পরাজয়ের কারণ হইল শের খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা। স্থর ও লোহানী আফগানদের ফার্মুলী ও লোদী আফগানদের প্রভাবাধীন শক্তিসজ্ঘে যোগদানে বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। ইহার পর হুমায়ুন শের খাঁর হস্তগত চুনারের দুর্ভেদ্য দুর্গের দিকে অগ্রসর হন। মাসকয়েক অবরোধের পর শের বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হইয়া জনৈক রাজদূত প্রেরণ করেন। হুমায়ুন তখন গুজরাটে বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হুমায়ুনের সাহায্যের জন্য শের নিজ পুত্র কুতব খাঁর অধীনে একদল আফগান সৈন্যও প্রেরণ করেন।

হুমায়ুন ও গুজরাটের বাহাদুর শাহ্ঃ বাহাদুর শাহ্ মালব অধিকার করিয়া চিতোর অবরোধ করিয়াছিলেন। রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর চিতোর দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিল। সঙ্গের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বিক্রমাদিত্য নিজ রাজধানী রক্ষায় অসমর্থ হন; তখন তাঁহার জননী হুমায়ুনের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানান। জনকয়েক মোগল রণনায়ক অসন্তুষ্ট হইয়া আসিয়া বাহাদুর শাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন; তাহা ছাড়া আলম খাঁ লোদী এবং অন্যান্য আফগান আশ্রয়প্রার্থীও আসিয়া তাঁহার দলে যোগদান করেন। ১৫৩৪ সালে হুমায়ুন পূর্বাঞ্চল হইতে দ্রুতগতিতে আসিয়া মালবে উপনীত হন; বাহাদুর শাহ্ কর্তৃক প্রেরিত আফগান আশ্রয়প্রার্থীদের বেশ বড় রকমের একটি দল তাঁহার হস্তে পরাভূত হয়; তারপর বাহাদুর শাহ্ যখন চিতোর ধ্বংস করিয়া লুণ্ঠন-সামগ্রী লইয়া ফিরিতেছেন তখন হুমায়ুন আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়ান। বাহাদুর শাহ্ মান্দাসোরে নিজ শিবির স্থরক্ষিত করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। তাঁহার হাতে ছিল চমৎকার একসারি কামান— 'রুমের কাইজারের কামানসারির ঠিক পরেই ছিল উহার স্থান'। হুমায়ুন যথেষ্ট সাহস, কর্মোদ্যম ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বাহাদুর শাহ্কে সকল প্রকার যোগাযোগের পথ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন; নিরুপায় বাহাদুর শাহ্কে তখন তাঁহার সারি সারি গুরুভার কামানের মুখ শলাকা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া, সামান্য কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে রাতারাতি পলায়ন করিতে হয়। হুমায়ুন সমগ্র মালব রাজ্য অধিকার করিয়া ফেলেন, তারপর গুজরাট অভিমুখে

অগ্রসর হন। চম্পানীরের বহির্বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করা হয়; বাহাদুর বিতাড়িত হইয়া দিউ শহরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। আহ্‌মদাবাদ হুমায়ুনের পদানত হইয়া পড়ে; ভ্রাতা আস্‌কারীকে সেখানে নিজের প্রতিনিধি রূপে রাখিয়া তিনি আগ্রায় প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু পোর্তুগীজদের সহায়তা লাভ করিয়া বাহাদুর অচিরেই হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দেন। সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। এদিকে আস্‌কারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার উদ্যোগ-আয়োজনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; তাঁহাকে উর্ধ্বশ্বাসে পশ্চাদপসরণ করিতে হয়। বাহাদুর সমগ্র গুজরাট পুনরুদ্ধার করিয়া ফেলেন। স্থানীয় নায়কগণ পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করায় মালব পর্যন্ত হুমায়ুনের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। অবশ্য ইহার অল্পকাল পরেই পোর্তুগীজদের সঙ্গে এক খণ্ডযুদ্ধের ফলে বাহাদুরকে প্রাণ হারাইতে হয়, কিন্তু তখন বিহার ও বাঙ্গালা দেশ লইয়া হুমায়ুন এমনই বিব্রত হইয়া পড়েন যে এ সুযোগের কোনরূপ সদ্ব্যবহার করাই আর তাঁহার সাধ্যে কুলাইয়া উঠে নাই।

শের শাহের পূর্বজীবন: হুমায়ুনের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় শের খাঁ সুর নামে দক্ষিণ-বিহারের জনৈক আফগান রণনায়ক বাহাদুর শাহ্‌ অপেক্ষা অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন; এমন কি, তিনি হুমায়ুনকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়নেও সমর্থ হন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল ফরিদ। সম্ভবতঃ ১৪৮৬ (অথবা ১৪৭২) সালে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা হাসান সুর ছিলেন বিহারের অন্তর্গত সাসারামের একজন জায়গীরদার। বিমাতার চক্রান্তের ফলে অতি অল্পবয়সেই শের গৃহত্যাগ করিয়া বৎসরকয়েক জৌনপুরে অতিবাহিত করেন। সেখানে তিনি অধ্যয়নে রত হন; ফলে পারসিক সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে। অতঃপর পিতা তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহারই উপর জায়গীর তদারকের ভার দেন। বৎসরকয়েক তিনি সেই কাজেই নিযুক্ত থাকেন। শাসনকার্যের এই অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে তাঁহার বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল। কিন্তু বিমাতার ঈর্ষ্যার ফলে পুনরায় তাঁহাকে সাসারাম পরিত্যাগ করিতে হয়। ১৫২২ সালে শের আসিয়া বিহারের স্বাধীন সুলতান বাহার খাঁ লোহানীর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধের পর তিনি গিয়া মোগলদের অধীনে চাকুরি লন; কিছুকাল তাহাদের সহিত বসবাস করার ফলে তাহাদের সামরিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে।

পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরেই, ১৫২৮ সালে, মোগলদের সহায়তায় তিনি তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতাদের নিকট হইতে পৈতৃক জায়গীর উদ্ধার করেন। ১৫২৯ সালে তিনি হইয়া দাঁড়ান অপ্রাপ্তবয়স্ক লোহানী নায়ক (বাহার খাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী) জালাল খাঁর অভিভাবক।

এই সময় শেরের নিকট ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি বৃদ্ধির এক অপূর্ব সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৫৩০ সালে তিনি চুনারের দুর্ভেদ্য দুর্গ হস্তগত করেন। ১৫৩১ সালে হুমায়ুন আসিয়া চুনার অবরোধ করেন; সময় থাকিতে বশ্যতা স্বীকার করায় শের সে যাত্রায় বাঁচিয়া যান। শেরের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি বিহারের লোহানী নায়কদের ঈর্ষ্যার বিষয় হইয়া উঠে; ১৫৩৩ সালে তাঁহারা বাঙ্গালার সুলতান মামুদ শাহের সহিত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন; মামুদ শাহ্‌ও এই শক্তিমান প্রতিবেশীর শক্তি-সংহরণের জন্য স্বভাবতঃই উৎকণ্ঠিত ছিলেন। নাবালক সুলতান জালাল খাঁরও শেরের কর্তৃত্ব দুঃসহ বোধ হইতেছিল, তিনি বাঙ্গালাদেশে পলায়ন করিলেন। কিন্তু ১৫৩৪ সালে (কিউল নদীতীরে) সুরযগড়ে শেরের হস্তে মামুদ শাহ্‌ ও তাঁহার লোহানী মিত্রদের বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এই বিজয়গৌরব অর্জনের ফলে শেরের মর্যাদাবৃদ্ধি ঘটে, এবং নামে না হইলেও কাজে তিনিই হইয়া দাঁড়ান বিহারের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিপতি। হুমায়ুন তখন পশ্চিম-ভারতে বাহাদুর শাহের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন; সেই সুযোগে শের আসিয়া বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করেন। প্রভূত অর্থ এবং কয়েকটি জেলা ছাড়িয়া দিয়া মামুদ শাহ্‌কে সন্ধি ক্রয় করিতে হয়। বহু প্রথিতযশা আফগান ওমরাহ্‌ আসিয়া শেরের পতাকাতলে সমবেত হন। ১৫৩৭ সালে স্থায়ী ভাবে বাঙ্গালাদেশ জয় করিবার অভিপ্রায়ে তিনি পুনরায় বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। গৌড় নগর অবরোধ করা হয়।

হুমায়ুন ও শের শাহ্‌ঃ হুমায়ুন দেখিলেন শেরের এইরূপ দ্রুতগতিতে শক্তিবৃদ্ধি পূর্বাঞ্চলে মোগলদের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিতেছে; তাঁহার এই ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। ১৫৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি আগ্রা হইতে বহির্গত হন এবং পর বৎসরের প্রথম ভাগেই আসিয়া চুনার অবরোধ করেন। এদিকে গৌড় নগর পদানত (এপ্রিল, ১৫৩৮) করার পর শের আসিয়া শঠতার বলে রোটাসের অভেদ্য পার্বত্য দুর্গ অধিকার করেন; সেখানে তাঁহার পরিবারবর্গের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়।

মামুদ শাহ্ পলায়ন করিয়া হুমায়ুনের শিবিরে আসিয়া উপনীত হন। চুনার জয়ের পর হুমায়ুন দ্রুতগতিতে বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং (সাহেবগঞ্জের নিকটবর্তী) তেলিয়াগঢ়ীর পথ দিয়া আসিয়া প্রবেশ করেন গৌড় নগরে। এদিকে বীরভূম ও ঝাড়খণ্ড হইয়া অপর এক পথে বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রত্যাগত শের আসিয়া উপনীত হন রোটাসে। হুমায়ুন নয় মাসকাল গৌড় নগরে আমোদ-প্রমোদে কাটাইয়া দেন। সেই অবসরে শের আসিয়া অধিকার করেন বারাণসী, এবং জৌনপুর অবরোধ করিয়া একেবারে কনৌজ অবধি সমগ্র ভূভাগ পর্যুদস্ত করিয়া ফেলেন।

এইরূপ অবস্থায় হুমায়ুনকে বাধ্য হইয়াই বাঙ্গালাদেশ ছাড়িয়া বাহির হইতে হইল। তিনি গঙ্গার উত্তর-তীর ধরিয়াই অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু এক অলীক মর্যাদাবোধের বশবর্তী হইয়া দক্ষিণ-তীরে আসিয়া উপনীত হন। শের তখন রোটাসের পাহাড়পর্বত হইতে বহির্গত হইয়া পড়েন। প্রায় দুইমাস কাল ধরিয়া উভয় পক্ষে কেবলই খণ্ডযুদ্ধ হইতে থাকে। জনৈক ঐতিহাসিক যথার্থই বলিয়াছেন, "হুমায়ুনের তখন যেরূপ পরিস্থিতি তাহাতে সাধারণ অবস্থায় তিনি ভ্রাতাদের নিকট এবং তাঁহার রাজধানীর চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে সাহায্যের প্রত্যাশা করিতে পারিতেন। কিন্তু কোনদিক হইতেই তাঁহার প্রতি সান্ত্বনার আলোকপাত হইল না। ত্বরিতগতি সহায়তার স্থলে দেখা দিতে লাগিল অযথা কালক্ষেপ, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসহানি। হিন্দাল স্বক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। কামরান আগ্রা অবধি অগ্রসর হইয়াও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তাঁহার ভাগ্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন। সকলেরই যাহাতে সুবিধা হয় সেদিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া তিনি স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থার মধ্যে শের সন্ধির কথাবার্তা উত্থাপন করেন। তাঁহার শর্ত হইল চুনার দুর্গ ও উহার পূর্বদিকস্থ ভূখণ্ড তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এইভাবে মোগলদের অন্তর হইতে আশু বিপদের আশঙ্কা দূরীভূত করিয়া, ১৫৩৯ সালের ২৭শে জুন প্রত্যুষের মনোরম আবহাওয়ায় অকস্মাৎ শের মোগল শিবির আক্রমণ করিয়া বসিলেন। বক্সারের নিকট চৌসার এই যুদ্ধে হুমায়ুনের সৈন্যবল বিনষ্ট হইল। শেরের হস্তে তাঁহার বেগম পর্যন্ত বন্দিনী হইয়া পড়িলেন, তবে নিজে তিনি পলায়ন করিতে সমর্থ হন। বঙ্গ ও বিহারের সহিত এবার জৌনপুরও শেরের হস্তগত হইল। তাঁহার দিক্‌চক্রবালের

পরিধি-বিস্তার ঘটিল। ১৫৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি রাজমুকুট ধারণ করিলেন।

পর বৎসরের প্রথমভাগেই হুমায়ুন নিজের হৃত প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারের আয়োজন করেন। ১৫৪০ সালের ১৭ই মে (গঙ্গাতীরে) হরদই নামক স্থানে এক চূড়ান্ত সংগ্রাম হয়। ইহা সাধারণতঃ কনৌজের যুদ্ধ নামেই পরিচিত। মোগল-বাহিনীর সৈন্যবল ছিল ৪০,০০০-এর মতো। এই সন্ধিক্ষণে কামরান তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কোনও উপকারেই লাগিলেন না। বাস্তবিক কী যে ঘটিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই প্রথম শের বিনা চাতুরীতে যুদ্ধজয় করেন। খওয়াস খাঁ নামে শেরের একজন সহকারী মোগল-বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বভাগের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। শিবিরের অনুচরবর্গকে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয় মোগল-বাহিনীর কেন্দ্রভাগে, ফলে সেখানে ঘটে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা। হুমায়ুনের সারি সারি কামান নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে, কেননা উহার সম্মুখভাগেই আসিয়া ভিড় করিয়াছিল তাঁহার আপন শিবিরের অনুচরবৃন্দ। সৈন্যবাহিনী পরিণত হয় এক বিশৃঙ্খল জনতায়। ছত্রভঙ্গ বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের ভার শের ব্রহ্মজিৎ গৌড় নামে তাঁহার এক সেনাপতির উপর অর্পণ করেন।

হুমায়ুনের পলায়ন: হর্‌দইর এই শোচনীয় পরাজয়ের পর হুমায়ুন পঞ্জাবে আসেন, ভাইদের সাহায্য লাভের জন্য তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তিনি সিন্ধুপ্রদেশে চলিয়া যান। সেখানে অনর্থক ভাক্কর ও সেওয়ান অবরোধে লিপ্ত হইয়া তিনি মূল্যবান সময় নষ্ট করেন। ১৫৪১ সালের গ্রীষ্মকালে ইতিহাসে আকবরের জননী রূপে খ্যাতির অধিকারিণী হামিদা বেগমের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর মাড়বারের অধিপতি মালদেব তাঁহার পক্ষাবলম্বনের আশ্বাস দান করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য মাড়বার অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি যখন আসিয়া উপস্থিত হন তখন মালদেবের আমন্ত্রণের পর বারো মাস কাটিয়া গিয়াছে। অবস্থার পরিবর্তনের ফলে মালদেবকে তখন হুমায়ুনকে তাঁহার রাজ্যে আশ্রয় দান না করিবার জন্য শেরের দাবী মানিয়া লইতে হয়। হুমায়ুন যখন রাজপুতানা হইতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন তখন ১৫৪২ সালের ১৫ই অক্টোবর (১৫৪২ সালের ২৩শে নবেম্বর ?) অমরকোটে আকবরের জন্ম হয়। অতঃপর

হুমায়ুন কান্দাহার অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। আস্‌কারী যখন গজনী হইতে কান্দাহার অভিমুখে অগ্রসর হন, হুমায়ুন তখন পারস্যে পলায়ন করেন। "সম্প্রতি কিছুকাল পূর্বেও নিজেকে তিনি যাহার অধীশ্বর জ্ঞান করিতেন তাহার প্রত্যেকটি ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইতে হইতে এবং ভাইয়ের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনায় একান্ত সন্ত্রস্তচিত্তে তিনি স্থির করেন পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিবেন, এবং শেষ অবধি আসিয়া আত্মসমর্পণ করেন এক অপরিচিতের সংশয়-সমাকুল ও অপরীক্ষিত মহানুভবতার উপর।"

হুমায়ুনের ব্যর্থতার কারণ: ভারতবর্ষে স্বাধিকার রক্ষায় হুমায়ুনের এই যে ব্যর্থতা, ইহার জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিলেন তিনি নিজেই। ঐতিহাসিকগণ বলেন, তাঁহার মধ্যে সাময়িক উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব ছিল না, কিন্তু একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার একান্ত অভাব ছিল। বিজয়লাভের পর তিনি আলস্য ও আমোদ-প্রমোদে অযথা কালহরণ করিয়া সম্পূর্ণ ফললাভে বঞ্চিত হইতেন। তাহা ছাড়া তাঁহার অপ্রচুর সৈন্যবল লইয়া শত্রুদের মূলোচ্ছেদের জন্য কোনরূপ সুষ্ঠু ও ব্যাপক সমর-পরিকল্পনা ব্যতিরেকে তাঁহার পক্ষে এরূপ এক সুবিস্তৃত ও ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না। ধীরস্থির ভাবে সর্বত্র সজাগ দৃষ্টি রাখা তাঁহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাঁহার রণনিপুণ অভিজ্ঞ সেনানীদের অধিকাংশেরই বাঙ্গালা দেশের যুদ্ধে প্রাণ যায়। তাঁহার দিক হইতে সাফল্য অর্জনের অভাব এবং তাঁহার ভ্রাতাদের মধ্যে একতার অভাবের ফলে তাঁহার শিবিরে এবং রাজসভায় সকলের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। বিপক্ষের এই স্বভাবগত দুর্বলতার সুযোগে নিজ অভিপ্রায় সাধনের মতো চাতুর্য ও কর্মদক্ষতা শেরের যথেষ্টই ছিল।

শের শাহের রাজ্যবিস্তার: হুমায়ুনের পলায়নের পর শের শাহ্ হইয়া দাঁড়ান উত্তর-ভারতের অবিসংবাদিত প্রভু। তিনি এমনই শক্তিশালী হইয়া উঠেন যে কামরানকে পঞ্জাব ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টিবিধান করিতে হয়। শের পঞ্জাবে রোটাস দুর্গ নির্মাণ করিয়া মোগলদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য ৫০,০০০ সৈন্য মোতায়েন করেন। সিন্ধুপ্রদেশ এবং মূলতানও অধিকার করা হয়।

বাঙ্গালা দেশে বিদ্রোহের মনোভাব এমনই ওতঃপ্রোত হইয়া গিয়াছিল যে রাজ্যপালের পর রাজ্যপাল পরিবর্তনের দ্বারা কোনরূপ প্রতিকারের আশা ছিল

না। গৌড় (বা লক্ষ্মণাবতী) নগরীর নাম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল "দ্বন্দ্ব-নগরী"। শের বাঙ্গালার সামরিক শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। প্রদেশের সীমারেখা সঙ্কুচিত করিয়া উহাকে উনিশটি সরকারে বিভক্ত করা হয়; বিভিন্ন সরকারের কার্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য একজন 'কাজী ফজিলাৎ' নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে 'হাকীম-ই-বাঙ্গলা' উপাধির পরিবর্তে দান করা হয় 'আমীন-ই-বাঙ্গলা' উপাধি।

মধ্যভারতে দুই বৎসরকাল অবরোধের পর গোয়ালিয়র অধিকৃত হয়। ১৫৪২ সালে মালব বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু (মালবে) রায়সীনের পূরণ মল ছিলেন সামরিক দিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় একটি দুর্গের অধিপতি। চারি মাস ধরিয়া এই দুর্গের অবরোধ চলে। পূরণ মলকে কয়েকটি শর্ত মঞ্জুর করিয়া এইরূপ আশ্বাস দান করা হয় যে তিনি তাঁহার পরিবার-পরিজন ও অনুচরবর্গ লইয়া নিরাপদে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া যাইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল ও পরিবারবর্গ লইয়া তিনি বাহিরে পদার্পণ করিতেই এক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। এই নৃশংস ব্যাপার শের শাহের নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই তাঁহার সৈন্যদলের দাবীর নিকট মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল।

রাজপুতানায় তখন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নরপতি ছিলেন মাড়বারের রাজা মালদেব। তাঁহার সহিত সংগ্রামই ছিল শেরের পক্ষে কঠিনতম সামরিক অভিযান। ১৫৪৪ সালে শের ৮০,০০০ সৈন্য লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু যোধপুরের কিছু পূর্বেই আক্রমণকারী বাহিনীর গতিরোধ করা হয়। একমাস কাল দুই বিপক্ষ বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া থাকে। শের এক দুরূহ সামরিক সমস্যায় নিপতিত হন। কিন্তু সামান্যতম শঠতার আশ্রয় গ্রহণেই রাঠোর বাহিনী স্থানত্যাগ করে। মাড়বারের জনকয়েক রণনেতার জবানীতে শের শাহের নামে একখানি জাল চিঠি তৈয়ারি করিয়া, তাহা যাহাতে মালদেবের হাতে পড়ে সেভাবে রাজপুত-শিবিরে ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা হয়। চিঠি পাইয়া মালদেব বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ করিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করেন। শের অগ্রসর হইতে থাকেন। মালদেব যোধপুর ত্যাগ করিয়া শিওয়ানায় আসিয়া উপনীত হন। রাজপুতানাকে সম্পূর্ণরূপে পদানত করার অভিপ্রায় শেরের ছিল না; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল রণনায়কগণকে রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক ক্ষেত্রের দিক

দিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা। পরবর্তী কালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপর ব্রিটিশদের যে প্রকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, রাজপুতানার উপর তাঁহার কর্তৃত্বও ছিল তদনুরূপ। রাজপুত রণনায়কগণকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য তিনি আজমীর, যোধপুর, আবু পর্বত এবং চিতোরে সৈন্যশিবির স্থাপন করেন।

১৫৫৪ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কালঞ্জর দুর্গ আক্রমণের সময় এক দুর্ঘটনায় শের মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুর্গ অধিকৃত হয়।

শের শাহের শাসন-ব্যবস্থা: রাজপদ সম্বন্ধে এক নূতন মতবাদ লইয়া বাবর এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। স্বাতন্ত্র্যভোগী নরপতিদের উপর সুলতান রূপে আধিপত্য করার বাসনা তাঁহার ছিল না, তৈমুর-বংশের ঈশ্বর-প্রদত্ত অধিকারের বলে বাদশাহ্ পদ লাভ করাই ছিল তাঁহার দাবী। "রাজপদ সম্বন্ধে মোগলদের এই অভিনব আদর্শ সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল তাহা তাঁহারা নিজেরা গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই, শের শাহ্ই না জানিয়া তাহা তাঁহাদের জন্য গড়িয়া রাখিয়া যান।"

তুর্ক-আফগানদের স্থপতিরা হিন্দু মন্দিরসমূহের শীর্ষভাগ ধ্বংস করিয়া সেখানে গম্বুজ ও অর্ধচক্রাকার আয়তনাদির সমাবেশে যেভাবে মসজিদ নির্মাণ করিত, তাঁহারাও সেইভাবে ঊর্ধ্বভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নদেশ অবধি প্রসারিত এক শাসনসংস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। শেরের কর্মজীবন শুরু হইয়াছিল সাসারামের "জবরদস্ত শিকদার" রূপে; তিনি নিম্নদেশ হইতে তাঁহার গঠনকার্য আরম্ভ করেন। তবে তিনি নববিধানের প্রবর্তক ছিলেন না। এ কথা বলিলে অনৈতিহাসিক উক্তি করা হইবে যে, তিনি পূর্বতন সুলতানদের অপরিজ্ঞাত 'পরগণা' (কতিপয় গ্রামের সমষ্টি) নামক সংস্থা সৃষ্টি করিয়া যান। তবে তিনি যখন তাঁহার পিতার জায়গীর তদারকের ভার গ্রহণ করেন তখন যাহা তাঁহার হাতের কাছেই ছিল তাহাতে তিনি নবজীবনের সঞ্চার করেন। প্রত্যেক পরগণায় তিনি নিয়োগ করেন একজন 'আমিন', একজন 'শিকদার', একজন 'খাজাঞ্চী', এবং হিন্দী লিখিবার জন্য একজন আর ফারসি লিখিবার জন্য আর-একজন, এই দুইজন করিয়া 'কারকুন'। কয়েকটি পরগণার সমবায়ে গঠিত হইল এক-একটি 'সরকার'; 'সরকারে'র কার্যকলাপ তত্ত্বাবধানের ভার রহিল একজন 'শিকদার-

ই-শিকদারান' এবং একজন 'মুনসিফ-ই-মুনসিফানে'র উপর। শের শাহের সাম্রাজ্যে ৪৭টি সরকার ছিল।

সর্বত্র একই পদ্ধতিতে জমি জরিপের ব্যবস্থা হয়, পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেকটি ভূমিখণ্ডের পরিমাপ হয়, রাজসরকারের দাবী ধার্য হয় উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ। শের শাহ্ কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবহারের জন্য সাধারণভাবে জমি জরিপ করার আদেশ দান করেন। ইহাতে নূতন জোতজমা ধার্য করার ভিত্তি তাঁহার অধিগত হয়। তবে তাঁহার এই জরিপের কাজ খুব যে সন্তোষজনক হইয়াছিল তাহা মনে হয় না, কেননা তাঁহার রাজত্বকাল এরূপ কার্য সম্পাদনের পক্ষে ছিল যার-পর-নাই সংক্ষিপ্ত। প্রজাদের নগদ টাকায় অথবা উৎপন্ন শস্যের ভাগে রাজস্ব প্রদানের স্বাধীনতা দান করা হইয়াছিল। যাহাতে এ সব বিষয়ে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে কিংবা কোনরূপ অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে না পারে, সেজন্য কবুলিয়ত ও পাট্টা তৈয়ারির ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এই দুই রকমের কাগজে ব্যক্তিবিশেষের নিকট রাজ-সরকারের প্রাপ্য কী এবং নিজের জমির উপর তাহারই বা কী কী অধিকার, এ সব বিষয় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকিত। ভূমি-রাজস্ব ছাড়া আরও দুইটি কর ছিল। তাহা হইল জরিপের খরচ আর রাজস্ব-সংগ্রাহকের দক্ষিণা। শেরের কর্মপন্থা ছিল জায়গীর-প্রথার বিরোধী, তবে সুর বংশের রাজত্বকালে জায়গীর মঞ্জুর করার প্রথা অব্যাহতই থাকে। তাহা ছাড়া তিনি ওয়াকৃফ জমি মঞ্জুরের প্রথাও যথাসম্ভব হ্রাস করেন।

মুদ্রা-সংস্কারও শেরের অপর একটি কীর্তি। তিনি প্রচুর রৌপ্যমুদ্রা বাহির করেন ; উহার মুদ্রামান কার্যতঃ পরবর্তীকালের টাকার সমানই ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি কয়েকটি অপ্রীতিকর শুল্ক রহিত করেন। সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত পথঘাট নির্মাণও তাঁহার আর-এক কীর্তি ; কথিত আছে, পথিকদের জন্য তিনি না কি সরাই বা বিশ্রামাগারই নির্মাণ করেন ১,২০০। তিনি ডাকচৌকি ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। আরক্ষা-ব্যবস্থারও পুনর্গঠন সাধিত হয় ; নিজ নিজ এলাকায় শান্তিরক্ষা এবং দুষ্কৃতকারীদের সন্ধানের ভার অর্পণ করা হয় গ্রামের মোড়লদের উপর। প্রজারা যাহাতে অবিলম্বে ন্যায়বিচার লাভ করে সে চেষ্টাও করা হয়।

শের শাহ এক বিপুল স্থায়ী বাহিনী পোষণ করিতেন ; তাহাতে অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল ১,৫০,০০০, পদাতিক ছিল ২৫,০০০, আর রণহস্তী ছিল ৫,০০০।

আলা-উদ্দীন কর্তৃক প্রবর্তিত বিধান অনুসারে তিনিও সরকারী অশ্ব চিহ্নিত করিতেন ; তাঁহার নথিপত্রের মধ্যে বেতনভুক কর্মচারীদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিবরণও রক্ষিত হইত। তাঁহার অধীনে জনকয়েক হিন্দু গুরুদায়িত্বের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অধস্তন হিন্দু সহযোগীদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন ব্রহ্মজিৎ গৌড় ; চৌসা ও কনৌজের যুদ্ধের পর তাঁহার উপর হুমায়ুনের পশ্চাদ্ধাবনের ভার দেওয়া হইয়াছিল।

ললিত কলা ঃ দিল্লীতে শেরের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালের মধ্যেই ঘটে এক অভিনব স্থাপত্যরীতির প্রবর্তন। কিলা-ই-কুহ্না মসজিদ নামে শের শাহের রাজকীয় ভজনাগারটি সুরুচির পরিচয় বহন করিতেছে। পার্সি ব্রাউন বলেন, "শের শাহের দুর্গাবাসে যে স্থপতিশ্রেষ্ঠ এই অপূর্ব ক্ষুদ্র মসজিদটি নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই প্রতিভাকে আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে নির্মিত বহু কীর্তির উৎসস্বরূপ জ্ঞান করা যাইতে পারে।" স্থাপত্যশিল্পে শেরের সুরুচি-জ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়াছে সাসারামে তাঁহার মহত্ত্বাবোদ্দীপক সমাধিমন্দিরে। "পিরামিডের ন্যায় ইহার গম্বুজ—সূর্যাস্তকালে আকাশপটে যাহা দর্শন করিলে মনে হয় তাহা স্মৃতিপটে অক্ষয় করিয়া রাখিবার উপযুক্ত বস্তুই বটে—ইহাতে প্রতিফলিত সূক্ষ্মভাবে সুবিন্যস্ত আয়তনের বোধ, ইহার ক্রমহ্রস্বায়মান স্তরবিন্যাসের অনুপাত, বর্গ হইতে অষ্টভুজ এবং অষ্টভুজ হইতে বৃত্তে পরিণতির সাম্যভাব, ইহার প্রত্যেকটি অংশের সারল্য, বিস্তার ও সমতা, সব কিছু একত্র হইয়া অন্তরে এক সুগভীর সৌন্দর্যরসের সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষের গর্ব করিবার মতো অনন্য-সাধারণ সৌন্দর্যপ্রভায় মণ্ডিত সমাধিমন্দির কতকগুলিই রহিয়াছে, কিন্তু সাসারামে দ্বীপমধ্যে অবস্থিত শের শাহের এই ধূসরবর্ণ ও ধ্যানগম্ভীর সমাধিমন্দিরটিই সম্ভবতঃ সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী।"

শের শাহের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ শের শাহ্ ছিলেন একজন সুচতুর দিগ্বিজয়ী এবং সুবিজ্ঞ শাসক। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের সময় আমাদিগকে দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, তাঁহার রাজত্বকাল ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, মাত্র প্রায় পাঁচ বৎসরেই পর্যবসিত। এই সামান্য সময়ের মধ্যে তিনি প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত জয় করিয়া একটি উন্নত শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া রাখিয়া যান। দ্বিতীয়তঃ, শের শাহ্‌কে একমাত্র আপন শক্তিমত্তার উপর নির্ভর করিয়াই যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইয়াছে ; আফগানদের ঐক্যবদ্ধ পৃষ্ঠপোষকতা তিনি

লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি যে ক্ষমতার শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা মোগলদের বিরুদ্ধে আফগানদের মনোনীত নেতৃপুরুষ রূপে নয়। মোগলদের দুর্বলতা সত্ত্বেও একজন সামান্য জায়গীরদারের অবহেলিত পুত্রের পক্ষে একটি সাম্রাজ্য স্থাপন সহজ ব্যাপার ছিল না।

হিন্দুদের সঙ্গে ব্যবহারে শের শাহের রাজত্বকালে এক নূতন নীতির আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়; আকবর তাহারই পরিপুষ্টি সাধন করেন। তিনি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সহিষ্ণু ছিলেন, সাম্রাজ্য সৃষ্টি এবং সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদনে হিন্দু-প্রতিভাকে কার্যে নিয়োগের উপযুক্ত প্রজ্ঞা তাঁহার ছিল। তিনি সজ্ঞানেই ফিরোজ তুঘলুক ও সিকান্দর লোদী কর্তৃক সৃষ্ট ঐতিহ্যের কোনরূপ আমল দেন নাই।

শের শাহের বংশধরগণ: শের শাহের পর সিংহাসন লাভ করেন তাঁহার পুত্র জালাল খাঁ; জালালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদিলকে ওমরাহ্‌গণ উপযুক্ত বিবেচনা করেন নাই। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জালাল ইসলাম শাহ্ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি খওয়াস খাঁ ও হৈবৎ নিয়াজীর ন্যায় বিদ্রোহী ওমরাহ্‌গণকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন। খক্করদের শক্তি বিচূর্ণ করা হয় এবং কাশ্মীর সীমান্তে মানকোট দুর্গের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। নয় বৎসর রাজত্বের পর ১৫৫৪ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইসলামের পুত্র ফিরোজ সিংহাসনে আরোহণের সময় ছিলেন বারো বৎসরের বালক মাত্র। শের শাহের ভ্রাতা নিজাম খাঁ স্থরের পুত্র মুবারিজ খাঁ ছিলেন ফিরোজের পিতৃব্য; তিনি ফিরোজকে হত্যা করিয়া মহম্মদ আদিল শাহ্ নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ইহাতে স্বভাবতঃই স্থর বংশের অন্যান্য সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। ইব্রাহিম খাঁ স্থর তাঁহাকে দিল্লী হইতে বিতাড়িত করিয়া উহা অধিকারে সমর্থ হন। আদিল আসিয়া উপনীত হন চুনারে। আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী দাবীদার হইয়া দাঁড়ান আদিলের শ্যালক (ভগ্নীপতি?) ও পঞ্জাবের রাজ্যপাল আহ্‌মদ খাঁ স্থর। তিনি সিকান্দর শাহ্ উপাধি গ্রহণ করেন। বাঙ্গালার রাজ্যপাল মহম্মদ খাঁ স্থরও বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করেন। কিছুকাল পরে (আগ্রার নিকটে) ফারাহ্ নামক স্থানে সিকান্দরের হস্তে ইব্রাহিম খাঁর পরাজয় ঘটে।

হুমায়ুনের পুনরায় রাজ্যলাভ: আফগানদের মধ্যে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে হুমায়ুনের পক্ষে ভারত আক্রমণ সম্ভবপর হয়। পারস্যরাজকে

কান্দাহার প্রত্যর্পণের শর্তে প্রবাসকালে তিনি আফগানিস্তান জয়ে পারসিক বাহিনীর সহায়তা লাভে সমর্থ হন। ১৫৪৫ সালে তিনি কান্দাহার ও কাবুল জয় করেন। তারপর পারস্যরাজের হস্তে কান্দাহার সমর্পণ করিলেও, সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র তিনি কান্দাহার কাড়িয়া লইতে দ্বিধা করেন নাই। কাবুল জয়ের পর কামরানকে অন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিছুকাল পরে বদখ্শান জয় করিতে গিয়া হুমায়ুন অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসেন। ১৫৫৪ সালের নবেম্বর মাসে তিনি ভারত আক্রমণ করেন। ১৫৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোর অধিকৃত হয়। (পঞ্জাবের অন্তর্গত) মচ্ছিওয়ারায় সিকান্দরের বাহিনীর সম্পূর্ণ পরাভব ঘটে; তারপর সিরহিন্দে বৈরাম খাঁর নেতৃত্বে মোগলদের নিকট তিনি পুনরায় পরাভূত হইয়া পঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে বিতাড়িত হন। ১৫৫৫ সালের জুলাই মাসে দিল্লী ও আগ্রা অধিকৃত হয়।

ইত্যবসরে আদিলের হিন্দু সেনাপতি হিমু কাল্পি এবং খানুয়ার সন্নিকটে ইব্রাহিম সুরকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন; তাহা ছাড়া কাল্পি হইতে ২০ মাইল দূরে ছাপরঘাটা নামক স্থানে তিনি মহম্মদ খাঁ সুরকেও পরাজিত ও নিহত করেন। ফলে তখন রঙ্গমঞ্চে বিদ্যমান থাকেন কেবল দুইজন শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বী —হুমায়ুন এবং আদিল শাহ্। ১৫৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে হুমায়ুনও মৃত্যুমুখে পতিত হন; আফগানদের বিধ্বস্ত করার দায়িত্বভার আসিয়া পড়ে তাঁহার বালক-পুত্র আকবর ও আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁর উপর।

সুর বংশের বংশতালিকা
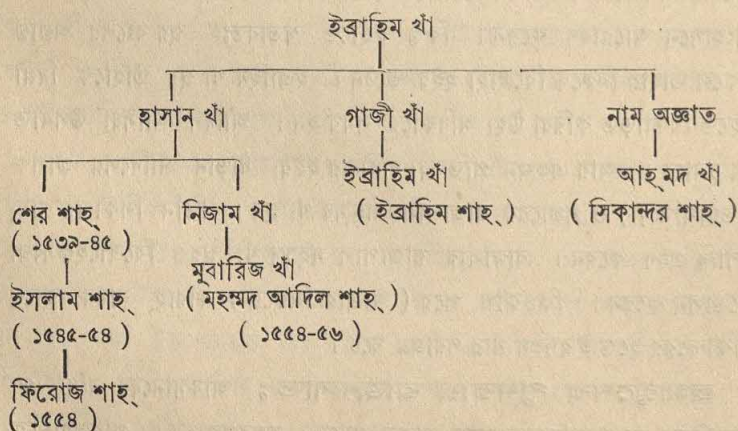
সপ্তদশ অধ্যায়

আকবর

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্য বিস্তার

সিংহাসন লাভ (১৫৫৬): ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর, রবিবার, আকবরের জন্ম হয়। ভি. এ. স্মিথ যে ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে নবেম্বর আকবরের জন্মতারিখ রূপে নির্দেশ করিয়াছেন তাহার একমাত্র কারণ জৌহর নামে জনৈক সমসাময়িক লেখকের বিবৃতি; কিন্তু সমসাময়িক লেখক-লেখিকাদের মধ্যে অপর কেহই—বিশেষতঃ গুলবদন বেগম ও আবুল ফজল—এই মতবাদ সমর্থন করেন না। সিরহিন্দে হুমায়ুনের বিজয়লাভের পর, ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জুন, আকবরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হয়। সেই বৎসরই (১৫৫৫) নবেম্বর মাসে বৈরাম খাঁ'র অভিভাবকত্বে তিনি পঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মহম্মদ হাকিম নামে আকবরের দুই বৎসরের ছোট এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন; তাঁহাকে নিয়োগ করা হয় কাবুলের শাসনকর্তার পদে, তবে তাঁহার হইয়া মুনিম খাঁ'ই শাসনকার্য নির্বাহ করিতে থাকেন। হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ বৈরাম খাঁ ও আকবরের নিকট আসিয়া পৌঁছিলে, পঞ্জাবে কলনৌর নামক স্থানে এক উদ্যানবাটিকায় আনুষ্ঠানিক ভাবে আকবরকে সিংহাসনে অভিষেক করা হয় (১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৫৫৬)। এই অনুষ্ঠানের ফলে সিংহাসনের উপর কেবল তাঁহার দাবীই ঘোষণা করা হইল, কেননা কার্যতঃ কর্তৃত্ব লাভের পূর্বে আকবরকে হিমুর সহিত শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হয়।

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬): মহম্মদ আদিল শাহের আফগান প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিতাড়িত করার পর হিমু ৫০,০০০ অশ্বারোহী, ১,০০০ হস্তী এবং ৫১টি কামান লইয়া গঠিত এক বিপুল বাহিনীর পুরোভাগে, পথিমধ্যে

সকল বাধাবিঘ্ন ছিন্নভিন্ন করিতে করিতে, দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তুঘলুকাবাদে দিল্লীর মোগল শাসনকর্তা তর্দি বেগ খাঁর পরাভব ঘটিল। আকবর ও বৈরাম খাঁ অবিলম্বে দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইতে না-হইতেই তাঁহাদের হাতে আসিয়া পড়িল হিমুর কামানের সারি; মোগল বাহিনী তখনও বহুদূরে রহিয়াছে—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া হিমু সৈন্যদলের পূর্বেই তাহা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই প্রাথমিক সাফল্যের পর মোগল বাহিনী আসিয়া পাণিপথের প্রান্তরে ব্যূহ রচনা করিয়া দাঁড়াইল। মোগল বাহিনীতে প্রকৃত যোদ্ধার সংখ্যা ছিল ১০,০০০। ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের ৫ই নবেম্বর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথমদিকে হিমুর হস্তীগুলির বারংবার প্রবল আক্রমণে মোগল অশ্ববাহিনী বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবার উপক্রম দেখা দেয়। তখন মূল বাহিনী হইতে একদল সৈন্যকে সরাইয়া আনিয়া হিমুর পার্শ্বভাগ আক্রমণে নিয়োজিত করা হইল; ফলে হিমুর সৈন্যদলে দেখা দিল খানিকটা বিশৃঙ্খলা। মোগল তীরন্দাজদের শরনিক্ষেপে মারাত্মক ফল ফলিতে লাগিল। যুগপৎ চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া হিমু দুর্বল হইয়া পড়িলেন। অকস্মাৎ একটি তীর আসিয়া তাঁহাকে বিঁধিয়া ফেলিল; তাঁহার সেনাদল ব্যূহ ভাঙ্গিয়া বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিতে লাগিল। শোনা যায়, আহত ও মূর্ছিত হিমুকে বালক-রাজার নিকট লইয়া আসা হইলে, বৈরাম তাঁহাকে বধ করিতে বলেন; কিন্তু আকবর মূর্ছিত শত্রুকে আঘাত করিতে অস্বীকৃত হন। বৈরাম খাঁ তখন স্বহস্তেই তরবারির আঘাতে হিমুর মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলেন। আবুল ফজল, নিজাম-উদ্দীন, বদাউনী, জাহাঙ্গীর (তাঁহার আত্মকাহিনীতে), এমন কি বৈরাম খাঁ'র পুত্র আব্দুল রহমান খান খানান পর্যন্ত এই কাহিনী সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভি. এ. স্মিথ এই সমবেত সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়া বলেন আকবরই এই নৃশংস কাণ্ড সাধন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মোগল তীরন্দাজদের শরচালনার কৌশলই সেদিন পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করে। মোগলদের জয়লাভে দিল্লীর আধিপত্য লইয়া আফগান ও মোগলদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতারও চির-অবসান ঘটে।

হিমু: প্রথম জীবনে হিমু রেওয়ারীতে গন্ধকের দোকান করিতেন। ইসলাম শাহের নজরে পড়ায় তাঁহার উন্নতির পথ খুলিয়া যায়। আদিল শাহের সেনাপতি ও প্রধান পরামর্শদাতা রূপে তিনি শক্তিশালী প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে

বারকয়েক জয়লাভ করেন। হিমু যে তাঁহার কর্মজীবনে কখনও নিজেকে স্বাধীন নরপতিরূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। হিমুর নিজস্ব নামাঙ্কিত মুদ্রা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। আবুল ফজল স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন যে, "দূরদর্শিতাবশতঃ তিনি আদিল শাহের নামমাত্র সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেন এবং তাঁহার প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতেন।" এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, হিমু আকবরের একজন সামান্য প্রতিপক্ষ ছিলেন না; তাঁহার বীরত্ব, বিপদের সম্মুখীন হওয়ার মতো মনোবল এবং দুরূহ কার্য সাধনের উপযোগী পরিকল্পনা সৃষ্টির ক্ষমতা, সবই ছিল।

সুর বংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান: হিমুর মৃত্যুর পর মোগল-শক্তির অভ্যুদয়ে সুর বংশের প্রতিকূলাচরণ লইয়া আকবর ও বৈরাম খাঁকে বিশেষ উদ্বেগ ভোগ করিতে হয় নাই। সিকান্দর সুর শিবালিক পর্বতাঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি গিয়া আশ্রয় লন মালকোটের দুর্গে। মোগলরা তাহা অবরোধ করে। ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে মে দুর্গটি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। সিকান্দর তাঁহার পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ মোগল শিবিরে প্রেরণ করিয়া সদ্ভাবে বসবাস করিতে স্বীকৃত হন; বিহারে তাঁহাকে একটি জায়গীর প্রদান করা হয়। দুই বৎসর পরে বঙ্গদেশে আশ্রয়ার্থী রূপে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। হিমুর প্রভু আদিল শাহ বঙ্গদেশে মহম্মদ খাঁ সুরের পুত্র খিজর খাঁর বিদ্রোহের জন্য তাঁহার সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের অভিযানে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিহারে তিনি পরাভূত ও নিহত হন। আদিল শাহের পুত্র শের খাঁ ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে বৈরাম খাঁর বিদ্রোহকালে মাথা তুলিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু জৌনপুরে খাঁ জমানের হাতে তাঁহার পরাভব ঘটে। ইহার পর তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। বৎসর কয়েক পরে উড়িষ্যায় পলাতক অবস্থায় ইব্রাহিম সুর মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইভাবে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের অনতিকালের মধ্যেই আফগানদের আশাভরসা সম্পূর্ণ নির্মূল হইয়া যায়।

বৈরাম খাঁ: বৈরাম খাঁ ছিলেন একজন তুর্কোম্যান (অর্থাৎ মধ্য-এশিয়ার তাতারজাতির একটি শাখার অন্তর্গত)। প্রথমে তিনি ছিলেন পারস্যের অধিপতির একজন প্রজা। শাহ ইসমাইল বাবরকে সমরকন্দ ও

বোখারা জয়ে সাহায্যের জন্য যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন, তিনি আসেন সেই বাহিনীর সঙ্গে। পারসিক বাহিনী ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসিলে, তিনি বাবর ও হুমায়ুনের অধীনেই কাজ করিতে থাকেন। হুমায়ুনের বঙ্গদেশে অভিযানের সময় তিনি তাহাতে বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন; একবার বাদশাহী ফৌজের অগ্রগামী দল তাঁহারই কৃতিত্ব ও বীর্যবত্তার ফলে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পায়। কনৌজের যুদ্ধের পর তিনি পলায়ন করেন বটে, কিন্তু অনতিকাল পরেই শের শাহের হস্তে বন্দী হন। শের শাহ তখন এই সুদক্ষ তরুণ সেনানীকে স্বপক্ষে আনয়নের চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রকৃত অনুরাগের পরিবর্তন সম্ভবপর নয়—বৈরামের মুখে এ কথা শুনিয়া তাঁহাকে সে চেষ্টায় বিরত হইতে হয়। ইহার পর বৈরাম পুনরায় পলায়ন করিয়া সিন্ধুদেশে গিয়া হুমায়ুনের সহিত মিলিত হন। হুমায়ুন পারস্যদেশে পলায়ন করিলে, স্বভাবতঃই বৈরাম তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা হইয়া উঠেন। কান্দাহার এবং সিরহিন্দে হুমায়ুনের সাফল্যলাভের মূলে তাঁহার এই বিশ্বস্ত সেবকের প্রচুর কৃতিত্ব ছিল। তিনি যে শেষ অবধি তাঁহাকে আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত করিবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না।

আকবরের অভিভাবকরূপে বৈরাম এক বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হন। তাঁহার অধীনস্থ ক্ষুদ্র বাহিনীর শৃঙ্খলা ও মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে কয়েকটি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়; শাহ আবুল-মালি নামে জনৈক বিদ্রোহী ওমরাহ্‌কে তিনি কারাদণ্ড প্রদান করেন, এবং হিমুকে প্রতিরোধ করিতে গিয়া অশোভন দৌর্বল্য প্রদর্শনের অপরাধে মোগল সেনাপতি তর্দি বেগের প্রাণদণ্ড বিধান করেন। এই সব কঠোর ব্যবস্থার ফলে "চাঘতাই সেনানীদের প্রত্যেকেই, নিজেকে অন্ততঃ কায়কোবাদ ও কায়কাউসের সমকক্ষ জ্ঞান করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইলেও, এখন একথা বুঝিতে বাধ্য হইলেন যে বৈরাম খাঁর নির্দেশ পালন এবং নির্বিচারে তাঁহার কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া চলা প্রয়োজন।" কাবুলে প্রত্যাবর্তনের পক্ষে ভীরু ব্যক্তিদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া হিমুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে সৈন্যদলের অন্তর হইতে পরাভব-শঙ্কা দূর করিবার অভিপ্রায়ে তিনি এক উদ্দীপ্ত ভাষণ দান করেন; রণক্ষেত্রেও তিনি অর্জন করেন অবিসংবাদী সাফল্য।

কিন্তু মোগলদের বিপদের আশঙ্কা দূরীভূত হইলে পর বৈরামের চরিত্রেও নাকি পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি হুমায়ুনের ভগ্নীর কন্যা সলীমা বেগমের পাণিগ্রহণ করিয়া রাজ-পরিবারের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া তিনি অনেকেরই বিরাগভাজন ছিলেন ; ১৫৫৮-৫৯ খ্রীস্টাব্দে শেখ গদাই নামে একজন শিয়াকে 'সদর-উস-সদর' (আইন-বিভাগীয় কর্মচারীদের অধ্যক্ষ এবং ধর্মকার্য ও জনহিতকর অনুষ্ঠানের জন্য ভূদান-কার্যের নিয়ন্তা) নিযুক্ত করিয়া তিনি এক মারাত্মক ভুল করেন। নৈষ্ঠিক সুন্নীদের মধ্যে ইহার ফলে ঘোর অসন্তোষ দেখা দেয়। ইতিপূর্বেই তর্দি বেগ ও শাহ আবুল-মালির বন্ধুবান্ধব এবং ভক্তদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। শোনা যায়, তাঁহার অহেতুক ঔদ্ধত্য এবং অবিবেচনাপ্রসূত নানারূপ মন্তব্যের ফলে অনেকেই তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৈরামের আচরণ দরবারের অনেকের কাছে অসহ্য স্বৈরাচার বলিয়া প্রতিভাত হইত ; ফলে দরবারে তাঁহার বিরুদ্ধে গড়িয়া উঠিয়াছিল একটি বিশেষ শক্তিশালী দল। আকবর ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দে অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করেন। বৈরাম তাঁহাকে হাতখরচের টাকা পর্যন্ত মঞ্জুর করিতে পরাঙ্মুখ হন ; ফলে আকবরের কাছেও বৈরামের কঠোর শাসন অসহ্য হইয়া উঠিতে থাকে। এরূপ অবস্থায় আকবরের জননী হামিদা বানু বেগম, তাঁহার ধাত্রীমাতা মহম অনগ, ধাত্রীপুত্র আধম খাঁ এবং ধাত্রীমাতার এক আত্মীয় দিল্লীর শাসনকর্তা শিহাব-উদ্দীন প্রভৃতি যাঁহারা সর্বদাই আকবরকে ঘিরিয়া থাকিতেন তাঁহাদের পক্ষে বালক সম্রাটকে অভিভাবকের বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য উত্তেজিত করিয়া তুলিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দে আকবর বৈরাম খাঁকে মক্কা যাইতে অনুরোধ করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, তিনি স্বহস্তেই শাসনভার গ্রহণ করিতে চাহেন। বৈরাম তাহাতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু 'তাঁহাকে যথাশীঘ্র সম্ভব তাড়াহুড়া করিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দিবার জন্য' পাঠানো হইল উদ্ধত স্বভাবের দোষে ইতিপূর্বে বৈরাম কর্তৃকই পদচ্যুত পীর মহম্মদ শেরওয়ানী নামে এক ভুঁইফোড়কে। পীর মহম্মদের তাড়াহুড়ার জ্বালায় অপমান বোধ করিয়া বৈরাম বিদ্রোহ করিলেন। জলন্ধরের নিকট তাঁহার পরাভব ঘটিল ; তিনি বন্দী হইলেন। কিন্তু আকবর তাঁহার অপরাধ মার্জনা করিয়া, তাঁহাকে যথাযোগ্য পদমর্যাদার সঙ্গে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিবার অনুমতি দান করিলেন। মক্কার পথে গুজরাটে বৈরাম এক আফগানের হাতে নিহত হন (১৫৬১)। তাঁহার

শিশুপুত্র আব্দুর রহিমকে দরবারে লইয়া আসা হয় ; বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠিলে তাহাকে উন্নীত করা হয় খান খানান পদে।

শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা (১৫৬০-৬২): কর্ণধারকে ত্যাগ করা হইল বটে, কিন্তু আকবরের তখনও শাসনতরীর হাল ধরিয়া সৈন্য-বাহিনীকে সংযত রাখা এবং রাজকার্য পরিচালনা করার মতো বয়স হয় নাই। বৈরাম খাঁর অভ্যুদয়ের ফলে তাঁহার অন্তরে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, রাজ্যের যাবতীয় কর্তৃত্বভার কোন-একজন সর্বশক্তিমান উজীরের হাতে অর্পণ করা উচিত নয়। শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবার জন্য কাবুল হইতে মুনিম খাঁকে তলব করিয়া পাঠানো হইল। পীর মহম্মদ আর আধম খাঁ বাহির হইলেন মালব অভিযানে। মাহম অনগ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। তবে আকবরও যে রাজকার্যে কিছু কিছু অংশ গ্রহণ না করিতেন তাহা নয়। কাবুল হইতে শামস-উদ্দীন মহম্মদ খাঁ আৎগা নামে শাসনবিভাগের একজন অভিজ্ঞ কর্মচারীকে আনাইয়া তিনি তাঁহাকে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে হইলেও, দৃঢ়তা সহকারে তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন। আধম খাঁকে তিনি মালব হইতে তলব করিয়া পাঠাইলেন, সে স্থানে নিয়োগ করিলেন আবদুল্লা খাঁ উজবেগকে ; আধম খাঁ কর্তৃক যখন শামস-উদ্দীন আৎগার হত্যাকাণ্ড সাধিত হইল তখন তাঁহার প্রাণ লইলেন। ১৫৬০-৬২ : এই সময়টিকে 'প্রমীলার রাজত্বকাল' (Petticoat Government) নামে বর্ণনা করা হয়। আকবরের অনভিজ্ঞতা, মুনিম খাঁর দুর্বলতা এবং মাহম অনগ ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনদের উপর আকবরের যে বিশ্বাস ছিল সেজন্য মাহম অনগ অবশ্য প্রচুর প্রভাব বিস্তার করিতেন ; কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত বন্ধু ছিলেন না। এই কয় বৎসরের কু-শাসনের মূল কারণ ছিল বৈরাম খাঁর স্থলে একজন উপযুক্ত সচিবের অভাব। ১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে আকবরের শিক্ষানবিশীর কাল উত্তীর্ণ হইয়া যায় ; নিজেই তিনি কর্মপন্থা নির্ধারণ ও শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ; এই সময় হইতেই মন্ত্রীরা তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যে পরিণত হইয়া যান।

প্রথমদিকে রাজ্যবিস্তার (১৫৫৮-৬২): আকবরের চরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া একজন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, তিনি ছিলেন "এমনই এক দুর্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী যে তাঁহার সূর্যের ন্যায় অমিত তেজের সম্মুখে লর্ড

ডালহৌসির মৃদু তারকাদ্যুতি নিষ্প্রভ হইয়া যায়।" তাঁহার দিগ্বিজয়-স্পৃহা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই ; ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে নিঃসংশয়ে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি বলিতেন, "রাজা নিরন্তর দিগ্বিজয়ে সচেষ্ট থাকিবেন, অন্যথায় তাঁহার প্রতিবেশীরা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে উৎসাহ বোধ করেন।" ইহা অবশ্য ছিল রাজকীয় উচ্চাভিলাষ মাত্র। তিনি যে পথ নির্দেশ করিয়া যান, তাঁহার উত্তরাধিকারীরা একাগ্রচিত্তে তাহাই অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকেন ; ফলে ঔরঙ্গজেবের আমলে মোগল সাম্রাজ্যের চরম বিস্তার সাধিত হয়।

বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বের সময়েই হিন্দুস্থানে হৃত মোগল-রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধনের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল ; তখন একে একে গোয়ালিয়র, আজমীঢ় এবং জৌনপুর পুনরধিকৃত হয়। ইহার ফলে দিল্লী ও আগ্রার পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডে আকবরের রাজ্যের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় হইয়া উঠে। ১৫৬০-৬১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মালব বিজয় সম্পূর্ণতা লাভ করে। বাজ বাহাদুর সারঙ্গপুরের নিকট সুলতান উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ; পীর মহম্মদ শেরওয়ানীর সহায়তায় আধম খাঁ তাঁহাকে পরাভূত করিতে সক্ষম হন। আধম খাঁর পদচ্যুতির পর পীর মহম্মদের হাতে অর্পণ করা হয় সেই অসম্পূর্ণ ভাবে বিজিত প্রদেশের শাসনভার। একবার বাজ বাহাদুরের পশ্চাদ্ধাবন করিবার সময় তিনি জলে ডুবিয়া মারা যান। তখন তাঁহার স্থলে প্রেরণ করা হয় আবদুল্লা খাঁ উজবেগকে। তিনি বাজ বাহাদুরের বহিষ্কার সাধন করেন। অবশ্য ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে বাজ বাহাদুরকে বশ্যতা-স্বীকারে বাধ্য করা যায় নাই।

১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে অম্বরের (জয়পুরের) রাজা বিহারী মল বিনা যুদ্ধে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁহাকে দেওয়া হয় এক পাঁচ হাজারী মনসব ; তাঁহার পুত্র ভগবানদাস এবং পৌত্র মান সিংহ মোগল-বাহিনীতে যোগদান করেন। মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন ও স্থায়িত্ব সম্পাদনে ভগবানদাস ও মান সিংহ উভয়েই বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং শাহী পরিবারের সঙ্গে এইরূপ ঘনিষ্ঠতার ফলেই অম্বরের ন্যায় একটি অখ্যাত রাজ্য রাজপুতানায় একটি বিশিষ্ট গৌরবের স্থান অধিকারে সমর্থ হয়।

গোন্দোয়ানা জয় (১৫৬৪)ঃ ইহার পর আকবর গোন্দোয়ানা জয় করেন। পূর্বাঞ্চলের প্রদেশপাল ছিলেন আসফ খাঁ ; রাণী

দুর্গাবতীকে আক্রমণের জন্য তাঁহাকে আদেশ দান করা হয়। রাণী দুর্গাবতী তাঁহার নাবালক পুত্র বীরনারায়ণের অভিভাবিকা রূপে গোন্দ অঞ্চলের গড় কটঙ্গা (মধ্যপ্রদেশের উত্তরাঞ্চল) রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি রাজপুত-কুলের উপযুক্ত শৌর্যবীর্য সহকারে আক্রমণকারীকে প্রবল বাধা দান করেন ; কিন্তু গড় ও মণ্ডলের (জব্বলপুর জেলায়) মধ্যবর্তী স্থানে উভয় পক্ষের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে শত্রুপক্ষের বিপুল বাহিনীর আক্রমণে তিনি পর্যুদস্ত হইয়া যান। যখন তিনি দেখিলেন পরাজয় সুনিশ্চিত তখন স্বহস্তে বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র বীরনারায়ণও চৌরাগড় দুর্গ রক্ষার চেষ্টায় যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দেন। পুরমহিলারা জহরব্রত উদ্‌যাপন করিয়া জ্বলন্ত চিতানলে আত্মাহুতি দান করেন।

চিতোর অবরোধ (১৫৬৭-৬৮) : আকবরের সুপ্রসিদ্ধ অভিযান, চিতোর অবরোধ ও অধিকার, আরম্ভ হয় ১৫৬৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। চিতোরের রাণা ছিলেন সংগ্রাম সিংহের পুত্র উদয় সিংহ। শোনা যায় তিনি বাজ বাহাদুর এবং আর একজন বিদ্রোহী সামন্ত নারোয়ারের সর্দারকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সামরিক দৃষ্টিতে উত্তর-ভারতের সম্রাটের পক্ষে রাজপুতানার বন্ধনরজ্জুস্বরূপ মাড়ওয়ার রাজ্যের মেরতা (ইহা পূর্বেই অধিকৃত হইয়াছিল), মেওয়ার রাজ্যের চিতোর এবং বুন্দী রাজ্যের রণথম্ভোর অধিকার করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। আকবরের চিতোর অবরোধ স্থায়ী হয় চারি মাস কাল। মেওয়ারের দুর্ভাগ্যক্রমে উদয় সিংহের বলবীর্য বলিতে কিছুই ছিল না ; জয়মল রাঠোর ও পত্তা, এই দুইজনের উপর চিতোর রক্ষার ভার দিয়া তিনি দূরে এক বনপ্রদেশে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। জয়মল ও পত্তা অনমনীয় দৃঢ়তার সহিত বাধাদান করিতে লাগিলেন। চিতোর অবরোধে আকবর যথেষ্ট ধৈর্য ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। এই কাজে তিনটি জিনিসের ব্যবহার হয়—এক দীর্ঘ ও গভীর খাত (সবৎ), কারিগরদের জন্য এমন রক্ষাবেষ্টনী যাহা স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায় (তুরাহ্), এবং প্রাকারচূড়া যাহাতে দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকে এরূপ সুউচ্চ মঞ্চ (সিবা)। অবরোধ আরও বহুদিন স্থায়ী হইবারই সম্ভাবনা ছিল ; কিন্তু দৈবাৎ আকবরের অদৃষ্টে স্বহস্তে জয়মলকে গুলি করিয়া বধ করার এক মহাসুযোগ জুটিয়া যায়। ফলে রক্ষিবাহিনী হতোদ্যম হইয়া পড়ে। পুরমহিলারা জহরব্রত করিয়া চিতানলে

প্রাণ বিসর্জন দেন। সম্মুখসমরে রণশয্যা গ্রহণ করেন রাজপুত বীরের দল। এই দুর্দমনীয় প্রতিরোধে আকবর দারুণ রোষে এমনই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সে কাজে কেবল সহায়তা করার অপরাধে যোদ্ধা নয় এরূপ অসংখ্য লোকের তিনি প্রাণনাশ করেন। ইহার পূর্বেও আলাউদ্দীন খলজী এবং গুজরাটের বাহাদুর শাহের হাতে চিতোরের পতন ঘটিয়াছিল; সুতরাং সামরিক কীর্তি হিসাবে কেবল চিতোর অধিকার এমন কিছু অনন্যসাধারণ ব্যাপার ছিল না। তাহা ছাড়া রাজধানী অধিকার করিলেও, তিনি রাজ্যটিকে সম্পূর্ণভাবে স্ববশে আনয়ন করিতে পারিলেন না।

রাজপুত-নীতি: রণথম্ভোরের পতন ঘটে ১৫৬৯ খ্রীস্টাব্দে। তখন বুন্দী রাজ্যের সহিত যে সন্ধি স্থাপিত হয় তাহা হইতেই আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি রাজপুতদের তুষ্টিবিধান করিয়া তাহাদের স্বপক্ষে আনয়নের জন্য আকবর কিরূপ ব্যগ্র ছিলেন, তাহাদের প্রতি আচরণে কোন্ কর্মপন্থাই বা তিনি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। টড তাঁহার 'ইতিবৃত্তে' বলিয়াছেন অম্বরের (জয়পুরের) রাজার মধ্যস্থতায় বুন্দীর সহিত এক সন্ধি স্থাপিত হয়। সেটির শর্তগুলি ছিল এইরূপ :—(১) বুন্দীর সামন্তগণ মোগল হারেমে কন্যা প্রেরণের ন্যায় রাজপুতজাতির পক্ষে অবমাননাকর প্রথা হইতে মুক্ত থাকিবেন। (২) জিজিয়া কর প্রদানের দায় হইতে তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দান করা হইবে। (৩) তাঁহাদিগকে আটক শহর অতিক্রম করিতে বাধ্য করা হইবে না। (৪) নওরোজ উৎসবে যে বাজার বসে সেখানে কোন দোকান খুলিবার জন্য তাঁহাদের কাহারও পত্নী অথবা অপর কোন আত্মীয়াকে প্রেরণ করিতে হইবে না। (৫) দেওয়ান-ই-আমে সম্পূর্ণ সশস্ত্র অবস্থায় তাঁহাদের প্রবেশাধিকার থাকিবে। (৬) তাঁহাদের মন্দিরাদির মর্যাদা রক্ষিত হইবে। (৭) তাঁহাদিগকে কখনও কোন হিন্দু নেতার অধীনে কাজ করিতে আদেশ দেওয়া হইবে না। (৮) তাঁহাদের অশ্বসমূহ শাহী দাগে চিহ্নিত করা হইবে না। (৯) তাঁহারা লাল দরওয়াজা অবধি নিজেদের দামামা বাজাইতে বাজাইতে যাইতে পারিবেন।

মেবার কখনও আকবরের বশ্যতা স্বীকার না করিলেও, এবং উদয় সিংহের পুত্র প্রতাপ সিংহ তাঁহাকে প্রবল বাধা দান করিলেও, কার্যতঃ মোগল সম্রাটই ছিলেন রাজপুতানার সর্বাধিনায়ক; রাজপুত সামন্তদের প্রায় সকলেই মোগল সাম্রাজ্যের এক-একজন মনসবদার হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। রাজপুতরাই হইয়

দাঁড়ান বাদশাহের সবচেয়ে ভক্ত সেনার দল। মোগল অশ্বারোহী বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠীর সৈনিকদের লইয়াই গঠিত হইত। আকবরের চরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া টড বলিয়াছেন, তিনিই "প্রথম রাজপুত-জাতির স্বাধীনতা হরণে সাফল্য লাভ করেন ; এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে তাঁহার বিবিধ গুণ বিশেষ সহায়ক হইয়া উঠিয়াছিল, কেননা মানবচরিত্র বিশ্লেষণে এবং মানুষের অন্তরে উদ্যম ও উৎসাহ সঞ্চারে তাঁহার নৈপুণ্যবশতঃ তিনি তাহাদিগকে স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হন।" ঠিক এইখানেই ছিল আলাউদ্দীন খলজী ও শের শাহের রাজপুতদের প্রতি অনুসৃত কর্মপন্থা হইতে আকবরের এই কর্মপন্থার পার্থক্য।

গুজরাট জয় (১৫৭২-৭৩)ঃ ১৫৬৯ খ্রীস্টাব্দে কালঞ্জরের আত্মসমর্পণের পর আকবর পশ্চিম এবং পূর্বদিকে আরও অধিক দূর অবধি রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশের অবকাশ লাভ করিলেন। তাঁহার পরবর্তী প্রচেষ্টা হইল গুজরাট অধিকার। তাঁহার পিতাই তাহা জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার হস্তচ্যুতও হইয়া পড়ে। গুজরাটে তখন অরাজক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। ৩য় মুজঃফর শাহ কেবল নামেমাত্র স্থলতান ছিলেন ; পরস্পর বিবদমান সামন্তদের শাসনে রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না ; ইঁহাদেরই একজন আকবরকে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন। ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দের নবেম্বর মাসে আকবর আসিয়া উপনীত হন আহম্মদাবাদের সন্নিকটে ; ৩য় মুজঃফর শাহ বশ্যতা স্বীকার করেন ; সিংহাসনের বিনিময়ে তাঁহাকে বৃত্তি দান করা হয়। ইহার পর আকবর স্থরাটের দিকে অগ্রসর হন, এবং পথিমধ্যে সর্নল নামক স্থানে এক তুমুল খণ্ডযুদ্ধে অসামান্য ব্যক্তিগত বীর্যবত্তা প্রদর্শন করেন। ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে স্থরাট নগর আত্মসমর্পণ করিলে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। কাম্বে শহরে পোর্তুগীজদের সঙ্গে এক সন্ধি হয় ; তাহার ফলে মক্কাযাত্রিগণ নিরাপদে যাতায়াতের অধিকার লাভ করেন। বিজিত প্রদেশ শাসনের বিধিব্যবস্থা স্থির করার পর আকবর রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন ; সে সময় তাঁহার রাজধানী ছিল ফতেপুর সিক্রি।

কিন্তু অচিরেই সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল যে পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে ; বিদ্রোহে নায়কত্ব করিতেছেন মীর্জা পদবীতে ভূষিত জনকয়েক দুর্দমনীয়স্বভাব মোগল রাজকুমার। বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সহিত অভিযানের আয়োজন করিয়া, ঝঞ্ঝামদমত্ত বেগে আকবর বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইলেন ; ৬০০ মাইল দূরে

আহম্মদাবাদ শহরে আসিয়া পৌঁছিতে তাঁহার লাগিল মাত্র নয় দিন। মাত্র ৩,০০০-এর মতো সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র দল লইয়া আহম্মদাবাদের ২০,০০০ সৈন্যের বিদ্রোহী বাহিনীকে তিনি বীরদর্পে আক্রমণ করিলেন। নূতন সৈন্যদলের প্রতীক্ষায় কালহরণ না করিয়া, ক্ষিপ্ত শার্দূলের তেজে তিনি বিদ্রোহী বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বিদ্রোহী দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, আকবর জয়লাভ করিলেন (সেপ্টেম্বর, ১৫৭৩)। আকবরের এই দ্বিতীয়বার গুজরাট অভিযানকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যত যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে তন্মধ্যে ক্ষিপ্রতম অভিযানরূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দের এই বিজয়লাভ সম্পূর্ণরূপে ফলপ্রসূ হইয়াছিল। গুজরাট জয়ের ফলে কেবল যে সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি সাধনই হইল তাহা নয়, ইহার ফলে সমুদ্র-গমনের পথ উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় বণিকদের সহিতও সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটিল।

বঙ্গ (১৫৭৪-৭৬) ও উড়িষ্যা (১৫৯২) বিজয়: ইহার পর আকবর বঙ্গদেশ জয় করেন। স্থর বংশের পতনের পর ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদেশের আধিপত্য লাভ করেন আফগান নায়ক স্থলেমান কররানী। ১৫৬৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি রোটাস অবরোধ করেন; কিন্তু দুর্গরক্ষায় সাহায্যের জন্য আকবর একদল সৈন্য প্রেরণ করিলে, অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া বঙ্গদেশে সরিয়া পড়াই তাঁহার নিকট যুক্তিযুক্ত কাজ মনে হয়। তা' ছাড়া নানারূপ মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া, আনুষ্ঠানিক ভাবে আকবরের বশ্যতা স্বীকারও করেন তিনি। গৌড় হইতে তিনি রাজধানী তুলিয়া আনেন তণ্ডা শহরে। উড়িষ্যার হিন্দুরাজ্যও তিনি জয় করেন। ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বায়াজিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁহারও মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দায়ূদ রাজপদ অধিকার করিয়া স্বনামে 'খুৎবা' উপাসনা পাঠের আদেশ জারি করেন এবং স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করিতে থাকেন। ইহাই হইল মোগল সম্রাটের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইঙ্গিত। তা' ছাড়া আকবর যখন গুজরাটে ছিলেন তখন তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া প্রত্যন্তভাগের কয়েকটি সৈন্যাবাস অধিকার করার ফলে তিনি আকবরের রোষের উদ্রেকও করিয়াছিলেন।

বর্ষাকাল ভারতবর্ষে যুদ্ধবিগ্রহের সময় নয়; তবুও ১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দে বর্ষার মধ্যেই আকবর গঙ্গানদী দিয়া নৌ-অভিযানে অগ্রসর হইলেন। পাটনা ও হাজীপুর

হইতে দায়ুদের বহিষ্কার সাধন করা হইল। সেনাপতি মুনিম খাঁ এবং তাঁহার সহকারী রূপে কাজ করিবার জন্য রাজা তোড়ল মলের উপর যুদ্ধ চালাইবার ভার দিয়া তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। ঘনঘোর বর্ষার মধ্যে আকবরের পাটনা অধিকার ছিল প্রায় এক অভূতপূর্ব সামরিক কীর্তি। ইহার পর মুনিম খাঁ দ্রুতগতিতে একে একে মুঙ্গের, ভাগলপুর, কোলগাঁও এবং তেলিয়াগড়ী গিরিপথ কাড়িয়া লইলেন। তারপর তিনি আসিয়া প্রবেশ করিলেন তণ্ডা শহরে। দায়ুদ উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে বালেশ্বর জেলার তুকারয় নামক স্থানে এক তুমুল সংগ্রাম হইল। দায়ুদ পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। রাজা তোড়ল মলের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া দায়ুদের পক্ষে কতকগুলি সুবিধাজনক শর্তেই সন্ধি করিতে রাজি হইয়া গেলেন মুনিম খাঁ; উড়িষ্যার উপরও দায়ুদেরই অধিকার রহিয়া গেল। কিন্তু সামান্য কয়েক মাসের মধ্যেই দায়ুদ পুনরায় অস্ত্রধারণ করিলেন। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে রাজমহলের যুদ্ধে শাহী সৈন্যদলের হাতে তাঁহার পরাজয় ও মৃত্যু ঘটিল। এইভাবে যদিও বঙ্গদেশ আনুষ্ঠানিক ভাবে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়া পড়িল, তবুও বহুকাল যাবৎ জনকয়েক শক্তিশালী সামন্ত কার্যতঃ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে (ঢাকা-মৈমনসিংহের) ঈশা খাঁ, (ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের) কেদার রায় এবং (যশোহরের) প্রতাপাদিত্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৫৯২ খ্রীস্টাব্দে উড়িষ্যা অধিকৃত হয়।

রাণা প্রতাপ সিংহ (১৫৭২-৯৭): চিতোর অধিকার এবং প্রায় যাবতীয় রাজপুত-রাজ্যের বশ্যতা স্বীকারের পরও রাজপুতানা লইয়া আকবরকে বিশেষ বিব্রত থাকিতে হয়। ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে সংগ্রাম সিংহের পৌত্র ও উদয় সিংহের পুত্র প্রতাপ সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং তখন হইতেই আরম্ভ হয় মোগলের বিরুদ্ধে তাঁহার স্মরণীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম। মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর এবং বুন্দীর রাজারা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু, টডের অননুকরণীয় ভাষায়, "একমাত্র আত্মবলে বলীয়ান থাকিয়া, শতাব্দী-কালের এক-চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া তিনি প্রতিরোধ করিতে থাকেন সাম্রাজ্যের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা; কখনও তিনি আসিয়া বিধ্বস্ত করিতেন সমভূমি, কখনও বা পলায়ন করিতেন পর্বত হইতে পর্বতান্তরে; তাঁহার জন্মভূমির পার্বত্য ফলমূলই

ছিল তাঁহার পরিবারের ভক্ষ্যবস্তু ; তাঁহার সেই বীর্যবত্তা ও প্রতিশোধগ্রহণস্পৃহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী রূপে শিশুপুত্র বীর অমরকে মানুষ করিয়া তোলেন তিনি হিংস্র পশুকুল এবং প্রায় সেইরূপই হিংস্র মনুষ্যকুলের সাহচর্যে।" ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে জুন মাসে আকবরের বিশ্বস্ত সেনাপতি মান সিংহের হাতে হলদিঘাট বা গোগুণ্ডার যুদ্ধে প্রতাপের ঘটে এক নিদারুণ পরাজয়। তাঁহার সুরক্ষিত স্থানগুলি একে একে মোগলদের করায়ত্ত হইয়া পড়ে, তবুও তিনি পার্বত্য অঞ্চল হইতে সেই বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে মেবারের উর্বর ভূখণ্ডগুলি হইয়া পড়িল 'বে-চিরাগ', নিষ্প্রদীপ। অবশেষে চিতোর, আজমীঢ় ও মণ্ডলগড় ব্যতীত মেবার রাজ্যের অন্যান্য সমুদয় অংশের পুনরুদ্ধার সাধন করেন প্রতাপ। ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রতাপের জীবনের শেষভাগে আকবর অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় তাঁহার বিরুদ্ধে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালাইতে পারেন নাই। টড বলেন, প্রতাপের বীরবিক্রম আকবরের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল ; তাই তাঁহার শেষজীবনে শান্তিভঙ্গের প্রয়াস হইতে তিনি বিরত হইয়াছিলেন। কিন্তু আকবরের কর্মপন্থায় এরূপ ভাবপ্রবণতা প্রশ্রয় পাইত না। প্রতাপ তাঁহার চতুর্দিকে মোগল-রাজ্যের দ্বারা এরূপ ভাবে পরিবেষ্টিত ছিলেন যে, আকবর নিজের প্রায় অফুরন্ত বলৈশ্বর্য লইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে এবং অন্যত্র অল্পায়াসসাধ্য বিজয়লাভের চেষ্টা করিতে পারিতেন।

বঙ্গদেশে বিদ্রোহ (১৫৮০-৮৪): ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দে আকবরের ধর্ম ও শাসন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত নব নব বিধান প্রবর্তনের প্রতিবাদস্বরূপ বঙ্গদেশ ও বিহারে মোগল কর্মচারীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। শোনা যায়, জৌনপুরের কাজী এক ফতোয়া জারী করিয়া আকবরের ধর্মনিষ্ঠার অভাবের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সমর্থন করেন। বিদ্রোহীদের সঙ্গে নাকি আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কাবুলের শাসনকর্তা মীর্জা মহম্মদ হাকিমের যোগসাজস ছিল। ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের দিকে রাজা তোড়ল মল, মীর্জা আজিজ কোকা, এবং শাহবাজ খাঁ প্রভৃতি আকবরের কর্মচারীরা বিহার ও বঙ্গের বিদ্রোহ দমনে কৃতকার্য হন।

কাবুল আত্মসাৎ (১৫৮১-৮৫): ১৫৮১ খ্রীস্টাব্দে আকবর নিজেই এক অভিযানের পুরোভাগে কাবুল গমন করেন। লরেন্স বিনিয়ন বলেন, "ঈগলপাখী মশককে যে চক্ষে দেখিয়া থাকে, আকবর তাঁহার ভাইকে

দেখিতেন সেই চক্ষে।" হাকিম কেবল নামেই হিন্দুস্থানের বাদশাহের অধীন ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন স্বাধীন। তিনি ছিলেন দুর্বলচেতা ব্যক্তি, অকর্মণ্য মদ্যপায়ী মাত্র। তবে লোকে সন্দেহ করিত যে, বঙ্গদেশের বিদ্রোহীর দল ছাড়াও, অর্থমন্ত্রী শাহ মনসুরের ন্যায় দরবারের কোন কোন প্রভাবশালী ওমরাহের তাঁহার সহিত যোগসাজস ছিল। ১৫,০০০ অশ্বারোহী লইয়া হাকিম লাহোর অবধি অগ্রসর হইলেন। মান সিংহ তাঁহাকে বাধাদান করেন, ফলে তাঁহাকে কাবুলে ফিরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু ৫০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৫০০ হস্তী লইয়া আকবর তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। পথিমধ্যে শাহ মনসুরকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ১৫৮১ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে আকবর কাবুলে প্রবেশ করেন। তাঁহার আগমনে হাকিম পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিলেন। হাকিমকে কাবুল শাসনের অনুমতি দান করা হয়। তারপর ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দে অত্যধিক মদ্যপানের ফলে হাকিমের মৃত্যু হইলে তাঁহার রাজ্য আকবরের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। মান সিংহ উহার শাসনকার্য পরিচালনার বিধিব্যবস্থা স্থির করিয়া দিয়া আসেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত: কাবুল রাজ্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত করার পর আকবরকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হয়। এই সীমান্ত অঞ্চলটির রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল প্রচুর। কাশ্মীরের পশ্চিম-প্রান্ত হইতে পেশোয়ার, কোহাট ও বান্নু অবধি এবং তারপর দক্ষিণদিকে সিন্ধু-উপত্যকা দিয়া সিন্ধুপ্রদেশের সমুদ্রতট পর্যন্ত রহিয়াছে এক বিশৃঙ্খল ভাবে বিন্যস্ত ভূমিভাগের বিস্তার—বিভিন্ন অপসারী ভূখণ্ড-সমেত উহার মোট দৈর্ঘ্য হইবে প্রায় ১,২০০ মাইল। উত্তরদিকে খাইবার গিরিবর্ত্ম পেশোয়ার উপত্যকাকে সংযুক্ত করিতেছে কাবুলের সঙ্গে; মধ্যভাগে তোচি ও গোমাল গিরিবর্ত্ম দু'টি করিতেছে গজনী ও দক্ষিণ-আফগানিস্থানের সঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকার সংযোগ সাধন; আর এদিকে মুল্লা, বোলান ও গোমাল এই তিনটি গিরিবর্ত্ম দিয়া ঘটিয়াছে কালাত ও কান্দাহারের সঙ্গে সিন্ধুপ্রদেশের সমভূমির সংযোগ। এই সব পথে চলিত আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য। এই দুর্গম সীমান্ত অঞ্চল রক্ষার জন্য ইউসুফজাইদের মতো দুর্ধর্ষ আফগান উপজাতিদের দৃঢ়তা সহকারে বশীভূত রাখা প্রয়োজন ছিল। ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে স্বোয়াট উপত্যকায় মোগল বাহিনী এক বিপর্যয় ভোগ করে। আকবরকে

তখন উপজাতীয় সর্দারদের বৃত্তিদান করিয়া বশে আনিতে হয়। লাহোরে তাঁহার দীর্ঘকাল বাস হইতে মনে হয় তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দৃঢ়তা সম্পাদনে উৎসুক ছিলেন।

উজবেগদের ক্রমবর্ধমান শক্তি আফগানিস্থানে মোগল-শাসনের পক্ষে এক আতঙ্কের বিষয় হইয়া উঠিতেছিল। আবদুল্লা খাঁ নামে একজন উজবেগ সর্দার বদখশানের সর্বময় প্রভু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বাবরের পৌত্রের পক্ষে একজন শক্তিমান উজবেগ নরপতির প্রতি খানিকটা ভয়ভক্তি থাকাই ছিল স্বাভাবিক। কাবুলের অধিপতি রূপে উজবেগদের দমন অথবা মনোজয়ের চেষ্টা না করিয়া তিনি পারিতেন না। আবদুল্লা খাঁ তাঁহার প্রতি মিত্রভাবাপন্ন থাকায় আকবরকে মধ্য-এশিয়ায় আর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া পড়িতে হয় নাই।

কাবুলের নিরাপত্তার জন্য কান্দাহারের উপর আধিপত্য বিস্তারেরও প্রয়োজন ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সামরিক দিক দিয়া কান্দাহারের গুরুত্বও ছিল যথেষ্ট। বৎসর বৎসর ভারতবর্ষ হইতে কান্দাহারের পথ দিয়াই যাইত প্রায় ১৪,০০০ পণ্যবাহী উট। "প্রাচীনকালের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কাবুল ও কান্দাহারকে হিন্দুস্থানের যুগ্মতোরণ জ্ঞান করিতেন, একটি ছিল তুর্কিস্থানের প্রবেশদ্বার, অপরটি পারস্যের।" এই কান্দাহারের দুর্গ ই পশ্চিম হইতে ভারতে আগমনের পথ আর দক্ষিণ হইতে কাবুলে গমনের পথ রক্ষা করিত। "ইহার সামরিক গুরুত্ব এইখানে যে, ইহা হিরাট হইতে মাত্র ৩০০ মাইল পরিমিত এক সমতল ক্ষেত্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন, আর সেই হিরাটের নিকটই সুউচ্চ হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণী শিখর নত করিয়া মধ্য-এশিয়া অথবা পারস্য হইতে আগত আক্রমণকারী বাহিনীর জন্য সহজ পথ খুলিয়া রাখিয়াছে। এরূপ কোন বাহিনীকে কান্দাহারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেই হইবে, অতএব এখানেই যদি তাহার মোড় ফিরাইয়া দেওয়া গেল তো হইল, নতুবা নয়।" যে যুগে কাবুল ছিল দিল্লী সাম্রাজ্যের একটি অংশবিশেষ সে যুগে কান্দাহারের কর্তৃত্ব লইয়া যে পারস্য ও ভারতের অধিপতিদের মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব চলিতে থাকিবে তাহা ছিল একান্তই একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে কান্দাহারের পারসিক শাসনকর্তা বিনা যুদ্ধে উহা আকবরের হস্তে সমর্পণ করেন।

কাশ্মীর অধিকৃত হয় ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে, সিন্ধুপ্রদেশ ১৫৯০-৯১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে, আর ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে অধিকৃত হয় বেলুচিস্থান।

দাক্ষিণাত্য জয়ঃ উত্তর-পশ্চিমে স্বীয় অবস্থার উন্নতিবিধান করিয়া আকবর দাক্ষিণাত্য জয়ে আত্মনিয়োগের অবকাশ লাভ করিলেন। উত্তরভাগ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ভাবই হইয়া দাঁড়াইল দক্ষিণভাগে অগ্রসর হওয়ার যুক্তি। আকবরের রাজত্বকালের শেষভাগে দাক্ষিণাত্যে ছিল পাঁচটি মুসলমান রাজ্য—খান্দেশ, আহম্মদনগর, বিজাপুর, বিদর ও গোলকোণ্ডা। আকবর কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে অবস্থিত ভূভাগ জয়ের চেষ্টা করেন নাই। খান্দেশ, আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার স্থলতানগণ স্বেচ্ছায় দিল্লীর আধিপত্য স্বীকার করিতে সম্মত আছেন কি না তাহা জানিবার জন্য ১৫৯১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহাদের নিকট দূত প্রেরণ করা হইল। দাক্ষিণাত্যের প্রবেশপথে অবস্থিত বিখ্যাত অসিরগড়[১] দুর্গ ছিল খান্দেশের অন্তর্গত ; তাই মোগল শক্তির বিস্তার সাধনের পক্ষে এই চারিটি রাজ্যের মধ্যে খান্দেশের গুরুত্বই ছিল সর্বাধিক। আহম্মদনগর ছিল ঠিক উহার পরবর্তী রাজ্য। খান্দেশের স্থলতান রাজা আলী খাঁ বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হন। কিন্তু আহম্মদনগরের স্থলতান বুরহান-উল-মুল্ক সে প্রস্তাব উপেক্ষা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীকে উত্তরদিক হইতে বাদশাহী ফৌজ এবং দক্ষিণদিক হইতে বিজাপুরের বাহিনী প্রবল আক্রমণ করে। আব্দুর রহিম খান খানান এবং আকবরের মধ্যম পুত্র মুরাদ এই দুই শাহী সেনাপতির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। অবশ্য তাঁহারা আহম্মদনগর অবরোধ করেন (১৫৯৫)। বিপুল বিক্রমে উহার প্রতিরোধ করিতে থাকেন বুরহান-উল-মুল্কের ভগ্নী বিজাপুরের বিধবা মহিষী চাঁদ বিবি। শাহী সেনাপতিগণ তখন প্রস্তাবিত শর্তে সন্ধি স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে বেরার প্রদেশটি বাদশাহকে সমর্পণ করিতে হয়, এবং বাহাদুর নামে বুরহান-উল-মুল্কের এক পৌত্রকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় বাদশাহের অধীন স্থলতান রূপে (১৫৯৬)। কিন্তু আহম্মদনগরের মধ্যে চক্রান্তের ফলে চাঁদ বিবির অপসরণ ঘটে, সন্ধির শর্তভঙ্গও করা হয়। বিজাপুর হইতে আহম্মদনগরের সাহায্যের জন্য আসে একদল সৈন্য। কিন্তু গোদাবরী-তীরে স্থপা নামক স্থানের যুদ্ধে বাদশাহী ফৌজের হাতে সেই সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় ঘটে (১৫৯৭)। ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে যুবরাজ মুরাদের মৃত্যু হয়। আকবর

১ ইহার অবস্থান ছিল সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর একটি লম্বমান শৃঙ্গের উপর ; তদুপরি তিনটি সুদৃঢ় এককেন্দ্রিক প্রাকারের দ্বারা ইহার স্বাভাবিক শক্তির বৃদ্ধিসাধন করা হইয়াছিল।

স্বয়ং বুরহানপুরে আগমন করেন। তাঁহার নির্দেশে আব্দুর রহিম খান খানানকে নবোদ্যমে যুদ্ধকার্যে লিপ্ত হইতে হয়। এইরূপ কোন এক সময়ই
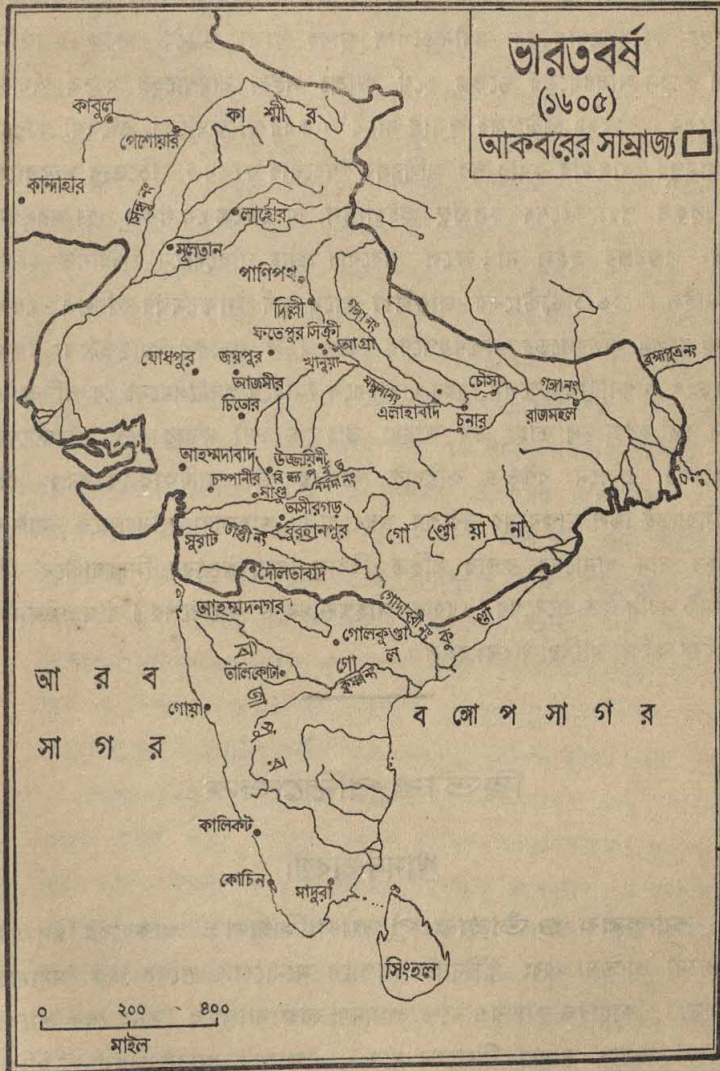
চাঁদ বিবি আততায়ীর হাতে প্রাণ দেন। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে আহম্মদনগরের পতন হয়। তবে সমগ্র আহম্মদনগর রাজ্যটি অধিকার করা

সম্ভবপর হয় নাই। মুর্তাজা নামে এক রাজকুমার উহার এক বৃহৎ অংশে রাজত্ব করিতে থাকেন।

এদিকে আবার খান্দেশের রাজা আলীর পরবর্তী সুলতান মিরন বাহাদুর শাহের কাছে মোগলের অধীনতাপাশ দুঃসহ হইয়া উঠিতে থাকে। তিনি স্থির করেন অসিরগড়ের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় লইয়া বাদশাহের কর্তৃত্ব অমান্য করিবেন। ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে আকবর দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়া বুরহানপুর অধিকার করার পর অসিরগড় অবরোধ করেন। চিতোর অবরোধে যে সকল পন্থা বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল, এ ক্ষেত্রে সে সকল পন্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হইল না; ফলে অবরোধ প্রায় পরিবেষ্টনে পর্যবসিত হইয়া দাঁড়াইল। ১৬০১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দুর্গ আত্মসমর্পণ করিল। কেহ কেহ বলেন অসিরগড়ের আত্মসমর্পণের কারণ ছিল মড়কের প্রাদুর্ভাব। কিন্তু জেসুইৎ মিশনারীগণ বলেন মিরন বাহাদুরকে নির্বিঘ্নে গমনাগমনের যে প্রতিশ্রুতি দান করা হইয়াছিল তাহা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করার পর দুর্গরক্ষীদের উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করিয়াই আকবর উহা অধিকার করেন। এই অসিরগড়ই ছিল আকবরের সর্বশেষ জয়মাল্য। শাহজাদা দানিয়ালকে আব্দুর রহিম খান খানানের কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া, শ্বশুরের নিয়ন্ত্রণাধীনে এই তিনটি নববিজিত প্রদেশের (বেরার, আহম্মদনগর ও খান্দেশের) রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া যাওয়া হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শাসন-ব্যবস্থা

আকবর ও তাঁহার পুরোগামিগণ: আকবরের ছিল এক সংগঠনী প্রতিভা এবং খুঁটিনাটি ব্যাপারে মনোযোগ দানের এক অসামান্য ক্ষমতা। কাহারও কাহারও মতে শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি শের শাহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। পক্ষান্তরে, আবুল ফজল এই বলিয়া শের শাহকে ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, "তিনি (শের শাহ) তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে আলাউদ্দীনের বিধিনির্দেশ পাঠ করিয়া কেবলমাত্র

সেইগুলিরই পুনঃপ্রবর্তনের দ্বারা ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের নিকট সুখ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।" এদিকে আবার ভি. এ. স্মিথ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "অষ্টাদশ শতকের চতুর্থপাদে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় হইতে ভারতের নবগঠিত ইংরেজ কর্তৃপক্ষ আকবরের বিধিনির্দেশের সন্ধানে অতীতের দিকে পথ হাতড়াইতে শুরু করিয়া দেন। ক্রমশঃ তাঁহারা ভূমিরাজস্ব নির্ধারণে নিযুক্ত প্রয়োজনীয় বিভাগটিতে তাঁহারই প্রবর্তিত বিধিবিধানের মূলসূত্রগুলি গ্রহণ করেন। সরকারের এই আমলাতান্ত্রিক কাঠামোয় এখনও তাঁহার হাতের কাজের বিস্তর ছাপ চোখে পড়ে।" বঙ্গদেশের ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে এ কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হেস্টিংসের কেন্দ্রীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিয়া স্যর জন শোর (১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে) যখন জেলাগুলিকেই এক-একটি ভৌমিক সংস্থা রূপে গঠন করেন তখন তাঁহার সে কাজ হইয়া দাঁড়ায় আকবরেরই 'সরকার' সম্পর্কিত ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন মাত্র। এ কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য শুধু ইহাই প্রতিপাদন করা যে, শাসন-ব্যবস্থায় যাঁহারাই সাফল্য অর্জন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সকলেই তাঁহাদের পুরোবর্তিগণের নিকট ঋণী ; আকবর উহার ব্যতিক্রমস্থল ছিলেন না। শের শাহ জমি জরীপ করার যে ব্যবস্থা করিয়া যান তাহা যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন, এবং তিনি যেরূপ ব্যাপক ভাবে পথঘাট নির্মাণ এবং টাঁকশালের শহর স্থাপন করেন, তাহা নিঃসন্দেহে আকবরকে তাঁহার শাসনসংস্থা গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল। তবে এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নাই যে, আকবরের শাসননীতি ও শাসনসংস্থা তাঁহার পুরোবর্তিগণের শাসননীতি ও শাসনসংস্থা হইতে মূলতঃ পৃথক ছিল।

কেন্দ্রীয় সংস্থা : সম্রাট : সমগ্র শাসনসংস্থার মূলাধার অবশ্য ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। বস্তুতঃ মহম্মদ হাকিম সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে গিয়া আবুল ফজল যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন, "বংশমর্যাদা ও ধনসম্পদ এবং চতুষ্পার্শ্বে জনতার সমাবেশই এই পদগৌরব লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়।" আকবরের পরিকল্পনায় আরামপ্রিয় সম্রাটের কোনও স্থান ছিল না। তাঁহাকে কঠোর কর্মময় জীবন যাপন করিতে হইবে। আকবর দৈনিক তিনবার দরবার করিতেন—একবার আম-দরবার, একবার দৈনন্দিন বাঁধাধরা কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য দরবার, তারপর রাত্রে অথবা অপরাহ্নে যে দরবার বসিত তাহাতে কেবল যে ধর্ম-সম্পর্কিত বিষয়েরই আলোচনা হইত তাহাই নয়, রাজনীতি এবং রাজকার্য

পরিচালনা সম্পর্কেও মন্ত্রণা হইত। শাসনকার্যের সকল বিভাগেই এই সব সভার প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। বিচারকার্যের জন্য নির্দিষ্ট থাকিত একটি দিন। কর্মচারীদের নিয়োগ, বেতনবৃদ্ধি, জায়গীর, মনসব, সরকারের দানখয়রাৎ, অর্থপ্রদানের আদেশ, রাজারাজড়া, প্রদেশপাল, বকসী, দেওয়ান, ফৌজদার ও ওমরাহদের মারফৎ প্রেরিত জনসাধারণের আবেদন ইত্যাদি যাবতীয় গুরু বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারই সম্রাটের সম্মুখে পেশ করা হইত। এমন কি সম্রাট যখন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাহির হইতেন, তখনও এই দৈনন্দিন কর্মসূচীর অনুসরণ চলিত।

কেন্দ্রীয় সংস্থা: মন্ত্রিমণ্ডলী: বৈরাম খাঁর নিরঙ্কুশ ভাবে উজীরের ক্ষমতা প্রয়োগ হইতে আকবর সর্বশক্তিমান উজীর নিয়োগ সম্বন্ধে সাবধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। 'ভকীলে'র পদ অবশ্য অক্ষুণ্ণ ছিল, তবে বৈরাম খাঁর পরে আর কোনও ভকীলই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। ভকীল-পদ অব্যাহত ছিল শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রথম পর্ব অবধি। পদটির মানমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, যথার্থ ক্ষমতার বিন্দুবিসর্গও অবশিষ্ট ছিল না।

আকবরের ছিলেন চারিজন মন্ত্রী—(১) 'দেওয়ান', ইহার উপর ন্যস্ত ছিল রাজস্ব ও আয়ব্যয়ের ভার; (২) 'মীর বকসী', ইনি ছিলেন সামরিক বিভাগের অধ্যক্ষ; (৩) 'মীর সামান', অর্থাৎ কলকারখানা আর মালগুদামের প্রধান কর্মসচিব; (৪) এবং 'সদ্‌র-উস-সদ্‌র' বা ধর্ম ও বিচার বিভাগের অধিকর্তা। শোনা যায় ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে 'সদ্‌রে'র পদ তুলিয়া দেওয়া হয়। তবে সমুদয় রাজকার্যের ভার কেবল এই চারিজন মন্ত্রীর উপরই ন্যস্ত ছিল না; পরিষদে অন্যান্য সদস্যও থাকিতেন। দরবারের অন্যান্য কর্মচারীদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের দ্বারাও মন্ত্রীদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল; তা' ছাড়া সর্বোপরি ছিল স্বয়ং সম্রাটের সদাজাগ্রত দৃষ্টি। আকবরের এই চারিজন মন্ত্রীকে বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে তাঁহারা ছিলেন "সাম্রাজ্যের চারিটি স্তম্ভ, তবে তুরস্ক-সাম্রাজ্যের স্তম্ভ-প্রতীকের ন্যায় তাঁহারা শিবিরের ভার ধারণ করিয়া থাকিতেন না, তাঁহারা ছিলেন যেন মোগল তাজের স্তম্ভস্বরূপ, সৌধভার বহনের পরিবর্তে তাঁহারা কেবল উহার গাম্ভীর্য, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতেন মাত্র।"

এই কয়জন মন্ত্রী ছাড়া কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় আরও দুইজন কর্মচারীর

বিশেষ প্রাধান্য ছিল। তাঁহারা ছিলেন 'দারোগা-ই-ঘুসলখানা' এবং 'আরজ-ই-মুকারর'। প্রথমজন করিতেন সম্রাটের খাস কর্মসচিবের কাজ। দ্বিতীয়জনের কাজ ছিল সম্রাটের আদেশ-নির্দেশ সংশোধন করিয়া সম্রাটের অনুমোদনের জন্য তাহা দ্বিতীয়বার তাঁহার নিকট পেশ করা। অন্যান্য অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে আমরা 'দারোগা-ই-ডাকচৌকি' এবং 'মীর আরজ' এই দুইজনের নাম উল্লেখ করিতে পারি। প্রথমজনের উপর ছিল গুপ্তচর-বিভাগের ভার, দ্বিতীয়জন দরখাস্ত সম্পর্কিত ব্যাপারের অধ্যক্ষ ছিলেন।

শাসনকার্য-নির্বাহে নিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রবর্তনে সিদ্ধকাম হন আকবর; ফলে তাঁহার পরবর্তী সম্রাটদের আমলে "জাবিতা নস্ত্" ("ইহা রীতিসিদ্ধ নয়") একটা চলতি কথা আর প্রচলিত রীতিতে দাঁড়াইয়া যায়।

মোগল রাজকার্যে পদমর্যাদা: মনসবদারী প্রথা: মোগল আমলাতন্ত্র ছিল সামরিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উর্ধ্বতন কর্মচারীরা দশ হইতে দশহাজারী মনসবদার রূপে ৩৩-টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। উচ্চতম মনসব কয়টি (১০০০০, ৮০০০, এবং ৭০০০) ছিল তিন রাজকুমারের জন্য সংরক্ষিত। আবুল ফজল নিম্নোক্ত সংখ্যাকয়টির উল্লেখ করিয়াছেন—১০ হইতে ১৫০ জন সৈন্যের নায়ক ১৩৮৮ জন, আর ৫০০০ হইতে ২০০ সৈন্যের নায়ক ৪১২ জন। খুব সম্ভব আকবরের আমলে ২০০-এর নীচের এবং শাহ জাহানের আমলে ৫০০-এর নীচের মনসবদারগণ নিজেদের আমীর বলিয়া পরিচয় দানের অধিকার লাভ করিতেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একই সময়ে একাধিক ব্যক্তি 'আমীর-উল-উমারা' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। যাহা হউক মনসবদারগণ ছিলেন রাজ্যের ওমরাহ শ্রেণীভুক্ত। সামরিক ও অন্যান্য রাজপদ ছিল একই ধরণে সজ্জিত মনসবদারী প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। মনসবদারগণ নিজ নিজ সৈন্য সংগ্রহ করিতেন। যেভাবে শ্রেণী বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা হইতে মনে হয় উহা ছিল কার্যকালে কে সঙ্গে করিয়া কত সৈন্য আনিবেন তাহারই নির্দেশ, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যাইত সৈন্যসংখ্যা উহা হইতে কম পড়িয়াছে। আকবর নির্দিষ্ট সংখ্যা হইতে প্রকৃত সংখ্যার এই পার্থক্য অনুধাবন করিয়া উহা সংশোধনে তৎপর হন। তাঁহার রাজত্বকালের একাদশ বর্ষে 'জাত' ও 'সওয়ার', এই দুইটি শ্রেণীর প্রবর্তন হয়। কোন মনসবদার প্রকৃতপক্ষে কত সৈন্য আনিবেন তাহা 'সওয়ার'-সংখ্যা দ্বারা বুঝাইত, আর

'জাত'-সংখ্যা দ্বারা বুঝাইত ব্যক্তিগত মর্যাদা—'জাত'-সংখ্যা 'সওয়ার'-সংখ্যা হইতে বেশী হইত। পরবর্তী কালে উর্ধ্বতন মনসবদারগণের 'সওয়ার' (অশ্বারোহী) শ্রেণীতে সিহ্‌স্পাহ্ (তিন ঘোড়া), দুয়াস্পাহ্ (দুই ঘোড়া), এবং ইয়াক্‌স্পাহ্ (এক ঘোড়া), এই তিনটি শ্রেণীর প্রচলনের দ্বারা অধিকতর জটিলতার প্রবর্তন ঘটে। "এই তিন শ্রেণী প্রবর্তনের আর্থিক দিক দিয়া সুবিধা হইল এই যে, এক-একজন কর্মচারী (মনসবদার) মাথা-পিছু পাইতেন একটা থোক টাকা, তাহাতে গড়পড়তা একটা নির্দিষ্ট ব্যয়ে তিনি অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন। তিন শ্রেণী প্রবর্তনে যেমন লাভের সম্ভাবনা ছিল, তেমনই ইহা মর্যাদাবৃদ্ধিও করিত। সামরিক দৃষ্টিতে অবশ্য তিন শ্রেণীর অশ্বারোহী সৈন্য ছিল না, ছিল একটিমাত্র শ্রেণীই, পার্থক্য ছিল কেবল হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে।" জাহাঙ্গীরের আমলে, তাঁহার শৈথিল্যবশতঃ, 'সওয়ার'-সংখ্যা পুনরায় এক অলীক সামরিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়; ফলে শাহজাহানকে বিভিন্ন বাহিনীর কার্যকরী সৈন্যসংখ্যা ⅓ বা ¼ অংশে নামাইয়া আনিয়া এবং কর্মচারীদের (মনসবদারদের) বেতন প্রচুর পরিমাণে হ্রাস করিয়া কঠোরহস্তে উহার পুনর্গঠন সাধন করিতে হয়। তাঁহাদের নগদ বেতন অথবা জায়গীর দান করা যাইত। আকবর ভূমিদানের পরিবর্তে নগদ বেতন দিবারই পক্ষপাতী ছিলেন। মোরল্যাণ্ডের হিসাব অনুসারে দেখা যায়, একজন পাঁচহাজারী মনসবদারের মাসিক বেতন ছিল কমপক্ষে ১৮,০০০ টাকা, ৫০০ সৈন্যের নায়ক কমপক্ষে পাইতেন মাসিক ১,০০০ টাকা। মনসবদারদের বেতন এইরূপ অত্যন্ত বেশি ছিল। আকবরের স্থায়ী সৈন্যদল ছোটই ছিল। ব্লকম্যান বলেন, ২৫,০০০-এর বেশি সৈন্য ছিল না; অবশ্য ফাদার মনসেরাটের হিসাবে দেখা যায় ১৫৮১ খ্রীস্টাব্দে আকবরের স্বগঠিত বেতনভুক বাহিনীতে ছিল ৪৫,০০০ অশ্বারোহী, এবং ৫,০০০ হস্তী। সৈন্যবাহিনীর বৃহত্তর ভাগ ছিল মনসবদারদের প্রদত্ত সৈন্যে গঠিত।

মোগল আভিজাত্য ছিল কর্মগত আভিজাত্য। ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে হকিন্স লিখিয়া গিয়াছেন, "মোগল সম্রাটের বিধান এই যে, যখন তাঁহার সাম্রাজ্যের কোন অভিজাত ব্যক্তির মৃত্যু হয় তখন তিনি সেই ব্যক্তির ধনসম্পদ আত্মসাৎ করিয়া, তাঁহার মর্জি মাফিক তাহা মৃতব্যক্তির সন্তানসন্ততিদের দান করিয়া থাকেন, তবে সচরাচর তিনি তাহাদের প্রতি কার্পণ্য প্রদর্শন করেন না।"

'বাইৎ-উল-মাল' নামে একটি নিয়মিত সরকারী বিভাগ ছিল ; সেখানে সংরক্ষিত হইত মৃত ব্যক্তিদের ধনসম্পত্তি। ইহার ফলে অভিজাত ব্যক্তিগণ অমিতব্যয়িতার ফলে অর্থের অপচয় করিতেন। তাহারই জন্য ব্যক্তিগত মূলধন সঞ্চিত হইত না, রাজশক্তিকে সংযত রাখার উপযুক্ত স্বাধীন বংশানুক্রমিক কোন অভিজাত-শ্রেণীও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

যে সব সৈন্যকে রাজকোষ হইতেই বেতন দিয়া মনসবদারদের অধীনে রাখা হইত, তাহাদের বলিত 'দাখিলী' (অনুপূরক)। তা' ছাড়া একদল 'ভদ্র অশ্বারোহী' সৈন্যও ছিল ; তাঁহাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে কর্মে নিয়োগ করা হইত। তাঁহাদের বলিত 'আহাদী'। তাঁহাদিগকে কখনও মনসবদারদের অধীনে কাজ করিতে পাঠানো হইত না। তাঁহারা সর্বদাই কোন-না-কোন নামজাদা ওমরাহের অধীনে কাজ করিতেন, এবং সেই ওমরাহকে সাহায্য করিবার জন্য থাকিতেন পৃথক একজন 'বক্সী'। এক-একজন 'আহাদী' অতি উচ্চহারে বেতন পাইতেন।

রাজস্ব-ব্যবস্থা : আকবরের রাজত্বকালের প্রথমদিকে রাজস্ব সম্পর্কে কতকগুলি পরীক্ষা হয়। তোড়র মলের রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কারের (১৫৮২) পর সমগ্র সাম্রাজ্যে তিনটি প্রধান প্রধান রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রচলন হয় ; সেগুলি এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

(১) 'ঘল্লাবক্‌শ্' বা উৎপন্ন শস্যের অংশ গ্রহণ। এই ব্যবস্থায় যাবতীয় ফসলের একাংশ রাজপ্রাপ্য রূপে ধার্য হইত। এ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল সিন্ধু-প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে এবং কাবুল ও কাশ্মীরের একাংশে।

(২) 'জাব্‌তি' বা তোড়র মলের নামের সহিত বিজড়িত বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা। ইহার প্রচলন ছিল মূলতান হইতে বিহার অবধি এবং রাজপুতানা, মালব ও গুজরাটের নানা অংশে। "এ ব্যবস্থার মূল সূত্র ছিল এক-এক ক্ষেত্রে এক-এক প্রকারের বীজ বপনের ফলে উৎপন্ন ফসলের যে কমবেশি হয় তৎপরিবর্তে উহার নগদ মূল্যের নির্দিষ্ট হার নিরূপণ করিয়া তাহাই রাজস্ব হিসাবে প্রদান করা।" এজন্য প্রত্যেকবার কতখানি জমিতে চাষ হইল তাহা জরীপ করিয়া লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হইত। এ ব্যবস্থা দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভর করিত : হার নিরূপণের তালিকা—ইহাকে বলিত 'দস্তুর', আর উৎপন্ন ফসলের হিসাব তৈয়ারি করা। জমিকে চারিভাগে ভাগ করা হইয়াছিল : 'পোলাজ'

(ক্রমাগত কর্ষিত), 'পরাউতি' (উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য এক কি দুই বৎসর পতিত ফেলিয়া রাখা জমি), 'চাচর' (৩ কি ৪ বৎসর পতিত রাখা), এবং 'বঞ্জর' (৫ বৎসর, কি তাহারও অধিককাল অকর্ষিত)। প্রথম তিন শ্রেণীর জমির প্রত্যেকটি আবার ছিল তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত: উত্তম, মধ্যম, এবং অধম; গড়পড়তা উৎপন্ন ফসলের পরিমাপ হইত এই তিনের মাঝামাঝি উৎপাদনের হিসাবে। কেবলমাত্র যে জমিতে বাস্তবিকই চায করা হইত, তাহারই উপর কর ধার্য হইত। এক-এক প্রকারের ফসল চাষের ক্ষেত-পিছু রাজস্বের হারও ছিল এক-এক প্রকারের, আর হিসাবের সময় চলতি মূল্যের মাঝামাঝি অবস্থা বিবেচনা করিয়া কর ধার্য হইত। রাজস্ব-ব্যবস্থা ছিল রায়তওয়ারী। আকবরের দাবীর হার ছিল এক-তৃতীয়াংশ। চাষের সময় হিসাবনিকাশের কাজ ছিল এক শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল ব্যাপার; উহার ব্যয়ভারও কিয়ৎপরিমাণে চাষীদেরই বহন করিতে হইত সন্দেহ নাই। তবুও এই ব্যবস্থার মস্ত বড় গুণ ছিল এই যে, ইহাতে অযথা দাবীদাওয়ার স্থান ছিল না, রাজস্ব লইয়া জুয়াখেলা চলিত না, অথবা জবরদস্তি ব্যবস্থারও কোনও অবকাশ ছিল না। তবে "আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের অষ্টম বৎসরে যে আদেশ জারি হয় তাহাতে দেখা যায় হিসাবনবিস বৎসর বৎসর একটা থোক টাকার প্রস্তাব করিতেছেন এবং আকবরের পদ্ধতি প্রয়োগ করিতেছেন কেবল তখনই যখন কোন গ্রাম অথবা তদপেক্ষা বৃহত্তর কোন এলাকা তাহাতে সম্মতি দান করিতেছে না। সমগ্রভাবে এক-একটি গ্রাম আরও সরাসরিভাবে হইয়া উঠিতেছে এক-একজন হিসাবনবিসের কৃপা-পরবশ, আর এদিকে ব্যক্তিগতভাবে চাষীরাও কৃপার পাত্র হইয়া উঠিতেছে তাহাদের মধ্যে যাহারা অধিকতর শক্তিশালী তাহাদের কাছে।......আকবরের রাজস্ব-ব্যবস্থায় জমি ভোগ করার জন্য খাজনা বা জমাবন্দির কোনও চিহ্নই ছিল না; তিনি জমি ভোগ করার জন্য রাজস্ব দাবী করিতেন না, রাজস্ব দাবী করিতেন জমি চাষ করার জন্য। আওরঙ্গজেবের আমলেও এই ব্যবস্থাই বলবৎ ছিল, তবে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে এই অনুকল্প ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল যে, কোন চাষী তাহার জমি ভোগের জন্য রাজস্বের পরিবর্তে কর্তৃপক্ষের সম্মতি অনুসারে বার্ষিক নগদ টাকা জমাবন্দি দিবার ব্যবস্থা করিতে পারে।"

(৩) 'নাসক' বা হিসাব। বঙ্গদেশের রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আবুল ফজল

তাঁহার 'আইন-ই-আকবরী'তে লিখিয়াছেন, "সরকার ও চাষীর মধ্যে উৎপন্ন শস্য ভাগাভাগি করিয়া লওয়া এই সুবার রীতি নয়। এখানে শস্য সর্বদাই সুলভ, তাই জমির উৎপাদন নির্ধারিত হয় নাসকের দ্বারা। সম্রাট সহৃদয়তাবশতঃ এই ব্যবস্থাই অনুমোদন করেন।" তোড়র মল বঙ্গদেশে ছিলেন মাত্র দুই বৎসরকাল; সেই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে আফগান বিদ্রোহীদের লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাঁহার এই অবস্থিতি-কাল ব্যাপক ও শ্রমসাধ্য জরীপ-কার্যের পক্ষে খুবই স্বল্প ছিল। তিনি কানুনগোদের হিসাবপত্র সংগ্রহ করিয়া, কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় অনুসন্ধান কার্যের দ্বারা উহার যাথার্থ্য নির্ণয় করেন। এই সব হিসাবপত্র হইতেই তিনি প্রণয়ন করেন এই সুবার রাজস্ব-পঞ্জী। 'নাসকী' ব্যবস্থা জরীপ কার্য অথবা বাৎসরিক উৎপন্ন ফসলের বিবরণের উপর নির্ভর করিত না। উহা ছিল জমিদারী প্রথার অনুরূপ।

প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থাঃ আকবরের সাম্রাজ্য ছিল পনেরোটি 'সুবা'[১] অথবা প্রদেশে বিভক্ত। প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থারই ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র। প্রাদেশিক শাসন-বিভাগের শীর্ষে অবস্থান করিতেন 'সুবাদার' বা 'সিপাহ্‌সালার', সরকারী ভাষায় তাঁহাকে বলিত 'নাজিম'। প্রাদেশিক 'দেওয়ান', 'বকসী', 'কাজী' ও 'সদ্‌র' ছিলেন তাঁহার এক-একজন সহকারী। দেওয়ান ছিলেন রাজস্ববিভাগের কর্তা; তিনি দেওয়ানী মামলার বিচারও করিতেন; অতএব নাজিমের অধস্তন কর্মচারী হইলেও, কার্যতঃ তাঁহার কর্মক্ষেত্রের দ্বারা নাজিমের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধান প্রধান কেন্দ্রে, কতিপয় পরগণার উপর, 'সরকার' নামে আখ্যাত এক-একটি শাসনসংস্থার শীর্ষে থাকিতেন 'ফৌজদার' নামে এক-একজন কর্মচারী; তাঁহাদের কাজ ছিল ফৌজদারী মামলা আর আরক্ষা-বিভাগে (পুলিশবিভাগে) এবং সামরিক ব্যাপারে নাজিমকে সর্বতোভাবে যথাশক্তি সাহায্য করা। এইরূপ ক্ষেত্রবিশেষে 'আমলগুজার' নামে আর একজন কর্মচারী থাকিতেন;

১। (১) বঙ্গদেশ (উড়িষ্যা-সমেত); (২) বিহার; (৩) এলাহাবাদ; (৪) অযোধ্যা; (৫) আগ্রা; (৬) দিল্লী; (৭) আজমীর; (৮) মুলতান (সিন্ধুপ্রদেশ সহ); (৯) লাহোর (কাশ্মীর সহ); (১০) কাবুল; (১১) আহম্মদাবাদ (গুজরাট); (১২) মালব; (১৩) খান্দেশ; (১৪) বেরার; (১৫) আহম্মদনগর।

জাহাঙ্গীরের অধীনে ছিল ১৭-টি সুবা, আওরঙ্গজেবের অধীনে ২১-টি।

তাঁহার কাজ ছিল হিসাবনিকাশ, কর ধার্য এবং কর আদায় করা। বড় বড় শহরে শান্তিরক্ষার ভার ছিল 'কোতোয়াল' অর্থাৎ আরক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষের উপর; আধুনিক পৌরসভার বহু দায়িত্বও তাঁহাকে পালন করিতে হইত। পল্লী অঞ্চলে শান্তিরক্ষা করিতেন 'ফৌজদার'। "জনসাধারণের নিরাপত্তা স্থান হইতে স্থানান্তরে এবং এক সময় হইতে অন্য সময়ে নানারূপ অবস্থার উপর নির্ভর থাকিত।" স্থানীয় কর আদায় হইত উৎপন্ন দ্রব্য ও ব্যবহার্য পদার্থের উপর ধার্য সামান্য সামান্য শুল্ক হইতে; তা' ছাড়া ব্যবসায়, বৃত্তি, পরিবহন প্রভৃতির উপরও ধার্য শুল্ক হইতে স্থানীয় কর সংগৃহীত হইত।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক শাসনযন্ত্রে কর্তৃত্ব বিভাগের দ্বারা এবং সুবাদারের কার্যকাল হ্রাস ও তাঁহাকে প্রায়ই এক স্থান হইতে অন্যত্র বদলি করিয়া প্রাদেশিক শাসনযন্ত্রটিকে আয়ত্তে রাখিতেন। বিভিন্ন প্রদেশে কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে সংবাদদাতাদের মারফৎ তাহা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে জানিয়া কেন্দ্রীয় সরকার সে সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকিতেন। নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর তাঁহাদিগকে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইত। এই সব সংবাদ সম্রাটের নিকট আসিয়া পৌঁছিত 'দারোগা-ই ডাকচৌকি' নামক কর্মচারীর মারফৎ।

বিচার-ব্যবস্থা: বিচার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই ছিল যে, মামলাবাজিতে যাহাতে স্পৃহা না জন্মে তাহাই ছিল সরকারের নীতি; মামলাবাজির কোনরূপ অনুকূল পরিবেশই সৃষ্টি করা হয় নাই। প্রাচীন পল্লীসমাজ ও উহার যাবতীয় হিন্দু সংস্থাই সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল। রাষ্ট্রশক্তি পরগণা, সরকার এবং প্রাদেশিক রাজধানীর বাহিরে বড়-একটা হস্তক্ষেপ করিত না। হিন্দু বিধিনির্দেশের অন্তর্নিহিত ধর্মভাববশতঃ শহর অঞ্চলে পর্যন্ত হিন্দুদের বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি ব্যাপারের নিষ্পত্তি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনুসারেই হইত।

সম্রাটের দরবারে প্রাথমিক মামলা-মোকদ্দমারও বিচার হইত, আবার অপর কোন আদালতের রায় সম্পর্কে আবেদনেরও নিষ্পত্তি হইত। সম্রাটের সম্মুখে আনীত অভিযোগাদি প্রায়ই ছিল ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত বিষয়। প্রাণদণ্ডের আদেশ সকল ক্ষেত্রেই ছিল সম্রাটের অনুমোদন-সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রাদেশিক শাসনকর্তাও সম্রাটেরই ন্যায় অভিযোগাদির বিচার করিতেন;

জেলার ফৌজদারের কাজ ছিল অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করা। তবে অনুসন্ধানের ফলে যদি দেখা যাইত কোন মামলা পড়ে শরীয়তের আওতায়, তবে তাহা পেশ করিতে হইত প্রাদেশিক কাজীর নিকট। রাজনৈতিক অপরাধের বিচার তিনি নিজেই করিতেন, আর রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় পাঠাইয়া দিতেন দেওয়ানের কাছে। ফৌজদারী মামলার রায় সম্পর্কিত ব্যাপার ছিল তাঁহার তত্ত্বাবধানের বিষয়ীভূত। প্রধান কাজীকে নিয়োগ করিতেন সম্রাট স্বয়ং, তিনি আবার সম্রাটের অনুমোদন-সাপেক্ষে নিয়োগ করিতেন অধস্তন কাজীদের। মুফ্‌তীদের কাজ ছিল ইসলামীয় আইন এবং রীতিনীতি ব্যাখ্যা করা ; তবে প্রত্যেক মামলায়ই যে তাঁহাদের নিয়োগ করা হইত তাহা নয়, নিম্নতর শাসন-সংস্থাগুলিতে তাঁহাদের অস্তিত্বের কোনও উল্লেখই পাওয়া যায় না। 'মুহ্‌তাসীব' পুলিশের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারেও বিধিনির্দেশ দান করিতেন। রাজধানীতে এবং সুবায় সুবায় মুহ্‌তাসীব থাকিতেন। কাজীদের কর্মক্ষেত্র কেবল নগরগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না ; ক্ষুদ্রতর স্থানসমূহেও কাজী নিযুক্ত হইতেন। উত্তরাধিকার, বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ বিষয়ক ইসলামীয় আইন সংক্রান্ত বিষয়ের বিচার কাজী ও মুফ্‌তী ব্যতীত আর কাহারও করিবার অধিকার ছিল না ; তবে সাক্ষ্য সম্পর্কিত আইন এবং ফৌজদারী মামলার বিচারে আকবর এইরূপ কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেন যে, কাজীরা কেবলমাত্র সাক্ষীদের জবানবন্দির উপরই নির্ভর করিয়া কাজ করিবেন না, অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদিরও যথাযোগ্য মূল্য দান করিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মমত

আকবরের ধর্মমতের অভিব্যক্তিঃ আকবরের ধর্মমত ধীরে ধীরে অভিব্যক্তির ধারা বাহিয়া বিকশিত হইয়া উঠে। তাঁহার হৃদয় সময় সময় যথার্থ আধ্যাত্মিক সংশয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। বদাউনী তাঁহার গুণগ্রাহী হওয়া তো দূরের কথা, তাঁহার সহৃদয় সমালোচক পর্যন্ত ছিলেন না; তবুও তিনি আমাদের বলিয়া গিয়াছেন যে, সম্রাট "অনেক সময় প্রাতঃকালে ......(ফতেপুর সিক্রিতে) প্রাসাদের অনতিদূরে এক নির্জন স্থানে একাকী বিষণ্ণ হৃদয়ে আবক্ষনতমস্তকে উপাসনায় বসিয়া প্রভাতের স্বর্গীয় শান্তি প্রাণ ভরিয়া গ্রহণ করিতেন।" বাল্যকাল হইতেই আকবর সুফী মতবাদের সংস্পর্শে ছিলেন। তাঁহার রাজপুত মহিষীগণ এবং হিন্দু সভাসদগণের সংস্পর্শের ফলেও ইসলাম ধর্মের বহির্ভূত এক নবীন জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার চেতনার উন্মেষ সাধিত হয়। ভারতবর্ষে তখন আবার ভক্তিধর্মের আন্দোলন এক অভিনব পরিবেশেরও সৃষ্টি করিয়াছিল।

শোনা যায় ১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দ অবধি আকবর নৈষ্ঠিক সুন্নি মুসলমানই ছিলেন। তারপর তিনি আসেন শেখ মুবারক এবং তাঁহার দুই খ্যাতনামা পুত্র ফৈজী ও আবুল ফজলের উদার মতবাদের সংস্পর্শে; তাঁহাদেরই প্রভাবে তিনি যুক্তিবাদী মুসলমান হইয়া উঠেন। ফতেপুর সিক্রিতে তিনি নির্মাণ করেন এক উপাসনা-গৃহ (ইবাদৎখানা); সেখানে মুসলমান, হিন্দু, পার্শি, জৈন, খ্রীস্টান—সকল ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই সমবেত হইয়া ধর্মবিষয়ক তর্কবিতর্কে যোগদান করিতেন। সম্ভবতঃ এই সব তর্কবিতর্ক হইতেই আকবরের চিত্তে এই প্রতীতির উদয় হয় যে, "সকল ধর্মেই আছে আলোক, তবে সকল প্রকারের উপাসনা-পদ্ধতিতেই আলোকের সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়াছে ন্যূনাধিক ছায়ার বিস্তার।"

উলেমাদের অসঙ্গত প্রভাব খর্ব করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আকবর জারি করেন তাঁহার তথাকথিত 'অভ্রান্ততা সম্পর্কিত

আদেশ' (Infallibility Decree) ; উহার বলে তিনি লাভ করেন ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নে চরম মীমাংসা দানের অধিকার। এই আদেশ অথবা দীন-ই-ইলাহী প্রচারের জন্য বদাউনীর এ অভিযোগ সমর্থিত হয় না যে, শেষ বয়সে আকবর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুসলমান প্রজাদের ঐকান্তিক আনুগত্য লাভের বাসনায় প্রণোদিত হইয়াই তিনি এই আদেশ জারি করেন, ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি কোনও পুরোহিত-শ্রেণী সৃষ্টি করিয়া যান নাই। বদাউনী আকবরের ধর্মবিষয়ক কতকগুলি বিধানের সমালোচনা করিয়াছেন ; কিন্তু সে সব বিধান সযত্নে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় সেগুলির সহিত ইসলামের মূলতত্ত্বের কোনও বিরোধ ছিল না।

দীন-ই-ইলাহী ঃ শোনা যায় বিভিন্ন ধর্মের সারতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া আকবর দীন-ই-ইলাহী নামে এক নবধর্মের সৃষ্টি করেন। ১৫৮২-১৬০৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনিই ছিলেন উহার পয়গম্বর। এই দীন-ই-ইলাহীকে 'একেশ্বরবাদী পারসিক হিন্দুধর্ম' রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বদাউনী বলেন, আকবর তাঁহার এই কল্পিত নববিধানে হিন্দুদের গ্রহণ করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন না। দীন-ই-ইলাহীর প্রধান অনুসরণকারীদের তালিকায় মাত্র একজন হিন্দুর নাম পাওয়া যায়—সেটি হইল রাজা বীরবলের নাম। বাস্তবিক তাঁহার নামের উপর কোনরূপ গুরুত্বই আরোপ করা চলে না। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, এই নবধর্মের পশ্চাতে এরূপ কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না যে পরস্পর বিবদমান ধর্মসমূহের মধ্যে ঐক্য বিধানের ফলে বহুকালের বিদ্বেষ-ভাবকে প্রেমের সুবর্ণসূত্রে পরিণত করিয়া সম্রাট তাহাই দেশময় প্রচলিত করিয়া দিবেন। সেরূপ হইলে হিন্দুদের গ্রহণের জন্য সবিশেষ চেষ্টা হইত।

বস্তুতঃ, দীন-ই-ইলাহী লোককে ধর্মান্তরিত করার ধর্ম ছিল না। উহা সীমাবদ্ধ ছিল জনকয়েক নির্বাচিত ব্যক্তির মধ্যে। "ইহা ছিল ইসলামেরই অন্তর্গত সুফী মতবাদবিশেষ ; অনুবর্তী ব্যক্তির অন্তরের উপলব্ধিই ছিল ইহার ভিত্তিস্বরূপ ; যাঁহারা আত্মোন্নতির একটি বিশিষ্ট স্তরে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই ছিল ইহাতে প্রবেশের অধিকার। আকবর ছিলেন সাদী, রূমী, জামী, হাফিজ, ফরিদ-উদ্দীন, শামস্-উদ্দীন প্রভৃতিরই ন্যায় একজন সুফী।" ভি. এ. স্মিথ যে অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, "সমগ্র পরিকল্পনাটি ছিল হাস্যকর

অহমিকার ফল, অসংযত স্বৈরাচারের বিকট পরিণাম," তাহার কারণ হইল বদাউনী এবং যেশুইৎ পুরোহিতদের উপর স্মিথের একান্ত বিশ্বাস এবং কোন স্বৈরাচারীর অন্তরেও যে আত্মজিজ্ঞাসা, বৈরাগ্য, এবং তত্ত্বজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার উদয় হইতে পারে, তাহা ধারণা করিতে তাঁহার নিজেরই অক্ষমতা।

হিন্দুদের প্রতি ব্যবহার: তাঁহার কর্মজীবনের একেবারে প্রথম দিকেই (১৫৬২-৬৪) সবিশেষ মৌলিকতা ও সাহসের সহিত আকবর কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রবর্তন করেন। তাহা হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় হিন্দুদের সহিত ব্যবহারে কিরূপ কর্মপন্থা অনুসরণের ইচ্ছা তিনি অন্তরে পোষণ করিতেন। তিনি হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপর হইতে শুল্ক তুলিয়া দেন, যুদ্ধবন্দীদের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার প্রথা ত্যাগ করিতে আদেশ দান করেন, এবং অ-মুসলমানদের উপর যে জিজিয়া কর ছিল তাহাও রদ করেন। আবুল ফজল বলিয়া গিয়াছেন, তীর্থযাত্রীদের নিকট হইতে যে কর আদায় হইত তাহার পরিমাণ ছিল বহু লক্ষ টাকা। এই সব শুল্ক এবং জিজিয়া কর রদ করার ফলে রাজকোষের প্রচুর ক্ষতি হয়। এই সব সংস্কারকার্যের জন্য যে প্রশংসা তাহা কোনও পরামর্শদাতারই প্রাপ্য নয়। আকবর নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, "আল্লাহ-তাআলার কৃপার ফলেই আমি ১৫৬২-৬৪ সালের মধ্যে কোনও সুযোগ্য মন্ত্রী খুঁজিয়া পাই নাই। নহিলে লোকে ভাবিত আমি যে সব সংস্কার সাধন করিয়াছি সেগুলি তাঁহার দ্বারাই উদ্ভাবিত।"

আকবরের নীতি ছিল সকল ধর্মমত সম্পর্কেই সহিষ্ণুতা অবলম্বন (সুল্‌হ্‌-ই-কুল)। কিন্তু ধর্মনীতির কথা বাদ দিয়াও বলা যায়, সুস্থ সহজাত সংস্কারের বশেই আকবর হিন্দুদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন। রাজা ভগবানদাস, মানসিংহ প্রভৃতির ন্যায় যে সব হিন্দুর সহিত বৈবাহিক সূত্রে তাঁহার কুটুম্বিতা হয় তাঁহাদের সকলেই মোগল অভিজাত সমাজে বিশেষ উচ্চপদ লাভ করেন, রাজকুটুম্ব রূপে তাঁহারা সকলেই যথাযোগ্য মর্যাদার পাত্রও ছিলেন। হিন্দুদের শিক্ষাদীক্ষায়ও উৎসাহ দান করা হইত, হিন্দুদের মন্দিরাদি স্থাপনের অবাধ অধিকার ছিল, হিন্দুদের ধর্মোৎসব বা মেলা চলিত নির্বিবাদে, হিন্দুদের উপর কোনরূপ আর্থিক ভার চাপাইয়া সর্বসমক্ষে তাহাদের হেয় প্রতিপন্ন করার কোনরূপ দুশ্চেষ্টা ছিল না। আকবর বুঝিতেন রাজ্যের সমগ্র জনশক্তির তিন-চতুর্থাংশই হিন্দু, তাহাদের মনীষা, সংগঠনশক্তি, এবং আর্থিক সম্পদ বিনষ্ট হইতে

দেওয়া কোনরূপ কাজের কথাই নয়। যাঁহারা আকবরকে হিন্দুঘেঁসা অপবাদ দিয়া তাঁহার তথাকথিত ইসলাম-বিরোধী বিধিনিদেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহেন এবং বলেন যে হিন্দুরাই তাঁহাকে 'জগৎগুরু' রূপে অভিহিত করিত, তাঁহাদের নিম্নলিখিত বিষয় কয়টি স্মরণ রাখা উচিত। আকবরই হিন্দুদের সমর্থন লাভে কৃতকার্য হইয়া ভারতবর্ষে মোগল কর্তৃত্বকে তুর্ক-আফগান কর্তৃত্ব অপেক্ষা বহুগুণে দৃঢ়তর করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহা ছিল সার্থক কর্মনীতি। তাহারই সঙ্গে সঙ্গে তিনি "ভারতীয় ইসলামকে আরবীয় প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া, পারসিকেরা যেরূপ শিয়ামত উদ্ভাবনের ফলে তাহাদের জাতীয় প্রতিভার সহিত ইসলামের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে সেইরূপ, ভারতের প্রয়োজনের সঙ্গে ইসলামের সামঞ্জস্য স্থাপনের মহৎ প্রয়াস করেন। আকবরের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় ভারতীয় ঐতিহ্যের সহিত ইসলামের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ধর্ম ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিপুল আন্দোলন, আর দারার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে উহার অবসান।" তাঁহার কর্মনীতি ছিল জাতীয়তা ও যৌক্তিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারই প্রভাবে তুর্ক-মোগল রাজবংশ তুর্ক অথবা মোগলের তুলনায় স্পষ্টতর ভাবে পরিগ্রহ করে ভারতীয় রূপ।

ইতিহাসে স্থাননির্দেশঃ সাম্রাজ্যসৌধের এই বিরাট স্থপতির কীর্তিকাহিনী আলোচনার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁহার স্থান কোথায় সে বিষয়ে আমাদের অন্তরে একটি সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকে। লরেন্স বিনিয়ন যথার্থই বলিয়াছেন, "ইতিহাসের পূর্ণ দিবালোকে দণ্ডায়মান আকবর যেন ছায়াচ্ছন্ন অথচ বিপরীতধর্মী দুইটি জগতের সন্ধিস্থলে অবস্থান করিতেছেন : একদিকে তাঁহার মধ্য-এশিয়াস্থ পিতৃপুরুষদের জগৎ, সে জগৎ হইতে উৎসারিত হইতেছে মানবিক প্রাণচাঞ্চল্যের স্রোত, সেই প্রাণচাঞ্চল্যের আপন মাহাত্ম্যেই চলে সেখানে তাহার একান্ত আরাধনা, মৃগয়ার উন্মাদনায় প্রমত্ত সে জগৎ, সে উন্মাদনার মধ্যে নাই পশু-হনন ও মনুষ্য-নিপাতের মধ্যে পার্থক্য-বিচার—তাঁহার একদিকে হিংস্র কর্মময় জগৎ, স্বপ্নের মতো বিলীয়মান, অপর দিকে ভারতবর্ষীয় জগৎ, অর্থাৎ সেই জগৎ যাহা বিলাসবৈভব ও নিষ্ঠুরতার লীলায় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিতে পারে বটে, তবুও যেখানে ঘটে বুদ্ধ ও অশোকের মহিমময় চারিত্র-ধর্মের স্ফুরণ, অতীতের ঐ সব দুর্মদ বিজয়ীদের চেয়ে বহু দূরবর্তী কাল হইতে আমাদের জন্য বাণী বহন করিয়া আনিতেছেন তাঁহারা, তবু আজও অম্লান হইয়া

আছে তাঁহাদের কণ্ঠস্বর, আজও তাহা প্রভাব বিস্তার করিতেছে আমাদের জীবনে। আকবরের চরিত্রেও রহিয়াছে অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্যের প্রমত্ততা, কর্মের অবতার তিনি যেন, তবুও অন্তরের অন্তঃস্থলে তিনি বহন করিয়া চলিয়াছেন এমন কিছু যাহা এ সব হইতেই সর্বথা স্বতন্ত্র, যাহা ভাবসম্পদ ও ধ্যানালোকের জন্য ব্যাকুল, যাহা ফেরে ন্যায়নীতির সন্ধানে, এবং কামনা করে সৌম্যভাব।" ইহার চেয়েও বড় কথা এই যে, আকবরের অধীনেই ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রাচীন আদর্শ পুনরায় মূর্ত হইয়া উঠে; তিনি কেবল রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনেরই চেষ্টা করিয়া যান নাই, সাংস্কৃতিক মিলন সংঘটনও ছিল তাঁহার প্রচেষ্টার বিষয়ীভূত।

মোগল সম্রাটগণের বংশতালিকা
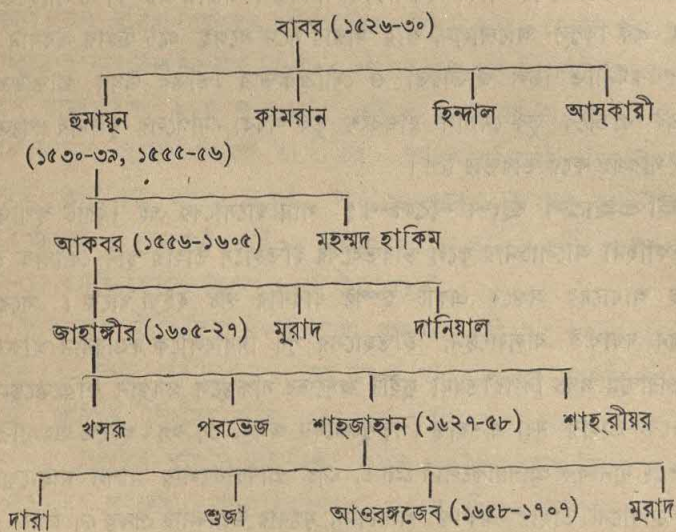
অষ্টাদশ অধ্যায়

মোগল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

জাহাঙ্গীর

সিংহাসনারোহণঃ আকবর ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যুবরাজ সলীমকে উষ্ণীষ ও পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া তাঁহার কটিবন্ধে ঝুলাইয়া দেন নিজস্ব কৃপাণ ; এইরূপ স্পষ্টভাবেই তিনি তাঁহার অন্তরের এই বাসনা জ্ঞাপন করেন যে, নানারূপ অসঙ্গত আচরণ সত্ত্বেও সলীমই তাঁহার পর সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে একমাত্র সলীমই তখন জীবিত ছিলেন। যুবরাজ দানিয়াল ও মুরাদ পিতার জীবৎকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। আকবরের শেষজীবনে সলীমের ভবিষ্যৎ বাস্তবিকই বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। ১৬০১-১৬০৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি আকবরের বিশেষ উদ্বেগের কারণও হইয়া উঠিয়াছিলেন। আকবর দাক্ষিণাত্যে গমন করিলে, সেই সুযোগে ১৬০১ খ্রীস্টাব্দে এলাহাবাদে তিনি কার্যতঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ; সেখানে এক স্বাধীন দরবার স্থাপন করিয়া তিনি ফরমান জারি এবং জায়গীর বণ্টন শুরু করিয়া দেন। বীর সিংহ বুন্দেলা প্রকাশ্য ভাবেই আকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন ; আকবর দাক্ষিণাত্য হইতে আগ্রায় ফিরিলে, আবুল ফজল যখন দাক্ষিণাত্য হইতে আগ্রায় আসিতেছিলেন তখন সলীমেরই প্ররোচনায় বীর সিংহ বুন্দেলা তাঁহাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করেন। সলীমের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, তাঁহার এই পিতৃবন্ধু ও পিতৃসহচরই তাঁহার বিরুদ্ধে পিতার কান ভারী করিয়া তুলিয়াছেন। আবুল ফজলের হত্যাকাণ্ডে আকবরের শোকের অবধি রহিল না ; তবুও, নির্মম ভাবে বীর সিংহ বুন্দেলার পশ্চাদ্ধাবন করা হইলেও, যিনি ছিলেন এই নাটের গুরু সেই যুবরাজের কোনও শাস্তি

হইল না ; বরং পিতৃহৃদয়ের দুর্বলতাবশতঃই ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আকবর পুত্রের সহিত পুনর্মিলিত হইলেন। পিতাপুত্রের এই পুনর্মিলনের উল্লেখ করিয়া জাহাঙ্গীর তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'তে অদ্ভুত সারল্যের সহিত লিখিয়াছেন, "যে রাজ্যের ভিত্তি হইল পিতার প্রতি বিদ্বেষভাব, তাহার স্থায়িত্ব যে কিরূপ তাহা আমার জানা আছে।" কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে মেবারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার আদেশ দান করিলে তিনি সে আদেশ পালনে বিশেষ অনিচ্ছা প্রদর্শন করেন ; ফলে তাঁহাকে এলাহাবাদ প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দান করা হয় ; সেখানে গিয়া তিনি পুনরায় এক স্বাধীন দরবার খুলিয়া বসেন। এইরূপ সময়েই আবার সলীমকে অতিক্রম করিয়া সলীমের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরুকে আকবরের পর সিংহাসনে স্থাপনের এক চক্রান্ত হয়। তিনি ছিলেন মান সিংহের ভাগিনেয় এবং আজিজ কোকার জামাতা। এই দুইজন প্রভাবশালী ওমরাহের অন্তরের বাসনা ছিল পিতার পরিবর্তে পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রূপে মনোনয়ন করা। সলীম পিতার মার্জনা ভিক্ষা করেন, তাঁহাকে তিরস্কার জ্ঞাপন করিয়া পূরা দশদিন কারারুদ্ধ রাখা হয়, কিন্তু তারপর তাঁহার সহিত এমন ভাবে ব্যবহার করা হইতে থাকে যেন কিছুই হয় নাই। এ ব্যাপার ঘটে ১৬০৪ খ্রীস্টাব্দের নবেম্বর মাসে। কিন্তু পরবৎসর যখন আকবর অসুস্থ হইয়া পড়েন তখন উভয় পক্ষের মধ্যেই চক্রান্তের উপর চক্রান্তের ধূম পড়িয়া যায়। শোনা যায় সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া বাস্তবিকই না কি এক বৈঠক বসে, তাহাতে অধিকাংশ ওমরাহই সলীমের পক্ষ সমর্থন করেন। ফলে আজিজ কোকাকে পর্যন্ত তাহা মানিয়া লইতে হয়। অবশেষে মরণাপন্ন সম্রাট তাঁহাকে রাজবেশে ভূষিত করিলে পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া সলীমকে আর কোনরূপ বেগ পাইতে হয় না। ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর আগ্রায় আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁহার সিংহাসনে অভিষেক হয় ; অভিষেক কালে তিনি 'নূরউদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর পাদিশাহ গাজী' উপাধি গ্রহণ করেন।

খসরুর বিদ্রোহ : তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল খসরুর বিদ্রোহ। মান সিংহ তাঁহার ভাগিনেয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন বটে, তবে এ সময় তিনি ছিলেন সুদূর বঙ্গদেশে। খসরুকে আধা-বন্দী অবস্থায় রাখা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি আগ্রার দুর্গাবাস হইতে পলায়ন করিয়া পঞ্জাবের

দিকে অগ্রসর হন। তাঁহার সৈন্যদল বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ১২,০০০-এ আসিয়া দাঁড়ায়। লাহোরের দেওয়ান তাঁহার সহিত যোগদান করেন, কিন্তু সেখানকার সুবাদার (প্রদেশপাল) নগর রক্ষা করিতে থাকেন। ইত্যবসরে সেখানে আসিয়া পৌঁছে বাদশাহী ফৌজ। ভৈরোয়ালে এক যুদ্ধ হয়। খসরু সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন; তিনি স্থির করিয়াছিলেন কাবুলে পলায়ন করিবেন, কিন্তু চন্দ্রভাগা নদীতে তাঁহার নৌকা চড়ায় আটকাইয়া যাওয়ায় তিনি ধৃত হন। তাঁহার প্রধান প্রধান সমর্থককে বর্বর ভাবে হত্যা করা হয়। কথিত আছে, শিখগুরু অর্জুন খসরুর পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহার সাফল্যের জন্য প্রার্থনার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বন্দী করা হয়; শোনা যায় বন্দী অবস্থার কঠোরতার ফলেই তাঁহার মৃত্যু (১৬০৬) ত্বরান্বিত হইয়াছিল। খসরুকে অন্ধ করিয়া রাখা হয়, তবে পরবর্তী কালে তিনি একটি চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি কিয়ৎপরিমাণে ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

মেবারের বশ্যতা স্বীকার (১৬১৫): জাহাঙ্গীরের রাজত্বকে আকবরের রাজত্বেরই অনুবৃত্তি রূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারত উভয় ক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার পিতার পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিতে থাকেন। তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা হইল মেবারকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা। মেবারের রাণা তখন ছিলেন অমর সিংহ; ১৫৯৭ সালে তাঁহার পিতা প্রতাপ পরলোকগমন করিলে তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রথম বৎসরেই নামেমাত্র তাঁহার মধ্যমপুত্র পরভেজের অধীনে মেবারের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয় ২০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী। কিন্তু যুদ্ধে জয়-পরাজয় অমীমাংসিতই রহিয়া যায়। এদিকে খসরুর বিদ্রোহের জন্য মণ্ডলগড়ে যুদ্ধবিরতির এক চুক্তি সম্পাদন করিতে হয়। তারপর ১৬০৮ সালে সোৎসাহে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বাদশাহী ফৌজের অধিনায়ক ছিলেন মহবৎ খাঁ। কিন্তু মোগল অশ্বারোহী বাহিনী বনময় পার্বত্য অঞ্চল এবং রাজপুতদের দুর্গম আশ্রয়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিল না। মহবৎ খাঁকে সরাইয়া সেখানে আবদুল্লা খাঁকে নিয়োগ করা হইল। তিনি সুষ্ঠুভাবেই যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বদলি করিতে হইল গুজরাটে, তারপর সেখান হইতে দাক্ষিণাত্যে। ইহার পর কিছুকালের মতো যুদ্ধের স্রোতে ভাঁটা পড়িয়া গেল।

১৬১৩ সালে জাহাঙ্গীর আজমীঢ়ে দরবার তুলিয়া আনিয়া তাঁহার তৃতীয় পুত্র

খুর্‌রমকে নিয়োগ করেন সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক পদে। আবদুল্লা খাঁ এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য সেনানীরাও আসিয়া তাঁহার শক্তিবৃদ্ধি করেন। মোগলদের পরিকল্পনা ছিল সর্বত্র অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও ধ্বংসসাধনের দ্বারা রাজপুতদের অনাহারে রাখিয়া তাহাদের পার্বত্য আশ্রয় হইতে বাহির হইতে বাধ্য করা এবং সর্বত্র অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চতুর্দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইয়া যাওয়া। রাণা অমর সিংহের চরিত্রে তাঁহার পিতার ন্যায় দৃঢ়তা ও সঙ্কল্পনিষ্ঠার কিছু অভাব ছিল ; দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বিপন্ন হইয়া তিনি সন্ধিভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। জাহাঙ্গীর সহৃদয়তা প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। ১৬১৫ সালের সন্ধির শর্ত অনুযায়ী বাদশাহের অধীনে কাজ করার জন্য রাণাকে ১,০০০ অশ্বারোহীর একটি বাহিনী প্রেরণে সম্মত হইতে হইল ; তাঁহার পুত্র যুবরাজ করণকে গ্রহণ করিতে হইল পাঁচহাজারী মনসবদারের পদ। বাদশাহের দরবারে স্বয়ং উপস্থিত হওয়ার দায় হইতে রাণা অব্যাহতি লাভ করিলেন ; মেবারের কোনও কন্যাকেও শাহী হারেমে প্রেরণের কোনও দায় রহিল না। যুবরাজ করণকে এতই প্রচুর উপঢৌকন দান করা হয় যে, ব্রিটিশ দূত স্যর টমাস রো'র চিত্তে প্রতীতি জন্মে উপঢৌকনের বলেই মেবারের বশ্যতা ক্রয় করা হইয়াছে। মেবারের যুবরাজের প্রতি জাহাঙ্গীরের এইরূপ সদয় ব্যবহার ছিল জয়সিংহ যখন মোগলশক্তির বৈরিশ্রেষ্ঠ শিবাজীকে বশ্যতা স্বীকার করিয়া দরবারে উপস্থিত হইতে সম্মত করেন তখন তাঁহার প্রতি আওরঙ্গজেবের আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত অনুষ্ঠানের এক অপূর্ব নিদর্শন। আরামপ্রিয়, ইন্দ্রিয়াসক্ত জাহাঙ্গীরের তাঁহার সহানুভূতিহীন, কঠোর শ্রমশীল পৌত্রের চেয়ে অনেক ভালো জানা ছিল সাম্রাজ্য-গঠনের কৌশল।

বঙ্গদেশে আফগানদের দমন : বঙ্গদেশের আফগানদের প্রতিও প্রযুক্ত হয় এই একই মনোজয়ের নীতি। পূর্বপ্রান্তের এই মোগল প্রদেশটিতে বিক্ষোভের শান্তি ছিল না। দায়ুদের বিফলতার পর একে একে কতলু খাঁ, ইসা খাঁ এবং সুলেমান কররাণী ভারতবর্ষের এই অংশটিতে মোগলশক্তির দৃঢ়তা সম্পাদনে বিরুদ্ধাচরণের ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া চলিতে থাকেন। মান সিংহ, কুতব-উদ্দীন এবং জাহাঙ্গীর কুলী, পর পর এই কয়জন মোগল প্রদেশপালের পক্ষে আফগান বিদ্রোহীদের দমন করা প্রায় যেন এক অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পর বঙ্গদেশের সুবাদার হইয়া আসেন ইসলাম খাঁ। তিনি রাজমহল হইতে

ঢাকায় রাজধানী তুলিয়া আনেন। উসমান নামে ইসা খাঁ'র এক পুত্র ১৬০০ সালে ভদ্রক নামক স্থানে শাহী ফৌজকে পরাভূত করিয়াছিলেন; ১৬১২ সালের ১২ই মার্চ (ঢাকা হইতে ১০০ ক্রোশ দূরে) নেকুজ্যাল নামক স্থানের যুদ্ধে তাঁহার পরাভব ঘটে। আহত অবস্থায় উসমানের মৃত্যু হয়। বঙ্গদেশে তিনিই ছিলেন শেষ স্বাধীন আফগান রণনায়ক। মোগলদের মনোজয়ের নীতি নেতৃহীন আফগানদের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকারের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়।

কাঙ্গড়া অধিকার (১৬২০): জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল কাঙ্গড়া অধিকার। নগরকোট বা কাঙ্গড়ার দুর্ভেদ্য পার্বত্য দুর্গটি ইরাবতী ও শতদ্রুর মধ্যবর্তী পর্বতসঙ্কুল প্রদেশে শীর্ষ উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। তোডর মল জম্মু ও নগরকোটের (বিতস্তা ও ইরাবতীর) মধ্যবর্তী প্রদেশের পার্বত্য নায়কদিগকে মোগলশক্তির ছত্রতলে আনয়ন করিয়াছিলেন। পার্বত্য অঞ্চলে এরূপ একটি জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে তোডর মল না কি আকবরের নিকট তৎপ্রবর্তিত বিধিব্যবস্থা একটি মনোহর রূপকের মধ্য দিয়া ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন, "তিনি মাংস কাটিয়া লইয়া হাড়গুলি ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন।" কিন্তু তখন পর্যন্তও কাঙ্গড়া অধিকৃত হয় নাই। দীর্ঘকাল অবরোধের পর ১৬২০ সালে রায় রায়ান বিক্রমজিৎ দুর্গ অধিকারে সমর্থ হন। দুর্গটির বর্ণনা করিতে গিয়া জাহাঙ্গীর বলিয়াছেন, উহাতে ছিল ২৩টি পঞ্চভুজাকার বহির্বেষ্টনী এবং সাতটি তোরণ। উপত্যকা প্রদেশের সৌন্দর্য সন্দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইয়া যান।

দাক্ষিণাত্য সম্পর্কিত ব্যাপার—আহম্মদনগর: জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের ব্যাপারে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেন মালিক অম্বর। তাঁহার জন্মভূমি ছিল আবিসিনিয়া, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে আসিয়া তিনি স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে থাকেন। শাসনকার্য পরিচালনার বিপুল ক্ষমতা, অপূর্ব বিচারবুদ্ধি এবং প্রচুর সামরিক নৈপুণ্যের বলে বিশ বৎসর অবধি দাক্ষিণাত্যের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে তিনিই মূল ভূমিকায় অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। তখনও আহম্মদনগর রাজ্যের যাহা অবশিষ্ট ছিল, মোগলদের করাল গ্রাস হইতে তাহা রক্ষা করাই ছিল তাঁহার অন্তরের অভিলাষ। খড়্কি নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া, তিনি রাজবংশের জনৈক তরুণকে ২য় মুর্তজা নিজাম শাহ উপাধি সহকারে সিংহাসনে স্থাপন করেন, এবং সহসা আক্রমণ ও

সহসা অন্তর্ধানে শত্রুপক্ষকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিবার জন্য দলে দলে মারাঠাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদলে নিযুক্ত করিয়া মোগলশক্তির প্রসার সাধনে বাধাদান করিতে থাকেন। তাঁহার একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয় ১৬১১ সালে। মোগলরা বিভিন্ন দিক হইতে একযোগে আক্রমণের এক বিরাট পরিকল্পনা স্থির করে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহাদের বিবিধমুখী প্রযত্নের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষায় সমর্থ হয় না। মোগলদের বিপর্যস্ত করিয়া তুলিবার সর্বোত্তম পন্থা রূপে মালিক অম্বর বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। মিত্রপক্ষের মধ্যে বিভেদ ঘটাইবার জন্য অবিরল চলিতে থাকে মোগল আশরফি ও মোগল কূটনীতির খেলা। কিন্তু মোগল সেনাপতিরাও পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ করিতেছিলেন। অবশেষে পরভেজকে এলাহাবাদে স্থানান্তরিত করিয়া, ১৬১৬ সালে দাক্ষিণাত্যের যাবতীয় ব্যাপারের ভার দেওয়া হয় যুবরাজ খুর্‌রমের উপর। তিনি দাক্ষিণাত্যের মিত্রসঙ্ঘ হইতে বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহকে সরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। মালিক অম্বর সমগ্র বালাঘাট অঞ্চল দখল করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা আবার মোগলদের হাতেই তুলিয়া দিতে হইল, এবং ১৬১৭ সালে কেবল আহম্মদনগরেরই নয়, অন্যান্য স্থানের দুর্গ ও সেনানিবাসেরও চাবিকাঠি আনুষ্ঠানিক ভাবে সমর্পণ করিতে হইল মোগলদের হাতে। খুর্‌রম 'শাহ জাহান' উপাধি লাভ করিলেন, কিন্তু মোগল অধিকার ১৬০৫ সালের সীমারেখার বাহিরে একটি মাইলও অগ্রসর হইল না।

নিজেদের মধ্যে গোলযোগ আর বিশৃঙ্খলার ফলে দাক্ষিণাত্যে কেবলই মোগলদের শক্তিক্ষয় হইতে লাগিল। আব্দুর রহিম খান খানান ও তাঁহার পুত্র শাহ নওয়াজ খাঁ'র উপর ছিল দাক্ষিণাত্য সম্পর্কিত ব্যাপারের ভার; পরস্পর বিবদমান মোগল সেনাপতিদের আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। ১৬২০ সালে মালিক অম্বর বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সহিত পুনরায় মৈত্রী স্থাপন করিয়া ১৬১৭ সালের সন্ধিভঙ্গ করিয়া বসিলেন। যুদ্ধবিগ্রহে জয়লাভ করিয়াও মোগলদের কোনরূপ সুবিধা হইল না। চকিতে আক্রমণ ও চকিতে অন্তর্ধানের জন্য মালিক অম্বর মারাঠাদের লইয়া যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্বারোহী সৈন্যের দল গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহারা দাক্ষিণাত্যের মোগল-অধিকৃত ভূভাগের এক বিপুল অংশ পর্যুদস্ত করিয়া দিয়া গেল। এমন কি, মালিক অম্বর আসিয়া বুরহানপুর অবরোধ করিয়া বসিলেন। আবার শাহজাহানকে

নিয়োগ করিতে হইল। তাঁহার আগমনের ফলে শুরু হইল তুমুল আক্রমণ। মালিক অম্বরের পক্ষে বুরহানপুরের অবরোধ প্রত্যাহার না করিয়া কোনও উপায় রহিল না। মোগলেরা খড়কি অধিকার করিয়া শহর ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিল। মালিক অম্বর সন্ধি ভিক্ষা করিলেন; মোগলদের যে সকল স্থান তিনি কাড়িয়া লইয়াছিলেন সে সকল স্থান তো বটেই, তদুপরি কয়েকটি পার্শ্ববর্তী ভূভাগও ছাড়িয়া দিতে হইল। আর এদিকে ব্যবস্থা হইল যে, দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেকটি সুলতানী রাজ্যকেই জমা দিতে হইবে নজরাণা—বিজাপুরকে দিতে হইবে ১৮ লক্ষ, আহম্মদনগরকে ১২ লক্ষ, গোলকোণ্ডাকে ২০ লক্ষ।

১৬২৩ সালে মোগলদের সঙ্গে বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহের একটি পৃথক সন্ধি হয়; তাহার ফলে আদিল শাহ্ মোগলদের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন। ইহারই প্রত্যুত্তরস্বরূপ মালিক অম্বর গোলকোণ্ডার সুলতান কুতব-উল-মুল্ক-এর সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া বিদরে বিজাপুর-বাহিনী ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন, এবং তারপর আসিয়া একেবারে বিজাপুর অবরোধ করিয়া বসেন। মোগল বাহিনী বিজাপুর সুলতানের সাহায্যের জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসে। ইতিমধ্যে শাহজাহান তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন; তিনি আসিয়া মালিক অম্বরের পক্ষে যোগ দিয়া বুরহানপুর অবরোধ করিয়া বসিলেন। জাহাঙ্গীরের আদেশে মহবৎ খাঁ'র সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন পরভেজ। শাহজাহান বশ্যতা স্বীকার করিলেন, মালিক অম্বরকে পিছু হটিয়া আসিতে হইল, এমন সময় সেখান হইতে ফিরাইয়া আনা হইল মহবৎ খাঁকে। দাক্ষিণাত্যে মোগলদের যুদ্ধবিগ্রহের গতি স্তিমিত হইয়া পড়িল।

১৬২৬ সালে মালিক অম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। "আবিসিনিয়ার একজন ক্রীতদাসের পক্ষে গৌরবের এতখানি উচ্চ শিখরে আরোহণের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর একটিও নাই।" নিজাম শাহী বংশের এই মন্ত্রিপ্রবর কেবল যে দাক্ষিণাত্যে মোগলশক্তির প্রসার লাভে বাধাদান করিয়া সাফল্য অর্জনের জন্যই খ্যাতিভাজন হইয়া আছেন তাহাই নয়, গ্রামে গ্রামে জমি জরিপ করা, ভূসম্পত্তির দলিল তৈয়ারি, করভার নির্ধারণ প্রভৃতি নানারূপ জনকল্যাণকর কার্যের জন্যও খ্যাতির অধিকারী তিনি। আবার নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি মারাঠাশক্তির পরিপুষ্টি সাধন করিয়া যান। মোগলদের পূর্ববিজিত অঞ্চলসমূহের পুনরুদ্ধার সাধন ছাড়া আর কিছু করাই জাহাঙ্গীরের সাধ্যে কুলাইল না।

পারস্যের সহিত সম্পর্ক : পারস্যের সাফাবী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি শাহ আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯) ছিলেন জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। তাঁহার পূর্ববর্তী রাজন্যবর্গ (অর্থাৎ হুমায়ুন ও আকবরের সমকালীন শাহ তাহ্‌মাস্প এবং বাবরকে যিনি একবার সাহায্য দান করিয়াছিলেন সাফাবী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সেই শাহ ইসমাইল) অপেক্ষা নিঃসংশয়ে তিনি ছিলেন অধিকতর কর্মকুশল এবং অধিকতর তেজস্বী। কান্দাহারের বৈষয়িক ও সামরিক গুরুত্বের জন্য শাহ আব্বাস উহা পুনরধিকার করিতে চাহেন। ১৬০৬ সালে পারসিকদের কান্দাহার অধিকারের চেষ্টা নিষ্ফল হয়। অতঃপর পারসিকেরা জাহাঙ্গীরের সন্দেহ নিরসনের কৌশল অবলম্বন করে। ১৬১১ সালে মোগল দরবারে আসিয়া হাজির হয় একটি পারসিক দূত-সংসদ ; রাজদূত নিজে দুই বৎসর কাল এখানে থাকিয়া যান। বিনিময়ে ১৬১৩ সালে প্রেরিত হয় একটি মোগল দূত-সংসদ। ১৫১৫ সালে দ্বিতীয় একটি পারসিক দূত-সংসদ দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছে। তারপর ১৬১৬-১৭ সালে তৃতীয় বারের মতো দিল্লীতে যে পারসিক দূত-সংসদের আবির্ভাব ঘটে, সমারোহের আতিশয্যে তাহা পারসিকদের যাবতীয় দূত-সংসদকে ছাড়াইয়া যায়। ১৬২০ সালে বিবিধ উপঢৌকন সহকারে আসিয়া দেখা দেয় চতুর্থ দূত-সংসদ। পারসিকদের সদ্ভাব সম্বন্ধে মোগলদের অন্তরে বিশ্বাসের উদ্রেক হয়, এবং সম্ভবতঃ তাহারা কান্দাহারের সংরক্ষণ-ব্যবস্থায় শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে থাকে। ১৬২২ সালে সহসা শাহ আব্বাস সেখানকার বিরাট দুর্গটি অবরোধ করেন। দিল্লীতে তখন চলিতেছিল দলাদলির মারপ্যাঁচ। ৪৫ দিন অবরোধের পর শাহ আব্বাস কান্দাহার দখল করিয়া ফেলেন। কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য জাহাঙ্গীর এক বিপুল অভিযান প্রেরণের পরিকল্পনা করেন। শাহজাহানকে উহার নেতৃত্ব করিতে আদেশ দান করা হয় ; কিন্তু এত দূরে গিয়া নিজের উত্তরাধিকার বিপন্ন করার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তৎপরিবর্তে তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন।

নূরজাহানের আধিপত্য : ১৬১১ হইতে ১৬২৭ সাল পর্যন্ত শাহী দরবারে প্রভাব-প্রতিপত্তিতে নূরজাহানের সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। ১৬১১ সালে জাহাঙ্গীরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। নূরজাহানের জীবন-বৃত্তান্ত কিংবদন্তীর কল্পনায় নিবিড় ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মেহের-উন্-নিসা

(সম্রাটের সহিত বিবাহের পূর্বে এই নামেই ছিল নূরজাহানের পরিচয়) ছিলেন পারসিক পিতামাতার সন্তান। নিরতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহারা পারস্য ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে বসবাস করিতে আসেন। আকবরের অধীনে তাঁহার পিতার একটি চাকুরী হয়। জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রতি প্রেমে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন, কিন্তু আকবর উভয়ের মিলনে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আলী কুলী ইস্তাজলুর (ইঁহার উপাধি ছিল শের আফকুন, অর্থাৎ ব্যাঘ্র নিক্ষেপকারী বা শার্দূলজিৎ) সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া কার্যব্যপদেশে আলী কুলীকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের অল্পকাল পরেই বঙ্গদেশের সুবাদার কুতব-উদ্দীন একবার শের আফকুনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, শের আফকুনের ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারান, সঙ্গে সঙ্গে কুতব-উদ্দীনের অনুচরদের হাতে শের আফকুনেরও প্রাণ যায়। শের আফকুনের বিধবা পত্নীকে তখন পাঠাইয়া দেওয়া হয় আগ্রায়, এবং ইহার বৎসর কয়েক পরে তাঁহার বিবাহ হয় সম্রাটের সঙ্গে। এই রসঘন কাহিনীর ভিত্তিমূল চূর্ণ করিয়া এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা হইয়াছে যে, জাহাঙ্গীর ১৬১১ সালের আনন্দবাজারেই প্রথম মেহের-উন্-নিসার দর্শন লাভ করেন।

লাবণ্যময়ী এবং কর্ত্রীত্বাভিলাষিণী নূরজাহান তাঁহার রূপ ও কর্মক্ষমতার বলে কেবল যে রাজধানীর মহিলা-সমাজেরই শীর্ষস্থান অধিকার করেন তাহাই নয়, প্রকাশ্যেই তাঁহাকে অসাধারণ রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারিণী রূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। তাঁহার নামে বাহির হইতে থাকে নূতন মুদ্রা, তাহাতে খোদাই করা থাকিত নিম্নলিখিত লিপি: "নরনাথ জাহাঙ্গীরের নির্দেশ অনুসারে, রাজ্ঞী বেগম নূরজাহানের নামাঙ্কিত স্বর্ণে শতেক দীপ্তির সংযোগ ঘটিয়াছে।" তাঁহার পিতা ইতিমদ-উদ্দৌলা উপাধিতে ভূষিত হইয়া কার্যতঃ মুখ্যমন্ত্রীই হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতা ইতিকাদ খাঁ—পরবর্তী কালে ইঁহারই পরিচয় হইয়া দাঁড়ায় আসফ খাঁ—নিযুক্ত হইলেন প্রাসাদপাল এবং সেই ১৬১১ সালেই আরম্ভ হয় তাঁহার সমুজ্জ্বল কর্মজীবন। ১৬১২ সালে নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা মমতাজ মহলের বিবাহ হয় খুর্‌রমের সঙ্গে; জাহাঙ্গীরের পুত্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মকুশল বলিয়া তাঁহারই ছিল সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভের সমধিক সম্ভাবনা। পরবর্তী দশ বৎসর কাল নূরজাহান, ইতিমদ-উদ্দৌলা, আসফ খাঁ এবং যুবরাজ খুর্‌রম, এই কয়জনে মিলিয়া যে দল গঠন করেন,

দরবারে সেই দলেরই প্রাধান্য চলিতে থাকে, তবে জাহাঙ্গীরের মতামত সর্বদাই সমীহ করিয়া চলিতে হইত। কিন্তু ১৬২২ সালের দিকে আমরা দেখিতে পাই ইতিমদ-উদ্দৌলার মৃত্যু ঘটিয়াছে, আর কর্ত্রীত্বাভিলাষিণী সম্রাজ্ঞী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবরাজ (শাহজাহান) হইয়া দাঁড়াইয়াছেন পরস্পরের প্রকাশ্য শত্রু। বয়োবৃদ্ধ ওমরাহদের মধ্যে মহবৎ খাঁ ছিলেন সর্বাপেক্ষা কর্মকুশল, কিন্তু এতকাল তাঁহারা অসহায় অবস্থায়ই কালযাপন করিতেছিলেন, এবার তাঁহারা মাথা চাড়া দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজনীতি পর্যবসিত হইল নিছক দলাদলিতে।

শাহজাহানের বিদ্রোহ: জাহাঙ্গীরের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করায় তাঁহার রাজত্বকালের শেষভাগ দলগত চক্রান্ত ও কূটকৌশলে ছাইয়া গেল। শের আফকুন ও নূরজাহানের কন্যা লাদিলা বেগমের বিবাহ হইল জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্‌রীয়রের সঙ্গে। এই অকর্মণ্য রাজকুমার হইয়া দাঁড়াইলেন নূরজাহানের হাতের পুতুল; কর্তৃত্বাভিলাষী শাহজাহানের পরিবর্তে তাঁহাকেই তিনি সিংহাসনে স্থাপনের অভিলাষ অন্তরে অন্তরে পোষণ করিতে লাগিলেন।

প্রথম দুর্লক্ষণ হইল খসরুর মৃত্যু অথবা হত্যাকাণ্ড। এই অভাগা রাজপুত্রের জীবনের বিষাদময় পরিণতি ঘটে ১৬২২ সালে। তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল শাহজাহানের তত্ত্বাবধানে। শাহজাহান দাক্ষিণাত্য হইতে সংবাদ পাঠান যে শূলবেদনায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সমসাময়িক জনমত তাঁহার মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড বলিয়াই ধরিয়া লয়।

উহা হত্যাকাণ্ড হইলে শাহজাহানই ছিলেন সে অপরাধের জন্য দায়ী; অনতিকাল পরেই তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন তাঁহার পদতল হইতে মৃত্তিকা যেন সরিয়া যাইতেছে। তাঁহাকে কান্দাহারে অভিযান পরিচালনার আদেশ দেওয়া হইলে তিনি মনে করিলেন তাঁহার পিতার ভগ্নস্বাস্থ্য এবং দরবারে নূরজাহানের প্রতিপত্তি এবং পিতার কান ভারী করিয়া তুলিবার সুযোগ, এই সব বিপদের মধ্যে এত দূরে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। প্রথমে তিনি নানারূপ অসম্ভব শর্তের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন, শেষকালে করিয়া বসিলেন বিদ্রোহ। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার সম্বন্ধে জাহাঙ্গীরের মত লিপিকারের দ্বারা এইভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে: "শাহজাহানকে আমি যে সকল অনুগ্রহ ও যেরূপ

স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছি সে তৎসমুদয়ের সম্পূর্ণ অযোগ্য।" কার্যতঃ পরভেজকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল এবং শাহ্‌রীরকে নিয়োগ করা হইল কান্দাহার অভিযানের নায়কের পদে; তবে শাহজাহানের বিদ্রোহের জন্য কান্দাহার অভিযান সম্ভবপর হইল না। ১৬২৩ সালের মার্চ মাসে বিলোচপুরের যুদ্ধে শাহজাহান পরাভূত হইলেন। তিনি পলায়ন করিলেন মাণ্ডুতে, তারপর সেখান হইতে দাক্ষিণাত্যে। পরভেজ ও মহবৎ খাঁ'র অধীনে শাহী ফৌজ তাঁহাকে স্থান হইতে স্থানান্তরে তাড়াইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল। দাক্ষিণাত্য হইতে পলায়ন করিয়া উড়িষ্যার পথে তিনি আসিয়া প্রবেশ করিলেন বঙ্গদেশে; রাজমহল তাঁহার করায়ত্ত হইয়া পড়িল; পাটনায় প্রবেশ করিয়া তিনি বিহার অধিকার করিয়া ফেলিলেন। পরভেজ ও মহবৎ খাঁর নেতৃত্বে ধাবমান বাদশাহী ফৌজ আসিয়া তাঁহাকে এলাহাবাদ হইতে অবরোধ তুলিয়া লইতে বাধ্য করিল; যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটিল। পুনরায় দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিয়া, তিনি গিয়া যোগ দিলেন মালিক অম্বরের সঙ্গে এবং বুরহানপুর অবরোধ করিয়া বসিলেন। পরভেজ ও মহবৎ খাঁ পুনরায় তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে তাঁহাকে অবরোধ তুলিয়া লইতে হইল। এবার আর মার্জনা ভিক্ষা ছাড়া তাঁহার কোনও গতি রহিল না। তখন পর্যন্তও রোটাস ও অসিরগড়ের দুর্গ দু'টি তাঁহার হাতে ছিল; সে দু'টি সমর্পণ করিয়া তিনি তাঁহার দুই পুত্র দারা ও ঔরঙ্গজেবকে প্রতিভূস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে মার্জনা করিয়া বালাঘাটের শাসনভার দান করা হইল। তিন বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল এই গৃহযুদ্ধ; ইহার ফলে কেবল যে মোগলদের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সামরিক কর্মচারী প্রাণ হারান তাহাই নয়, ইহার ফলে কান্দাহার পুনরধিকারের কাজও স্থগিত থাকে। জাহাঙ্গীরের ভাষায় শাহজাহানের এই বিদ্রোহ "তাহার নিজ রাজ্যেরই পদতলে কুঠারাঘাত করিয়া সে অভিযানের পথে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করিয়া বসে।"

মহবৎ খাঁর বিদ্রোহঃ শাহজাহানকে পরাভূত করার কৃতিত্ব প্রধানতঃ ছিল মহবৎ খাঁর প্রাপ্য, অথচ নূরজাহান তাঁহাকেই সন্দেহের চোখে দেখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাকে পরভেজের সান্নিধ্য হইতে অপসারণ করিয়া, বঙ্গদেশে গমন করিবার আদেশ দান করা হয়। তিনি ছিলেন অপুত্রক; সেই অবস্থায় তাঁহার সম্পত্তির স্বত্ব রাজার উপর গিয়া বর্তাইবে বলিয়া তিনি তাঁহার সম্পত্তির হিসাবনিকাশ দাখিল করিতে আদিষ্ট হইলেন। তাঁহার জামাতার

প্রতি যার-পর-নাই দুর্ব্যবহার করা হইতে লাগিল। তাঁহার আশঙ্কা হইল তাঁহার সর্বনাশ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সে সময় জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান কাবুল যাত্রা করিয়াছিলেন। বিতস্তাতীরে মহবৎ খাঁ তাঁহার রাজপুত অশ্বারোহী বাহিনীর সহায়তায় বাদশাহী শিবির ঘেরাও করিয়া সম্রাটকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সম্রাটের নিকট হইতে তিনি নিজের ইচ্ছামতো শর্ত আদায় করিবেন। নূরজাহান মহবৎ খাঁর অনুচরদের আক্রমণ করিতে গিয়া বিফল হইলেন; তখন তিনি স্থির করিলেন স্বামীর সহিত তিনিও বন্দিদশা ভোগ করিবেন। এইভাবে মহবৎ খাঁর বলপ্রয়োগ সার্থক হইল বটে, তবে তাহা স্থায়ী হইল না। তাঁহার অধীনে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে লইয়া বাদশাহী ফৌজ কাবুল অভিমুখে রওনা হইল। কাবুলে পৌছিয়া কৌশলে নূরজাহান স্বামীকে মুক্ত করিলেন। এবার মহবৎ খাঁরই পলায়নের পালা। তিনি একেবারে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া দাক্ষিণাত্যে শাহজাহানের সহিত মিলিত হইলেন। চারিদিক হইতে বিপদের জালে জড়াইয়া পড়িয়া শাহজাহান পারস্যে পলায়নের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, সহসা ঘটনাচক্রের গতি তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুকূল হইয়া উঠিল। ১৬২৬ সালের অক্টোবর মাসে পরভেজের মৃত্যু হইল, তারপর ১৬২৭ সালের অক্টোবরে জাহাঙ্গীর নিজেও শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সংবাদ পাইয়া উত্তরাধিকার লাভের বাসনায় দাক্ষিণাত্য হইতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন শাহজাহান।

জাহাঙ্গীরের চরিত্র: জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে টেরী মন্তব্য করিয়াছেন, "এই রাজার চরিত্র আমার কাছে সর্বদাই কোমলে-কঠোরে গঠিত বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, কেননা সময় সময় তিনি নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতেন, আবার সময় সময় তাঁহাকে মনে হইত সাতিশয় অনুকূল ও মৃদুস্বভাব।" অবিচল চিত্তে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জীবন্ত মানুষের গাত্রত্বক মোচনের দৃশ্য দর্শন করার মতো নিষ্ঠুরতা তাঁহার ছিল; আবার তাহারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মধ্যে ছিল সূক্ষ্ম রসরুচি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি যথার্থ অনুরাগ। তাঁহার জীবনস্মৃতি 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার স্পষ্ট পরিচয় বহন করিতেছে। সম্ভবতঃ অসংযত জীবন যাপনের ফলেই তাহার যাবতীয় সদগুণ বিনষ্ট হইয়া যায়। ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার মধ্যে কোনরূপ গোঁড়ামি ছিল না, তবে এ বিষয়ে তাঁহার পিতার উদার দৃষ্টিও তিনি লাভ করেন নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শাহজাহান

সিংহাসনারোহণ : শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৬২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ১৬২৭ সালের অক্টোবরে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু এবং শাহজাহানের সিংহাসনারোহণের মধ্যে শাহরীয়রের সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা শাহজাহানের শ্বশুর আসফ খাঁ বিফল করিয়া দেন। শাহজাহান যখন দাক্ষিণাত্য হইতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছিলেন তখন আসফ খাঁ খসরুর পুত্র দাওয়ার বক্শকে সেই ফাঁকটুকু ভরাট করিবার জন্য সম্রাটপদে বহাল করেন, তারপর যুদ্ধে শাহরীয়রকে পরাভূত করিয়া তাঁহাকে অন্ধ করিয়া দেন। শাহজাহান আসিয়া পৌঁছিলে, দাওয়ার বক্শকে নির্বিবাদে পারস্যে পলায়ন করিতে দেওয়া হয় ; সেখানে গিয়া তিনি হইয়া দাঁড়ান পারস্যের শাহের একজন বৃত্তিভোগী মাত্র।

হুগলী অধিকার (১৬৩২) : ষোড়শ শতকের শেষভাগে পোর্তুগীজরা আসিয়া বঙ্গদেশে বসতি স্থাপন করে। তাহাদের প্রধান কুঠি স্থাপিত হয় (কলিকাতার নিকট) হুগলীতে ; ক্রমশঃ তাহা হইয়া দাঁড়ায় ব্যবসায় বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে অতিরিক্ত হারে শুল্ক আদায় করিতে আরম্ভ করায় তাহারা মোগল কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়া উঠিতে থাকে ; তা' ছাড়া অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের চুরি করিয়া লইয়া গিয়া খ্রীস্টান করিবার জন্য দেশময় আতঙ্কও দেখা দেয়। শাহজাহানের আদেশে বাঙ্গালার সুবাদার কাশিম আলী খাঁ তিনমাস অবরোধের পর হুগলী অধিকার করেন। বিস্তর পোর্তুগীজের প্রাণনাশ করা হয়, এবং বহুসংখ্যক পোর্তুগীজকে বন্দী করিয়া চালান দেওয়া হয় আগ্রায়।

দাক্ষিণাত্য সম্পর্কিত ব্যাপার ও আহম্মদনগরের বিলোপ সাধন (১৬৩৩) : সিংহাসনে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবার পর শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্ব বিস্তারের সুযোগ লাভ করিলেন। মালিক অম্বরের মৃত্যু হইয়াছিল, তাঁহার পুত্র ফতে খাঁ'র উপর নিজামশাহী সুলতান ২য়

মুর্তজার আস্থা ছিল না। তিনি ফতে খাঁকে কারারুদ্ধ করিয়া খাঁ জাহান লোদী নামে একজন আফগান ওমরাহের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন; খাঁ জাহান লোদী শাহজাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। শাহজাহান স্থির করিলেন যুগপৎ আহম্মদনগরের বিবিধ সঙ্কটক্ষেত্র আক্রমণ করিবেন। তাহারই সঙ্গে সঙ্গে মোগল পক্ষ হইতে মারাঠা সর্দারদের দান করা হইতে লাগিল প্রভূত সাহায্য ও উৎসাহ। বিপদ বুঝিয়া ২য় মুর্তজা ফতে খাঁকে মুক্তিদান করিলেন, কিন্তু ফতে খাঁ তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করিলেন হুসেন শাহ নামে এক বালক রাজাকে (১৬৩০)। খুৎবা আবৃত্তি এবং সম্রাটের নামে মুদ্রা প্রচলন করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ফতে খাঁ। খাঁ জাহান লোদীর বিদ্রোহ দমন করা হইল। মহবৎ খাঁ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। ১৬৩৩ সালে নূতন নিজামশাহী রাজধানী দৌলতাবাদ অধিকার হইল, রাজধানী অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে এই বংশের শেষ রাজা হুসেন শাহও বন্দী হইলেন। এইভাবে ঘটিল নিজামশাহী সুলতানীর কলঙ্কময় অবসান।

দাক্ষিণাত্য সম্পর্কিত ব্যাপার ঃ বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা ঃ এবার দেখা দিল এক নূতন বিপত্তি। আহম্মদনগরের পতনে সুযোগ বুঝিয়া বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সুলতান দু'জন উহার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ নিজ নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইবার ফিকির করিলেন। স্বনামধন্য শিবাজীর পিতা শাহজী একজনকে হাতের পুতুলের মতো নিজামশাহী সুলতান খাড়া করিয়া তাঁহারই নামে শাসন করিতে লাগিলেন নিজামশাহী রাজ্যের একাংশ। বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ তাঁহাকে উৎসাহ ও সাহায্য দান করিতে লাগিলেন। পূর্বে পরেন্দা নামে একটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল নিজামশাহী সুলতানদের হাতে, এখন বিজাপুরের সুলতান আসিয়া তাহা দখল করিয়া বসিলেন। মহবৎ খাঁ উহা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। শাহজাহান তাঁহাকে ধিক্কার দিয়া পাঠাইলেন, ১৬৩৪ সালে ভগ্নহৃদয়ে তাঁহার মৃত্যু হইল।

সম্রাট এবার দাক্ষিণাত্যে স্বীয় অধিকার সুদৃঢ় করিয়া তুলিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলেন। যুদ্ধকার্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৬৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন দাক্ষিণাত্যে। বিজাপুর ও

গোলকোণ্ডা আক্রমণের জন্য নিয়োজিত হইল তিন-তিনটি মোগল বাহিনীর মোট ৫০,০০০ সৈন্য, এবং ৮,০০০ সৈন্যের আর-একটি বাহিনী নিযুক্ত হইল শাহজী-শাসিত জুন্নার, পুনা, চাকন ও কোঙ্কন অঞ্চল দখল করার জন্য। গোলকোণ্ডার সুলতান আব্দুল্লা কুতব শাহ কঠিন বাধাদানের কথা চিন্তা করিতেও সাহস পাইলেন না। তিনি মোগল সম্রাটকে অধিরাজ রূপে স্বীকার করিয়া লইয়া বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা করদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু বিজাপুরের সুলতান বাধাদান করিলেন। মোগল বাহিনী তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসসাধন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলেও বিজাপুর রাজ্য বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। ১৬৩৬ সালের মে মাসে বিজাপুরের সুলতান একটা নিষ্পত্তি করিতে সম্মত হইলেন। তখনকার সেই সন্ধির শর্ত অনুসারে আদিল শাহ মোগল অধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়া গোলকোণ্ডা রাজ্যের সীমানা লঙ্ঘন না করিতে এবং ক্ষতিপূরণস্বরূপ ২০ লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন; তবে স্থির হইল তাঁহাকে কোনরূপ বার্ষিক কর দিতে হইবে না। পুনা জেলা ও উত্তর কোঙ্কন সমেত আহম্মদনগর রাজ্যের একাংশ তাঁহার হস্তগত হইল, উহার রাজস্বের পরিমাণ ছিল বার্ষিক ৮০ লক্ষ টাকা। আহম্মদনগর রাজ্যের অবশিষ্টাংশ মোগল সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হইয়া পড়িল। মোগল ও তাহাদের মিত্র বিজাপুরীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িলেন শাহজী, এবং শেষ অবধি উত্তর কোঙ্কনের অন্তর্গত মাহুলি নামক স্থানে সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার না করিয়া তাঁহার কোনও উপায় রহিল না। হাতের পুতুল নিজাম শাহকে পরিত্যাগ করিলেন তিনি, যে সকল দুর্গ ও রাজ্যখণ্ড তিনি জয় করিয়াছিলেন তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। কেবল পুনা জেলায় সামান্য একখণ্ড জায়গীর তাঁহাকে রাখিতে দেওয়া হইল, তাহাও তিনি ভোগ করিতে লাগিলেন বিজাপুরের একজন ক্ষুদ্র সামন্তরূপে।

দাক্ষিণাত্য সম্পর্কিত ব্যাপার ঃ রাজপ্রতিনিধি-রূপে ঔরঙ্গজেব (১৬৩৬-৪৪, ১৬৫২-৫৭) ঃ এইভাবে দাক্ষিণাত্য সম্পর্কিত ব্যাপারের নিষ্পত্তি ঘটিল; পরিষ্কার করিয়া নির্ধারিত হইল মোগল সাম্রাজ্য এবং বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সুলতানী দু'টির সীমানা। ১৬৩৬ সালের জুলাই মাসে শাহজাহান উত্তর-ভারতে ফিরিয়া আসিলেন; দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি রূপে সেখানকার রাজধানী ঔরঙ্গাবাদে রাখিয়া

আসিলেন তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেবকে। খড়কি গ্রামে এই শহরটির প্রথম পত্তন করেন মালিক অম্বর, তারপর ঔরঙ্গজেবের নামানুসারে উহার নূতন নামকরণ হয়। এখান হইতেই ঔরঙ্গজেব তখন যে চারিটি প্রদেশ লইয়া মোগল-অধিকৃত দাক্ষিণাত্য গঠিত ছিল[১] তাহা শাসন করিতেন। ১৬৩৮ সালে এই তরুণ রাজপ্রতিনিধি দাক্ষিণাত্য হইতে গুজরাট যাইবার বড় সড়কের উপর অবস্থিত বাগলানা নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন ; সহজেই রাজ্যটি অধিকৃত হয়। ঔরঙ্গজেবের প্রথমবারের এই রাজ-প্রতিনিধিত্ব ১৬৪৪ সালে সহসা তাঁহার রাজানুগ্রহভ্রংশ ও পদচ্যুতির ফলে সমাপ্ত হয়। ১৬৪৫ সালে পুনরায় তিনি রাজানুগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহাকে প্রেরণ করা হয় গুজরাটে এবং সেখান হইতে বল্‌খ ও বদখ্‌শানে। দাক্ষিণাত্যে পর পর অল্পকালের জন্য কয়েকজন রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসেন, কিন্তু কেহই কোনরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন না। ১৬৫২ সালে ঔরঙ্গজেবের পুনর্নিয়োগ হয়। মোগলদের সৌভাগ্যক্রমে ১৬৪৪-৫২ সালের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে এমন কিছুই ঘটে না।

১৬৫২ সালে ঔরঙ্গজেব যখন দ্বিতীয় বারের মতো দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হইয়া আসেন তখন তিনি দেখিতে পান দেশটির শাসনকার্য মোটেই সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ হয় নাই, রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, কর্ষিত ভূমির আয়তনও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যন্তভাগে বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা রাজ্য দু'টি দমন না করার ফলে দাক্ষিণাত্যে এক বিরাট বাহিনী পোষণ করিতে হইত। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের কোনরূপ সামঞ্জস্য ছিল না ; ফলে তরুণ রাজপ্রতিনিধিকে প্রায়ই পিতার নিকট প্রদেশের শাসনকার্য নির্বাহের জন্য অর্থসাহায্য ভিক্ষা করিতে হইত। তাহাতে আর্থিক ব্যাপার লইয়া পিতা-পুত্রের মধ্যে প্রায়ই বাদবিতণ্ডার অবতারণা হইত। সৌভাগ্যক্রমে ঔরঙ্গজেব একজন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন রাজস্ব-কর্মচারী খুঁজিয়া পান ; তিনি হইলেন মুর্শিদকুলী খাঁ। দাক্ষিণাত্যের ভূমিরাজস্বের ইতিহাসে তাঁহার কীর্তি স্মরণীয় হইয়া আছে। মুর্শিদকুলী খাঁ খোরাসান হইতে এ দেশে আগমন করেন।

১ এ সময় মোগল-শাসিত দাক্ষিণাত্য ছিল চারিটি প্রদেশে গঠিত : (১) খান্দেশ, (২) বেরার, (৩) তেলিঙ্গানা, (৪) আহম্মদনগর।

ঔরঙ্গজেবের দেওয়ান রূপে তিনিই দাক্ষিণাত্যে তোডরমলের রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তবে স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তিনি তোডরমলের ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তনও সাধন করেন; অনগ্রসর অঞ্চলসমূহে জমি জরীপ এবং রাজস্ব নির্ধারণের পদ্ধতি আঁকড়াইয়া বসিয়া না থাকিয়া তিনি লাঙ্গল পিছু থোক রাজস্ব নিরূপণের প্রাচীন প্রথা অথবা উৎপন্ন শস্যের অংশ গ্রহণের পদ্ধতিই স্বীকার করিয়া লন। মুর্শিদকুলীর রাজস্ব নির্ধারণের পদ্ধতিও বেশ উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি পরিত্যক্ত গ্রামগুলিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়া স্বাভাবিক জীবনধারা ফিরাইয়া আনেন। যে সব গ্রাম উৎখাত হইয়া গিয়াছিল সেগুলির পুনর্গঠনের জন্য আবশ্যক হইলে মূলধন যোগান দেওয়ার ব্যবস্থাও তিনি করেন।

দাক্ষিণাত্যে কেবল শাসকরূপে সাফল্য অর্জন করিয়াই ঔরঙ্গজেব তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না, বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সুলতানী দু'টির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া রাজ্যবিস্তারের জন্যও তিনি উৎসুক ছিলেন। এই দু'টি রাজ্যের অপরিমেয় ধনসম্পদ হস্তগত করিয়া নিজের এবং নিজ অনুচরবর্গের শক্তিবৃদ্ধির অভিলাষও তিনি অন্তরে পোষণ করিতেন। গোলকোণ্ডা রাজ্যটি ছিল বিশেষ উর্বর, উহার রাজধানী হায়দরাবাদ ছিল পৃথিবীতে হীরক-ব্যবসায়ের কেন্দ্র, আর সে রাজ্যের সুলতান কুতব শাহ ছিলেন ঐশ্বর্যবান, দুর্বল ও অকর্মণ্য। বিজাপুরের সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ (১৬২৫-৫৬) যে রাজ্য শাসন করিতেন তাহা একদিকে আরবসাগর এবং অপরদিকে বঙ্গোপসাগর অবধি ভারতীয় উপদ্বীপের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান ছিল। ১৬৫৬ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন; অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ ২য় আদিল শাহের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; উচ্চাভিলাষী মোগল রাজপ্রতিনিধি সে সুযোগ হেলায় হারাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

রাজপ্রতিনিধিরূপে ঔরঙ্গজেব: গোলকোণ্ডার সহিত যুদ্ধ (১৬৫৬): গোলকোণ্ডার সহিত ঔরঙ্গজেবের বিবাদের কারণও প্রায়ই দেখা দিত। বার্ষিক কর দেয় ছিল হুনের হিসাবে, হুন ছিল দক্ষিণ-ভারতের এক প্রকার স্বর্ণমুদ্রা, উহার বিনিময়ের হার ৪৲ টাকার স্থলে ৫৲ টাকায় উঠিয়াছিল। কিন্তু কুতব শাহ পুরাতন হারেই কর দিতে চাহেন। এদিকে তিনি কর্ণাটকের (কৃষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ ভূভাগের) বিস্তৃত অংশে কয়েকটি

বিজয় অভিযান প্রেরণ করেন। মোগল রাজপ্রতিনিধি অভিযোগ করিলেন, এ কাজে তাঁহার অধিরাজ অর্থাৎ মোগল সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ করা হয় নাই। অবশেষে ১৬৫৬ সালে মীর জুমলার ব্যাপারে যুদ্ধ ত্বরান্বিত হইয়া পড়িল।

ইতিহাসে 'মীর জুমলা' (গোলকোণ্ডা রাজ্যের একটি সরকারী উপাধি) নামে বিখ্যাত মহম্মদ সঈদ ছিলেন পারস্যের অন্তর্গত আদিস্তানের জনৈক সৈয়দ। তাঁহার পিতা ইস্ফাহানে তৈলের ব্যবসায় করিতেন। শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত অসম-সাহসী সঈদ ব্যবসায়ী রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জনের বাসনায় গোলকোণ্ডার শিয়া রাজ্যে পদার্পণ করিয়া কালক্রমে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইয়া দাঁড়ান। দাক্ষিণাত্যে তাঁহার ন্যায় বিপুল বৈভব সম্ভবতঃ আর কেহই অর্জন করিতে পারেন নাই ; তিনি হইয়া উঠিয়াছিলেন বিশ মণ হীরার মালিক। তা'ছাড়া তাঁহার হাতে ছিল চমৎকার একসারি কামান, তাঁহার অধীনে কাজ করিত য়ুরোপীয় গোলন্দাজ সৈনিকেরা। কর্ণাটকের যে অঞ্চলটি ছিল গোলকোণ্ডার অন্তর্ভুক্ত, সেখানে তিনি এক বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার অস্ত্রবল এবং ভূসম্পত্তির উপর তাঁহার অবাধ—প্রায় নিরঙ্কুশ—কর্তৃত্বের ফলে তিনি তাঁহার একান্ত অকর্মণ্য সুলতান আবদুল্লা কুতব শাহকে আচ্ছন্ন করিয়া বসিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে বিভেদসৃষ্টি অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল, দরবারে তাঁহার পুত্র মহম্মদ আমিনের উদ্ধত ব্যবহার তাহা ত্বরান্বিত করিল মাত্র। ১৬৫৫ সালের নবেম্বর মাসে মহম্মদ আমিনকে কারারুদ্ধ করা হইল।

ইহাই হইয়া দাঁড়াইল ঔরঙ্গজেবের সুযোগ। ইহার কিছুকাল পূর্ব হইতেই মীর জুমলা মোগলদের সহিত যোগদানের কথাবার্তা চালাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাকে এবং তাঁহার পুত্রকে মোগল সরকারে চাকুরিও দেওয়া হয়। মহম্মদ আমিনের কারাদণ্ডের সংবাদ কানে আসিয়া পৌছিলে শাহজাহান অবিলম্বে তাঁহার কারামুক্তির জন্য কঠোর আদেশ দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তাঁহাকে মুক্তিদান করা না হয় তবে গোলকোণ্ডা আক্রমণ করিতে হইবে। ঔরঙ্গজেব যুদ্ধ ঘোষণার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াই ছিলেন, এখন নিরতিশয় চতুরতার সহিত তাঁহার মনস্কামনা পূরণের জন্য এই শর্তসাপেক্ষ আদেশ কার্যে প্রয়োগ করিলেন। কুতব শাহকে তিনি সম্রাটের এই অলঙ্ঘ্য আদেশ পালনের কোন সুযোগই দিলেন না, আদেশ অবহেলা করার অজুহাতকেই যুদ্ধঘোষণার যথেষ্ট কারণ বলিয়া ধরিয়া লইলেন। ১৬৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গোলকোণ্ডা

আক্রমণ করা হইল। এ যুদ্ধের জন্য বাস্তবিক শাহজাহান দায়ী ছিলেন না, ইহার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী ছিলেন ঔরঙ্গজেব নিজে; সুতরাং ইহাকে শাহজাহানের অনুসৃত কর্মপন্থার পরিণতিস্বরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। ইহা ঠিক সম্রাটের আক্রমণাত্মক কর্মনীতির ফল ছিল না, ইহা ছিল প্রধানতঃ রাজপ্রতিনিধির আক্রমণাত্মক কর্মনীতির পরিণতি—দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি যদি ভারত-সম্রাট হইয়া উঠিতে পারেন তবে তাঁহার অনুসৃত কর্মপন্থা কিরূপ হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা ছিল তাহারই পূর্বাভাস মাত্র।

গোলকোণ্ডার যুদ্ধের স্থিতিকাল ছিল সংক্ষিপ্ত, গতি ছিল দ্রুত। ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা মহম্মদ সুলেমান হায়দরাবাদে প্রবেশ করিলেন। কুতব শাহ গোলকোণ্ডায় পলায়ন করিলেন। ঔরঙ্গজেব স্বয়ং আসিয়া গোলকোণ্ডা অবরোধ করিলেন। অবরোধ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঔরঙ্গজেব সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন না, পিতার নিকট গোলকোণ্ডা অধিকারের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া পত্রের পর পত্র লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু দিল্লীতে কুতব শাহের দূত শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শুকোহ্‌র আনুকূল্য লাভে কৃতকার্য হইলেন; দারার নিকট হইতেই শাহজাহান জানিতে পারিলেন ঔরঙ্গজেবের কৌশলজাল বিস্তারের কাহিনী। অসন্তুষ্ট সম্রাট তখন অবরোধ প্রত্যাহারের জন্য কড়া হুকুম দিয়া পাঠাইলেন। ১৬৫৬ সালের ৩০শে মার্চ সন্ধি স্থাপিত হইল। গোল-কোণ্ডার সুলতান যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ এবং যতদিনের কর বাকি পড়িয়াছিল তাহা পরিশোধের জন্য মোট এক কোটি টাকা দিলেন, একটি জেলাও তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল। মীর জুমলা আসিয়া জুটিলেন ঔরঙ্গজেবের শিবিরে, সেখান হইতে তাঁহাকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়া পাঠানো হইল। দিল্লীতে গিয়া পৌছিলে তিনি সাদুল্লা খাঁ'র স্থলে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন; অল্পকাল পূর্বে সাদুল্লা খাঁ'র মৃত্যু হইয়াছিল। তবুও তখনও একটি বিষয় লইয়া গোলকোণ্ডার সহিত মতানৈক্য রহিয়াই গেল। হায়দরাবাদী কর্ণাটক নামে বর্ণিত অঞ্চলটি কুতব শাহের মতে ছিল তাঁহার নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত; মোগলদের চক্ষে উহা ছিল মীর জুমলার জায়গীর।

রাজপ্রতিনিধি রূপে ঔরঙ্গজেব: বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ (১৬৫৭)—মীর জুমলা দিল্লী গমন করিলে সেখানে আক্রমণাত্মক কর্মনীতিরই প্রাধান্য দেখা দিল। ১৬৫৬ সালের নবেম্বর মাসে

বিজাপুরের স্থলতান আদিল শাহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন ; সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তাঁহার তরুণ পুত্র ২য় আলী আদিল শাহ। ঔরঙ্গজেব মিথ্যাভাষণ করিয়া পিতাকে জানাইলেন যে, ২য় আলী আদিল শাহ বাস্তবিক বিজাপুরের মৃত স্থলতানের পুত্র নন, স্থলতানের হারেমে প্রতিপালিত এক নামগোত্রহীন বালক মাত্র। শাহজাহান বিজাপুর আক্রমণ সমর্থন করিয়া, ঔরঙ্গজেবকে 'তিনি যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেরূপ ভাবেই ব্যাপারটির মীমাংসা' করিতে অনুমতি দান করিলেন। বিদরের পতন ঘটিল, কল্যাণী শর্ত মানিয়া লইয়া আত্মসমর্পণ করিল, বিজাপুরে প্রবেশের পথে আর কোনরূপ বাধাই রহিল না। স্থলতান সম্রাটের দরবারে সন্ধির শর্ত আলোচনার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন দারা নিজে। শাহজাহান ঔরঙ্গজেবকে আদেশ দিয়া পাঠাইলেন বিদর, কল্যাণী ও পরেন্দার দুর্গকয়টি ছাড়িয়া দিলে এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ এক কোটি টাকা প্রদান করিলে যেন সন্ধি করা হয়। ইহার অল্পকাল পরেই শাহজাহান অসুস্থ হইয়া পড়েন ; মোগলদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আসন্ন, এই ভরসায় বিজাপুরীরা পরেন্দা ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইল না।

মধ্য-এশিয়া সম্পর্কিত কর্মনীতি[1]—বল্‌খ ও বদখ্‌শান বাবরের নিকট হইতে প্রাপ্য উত্তরাধিকার রূপে গণ্য হইত ; এ দু'টির অবস্থান ছিল তৈমুরের রাজধানী এবং বাবরের প্রথম জীবনের বহু বিজয়গৌরব ও ভাগ্যবিপর্যয়ের ক্ষেত্র সমরকন্দের পথে। এতকাল মোগল সম্রাটগণ উত্তর-ভারত ও দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যবিস্তার লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন। ১৬৩৬ সালে দাক্ষিণাত্যের ব্যাপার সমাধা করার পর শাহজাহান মনে করিলেন, এবার বাবরের নিকট হইতে প্রাপ্য উত্তরাধিকার হস্তগত করার চেষ্টা করিবার স্থযোগ আসিয়াছে।

বল্‌খ ও বদখ্‌শানের অকর্মণ্য নরপতি নজর মহম্মদ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছিলেন ; সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। এমন কি তাঁহার পুত্র

---

১ রুশীয় তথ্যপঞ্জীতে বাবর কর্তৃক মস্কোতে দূত প্রেরণের উল্লেখ আছে। ১৬১৩-১৬৪৫ সালের মধ্যে ভারতীয় বণিকগণ ভোল্‌গা (Volga) নদীতীরে বসতি স্থাপন করেন। ১৬২৫ সালে আস্ত্রাখানে একটি ভারতীয় সরাই নির্মিত হয়। ১৬৯৫ সালে একজন রুশীয় বাণিজ্যদূত ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতে আসেন। (নেহরু, *Discovery of India*, পৃষ্ঠা ৩০৮)

আবদুল আজিজ পর্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া তিনি শাহজাহানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠান। এই গোলযোগের সদ্ব্যবহার করার অভিপ্রায়ে ১৬৪৬ সালে যুবরাজ মুরাদের নেতৃত্বে একদল মোগল সৈন্য প্রেরণ করা হয়। তাহারা আসিয়া বদখ্শান ও বল্‌খ অধিকার করিয়া বসে। বিপত্তি দেখিয়া নজর মহম্মদ ইস্ফাহানে রওনা হন। কিন্তু মধ্য-এশিয়ার উষর ও অপ্রীতিকর ভূমিভাগ পরিত্যাগ করিতে উন্মুখ মুরাদ তাঁহার সৈন্যদলকে নেতৃবিহীন অবস্থায় ফেলিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। তখন আলী মর্দান খাঁ'র সহিত ঔরঙ্গজেবকে সেখানে প্রেরণ করা হয়। আলী মর্দান খাঁ ছিলেন পারসিক; তিনিই কান্দাহার মোগলহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে আব্দুল আজিজ মোগল অধিকারের দৃঢ়তা সম্পাদনে ক্রমাগত বাধাদান করিয়া চলিতে থাকেন। অক্ষুনদীর সীমারেখা রক্ষা করা ছিল এক দুরূহ ব্যাপার; উজবেগরা নদী পার হইয়া আসিয়া মোগলদের রক্ষিশিবির আক্রমণ অথবা লুণ্ঠন করিয়া পলাইত; মোগলরা দেখিল ক্ষিপ্রগতি উজবেগদের দমন করা তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। অবশেষে সম্রাট বল্‌খ পরিত্যাগ করাই সাব্যস্ত করিলেন; ১৬৪৭ সালের অক্টোবর মাসে নজর মহম্মদের প্রতিনিধিদের হাতে দুর্গ প্রত্যর্পণ করা হইল।

বল্‌খ অভিযানের অসাফল্যের মূল কারণ ছিল এতদূরে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে মোগল ওমরাহদের ইচ্ছার অভাব। তাঁহারা বিলাসবৈভবে জীবন যাপন করিতে একান্ত অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, মধ্য-এশিয়ার নীরস কঠোর জীবন তাঁহাদের নিকট রুচিকর বোধ হইত না। তাঁহাদিগকে "মসলিনের ঘাগরা-পরা পাণ্ডুর পুরুষ" রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তা' ছাড়া তাঁহারা স্থানীয় লোকেদের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। এই অভিযানের ফলে ভারতীয় রাজকোষের ৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু এক ইঞ্চি জমিও লাভ হয় নাই।

পারস্যের সহিত সম্পর্ক: পারস্যের সম্রাট ১ম শাহ আব্বাস ১৬২৯ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সিংহাসনে আরোহণ করেন শাহ সফী। পারস্যের মোগল দূত তাঁহার প্রভুকে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, পারস্য একদিকে তুর্কিদের এবং অপর দিকে উজবেগ ও আস্ত্রাখানদের আক্রমণের মুখে পড়িয়াছে। এইসব সংবাদের যাথার্থ্য নিরূপণের জন্য, দৃশ্যতঃ দিল্লী সাম্রাজ্যের সদ্ভাব সম্পর্কে

শাহকে আশ্বাস দানের অজুহাতে, পারস্যে আর একজন দূত প্রেরিত হয়। শাহের সহিত কান্দাহারের পারসিক শাসনকর্তা আলী মর্দান খাঁর মতানৈক্য ঘটে। তাঁহাকে মোগলদের হাতে কান্দাহার সমর্পণ করিতে সম্মত করাইয়া মোগল ওমরাহ-শ্রেণীতে অতি উচ্চ আসন দান করা হয়। পারসিকেরা উহা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে বটে, কিন্তু সফলকাম হইতে পারে না। মোগলদের সৌভাগ্যক্রমে শাহ সফী "তুরস্কের রণরত সুলতান" ৪র্থ মুরাদের সহিত যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন; তারপর যখন পারস্য ও তুরস্কের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়, ততদিনে কান্দাহারে মোগলদের অবস্থা সংহতি লাভ করিয়াছে।

১৬৪২ সালে শাহ সফীর মৃত্যু হয়। সিংহাসনে আরোহণ করেন ২য় আব্বাস। তিনি ছিলেন বালক মাত্র। অভিভাবকতন্ত্রে গোলযোগ ছিল প্রায় অনিবার্য। কিন্তু বল্‌খ-বদখ্‌শানের যুদ্ধে ব্যর্থতা বরণ করার ফলে মোগলদের মর্যাদাহানি ঘটিয়াছিল, তাহাতে পারস্যের উৎসাহবৃদ্ধি হয়। ২য় শাহ আব্বাস বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সঙ্গোপনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। ১৬৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পারসিকেরা আসিয়া কান্দাহার অবরোধ করে, ১৬৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উহা অধিকৃত হয়। মোগলদের ব্যর্থতার কারণ ছিল সাবধানতার অভাব এবং দুর্গরক্ষীদের সাহায্যের জন্য সৈন্যদল প্রেরণে বিলম্ব।

কিন্তু মোগলদের মর্যাদা রক্ষার জন্যই কান্দাহারের পুনরুদ্ধার সাধনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ঔরঙ্গজেব ও সাদুল্লা খাঁর অধীনে ৫০,০০০ সৈন্য লইয়া গঠিত প্রথম অভিযান-বাহিনী আসিয়া উপনীত হয় ১৬৪৯ সালের মে মাসে। দুর্গটি সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ হয়, কিন্তু বড় বড় কামানের অভাবে দুর্গপ্রাকার সম্পূর্ণ অক্ষতই রহিয়া যায়। কান্দাহারের ২৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এক সম্মুখ-সমরে মোগলদের হাতে এক পারসিক বাহিনীর নিদারুণ পরাভব ঘটিলেও, তাহাদিগকে অবরোধ প্রত্যাহার করিতে হয়। তা' ছাড়া পারসিক দুর্গাধ্যক্ষ মিহ্‌রাব খাঁ ছিলেন একজন অসাধারণ কর্মকুশল ব্যক্তি।

১৬৫২ সালে ঔরঙ্গজেব ও সাদুল্লা খাঁ দ্বিতীয়বার কান্দাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। প্রথমবারের অবরোধে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল সেগুলিরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। ভারতীয় গোলন্দাজরা দুর্গপ্রাকারের কোনরূপ ক্ষতিসাধনই করিতে পারে না। পুনরায় অবরোধ প্রত্যাহার করিতে হয়। ১৬৫৩ সালের এপ্রিল মাসে দারা শুকোহ্‌র নেতৃত্বে হয় তৃতীয়বারের প্রচেষ্টা। প্রাথমিক কার্যাবলীতে

তিনি কিছু কিছু সাফল্য অর্জন করেন বটে, কিন্তু শেষ অবধি তাঁহাকে ব্যর্থতাই স্বীকার করিতে হয়। কান্দাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় মোগলদের এই লজ্জাকর ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল মোগলদের আগ্নেয় অস্ত্রের দৈন্য। তিন-তিনবারের এই অবরোধের জন্য ব্যয় হয় ১০ কোটিরও অধিক টাকা; সব কয়টিরই ব্যর্থতার ফলে মোগলদের মর্যাদা ধূলিসাৎ হইয়া যায় এবং তদনুপাতে বৃদ্ধি পায় পারস্যের সামরিক মর্যাদা। "পরে বহু বৎসরের জন্য ভারতের পশ্চিম সীমান্তে কালমেঘের মতো ঝুলিতে থাকে পারসিক আতঙ্ক।"

সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ (১৬৫৭-১৬৬০)ঃ শাহজাহান ১৬৫৭ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর সহসা অসুস্থ হইয়া পড়েন। তৈমুর-বংশের ইতিহাসে সিংহাসনের জন্য সংগ্রাম ছিল একটা চল্‌তি নিয়ম, নিয়মের ঠিক ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু এখন যে সংগ্রাম শুরু হইল তাহা ছিল পূর্ববর্তী অন্যান্য রাজত্বকালের সিংহাসন লইয়া গোলযোগ অপেক্ষা বহুগুণে মর্মান্তিক ব্যাপার, কেননা এবার প্রতিদ্বন্দ্বীরা সকলেই ছিলেন পরস্পরের প্রায় সমতুল্য, 'তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ছিল রাজোচিত অনুচরের দল।' শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ দারার হাতে ছিল এলাহাবাদ, পঞ্জাব ও মূলতানের রাজপ্রতিনিধিত্বের ভার; এই সকল প্রদেশ তিনি তাঁহার প্রতিনিধিদের মারফৎ শাসন করিতেন। তিনি ছিলেন ৪০,০০০ অশ্বারোহীর মনসবদার। পিতার নির্বাচিত ভাবী সিংহাসনাধিকারী রূপে তিনি ছিলেন প্রায় রাজকীয় মানমর্যাদায় ভূষিত। তাঁহার প্রতি শাহজাহানের স্নেহের আতিশয্যবশতঃ "তিনি কখনও রণনীতি ও শাসননীতিতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন নাই; বাধা ও বিপদের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া মানব-চরিত্র বিচারের ক্ষমতা তিনি কখনও অর্জন করেন নাই; যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাঁহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।" শাহজাহানের মধ্যম পুত্র সুজা সপ্তদশ বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন অলসপ্রকৃতি, তবে সময়-বিশেষে প্রবল উৎসাহে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল, কিন্তু অবিচল প্রচেষ্টার শক্তি ছিল না। এই জীবনমরণ সংগ্রামের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ছিলেন তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব। স্থিরধীর, বিচক্ষণ, চক্রান্তে পটু, এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় মানুষ, তিনি ছিলেন শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মকুশল, তাঁহারই ছিল এই শক্তিপরীক্ষায় বিজয়ীর বেশে উত্তীর্ণ

হওয়ার সর্বাধিক সম্ভাবনা। ভ্রাতাদের মধ্যে কনিষ্ঠ, প্রমত্তস্বভাব, সুখসন্ধানী, নির্বোধ মুরাদ ছিলেন গুজরাটের শাসনকর্তা ; তাঁহার যাবতীয় নিঃশঙ্ক বীর্যবত্তা সত্ত্বেও ঔরঙ্গজেবের গভীর কূটবুদ্ধির কাছে তিনি ছিলেন শিশুমাত্র। তাঁহারই সহিত এই শক্তিপরীক্ষার প্রারম্ভেই তিনি মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন।

শাহজাহানের পীড়ার সংবাদ পাইয়া প্রথমে তিন ভাই দারার বিরুদ্ধে একত্র যোগদান করেন। ঔরঙ্গজেবের পক্ষে মুরাদের সহিত একযোগে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ ছিল। সুজা থাকিতেন বহুদূরে, তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ সহযোগিতার সম্ভাবনা ছিল না। স্থির হইল তিনজনে আগ্রায় আসিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইবেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে এইরূপ বোঝাপড়ার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য হইল দারার কবল হইতে সম্রাটের মুক্তিবিধান। ইত্যবসরে দারা নিজের শক্তিবৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিয়াছিলেন। সম্রাটের নামে তিনি স্বহস্তেই যাবতীয় রাজকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। মীরজুমলা এবং অন্যান্য যে সব ওমরাহ দাক্ষিণাত্যে ছিলেন তাঁহাদের সকলকে উত্তর ভারতে প্রত্যাগমনের আদেশ দেওয়া হইল। স্থির হইল প্রদেশগুলিও নূতন ভাবে গঠন করা হইবে।

শাহজাহান ১৬৫৭ সালের নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রের গতি নিরতিশয় দ্রুত হইয়া উঠিয়াছিল। ডিসেম্বর মাসে আহম্মদনগরে মুরাদের অভিষেক হইল ; বঙ্গদেশে সুজা নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল ; মীর জুমলা নিজের চমৎকার কামানের সারি লইয়া আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। ১৬৫৮ সালের মার্চ মাসে ঔরঙ্গজেব বুরহানপুর হইতে যাত্রা করিলেন। এপ্রিল মাসে তিনি নর্মদা পার হন, উজ্জয়িনীর নিকট মুরাদ আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করেন। ইহার পূর্বেই ঔরঙ্গজেব ধর্মসাক্ষী করিয়া মুরাদের সহিত এইরূপ এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ হইলে মুরাদ লাভ করিবেন পঞ্জাব, আফগানিস্তান, কাশ্মীর এবং সিন্ধুপ্রদেশ ; সেখানে তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবেন।

এই গৃহবিরোধের প্রথম যুদ্ধের অনুষ্ঠান হয় ১৬৫৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী বারাণসীর নিকট বাহাদুরপুরে। সেখানে দারার পুত্র সুলেমান শুকোহ্ এবং অম্বরের রাজা জয়সিংহের নেতৃত্বে দারার সৈন্যবাহিনীর হাতে সুজার পরাভব ঘটে। যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ এবং কাসিম খাঁকে ঔরঙ্গজেব ও

মুরাদের অগ্রগতিতে বাধাদানের জন্য প্রেরণ করা হয়। ১৬৫৮ সালের ১৫ই এপ্রিল উজ্জয়িনীর নিকট ধর্মাট নামক স্থানে দুই বিপক্ষ দলের সাক্ষাৎকার ঘটে। বাদশাহী ফৌজে ছিল ৩৫,০০০-এর অধিক সৈন্য, অর্থাৎ দুই ভাইয়ের মিলিত বাহিনীর সৈন্যসংখ্যার ঠিক দ্বিগুণ। কিন্তু বাদশাহী শিবিরে ছিল ঐক্যের একান্ত অভাব—কাসিম খাঁ যশোবন্ত সিংহকে কোনরূপ সাহায্যই করিলেন না; তা' ছাড়া মাড়ওয়াড়ের রাজা সাহসী হইলেও নেতৃত্বে বিশেষ পটু ছিলেন না। ঔরঙ্গজেব চূড়ান্ত বিজয়লাভ করিলেন, তাঁহার অনুচরদের চক্ষে স্বভাবতঃই তাহা শুভলক্ষণ রূপে প্রতিভাত হইল। "এক আঘাতেই দারাকে তিনি অত্যুচ্চ স্থান হইতে তাঁহার সমপর্যায়ে অথবা আরও নীচে নামাইয়া আনিলেন।"

তবে এই গৃহবিরোধের সর্বাপেক্ষা চূড়ান্ত মীমাংসা হয় আগ্রার নিকটে সামুগড়ের যুদ্ধে। ধর্মাটের যুদ্ধে বিজয়লাভের পর ঔরঙ্গজেব চম্বল নদী পার হইয়া স্বয়ং দারা কর্তৃক পরিচালিত বাদশাহী ফৌজের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল ৫০,০০০ বাদশাহী সৈন্য। কিন্তু এক রাজপুত বাহিনী আর দারার নিজের সৈন্যেরা ছাড়া আর কেহই ঠিক ভরসার পাত্র ছিল না; খলিলুল্লা খাঁ নামে একজন বিশিষ্ট আমীরের মন ঔরঙ্গজেব ইতিপূর্বেই বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আর কোনও যুদ্ধেই বোধ হয় ইহার চেয়ে চূড়ান্ত বিজয়লাভ ঘটে নাই, পরাজয়ের ফলও বোধ হয় ইহার চেয়ে মর্মান্তিক হইয়া উঠে নাই। দারার পক্ষাবলম্বীদের মধ্যে দশ হাজার লোক রণশয্যা গ্রহণ করিল; নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন প্রথমশ্রেণীর বাদশাহী সৈন্যাধ্যক্ষেরা—নয়জন রাজপুত এবং উনিশজন মুসলিম সেনানায়কের নাম উল্লেখ করিয়াই এবিষয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই যুদ্ধের ফলেই সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটে।

ইহার পর এ কাহিনীর উপসংহারে আর কালক্ষেপের প্রয়োজন হয় না। সামুগড়ের যুদ্ধের পর দারা পঞ্জাবে পলায়ন করেন। ১৬৫৮ সালের জুন মাসে ঔরঙ্গজেব আগ্রায় প্রবেশ করিলেন; শাহজাহানের দীর্ঘকালব্যাপী বন্দিজীবন শুরু হইল। এই মাসেই ঔরঙ্গজেব আবার মুরাদকেও কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন; ১৬৬১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করিয়া রাখার পর তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। মুরাদকে কারাগারে

নিক্ষেপ করিয়াই ঔরঙ্গজেব দারার বিনাশ সাধনে অগ্রসর হইলেন। বিপাশা নদীর তটরেখা রক্ষার জন্য দারা কিছুকাল ধরিয়া চেষ্টা করিতে থাকেন, কিন্তু ঔরঙ্গজেব তাঁহার সৈন্যদলে বিভেদ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। ভাগ্যহীন যুবরাজ লাহোর ছাড়িয়া মূলতানে পলায়ন করেন, সেখান হইতে যান সিন্ধুদেশে, তারপর প্রবেশ করেন গুজরাটে। সুজা এলাহাবাদ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া তিনি আগ্রা অভিমুখে ধাবিত হইতে চান। পথিমধ্যে যশোবন্ত সিংহের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়া পৌঁছে, যশোবন্ত সিংহ রাঠোরদের লইয়া তাঁহার সহিত যোগদানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ১৬৫৯ সালের ৫ই জানুয়ারী খাজোয়ার যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের হাতে সুজা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন, এবং অম্বরের মীর্জা রাজা জয় সিংহের মধ্যস্থতায় যুগপৎ আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন এবং উচ্চপদ দানের আশ্বাস দান করিয়া ঔরঙ্গজেব যশোবন্ত সিংহকে স্বপক্ষে আনয়নে সমর্থ হন। রাজপুতদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া দারা দেওরাই গিরিপথ রক্ষার সঙ্কল্প করেন। সেখানে এক তুমুল সংগ্রাম হয়; তাহাতে জয়লাভের জন্য ঔরঙ্গজেব বহুলাংশে জম্মু পাহাড়ের রাজা রাজরূপ এবং তাঁহার পাহাড়-পর্বতে বিচরণে সুদক্ষ অনুচরদের নিকট ঋণী ছিলেন; তাহাদেরই গোপন গতিবিধির ফলে দারার বামভাগের পৃষ্ঠরক্ষী বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে (মার্চ, ১৬৫৯)। এই পরাজয়ের পর দারা আহম্মদাবাদে পলায়ন করেন, তারপর সেখান হইতে কান্দাহারের পথে পারস্যে গিয়া আশ্রয় লইবার জন্য পশ্চাদপসরণ করেন সিন্ধুদেশে। দারা একবার মালিক জীয়ন (বোলান গিরিপথের নিকট) নামে একজন বেলুচি সর্দারের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন; তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তিনি গিয়া তাহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ সর্দার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে এবং বাদশাহী দলের হাতে তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়। ১৬৫৯ সালের ৩০শে আগস্ট দারার প্রাণদণ্ড হয়।

এই গৃহবিরোধের একেবারে প্রথমদিকে বাহাদুরপুরে দারার সৈন্যদলের হাতে পরাভবের পর সুজা পুনরায় ঔরঙ্গজেবের নিকট খাজোয়ার যুদ্ধে পরাভূত হন। তখন ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ সুলতান ও মীর জুমলা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকেন। কিন্তু সুজা গোপনে যুবরাজকে নিজের দলে টানিয়া আনিয়া তাঁহার সহিত নিজের কন্যা গুলরুখ বেগমের বিবাহের প্রস্তাব করেন।

বঙ্গদেশে যুদ্ধ চলিতেই থাকে; মীর জুমলা দিল্লী বাহিনী পরিচালনা করিতে থাকেন; তাঁহার শক্তিও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। সুজার রাজধানী তণ্ডা বিপন্ন হইয়া পড়ে। সুজাকে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিতে হয়; ১৬৬০ সালের মে মাসে তিনি মাত্র ৪০ জন অনুচর সঙ্গে লইয়া আরাকানে পলায়ন করেন। ওলন্দাজদের এক বিবরণ অনুসারে, ১৬৬১ সালে সেখানে মগদের হাতে তাঁহার প্রাণ যায়।

বঙ্গদেশে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল তখন যুবরাজ মহম্মদ সুলতান পুনরায় আসিয়া বাদশাহী দলে যোগ দেন। জীবনের অবশিষ্ট কাল কারাগারে যাপন করাই ছিল তাঁহার ভাগ্যলিপি। ১৬৫৮ সালে দারার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ সুলেমান শুকোহ্ গাড়োয়ালে শ্রীনগরের রাজার নিকট পলায়ন করিয়াছিলেন। ১৬৬০ সালে তাঁহাকে বন্দী করা হয়, তারপর ধীরে ধীরে বিষপ্রয়োগের ফলে ১৬৬২ সালে গোয়ালিয়র দুর্গে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। শাহজাহানকে কড়া পাহারায় আগ্রা দুর্গে আবদ্ধ রাখা হয়; ১৬৬৬ সালের ২২শে জানুয়ারী তিনি স্বাভাবিক ভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতার প্রতি ঔরঙ্গজেবের ব্যবহার 'কেবল ধর্মবুদ্ধিই নয়, সে যুগের সামাজিক সদাচারও ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল।'

শাহজাহানের চরিত্র: শাহজাহান অসাধারণ ব্যক্তি, অথবা অনন্যসাধারণ নরপতি, কিছুই ছিলেন না; তবে মোটের উপর তাঁহার কর্মজীবন ছিল সাফল্যমণ্ডিত, কিন্তু ১৬৫৭-৬০ সালের গৃহযুদ্ধের ফলে ঘটে তাহার গ্লানিময় অবসান। শাসক রূপে ন্যায়বিচার ও দয়াধর্মের জন্য তাঁহার যে সুনাম ছিল তিনি বাস্তবিকই তাহার যোগ্য ছিলেন। ১৬৩০-৩২ সালে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য যখন এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে উৎসন্ন হইয়া পড়িবার উপক্রম হয় তখন লোকের দুঃখদুর্দশা লাঘবের জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে সম্ভবতঃ তিনি সচেতন ছিলেন না। বেনিয়ে বলেন, প্রাদেশিক শাসকদের উৎপীড়নের ফলে 'কৃষক ও শিল্পীরা প্রায়ই জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ হইতেও বঞ্চিত থাকিত।' আমলাতন্ত্র ও সৈন্যবাহিনীর বিপুল ব্যয়ভার বহন করিতে প্রজাদের প্রাণান্ত হইত, তাহার উপর আবার শাহজাহানের বিরাট সৌধাবলীর ব্যয়ভারও তাহাদের স্কন্ধে চাপিয়া বসে। করদাতাকে চারিদিক হইতে ক্রমাগত শোষণ করা হইতে থাকিলেও, সৈন্যবাহিনীর কর্মক্ষমতা ও মর্যাদা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া আসিতে-

ছিল। মধ্য-এশিয়া ও কান্দাহারে মোগল বাহিনীর ব্যর্থতার ফলে দুর্বলতার উদ্বেগজনক লক্ষণ প্রকাশ পায়; অষ্টাদশ শতকে তাহাই প্রকট হইয়া উঠে।

ধর্মের ব্যাপারে শাহজাহানের রাজত্বকালে যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, ঔরঙ্গজেবের আমলে দেখা দেয় তাহারই চরম পরিণতি। শাহজাহান তীর্থকরের পুনঃ-প্রচলন করেন, মন্দির নির্মাণ বন্ধ করিয়া দেন, এবং লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষাদানে উৎসাহ দিতে থাকেন। সম্ভবতঃ তাঁহার প্রিয়পুত্র দারার উদার মনোভাব তাঁহার ধর্মান্ধতাকে কিয়দংশে সংযত রাখিতে পারিয়াছিল। তিনি পত্নীর অনুরক্ত স্বামী এবং সন্তানদের স্নেহময় পিতা ছিলেন; কোন কোন য়ুরোপীয় পর্যটক তাঁহার চরিত্রে যে কলঙ্ক আরোপ করিয়া গিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহা ভিত্তিহীন।

জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের শাসন-ব্যবস্থা: স্মিথ জাহাঙ্গীরের শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন: "শাসন-ব্যবস্থা ভালো ছিল না। সুবাদারদের প্রত্যেকেই প্রায় যাহা খুশি তাহাই করিতে পারিতেন। অপরাধ দমনের জন্য নিষ্ঠুর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত।" তা' ছাড়া তিনি ইতালীয় পর্যটক মানুচীর এই বিবৃতিও অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে, শাহজাহান 'চমৎকার নিখুঁত ভাবে' রাজ্য শাসন করিতেন; বরং বেনিয়েরর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন যে, দেশে সুশাসন বলিতে কিছুই ছিল না। এ বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নাই যে, জাহাঙ্গীরের শৈথিল্যবশতঃ মনসবদারী প্রথার যথেষ্ট অপকর্ষ দেখা দিয়াছিল; তবে কর্মক্ষম ও কর্তৃত্বশালী শাহজাহান কঠোর হস্তে উহার পুনর্গঠন করেন। মোরল্যাণ্ডের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, এক-এক ক্ষেত্রে শাসনকার্য এক-একভাবে পরিচালিত হইলেও শাসন-ব্যবস্থার কাঠামো সর্বত্র প্রায় এক ছিল; ফলে পার্থক্যের পরিবর্তে বরং ছিল ঐক্যেরই প্রচলন।

অবশ্য একটি বিষয়ে আকবরের ব্যবস্থা হইতে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে "ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের অষ্টম বর্ষে যে আদেশ জারি হয় তাহাতে দেখা যায় রাজস্ব নির্ধারকগণ বৎসর বৎসর এক-একটা থোক টাকার প্রস্তাব করিতেন, এবং যখন কোন গ্রাম অথবা তদপেক্ষা বৃহত্তর কোন এলাকা তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিত, কেবল তখনই আকবরের প্রবর্তিত রাজস্ব সংগ্রহের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হইত। ইহার ফলে এক-একখানি গ্রাম আরও

সরাসরি ভাবে রাজস্ব-নির্ধারকদের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িত, আর ব্যক্তিগত ভাবে কৃষকরাও হইয়া পড়িত তাহাদের মধ্যে অধিকতর সম্বতিপন্ন লোকদের মুখাপেক্ষী। রাজস্ব-নির্ধারকদের উপর চাপের মাত্রা বাড়িয়াই চলিত, এবং ভূমি-রাজস্ব দিয়াই মিটাইতে হইত রাষ্ট্রের সেই বর্ধিত দাবি।......তাঁহার পরবর্তী বাদশাহেরা যতটা জমিতে চাষ-আবাদ হইতে পারে ততটার উপরই রাজস্ব ধার্য করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন, এবং রাষ্ট্রের দাবির হার থোক উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ হইতে অর্ধেকে টানিয়া দাঁড় করান।"

রাজকর্মচারী এবং ভারপ্রাপ্ত লোকেদের খেয়ালখুশির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল সম্রাটের বিরক্তি উৎপাদনের ভয়। সেজন্য সকলকেই পাছে দরবারে নিন্দা হয় তাই সাবধানে চলিতে হইত। জাহাঙ্গীরের আমলে, এবং বিশেষ করিয়া শাহজাহানের আমলে, শাসনকার্য নির্বাহে রাজকীয় অধীক্ষা কোনক্রমেই অবহেলার বস্তু ছিল না। মনিব হিসাবে শাহজাহান দয়ালু এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন; যে সকল কর্মচারীদের দ্বারা তিনি পরিবৃত থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও কর্মকুশল ব্যক্তির সংখ্যা যথেষ্টই ছিল। তাঁহার আমলে প্রজাদের অভিযোগে পরুষ ব্যবহার এবং উৎপীড়ন করিয়া অর্থ আদায়ের জন্য অনকয়েক প্রাদেশিক শাসকের কর্মচ্যুতির উদাহরণ আছে। রাজকর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারের পথে আরও একটি বাধা ছিল। একথা আমরা ভুলিয়া যাই যে তখনকার দিনে ব্যক্তির মান ততটা না থাকিলেও, সমষ্টিকে দস্তুরমতো সমীহ করিয়া চলিতে হইত। রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারীদের উপর সমষ্টিগত ভাবে চাপ দেওয়া এখনও এ দেশের একটি চিরাচরিত প্রথা। "১৬১৬ সালে সুরাটের আমদানি শুল্ককুঠির একজন কর্মচারী একজন গণ্যমান্য হিন্দু বণিকের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন; ফলে সমগ্র বণিক সম্প্রদায় একজোট হইয়া তাঁহাদের দোকান বন্ধ করিয়া দেন, এবং সুবাদারের নিকট মোটামুটি রকমে এক অভিযোগ পেশ করিয়াই শহর ত্যাগ করেন। ভাবখানা তাঁহাদের ছিল এইরূপ যে তাঁহারা ন্যায়বিচার প্রার্থনার জন্য দরবার অভিমুখে রওনা হইতেছেন। তখন তাঁহাদের নানারূপ কাকুতি-মিনতি করিয়া এবং, তাহার চেয়েও বেশি, অনেক রকমের সুযোগ-সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া ফিরাইয়া আনা হয়।" এরূপ ঘটনার বহু নিদর্শন আছে। সমষ্টিগত ভাবে কঠিন চাপ দেওয়া ছাড়াও, এ কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, দেশের এক বিরাট অংশ জুড়িয়া ধারদেনার লেনদেনের যে ব্যাপক ব্যবস্থা

ছিল, যাবতীয় রাজনৈতিক সীমা অতিক্রম করিয়া ছিল তাহার বিপুল বিস্তার; তাহা ব্যক্তিগত মর্জি আর খোশখেয়ালকে সর্বদাই সংযত রাখিত।

রাজস্বের বৃহত্তম অংশই নির্দিষ্ট থাকিত মোগল সরকারী কর্মচারীদের পরিপোষণের জন্য। ইংরেজদের মধ্যে এইরূপ প্রথম ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন উইলিয়ম হকিন্স; তাঁহার উক্তি হইতে আমাদের মনে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, এই সব সরকারী কার্যভারের কোনও স্থিরতা ছিল না। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে একটি নূতন প্রথার সৃষ্টি হয়—তাহা ছিল 'আলতম্‌ঘা' মঞ্জুর করার ব্যবস্থা; ইহা কেবল সম্রাটের কর্তৃত্ববলেই নাকচ হইতে পারিত, সাধারণভাবে রাজকার্য পরিচালন-ব্যপদেশে অন্যান্য কার্যভারের ন্যায় ইহা লাভ করা অথবা ইহাতে কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করা যাইত না। শাহজাহান যখন সাম্রাজ্যের আয়ব্যয়-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন তখন তিনি ব্যবস্থা করেন যে, রাজকোষের জন্য যথোপযুক্ত ক্ষেত্র নির্দিষ্ট থাকিবে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল ব্যাপিয়াও সরকারী কার্যভার ন্যাসের প্রথা চলিতে থাকে, তবে তাঁহার রাজত্বকালের শেষভাগে কার্যভার ন্যাসের পরিবর্তে প্রবর্তিত হয় নির্দিষ্ট রাজস্বের বিনিময়ে জমি বিলি করার ব্যবস্থা; তখন আর সম্রাটের পক্ষেও নির্বিবাদে ন্যস্ত ভূ-সম্পত্তি ভোগের নিশ্চয়তা দানের কোনও উপায় রহিল না।

উনবিংশ অধ্যায়

ঔরঙ্গজেব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজত্বকালের প্রথমার্ধ

ধর্মাট, সামুগড়, দেওরাই ও খাজোয়ার বিজয়ীবীর ১৬৫৯ সালের জুন মাসে 'আলমগীর' উপাধি গ্রহণ করিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকাল দু'টি প্রায় সমান ভাগে বিভক্ত; তাহার প্রথম ভাগ (১৬৫৮-১৬৮১) অতিবাহিত হয় উত্তর-ভারতে, দ্বিতীয় ভাগ (১৬৮২-১৭০৭) দাক্ষিণাত্যে। প্রথমার্ধে উত্তরাঞ্চলই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে, কেননা সেখানেই ঘটে যত গুরুতর ঘটনা। উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল এবং রাজপুতানাই ছিল উত্তর-ভারতে মোগলদের সামরিক ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন ক্ষেত্র। এই সময় দক্ষিণে শিবাজী মোগল-কর্তৃত্ব উপেক্ষা করিয়া জাতীয়তার সূত্রে মারাঠাদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিতেছিলেন; তবে ১৬৭৪ সালের পূর্বে স্বাধীন রাজা হিসাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁহার অভিষেক হয় নাই। এই সময় দাক্ষিণাত্যে তিনি মোগলদের ব্যাপৃত করিয়া রাখেন। দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর-ভারত এমনই অবহেলার বস্তু হইয়া উঠে যে গুরুত্বের দিক দিয়া উহা আসিয়া গৌণ স্থান অধিকার করে; সম্রাট তাঁহার পারিষদবর্গ, সৈন্যবাহিনী এবং কর্মচারীদের লইয়া দাক্ষিণাত্যেই বাস করিতে থাকেন, সেখানেই ঘটিতে থাকে যত অঘটন।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলঃ মীর জুমলা বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হন; নিয়োগকালেই "উক্ত সুবার অসংযত জমিদারদের, বিশেষ করিয়া আসাম এবং মগের (আরাকানের) জমিদারদের, শাস্তিদানের" জন্য তাঁহাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৬.২ সালে মোগল সাম্রাজ্যের সীমান্ত আসামের পশ্চিমাঞ্চলে গোয়ালপাড়া এবং কামরূপ অবধি বিস্তৃত হইয়াছিল এবং গৌহাটিতে একজন মোগল ফৌজদারও নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু আহোমরা সে সীমান্ত

লঙ্ঘন করে, এবং কুচবিহারের রাজাও মোগল-কর্তৃত্ব উপেক্ষা করেন। মীর জুমলা ১৬৬১ সালে ঢাকা হইতে যাত্রা করিয়া কুচবিহার অধিকার করার পর আসামে প্রবেশ করেন। ১৬৬২ সালের মার্চ মাসে আক্রমণকারী বাহিনী আহোমদের রাজধানী গড়গাঁওয়ে আসিয়া উপনীত হয়; লুণ্ঠিত সামগ্রীর অবধি থাকে না। আহোম-রাজ জয়ধ্বজ সিংহ পলায়ন করিতে বাধ্য হন, মোগল নৌ-বাহিনী আহোমদের নৌশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু বর্ষাকালের আবির্ভাবে আহোমদের পক্ষে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মোগল সামরিক ঘাঁটিগুলি আক্রমণের সুযোগ ঘটে। রসদ ও মালপত্র সরবরাহের পথ বন্ধ হইয়া যায়, আহোমদের আক্রমণে স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর যোগাযোগ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে, মোগল শিবিরগুলিতে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। বর্ষাশেষে মীর জুমলা পুনরায় আক্রমণ চালাইতে থাকেন, আহোম রাজার কোন কোন সহকারীকে দলে টানিয়া আনিতেও সমর্থ হন; কিন্তু তিনি ভয়ানক অসুস্থ হইয়া পড়েন, তখন মোগল বাহিনীই প্রায় তাঁহার হাতের বাহিরে চলিয়া যায়। নামমাত্র সুবিধাজনক শর্তে এক সন্ধি হয়; আহোমরাজ যুদ্ধের জন্য প্রভূত ক্ষতিপূরণ, বার্ষিক কর, এবং কয়েকটি অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন। ঢাকার পথে ১৬৬৩ সালের মার্চ মাসে মীর জুমলার মৃত্যু হয়। আহোম-রাজ যে সকল স্থান ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, অল্পকালের মধ্যেই সেগুলি মোগলদের হস্তচ্যুত হইয়া গেল; এমন কি, মীর জুমলার মৃত্যুর চারি বৎসর পরে আহোমরা তাহাদের হাত হইতে গৌহাটিও কাড়িয়া লইল। মোগল আর আহোমদের মধ্যে শুরু হইয়া গেল দীর্ঘকালব্যাপী খণ্ডযুদ্ধ, কিন্তু মোগলদের তাহাতে কিছুই লাভ হইল না। তবে কুচবিহারের রাজা তাঁহার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেও, রঙ্গপুর এবং কামরূপের পশ্চিমাঞ্চল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

মীর জুমলার পরবর্তী সুবাদার শায়েস্তা খাঁ ১৬৬৬ সালে আরাকানের রাজার নিকট হইতে চাটগাঁ (চট্টগ্রাম) কাড়িয়া লইলেন। কয়েকটি নৌযুদ্ধে আরাকানীদের পরাভব ঘটিল। চাটগাঁ হইয়া দাঁড়াইল নূতন এক মোগল ফৌজদারের ঘাঁটি। শায়েস্তা খাঁ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সন্দীপ নামে দ্বীপটিও কাড়িয়া লইলেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল: ভারতবর্ষ হইতে আফগানিস্তানে যাইবার পথে গ্রামগুলিতে এবং চারিদিকের পাহাড়-পর্বতে যে সব

পাঠান সর্দারের বাস ছিল তাঁহারা একান্ত অনিচ্ছায়ই মোগলদের বশ মানিয়া চলিতেন; সুবাদারের চরিত্রে দৌর্বল্যের লক্ষণ দেখিলেই, কিংবা বৈদেশিক যুদ্ধবিগ্রহ বাধিলেই তাঁহারা গোলযোগ সৃষ্টিতে বিলম্ব করিতেন না। ভারতবর্ষ ও কাবুলের মধ্যে যে পণ্যপ্রবাহ বহিত তাহার উপর এই সব আফ্রিদী, য়ুসুফজাই, খট্টক প্রভৃতি পার্বত্য উপজাতির শুল্ক আদায়ের অধিকার মোগল সরকার কার্যতঃ স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, তবুও উপজাতিদের বিদ্রোহ ছিল প্রায় যেন এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

১৬৬৭ সালে য়ুসুফজাইরা সহসা বিদ্রোহ করিয়া বসিল, দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া তাহারা চুচ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল, তাহাদের প্রতাপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল দিল্লী ও কাবুল এবং কাবুল ও কাশ্মীরের যোগাযোগ। অবশ্য মোগল সেনাপতি মহম্মদ আমিন খাঁ কঠিন আঘাতে তাহাদের শায়েস্তা করিয়া ফেলিলেন। ১৬৭১ সালে যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহের উপর দেওয়া হইল জামরুদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি রক্ষার ভার।

১৬৭২ সালে দেখা দিল আফ্রিদী এবং খট্টকদের বিদ্রোহ। আলী মসজিদে আফ্রিদী নেতা আকমল খাঁ'র হাতে ঘটিল কাবুলের সুবাদার মহম্মদ আমিন খাঁর পরাজয়। মহম্মদ আমিন খাঁ পেশোয়ারে পলাইয়া আসিলেন, কিন্তু দশ হাজার মোগল সৈন্যের প্রাণ গেল, বন্দী হইল বিশ হাজার, আফ্রিদীরা হস্তগত করিয়া বসিল প্রচুর মালপত্র। দূরদূরান্তরে বিঘোষিত হইতে লাগিল এই বিজয়বার্তা। কবি সর্দার খুশল খাঁ'র নেতৃত্বে খট্টকরা আসিয়া যোগ দিল আফ্রিদীদের সঙ্গে, আন্দোলন দ্রুতগতিতে মোগলদের বিরুদ্ধে পাঠানদের জাতীয় বিদ্রোহে পরিণতি লাভ করিতে চলিল। বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য সম্রাট শুজায়েৎ খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার সহিত সহযোগিতা করার জন্য আদিষ্ট হইলেন যশোবন্ত সিংহ। সম্রাটের অনুগ্রহেই সামান্য অবস্থা হইতে উচ্চপদে উন্নীত হইয়াছিলেন শুজায়েৎ খাঁ; যশোবন্ত সিংহের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া করপা গিরিবর্ত্মে তিনি প্রাণ হারাইলেন। মোগলদের সাম্রাজ্য-গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য ১৬৭৪ সালের জুন মাসে স্বয়ং ঔরঙ্গজেব হাসান আবদালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৎসরাধিক কাল সেখানে থাকিয়া তিনি যুদ্ধকার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকেন। তাঁহার প্রভাবে সাম্রাজ্যের অস্ত্রবলের ন্যায়ই সক্রিয় হইয়া উঠিল সাম্রাজ্যের কূটনীতি। বহু ক্ষেত্রে পরাভব সত্ত্বেও ১৬৭৫ সালের শেষভাগের

দিকে অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটিল ; সম্রাট দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। আমীর খাঁ নিজেকে সম্রাটের নিকট বিশেষ কৃতী ও কূটবুদ্ধি স্থবাদার রূপে প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইলেন ; আফগান সর্দারদের শান্ত করিয়া, উপজাতিতে উপজাতিতে বিভেদ বাধাইয়া দিয়া, আকমল খাঁর নেতৃত্বে গঠিত উপজাতি-সঙ্ঘ তিনি ভাঙ্গিয়া দিলেন, দুই হাতে বিতরণ করিতে লাগিলেন উৎকোচ, পণ্যপ্রবাহের জন্য মুক্ত রাখিলেন যত গিরিপথ। তবুও যোদ্ধা, কবি ও দেশপ্রেমিক খুশল খাঁ পাঠান জাতির স্বাধীনতা-পতাকা অবনমিত করিলেন না। অবশেষে তাঁহার নিজ পুত্র বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়, তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হয় গোয়ালিয়র দুর্গে।

আফগান যুদ্ধ ঔরঙ্গজেবের কর্মনীতির উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সাম্রাজ্যের আয়ব্যয়ের উপর ইহার ফল হয় সাংঘাতিক। ইহার রাজনৈতিক ফল ছিল আরও ক্ষতিকর। ইহা "রাজপুতদের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে আফগানদের নিয়োগ করা অসম্ভব করিয়া তোলে। অধিকন্তু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধের জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে বাছা বাছা মোগল সৈন্য সরাইয়া আনিয়া ইহা শিবাজীর উপর হইতে চাপ লাঘব করে।" এইরূপ পরোক্ষভাবে রাজপুত ও মারাঠাদের সাফল্য লাভে সহায়তা করে আফগানরা।

ধর্মনীতি : তাঁহার পুরোগামীদের অধীনে মোগল রাষ্ট্রের প্রকৃতি যেরূপ ছিল, তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেন ঔরঙ্গজেব। ইহাকে একটি নৈষ্ঠিক স্থন্নি রাষ্ট্রে পরিণত করার বাসনা পোষণ করিতেন তিনি, অথচ ইহার জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দুদেরই ছিল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। জানিয়া শুনিয়াই তিনি দার-উল-হর্ব (অ-মুসলমান দেশ)-কে পরিণত করিতে চান দার-উল-ইসলাম (মুসলমান রাজ্য)-এ। এই কর্মনীতি অনুসরণ করিতে গিয়া শাসনকার্যে তিনি যে সব বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেন সে সব ছিল সারা ভারতবর্ষে তাঁহার হিন্দু প্রজাদের বিরাগ উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। ১৬৬৫ সালের এক বিধানে আমদানি-শুল্কের হার নির্দিষ্ট হয় মুসলমান বণিকদের উপর শতকরা ২½ ভাগ, হিন্দু বণিকদের উপর শতকরা ৫ ভাগ। ১৬৬৭ সালে মুসলমানদের আমদানি-শুল্ক প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি দান করা হয়, কিন্তু হিন্দুদের উপর তাহা বলবৎ থাকে। ১৬৬৯ সালে প্রাদেশিক

শাসকদের উপর তিনি 'কাফেরদের যাবতীয় বিদ্যালয় ও মন্দিরাদি ধ্বংস করার জন্য' এক সাধারণ আদেশ জারি করেন। ১৬৭১ সালের এক বিধানে বলা হয় যে, কেবল মুসলমানদেরই করণিক (কেরানী) ও গাণনিক (হিসাবরক্ষক) রূপে নিযুক্ত করিতে হইবে, কিন্তু যখন দেখা গেল যে হিন্দুদের সহায়তা ব্যতীত শাসনকার্য পরিচালনা করা অসম্ভব তখন আদেশ হইল পেশকারদের অর্ধেক হইবে হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান। আকবর জিজিয়া কর বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, ১৬৭৯ সালের এপ্রিল মাসে 'ইসলামের বিস্তার সাধন এবং অধর্মের চর্চা বন্ধ করিবার জন্য' সাম্রাজ্যের সর্বত্র উহার পুনঃপ্রবর্তন হয়। এই কর হইতে প্রচুর অর্থাগম হইত। গুজরাট প্রদেশে ইহা হইতে পাওয়া যাইত বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা। ১৬৯৫ সালে একমাত্র রাজপুত ব্যতীত অন্যান্য সকল হিন্দুর পক্ষে পাল্কী, হাতী, আর ভালো জাতের ঘোড়ায় চড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ হইল।

ধর্মান্ধতা রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক নয়। ফরাসী রাজতন্ত্রের পক্ষে ১৪শ লুই কর্তৃক 'নাতেঁর রাজকীয় ঘোষণা' (Edict of Nantes) নাকচ করার যে কুফল ফলিয়াছিল, জিজিয়া করের পুনঃপ্রবর্তন মোগল রাষ্ট্রের পক্ষে তদপেক্ষাও ভয়াবহ ফল প্রসব করিল বলিতেই হইবে। শিবাজী একখানি সদ্‌যুক্তিপূর্ণ ও সাহসিক পত্রে জিজিয়া কর প্রবর্তনের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। রাজসিংহের প্রতিবাদ গ্রহণ করে মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাঠোর-গুহিলোত শক্তিসমবায়ের রূপ। ১৭১৩ সালে ফররুখসিয়র জিজিয়া কর প্রত্যাহার করেন, কিন্তু ১৭১৭ সালে উহার পুনঃপ্রবর্তন ঘটে ; তবে মহম্মদ শাহ তাঁহার হিন্দু অনুচরদের বিরাগ উৎপাদন অবিবেচনার কাজ মনে করিয়া উহার প্রচলন রদ করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার নামের সহিত জড়িত হইয়া থাকিলেও পরমতবিদ্বেষের এই পর্ব সম্রাটের মৃত্যুর পর অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। তবুও আকবর যে মোগল ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যক্ত না হইলে জাঠ, বুন্দেলা, মারাঠা, রাজপুত এবং শিখদের বিরোধিতা এমন প্রবল আকার ধারণ করিত না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধের পরিবর্তে দেখা যাইত আনুকূল্য।

একমাত্র হিন্দুদেরই ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতার বিষময় ফল ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার সুন্নিসুলভ পরমতদ্বেষের ফলে শিয়াদের মধ্যেও বিরাগের

সঞ্চার হইয়াছিল ; বোহ্‌রা এবং খোজারা হইয়া উঠিয়াছিল উৎপীড়নের পাত্র। তবে জাঠ, বুন্দেলা, মারাঠা, রাজপুত ও শিখদের মতো তাহারা বিপক্ষ রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করিতে পারে নাই।

হিন্দুদের মধ্যে বিদ্রোহ: ১৬৬৯ সালে মথুরা অঞ্চলের জাঠরা গোকলা নামে এক জমিদারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করিয়া মোগল ফৌজদারের প্রাণনাশ করে। তাহাদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয় ; গোকলার হয় প্রাণদণ্ড ; তাঁহার পরিবারবর্গকে কবুল করানো হয় ইসলাম। ১৬৮৬ সালে রাজা রামের নেতৃত্বে জাঠরা পুনরায় মস্তক উত্তোলন করে ; রাজা রাম পরাজিত হন, কয়েক বৎসর পরে তাঁহারও প্রাণবধ করা হয়। ইহার পর জাঠদের মধ্যে চূড়ামন নামে একজন ক্ষমতাশালী নেতা আবির্ভূত হন, ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিচালনায় জাঠরা তুমুল বিদ্রোহ বাধাইয়া দেয়।

ঔরঙ্গজেব মন্দির ধ্বংসের পন্থা অবলম্বন করিলে বুন্দেলাদের মধ্যে দেখা দেয় বিদ্রোহ। বুন্দেলারা ছিল এক রাজপুত গোষ্ঠী ; তাহারা আসিয়া যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদেরই নামানুসারে সেই ভূখণ্ডের নাম হয় বুন্দেলখণ্ড। আকবরের রাজত্বকালের শেষভাগে বীর সিংহ বুন্দেলা তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথমভাগে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন চম্পৎ রায় ; পরিশেষে আত্মহত্যা করিয়া তাঁহাকে বন্দিত্বের সম্ভাবনা এড়াইতে হয়। তাঁহার পুত্র ছত্রসাল সম্রাটের চাকুরি গ্রহণ করেন ; তিনি জয় সিংহের অধীনে দাক্ষিণাত্যে কাজ করিতে গিয়াছিলেন ; সেখানে স্বাধীনতা ও ধর্মবিশ্বাসের জন্য শিবাজীর নিঃশঙ্ক সংগ্রাম তাঁহার অন্তরে উদ্দীপনা সঞ্চার করে। ১৬৭১ সালে তিনি বুন্দেলখণ্ডের অসন্তুষ্ট হিন্দু জনগণের নেতা হইয়া দাঁড়ান। অর্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া মোগল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বুন্দেলাদের বিরোধিতা স্থানীয় ইতিহাসের অঙ্গস্বরূপ হইয়া উঠে ; পরিশেষে বুন্দেলা ও মারাঠারা হইয়া দাঁড়ায় পরস্পরের মিত্র। ১৭৩১ সালে তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে ছত্রসাল মালবে নিজের একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হন।

বর্তমান পাতিয়ালা ও আলোয়ার অঞ্চলে বাস করিত সৎনামী নামে এক নিরীহ হিন্দু সম্প্রদায়। ১৬৭২ সালে তাহারাও মস্তকোত্তোলন করে। এক বিরাট মোগল ফৌজ আসিয়া অনায়াসেই তাহাদের দমন করিয়া ফেলে।

সম্রাটের এক পরওয়ানা-বলে ১৬৭৫ সালে শিখদের নবম গুরু তেগ বাহাদুরের প্রাণদণ্ড বিধান করা হয়। তাঁহার পুত্র ও পরবর্তী গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখ সম্প্রদায়ের অন্তরে মোগল শাসনের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রবল আগ্রহের উদ্রেক করিয়া রণদুর্মদ খালসা বাহিনীর সৃষ্টি করেন। ফলে দমন ও প্রতিহিংসার তাণ্ডবলীলা হইয়া উঠে শিখ ইতিবৃত্তের অঙ্গস্বরূপ।

রাজপুতানায় যুদ্ধ (১৬৭৯-১৭০৮): ১৬৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জামরুদে মারওয়াড়ের মহারাজা যশোবন্ত সিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। সে সময় তাঁহার রাণীদের মধ্যে দুইজন ছিলেন সন্তানসম্ভবা। তাঁহারা লাহোরে আসিয়া পৌঁছিলে পর ১৬৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহাদের দুইজনেরই দুই পুত্র হয়। কিন্তু ঔরঙ্গজেব যশোবন্ত সিংহের রাজ্য হস্তগত করিবেন স্থির করেন। দলে দলে মোগল সৈন্য আসিয়া মারওয়াড়ে প্রবেশ করে। রাজ্যের শীর্ষস্থানে কেহই ছিলেন না বলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বাধাদানের কোন সুযোগ হয় নাই। যশোবন্ত সিংহের ভ্রাতার পৌত্র নাগরের ইন্দ্র সিংহকে যোধপুর রাজ্যের অধীন সামন্ত নরপতি রূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়; কিন্তু মোগল শাসনকর্মচারীরা এবং মোগল সৈন্যেরা দেশ অধিকার করিয়া বসিয়াই থাকে।

মারওয়াড় এক মরুময় ভূখণ্ড, কিন্তু তাহারই মধ্য দিয়া ছিল শাহী রাজধানী হইতে সমৃদ্ধিশালী আহমদাবাদ নগর এবং কর্মমুখর কাম্বে বন্দরে পণ্য-পরিবহনের সর্বোত্তম পথ। উহা অধিকার করিতে পারিলে রাজপুতানা প্রায় দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়ে এবং মেবারের রাণার পার্শ্বদেশ বিপন্ন হইয়া উঠে। ঔরঙ্গজেব তখন হইতে যে উৎপীড়নের পন্থা অবলম্বনের বাসনা পোষণ করিতেছিলেন, মারওয়াড় রাজ্যটিকে স্বীয় অধিকারে আনিয়া বশীভূত করিতে পারিলে হিন্দুদের তাহাতে বাধাদানের শক্তি হ্রাস পাইত।

যশোবন্ত সিংহের দুই পুত্রের মধ্যে একটি জীবিত থাকে। তাহার নাম রাখা হয় অজিত সিংহ। তাহাকে দিল্লীতে আনিয়া সম্রাটের নিকট তাহার দাবিদাওয়া পেশ করা হয়। কিন্তু সম্রাট এরূপ নির্দেশ দান করেন যে, তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য মোগল হারেমে আনিয়া রাখিতে হইবে, এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠিলে পর তাহাকে ভূষিত করা হইবে মোগল ওমরাহ শ্রেণীর অন্তর্গত কোন একটি পদমর্যাদায়। সর্বনাশের সম্মুখীন হইয়া দুর্গাদাসের নেতৃত্বে রাঠোরদের বলবীর্য জাগিয়া উঠে; তিনি প্রায় সম্পূর্ণরূপে নৈরাশ্য-কবলিত

রাঠোর-পক্ষের মুখপাত্রস্বরূপ মোগল অবিচারের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সগৌরবে তাহাদের সাফল্যের শিখরে উত্তীর্ণ করিয়া লইয়া আসেন। অজিত সিংহকে এবং যশোবন্ত সিংহের বিধবা রাণীদের ধরিয়া আনিবার জন্য সম্রাট এক শক্তিশালী সৈন্যদল প্রেরণ করেন। রাঠোররা অন্তিম শক্তিতে তাহাতে বাধা দেয়। সেই গোলযোগের মধ্যে দুর্গাদাস অজিত সিংহ এবং পুরুষবেশে সজ্জিত রাণীদের লইয়া পলায়ন করেন। দিল্লীতে রাঠোররা যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিয়াছে, সেই অবসরে দুর্গাদাস উর্ধ্বশ্বাসে অশ্বারোহণে পলায়ন করিতে থাকেন। আর একদল রাঠোর প্রাণপণে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষা করিতে থাকে। শ্রান্তক্লান্ত মোগলরা পশ্চাদ্ধাবন হইতে বিরত হয়। দুর্গাদাস অজিত সিংহকে লইয়া যোধপুরে আসিয়া উপনীত হন (জুলাই, ১৬৭৯)।

ঔরঙ্গজেব তখন এক গোয়ালার ছেলেকে অজিত সিংহ রূপে ঘোষণা করিয়া ইন্দ্র সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং মারওয়াড় রাজ্য পুনরধিকার করিতে কৃতসংকল্প হন। স্বয়ং আজমীঢ়ে আগমন করিয়া, তিনি তাঁহার পুত্র মহম্মদ আকবরকে মোগল বাহিনীর অগ্রেই প্রেরণ করেন। এক খণ্ডযুদ্ধে রাঠোররা বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে ; তখন তাহারা শুরু করিয়া দেয় পাহাড়-পর্বত আর মরুভূমির মধ্য হইতে থাকিয়া থাকিয়া সহসা আক্রমণ। সমগ্র মারওয়াড় দেশ মোগলদের পদানত হইয়া পড়ে, সুবিধাজনক স্থান বাছিয়া বাছিয়া ফৌজদারদের ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। "ধর্মের প্রতীকসমূহ পদদলিত হইতে থাকে, মন্দিরের পর মন্দির ধ্বংস করা হয়, এবং সে সকল স্থানে নির্মিত হয় এক-একটি মসজিদ।"

১৬৭৯ সালের ২রা এপ্রিল হিন্দুদের উপর নূতন করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয় আকবর কর্তৃক অবলুপ্ত জিজিয়া কর। মেবারের মহারাণা রাজসিংহের উপর তাহা আদায় করার আদেশ দেওয়া হয় ; স্বভাবতঃই তিনি অসন্তুষ্ট বোধ করেন। অজিত সিংহের জননী ছিলেন মেবারের এক রাজকন্যা ; মোগলদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া মহারাণার নিকট তিনি আবেদন করিলেন। রাজসিংহ যুদ্ধের আয়োজনে মন দিলেন। সম্রাট তাহা পূর্বেই অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি মেবার আক্রমণ করিয়া বসিলেন। মহারাণাকে সমভূমি, এমন কি রাজধানী উদয়পুর অবধি, ত্যাগ করিতে হইল ; সদলবলে তিনি আসিয়া আশ্রয় লইলেন পাহাড়-পর্বতে। মোগলেরা উদয়পুর ও চিতোর অধিকার করিয়া ২০০-এরও অধিক মন্দির ধ্বংস করিয়া ফেলিল। কিন্তু আরাবল্লী

পর্বতমালার দ্বারা মেবার ও মারওয়াড়ের মোগল ঘাঁটিগুলি বিচ্ছিন্ন ছিল ; উহারই শিখরে ছিল রাণার আশ্রয় ; সেখান হইতে যেমন খুশি তেমনই তিনি পূর্বে অথবা পশ্চিমে অবতরণ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া কঠিন আঘাত হানিতে লাগিলেন। স্বয়ং যুবরাজ আকবর একাধিকবার আকস্মিক আক্রমণে পরাভব স্বীকার করেন। আতঙ্কে মোগল বাহিনী প্রায় অসাড় হইয়া পড়িল। ক্রুদ্ধ সম্রাট তাঁহাকে মারওয়াড়ে স্থানান্তরিত করিয়া যুবরাজ আজমের উপর দিলেন মেবার-যুদ্ধের ভার। উদয়পুরের যোদ্ধাদের চেয়ে রাঠোররাও সম্রাটকে কম বিব্রত করিয়া তোলে নাই।

আকবর তখন আসিয়া যোগ দিলেন বিদ্রোহী রাজপুতদের সঙ্গে। ১৬৮১ সালের জানুয়ারী মাসে এক বিজ্ঞপ্তিতে তিনি তাঁহার পিতার সিংহাসনচ্যুতি ও নিজের সম্রাটপদে অভিষেকের বার্তা ঘোষণা করিলেন। আকবরের এই পক্ষ-ত্যাগের মূলে ছিল মহারাণা রাজসিংহের কূটনীতি। কিন্তু ১৬৮০ সালের অক্টোবর মাসে মহারাণা নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তী মহারাণা জয়সিংহ কিছুকাল নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকেন, তাহারই ফলে আকবরের সঙ্কল্প ঘোষণায় বিলম্ব ঘটে। যাহা হউক, ১৬৮১ সালের জানুয়ারী মাসে আকবর আজমীঢ় অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন, সম্রাট তখন সেখানেই অবস্থান করিতেছিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া ছুটিয়া আসিলে আকবরের মনোরথ সিদ্ধ হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি অযথা কালক্ষেপ করিয়া বিলম্ব করিতে থাকেন, এবং সেই অবসরে সম্রাটের বল দ্বিগুণেরও অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আকবরের দক্ষিণহস্তস্বরূপ তহব্বর খাঁ আততায়ীর হস্তে প্রাণ দেন। তারপর, নির্বোধ রাজপুতদের শাহী সৈন্যদলের হাতে বলিদানের জন্য ভুলাইয়া আনিতেছেন বলিয়া আকবরকে প্রশংসা করিয়া, ঔরঙ্গজেব একখানা মিথ্যা চিঠি লেখেন, এবং তাঁহারই ব্যবস্থা অনুসারে সেখানা গিয়া পড়ে দুর্গাদাসের হাতে ; রাজপুতরা আকবরের দিক দিয়া বিশ্বাসহানি সন্দেহ করিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এইভাবে ভাঙ্গিয়া যায় এই শক্তিসজ্ঘ, এবং প্রাণরক্ষার জন্য আকবরকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতে হয়। দুর্গাদাস এই চাতুরী বুঝিতে পারিয়া আকবরকে আশ্রয় দান করেন এবং শিবাজীর পুত্র মারাঠারাজ শম্ভুজীর দরবারে পৌছাইয়া দিয়া আসেন। আকবরের বিদ্রোহের ফলে মোগলদের রণপরিকল্পনা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; সেই

সুযোগে জয়সিংহের সৈন্যেরা গুজরাট ও মালব বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া আসে। কিন্তু মহারাণা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৬৮১ সালের জুন মাসে জিজিয়ার পরিবর্তে তিনখানি পরগণা ছাড়িয়া দিয়া তিনি সন্ধি করেন। মোগলরা মেবার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, রাণা স্বস্থানে পুনরধিষ্ঠিত হন।

কিন্তু মারওয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধ থামিল না; পরে মারাঠারা বিপক্ষদলের গতিবিধি অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে, সুযোগ পাইলেই তাহাদের বিব্রত করিয়া তোলার যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মোগলদের শক্তিক্ষয় করিয়াছিল, রাঠোররা এখন ঠিক সেই পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিল। বিরতিবিহীন এই যুদ্ধ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরেও এক বৎসরকাল চলিয়াছিল; তখন বাহাদুর শাহ অজিত সিংহকে মারওয়াড়ের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। স্যর যদুনাথ সরকার এ বিষয়ে বলিয়াছেন: "রাজনৈতিক বিজ্ঞতার চূড়ান্ত অভাব বশতঃ ঔরঙ্গজেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগানদের বিদ্রোহ শান্ত হইবার পূর্বেই অসাবধানভাবে রাজপুতানায় বিদ্রোহ উৎপাদন করেন। দুইটি প্রধান রাজপুত কুল (রাঠোর ও গুহিলোত) তাঁহার বিরোধী হওয়ায় মোগল বাহিনী সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ ও সাহসী সৈন্য হারাইল। কেবলমাত্র মারওয়াড় ও মেবারে বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ রহিল না। হাড়া ও গৌড় কুলে ইহা সংক্রামিত হইল। অরাজকতার ঢেউ রাজপুতানার সীমা অতিক্রম করিয়া মালবে পৌছিল এবং মালব হইতে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত প্রসারিত মুঘল রাজপথ বিপন্ন করিল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিবাজী ও মারাঠাদের অভ্যুদয়

মোগল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলার জন্য যে মারাঠাশক্তির ন্যায় দায়ী আর কিছুই ছিল না, সেই শক্তির প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী ছিলেন শাহজী ভোঁসলের মধ্যম পুত্র। এই শাহজী ভোঁসলেই আবার মালিক অম্বরের ন্যায় দাক্ষিণাত্যে মোগল-শক্তির সম্প্রসারণ প্রতিরোধ করিতে গিয়া ব্যর্থমনোরথ হন। পিতা কাজ করিয়া যান এক পতনোন্মুখ রাজতন্ত্রের পক্ষে। পুত্রের ছিল নেতৃত্বে জন্মগত অধিকার, দেশের বাছা বাছা লোকদের স্বপক্ষে টানিয়া আনিয়া

তিনি মারাঠাদের ঐক্যবদ্ধ করেন জাতীয়তার সূত্রে, জনগণের অন্তরে সঞ্চার করেন নবীন প্রেরণা ; তাই দীর্ঘকালস্থায়ী হয় তাঁহার সেই সৃষ্টি। তাহার সাফল্যের মূলে ছিল তাঁহার সংগঠনী প্রতিভা আর তাহারই সৃষ্ট সেই নবীন প্রেরণা। এজন্য কেবল তাঁহার প্রতিপক্ষের অযোগ্যতাই দায়ী ছিল না।

মহারাষ্ট্র দেশ ও মারাঠা জাতি ঃ মারাঠা জাতির বাসভূমি মহারাষ্ট্র দেশ সারি সারি পাহাড়ের মধ্যে আবদ্ধপ্রায়। তাহার দুইদিকে বিশাল পর্বতমালার পরিবেষ্টনী—উত্তর হইতে দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে সহ্যাদ্রি (পশ্চিমঘাট পর্বতমালা), পূর্ব হইতে পশ্চিমে আসিয়াছে সাতপুরা ও বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণী। এই সকল মূল পর্বতমালা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে বিবিধ গৌণ পর্বতশাখা। তিনটি আঞ্চলিক বিভাগের সমবায়ে গঠিত এই দেশটি—কোঙ্কন, অর্থাৎ পশ্চিমঘাট (সহ্যাদ্রি) ও সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত এক সঙ্কীর্ণ ভূমিভাগ ; মাওল, অর্থাৎ পশ্চিমঘাটের পূর্বদিকে ২০ মাইল বিস্তারের এক সাতিশয় বন্ধুর ভূ-বলয় ; দেশ, অর্থাৎ আরও পূর্বদিকে তরঙ্গিত কৃষ্ণমৃত্তিকায় গঠিত এক বিশাল সমভূমি। পাহাড়গুলির চূড়া ছিল স্বাভাবিক দুর্গের মতো, সেখানে জলের কোনও অভাব হইত না। লোকেরা ছিল সরলপ্রকৃতি, কর্মঠ, আত্মনির্ভরশীল।

দাক্ষিণাত্যে মুসলমান বিজয়ের পর বহু মারাঠা সর্দার আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সুলতানদের অধীনে ভাড়াটে সৈন্যদলের অধিনায়করূপে খ্যাতি লাভ করেন। "শিবাজী কর্তৃক রাজনৈতিক ঐক্য দানের পূর্বেও সপ্তদশ শতকে মহারাষ্ট্র দেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল ভাষা, ধর্মনীতি ও জীবনযাত্রায় এক অভূতপূর্ব ঐক্যভাব।" তুকারাম, রামদাস এবং অন্যান্য সাধুসন্তের নামের সহিত বিজড়িত এক উদার ও পরমতসহিষ্ণু ধর্মবিষয়ক ও সামাজিক আন্দোলন শিবাজীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক উপপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

শিবাজীর বাল্যজীবন ঃ জুন্নরের সন্নিকটে শিবনেরের পার্বত্য দুর্গে ১৬২৭ সালের ৬ই এপ্রিল, অথবা অন্যান্য অনেকের মতে, ১৬৩০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী, শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জননী জীজাবাঈ ছিলেন শাহজীর অনাদৃতা পত্নী। জননী-চরিত্রের প্রায় সন্ন্যাসিনীর ন্যায় গভীর ধর্মভাব পুত্রের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। শাহজী ১৬৩৬ সালে বিজাপুরের সুলতানের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন ; বিজাপুর রাজ্যের বিস্তার সাধনের অভিপ্রায়ে নব নব ভূমিভাগ জয়ের জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করা হয় মহীশূরের

অন্তর্গত তুঙ্গভদ্রা অঞ্চলে, তারপর মাদ্রাজের উপকূল ভাগে। তিনি তাঁহার আদরিণী পত্নী তুকাবাঈ ও তাঁহার পুত্র ব্যাঙ্কোজীকে সঙ্গে লইয়া যান; শিবাজীকে রাখা হয় দাদাজী কোণ্ডদেবের রক্ষণাবেক্ষণে পুণায় তাঁহার জননীর নিকট। প্রচুর সাক্ষ্যপ্রমাণাদি হইতে এই মতই সমর্থিত হয় যে শিবাজী নিরক্ষর রূপেই বড় হইয়া উঠেন, তবে হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য দু'খানির বিষয়বস্তু তাঁহার নখদর্পণে ছিল। ১৬৪৭ সালে দাদাজী কোণ্ডদেব মৃত্যুমুখে পতিত হন; ফলে শিবাজী হইয়া দাঁড়ান সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন।

শিবাজী ও বিজাপুর: ইহারই মধ্যে শিবাজী আপন অভিরুচি অনুযায়ী বিঘ্নসঙ্কুল দুঃসাহসিক অভিযানের পথ ধরিয়াছিলেন। ১৬৪৬ সালে তিনি বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত তোর্ণা অধিকার করেন, রাজগড়ে নির্মাণ করেন এক নূতন দুর্গ, এবং বিজাপুরের জনৈক প্রতিনিধির নিকট হইতে কাড়িয়া লন কোণ্ডনা। শিবাজীর এই সব ক্রিয়াকলাপের জন্য, অথবা মতান্তরে নিজেরই ঔদ্ধত্যের শাস্তিস্বরূপ, শাহজীকে কারারুদ্ধ করা হয়। শোনা যায় পিতার মুক্তির জন্য শিবাজী মোগল রাজকুমার মুরাদের শরণাপন্ন হন, তবে শাহজী বাস্তবিক বিজাপুরেরই দুইজন প্রভাবশালী ওমরাহের মধ্যস্থতার ফলে মুক্তিলাভ করেন। বৎসর কয়েকের (১৬৫০-৫৫) মতো শিবাজী নির্বিবাদে কালযাপন করিতে থাকেন বটে, তবে এই সময়ের মধ্যেই তিনি অধিকার করিয়া বসেন পুরন্দরের দুর্ভেদ্য দুর্গ। দক্ষিণদিকে তাঁহার অগ্রগতির অভিলাষ পূরণে জাওলী ছিল পথের কণ্টকস্বরূপ, ১৬৫৬ সালে তিনি উহা অধিকার করিয়া ফেলেন। শিবাজীর সমর্থন লাভ করিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ পূর্ব-পরিকল্পিত কতিপয় হত্যাকাণ্ড সাধনের দ্বারা জাওলী অধিকারের পথ প্রস্তুত করিয়া দেয়। দক্ষিণ বিহারের দুর্গসমূহ হস্তগত করার জন্য শের শাহ যেরূপ শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, শিবাজীও সেইরূপ শঠতার সহিত বলপ্রয়োগের মিশ্রণে নিজের পথ পরিষ্কার করেন। তাঁহার সৈন্যসংগ্রহের ক্ষেত্র দ্বিগুণ প্রসার লাভ করে, দক্ষিণদিকের দুয়ারও খুলিয়া যায়।

১৬৫৭ সালে দাক্ষিণাত্যের মোগল রাজপ্রতিনিধি ঔরঙ্গজেব যখন বিজাপুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, তখন শিবাজীকে দলে ভিড়াইবার চেষ্টা হয়। কিন্তু বিজাপুরের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান এই বিদ্রোহী সম্ভবতঃ তৎপূর্বেই নিজস্ব কোন এক পরিকল্পনা অনুসরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন; ঔরঙ্গজেব যখন কল্যাণী

অবরোধে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তিনি বিজাপুরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাদশাহী বাহিনীর মনোযোগ অন্যত্র আকর্ষণের জন্য দাক্ষিণাত্যের মোগল-অধিকৃত অংশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তভাগ আক্রমণ করেন। শিবাজী কর্তৃক সৃষ্ট এই গোলযোগের বিবরণ শ্রবণে ঔরঙ্গজেব ভয়ানক রুষ্ট হন। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত এক মোগল বাহিনীর নিকট তাঁহার পরাভব ঘটে, কিন্তু বর্ষার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় উহা তাঁহার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। ইহারই পর আসিয়া পৌঁছে শাহজাহানের পীড়ার সংবাদ। দাক্ষিণাত্য ত্যাগের পূর্বে ঔরঙ্গজেব বাহিরে আনন্দ প্রকাশ করিয়া শিবাজীর নিকট হইতে বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে মার্জনা জ্ঞাপন করেন না।

১৬৫৭-৫৯ সালের মধ্যে শিবাজী মাহুলী হইতে মাহাদের নিকট পর্যন্ত কোঙ্কনের উত্তরাঞ্চল জয় করিয়া ফেলেন। মোগল আক্রমণের চাপ হইতে মুক্তিলাভ করায় বিজাপুর রাজ্যের পক্ষে এখন শিবাজীকে দমন করার পরিকল্পনা প্রণয়নের সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন বিজাপুরের অন্যতম প্রধান সেনাপতি আফজল খাঁ। তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল শিবাজীর প্রতি বন্ধুত্বের ভাণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী অথবা হত্যা করার নির্দেশ। কিন্তু উভয়ের সাক্ষাৎকারের সময় শিবাজীই তাঁহার প্রাণনাশ করেন (১০ই নবেম্বর, ১৬৫৯)। লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণাদি হইতে এই মতই সমর্থিত হয় যে ইহা ছিল "আত্মরক্ষার জন্য অনুষ্ঠিত একটি হত্যাকাণ্ড।" বিজাপুরের শিবির লুণ্ঠন করা হইল। মারাঠারা এবার দলে দলে আসিয়া জুটিল দক্ষিণ-কোঙ্কন ও কোহ্লাপুর অঞ্চলে। অবশ্য ১৬৬০ সালের জুলাই মাসে বিজাপুরের এক সৈন্য-বাহিনী শিবাজীকে পানহালা দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করে।

শিবাজী ও মোগলগণ: ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে তাঁহার মাতুল শায়েস্তা খাঁ দাক্ষিণাত্যের মোগল রাজপ্রতিনিধিরূপে ১৬৬০ সালের প্রথমদিকে শিবাজীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। তিনি আসিয়া পুণা অধিকার করিয়া বসেন; চাকনের দুর্গ এবং উত্তর-কোঙ্কনের অন্তর্গত কল্যাণ অঞ্চলও তাঁহার হস্তগত হয়। শিবাজী কোনক্রমে বিজাপুরের সহিত যুদ্ধবিরতির এক চুক্তি করিয়া, মোগল-শক্তির সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হন। ১৬৬৩ সালে এপ্রিল মাসের এক রাত্রে মোগল রাজপ্রতিনিধি "তাঁহার শিবিরের ঠিক মধ্যস্থলে, আভ্যন্তরীণ দেহরক্ষিচক্রে পরিবেষ্টিত শয়নকক্ষের মধ্যে" শিবাজীর অতর্কিত

আক্রমণে আহত হন, তাঁহার একটি পুত্রের প্রাণহানি ঘটে, অপর দুই পুত্রও আহত হয়; শিবাজী পলায়ন করেন। এই সাফল্যমণ্ডিত নৈশ অভিযানের ফলে শিবাজীর প্রচুর মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। ১৬৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি সমৃদ্ধিশালী সুরাট-বন্দর লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধনসামগ্রী হস্তগত করেন।

সম্রাট শায়েস্তা খাঁর শৈথিল্য ও অকর্মণ্যতার জন্য তাঁহাকে বঙ্গদেশে স্থানান্তরিত করিয়া, শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ তাঁহার এই দুইজন যোগ্যতম হিন্দু ও মুসলমান সেনাপতিকে (১৬৬৫)। জয়সিংহ সুকৌশলে বিজাপুর-সুলতানের অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভয়ভীতির পরিপুষ্টি সাধন করিয়া, শিবাজীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁহাকে নিরপেক্ষ থাকিতে প্রবৃত্ত করেন। শিবাজীর সমর্থক-দলকে তিনি বশীভূত করিতে প্রয়াস পান অর্থ এবং উচ্চপদ দানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে। এইভাবে কূটনীতি প্রয়োগে অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া, তিনি আসিয়া পুরন্দর-দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন। ক্ষিপ্রগতি সৈন্যদল শিবাজীর গ্রামগুলি পর্যুদস্ত করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে লাগিল মারাঠাদের অবরোধ প্রত্যাহারের যাবতীয় প্রচেষ্টা। নিরবচ্ছিন্ন চাপের ফলে ক্রমশঃ আসন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল পুরন্দরের পতনাশঙ্কা। কিন্তু সেখানেই আশ্রয় দান করা হইয়াছিল শিবাজীর সামরিক কর্মচারীদের পরিবারবর্গকে; পুরন্দরের পতন ঘটিলে তাঁহাদের বন্দিত্ব ও অমর্যাদার হাত হইতে রক্ষা করা যাইত না। শিবাজীকে নতি স্বীকার করিতে হইল। তিনি জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; ১৬৬৫ সালের জুন মাসে পুরন্দরের সন্ধি স্থাপিত হইল। শিবাজী সমর্পণ করিলেন তাঁহার ২৩-টি দুর্গ এবং বার্ষিক ৪ লক্ষ হুন (১ হুন = ৪ টাকা) রাজস্বের ভূমি। মোগল রাজশক্তির সেবা এবং আনুগত্য স্বীকারের শর্তে সম্মত হওয়ায় তাঁহার নিজের হাতে রহিল ১২-টি দুর্গ (রাজগড় সমেত) এবং এক লক্ষ হুন রাজস্বের জমি। স্বয়ং দরবারে হাজির হওয়ার দায় হইতে তিনি অব্যাহতি ভিক্ষা করিয়া, সম্রাটের সেবার জন্য ৫,০০০ অশ্বারোহীর সঙ্গে পুত্রকে প্রেরণের প্রস্তাব করিলেন।

শিবাজীর এই পরাজয়ের পর জয়সিংহ বিজাপুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল ধর্মসাক্ষী করিয়া শপথ এবং উচ্চ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দান করিয়া শিবাজীকে সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করা বিশেষ

প্রয়োজন। আদিল শাহ ও কুতব শাহ মোগলদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় জয়সিংহ দক্ষিণী সুলতানদের সঙ্গে শিবাজীর যোগদানের সম্ভাবনা নিবারণ করিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। শিবাজীর অন্তরে জয়সিংহের আশ্বাসদানে আস্থা জন্মিল; তিনি তাঁহার অনুপস্থিতি-কালের জন্য জননীর করে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, ১৬৬৬ সালের মে মাসে আগ্রায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। জয়সিংহ তাঁহাকে যেরূপ প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন এবং শিবাজীর অন্তরেও তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া যে আশা ছিল, তাঁহাকে সেরূপ সম্মান ও সমাদরের সহিত গ্রহণ করা হইল না। প্রকাশ্য দরবারে তিনি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং পরে স্বয়ং সম্রাটকেই দায়ী করিয়া বসিলেন বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে। তাঁহাকে দরবারে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। জয়পুরে জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের পিতার নিকট লিখিত যে সকল পত্র রক্ষিত আছে তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে, শিবাজীকে মোগল-শক্তির অধীনে কার্যব্যপদেশে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রেরণ করিবার পরিকল্পনা মোগলদের ছিল, এমন কি সেখানে তাঁহার প্রাণনাশের ব্যবস্থা পর্যন্তও হইয়াছিল। যাহা হউক, শিবাজী কৌশলে আগ্রা হইতে পলায়ন করিয়া এমনই দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে থাকেন যে, দাক্ষিণাত্য অভিমুখী হ্রস্বতম পথেও তাহা অতিক্রম করা সম্ভবপর ছিল না; দাক্ষিণাত্যে তিনি আসিয়া উপনীত হন ১৬৬৬ সালের নবেম্বর মাসে। তাঁহার গতিবেগ এমনই দ্রুত ছিল যে, উহার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং প্রত্যাবর্তনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজগড়ে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। কথিত আছে ঔরঙ্গজেব তাঁহার সর্বশেষ উইলে লিখিয়া যান, "এক মুহূর্তের অবহেলা বহু বৎসরের অবমাননার কারণ হইয়া থাকে। আমারই অসাধবানতার জন্য হতভাগা শিবা পলায়ন করিতে সমর্থ হয়, এবং [তাহারই ফলে] আমার জীবনের শেষ অবধি আমাকে [মারাঠাদের বিরুদ্ধে] কঠোর পরিশ্রম করিতে হইতেছে।" মহাসম্রাট কেবল তাঁহার অবহেলা সম্বন্ধেই সচেতন ছিলেন। এ কথা তাঁহার উপলব্ধিরও অতীত ছিল যে, উদারতা ও সৌহার্দ্যের ফলে এই শত্রুই হয়তো মিত্রে পরিণত হইতে পারিত। শঠতাপূর্ণ রাজনৈতিক চাতুরী রাজনীতিজ্ঞতা নয়।

আগ্রা হইতে প্রত্যাগমনের পর শিবাজী বিশেষ নির্বিবাদেই স্বদেশে তিন বৎসরকাল অতিবাহিত করেন, ১৬৬৮ সালে মোগলদের সহিত তাঁহার সন্ধিও

স্থাপিত হয়। সম্রাট তাঁহার 'রাজা' উপাধি স্বীকার করিয়া লন, কিন্তু তাঁহার দুর্গগুলি প্রত্যর্পণ করেন না। পেশোয়ারে যুসুফজাইদের বিদ্রোহ দমনে মোগলবাহিনী ব্যস্ত থাকে। এই কয় বৎসরের শান্তির মধ্যে শিবাজী তাঁহার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৬৭০ সালে মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তিনি কয়েকটি দুর্গের পুনরুদ্ধার সাধন করেন। প্রথমবার সুরাট লুণ্ঠন করিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এখান হইতেই তিনি যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন; তাই তিনি দ্বিতীয়বারের মতো পুনরায় সুরাটের সমৃদ্ধ বন্দরটি লুণ্ঠন করেন। দাক্ষিণাত্যের মোগল রাজপ্রতিনিধি যুবরাজ মুয়াজ্জম তাঁহার সহযোগী দিলীর খাঁর সহিত কলহে প্রবৃত্ত হন। যুবরাজ নিজে নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকেন; ফলে শিবাজীর প্রায় যথেচ্ছভাবে কাজ করার সুযোগ লাভ হয়। তিনি মোগল সেনাপতি দাউদ খাঁকে পরাজিত করিয়া বেরার ও বাগলানায় অভিযান চালাইতে থাকেন। মোগলদের বিরুদ্ধে তাঁহার ১৬৭১-৭৩ সালের যুদ্ধবিগ্রহে প্রচুর সাফল্য অর্জিত হয়। ১৬৭৪ সালের ৬ই জুন রায়গড়ে বিপুল সমারোহে নিজের অভিষেক অনুষ্ঠানে তিনি 'ছত্রপতি' উপাধি ধারণ করেন।

এদিকে তখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আফগানদের সহিত সংঘর্ষে আঁটিয়া উঠিতে মোগলদের বড়ই বেগ পাইতে হইতেছিল। ২য় আলী আদিল শাহ পরলোকগমন করিয়াছিলেন; ফলে বিজাপুরে দক্ষিণী দল ও আফগান দলের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসনকর্তা বাহাদুর খাঁ সেই গোলযোগের মধ্যে স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজিতেছিলেন। শিবাজীর সহিত তিনি এক রফা করিয়া ফেলিলেন। গোলকোণ্ডার ক্ষমতাশালী উজীর মদন পণ্ডিত ছিলেন শিবাজীর সহিত সহযোগিতার জন্য উৎসুক; ফলে শিবাজী গোলকোণ্ডার সহিত মৈত্রীতে আবদ্ধ হইলেন। স্থির হইল গোলকোণ্ডার সুলতান শিবাজীকে মাসিক ৪½ লক্ষ হুন এবং তাঁহার নিজের একজন সেনাপতির অধীনে ৫,০০০ সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন; বিনিময়ে শিবাজী তাঁহার মিত্রকে প্রতিশ্রুতি দান করিলেন যে কর্ণাটকের যে সকল অংশ তাঁহার পিতা শাহজীর অধিকারভুক্ত ছিল না তৎসমুদয় তিনি তাঁহাকে সমর্পণ করিবেন। মোগলদের বিরুদ্ধে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি বলবৎ করা হইল। সেজন্য গোলকোণ্ডার পক্ষ হইতে পাওয়া গেল বার্ষিক এক লক্ষ হুন বৃত্তি দানের সম্মতি। ১৬৭৭

সালে শিবাজী জিঞ্জি, ভেলোর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া কুদ্দালোর অবধি অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা একোজী ছিলেন
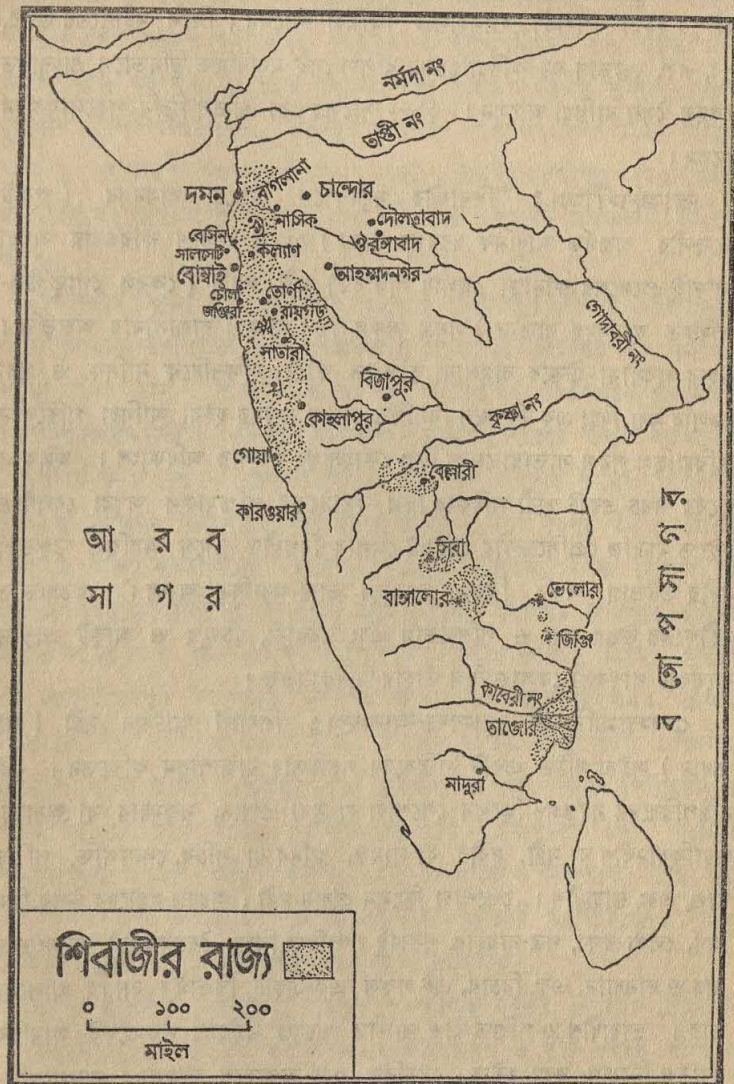
তাঞ্জোরের অধিপতি। শিবাজী তাঞ্জোর রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিলেন। ১৬৭৭ ও ১৬৭৮ সালের যুদ্ধবিগ্রহের ফলে কর্ণাটকে তিনি লাভ করেন একশত

দুর্গ-সমেত বার্ষিক ২০ লক্ষ হুন রাজস্বের ভূমিভাগ। একোজীকেও বিজাপুরের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিয়া আনা হয়। ১৬৭৮ সালের এপ্রিল মাসে মহীশূর হইয়া শিবাজী পান্‌হালায় ফিরিয়া আসেন; তিনি মহীশূরের উত্তর, পূর্ব, এবং মধ্যভাগ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া সেই নববিজিত ভূমিভাগে প্রহরারত একদল সৈন্য রাখিয়া আসেন। ১৬৮০ সালের ৩রা এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করেন।

রাজ্যসীমা: "শিবাজীর মৃত্যুকালে উত্তরে রামনগর (সুরাট এজেন্সীর অন্তর্গত আধুনিক ধরমপুর রাজ্য) হইতে দক্ষিণে কারওয়ার অথবা বোম্বাই প্রদেশের কানাড়া জেলায় গঙ্গাবতী নদী অবধি (কেবল পোর্তুগীজ-অধিকৃত স্থানসমূহ ব্যতীত) সমগ্র অঞ্চল ছিল তাঁহার রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত। উহার পূর্বসীমা উত্তরে বাগলানা কুক্ষিগত করিয়া দক্ষিণদিকে নাসিক ও পুণা জেলার মধ্য দিয়া এক বিশৃঙ্খল বিসর্পিত রেখায় অগ্রসর হইয়া আসিয়া পরিবেষ্টন করিয়াছিল সমগ্র সাতারা জেলা এবং কোহ্লাপুর জেলার অধিকাংশ। অল্পকাল পূর্বের অথচ একটি স্থায়ী অধিকার ছিল কর্ণাটকের পশ্চিমাঞ্চল অথবা বেলগাঁও হইতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেল্লারী জেলার বিপরীত ভাগে অবস্থিত তুঙ্গভদ্রা নদীর তটভাগ অবধি বিস্তৃত কানাড়ী ভাষা-অধ্যুষিত অঞ্চল।" এতদ্ব্যতীত মহীশূরের উত্তর, মধ্য ও পশ্চিমভাগ এবং বেল্লারী, চিত্তুর ও আর্কট প্রভৃতি কয়েকটি পার্শ্ববর্তী জেলাও ছিল তাঁহার অধিকারভুক্ত।

বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা: শিবাজী আটজন মন্ত্রী (অষ্ট প্রধান) লইয়া গঠিত একটি পরিষদের সহায়তায় রাজ্যশাসন করিতেন। এই মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ ছিলেন পেশোয়া বা মুখ্য প্রধান, মজুমদার বা অমাত্য, ওয়াকিয়ানবীশ বা মন্ত্রী, দবীর বা সামন্ত, সুর্নিস বা সচিব, সেনাপতি, পণ্ডিত রাও, এবং ন্যায়াধীশ। পেশোয়া ছিলেন প্রধান মন্ত্রী; অন্যান্য মন্ত্রীদের উপর ছিল অর্থ, লেখ্য-রক্ষা, পত্র-ব্যবহার, পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়, সৈন্যবাহিনী, ধর্ম-সংক্রান্ত প্রশ্ন ও দানধ্যান, এবং বিচার, এই সকল এক-একটি বিভাগীয় দায়িত্ব পালনের ভার। ন্যায়াধীশ ও পণ্ডিত রাও ব্যতীত অন্যান্য মন্ত্রীদের সকলকেই সামরিক কার্যেও নিয়োগ করা হইত; সামরিক কার্য-ব্যপদেশে তাঁহাদের অনুপস্থিতির সময় রাজধানীতে তাঁহাদের কার্য নির্বাহ করিতেন উপমন্ত্রিগণ। এই সকল প্রধানগণ তাঁহাদের অধস্তন কর্মচারীদের নিয়োগ করিতে পারিতেন না;

অধস্তন কর্মচারীদের নির্বাচন করিতেন রাষ্ট্রপতি (রাজা) স্বয়ং। পেশোয়াদের আমলে এই সব কর্মচারীদের পদ বংশানুক্রমিক হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু শিবাজীর আমলে এরূপ কোনও কর্মচারীকে আজীবনের জন্যও নিযুক্ত করা হইত না। রাজার মর্জি হইলেই তাঁহাদের পদচ্যুত করা যাইত। সমগ্র শাসন-ব্যবস্থার মূলাধার ছিলেন রাজা স্বয়ং। তাঁহারই ব্যক্তিগত সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিত যাবতীয় ব্যাপার। মন্ত্রীরা ছিলেন একটি উপদেষ্টা-সংসদের সদস্য মাত্র, তাঁহাদিগকে রাজনির্দেশ পালন এবং বিভাগীয় কার্যের তত্ত্বাবধান করিতে হইত।

শিবাজীর রাজ্য ছিল কয়েকটি প্রদেশে (প্রান্তে) বিভক্ত; প্রত্যেকটি প্রান্ত আবার উপবিভক্ত ছিল কতকগুলি পরগণায় এবং তরফে। নিম্নতম সংস্থা ছিল গ্রাম। শিবাজী গ্রামগুলির আভ্যন্তরীণ সংবিধানে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। এইরূপ কতকগুলি (গ্রামীণ) সংস্থার উপর থাকিতেন বংশানুক্রমিক দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেগণ। প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন না করিয়াও, শিবাজী এই অবস্থার প্রতিকার সাধনে যত্নপর হন। তিনি নিজস্ব রাজস্ব-কর্মচারীদের নিয়োগ করিতে থাকেন, কিন্তু দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেগণকে তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন না। তাঁহাদিগকে তিনি দুর্গাবাস নির্মাণ করিতে নিষেধ করিয়া দেন এবং তাঁহাদের কতকগুলি সুরক্ষিত আবাস ভাঙ্গিয়াও ফেলেন। রাজস্ব সংগ্রহের জন্য রাষ্ট্র ও প্রজার মধ্যে যে সকল সংশ্লিষ্ট সংস্থা ছিল সেগুলির বিলোপ সাধন করিয়া, শিবাজী নিজ রাজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন ও পরিমার্জন-সহ গ্রহণ করেন মালিক অম্বরের রাজস্ব-সম্পর্কিত বিধান। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জমি জরীপ করিয়া, মোট উৎপাদনের শতকরা ৩৩ ভাগ কর ধার্য করার জন্য কৃতিত্বের ভাগী ছিলেন তাঁহার কর্মচারী অন্নজী দত্তো। পরে শিবাজীর দাবি হইয়া দাঁড়ায় থোক শতকরা ৪০ ভাগ কর।

নিজ সার্বভৌম কর্তৃত্বের বহির্ভূত অঞ্চলসমূহ হইতে শিবাজী চৌথ ও সরদেশমুখী নামে সামরিক করও আদায় করিতেন; এ দু'টি করের পরিমাণ যথাক্রমে ছিল স্থানবিশেষের নির্দিষ্ট করের এক-চতুর্থাংশ ও এক-দশমাংশ। "চৌথ প্রদানের ফলে স্থানটি কেবল মারাঠা সৈন্যদল এবং তাহাদের অনুগত বেসামরিক গুণ্ডাদের অস্বস্তিকর আবির্ভাব হইতে রক্ষা পাইত, কিন্তু সেজন্য সে

অঞ্চলটিকে বাহিরের আক্রমণ কিংবা ভিতরের গোলযোগ হইতে রক্ষা করার কোনরূপ আনুষঙ্গিক দায়িত্ব শিবাজীর উপর বর্তিত না।" এইরূপ কর আদায়ের পক্ষে একমাত্র যুক্তি ছিল আপৎকালীন অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা। মহারাষ্ট্র দেশের পর্বতসঙ্কুল ভূমিভাগ হইতে শিবাজীর পক্ষে পর্যাপ্ত রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভবপর ছিল না। অথচ তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে মোগলদের বিরুদ্ধে, বিজাপুরের বিপক্ষে, জাঞ্জিরার সিদিদের ও গোয়ার পোর্তুগীজদের সহিত, এবং কোলি রাজাদের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ধ-স্বাধীন রণনায়কদের সঙ্গে। তাঁহাকে গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে সৈন্যবাহিনী, নির্মাণ করিতে হইয়াছে নূতন নূতন দুর্গ, নববিজিত রাজ্যখণ্ডগুলি রক্ষা করিয়া চলিতে হইয়াছে তাঁহাকে, সাজাইয়া তুলিতে হইয়াছে নৌবহর, দমন করিতে হইয়াছে জলদস্যুদের। যুদ্ধ করিয়াই তাঁহাকে যুদ্ধের মালমশলা সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

সামরিক ব্যবস্থা ঃ শিবাজীর মাওলী আর হেৎকরীরা ভারতবর্ষের সামরিক ইতিকথায় বিখ্যাত হইয়া আছে। ব্যক্তিগত ভাবে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের নির্বাচন করিতেন তিনি; প্রত্যেকটি লোকই হইত অভিজ্ঞতার পাঠশালায় সুশিক্ষিত। তাঁহার সৈন্যবাহিনী ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবেই লঘুভার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ক্ষিপ্রগতি পদাতিক ও ক্ষিপ্রগতি অশ্বারোহী সৈন্যে গঠিত; অতর্কিত ভাবে এবং পর্বতসঙ্কুল প্রদেশে যুদ্ধবিগ্রহের পক্ষে তাহারা ছিল চমৎকার উপযুক্ত। অশ্বারোহী বাহিনী ছিল দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত; বার্গীর ও শিলাদার। বার্গীরদের সরকার হইতেই অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হইত, শিলাদারদের আনিতে হইত নিজ নিজ অশ্ব। শিবাজী কখনও তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে গুরুভার অস্ত্রশস্ত্র অথবা মূল্যবান শিবিরোপকরণে ভারাক্রান্ত হইতে দিতেন না। শিবিরে কেহই কোন নারীকে স্থানদান করিতে পারিত না। এই নিয়মের ব্যতিক্রমে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত। সৈন্যদের প্রত্যেককেই লুণ্ঠিত সামগ্রী জমা দিতে হইত রাজ-সরকারে। শিবাজী সৈন্যদের হয় নগদ বেতন, নয় জেলা-সরকার হইতে প্রাপ্তিযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। তিনি জায়গীর দিয়া দায়মুক্ত হইতেন না। সৈন্যবাহিনীতে তিনি কঠোর শৃঙ্খলা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার সৈন্যবাহিনীও ছিল অদ্ভুত কর্মকুশল।

শিবাজীর সামরিক ব্যবস্থায় দুর্গসমূহের সবিশেষ গুরুত্ব ছিল। প্রত্যেকটি

দুর্গ থাকিত হাওলদার, সব্নীস ও সর্নোবৎ, সমপর্যায়ের এই তিনজন কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে ; ইহাদের প্রত্যেকেই হইয়া উঠিতেন অপর দুইজনের যথেচ্ছ ক্রিয়াকলাপের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। মৃত্যুকালে শিবাজীর অধীনে ছিল ২৪০টি দুর্গ। প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার অধিকারভুক্ত ভূমিভাগে প্রত্যেকটি গুরুত্বময় গিরিবর্ত্ম ছিল একাধিক দুর্গের দ্বারা সুরক্ষিত।

লোকমুখের বর্ণনা অনুযায়ী, কোঙ্কন জয়ের পর শিবাজী 'সাগর বন্ধন করিয়াছিলেন।' নানা আকারের এবং নানা শ্রেণীর ৪০০ শত জলযান—ঘুরব, গল্লিবৎ, নদীপথের নৌকাদি—লইয়া দুইজন নৌসেনানীর অধীনে গঠন করা হয় দুইটি নৌবহর। জাঞ্জিরার সিদিদের সঙ্গে শিবাজীর নৌবহরকে ক্রমাগত সংঘর্ষে লিপ্ত থাকিতে হইত। তাঁহার নৌবহরে কাজ করিত মালাবারের কোলি এবং অন্যান্য সমুদ্রবিহারী উপজাতিরা। তাঁহার প্রধান বন্দর ছিল মালওয়ান। শিবাজী যে নৌ-বীর্য জাগ্রত করিয়া যান তাহা তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইয়া যায় নাই। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ অবধি আঙ্গ্রিয়ারা মারাঠাদের নৌবহরের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

শিবাজীর কৃতিত্ব: শিবাজীর জীবনধারা ও কীর্তিকলাপ এবং তাঁহার পর মারাঠাশক্তির সাফল্য, দুঃসাহস ও দস্যুবৃত্তি সম্পর্কিত সাধারণ মতবাদের দ্বারা অথবা আকস্মিক উপপ্লবের দৃষ্টান্ত রূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। সকল প্রকারের দৈবদুর্বিপাকের মধ্যেও মারাঠারা যে তাহাদের অবিচলিত স্বদেশপ্রেমের জন্য ভারতবর্ষের অবশিষ্ট জনগণ হইতে স্বতন্ত্র ছিল, তাহা পরবর্তী কালে ওয়ারেন হেস্টিংস ও স্যর চার্লস মেটকাফের দৃষ্টি এড়ায় নাই। সুতরাং এ কথা বলিলে ভুল হইবে না যে, শিবাজী যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা সার্ধ-শতাব্দীকাল স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের অক্ষয় কীর্তি ছিল জনচিত্তে নবীন বলবীর্য সঞ্চার করিয়া মারাঠাগণকে একটি জাতিরূপে গঠন করা। জনৈক সমসাময়িক লোকের ভাষায়, ৯৬টি গোষ্ঠীর সমবায়ে গঠিত মারাঠা জাতিকে তিনি উন্নীত করিয়া যান এক অশ্রুতপূর্ব মর্যাদায়। এক চমৎকার শাসন-ব্যবস্থা সমন্বিত একটি সুসংহত সামরিক রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া যান তিনি। নিজে তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মে পরম আস্থাবান, কিন্তু অন্যান্য ধর্মমতও তাঁহার চক্ষে শ্রদ্ধার বস্তু ছিল ; নারীজাতিকে তিনি যেরূপ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং শিবিরে তিনি যে কঠোর নৈতিক আদর্শ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রতিকূল

সমালোচকগণেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে একটি সুসংহত সামরিক রাষ্ট্রের স্থলে আমরা দেখিতে পাই এক শিথিল শক্তি-সমবায়, একটি অদ্ভুত সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তে দেখি এক হীন বিশৃঙ্খল জনতা। শিবাজী-প্রবর্তিত নানা বিধিবিধান যে তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইয়া যায়, তাহার কারণ আমাদিগকে মারাঠাজাতির পরবর্তী ইতিহাসের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু শিবাজী যে শক্তির উদ্বোধন করিয়া যান তাহাই "মোগল সাম্রাজ্য যখন গৌরবের চরম শিখরে সমাসীন তখন মারাঠাদিগকে তাহার সংঘাত বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে" উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল; এবং তাহাই আবার অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে ব্রিটিশদের "সংশ্রবে আসিতে" তাহাদের একান্ত "অনিচ্ছার" দ্বারা ব্রিটিশ রাজনীতিকদের বিস্ময় উদ্রেক করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেব

রাজত্বকালের প্রথমার্ধে দাক্ষিণাত্য-সম্পর্কিত কর্মনীতিঃ এক ১৬৬৫ সালে জয় সিংহ যখন শিবাজীকে পুরন্দরের সন্ধি করিতে বাধ্য করেন তখন ছাড়া, ১৬৫৮-১৬৮১ সালের মধ্যে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে কোনরূপ নিশ্চিত ফললাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্ব-কালের প্রথমার্ধে দাক্ষিণাত্যে এই যে তাঁহার সাফল্যের অভাব, ইহার যে সকল কারণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে তাহা হইতেছে এইরূপ : একাদশ বৎসর যাবৎ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন যুবরাজ শাহ আলম; তিনি ছিলেন নিরীহ নিরুদ্যম প্রকৃতির লোক। তাঁহার প্রধান সহায় দিলীর খাঁ প্রকাশ্যেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেন; উভয়ের মধ্যে বৈরভাব এমনই দৃঢ়মূল ছিল যে, মনে হইত মোগল-অধিকৃত দাক্ষিণাত্য না জানি অন্তর্যুদ্ধে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এদিকে আবার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতিগণ এবং রাজপুত রাজ্যগুলিকে লইয়া স্বয়ং সম্রাটও ছিলেন যার-পর-নাই বিব্রত; দাক্ষিণাত্যের ব্যাপারে যথাযথ মনোযোগ দান করা এবং সেখানে প্রয়োজন অনুসারে লোকবল ও অর্থসাহায্য

প্রেরণের সুযোগ তাঁহার ছিল না। বিজাপুর, গোলকোণ্ডা এবং মারাঠাগণ, দাক্ষিণাত্যের এই শক্তিত্রয়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার পথও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ১৬৬২ সালের পর শিবাজীর সঙ্গে বিজাপুর রাজসরকারের একটা বোঝাপড়া হইয়াছিল, শিবাজীও আর বিজাপুর রাজ্যের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিয়া কোনরূপ গোলযোগ সৃষ্টি করেন নাই। গোলকোণ্ডার সুলতান শিবাজীর মিত্রই ছিলেন।

কিন্তু শিবাজীর মৃত্যুর পর ঘটনাচক্রের গতিতে সাম্রাজ্যের কূটনীতিতে দেখা দেয় এক আমূল পরিবর্তন। বিদ্রোহী রাজকুমার আকবর শিবাজীর পুত্র ও উত্তরাধিকারী শম্ভুজীর রাজসভায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঔরঙ্গজেব স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া শম্ভুজীর উচ্ছেদ সাধন এবং আকবরকে স্ববশে আনয়নের সিদ্ধান্ত করিলেন। ১৬৮২ সালের ২২শে মার্চ তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন ঔরঙ্গাবাদে। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন তাঁহার তিন পুত্র এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণ; মোগল সাম্রাজ্যের যাবতীয় শক্তি দাক্ষিণাত্যে কেন্দ্রীভূত হইল। মারাঠারাজ ও বিদ্রোহী মোগল রাজকুমারের বিরুদ্ধে রচিত হইল যুদ্ধকার্যের এক ব্যাপক পরিকল্পনা; কিন্তু নিজ পরিবার-পরিজনের প্রতি বিশ্বাসহানির ফলে সম্রাট তাঁহার ক্রিয়াকলাপে প্রদর্শন করিতে লাগিলেন "দ্বিধা, সংশয়, সতর্কতা, এবং দৃশ্যতঃ খামখেয়াল ও স্ববিরোধী মনোভাবের লক্ষণ।"

শম্ভুজী (১৬৮০—১৬৮৯): শিবাজীর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার নির্ভীক অথচ ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুত্র শম্ভুজী। মোগল আতঙ্কের গুরুত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ সুস্পষ্ট ধারণাই তাঁহার ছিল না। সম্রাটের বিরুদ্ধে শক্তিসঞ্চয় করার পরিবর্তে তিনি পোর্তুগীজ ও জাঞ্জিরার সিদিদের ন্যায় সামান্য সামান্য শত্রুদের সহিত সময়ে-অসময়ে যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া শক্তিক্ষয় করিতে থাকেন। কোপনস্বভাব ও খামখেয়ালী মারাঠারাজের সহিত মনোমালিন্যের ফলে ১৬৮৭ সালে যুবরাজ আকবর পারস্যযাত্রা করিয়াছিলেন। শম্ভুজী ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন থাকিতেন; ফলে তাঁহার রাজ্য আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও সভাসদগণের চক্রান্তে উৎসন্ন হইয়া যাইতে বসিল। ঔরঙ্গজেব যখন বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের যাবতীয় শক্তি নিয়োগ করিলেন, শম্ভুজী রাজ্য দু'টির পতন নিবারণের জন্য সামান্য অঙ্গুলিহেলন পর্যন্ত করিলেন না, অথচ ইহা তাঁহার অবিদিত থাকিবার কথা নয় যে ব্যাপারটা ছিল দক্ষিণী

শক্তিমাত্রেরই পক্ষে ভয়ের বিষয়। তখনকার মতো সম্রাট তাঁহার থাকিয়া-থাকিয়া যখন-তখন আক্রমণ করার ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করিয়া বাস্তববুদ্ধিরই পরিচয় দান করিতে লাগিলেন ; বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার পতন না ঘটা অবধি সম্রাট মারাঠাদের প্রতি যথাযথ মনোযোগ অর্পণ করেন নাই। শম্ভুজী নিজে সঙ্গমেশ্বরে 'অসংযত ইন্দ্রিয়সুখভোগে' প্রমত্ত অবস্থায় জনৈক মোগল সেনাপতি কর্তৃক বন্দী হন। ১৬৮৯ সালের মার্চ মাসে অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়া তাঁহার প্রাণবধ করা হয়। শিবাজীর রাজধানী রায়গড় সমেত মারাঠাদের অনেকগুলি দুর্গের পতন ঘটে, এবং শম্ভুজীর নাবালক পুত্র শাহু সহ তাঁহার সমগ্র পরিবার ঔরঙ্গজেবের হস্তে বন্দী হইয়া পড়েন।

বিজাপুর (১৬৮৬) ও গোলকোণ্ডা (১৬৮৭) অধিকার : দাক্ষিণাত্যে আগমনের পর ঔরঙ্গজেব যুবরাজ আকবরকে বন্দী করার বৃথা চেষ্টায় এবং মারাঠাদের বিরুদ্ধে উদ্যমহীন যুদ্ধবিগ্রহে প্রায় চারি বৎসর কাল অপচয় করেন। অতঃপর তিনি সঙ্কল্প করেন বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা জয় করিবেন। ১৬৮৫ সালের এপ্রিল মাসে বিজাপুর অবরোধ করা হয়, তারপর উহা অধিকৃত হয় ১৬৮৬ সালের সেপ্টেম্বরে। গোলকোণ্ডা অবরোধ করা হয় ১৬৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে, সেই বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে উৎকোচ প্রদানের ফলে উহা অধিকৃত হয়। আদিল শাহী ও কুতব শাহী বংশের শেষ সুলতানদ্বয়ের জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত হয় দৌলতাবাদের রাজ-কারাগারে ; তাঁহাদের রাজ্য দু'টি মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়া যায়।

বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা আত্মসাৎ করার জন্য অনেকে ঔরঙ্গজেবের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন ; তাঁহারা বলেন মারাঠাদের উচ্ছেদ সাধনে এই দুইটি মুসলমান রাজ্য সহায়তা প্রদানে হয়তো কার্পণ্য করিত না। কিন্তু এই দু'টি পতনোন্মুখ সুলতানী রাজ্য নবজাত মারাঠাজাতির সহিত শক্তিপরীক্ষায় টিঁকিতে পারিত কি না তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। তা' ছাড়া এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আকবর যেদিন প্রথম বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে মোগল-শক্তির সম্প্রসারণ সাধনের কর্মনীতি গ্রহণ করেন সেদিন হইতে ঔরঙ্গজেবের গোলকোণ্ডা প্রবেশ পর্যন্ত মোগল-শক্তির চরম লক্ষ্য ছিল দাক্ষিণাত্যের সম্পূর্ণ বশ্যতা সাধন। বিজাপুরের সুলতানদের বার্ষিক রাজস্ব ছিল ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা, আবার তাহার উপর সামন্ত রাজা ও জমিদারগণের নিকট হইতে আসিত ৫½ কোটি

টাকা বার্ষিক কর। গোলকোণ্ডা যখন বিজিত হয় তখন উহার বার্ষিক রাজস্ব ছিল ২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। ভারতবর্ষের এই দু'টি শিয়া শক্তির সহিত ছিল মোগল সাম্রাজ্যের চিরশত্রু পারস্য-রাজ্যের নাড়ীর টান। এদিকে আবার দলাদলির ফলে আর 'রাজনৈতিক বেদুইনদের' কবলে পড়িয়া রাজ্য দু'টি প্রায় দশম দশায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিল ; বিজয়গর্বী মদমত্ত মারাঠাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এ দু'টি রাজ্যের একেবারেই ছিল না। যতক্ষণ অবধি না কোন নৈসর্গিক বাধা পথের কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, অথবা অপর কোন সমকক্ষ কিংবা বলবত্তর শক্তি আসিয়া গতিরোধ করিতেছে, ততক্ষণ অবধি কোন অগ্রগতিশীল সামরিক শক্তির পক্ষে নিজ অগ্রগতি সংযত করা সম্ভবপর নয়। যুবরাজ রূপে যে ঔরঙ্গজেব বলখ ও বদখশান জয়ে এবং কান্দাহারের পুনরুদ্ধার সাধনে অকৃতকার্য হন, সম্রাট রূপে তিনি যে সে সকল অঞ্চলে মোগলদের অস্ত্রবলের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া, বাবরের উত্তরাধিকার এবং কান্দাহারের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ করায়ত্ত করার কোনরূপ চেষ্টাই করেন নাই, ইহা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার ; তিনি অবলম্বন করেন দক্ষিণে অগ্রগতির সহজতর এবং সম্ভবতঃ অধিকতর লাভের পথ। মারাঠাদের বলবীর্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা তিনি করিতে পারেন নাই, তবে তাঁহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অনেকেও এরূপ ভ্রান্তির বশে নিজেদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছেন। নেপোলিয়নের পরাভবের একটি প্রধান কারণ ছিল স্পেনের স্বাজাত্যবোধ-প্রসূত বিরোধিতার দৃঢ়তা অনুধাবনে তাঁহার অক্ষমতা।

বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা জয়ে এবং মারাঠা রাজ্য জয়ের চেষ্টায় ঔরঙ্গজেব মোগল পররাষ্ট্রনীতিরই স্বাভাবিক গতি অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, তবে তাঁহার নিজস্ব বিশিষ্ট ধারায়ই তিনি উহার অনুসরণ করিয়া যান। "মোগলশক্তির দ্বিতীয়ার চাঁদ হইয়া দাঁড়ায় পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র", কিন্তু আবার তাঁহার জীবনের শেষ অষ্টাদশ বৎসরেই দেখা দেয় সে শশিকলা হ্রাসের লক্ষণ। রাজপুত রণনায়কদের প্রতি আকবরের আচরণে, অথবা মেবারের রাণার প্রতি জাহাঙ্গীরের আচরণে যে বৈশিষ্ট্য ছিল, শিবাজীর প্রতি তাঁহার আচরণে প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় সেরূপ ঔদার্যের পরিচয় তিনি দান করিতে পারেন নাই ; আবার ১৬৫৬ এবং ১৬৫৭ সালে বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সুলতানদের প্রতি শাহজাহান যে মমত্ববোধের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে বিপন্ন রাজগণের

প্রতি সে মমত্ববোধের লেশমাত্রও ছিল না। তিনি ছিলেন নির্মম, সহানুভূতিহীন, তদুপরি শেষজীবনে তিনি হইয়া পড়েন বাস্তবের সহিত সম্পর্কশূন্য। কেবল
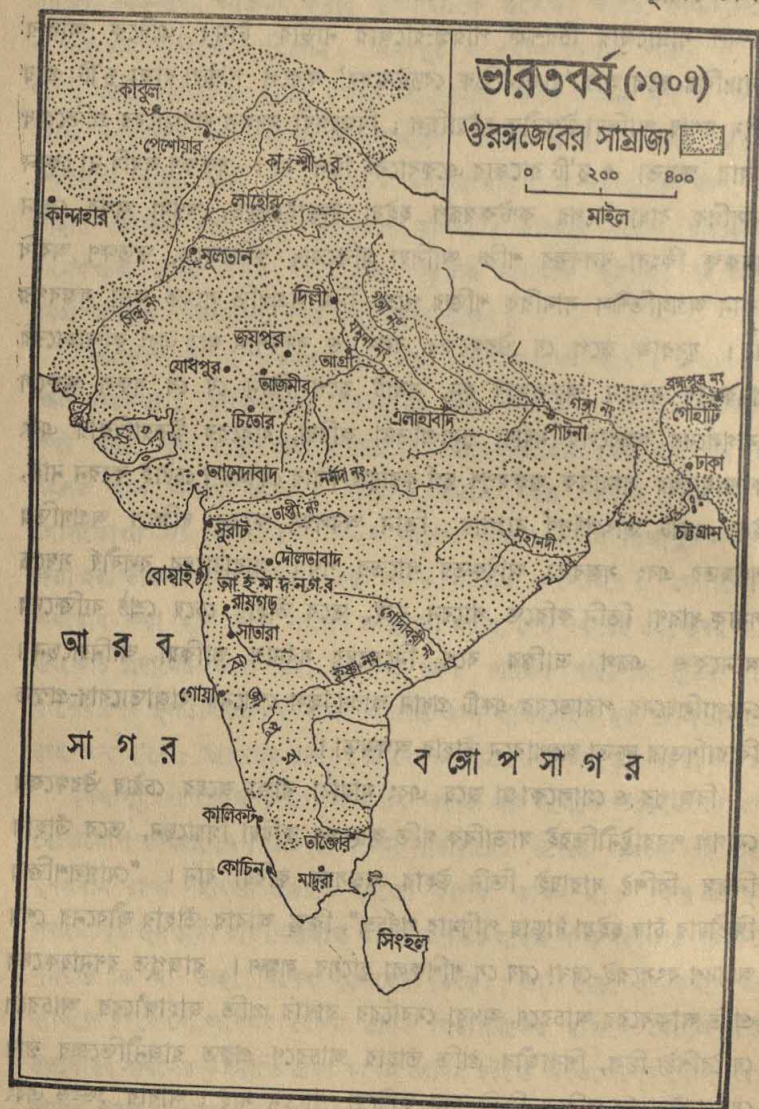
নিপাত করিতেই জানিতেন তিনি, সম্প্রীতি স্থাপন করিতে জানিতেন না। দুর্গাদাসের সঙ্গেও তাঁহার সম্প্রীতি বড়ই ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল ; ফলে যে রণক্লান্ত

রাঠোরদের সহজেই শান্ত করা যাইত, তাহারা মোগলদের শত্রু হইয়াই রহিল। রাজারামকে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাঞ্চল ও কোঙ্কনের অধিপতি রূপে স্বীকার করিয়া সসম্মানে সন্ধি স্থাপন করিলে, তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু মারাঠাদের বিরুদ্ধে মূর্খের ন্যায় যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া তিনি যে কী বিপদ ডাকিয়া আনিতেছেন, সে বিষয়ে তাঁহার চিত্তের বার্ধক্যজনিত অনমনীয়তা তাঁহাকে সম্পূর্ণ অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ঔরঙ্গজেব স্বভাবের একটি মহাসম্পদ হইতে বঞ্চিত ছিলেন, তাহা হইল উচ্চস্তরের রাজনীতিজ্ঞতার একটি অতি সুকুমার ও বিরল সম্পদ—সীমাবোধ।

মোগল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি: ঔরঙ্গজেবের জীবনের শেষভাগে মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল একদিকে গজনী হইতে চট্টগ্রাম এবং অপরদিকে কাশ্মীর হইতে কর্ণাটক পর্যন্ত। "মহারাষ্ট্র, কানাড়া, মহীশূর, এবং কর্ণাটকের পশ্চিমাঞ্চলে অবশ্য তাঁহার অবিসংবাদী কর্তৃত্ব ছিল না; তাই এই অঞ্চলটিকে 'দো-আম্‌লী', অর্থাৎ দুই তরফের আজ্ঞাবহ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।" এই বিশাল সাম্রাজ্য ২১টি সুবায় বিভক্ত: (১) আগ্রা, (২) আজমীঢ়, (৩) এলাহাবাদ, (৪) বিহার, (৫) বঙ্গ, (৬) দিল্লী, (৭) কাশ্মীর, (৮) লাহোর, (৯) গুজরাট, (১০) মালব, (১১) মূলতান, (১২) থাট্টা (সিন্ধু), (১৩) উড়িষ্যা, (১৪) খান্দেশ, (১৫) বেরার, (১৬) ঔরঙ্গাবাদ, (১৭) বিদর, (১৮) বিজাপুর, (১৯) হায়দরাবাদ, (২০) কাবুল, (২১) অযোধ্যা। আফগানিস্তানের কথা বাদ দিলে, আকবরের আমলে যে মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্ব ছিল বার্ষিক ১৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকা, ঔরঙ্গজেবের আমলে তাহার রাজস্ব হইয়া দাঁড়ায় ৩৩ কোটি ২৫ লক্ষ। আফগানিস্তান হইতে আকবরের সময় ২০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত, ঔরঙ্গজেবের আমলে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ৪০ লক্ষ টাকা। ইহা ছিল কেবল ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ। ঔরঙ্গজেবের শেষজীবনে জায়গীর ও খালসার (রাজকীয় ভূসম্পত্তির) মধ্যে অনুপাত কী ছিল তাহা এই ব্যাপার হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, জায়গীরসমূহের নির্ধারিত আয় যেখানে ছিল ২৭·৬৪ কোটি, খালসার নির্ধারিত আয় সেখানে ছিল ৫·৮১ কোটি মাত্র।

মারাঠাদের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম—১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ঔরঙ্গজেব ক্ষমতার চরম শিখরে আরোহণ করেন; উত্তর-ভারত

এবং দাক্ষিণাত্যও তাঁহার পদানত হইয়া পড়ে। "দৃশ্যতঃ প্রতীয়মান হইতে থাকে এতদিনে সব কিছুই বুঝি ঔরঙ্গজেবের হস্তগত হইল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সব কিছুই হারাইয়া বসিলেন। উহা ছিল তাঁহার শেষদশার সূত্রপাত। এতদিনে শুরু হইল তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা বিষাদময় ও সর্বাধিক নৈরাশ্যজনক অধ্যায়। মোগল সাম্রাজ্য এমনই বিরাট বিপুল হইয়া উঠিল যে, তাহা আর একজনের পক্ষে অথবা একটিমাত্র কেন্দ্র হইতে শাসন করা সম্ভবপর ছিল না।...চতুর্দিকে মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিলেন তাঁহার শত্রুগণ; তাঁহাদের পরাভূত করার ক্ষমতা তাঁহার ছিল, কিন্তু চিরতরে উচ্ছেদের ক্ষমতা ছিল না।...দাক্ষিণাত্যে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহের ফলে রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল; রাজ্যসরকার হইয়া দাঁড়াইল নিঃসম্বল; সৈন্যদের বেতন বাকি পড়িতে লাগিল, অভাব-অনটনের তাড়নায় তাহাদের মধ্যে দেখা দিতে লাগিল বিদ্রোহ।...১ম নেপোলিয়ন বলিতেন, 'স্পেনীয় দুষ্টক্ষতই আমার সর্বনাশ সাধন করিয়াছে।' ঔরঙ্গজেবের সর্বনাশ সাধন করিল দাক্ষিণাত্যের দুষ্টক্ষত।"

শম্ভুজীর মৃত্যুর পর মারাঠারা যেভাবে প্রতিরোধ শুরু করে তাহা ছিল বাস্তবিকই জনসংগ্রাম। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজারাম সর্বসম্মতিক্রমে হইয়া দাঁড়ান মারাঠা রাজ্যের অধিনায়ক; কিন্তু মারাঠাদের কেন্দ্রীয় সরকার বলিতে কিছুই ছিল না। রাজারাম আসিয়া কর্ণাটকের অন্তর্গত জিঞ্জির দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন; পূর্ব-উপকূলে উহাই হইয়া দাঁড়াইল মারাঠাদের দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপের কর্মকেন্দ্র। মারাঠা সেনানীদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অনুচরবর্গ লইয়া মোগলদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজেবের সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইল এক সর্বময় শত্রু, 'বোম্বাই হইতে ভারতীয় উপদ্বীপের মধ্যভাগ ভেদ করিয়া মাদ্রাজ অবধি তাহার ব্যাপ্তি, বায়ুপ্রবাহের ন্যায় অবাধ তাহার গতি, তাহার না আছে নায়ক, না আছে কোন সুরক্ষিত আশ্রয় যাহা অধিকার করিয়া তাহার শক্তিক্ষয় করা যাইতে পারে।'

১৬৯০ সালের মে মাসে ঘটনাস্রোত ঔরঙ্গজেবের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল। রুস্তম খাঁ ছিলেন মোগল সেনাপতিদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী; মারাঠাদের হাতে তিনি পরাভূত ও বন্দী হন। মারাঠাদের নিকট হইতে পানহালা অধিকারের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। সান্তাজী ঘোরপাড়ে এবং ধনাজী যাদব, এই দুইজন অসমসাহসিক মারাঠা সেনাপতি অবিশ্রান্ত ভাবে

আক্রমণ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। সান্তাজীর নাম এমনই আতঙ্কের বিষয় হইয়া উঠিল যে, "শাহী আমীরদের কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস পাইতেন না, এবং প্রত্যেক বারই তিনি যে বিপর্যয়-কাণ্ড বাধাইয়া যাইতেন তাহাতে বাদশাহী ফৌজ আতঙ্কে কম্পমান হইত।" এক গৃহবিবাদে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। ১৬৯৮ সালে মোগলরা জিঞ্জি অধিকার করে; কিন্তু রাজারাম পলায়ন করিয়া সাতারায় ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে গড়িয়া তোলেন এক নূতন সৈন্যবাহিনী। সম্রাট এবার পর পর মারাঠাদের দুর্গগুলি হস্তগত করার দিকে মনোযোগ দান করেন। শুরু হয় যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া ছেলেখেলা; নিম্নোদ্ধৃত বাক্যকয়টিতেই পাওয়া যাইবে তাহার সর্বোত্তম বর্ণনা: "প্রভূত সময়, অর্থ ও লোকক্ষয় করিয়া তিনি হয়তো অধিকার করিলেন একটি গিরিদুর্গ, সামান্য কয়েক মাসের মধ্যেই শক্তিহীন দুর্গরক্ষী মোগল সৈন্যদের হাত হইতে মারাঠারা তাহার পুনরুদ্ধার সাধন করিল, দুই-এক বৎসর পরে পুনরায় তাহা অবরোধ করিয়া বসিল মোগলেরা। সাতারা, পার্লি, পান্‌হালা, খেল্‌না, কোণ্ডনা (সিংহগড়), রাজগড়, তোর্না, এবং বাজিঞ্জেরা—এই আটটি দুর্গের অবরোধে কাটিয়া যায় সাড়ে পাঁচ বৎসর।"

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হয়। তাঁহার উত্তরাধিকার আসিয়া বর্তে তাঁহার নাবালক পুত্র ৩য় শিবাজীর উপর। নাবালক রাজার অভিভাবক হন রাজারামের বিধবা মহিষী মহীয়সী তারা বাঈ। তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ চালাইয়া যাইতে থাকেন। মারাঠারা—কেবল দাক্ষিণাত্যেই নয়—মালব ও গুজরাটেও মোগল সাম্রাজ্য লুঠতরাজ করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করে। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে এক বিরাট মারাঠা বাহিনী আসিয়া আহম্মদনগরে স্বয়ং সম্রাটের শিবিরে পর্যন্ত হানা দেয়।

মারাঠাদের সহিত নিষ্ফল যুদ্ধবিগ্রহে অবসন্ন সম্রাট গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পশ্চাদপসরণ করিলেন; পায়ে পায়ে অনুসরণ করিয়া আসিল মারাঠারা। ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা, বিপ্লব, দুর্দৈব এবং দৈন্যদশার মধ্যে অন্তরে অপরিসীম অকৃতার্থতার গ্লানি লইয়া তিনি আসিয়া উপনীত হইলেন আহম্মদনগরে। মারাঠাদের প্রতি-আক্রমণ ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিতে করিতে পরিশেষে সম্পূর্ণ দুর্বার হইয়া উঠিল। জীবনের যাত্রাপথের শেষপ্রান্তে আসিয়া মহাসম্রাটের বুঝিতে বাকি রহিল না যে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার যুদ্ধবিগ্রহ ব্যর্থতায়

পর্যবসিত হইয়া গিয়াছে। আহম্মদনগরেই ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ঔরঙ্গজেবের চরিত্র ও কর্মনীতি—ঔরঙ্গজেব তাঁহার প্রিয় পুত্র কাম বক্সকে তাঁহার সর্বশেষ পত্রে লিখিয়াছিলেন: "সংসারের লোকেরা প্রবঞ্চক (আক্ষরিক অর্থে—তাহারা নমুনা দেখায় গমের, কিন্তু সরবরাহ করে যব)। তাহাদের বিশ্বস্ততার উপর ভরসা রাখিয়া কোনও কাজে হাত দিয়ো না।" নিজের নিঃসঙ্গ মহিমায় অবস্থিত, মানবমাত্রেরই চরিত্রে সন্দেহপরায়ণ, মহামোগলদের এই সর্বশেষ প্রতিনিধি তাঁহার জীবনের অন্তিমকালে চতুর্দিকে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে দেখিয়া যান তাঁহার কর্মচারীরা বাস্তবিকই বিশ্বাস ও দায়িত্বের পদের অনুপযুক্ত, আত্ম-উদ্যম-বিহীন, তাঁহার শাসনযন্ত্রটিকে বিকল করিয়া ফেলিয়াছে তাহারা, তাঁহার অস্ত্রবলকে করিয়া তুলিয়াছে পঙ্গু। শাহজাহানের আমলে সাদুল্লা ছিলেন বিশেষ অভিজ্ঞ শাসকরূপে খ্যাতিমান; জনৈক নৈরাশ্যবাদীর নিকট মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি একবার বলেন, "কর্মিষ্ঠ লোকের অভাব কোন যুগেই হয় না। প্রয়োজন হইল এমন একজন মনিবের যিনি তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া, সহৃদয় ভাবে তাহাদের দিয়া নিজের কাজ গুছাইয়া লইতে পারেন, এবং এরূপ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে স্বার্থান্বেষীদের কানভাঙানিতে কান না দেন।" ঔরঙ্গজেবের পুঙ্খানুপুঙ্খ অধীক্ষা, তাঁহার নিয়মন ও প্রতিনিয়মনের ব্যবস্থা সত্ত্বেও, আকবর ও শাহজাহানের আমলে ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও ব্যক্তিগত অনুরাগের যে বলিষ্ঠ ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার পরিবর্তে মোগল রাজসরকারের উর্ধ্বতন কর্মাধিকারে সৃষ্টি হয় উহার বিপরীত হীন আত্মস্বার্থ-প্রণোদিত আজ্ঞাবহতার আবহাওয়া।

মহম্মদ আকবর যখন বিদ্রোহ করেন, ঔরঙ্গজেব তখন এক পত্রে তাঁহাকে "দুর্ভাগ্যের" পথ পরিহার করিতে উপদেশ দিয়া পাঠান। উত্তরে বিদ্রোহী রাজকুমার লেখেন, "স্বয়ং সম্রাট যে পথে পদক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা কী করিয়া দুর্ভাগ্যের পথ হইতে পারে?" নিজ পিতার প্রতি ঔরঙ্গজেবের বশ্যতা-ভঙ্গ এবং আপন ভ্রাতাদের তিনি যে দুর্ভাগ্যের কবলে নিক্ষেপ করেন, তাহার পরিণাম হইতে তিনি অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বকালের প্রারম্ভেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ সুলতানকে সুজার সহিত যোগদানের অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে হয়। তারপর দেখা দেয় মহম্মদ আকবরের

বিদ্রোহ; সেজন্য তাঁহাকে বিতাড়িত করিতে হয় ভারতবর্ষের বাহিরে। ১৬৭৭ সালে তাঁহার পুত্রদের মধ্যে যাঁহারা জীবিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যুবরাজ শাহ আলম গোলকোণ্ডার স্থলতানের সঙ্গে—সম্ভবতঃ স্থলতানেরই সিংহাসন ও বংশ রক্ষার জন্য—আলাপ-আলোচনা চালাইতে গিয়া ধরা পড়েন। কাজটা গণ্য হয় রাজদ্রোহের সামিল। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়; সাত বৎসরের পূর্বে তাঁহার অদৃষ্টে কারামুক্তি ঘটে না। কথিত আছে যুবরাজের গ্রেপ্তারের পরে সম্রাট তাড়াতাড়ি সভাভঙ্গ করিয়া তাঁহার মহিষী ঔরঙ্গাবাদী মহলের নিকট ছুটিয়া গেলেন এবং সেখানে গিয়া হাঁটু চাপড়াইতে চাপড়াইতে শোক করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হায়! হায়! গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ আমি যাহা গড়িয়া তুলিতেছিলাম তাহাই ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিলাম'।" মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে আজম ও কামবক্সের উপর নির্ভর করা চলিত না, কেননা সিংহাসনের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত আসন্ন যুদ্ধে তাঁহারা ছিলেন মারাঠাদের সাহায্যলাভের জন্য উদ্‌গ্রীব! সৈন্যদলের মধ্যে যুদ্ধ এবং লোকক্ষয় নিবারণের জন্য মৃত্যুশয্যায় ঔরঙ্গজেব তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করিয়া দিবার জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু মোগল যুগের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনায় তাঁহার কৃতকর্মের ছাপ এমন গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, তাহা আর সম্ভবপর ছিল না।

তাঁহার নৈতিক চরিত্র ছিল বজ্রের ন্যায় কঠোর, প্রিয়পাত্রদের কথাবার্তায় তিনি কখনও বিচলিত হইতেন না, মনোবল তাঁহার আসিয়া ঠেকিয়াছিল প্রায় একগুঁয়েমির পর্যায়ে; সব কিছু লইয়া এই বিরাট রাজপুরুষের আচরণে দেখিতে পাই এই পরিচিত ব্যাপারের উদাহরণ যে, কোন একটি দেশকে বাঁধিয়া ফেলা যাইতে পারে অতি-শাসনের নিগড়ে। তিনি তাঁহার সমসাময়িক য়ুরোপীয় নরপতি ১৪শ লুইয়ের তুলনায় আড়ম্বরে হীনতর হইলেও তাঁহার রাজ্যলিপ্সা অথবা অতি-কেন্দ্রীকরণের স্পৃহা কিছুমাত্র ছিল না। মুসলমান বিবরণীকারদেরই ন্যায় বৈদেশিক পর্যটকগণও বিমুগ্ধ বিস্ময়ে শাসনকার্যে তাঁহার শ্রমশীলতার বর্ণনা দান করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যহ দরবার এবং প্রতি বুধবারে বিচারকার্য নির্বাহ করা ছাড়াও, চিঠিপত্র ও দরখাস্ত প্রভৃতির উপর তিনি স্বহস্তে তাঁহার নির্দেশাদি লিপিবদ্ধ করিতেন, সরকারী উত্তর প্রত্যুত্তরের ভাষা পর্যন্ত হইত তাঁহারই মুখনিঃসৃত বাণী। ইতালীয় চিকিৎসক গেমেল্লী কারেরী ১৬৯৫

সালের ২১শে মার্চ তারিখে সম্রাট যে আম-দরবার পরিচালনা করেন তাহার এইরূপ বর্ণনা দান করিয়াছেন, "আমি তাঁহাকে বিনা চশমায় স্বহস্তে (যাহাদের কাজ ছিল তাহাদের) দরখাস্তগুলির উপর নিজ নিজ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ বোধ করিতে লাগিলাম ; তাঁহার মৃদুহাস্যোদ্ভাসিত প্রফুল্ল বদনমণ্ডল দেখিয়া মনে হইতে লাগিল তিনি কার্যনির্বাহে সন্তোষ লাভ করিতেছেন।" তিনি ছিলেন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ; ভারতবর্ষে তাঁহার নামের সহিত যুক্ত 'ফতোয়া-ই আলমগীরী' নামে মুসলমান আইনের যে সঙ্কলন-গ্রন্থ রচিত হয়, সেজন্য তিনিই ছিলেন বহুলাংশে কৃতিত্বের ভাগী ; তদবধি উহাই এ দেশে মুসলমানী প্রথায় বিচারের ধারা নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ হেন নরপতিও শাসক রূপে সাফল্য অর্জন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার উদাহরণ লোকজনকে উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে পারে নাই। শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন পরিশ্রমীদের দলে, যাঁহারা অপরের পরিশ্রম নিয়ন্ত্রণ করিয়া নিজের নীতি কার্যে পরিণত করিতে পারেন তাঁহাদের দলে নন।

ঔরঙ্গজেবের অপরিসীম ব্যর্থতা সত্ত্বেও, তাঁহাকে "মহামোগলদের মধ্যে কেবল একজন ব্যতীত সর্বশ্রেষ্ঠ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শাসকরূপে ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তিনি, ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন রাজনীতিজ্ঞ রূপেও। ইহার কারণ অনুসন্ধান আমাদিগকে করিতে হইবে তাঁহার চরিত্র এবং তাঁহার অনুসৃত কর্মপন্থার মধ্যে। ইহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাঁহার রাজ্যজয়ের নীতির মধ্যে সীমাবোধের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার ধর্মনীতির সুদূরপ্রসারী ফলাফল বুঝি অতিরঞ্জনকেও ছাপাইয়া যায়।

শাসনযন্ত্রের বৈকল্য ঃ মারাঠাদের দমনের জন্য ঔরঙ্গজেবের চেষ্টা এবং দাক্ষিণাত্যে তাঁহার দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে "মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের যাহা ছিল একমাত্র সঙ্গত কারণ, মোগলদের প্রদত্ত সেই শান্তির" ভিত্তিমূল ধ্বসিয়া পড়িল। ইতালীয় পর্যটক মানুচী বলেন, ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব যখন মহারাষ্ট্রভূমি ত্যাগ করিয়া আসেন তখন "তদঞ্চলে তিনি রাখিয়া আসেন মনুষ্য ও পশুকুলের অস্থিসমাকীর্ণ, বৃক্ষহীন, শস্যহীন প্রান্তরের পর প্রান্তর।" দাক্ষিণাত্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য একরূপ বন্ধ হইয়াই গিয়াছিল। প্রায়

অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহের ফলে দেশ উৎসন্ন হইয়া যায়, চারিদিকে দেখা দেয় অরাজকতা। মারাঠারা দল বাঁধিয়া দাক্ষিণাত্য, মালব ও গুজরাটে মোগল সাম্রাজ্য তছনছ করিয়া বেড়াইতে থাকে। যে সকল স্থানে যুদ্ধবিগ্রহ ছিল না, সে সকল স্থানেরও প্রাদেশিক শাসনকর্তারা বাদশাহী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিতে থাকেন। "ভারতের উত্তর ও মধ্যভাগের বহু স্থান অরাজকতায় ছাইয়া যায়। সুদূর দাক্ষিণাত্যে বসিয়া বৃদ্ধ সম্রাট হিন্দুস্থানে তাঁহার কর্মচারীদের উপর সকল কর্তৃত্ব হারাইয়া বসেন; ফলে শাসনযন্ত্র শিথিল ও কলুষিত হইয়া পড়ে।" শাসনযন্ত্রের বৈকল্যের ফলে স্বভাবতঃই জনসাধারণের মধ্যে গোলযোগ বাধিয়া যায়। "রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে; বাদশাহী ফৌজের বুঝিতে বাকি থাকে না পরাভব ঘটিয়াছে, সন্ত্রাসে শত্রুপক্ষের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতে থাকে তাহারা। দুর্বার হইয়া উঠিতে থাকে যত কেন্দ্রাতিগ শক্তি, সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িবার উপক্রম দেখা দেয়। পঞ্চাশ বৎসরের কঠোর শাসন পর্যবসিত হয় বিপুল ব্যর্থতায়।"

বিংশ অধ্যায়

মোগল সাম্রাজ্য : সাধারণ বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাহিত্য

গৌরবময় ও জয়যুক্ত শাসনমাত্রই মানবমনের ক্রিয়াকলাপে উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া থাকে। "ভারতের ঐশ্বর্যসম্ভার ভার্সাইয়ের আড়ম্বরে অভ্যস্ত চক্ষুও ধাঁধাইয়া দিত।" সাহিত্য ও ললিত কলার প্রদীপ্ত পুনরুজ্জীবনের পক্ষে যে সকল অনুকূল অবস্থার সমাবেশ প্রয়োজন, দীর্ঘকালস্থায়ী শান্তি, বলিষ্ঠ ও উদার শাসনতন্ত্র, সুসমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, এবং অনুকূলমনা রাজপুরুষগণের সমাবেশে ঠিক সেইরূপ অবস্থানিচয়েরই উদ্ভব ঘটিয়াছিল। ভারতীয় কলা ও সাহিত্যের এই গৌরবময় যুগের মূলে রহিয়াছে রাজপরিবারের তিনজন অসাধারণ পুরুষের ভাস্বর আনুকূল্য—তাঁহারা হইলেন মহাপ্রতিভাধর আকবর, বররুচি ও সমারোহপ্রিয় শাহ জাহান, এবং মরমিয়া, ভাবপ্রবণ, মধুকরবৃত্তি দার্শনিক দারা। জাহাঙ্গীর সৌখিন কলাবিলাসী হইলেও, একজন সুদক্ষ গুণগ্রাহী এবং সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

আকবরের আমলে ভারতীয় ভাবপুষ্ট পারসিক সাহিত্য: আকবরের রাজত্বকালে ভারতীয় ভাবপুষ্ট পারসিক সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন আকবরেরই অন্যতম সুহৃদ্ আবুল ফজল। পারসিক ভাষায় যাঁহারা ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থ হইল 'আকবরনামা' ও 'আইন-ই-আকবরী'। প্রথমখানি তাঁহার নায়কের গুণকীর্তনের জন্য রচিত; উহাতে আমরা পাই রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস। দ্বিতীয়খানি হইল শাসনকার্য ও পরিসংখ্যানের বিবরণী। আবুল ফজলকে একজন স্তাবকশ্রেষ্ঠ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; তাঁহার রচনাশৈলী জটিল বাগ্‌বিন্যাসে পরিপূর্ণ, বাগাড়ম্বরে স্ফীত, এবং দুর্বোধ। তবুও ব্লকম্যান তাঁহার সত্যপ্রিয়তা

এবং নির্ভুল তথ্য-পরিবেশনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া যথার্থই বলিয়াছেন যে তাঁহার রচনায় "ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগের বিবরণ এবং চতুর্দিগ্‌বর্তী শত্রুদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশের একান্ত অভাব হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার উদার হৃদয়ের ব্যাপ্তি বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা-বারিধির সুস্পষ্ট দিগ্‌দর্শনসীমা অবধি বিস্তৃত ছিল।" তাঁহার 'আইন-ই-আকবরী' সম্বন্ধে রচনাশৈলীর কৃত্রিম লীলাবিলাসের অভিযোগ প্রয়োগ করা চলে না: শাসন-ব্যবস্থা ও পরিসংখ্যান সম্পর্কিত এই বিবরণীখানিতে আমরা পাই এক স্থিতিস্থাপক অবস্থার পরিচয়; তবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই যে তাঁহার উচ্চ পদমর্যাদার বলে তিনি প্রয়োজন-বোধে যে-কোনও নথিপত্র হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন, এবং তাঁহার দীর্ঘ কর্মজীবন ও বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষা তাঁহার সংশয়াতীত সামর্থ্যের সহিত যুক্ত হওয়ায় তাঁহার ন্যায় একজন সমসাময়িক লেখকের বহু পরিশ্রমের ফল এই বিবরণীখানিকে অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদে পরিণত করিয়াছে।

"আকবরের যুগের" অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হইতেছেন 'মুন্‌তাখব-উল-তাওরিখ'-রচয়িতা বদাউনী এবং 'তবকাৎ-ই-আকবরী'-রচয়িতা নিজাম-উদ্দীন। বদাউনী ছিলেন আকবরের একজন বিরুদ্ধ সমালোচক; নিজাম উদ্দীন ছিলেন পল্লবগ্রাহী। পারসিক ভাষায় যে সকল কবি কবিতা রচনা করিতেন তাঁহাদের মধ্যে আবুল ফজলের ভ্রাতা ফৈজীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ব্লকম্যান বলেন যে "দিল্লীর আমীর খসরুর পর মুসলমান ভারতে ফৈজী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন কবির আবির্ভাব ঘটে নাই।" নিরক্ষর হইলেও আকবর ছিলেন এক অতি উদার সংস্কৃতির অধিকারী; মহাভারত, রামায়ণ এবং অথর্ব বেদের ন্যায় সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত গ্রন্থাবলীর পারসিক অনুবাদে তিনি সক্রিয় উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিপিবিদ্যা ও সঙ্গীতেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন ছিলেন তাঁহারই রাজসভার একজন গায়ক। আব্দুর রহিম খান খানান বাবরের 'জীবনস্মৃতি' পারসিক ভাষায় অনূদিত করেন। রহিম নামের অন্তরালে খান খানান আরবী, পারসিক, তুর্কি, সংস্কৃত এবং হিন্দী ভাষায় তাঁহার রচনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

আকবরের আমলে হিন্দী সাহিত্য: হিন্দী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি তুলসীদাস (আনুমানিক ১৫৩২-১৬২৩) "আকবরের যুগে"ই

আবির্ভূত হন। বারাণসীতে তিনি তাঁহার নিভৃত জীবন যাপন করিতেন। সম্ভবতঃ আকবরের সহিত তাঁহার কোন পরিচয় ছিল না; তবে তাঁহার ভক্তদের মধ্যে ছিলেন রাজা মান সিংহ এবং আব্দুর রহিম খান খানান। তিনি দ্বাদশখানিরও অধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া যান; তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইল তাঁহার বিরাট 'রাম-চরিত-মানস'। এই অমর গ্রন্থখানি পূর্বী হিন্দীতে রচিত; ইহাতে মানব-চরিত্রের প্রতি যে সহানুভূতি এবং মানব-হৃদয় সম্বন্ধে যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে, তাহাই ইহাকে যুগপৎ জনসাধারণ এবং শিক্ষিত-সমাজের নিকট পরম সমাদর ও শ্রদ্ধার বস্তু করিয়া তুলিয়াছে; ইহা বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের সামান্য অনুবাদ মাত্র নয়, ইহার রচনারীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। "তুলসীদাস ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন কবি; তাঁহার ছিল বিস্ময়কর সাবলীলতা, ভাবৈশ্বর্য ও গভীরতা, এবং শব্দঝঙ্কার ও পদলালিত্য অনুধাবনের সূক্ষ্ম শ্রুতিবোধ। তাঁহার কাব্য, অন্তর্গূঢ় ধর্মভাব সত্ত্বেও, বর্ণবৈভব ও সৌন্দর্যে দীপ্তিমান, সময়বিশেষে তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাধুর্যের স্তরে আসিয়াও উপনীত হয়, অবশ্য সেজন্য কবিকে সর্বদাই সঙ্কুচিত বলিয়া মনে হইয়া থাকে। পল্লী অঞ্চলকে তুলসী সহজ রামনামে মুখরিত করিয়া গিয়াছেন।" স্যর জর্জ গ্রীয়ার্সন লিখিয়াছেন, "বহু শতাব্দীর ঘটনা পরম্পরার প্রতি ফিরিয়া চাহিলে আমরা দেখিতে পাই তাঁহার মহনীয় মূর্তি যশোমন্দিরের প্রাচীরবেদীতে অনধিগত এবং একক অবস্থায় নিজস্ব পূত দ্যুতিতে দ্যুতিমান।"

বিখ্যাত হিন্দী স্তুতিগায়ক, আগ্রার অন্ধ কবি সুরদাস আকবরের রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। তিনি কাব্য রচনা করিতেন পশ্চিমা হিন্দীতে। তিনি তাঁহার বিশদ গীতলহরী 'সুরসাগরে' কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করেন; কথিত আছে ৬০,০০০ চরণে উহা সম্পূর্ণ ছিল। "সুরদাস সৌন্দর্যের কলাবিলাসে মগ্ন, আত্মসংবরণে পরাঙ্মুখ। তুলসী ছিলেন ভক্তমাত্র, প্রায় একজন নীতিবাগীশ।" স্যর জর্জ গ্রীয়ারসন লিখিয়াছেন সুরদাসের ভাষা পশ্চিমা হিন্দী বুলির বিশুদ্ধতম রূপ, কিন্তু অন্যান্য আরও অনেকের মতো তিনি বেশি পছন্দ করেন "তুলসীর সমসাময়িক মহাকবির মধুর অথচ মৃদুতর কাব্যপ্রেরণার তুলনায় তুলসী-রচিত যাবতীয় বিষয়ের অন্তর্নিহিত মহদ্ভাব।"

জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে সাহিত্য: মহামতি আকবর যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়া যান, তাহা জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের

রাজত্বকালেও অব্যাহত ছিল। জাহাঙ্গীর নিজেই ছিলেন একজন যথেষ্ট গুণবান লেখক, তাঁহার বিখ্যাত 'জীবনস্মৃতি' রচনা ছাড়াও তিনি 'ফরহাঙ্গ-ই-জাহাঙ্গীরী' নামে একখানি মূল্যবান অভিধান সমাপ্তিতে উৎসাহ দান করেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে 'বাদশাহনামা'র লেখক আবদুল হামিদ লাহোরী এবং 'মুন্‌তাখব-উল-লুবাব'-রচয়িতা খাফি খাঁর দ্বারা ভারতের পারসিক ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করে। 'সাতশইয়া' বা ৭০০ পৃথক পৃথক শ্লোকসমষ্টির রচয়িতা জয়পুরের হিন্দী কবি বিহারীলাল ছিলেন শাহজাহানের আমলের লোক। তাঁহার রচনা "যে-কোনও ভারতীয় ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ কলাসৌকুমার্যের অন্যতম নিদর্শন" রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। মাড়ওয়ারের মহারাজা যশোবন্ত সিংহও ছিলেন হিন্দী অলঙ্কারশাস্ত্রের একজন খ্যাতিমান লেখক। মুসলমান সাধুপুরুষ মিঞা মীরের শিষ্য স্থফী-সম্প্রদায়ভুক্ত দারা তাঁহার প্রপিতামহের প্রবর্তিত দার্শনিক তত্ত্বানুশীলনের ধারা অনুসরণ করিতে থাকেন। তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন নাই,—তিনি নিজেই মুসলমান সাধুপুরুষদের একখানি জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি তাল্‌মুদ এবং নিউ টেস্টামেণ্ট, মুসলমান স্থফীদের রচনা এবং বেদান্ত সম্বন্ধে হিন্দুদের রচিত বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। মুল্লা শাহ বুদাখ্‌শী, সেখ মুহীবুল্লা এলাহাবাদী, শাহ দিলরুবা, মুহসিন ফানি, এবং সরমদ প্রভৃতি বিখ্যাত স্থফীদের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতা ছিল। তিনি তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের মূলসূত্র 'স্থল্‌হ্‌-ই-কুল' অনুযায়ী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট অপর সম্প্রদায়ের ধর্মের চরম সত্য ব্যাখ্যা করিতে চাহিতেন।

ঔরঙ্গজেবের আমলে স্পষ্টতঃই দেখা দেয় ভারতীয় সংস্কৃতির অধঃপতন : ফলে ভারতীয় সাহিত্যের ধারাও ক্রমশঃ নিম্নতর গতি অবলম্বন করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলা

আকবরের আমলে স্থাপত্য: আকবর প্রচুর সৌধাদি নির্মাণ করিয়া যান। তাঁহার রাজত্বকালের স্থাপত্যশিল্পের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নিদর্শন হইল দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধিমন্দির, আগ্রা ও লাহোরের দুর্গাবাস, এবং ফতেপুর সিক্রীর হর্ম্যমালা। দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধিমন্দির হুমায়ুনের মহিষী হাজী বেগমের পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত হয়; তাঁহার স্বামী যখন পারস্যে নির্বাসিতের জীবনযাপনে বাধ্য হন, তখন তিনিই ছিলেন তাঁহার সঙ্গিনী। মোগল যুগের স্থাপত্যশিল্পে তিনি সঞ্চার করেন পারসিক ভাবের অনুপ্রেরণা; তা' ছাড়া সৌধটিকে একটি উদ্যান-পরিবেষ্টনীর মধ্যস্থলে স্থাপন করার নূতন রীতিও তিনিই প্রবর্তন করেন। আগ্রায় আকবরের দুর্গাবাসের প্রাচীর উচ্চতায় প্রায় ৭০ ফুট, উহাই হইতেছে 'এরূপ প্রকাণ্ড আকারের পাথরের উপর কাজ করার প্রথম নমুনা।' উহার প্রধান তোরণ দিল্লী-দরওয়াজাকে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন ও রোমাঞ্চকর দ্বারপথ রূপে বর্ণনা করিতে হয়। আগ্রার দুর্গ দেখিলে মনে হয় রাজপুতদের দুর্গ স্থপতির চিত্তে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আগ্রা হইতে ২৬ মাইল দূরে ফতেপুর সিক্রি আকবরের অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার ফলে এক বন্যজন্তু-সমাকীর্ণ পর্বত হইতে উদ্যানরাজি ও সুশোভন হর্ম্যমালায় পরিশোভিত একটি নগরে পরিণত হয়। ১৫৬৯-৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি এখানেই বাস করেন। আকবরের হর্ম্যরাজি এবং অন্যান্য শিল্পকলাও তাঁহার পরমতসহিষ্ণু কর্মনীতির পরিচয় বহন করিতেছে। বিস্তর সৌধাবলীতে এতদ্দেশীয় কারুশিল্পিগণকে জৈন ও হিন্দু মন্দিরের বিশিষ্ট আকারাদি রক্ষা করিতে দেওয়া হইয়াছে। ফতেপুর সিক্রিতে যোধ বাঈয়ের প্রাসাদে এই হিন্দু প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ফতেপুর সিক্রির সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক বস্তু হইল আকবরের গুজরাট জয়ের স্মৃতিচিহ্ন রূপে নির্মিত বুলন্দ দরওয়াজা। "প্রত্যেক কলা-সংস্কৃতিরই সচরাচর থাকে একটি প্রকাশভঙ্গী, তাহার মধ্যেই উহা খুঁজিয়া লয় বিকাশের সর্বোত্তম পন্থা; মোগলদের বেলায় তাহা ছিল

প্রবেশ-তোরণ।” তাঁহার সৌধাদি নির্মাণকার্য এতদ্দেশীয় বিবিধ কলাশিল্পরীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। অম্বর ও যোধপুরে বিকাশ ঘটিয়াছে ‘হিন্দু ভাবৈশ্বর্যে মোগল ভিত্তিমূলের শাখা-প্রশাখা বিস্তারের’ উদাহরণ। আবুল ফজল এইভাবে আকবরের স্থাপত্যকুশলতার বর্ণনা দান করিয়াছেন: “সম্রাট অপূর্ব সৌধাবলীর পরিকল্পনা করিয়া থাকেন, তারপর তাঁহার হৃদয়মনের সেই ভাবকে রূপায়িত করিয়া তোলেন প্রস্তর ও কর্দমের ভূষণে।”

আকবরের আমলে চিত্রকলা—স্থাপত্যের শোভা সম্পাদনের জন্য আকবর চিত্রকলার বহুল প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। মোগল যুগের চিত্র বলিতে সচরাচর যাহা বুঝাইয়া থাকে, তাহা হইতেছে প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত আলেখ্য। আকবর ফতেপুর সিক্রিতে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য চিত্রকরের সমাবেশ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন খাজা আব্দুস সামাদ নামে জনৈক পারসিক এবং দাসোয়ানাথ ও বসাওন নামে দুইজন ভারতীয় চিত্রকর। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুজ্জীবন ঘটে, এবং তাহা অবলম্বন করে এক নব অভিব্যক্তির ধারা। “গড়িয়া উঠিতে থাকে নবভাবে ভাবিত চিত্রকরদের একটি নূতন গোষ্ঠী, প্রতিকৃতি অঙ্কন এবং বিষয়াবলীর রূপায়ণই হইয়া উঠে তাহার একমাত্র উপজীব্য, নাটকীয় আঙ্গিকে সতেজ ও সমাকীর্ণ দৃশ্যপট রচনায়ই ছিল তাহার আনন্দ। সে আবহাওয়ার সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল বরং সমারোহপ্রিয় লোরেঞ্জোর আমলের ফ্লোরেন্সের পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদী রোমের আবহাওয়ার। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা ভারতের নানা শ্রেণীর স্বদেশীয় চিত্রকলার পুনরুজ্জীবনের উদাহরণ ও সুযোগ দানে সমৃদ্ধ হইয়া না উঠিলে, তাহার ফল হইয়া দাঁড়াইত তুলনায় কম মূল্যবান।”

জাহাঙ্গীরের আমলে শিল্পকলা: জাহাঙ্গীর ছিলেন শিল্পকলার একজন সৌখিন সমঝদার; তাঁহার ছিল আলেখ্য-বিচারের চক্ষু, কিন্তু ‘স্থাপত্যের রূপায়ণে যে বিশালতা ও বিস্তারের প্রয়োজন হইয়া থাকে’ তাহার মর্ম উপলব্ধি করিতে অপারক ছিলেন তিনি। আগ্রার অনতিদূরে সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধিমন্দির এবং শাহদারায় জাহাঙ্গীরের নিজের সমাধিমন্দির মনোহর সৌধ নয়, তবে সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধিমন্দিরে চারিকোণ হইতে যে চারিটি মিনার উঠিয়াছে তাহা হইল মোগল স্থাপত্যের উন্নতির পথে নবরীতি প্রবর্তনের একটি নিদর্শন। জাহাঙ্গীর ছিলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রের ভক্ত। তা’

ছাড়া উঁচু চকমিলানো রাস্তা, কৃত্রিম জলাশয়, আর অসংখ্য ফোয়ারায় ভরা সুবিখ্যাত মোগল উদ্যান স্থাপনের কৌশল তাঁহারই রাজত্বকালে সম্পূর্ণতা লাভ করে। কাশ্মীরের মনোরম শালিমার বাগ তিনিই তৈয়ারি করেন। জাহাঙ্গীরের কৃষ্টিমতী জীবনসঙ্গিনীর 'পেলব নারীভাব'-বশতঃ আগ্রায় ইতিমাদ-উদ্দৌলার সমাধিমন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায় মোগল শিল্পরীতির এক অভিনব ব্যতিক্রম। উহা যে সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচয় বহন করিতেছে, তাহা ছাড়াও উহার গুরুত্বের আরও একটি কারণ আছে; আকবর ও জাহাঙ্গীরের বেলেপাথরে গড়া সহজ সরল হর্ম্যমালা এবং শাহজাহানের শ্বেত পাথরের সৌধাবলীর মধ্যে উহা হইল যোগসূত্রবিশেষ।

শাহজাহানের আমলে শিল্পকলা: শাহজাহান তাঁহার পুরোগামীদের ন্যায় সাহিত্য-রচনায় অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রাঙ্কনে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন নাই; তাঁহার মনোযোগ একান্তভাবেই নিবদ্ধ ছিল স্থাপত্য-শিল্পের উপর। তাঁহার সৌধমালা চারুত্ব ও মনোহারিত্বে অপূর্ব। আগ্রা ও দিল্লীতে তিনি জমকালো এবং অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। 'বাদশাহনামা'র লেখকের ভাষায় বলিতে হয়, "মনোহর বস্তুনিচয় পূর্ণতার চরম অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিল।" আগ্রার দুর্গাবাসে তাঁহার মর্মর-সৌধাবলী—দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, খাস মহল, শিক্ষা মহল, মুসম্মান বুর্জ, মোতি মসজিদ—মোগল-রীতির পূর্ণতার এক একখানি মুকুটমণি। দিল্লীতে যে নূতন হর্ম্য গঠনের জন্য তিনিই ছিলেন কৃতিত্বের ভাগী—সেখানে তিনি যে জমকালো রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন—তাহা সম্ভবতঃ তাঁহার এই সুবিখ্যাত দাবি সমর্থনই করিয়া থাকে যে, "মর্ত্যে যদি থাকে স্বর্গ, তবে তাহা এই, তাহা এই।" দিল্লীর জামি মসজিদকে তিনি দান করিয়াছেন মহনীয় রূপবৈভব, আগ্রার জামি মসজিদে প্রকাশ করিয়াছেন 'সুস্পষ্ট প্রাণের আকুতি'।

তবুও মোগল শিল্পকলার সর্বাপেক্ষা সুচারু কুসুম হইল তাজমহল; উহাতে ঘটিয়াছে 'সূক্ষ্মতম কলা সৌকুমার্য ও নিপুণতম গঠন কৌশলের সংমিশ্রণ', আবার তাহারই সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে শ্রেষ্ঠতম কলাচাতুর্য, অপূর্ব বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ কৌশল, নিঃশেষ ব্যবস্থাপন, এবং অনুপম ইন্দ্রিয়-সম্মোহনের একত্র সমাবেশ। যমুনার পরপারে শাহজাহান তাঁহার নিজের সমাধিমন্দির নির্মাণেরও পরিকল্পনা করিয়াছিলেন; তাঁহার ইচ্ছা ছিল উহা

হইবে কৃষ্ণমর্মরে তাজেরই এক প্রতিরূপ, এবং সে যুগল সৌধের মধ্যে থাকিবে এক সেতুবন্ধন। সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধের ফলে সে পরিকল্পনা কার্যে প্রয়োগ করিতে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন, তাঁহার পুত্রভাব-বর্জিত অনুগামী তাঁহার পরিকল্পিত কার্যভার পরিহার করেন।

মোগল শিল্পকলার অবনতি: ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের সঙ্গে সঙ্গেই মোগলদের কলাচর্চা অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার অসামান্য ধর্মোৎসাহ সত্ত্বেও, তিনি এরূপ একটিও সমাধিমন্দির অথবা এরূপ কোনও মসজিদ নির্মাণ করেন নাই যাহাকে অপরূপ সৌধরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। রীতি-পদ্ধতির অবনতি দেখা দেয়। শিল্পকলার এই অধঃপতনের জন্য ঔরঙ্গজেবের ব্যক্তিত্ব বহুলাংশে দায়ী ছিল সন্দেহ নাই, তবে পার্সি ব্রাউন যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন, "শাহজাহানের আমলে দেশে দেখা দিয়াছিল উচ্ছল সৃষ্টির যুগ; শিল্পীরা তখন তাঁহাদের কীর্তির শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থার পরে সচরাচর প্রতিক্রিয়াই দেখা দিয়া থাকে। শিল্পকলার ইতিহাসে এ বিষয়ের বহু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ রহিয়াছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে সপ্তদশ শতকে য়ুরোপের বড় বড় চিত্রকলা-সংসদও ইহার একটি উদাহরণস্থল; এই সকল সংসদের শ্রেষ্ঠ কীর্তিনিচয়ের পর যে ছেদ পড়ে তাহা ছিল এক গভীর অবসাদের যুগ। মোগলদের স্থাপত্যশিল্পেও সেই একই ব্যাপার ঘটিয়াছিল।" মোগল শিল্পকলা সম্বন্ধে এই একটি বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, "দেশের চিরাচরিত প্রথা হইল নাম গোপন রাখা; তাই য়ুরোপীয় কলাবিদ্যার ইতিহাসে যাহা হইতেছে একটি বিশেষ আলোচনার বিষয়, প্রতিভা ও পরিবেশের সেই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুধাবনের চেষ্টা এক্ষেত্রে নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

য়ুরোপীয় পর্যটকগণের বর্ণনা অনুযায়ী দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

অর্থনৈতিক অবস্থাঃ "ভারতবর্ষের জনশক্তি ছিল এক মুষ্টিমেয় অথচ সাতিশয় ঐশ্বর্যশালী ও অমিতব্যয়ী উচ্চশ্রেণী, একটি সংখ্যালঘু ও মিতব্যয়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণী, এবং প্রায় বর্তমানেরই স্থায় দারিদ্র্য-প্রপীড়িত সাতিশয় সংখ্যাগুরু নিম্নশ্রেণীর সমবায়ে গঠিত।"

কৃষকেরা নিজেদের সামান্ত সামান্ত জমিজমা চাষ করিত; তাহাদেরই নিকট হইতে আদায় হইত রাজস্বের বৃহত্তম অংশ। খনির কাজ এবং শ্রমশিল্পও ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্থায় গঠিত। মোগল রাজসরকার নৌবলে বলীয়ান ছিলেন না, দেশের বাণিজ্যিক নৌবহরও ছিল সামান্ত মাত্র; তাই ভারতীয় বণিকদের পক্ষে নূতন নূতন ব্যবসায়ক্ষেত্রের সন্ধান করা সম্ভবপর হইত না; তবে য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা এখানে আসিয়া দেখিতে পান ভারতীয় বণিকেরা ব্যবসায়বুদ্ধিতে বিদেশীয়দের তুলনায় হীন নন।

চাষ-আবাদের ক্ষেত্রে তামাকের চাষ প্রবর্তনের ফলে এক বিশেষ নূতনত্ব সাধিত হইয়াছিল। তামাকের ব্যবহার দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধি পায়। ১৬১৭ সালে জাহাঙ্গীর তাম্রকূট সেবনের বিরুদ্ধে এক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, কিন্তু মান্নচী লিখিয়া গিয়াছেন ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথমদিকে দিল্লীতে ইজারাদার তামাকের জন্য দৈনিক ৫,০০০ টাকা শুল্ক প্রদান করিতেন। এই সময়ে নীল, কার্পাস এবং রেশমের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। সচরাচর লোকেদের যেরূপ ধারণা কৃষকেরা সেরূপ রক্ষণশীল স্বভাবের ছিল না। বাজারের উঠতি-পড়তির হিসাব করিয়া চলিবার মতো বুদ্ধি তাহাদের ছিল।

বিহারে সোরা এবং গোলকোণ্ডায় লৌহ উৎপাদন ছিল মোগল যুগের দু'টি বিশিষ্ট শ্রমশিল্প, তবে এ যুগের সর্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল পশ্চিম-য়ুরোপের চাহিদা মিটাইবার জন্য কার্পাসবস্ত্র বয়নের প্রসার সাধন। বেনিয়ে বলেন, বঙ্গদেশে কার্পাস ও রেশমের এমনই প্রাচুর্য ছিল যে, দেশটিকে মোগল সাম্রাজ্য, পার্শ্ববর্তী

রাজ্যসমূহ, এবং এমন কি য়ুরোপীয় দেশগুলিরও এই দু'টি পণ্যদ্রব্যের সাধারণ ভাণ্ডারশালা রূপে গণ্য করা যাইতে পারিত। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি অভিনব ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় জাপানে ভারতীয় রেশমের এবং পশ্চিম-য়ুরোপে ভারতীয় নীল, কার্পাসবস্ত্র, এবং সোরার প্রচুর ব্যবহার। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বন্দর ছিল সিন্ধুদেশের লাহোরী বন্দর, সুরাট, গোয়া, কালিকট, কোচিন, মসুলিপত্তন, এবং বঙ্গদেশের সাতগাঁও, শ্রীপুর, চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁও।

এই সময় বঙ্গদেশের রপ্তানি-কারবার দ্রুতগতিতে উন্নতি করিতে থাকে। ১৬৮১ সালে বঙ্গদেশ হইতে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক যে সকল ভারতীয় পণ্য রপ্তানি হয় তাহার মোট মূল্য ছিল ১৮½ লক্ষ টাকা; তখনকার দিনে টাকায় এখনকার সময় হইতে বিশ গুণেরও অধিক দ্রব্যাদি ক্রয় করা যাইত। বৎসর বৎসর ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকরা বঙ্গদেশে যে টাকা খাটাইতেন তাহার ফলে এখানকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বহুল পরিবর্তন দেখা দেয়। বহুকাল ধরিয়া মোগল সম্রাটগণ কর হিসাবে বঙ্গদেশ হইতে পাইতেন কেবল হস্তী আর কারুশিল্প-খচিত দ্রব্যাদি। শায়েস্তা খাঁ বৎসর বৎসর ৫ লক্ষ করিয়া টাকা দিতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষদিকে এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথম চল্লিশ বৎসর বাঙ্গালাদেশের বাড়তি রাজস্বই বাদশাহ-পরিবারের প্রধান উপজীব্য হইয়া দাঁড়ায়।

উৎপাদনের চলতি ধারা মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষের ফলে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িত; কিন্তু এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে দুর্ভিক্ষ এখনকার দিনের চেয়ে তখন যে বেশি ঘন ঘন দেখা দিত তাহা মোটেই নয়। তবে তখনকার দিনে স্থানবিশেষে খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি দেখা দিলে, আমদানির ফলে তাড়াতাড়ি তাহা পূরণ করা যাইত না; তাই ভারতবর্ষে এইরূপ এক ধারণার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল যে, লোকে 'আহার্যের সন্ধানে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে' শুরু করিলেই বুঝিতে হইবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। তখন লোকজনের অন্যত্র গমন, রোগমহামারী ও মৃত্যুর ফলে গ্রাম, শহর, অথবা জেলা-বিশেষের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িত। ১৬৩০-৩২ সালে দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে দেখা দিয়াছিল এক নিদারুণ দুর্ভিক্ষ; তাহাতে বহুকালের মতো কৃষি, শ্রমশিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

সমসাময়িক বিদেশীয় পর্যটকদের প্রায় সকলেই ভারতবর্ষের শহরগুলিতে

খাদ্যদ্রব্যের অল্পমূল্যের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ; ইহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহারা সাধারণতঃ বলিয়াছেন দেশের উর্বরতার কথা। তাভার্নিয়ে বলেন যে ক্ষুদ্রতম পল্লীগ্রামেও ময়দা, চিনি ও মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। বাঙ্গালাদেশ সম্বন্ধে মানুচী বলিয়াছেন, "ফলমূল, ডাল, শস্য, মসলিন, স্বর্ণ ও রেশমের বস্ত্র, এখানে সব কিছুরই প্রাচুর্য রহিয়াছে।" কিন্তু মোরল্যাণ্ড নামে একজন আধুনিক লেখক ইহার অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন : "অর্থনৈতিক ব্যবস্থা……সম্বন্ধে এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে উহার লক্ষ্য ছিল পড়তার চেয়েও কম খরচে শহরের লোকেদের আহার যোগানো। ফসল তোলার সময় অতিরিক্ত মাল বাজারজাত করা ভারতবর্ষে এখনও একটা জানা ব্যাপার।…… যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করিতে বসিয়াছি তখন এই অতিরিক্ত মাল বোঝাইয়ের ব্যাপারটা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি তীব্র ছিল, কেননা বিক্রয়ের জন্য যাহা উৎপাদন করা হইত তাহার পরিমাণ অনুপাতে ছিল ঢের বেশি, আর গাফিলতির সাজাও ছিল ঢের বেশি কঠোর। প্রত্যেকবার ফসল তোলার সময় নগদ টাকাকড়ির জোর চাহিদা দেখা দিত ; ফলে ব্যবসায়ীদের হাতে টাকাকড়ি জমা থাকিত বলিয়া তাহারা একরূপ নিজেদের খুশিমতোই চুক্তি করিতে পারিত। তবে তাহাদেরও পরের বার ফসল তোলার সময় হাতে টাকা রাখিবার জন্য সময় মতো উজাড় করিয়া ফেলিতে হইত তাহাদের উৎপন্ন-দ্রব্যের মালগুদাম ; আর এদিকে শহরবাসীদের সংখ্যা তুলনায় অল্প ছিল বলিয়া, এইরূপ অবস্থার ফলে বাজার আটকা না থাকিয়া খোলা থাকিলে যাহা হইত তাহার চেয়ে কম দামে তাহারা কিনিতে পাইত আহার্য ও অন্যান্য সামগ্রী।" প্রায় সমস্ত য়ুরোপীয় পর্যটকদের সমবেত সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে সপ্তদশ শতকের জনসাধারণের দারিদ্র্য প্রমাণ করিবার জন্য মোরল্যাণ্ড বেশ কিছুটা আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। বিংশ শতকে আমরা যাহা দেখিতে পাইতেছি, সচ্ছলতার ক্ষেত্র তখন তদপেক্ষা যথেষ্ট প্রশস্ততর ছিল।

সামাজিক অবস্থা : ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে যে সকল য়ুরোপীয় পর্যটক ভারতবর্ষে আগমন করেন, তাঁহারা আমাদিগকে কেবল যে মোগল দরবার ও শিবির সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিয়া গিয়াছেন তাহাই নয়, ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও মূল্যবান বিবরণ দান করিয়া গিয়াছেন।

সেবাস্তিয়ান সন্ন্যাসী মান্‌রিক (Manrique) তাঁহার 'ভ্রমণপঞ্জী'তে (Itinerario) উল্লেখ করিয়াছেন ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা। গাঙ্গেয় সমভূমির উর্বরতা, এখানকার চমকপ্রদ কার্পাসবস্ত্র, গঙ্গানদী এবং গোজাতির প্রতি এখানকার লোকেদের শ্রদ্ধা, এবং জগন্নাথের রথযাত্রায় এবং সাগরসঙ্গমে পুণ্যার্থীদের আত্মাহুতি, এই সব বিষয়ের তিনি বর্ণনা দান করিয়া গিয়াছেন। ১৬২৩ সালে পিয়েত্রো দেল্লা ওয়ালে নামে (Pietro della Valle) একজন ইতালীয় পর্যটক স্থরাটে আসেন। সমগ্র গুজরাট-দেশে ধর্মাচরণ সম্পর্কে সকলেরই যে অবাধ স্বাধীনতা ছিল, তিনি সে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই ইতালীয় পর্যটকের কথা বিশ্বাসযোগ্য হইলে দেখিতে পাওয়া যায় সতীদাহ নিবারণে মোগলদের চেষ্টার ফলে দেশে সতীদাহের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল। স্থরাট ও কাম্বের নিকটে সতীদাহের বিরলতার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন দেল্লা ওয়ালে। আকবরের সতীদাহ-নিরোধ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার সম্ভবতঃ কিছু সাময়িক ফল ফলিয়াছিল। পঞ্চদশ শতকে নিকোলো কোন্তি এবং সপ্তদশ শতকে দেল্লা ওয়ালে তাঁহাদের পরিবারভুক্ত মহিলাদের সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষ পর্যটন করেন। ভারতবর্ষে বিদেশীয়েরা যে তাঁহাদের পরিবারভুক্ত মহিলাদের সঙ্গে লইয়া নিরাপদেই স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিতে পারিতেন, ইহা হইতেছে ভারতীয় সভ্যতার উন্নত অবস্থার এক অনুপম উদাহরণ—এই যে একটি অভিমত বেশ জোরের সঙ্গেই প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট সত্য আছে। "অবস্থা যদি ইহার বিপরীত হইত, কোন ভারতীয় পর্যটক যদি পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভকাল হইতে ষোড়শ শতকের সমাপ্তিকালের মধ্যে তাঁহার পরিবারবর্গ লইয়া য়ুরোপের অধিকতর সভ্য দেশগুলির যে-কোনও একটি পর্যটনে বাহির হইতেন, তবে তিনি যে ব্যবহার লাভ করিতেন তাহা ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীরা সমভাবে তাহাদের 'ফিরিঙ্গি' পরিদর্শকদের প্রতি যেরূপ আচরণ করিত তাহার সহিত কোনদিক দিয়াই তুলনীয় হইত কি না সন্দেহের বিষয়।"

ইংরেজ পর্যটকগণ: "ইংলিশ খাঁ" হকিন্স (Hawkins) জাহাঙ্গীরের শিথিল রাজত্বকালে মনসবদারী প্রথার অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধে আমাদিগকে বিশেষ মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করিয়া গিয়াছেন। রো (Roe)

দান করিয়া গিয়াছেন রাজকীয় শিবিরের একখানি চমৎকার আলেখ্য, 'আমার এই সামান্য জীবনের এক বিস্ময়'। হকিন্সের *Purchas—his Pilgrims* নামক গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহাকে জাহাঙ্গীরের সম্মুখে দুইজন ইংরেজ নাবিককে উপস্থাপিত করিতে হইয়াছিল, 'কারণ তাহাই হইল দেশের প্রথা ও ব্যবস্থা, কেননা তিনি কি করিতেছেন এবং কোথা হইতে আসিতেছেন তাহা জানিবার জন্য কোনও লোকেরই রাজার সম্মুখে চব্বিশ ঘণ্টার অধিককাল থাকিবার অধিকার নাই।"

বার্টন ও কার্টরাইট নামে দুইজন ইংরেজ বণিক ১৬৩২ সালে বাঙ্গালাদেশে আসেন। তাঁহারা বাস করিতে থাকেন কটকে। বার্টন পুরী যান। তিনি বলেন আকবরের আমলের পূর্বে জগন্নাথ-মন্দির করভার হইতে মুক্ত ছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, আকবর ধর্মের উৎপীড়ন হইতে দিতেন না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যথেচ্ছাচারেরও প্রশ্রয় দিতেন না। বাঙ্গালাদেশের লোকেদের বিষয়ে বার্টন এইভাবে লিখিয়া গিয়াছেন: "ইহারা বেশ করিতকর্মা লোক, তা' যে-কোনও কলাকৌশল অথবা বিজ্ঞানের কথাই হউক না কেন; যে-কোনও হাতের কাজ ইহাদের কাছে লইয়া আসা যাউক, তাহাই ইহারা নকল করিতে পারে।"

ফরাসী পর্যটকগণ: ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষে ছিলেন তিনজন ফরাসী—বের্নিয়ে (Bernier), তাভার্নিয়ে (Tavernier) এবং থেবেনো (Thevenot)। বের্নিয়ে ছিলেন চিকিৎসক, তাভার্নিয়ে মণিকার, থেবেনো আসিয়াছিলেন একজন ফরাসী বণিকের সঙ্গী রূপে। বের্নিয়ের ইতিহাস ও পত্রাবলী, তাভার্নিয়ের 'ছয়বার সমুদ্রযাত্রা' (*Six Voyages*), এবং থেবেনোর 'উপাখ্যানের' (*Narrative*) বিষয়বস্তু এক নয়; এই তিনের মধ্যে আবার তাভার্নিয়ের বিবরণই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। বহু পাশ্চাত্ত্য লেখকের প্রমুখাৎ আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে ভারতবর্ষে মানুষের প্রাণকে বিশেষ মূল্যবান বস্তু জ্ঞান করা হইত না, শাস্তিদান করা হইত অতর্কিতে, খামখেয়ালের বশে, এবং নিষ্ঠুর ভাবে; কিন্তু সুরাটের শাসন-ব্যবস্থার উল্লেখ করিতে গিয়া থেবেনো বলিয়াছেন যে উচ্চতম রাজকর্মচারীরও মোগল সম্রাটকে না জানাইয়া প্রাণদণ্ড কার্যে পরিণত করার অধিকার ছিল না। আমরা জানি যে ১৬৭০ সালে, যখন ডাঃ গ্রাফ এবং অপর একজন ওলন্দাজকে হুগলী হইতে পাটনার

ওলন্দাজ গবর্ণরের উদ্ধার সাধনের জন্য প্রেরণ করা হয়, তখন মুঙ্গেরে তাঁহারা শহর ও দুর্গের নক্সা আঁকিতেছেন এমন অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। কিন্তু ফৌজদারকে ব্যাপারটা জানাইতে হয় প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে। "একজন বিদেশীকে গুপ্তচরের কাজে রত অবস্থায় একেবারে হাতেনাতে ধরিয়া ফেলিয়াও তাহাকে প্রাণদণ্ড দানের জন্য তাঁহাকে সম্রাটের মতামত গ্রহণ করিতে হয়।" সুদিনের সময় মোগল শাসন-ব্যবস্থায় অকর্মণ্যতার লক্ষণ ছিল না—অন্ততঃ যে-সব বিষয়কে একান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান করা হইত সে সব বিষয়ে তো নয়ই।

বের্নিয়েকে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল সম্বন্ধে একজন প্রধান প্রামাণিক লেখকরূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু বিপ্লবের পূর্বে 'কোনও অধিকার পদদলিত না করিয়াই' ফ্রান্সের রাজশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, তাঁহার এই মন্তব্যের পর এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হইবে না যে তাঁহার মধ্যে বিচারবুদ্ধির অভাব ছিল। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী ফ্রান্সের সুশাসন সম্পর্কে প্রশংসায় যিনি পঞ্চমুখ, মোগল শাসনের এই সেই বিরুদ্ধ সমালোচকই কিন্তু আবার বঙ্গদেশে চাউল, শস্য ও জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তুর প্রাচুর্য, এ দেশের জনসমৃদ্ধ ও কৃষিসমৃদ্ধ অবস্থা, ইহার নক্সাকাটা ও সূচীশিল্পে মনোহর কার্পাস ও রেশম-বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য শ্রমশিল্পের প্রতি তাঁহার দেশের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বিবেচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন কিসের জন্য ভারতবর্ষে বহির্বাণিজ্যের তৌলমান সর্বদাই ছিল অনুকূল, কিসের জন্যই বা ভারতবর্ষ গ্রাস করিয়া ফেলিত পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল হইতে প্রেরিত স্বর্ণ-ও-রৌপ্য-সম্ভার।

একবিংশ অধ্যায়

মোগল সাম্রাজ্যের পতন

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারিগণ

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সংঘর্ষ: ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন লইয়া সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। জ্যেষ্ঠপুত্র (জীবিতদের মধ্যে) শাহজাদা মুয়াজ্জম (শাহ আলম) ছিলেন কাবুলে; দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা আজম এবং তৃতীয় পুত্র শাহজাদা কাম বক্স ছিলেন দাক্ষিণাত্যে। শাহ আলম এই অনিবার্য সংঘর্ষের জন্য ইতিপূর্বেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন; দ্রুতগতিতে তিনি আগ্রায় আসিয়া উপনীত হন; তাঁহার মধ্যম পুত্র আজিম-উস-শান ছিলেন বঙ্গদেশের সুবাদার, তাঁহাকে যখন দাক্ষিণাত্যে তলব করিয়া পাঠানো হয় তখন তিনি বঙ্গদেশ হইতে তাঁহার ধনরত্ন লইয়া আগ্রায় আসিয়া শহর দখল করিয়া বসিয়াছেন, তবে দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। শাহ আলম আসিয়া পৌঁছিলে আগ্রার দুর্গাধ্যক্ষ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করেন, ফলে আগ্রার ভূগর্ভস্থ কোষাগারে সঞ্চিত যাবতীয় সম্পদ শাহ আলমের হস্তগত হয়। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জুন আগ্রার দক্ষিণে জজৌ নামক স্থানে এক যুদ্ধে এই ভ্রাতৃবিরোধের প্রকৃত নিষ্পত্তি ঘটে। আজমের অধীনে ছিল ৪৫,০০০ পদাতিক ও ৬৫,০০০ অশ্বারোহীর এক বিপুল বাহিনী। তাঁহার পক্ষে ছিলেন আসাদ খাঁ এবং তাঁহার পুত্র জুলফিকর খাঁ—ইনি ঔরঙ্গজেবের জীবনের শেষভাগে কর্মবলে প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পক্ষে প্রায় ১০,০০০ সৈন্য নিহত হয়, কিন্তু আজমের বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। দুই পুত্রের সহিত তিনি নিজেও নিহত হন। তবুও এ গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে না। ১৭০৯ সালের ১৩ই জানুয়ারী হায়দরাবাদে কাম বক্সকে পরাভূত করিবার জন্য শাহ আলমকে—সম্রাট রূপে ইনি বাহাদুর শাহ

নামেই পরিচিত—দাক্ষিণাত্যে ছুটিয়া আসিতে হয়। যুদ্ধে আহত হইয়া কাম বক্স প্রাণত্যাগ করেন।

বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১৭১২)ঃ বাহাদুর শাহের সৌভাগ্যক্রমে দাক্ষিণাত্যে ঘটনাবলীর গতি অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল। সিংহাসন লাভের আশায় যুদ্ধার্থ উত্তর-ভারতে অগ্রসর হইবার পূর্বে আজম শম্ভুজীর পুত্র শাহুকে মোগলের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। কাজটা হইয়াছিল জুলফিকর খাঁর পরামর্শেই। ইহার ফলে মহারাষ্ট্র দেশে শাহু ও তারা বাঈয়ের সমর্থক-দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধিয়া যায়, কিছুকালের মতো দিল্লীও মারাঠাভীতির কবল হইতে মুক্তি পায়।

কিন্তু পঞ্জাবে বান্দার নেতৃত্বে শিখেরা মোগলদের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য অক্লেশে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছিল। বাহাদুর শাহ লৌহগড়ের শিখ-দুর্গ অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু বান্দা সেখান হইতে পলায়ন করেন, যুদ্ধও চলিতে থাকে। মাড়ওয়ার-রাজ অজিত সিংহ বশ্যতা স্বীকার করিয়া পুনরায় অস্ত্রধারণ করেন, অবশেষে দ্বিতীয়বারের মতো বশ্যতা স্বীকার করেন। মাড়ওয়ার-রাজ এবং জয়পুর-রাজ সওয়াই জয় সিংহ উভয়কেই মোগল সরকারে চাকুরী দেওয়া হয়।

১৭১২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বাহাদুর শাহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি ছিলেন সাতিশয় দুর্বলচেতা ব্যক্তি; তাঁহার যথেষ্ট বয়সও হইয়াছিল, আরামপ্রিয়তাও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, একটানা পরিশ্রমের ক্ষমতা আর ছিল না। তিনি এমনই অস্থিরমতি ছিলেন যে, জজৌয়ের যুদ্ধের পর ঔরঙ্গজেবের অধীনে চাকুরীর মর্যাদা লইয়া আসাদ খাঁ আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলে তিনি স্থিরই করিয়া উঠিতে পারেন না তাঁহার পুরাতন মন্ত্রী মুনিম খাঁ এবং আসাদ খাঁর মধ্যে কাহাকে উজীর-পদের জন্য নির্বাচন করিবেন। তিনি কর্তৃত্বভার উভয়ের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন, ফলে শাসনকার্যে দেখা দেয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

জাহান্দর শাহঃ বাহাদুর শাহের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে শুরু হইয়া গেল সেই অনিবার্য গৃহযুদ্ধ। ভ্রাতাদের মধ্যে যোগ্যতম ছিলেন তাঁহার মধ্যমপুত্র আজিম উস-শান। কিন্তু জুলফিকর খাঁ জ্যেষ্ঠ জাহান্দর শাহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তিন ভাইকে একযোগে আজিম-উস-শানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য গোপনে গোপনে প্ররোচনা দান

করেন ; যুদ্ধে আজিম-উস-শানের পরাভব ও মৃত্যু ঘটে। তখন জাহান্দর শাহ, রফি-উস-শান ও জাহান শাহ এই তিন ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া যায়। কনিষ্ঠ দুই ভাইয়ের প্রাণ বিনাশ করা হয়, অকর্মণ্য দুশ্চরিত্র জাহান্দর শাহ অবিসংবাদিত প্রভুত্ব লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল জুলফিকর খাঁয়েরই জয়জয়কারের ব্যাপার, কিন্তু ব্যাপারটা হইয়া দাঁড়ায় বড়ই ক্ষণস্থায়ী। মাস এগারো পরেই আজিম উস-শানের পুত্র ফর্‌রুখ সিয়র সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় হাসান আলী (পরবর্তী কালে আবদুল্লা খাঁ নামে পরিচিত) ও হুসেন আলীর সহায়তায় আগ্রা শহরের বহির্দেশে জাহান্দর শাহ ও জুলফিকর খাঁকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন। জাহান্দর শাহ কারাগারে খুন হন, জুলফিকর খাঁকে গলা টিপিয়া মারা হয়।

ফর্‌রুখ সিয়র (১৭১৩-১৭১৯) এবং সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রাধান্য লাভ: ফর্‌রুখ সিয়র মাত্র ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। 'আখম-ই-আলমগীরী'তে ঔরঙ্গজেবের অন্তিম অভিলাষজ্ঞাপক পত্র (উইল) নামে কথিত একখানি লিপি আছে ; তাহাতে তিনি ফর্‌রুখ সিয়রের প্রধান দুইজন সমর্থক যে গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন সেই বর্হার সৈয়দদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে সে বিষয়ে তাঁহার সন্তানসন্ততিগণকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিতেছেন, "বর্হার সৈয়দদের সহিত আচরণে তোমাদিগকে যার-পর-নাই সাবধান থাকিতে হইবে। তাহাদের প্রতি তোমাদের অন্তরে সহৃদয়তার অভাব যেন না থাকে, কিন্তু বাহিরে তাহাদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করিয়ো না, কেন না শাসনকার্যের প্রবল সহযোগী অচিরেই রাজপদ লাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। তোমরা যদি শাসন-ক্ষমতার কণামাত্রও তাহাদের হস্তগত করিতে দাও, পরিণামে তোমরা নিজেরাই লাঞ্ছনা ভোগ করিবে।" ১৭১৩-১৭২০ এই কয় বৎসর বর্হার সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় বাস্তবিকই রাজ-বিধাতার ভূমিকায় অভিনয় করিয়া চলিতে থাকেন। তবে ইহা শুধু এইজন্যই সম্ভবপর হইয়াছিল যে ফর্‌রুখ সিয়র ছিলেন 'ক্ষীণপ্রকৃতি, কপটস্বভাব, ভীরু ও অবজ্ঞার উপযুক্ত পাত্র'। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের আয়াস স্বীকারের ফলেই ফর্‌রুখ সিয়র তাঁহার সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। আবদুল্লাকে উজীর এবং হাসান আলীকে মীর বক্‌সী নিযুক্ত করা হইল। এই দু'টি প্রধান পদের উপর তাঁহারা আবার লাভ করেন নিজেদের জন্য দু'টি এবং তাঁহাদের জনৈক পিতৃব্যের জন্য একটি সুবার শাসনভার, কিন্তু রাজ্যের অন্যান্য

সমস্ত পদই তাঁহারা সম্রাটের বন্ধুবর্গ ও তুরানী সর্দারদের নির্বিবাদে ভোগদখল করিতে দেন। লঘুচিত্ত সম্রাট তবুও তাঁহাদের পতন সংঘটনের জন্য চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। অনেক সময়ই বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিত, আবার সে সব ধামাচাপা পড়িত। হুসেন আলীকে প্রেরণ করা হইল মাড়ওয়াড়-রাজ অজিত সিংহের বিরুদ্ধে, অজিত সিংহকে তিনি দীনভাবে বশ্যতা স্বীকার করিতেও বাধ্য করিলেন, অথচ এদিকে সম্রাট গোপনে হুসেন আলীর বিরুদ্ধাচরণের জন্য রাঠোর-রাজকে উসকাইতে লাগিলেন। ফর্‌রুখ সিয়রকে তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা ও প্রিয়পাত্র মীর জুমলাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিতে হইল। তারপর নিজাম-উল-মুল্ককে ডিঙাইয়া হুসেন আলীকে দেওয়া হইল দাক্ষিণাত্যের শাসনভার। সম্রাট সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে চক্রান্ত-জাল বুনিয়াই চলিতে লাগিলেন। অবশেষে হুসেন আলী নিজ সৈন্যদল লইয়া উত্তর-ভারত অভিমুখে অগ্রসর হইবেন স্থির করিলেন; মারাঠাদিগকে তিনি মঞ্জুর করিয়া দিলেন দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবা হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার, তাঁহার উত্তরাঞ্চল অভিযানে একটি মারাঠা বাহিনী তাঁহার সঙ্গী হইল। ফর্‌রুখ সিয়রের দীনহীন আত্মসমর্পণেও কোন সুরাহা হইল না। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় বাদশাহী প্রাসাদ অধিকার করিয়া ফর্‌রুখ সিয়রকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, সিংহাসনচ্যুতির দুই মাস পরে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করা হইল।

"বর্হার সৈয়দদের মধ্যে এরূপ এক স্থানীয় কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে কে-একজন প্রস্তাব করে শাহী পরিবারের সম্পূর্ণ অপসারণ সাধন করিয়া দুই ভাইয়ের একজনকে সিংহাসন প্রদান করা হউক। তখন সম্ভবতঃ এই সমস্যা দেখা দেয় যে কোন ভাই শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবেন।" বাহাদুর শাহের তৃতীয় পুত্রের রফি-উদ-দরজাৎ নামে এক পুত্রকে সম্রাট-পদ দান করা হয়। ক্ষয়রোগের আক্রমণে অতি দ্রুত তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপণের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় তাঁহাকে অল্পকাল পরেই সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে হয়; সে স্থলে স্থাপন করা হয় রফি-উদ-দৌলা নামে তাঁহারই ভাইকে, কিন্তু তিনিও ছিলেন আর-একজন রোগজীর্ণ তরুণ। ১৭১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু ঘটে; তখন বাহাদুর শাহের চতুর্থ পুত্র জাহান শাহের পুত্র রৌশন-আখতারকে মহম্মদ শাহ উপাধি-সহ সিংহাসনে স্থাপন করা হয়।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতন: সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় বিস্তর শত্রু সৃষ্টি

করিয়া বসিয়াছিলেন ; এদিকে আবার প্রায় এই সময়ই নিজাম-উল-মুল্ক সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধিতা করিয়া দাক্ষিণাত্যের শাসন-ব্যবস্থায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া বসিয়াছিলেন ; দরবারী দল তাঁহার সহিত যোগদান করে। সম্রাটকে সঙ্গে লইয়া হুসেন আলী দাক্ষিণাত্য অভিমুখে অগ্রসর হন, কিন্তু পথিমধ্যেই তাঁহার প্রাণনাশ করা হয়—এ হত্যাকাণ্ডে স্বয়ং সম্রাটেরই প্রশ্রয় ছিল। শোনা যায় এই হত্যাকাণ্ডের ঠিক পূর্বদিনই হুসেন আলী এই বলিয়া বাহাদুরি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে যাহাকেই তিনি তাহার অঙ্গে নিজ পাদুকা নিক্ষেপের উপযুক্ত পাত্র জ্ঞান করেন তাহাকেই তিনি সম্রাট তৈয়ারি করিয়া থাকেন।

এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ যখন আবদুল্লা খাঁর নিকট গিয়া পৌছিল তখন তিনি আর-এক পুতুল সম্রাট খাড়া করিয়া বসিলেন—তিনি হইলেন ইব্রাহিম। কিন্তু বাদশাহী ফৌজ মোড় ফিরিয়া উত্তরাভিমুখে আসিল ; হাসানপুরের প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে যমুনাতটে বিলোচপুর নামে এক গ্রামে আবদুল্লা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন। দুই বৎসর পরে কারাগারে বিষপ্রয়োগে তাঁহার প্রাণনাশ করা হইল। মহম্মদ শাহ এইরূপ এক আদেশ জারি করিলেন যে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর পর তাঁহাদের একজনকে 'নমকহারাম' এবং অপরজনকে 'হারামনমক' নামে উল্লেখ করিতে হইবে। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের উত্থানকালের মধ্যেই বান্দা-পরিচালিত শিখ-আন্দোলন নিষ্ঠুর ভাবে দমন করা হয়।

মহম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮)ঃ মহম্মদ শাহ বাদশাহী কর্তৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বাদশাহী শক্তির পুনরুজ্জীবন সাধন করার লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন দুর্বলচেতা, ইন্দ্রিয়াসক্ত, সম্ভবতঃ অবস্থার নৈরাশ্যজনকতা সম্বন্ধে সচেতন। হতবীর্য সৈন্যবাহিনী, সংহতিভ্রষ্ট শাসনযন্ত্র ও অভিজাতশ্রেণী যাহাদের 'পেশাই ছিল ঈর্ষ্যা', এই সব লইয়া তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া ঘটনাপ্রবাহে গা ঢালিয়া দিলেন, ফলে তাঁহারই সুদীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন কার্যতঃ সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই যে ভাঙনের প্রক্রিয়া, ইহা আরম্ভ হয় নিজাম-উল-মুল্কের দৌলতে ; পর পর তিনি দাক্ষিণাত্যে মোগল রাজপ্রতিনিধি (১৭১৩-১৪, ১৭২০-২২) এবং সাম্রাজ্যের উজীরের (১৭২২-১৭২৪) কাজ করিয়া, অবশেষে দাক্ষিণাত্যে কার্যতঃ স্বাধীনভাবেই কর্তৃত্ব করিতে থাকেন (১৭২৪-১৭৩৮)। তিনিই হইলেন হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। নাদির শাহ তাঁহার লুণ্ঠিত সম্পদ লইয়া দিল্লী ত্যাগের প্রাক্কালে মহম্মদ শাহকে বিশেষ

করিয়া নিজাম-উল-মুল্ক সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন ; দিল্লীর সভাসদগণের মধ্যে তাঁহাকেই তাঁহার সর্বাপেক্ষা ধূর্ত, স্বার্থপর, কুচক্রী ও ন্যায়-অন্যায়-বোধবিরহিত ব্যক্তি বলিয়া মনে হইয়াছিল। তবে স্বার্থান্বেষী সভাসদদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মক্ষম ব্যক্তি রূপে স্বাধীনতার পথে নিজাম বৃহত্তম সাফল্য অর্জন করিলেও, তাঁহার চেয়ে কম কর্মকুশল ব্যক্তিগণও স্বাধীন সামন্ত রাজ্য স্থাপনে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করিয়া যান, যথা—অযোধ্যায় সাদা'ত খাঁ, বঙ্গদেশে আলীবর্দি খাঁ, এবং বর্তমানে রোহিলখণ্ড নামে পরিচিত অঞ্চলে রোহিলা আফগানগণ। মারাঠাগণ মালব, বুন্দেলখণ্ড, গুজরাট, বেরার, এবং সামান্য কিছুকাল পরে, উড়িষ্যা অধিকারে সাফল্য লাভ করে। ১৭৩৯ সালে নাদির শাহের আক্রমণের ফলে মোগল সাম্রাজ্য রক্তাপ্লুত ও ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। তাঁহার প্রারব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিয়া তোলেন আহম্মদ শাহ আবদালী।

সম্রাটরূপী ক্রীড়নকগণ: মহম্মদ শাহের পর একে একে রাজপদ লাভ করেন আহম্মদ শাহ (১৭৪৮-৫৪), দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-৫৯), এবং দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬)। দিল্লীর সাম্রাজ্য ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে হইতে যমুনার পশ্চিমতীরস্থ কিয়দংশ ভূমিভাগ-সহ গাঙ্গেয় দোয়াবের উত্তরার্ধে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের অযোগ্য বংশধর এই সব সম্রাটরূপী ক্রীড়নকের হাতে যাহা অবশিষ্ট ছিল সেখানে অনধিকার-প্রবেশ করিতে থাকে দক্ষিণদিকে জাঠগণ এবং পশ্চিমদিকে শিখগণ। এমন কি এই অঞ্চলটুকুতেও শাসনক্ষমতা নামশেষ মোগল সম্রাটের হাতে ছিল না ; ১৭৮৪-১৮০৩ সালের মধ্যে ইহা ছিল মারাঠাদের প্রভাব-পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। ১৮০৩ সালে ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড লেক যখন দিল্লীতে প্রবেশ করেন এবং সেই বাদশাহী রাজধানীতে মারাঠা-শক্তি ধূলিসাৎ হইয়া পড়ে, তখন বাদশাহী কর্তৃত্বের ছায়ামূর্তিটুকুও অন্তর্ধান করে। ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহী সিপাহীরা যখন সর্বশেষ মোগল দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে বৈধ নেতারূপে উপস্থাপনের চেষ্টা করে তখন কালের পট হইতে মুছিয়া যায় এই রাজবংশের নাম।

ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী মোগলগণের বংশতালিকা
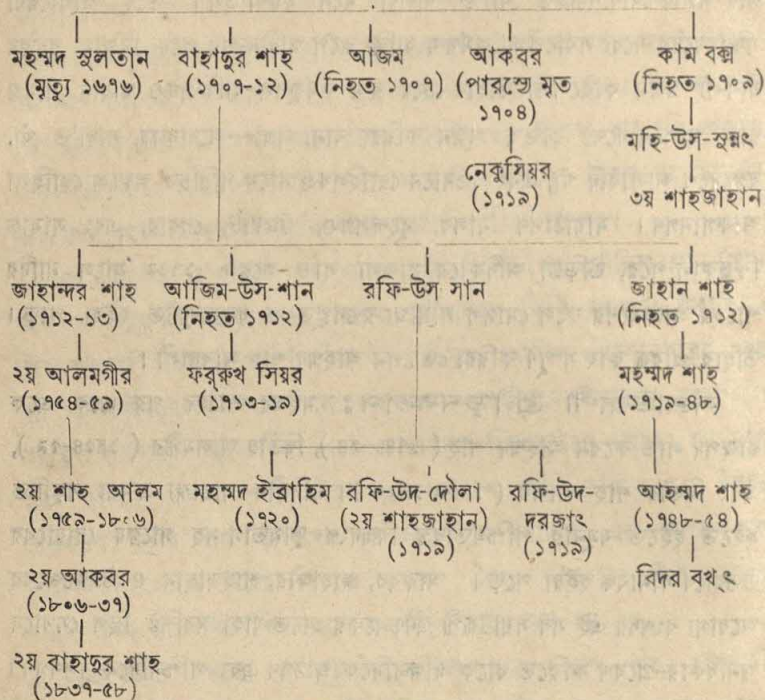
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পারসিক ও আফগান আক্রমণ

পারস্যের সাফাবী সাম্রাজ্য ও ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের সীমারেখা ছিল পরস্পর-সংলগ্ন। সাফাবী-বংশীয় ও তৈমুর-বংশীয় রাজগণ পরস্পরকে প্রতিযোগী জ্ঞান করিতেন, কিন্তু সাফাবী-বংশের কেহই কখনও দিগ্বিজয়ে বাহির হন নাই। বেনিয়ে বলেন, "পারসিকদের যদি হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে কিছু করিবার ক্ষমতা থাকিত, তবে হিন্দুস্থানে এই যে এতকাল ধরিয়া দুর্যোগ ও গৃহযুদ্ধ চলিল, এবং যখন দারা, শাহজাহান, সুলতান শুজা, এবং সম্ভবতঃ কাবুলের রাজসরকার পর্যন্ত তাহাদের সহায়তা কামনা করিতেছিলেন, এবং যখন তাহারা বিশেষ বড় রকমের কোন সৈন্যদল না লইয়াই, অথবা তেমন কিছু বেশি অর্থব্যয় না করিয়াই, কাবুল রাজ্য হইতে শুরু করিয়া সিন্ধুনদ অবধি এবং তাহার পরপারেও, ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা রমণীয় অঞ্চল অধিকার করিয়া যাবতীয় ব্যাপারে নিজেরাই বিধানদাতা হইয়া দাঁড়াইতে পারিত, তখন কেন তাহারা নিশ্চেষ্ট দর্শক হইয়া বসিয়া রহিল?" তাহারা দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেবের দীর্ঘকাল স্থিতির সময়েও সুযোগ বুঝিয়া নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা করিতে পারিত। ভারতীয় বিদ্রোহীদের আশ্রয়স্থান হইলেও, এবং প্রতিবেশী বলিয়া স্বভাবতঃই প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে গণ্য হওয়া সত্ত্বেও, পারস্য মোগল ভারতের নিকট আতঙ্কের বস্তু ছিল না।

নাদির শাহের আক্রমণ (১৭৩৮-৩৯): সাফাবী সাম্রাজ্যের পতন মোগল সাম্রাজ্যের পতনেরও পূর্বে শুরু হইয়া গিয়াছিল। ভাঙন ধরে অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকেই, সাফাবী সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে পারস্যে শুরু হয় আফগান-শাসন। নিজাম-উল-মুল্ক মহম্মদ শাহকে সাফাবীদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। সে পরামর্শ অবশ্য অগ্রাহ্যই করা হয়। তবে মোগল সম্রাট পারস্যরাজের সহায়তায় অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ হইলেও, অপর একজন ত্রাণকর্তার আবির্ভাব ঘটে; তিনি ছিলেন একজন দরিদ্র তুর্কোম্যান, ইমাম কুলীর পুত্র নাদির কুলী। আফগানদের বহিষ্কার সাধনের পর তিনি সাফাবী-রাজ তাহ্‌মাস্পকে

সিংহাসনচ্যুত করিয়া, ১৭৩২ সালে রাজ-প্রতিভূ এবং ১৭৩৬ সালে রাজা হইয়া বসেন। ১৭৩৭ সালের প্রথমদিকে তিনি আসিয়া অবরোধ করেন কান্দাহারের আফগান-দুর্গ। তখন বহু আফগান উত্তরাঞ্চলে পলাইয়া আসিয়া মোগল সুবা কাবুলে আশ্রয় গ্রহণ করে। নাদির শাহ ইহাতে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য দিল্লী দরবারে একজন রাজদূত প্রেরণ করেন। দিল্লী দরবার দূতকে আটক করেন, এবং প্রায় বৎসরকালের মধ্যে কোনও উত্তরও পাঠান না। জয়মদে মত্ত তুর্কোম্যানের কবল হইতে এত সহজে নিষ্কৃতি লাভের উপায় ছিল না। তিনি স্থির করিলেন ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবেন। পতনোন্মুখ মোগলরা আফগানিস্থান ও পঞ্জাবের রক্ষা-ব্যবস্থায় অবহেলা করিয়া আসিতেছিলেন। আফগানিস্থান জয় করিতে নাদির শাহকে কোনরূপ বেগ পাইতে হইল না। তারপর তিনি খাইবার গিরিবর্ত্মের ভারতীয় রক্ষিবাহিনীকে পরাজিত করিলেন। তিনি প্রধানতঃ অশ্বারোহী বাহিনীর পরিচালক হইলেও, পদাতিক সৈন্যদল পরিচালনায়ও বিশেষ কৃতী ছিলেন। ১৭৩৮ সালের নবেম্বর মাসে তিনি আসিয়া পেশোয়ারে প্রবেশ করেন, ডিসেম্বর মাসে শুরু হয় তাঁহার অগ্রগতি। পঞ্জাবের শাসনকর্তা জাকারিয়া খাঁ সামান্য বাধা দানের পর পরাজয় স্বীকার করেন। নাদির শাহ তখন লাহোর হইতে আসিয়া উপনীত হন কর্ণালে (পাণিপথের ২০ মাইল উত্তরে); সেখানেই ১৭৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাদশাহী ফৌজের সাক্ষাৎকার লাভ করেন তিনি।

"নাদিরের আক্রমণ-কালে শাহী দরবারের কার্যকলাপ হইয়া দাঁড়ায় নিরেট নির্বুদ্ধিতারই সমতুল্য এক লজ্জাকর অক্ষমতার কাহিনী।" গোলাম হোসেন যথার্থই বলিয়াছেন, "রাজপথ এবং গিরিবর্ত্মসমূহের অবহেলার দরুণ যাহারই খুশি সে-ই অলক্ষিতে যাতায়াত শুরু করিয়া দিল; কী ঘটিতেছে না-ঘটিতেছে তাহার কোনও সংবাদই আর দরবারে পাঠানো হইত না; এবং সম্রাট অথবা মন্ত্রী কেহই কখনও খোঁজ করিয়া দেখিতেন না কেন এরূপ কোন সংবাদ তাঁহাদের কানে আসিয়া পৌঁছিতেছেন না।" শাহী রাজধানীর প্রায় দ্বারের পাশে আসিয়া উপনীত না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণকারীকে বাধাদানের বিন্দুমাত্র চেষ্টাও হয় নাই।

পঞ্জাবের পতনের পর সম্রাটের মন্ত্রণাদাতারা—তাঁহাদের মধ্যে নিজাম-উল-মুল্কও ছিলেন—স্থির করিলেন কর্ণালে পরিখা খনন করিয়া অবস্থান করিবেন।

পারসিক বাহিনীর লোকসংখ্যা ছিল ৫৫,০০০, সমগ্র ভারতীয় বাহিনীতে ছিল প্রায় ৭৫,০০০ লোক। তবে ভারতীয় বাহিনীতে যোদ্ধা নয়, অন্যান্য কার্যে রত, এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল অত্যধিক। নাদির সম্মুখ-সমর পরিহার করিয়া পাণিপথ করতলগত করিলেন, ফলে দিল্লীর সহিত মোগল বাহিনীর যোগাযোগের পথ তাঁহারই করায়ত্ত হইয়া পড়িল। মোগল বাহিনীর তখন আর বাহির হইয়া আসা ছাড়া উপায় রহিল না। তবে সাদা'ত খাঁয়ের শিবিরের অনুচরদের উদ্ধার সাধনের অভিপ্রায়ে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য তাঁহার পীড়াপীড়ির ফলেই যুদ্ধ ত্বরান্বিত হইয়া উঠিল। তিন ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধ চলে, ৮,০০০ ভারতীয় নিহত হয়। আরম্ভ হয় সন্ধির কথাবার্তা, এবং কিছুদিন আলাপ-আলোচনার পর স্থির হয় যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা পাইলেই পারসিক বাহিনী ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যার দরুণ এ ব্যবস্থা ওলটপালট হইয়া যায়। সম্রাটের মীর বক্সী খাঁ দৌরন আহত অবস্থায় মোগল শিবিরেই মারা যান। নিজাম সে পদে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে নিয়োগ করিবার জন্য মহম্মদ শাহকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া রাজি করেন। কথাটা যখন নাদিরের শিবিরে বন্দী সাদা'ত খাঁর কানে যায় তখন তিনি ঈর্ষ্যা ও ক্রোধে আত্মহারা হইয়া পড়েন। নাদিরকে তিনি এই নিশ্চয়তা দান করেন যে দিল্লীতে গমন করিলে তিনি নগদ টাকা আর মণিমুক্তা লইয়া ২০ কোটি টাকা লাভ করিতে পারিবেন। নিজাম এবং সম্রাট যখন পরের বার নাদিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান তখন তাঁহাদিগকে বন্দী করা হয়; তারপর নিজ দলবলের সঙ্গে মহম্মদ শাহকে লইয়া নাদির দিল্লী অভিমুখে রওনা হন।

নাদির যখন দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন এক গুজব রটিয়া যায় যে তিনি খুন হইয়াছেন, এবং এক হানাহানির মধ্যে তাঁহার জনকয়েক সৈন্যের প্রাণ যায়। ইহার প্রতিশোধে তিনি নির্বিচারে নগরবাসীদের হত্যা করার আদেশ দান করেন, ফলে ২০,০০০ লোককে প্রাণ হারাইতে হয়। দিল্লীতে তিনি দুইমাস কাল অতিবাহিত করেন। সে সময় তাঁহারই নামাঙ্কিত মুদ্রা বাহির হইতে থাকে, সম্রাট রূপে তাঁহারই নামে হইতে থাকে খুৎবা উপাসনা পাঠ। তিনি যে বিপুল লুণ্ঠন-সামগ্রী লইয়া যান তাহার মূল্য হিসাব করা হইয়াছে ৭০ কোটি টাকা, তাহার মধ্যে ছিল যাবতীয় বাদশাহী মণিমুক্তা, সুবিখ্যাত হীরকখণ্ড কোহিনূর এবং শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসন। প্রস্থানকালে

তিনি মহম্মদ শাহের মস্তকে পরাইয়া দিয়া যান হিন্দুস্থানের রাজমুকুট ; মহম্মদ শাহ বিজয়ীকে সমর্পণ করেন সিন্ধুর পরপারে অবস্থিত মোগল সাম্রাজ্যের সমগ্র ভূভাগ। এইভাবেই আফগানিস্থান মোগলদের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। স্থির হয় সিন্ধুনদের পূর্বদিকে স্থানীয় দলপতিদের নিকট হইতে তিনি যে চারিটি স্থান জয় করিয়া লইয়াছিলেন, সে কয়টির বাড়তি রাজস্ব হিসাবে লাহোরের মোগল সুবাদার বার্ষিক তাঁহাকে ২০ লক্ষ টাকা পাঠাইবেন। এই আক্রমণের ফলে মোগল সাম্রাজ্য 'রক্তাপ্লুত ও ধূল্যবলুণ্ঠিত' হইয়া পড়িল ; প্রকট হইয়া উঠিল তাহার দৌর্বল্য, বিনষ্ট হইয়া গেল তাহার মর্যাদা।

আহম্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণ : ১৭৪৭ খ্রীস্টাব্দে নাদির শাহ আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারান। আহম্মদ শাহ আবদালীর কৃতিত্বে আফগানিস্থান স্বাধীনতা লাভ করে। নাদির শাহের দলবলের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিয়া স্বচক্ষে তিনি দেখিয়া যান মোগল সাম্রাজ্য কিরূপ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। স্বভাবতঃই তিনি নাদির শাহের পদাঙ্ক অনুসরণে ব্রতী হন। "খাইবার গিরিবর্ত্ম ও পেশোয়ার অঞ্চল বিদেশীর করায়ত্ত হওয়ায়, পঞ্জাব হইয়া দাঁড়ায় দিল্লী অভিযানের যাত্রাপীঠ।" ১৭৪৮ সালে প্রথমবারের মতো ভারত আক্রমণ করিয়া তিনি লাহোর অধিকার করিয়া বসেন ; কিন্তু সিরহিন্দের নিকট মনুপুর নামক স্থানে নামেমাত্র যুবরাজ আহম্মদ শাহের নেতৃত্বাধীন এক মোগল বাহিনীর হস্তে তাঁহার পরাভব ঘটে। ১৭৫০ সালে তিনি দ্বিতীয়বার ভারত আক্রমণ করেন। দিল্লীতে তখন চলিতেছিল ইরাণী ও তুরাণীদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ ; দরবার হইতে কোনরূপ সাহায্য না পাইয়া লাহোরের মোগল সুবাদার মীর মন্নু ১৭৩৯ সালে মহম্মদ শাহ সিন্ধুনদের পূর্বভাগের যে চারিটি জেলার অতিরিক্ত রাজস্ব নাদির শাহকে দিতে রাজি হইয়াছিলেন তাহাই তাঁহাকে দিতে রাজি হইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করেন।

আবদালীর তৃতীয় আক্রমণ হয় ১৭৫২ সালে। লাহোরের অনতিদূরে মীর মন্নু পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। আবদালী কাশ্মীর জয় করেন, এবং মোগল সম্রাট আহম্মদ শাহ তাঁহাকে সমর্পণ করেন সীমান্ত হইতে সিরহিন্দ অবধি সমগ্র ভূভাগ। আবদালী মীর মন্নুকে তাঁহার সুবাদার রূপে লাহোরে রাখিয়া যান। মোগল উজীর সফদর জঙ্গ ছিলেন মীর মন্নুর প্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্যদানই করেন না ; মোগল সম্রাট যখন

আবদালীকে উক্ত ভূমিভাগ সমর্পণ করেন, তখন তিনি অযোধ্যা ও এলাহাবাদে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন।

আবদালীর চতুর্থ আক্রমণ হয় ১৭৫৬-৫৭ সালে। মীর মন্নু তখন মারা গিয়াছেন; তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে পঞ্জাবে যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহারই জন্য ভারতবর্ষে পুনরায় ঘটে এই আক্রমণকারীর আবির্ভাব। তিনি আসিয়া প্রবেশ করেন লাহোরে, তারপর সোজাসুজি আসিয়া উপনীত হন দিল্লীতে। রোহিলা সর্দার নজিব-উদ্দৌলা আসিয়া তাঁহার পক্ষে যোগ দেন। উজীর ইমাদ-উল-মুল্ক বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন। আবদালীর লুঠতরাজের সীমাপরিসীমা থাকে না। ধনীদরিদ্র, অভিজাত ও সাধারণ লোক, বড় বড় ব্যবসায়ী এবং সামান্য কৃষক পর্যন্ত সকলকেই নির্বিচারে লুট করা হয়। মথুরার উপর লুণ্ঠন ও অত্যাচারের তাণ্ডব চালাইয়া আসিয়া, বৃন্দাবন লুণ্ঠন করেন আবদালী, কিন্তু তাঁহার শিবিরে বিসূচিকা-রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায় তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। তিনি যে সকল লুণ্ঠিত সামগ্রী লইয়া যান তাহার মূল্য নির্ধারণ করা হইয়াছে ১২ কোটি টাকা। নিরুপায় মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর আনুষ্ঠানিক ভাবে পঞ্জাব, কাশ্মীর ও সিন্ধুদেশ সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। আবদালী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তৈমুর শাহকে এই সব নবলব্ধ ভূভাগের শাসন-ব্যবস্থার জন্য তাঁহার প্রতিনিধি রূপে লাহোরে রাখিয়া যান। কিন্তু রঘুনাথ রাওয়ের অধীনে মারাঠারা পঞ্জাবে আসিয়া এক বৎসরের মধ্যেই তৈমুর শাহের বহিষ্কার সাধন করে। ইহারই ফলে অনিবার্য হইয়া উঠে মারাঠাদের সঙ্গে আহম্মদ শাহ আবদালীর জীবনমরণ সংগ্রাম। ১৭৫৯ সালে—অপ্রত্যাশিত ভাবে নয়—আবদালী আসিয়া যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, শেষ অবধি তাহারই চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে। তাহাতে বিজয়লাভের ফলে আহম্মদ শাহ বিশেষ লাভবান হইতে পারিলেন না। বকেয়া মাহিনার জন্য তাঁহার সৈন্যেরা সোরগোল বাধাইয়া দিল, তাহাদের দেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্যও পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। ১৭৬১ সালের মার্চ মাসে তিনি ভারত ত্যাগ করিলেন।

এবার আবদালী মনে মনে এই ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন যে পঞ্জাব, সিরহিন্দ, কাশ্মীর ও সিন্ধুদেশ রহিল প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার শাসনাধীন, আর দিল্লী, আগ্রা, মথুরা ও অন্যান্য স্থান রহিল লুণ্ঠনের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু অচিরেই

শিখশক্তির অভ্যুদয়ে পঞ্জাব প্রদেশের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব রক্ষা করা এক দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিল। পর পর ১৭৬২, ১৭৬৪, ১৭৬৫ এবং ১৭৬৭ সালে তিনি ভারতে আগমন করেন। কিন্তু তাঁহার সমুদয় সামরিক প্রতিভা এবং জয়গৌরবের ঐতিহ্য সত্ত্বেও শিখদের দমন করার সাধ্য তাঁহার হইল না; শিখদের সমরচাতুর্য, তাঁহার পক্ষে অন্যান্য কাজে ব্যস্ততার দরুণ এদিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দানের অক্ষমতা, বিদ্রোহে উদ্দীপ্ত একটি সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকার ঘোরতর অসুবিধা, এবং শিখ খালসার (বা সাধারণতন্ত্রের) অসামান্য জীবনীশক্তি—এই সব একত্র মিলিয়া পদে পদে তাঁহাকে ব্যাহত করিতে লাগিল; ফলে পঞ্জাবের বৃহত্তর অংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল শিখদের সার্বভৌমত্ব। এই ব্যাপারটি কীন চমৎকার ব্যক্ত করিয়াছেন, "পর পর বারকয়েক অতর্কিত (আফগান) আক্রমণ': প্রত্যেক বারের আক্রমণই পূর্বের তুলনায় অল্প ফলপ্রসূ: সুকঠিন ইষ্টক-প্রাচীরের ন্যায়, উত্তরাঞ্চলের বন্যাস্রোতের মুখে বিপুল বাঁধের মতো, স্থিতিলাভ করিয়া বসিল বিখ্যাত খালসা।"

আহম্মদ শাহের ভারতীয় অভিযানের উদ্দেশ্য এল্‌ফিন্‌স্টোন এইভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন: প্রথমতঃ, এ কার্যের ফলে স্বদেশে তিনি আপন ক্ষমতার দৃঢ়তা সম্পাদনের আশা অন্তরে পোষণ করিতেন। তিনি জাতীয় রাজতন্ত্রের ধারক হইলেও, প্রকৃতপক্ষে নিজে ছিলেন একজন স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ। তাঁহার আশা ছিল বৈদেশিক যুদ্ধবিগ্রহের ফলে তাঁহার যশোবৃদ্ধি ঘটিবে এবং তিনি আফগানদের আনুগত্য লাভ করিতে পারিবেন। ভারতীয় অভিযানসমূহের ফলে তিনি যে কেবল তাঁহার সৈন্যবাহিনী পরিপোষণের ব্যয়ভার বহন করিতে পারিবেন তাহাই নয়, আফগান সামন্তদের প্রসাদ ও পারিতোষিক বিতরণেও সমর্থ হইবেন। আবদালীর বারবার ভারত আক্রমণের দরুণ আফগানিস্থানে বাস্তবিক কিরূপ ফল ফলিয়াছিল তাহা নির্ণয় সম্ভবপর নয়, তবে, অন্ততঃ পঞ্জাবে শেষ অবধি শিখদের সাফল্য অর্জনের জন্য তিনিই ছিলেন পরোক্ষভাবে দায়ী; তাই ভারতবর্ষে তাঁহার কার্যকলাপের কাহিনী হইল শিখজাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মারাঠা সাম্রাজ্য

ঔরঙ্গজেবের শেষজীবন: ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মারাঠাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম মোগল সাম্রাজ্যের চেয়ে মারাঠা রাজ্যের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে রাজারাম মারাঠা রণনায়কদের যে বিপৎসঙ্কুল কার্যভার পালনের আশা করিতেন, সেজন্য তাঁহাকে জায়গীর এবং 'সরঞ্জাম' প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করিতে হয়। দস্যুবৃত্তিকে মারাঠারা একটা বিধিবদ্ধ ব্যাপারে পরিণত করিয়া তোলে; চতুর্দিকে লুঠতরাজ করিয়াই মারাঠা রাজপুরুষদের জীবিকা অর্জন করিতে হইতে থাকে। ফলে এক ভয়াবহ ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়। "মোগলরা যখন মহারাষ্ট্র হইতে যাবতীয় সৈন্যসামন্তকে টানিয়া বাহির করিয়া আনে, তখন যে মারাঠাদের দীর্ঘকাল ছিল না শাসন করিবার মতো কোন রাজ্য, নিজেদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত কোন শাসনসংস্থা। তাহারা সহসা আবিষ্কার করিল যে শত্রুর বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ করিবে সে-ও তাহাদের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বিধিনিষেধের গণ্ডির বাহিরে ভাসমান এই যে জনতা, তাহা এখন সম্পূর্ণ বাধাবন্ধহারা হইয়া লক্ষ্যশূন্য বা উদ্দেশ্যহীন অবস্থায় যত্রতত্র ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এই সকল বিশৃঙ্খলারই আবার ষোলো কলা পূর্ণ করিয়া গেল অন্তর্দ্বন্দ্ব।" সুনিয়ন্ত্রিত আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, জনগণকে পৌরজীবনে ফিরাইয়া আনা, অন্তর্দ্বন্দ্বের বীজ বিনষ্ট করা, এবং স্থিতিশীল রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন—এই সকল সমস্যাই হইয়া দাঁড়াইল মারাঠাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের উত্তরাধিকারস্বরূপ।

শাহু (১৭০৮-৪৯): ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আজম (শম্ভুজীর পুত্র) শাহুকে মুক্তিদান করেন; তাঁহার আশা ছিল ইহার ফলে তারাবাঈয়ের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ মারাঠাদের মধ্যে ভাঙন ধরিবে। সে আশা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়। তারাবাঈ নিজ পুত্রের দাবী প্রত্যাহার করিতে অসম্মত হন। তিনি শাহুকে প্রবঞ্চক ঘোষণা করিয়া, তাঁহার সভাসদগণকে অন্যান্য

দাবিদারদের বিরুদ্ধে তাঁহার পুত্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণে বাধ্য করেন। এইভাবেই মহারাষ্ট্রে শুরু হইয়া যায় অন্তর্দ্বন্দ্ব। শাহু আসিয়া সাতারায় প্রবেশ করেন, ১৭০৮ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁহার অভিষেক হয়। তারাবাঈ কোহ্লাপুর হইতে ১২ মাইল দূরে পন্‌হলা নামক স্থানে সরিয়া আসেন, উহাই হইয়া দাঁড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যের রাজধানী। ১৭১২ সালে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু ঘটে। কোহ্লাপুরের শাসনভার তারাবাঈয়ের হস্তচ্যুত হয়, তাঁহার স্থান অধিকার করেন তাঁহার সপত্নী রাজসবাঈ—তিনিই তাঁহার পুত্র শম্ভুজীর হইয়া কোহ্লাপুর রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালন করিতে থাকেন। কিন্তু চতুর্দিকে অরাজকতার মধ্যে
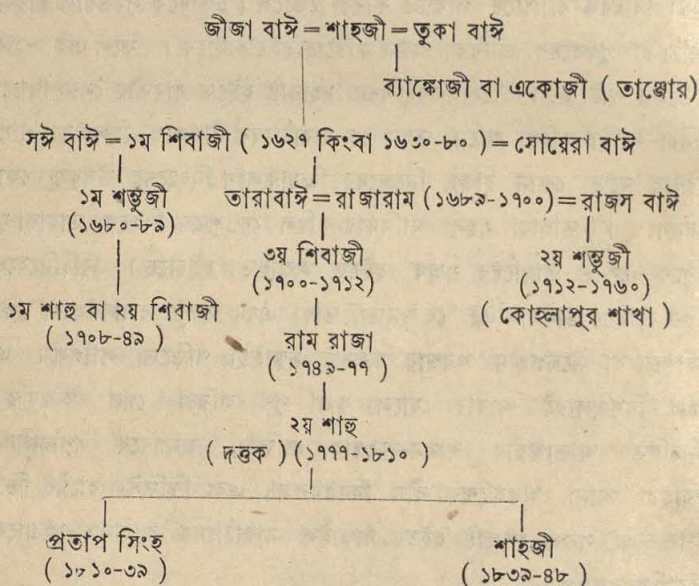
[রাম রাজাকে দত্তক গ্রহণ করেন ১ম শাহু। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর লর্ড হেস্টিংস প্রতাপ সিংহকে সাতারার সিংহাসনে স্থাপন করেন। শাহজীর অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে লর্ড ডালহৌসি কর্তৃক সাতারা কোম্পানীর রাজ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। কোহ্লাপুর রাজ্য বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া অবধি ২য় শম্ভুজীর বংশধরগণ কোহ্লাপুরে রাজত্ব করিতে থাকেন।]

সাতারার মারাঠা রাজ্যের উপর শাহুর কর্তৃত্ব টলমল করিতে থাকে। এমন সময় ঘটে এক অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তির আবির্ভাব, তিনিই হইয়া দাঁড়ান মারাঠা রাজ্যের ত্রাণকর্তা।

পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-২০): বালাজী বিশ্বনাথ ছিলেন কোঙ্কন অঞ্চলের জনৈক চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। তাঁহার প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। ধনাজী যাদবের অধীনে চাকুরি করিয়া তিনি প্রথম সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। শোনা যায় যাঁহারা ধনাজীকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তারাবাঈয়ের পক্ষত্যাগ করিয়া শাহুর সহিত যোগদানে সম্মত করান, তিনি ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন। ১৭১০ সালে ধনাজীর মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র চন্দ্রসেন যাদব কিন্তু গিয়া কোহ্লাপুরের দিকে যোগদান করেন, এবং পরিশেষে গিয়া মিলিত হন নিজাম-উল-মুল্কের সঙ্গে। ১৭১২ সালে বালাজী 'সেনাকর্তা', অর্থাৎ সৈন্যবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত জনৈক প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। শাহুর রাজ্য শাসনের কার্যে তিনি শৃঙ্খলা ও কর্মপটুতা আনয়ন করেন। ১৭১৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তাঁহাকে পেশোয়া পদে নিয়োগ করা হয়। একের পর এক দস্যু রণনায়কগণের ক্ষমতার অবসান ঘটে; কিন্তু কাহ্নোজী আঙ্গ্রিয়া কোহ্লাপুরের সহিত যোগদান করিয়া ভোরঘাটের পথ দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, বালাজীর পক্ষে তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় রহিল না। ১৭১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লোনাবালায় এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়; তদনুযায়ী আঙ্গ্রিয়া ১০-টি দুর্গ এবং অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী ১০-টি সুরক্ষিত স্থানের উপর কর্তৃত্ব লাভ করেন, অধিকন্তু তাঁহাকে মারাঠা নৌবাহিনীর সরখেল (নৌবলাধ্যক্ষ) রূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। তিনি সাতারার বশ্যতা স্বীকার করেন; সাতারার রাজসরকারও তাঁহাকে তাঁহার শত্রুদের, অর্থাৎ সিদ্দিগণ, পোর্তুগীজগণ এবং ইংরেজদের, বিরুদ্ধে সাহায্যদানে সম্মত হন।

১৬৮৯-১৭১২ সালের বিশৃঙ্খলা, দুর্বলতা এবং পরিপূর্ণ অরাজকতার পর নূতন কর্মনীতি প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা গিয়াছিল। লোনাবালার সন্ধিপত্রের অন্তর্গূঢ় মর্ম অনুসরণ করিয়া বালাজী যে বিপুল সংস্থা সৃষ্টি করেন, পরবর্তীকালে তাহাই মারাঠা শক্তি-সমবায় রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। মারাঠাদের পৃষ্ঠপোষকতার মূল্যস্বরূপ সৈয়দ হুসেন আলীর নিকট হইতে তিনি মোগল-অধ্যুষিত দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবা হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার লাভ করেন (১৭১৮)।

হুসেন আলীর সমভিব্যাহারে বালাজী দিল্লী যান, সেখানকার অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসেন। এই চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার পরে মহম্মদ শাহ কর্তৃক সমর্থিত হয়, এবং এই মঞ্জুরীর উপর ভিত্তি করিয়াই চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের যন্ত্রস্বরূপ গড়িয়া তোলা হয় মারাঠাদের শক্তি-সমবায়। পেশোয়া, প্রতিনিধি, সেনাপতি, সেনা সাহেব স্থবা, এবং অন্যান্য মারাঠা নায়কদের প্রত্যেকেরই ছিল নিজ নিজ প্রভাব-পরিমণ্ডল, সেই সকল ক্ষেত্র হইতেই তাঁহারা নিজেদের এই সকল প্রাপ্য আদায় করিতেন। সরদেশ-মুখী পূরাপুরিই রাজাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইত; চৌথেরও শতকরা ২৫ ভাগ ছিল তাঁহারই প্রাপ্য। চৌথের শতকরা ছয়ভাগ (সহোত্র) এবং তিনভাগ (নড়গুণ্ডা) বলিতে যাহা থাকিত তাহা রাজা যাহাকে খুশী তাহারই প্রাপ্য রূপে স্থির করিয়া দিতে পারিতেন। চৌথের অবশিষ্ট (শতকরা ৬৬) অংশ (মোকাসা) ছিল নায়কদের প্রাপ্য। সংগ্রহের এই যে জটিল ব্যবস্থা, ইহাই শক্তিসমবায়কে একসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছিল, এবং ইহাই আবার হইয়া উঠিয়াছিল মারাঠা সাম্রাজ্যবাদের যন্ত্রস্বরূপ। এই ব্যবস্থার ফলে কাহারও এমন কোন একীভূত সম্পত্তি রহিল না যাহার বলে সে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হইয়া থাকিতে পারে। মারাঠারা তোড়ল মল অথবা মালিক অম্বরের আমলে নির্দিষ্ট করভারের অনুপাতে চৌথ ও সরদেশমুখী দাবী করিত; যুদ্ধবিগ্রহে উৎসন্ন এই সকল অঞ্চলের লোকেরা তাহা দিয়া উঠিতে পারিত না। ফলে খাজনা সর্বদাই বকেয়া পড়িয়া থাকিত, সর্বদাই মাথার উপর ঝুলিত যুদ্ধবিগ্রহের খাঁড়া। মারাঠা রাষ্ট্র কখনও এককালীন কিছু অর্থ, কিংবা কোন রাজ্যখণ্ডের অধিকার গ্রহণে সম্মত হইত না, জানিয়া-শুনিয়াই স্বত্বাধিকারীদের উপর কর ধার্যের ব্যবস্থা পছন্দ করিত। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চল মারাঠা স্বার্থের প্রহরারত কুক্কুরের ন্যায় মারাঠা আমিন-আমলায় ছাইয়া গেল।

পেশোয়া ১ম বাজীরাও (১৭২০-৪০)ঃ ১৭২০ সালে বালাজী বিশ্বনাথ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পেশোয়া-পদের উত্তরাধিকারী হইয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার পুত্র বাজীরাও। প্রতিনিধি শ্রীপৎ রাওয়ের কর্মনীতি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি উত্তরাঞ্চলে প্রভাব বিস্তার সাধনের কর্মপন্থা অনুসরণ করিতে থাকেন। শ্রীপৎ রাও দাক্ষিণাত্যের উপর মারাঠা কর্তৃত্বের দৃঢ়তা সম্পাদনে ইচ্ছুক ছিলেন। পেশোয়ার বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে এবং যুক্তিতে শাহু সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া

পড়েন। তাঁহার যুক্তিজাল এই কয়টি কথায় সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে: "আসুন আমরা মৃতপ্রায় বৃক্ষের কাণ্ডদেশে আঘাত করি, তাহা হইলে শাখা-প্রশাখা আপনা হইতেই খসিয়া পড়িবে।" কৃষ্ণা হইতে সিন্ধু অবধি মারাঠা পতাকা উড্ডীন করিতে হইবে।

মালব ও গুজরাটে পুনঃপুনঃ অভিযান প্রেরিত হইতে থাকে। এই সকল অভিযানের ফলে মলহর রাও হোলকার, উদাজী পুয়ার, রণোজী সিন্ধিয়া, এবং বাজী রাওয়ের অন্যান্য সহকারীদের অভিজ্ঞতা লাভ হয়। গ্র্যাণ্ট ডাফ যথার্থই বলিয়াছেন, "বাজী রাও দস্যুবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শক্তির মর্ম অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি বুঝিতে পারেন গোলযোগ ও অরাজকতার মধ্যেই উহার পরিপুষ্টি, এবং উহা প্রতিকারের প্রথম পন্থাই হইল রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা; দূরদৃষ্টি-বলে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে বাহিরে গোলযোগ সৃষ্টির ফলে ঘরে শৃঙ্খলা বিধানের পথ সুগম হইবে, এবং বহুদূরে প্রেরিত অভিযানের অধিনায়ক রূপে তাঁহার প্রয়োজন সাম্রাজ্যের অন্য যে-কোন নায়কের তুলনায় বৃহত্তর বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব লাভ করা। যে বিপুল অশ্বারোহী সৈন্যের দল পরিপোষণের জন্য রাজস্বের অনর্থক অপচয় সাধিত হইত, তাহাদের অন্যত্র প্রেরণ করিলে দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব-ব্যবস্থার উন্নতি বিধান হইবে।" যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয়ের ফলে পেশোয়া মর্যাদায় ছত্রপতিকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া গেলেন।

১৭২৬ সালে পেশোয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে অর্থসাহায্য আদায় করাও হয়, তবুও সর্বদাই তিনি ছিলেন উত্তরাভিমুখে বিস্তারলাভের পক্ষপাতী। নিজাম-উল-মুল্ক তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়ান; চিরাচরিত চতুরতার সহিত তিনি কোহ্লাপুরের ২য় শম্ভুজীর সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া চৌথ ও সরদেশমুখীর মারাঠা সংগ্রাহকগণকে বিতাড়িত করেন। ফলে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ১৭২৮ সালে বাজী রাও যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহাকে (দৌলতাবাদের ২০ মাইল পশ্চিমে) পালখেড়ে এমন এক স্থানে টানিয়া আনিয়া ফেলিলেন যে এক জলহীন মরুময় ভূখণ্ডের মধ্যে মারাঠারা নিজাম-উল-মুল্কের বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। নিজাম-উল-মুল্ককে বাধ্য হইয়া শম্ভুজীর পক্ষ ত্যাগ করিতে হইল, ভবিষ্যতে মারাঠা আমিন-আমলারা যাহাতে নিরাপদে চৌথ ও সরদেশমুখী সংগ্রহ করিতে পারে তাহার জন্য তিনি জামিনও দিলেন।

কিন্তু নিজাম-উল-মুল্কের কূটনীতির চাল বন্ধ হইল না, তিনি গোপনে গোপনে মারাঠা সেনাপতি ত্রিম্বক রাও দাভাড়ের ঈর্ষ্যাগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। ফলে পেশোয়া এবং সেনাপতির মধ্যে খোলাখুলিভাবেই যুদ্ধ বাধিয়া গেল, কিন্তু ১৭৩১ সালে দভোই নামক স্থানে পেশোয়া সেনাপতিকে পরাস্ত ও নিহত করিতে সমর্থ হন। সেই বৎসরই বাজী রাওয়ের ভ্রাতা চিমনাজী আপ্পা (ধারের নিকটে) আমঝেরা নামক স্থানে মালবের মোগল প্রদেশপাল গিরধর বাহাদুরকে পরাভূত ও নিহত করেন। গিরধর বাহাদুরের পরবর্তী প্রদেশপাল মহম্মদ খাঁ বঙ্গশ মারাঠা উপপ্লাবন রোধ করিতে পারিলেন না; তাঁহার পরবর্তী প্রদেশপাল জয়পুরের রাজা সওয়াই জয়সিংহ পেশোয়ার সহিত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। সম্রাট মহম্মদ শাহ বাজীরাওকে স্বীকার করিয়া লইলেন মালবের সহকারী প্রদেশপাল রূপে। গুজরাটের চৌথ ও সরদেশমুখী মারাঠাদের মঞ্জুর করা হইল। এ অঞ্চলে ছিল দাভাড়ে পরিবারের প্রাধান্য, গায়কোয়াড়গণ ছিলেন তাঁহাদের সহকারী। দভোই-এর যুদ্ধের পর মান-মর্যাদায় গায়কোয়াড়গণ দাভাড়েদের অতিক্রম করিয়া যান।

বাজী রাও গঙ্গা-যমুনার দোয়াব এবং দিল্লী অঞ্চলেও বারকয়েক অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য মোগলদের সমুদয় প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তিনি দিল্লীর শহরতলী অবধি লুণ্ঠন করেন। অবশেষে মহম্মদ শাহ নিজাম-উল-মুল্ককে দিল্লী আসিয়া মারাঠা-দমনে তাঁহাকে সাহায্যদানের জন্য আবেদন করেন। ১৭৩৮ সালে ভূপালের নিকট নিজাম-উল-মুল্কের পরিচালনাধীন মোগল বাহিনীর সহিত বাজী রাওয়ের অধীন মারাঠা বাহিনীর সাক্ষাৎকার ঘটে। নিজাম-উল-মুল্ক চারিদিক দিয়া বেড়াজালে আটকাইয়া পড়েন, মারাঠারা তাঁহার রসদ সংগ্রহের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়। তাহারা তাঁহার নূতন সৈন্য আমদানির পথও বন্ধ করিয়া ফেলে। তিনি বাধ্য হইয়া এক চুক্তিপত্র সই করেন, তদনুযায়ী বাজী রাওকে প্রদান করা হয় সমগ্র মালব দেশ এবং নর্মদা ও চম্বলের মধ্যবর্তী ভূভাগের উপর সার্বভৌম অধিকার। বুন্দেলখণ্ডের রাজা ছত্রসাল ১৭৩৩ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, তৎপূর্বেই এক উইল করিয়া বুন্দেলখণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ তিনি বাজী রাওকে দান করিয়া যান; বুন্দেলখণ্ডের অবশিষ্টাংশ থাকে তাঁহার পুত্রদের অধিকারে; তাঁহারা সকলে হইয়া দাঁড়ান বাজী রাওয়ের মিত্রপক্ষ।

এবার অধিকতর শক্তির সহিত ‘শুষ্কপ্রায় বৃক্ষকাণ্ডে’ আঘাত করিবার মতো অবস্থায় আসিয়া উপনীত হন পেশোয়া, কিন্তু তখনই আবার নাদির শাহ আসিয়া ভারত আক্রমণ করেন, এবং তাঁহার সে আঘাতেই দিল্লীর রাজসরকার একেবারে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। মনে হয় বাজী রাওয়ের ধারণা হইয়াছিল নাদির দিল্লীর সিংহাসনে নিজেই সম্রাট হইয়া বসিবেন; নিজাম-উল-মুল্কের পুত্র নাসির জঙ্গ তখন পিতার দিল্লী অবস্থান-কালের জন্য হায়দরাবাদ রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; বাজী রাও তাঁহার সহিত সহযোগিতার এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, “হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে দাক্ষিণাত্যের সমগ্র শক্তি ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, আর এদিকে আমি নর্মদা হইতে চম্বল অবধি সমগ্র ভূভাগ আমার মারাঠাদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিব।” তাঁহার ভ্রাতা চিমনাজী তখন (পোর্তুগীজদের অধীন) বেসিন অবরোধ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলেন। কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চিমনাজী প্রবল পরাক্রমে অবরোধ চালাইয়া যাইতে থাকেন, ১৭৩৯ সালের মে মাসে জয়গৌরবের মধ্যে উহার অবসান ঘটে। এইভাবে তিনি কোঙ্কণ প্রদেশকে পোর্তুগীজ আতঙ্ক হইতে মুক্তিদান করেন। মারাঠাদের দিক দিয়া উহাই ছিল প্রবলতম অবরোধ। বেসিনের পতনের পর মারাঠা রণনায়কগণ পারসিক আক্রমণকারীর সম্মুখীন হইবার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু তখন সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল যে হতমান মহম্মদ শাহকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া নাদির শাহ পশ্চাদপসরণ করিয়াছেন। এদিকে ১৭৪০ সালের এপ্রিল মাসে বাজী রাও নিজেও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

বাজী রাও যে কেবল একজন পরাক্রমশালী যোদ্ধাই ছিলেন তাহা নয়, তিনি একজন সুনিপুণ সেনানায়কও ছিলেন। তাঁহাকে যথার্থই ‘অশ্বারোহী বাহিনীর একজন ক্ষণজন্মা নেতৃপুরুষ’ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার সৈন্য-পরিচালনায় আমরা দেখিতে পাই ক্ষিপ্রতার সহিত অতর্কিত আক্রমণের এক অনবদ্য সমাবেশ। শ্রেষ্ঠ নেতৃপুরুষের যাবতীয় গুণই তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল—ছিল চরিত্রবল, অধ্যবসায়, উৎসাহ, বীর্য, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা। দাক্ষিণাত্যে মারাঠা জাতিকে তিনি অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান, উত্তর-ভারতে স্থাপন করিয়া যান তাহাদেরই রাজনৈতিক প্রাধান্যের ভিত্তিমূল।

কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার দিকে যে ভয়াবহ গতি তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের অধীনে মারাঠাদের ধ্বংসের জন্য যেন পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া ছিল, তাহার গতিরোধ করিবার জন্য কোন চেষ্টাই তিনি করিয়া যান নাই।

পেশোয়া বালাজী বাজী রাও (১৭৪০-৬১): বাজী রাওয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বালাজী বাজী রাও তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে পেশোয়া পদ লাভ করেন। এতকাল ছত্রপতি শাহুকে সর্বদাই যথেষ্ট সমীহ করিয়া চলিতে হইত, কিন্তু ১৭৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। তারা বাঈ ঘোষণা করিলেন যে রাম রাজা নামে ২য় শিবাজীর এক পুত্র আছেন, পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার জন্ম হয়, জন্মের পর লুকাইয়া তাঁহাকে পানহালা হইতে সরাইয়া দিবার পর এক ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ চারণ গোপনে তাঁহাকে মানুষ করিয়া তোলে। শাহুর অন্তিম নির্দেশ অনুসারে সেই তরুণ কুমারকে সাতারায় আনিয়া যথারীতি তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। তারা বাঈয়ের আশা ছিল তাঁহার নামে তিনি নিজেই রাজ্য শাসন করিবেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন সে আশা ফলবতী হওয়া অসম্ভব তখন তিনি তাঁহাকে প্রতারক ঘোষণা করিয়া বসিলেন। রাম রাজাকে সাতারা হইতে পুণায় লইয়া আসা হইল, সেখানে তিনি এক চুক্তিনামা সম্পাদন করিলেন, তাহা "সঙ্গোলা চুক্তিনামা" নামে বিদিত, তাহার দ্বারা রাজ্যের সমুদয় প্রধান প্রধান পদ পেশোয়ার প্রতিনিধিদের অর্পণ করা হইল (১৭৫০)। তখন হইতে সাতারা আর মারাঠা সাম্রাজ্যের রাজধানী থাকিল না, রাজধানী হইয়া দাঁড়াইল পুণা। মারাঠা রাজ্যে ছত্রপতির আর কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি রহিল না; তিনি হইয়া দাঁড়াইলেন 'নিষ্কর্মা রাজা'।

বালাজী তাঁহার খ্যাতিমান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই উত্তরাঞ্চলে বিস্তার সাধনের কর্মপন্থা গ্রহণ করিলেন, তবে দাক্ষিণাত্যও তাঁহার মনোযোগের বহির্ভূত রহিল না। কর্ণাটক অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করিয়া কৃষ্ণার দক্ষিণস্থ ভূ-ভাগ হইতে কর আদায় করা হইতে লাগিল। পেশোয়া-পদে অধিষ্ঠিত হইবার অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গদেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়া বালাজী পেশোয়া পরিবারের পরম শত্রু বেরারের মারাঠা রণনায়ক রঘুজী ভোঁসলের মাথা কিনিয়া ফেলিলেন; বেরারের এই রণনায়ক প্রতি বৎসর বঙ্গদেশে আসিয়া অত্যাচার-উৎপীড়ন শুরু করিয়া দেওয়ায় আলিবর্দি বাধ্য হইয়া

তাঁহাকে উড়িষ্যা প্রদেশ সমর্পণ করেন এবং বঙ্গদেশের চৌথ হিসাবে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দান করিতে স্বীকৃত হন। বালাজীকে নিজাম সলাবৎ জঙ্গের সহিতও ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে হয়। সলাবৎ জঙ্গের গুরু ছিলেন সেই করিতকর্মা ফরাসী বুসী। ১৭৫১ সালে বুসীর সুশিক্ষিত পদাতিক বাহিনী একাধিক বার মারাঠা বাহিনীকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে। যতদিন সেই সুচতুর ফরাসী সেখানে ছিলেন ততদিন পেশোয়ার পক্ষে হায়দরাবাদ রাজ্যটির উচ্ছেদ সাধনের কোনরূপ চেষ্টা করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ১৭৫৮ সালে পন্দিচেরীর ফরাসী গবর্ণর লালী তাঁহাকে সেখান হইতে সরাইয়া আনেন। তখন বালাজী নিজাম রাজ্যের ধ্বংস সাধনের জন্য বিপুল প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। আহম্মদনগরের দুর্গটি পেশোয়াকে সমর্পণ করা হয়। ইব্রাহিম খাঁ গর্দি নামে বুসীর প্রথায় সুশিক্ষিত একজন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক পুরুষের উপর ছিল নিজামের গোলন্দাজ বাহিনী পরিচালনার ভার; তাঁহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া পেশোয়ার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিতে রাজি করানো হয়। ১৭৬০ সালে উদ্গীর নামক স্থানে পেশোয়ার পিতৃব্যপুত্র সদাশিব রাও ভাউ চমকপ্রদ ভাবে নিজামকে পরাভূত করিয়া তাঁহাকে রাজ্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল সমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। দাক্ষিণাত্যে উহাই হইল মারাঠাদের চরম শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের নিদর্শন। এই আঘাতে হায়দরাবাদ রাজ্য চিরদিনের মতো পঙ্গু হইয়া পড়িত, কিন্তু উত্তর-ভারতে এমনই সব বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিতে লাগিল যে তাহার ফলে অচিরেই এই যুদ্ধজয়ের ফলাফল নস্যাৎ না হইয়া পারিল না।

উত্তর ভারতীয় অভিযানসমূহ: পেশোয়ার ভাই রঘুনাথ রাও উত্তর-ভারতে দুইটি অভিযান পরিচালনা করেন। প্রথম অভিযান হয় ১৭৫৪-৫৬ সালে। তিনি জয়পুর, কোটা, বুন্দি, এবং রাজপুতানার অন্যান্য রাজ্য হইতে কর আদায় করেন; মোগল উজীর ইমাদ-উল-মুল্ককে মোগল সম্রাট আহম্মদ শাহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দ্বিতীয় আলমগীরকে সিংহাসনে স্থাপনের কাজে সাহায্যও করেন তিনি। ইমাদ-উল্-মুল্ক সম্পূর্ণরূপে মারাঠাদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। গাঙ্গেয় দোয়াবের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ মারাঠাদের নিকট হস্তান্তরিত করিয়া দেওয়া হয়। উত্তর-ভারতে রঘুনাথ রাওয়ের দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয় ১৭৫৭-৫৮ সালে। ১৭৫৬-৫৭ সালে আহম্মদ শাহ আবদালী চতুর্থ বারের মতো ভারত আক্রমণ করেন, দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া

মোগল সম্রাটকে পাঞ্জাব ও মুলতান তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য করেন তিনি। আবদালী বিদায় হইয়া গেলে আসিয়া উপস্থিত হন রঘুনাথ রাও। ইমাদ-উল্-মুল্ক পুনরায় মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দেন। দিল্লী প্রবেশে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া, রঘুনাথ রাও চন্দ্রভাগা নদী অবধি অগ্রসর হন, তারপর সেখান হইতে ফিরিয়া আসেন। এক সময় যে মারাঠা বাহিনী খাইবার গিরিবর্ত্ম অবধি অগ্রসর হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। আদিনা বেগ খাঁকে পাঞ্জাবে মারাঠা রাজপ্রতিনিধি রূপে রাখিয়া আসা হয়। এই অভিযান হইয়া দাঁড়ায় এক "ফাঁকা লোক-দেখানো ব্যাপার এবং খরচান্ত কাণ্ড"। ইহার ফলে ৮৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়ে, এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এইভাবে অগ্রসর হইয়া উত্তেজনার কারণ ঘটানো আর আবদালীর রাজপ্রতিনিধির বহিষ্কার সাধনের জন্য এক জীবনমরণ সংগ্রামকে অনিবার্য করিয়া তোলা হইল। যাহা হউক, এই চমকপ্রদ কাণ্ডের পর রঘুনাথ রাওকে দাক্ষিণাত্যে ফিরাইয়া আনা হয়, দত্তাজী সিন্ধিয়ার উপর থাকে উত্তর-ভারতে মারাঠাদের যাবতীয় ব্যাপারের ভার। মারাঠারা যখন দাক্ষিণাত্যে নিজামের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত, আহম্মদ শাহ আবদালী তাহারই মধ্যে পঞ্জাবে মারাঠাদের প্রতিকূলাচরণের মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইলেন। ১৭৬০ সালের জানুয়ারী মাসে (দিল্লীর ১০ মাইল উত্তরে) বরারি ঘাট নামক স্থানে তাঁহার হস্তে দত্তাজী সিন্ধিয়ার পরাভব ও মৃত্যু ঘটিল। তারপর তিনি দিল্লী প্রবেশ করিয়া মলহর রাও হোলকারকে পরাভূত করিলেন। অতঃপর আসন্ন চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য তিনি আলীগড়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১)ঃ তাই আবদালীর সহিত শক্তি পরীক্ষার জন্য উত্তর ভারতে প্রেরিত হইলেন উদ্‌গীরের বিজয়ী বীরপুরুষ। সদাশিব রাও ভাউয়ের পরিকল্পনা ছিল এটাওয়ার নিকটে নৌকার পর নৌকা সাজাইয়া এক সেতু নির্মাণ করিবেন, তারপর জোয়ারের ঊর্ধ্বস্থিত ভূ-ভাগে করিবেন আবদালীকে আক্রমণ, এবং পরিশেষে অযোধ্যার শুজা-উদ্দৌলার রাজ্যে হানা দিবেন। কিন্তু সেবার বড় তাড়াতাড়ি বর্ষা পড়িয়া গেল, নৌকা সংগ্রহ করা গেল না, তাই ভাউকে পরিকল্পনা পরিবর্তন করিতে হইল। তিনি স্থির করিলেন দিল্লী আক্রমণ করিবেন; বস্তুতঃ ১৭৬০ সালের আগস্ট মাসে দিল্লীতে উপনিবিষ্ট আফগান সৈন্যদলের হাত হইতে শহরটি কাড়িয়াও লইলেন তিনি; কিন্তু তাহাতে খাদ্য সরবরাহের সমস্যা মিটিল না।

অতঃপর ১৭৬০ সালের অক্টোবর মাসে তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন পাণিপথে। ইত্যবসরে আবদালী শুজা-উদ্দৌলাকে স্বপক্ষে টানিয়া আনেন, তারপর যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে পথ চলিতে চলিতে বাঘপাট নামক স্থানে যমুনা পার হইয়া একেবারে মারাঠাদের কাছাকাছি আসিয়া উপনীত হন। ১৭৬০ সালের নভেম্বর মাসে ভাউ পাণিপথে পরিখা খনন করিয়া বসিয়া যান। আফগানরা পরিখা খনন করিয়া বসিয়াছিল প্রায় আট মাইল দূরে। কিছুকাল ধরিয়া মারাঠা ও আফগানদের মধ্যে হানাহানি ও ছোটখাট লড়াই চলিতে থাকে। ১৭৬০ সালের ডিসেম্বর মাসের দিকে মারাঠা বাহিনী মরিয়া হইয়া উঠে, তাহাদের খাদ্যসম্ভার নিঃশেষ হইয়া পড়ে, তাহাদের অশ্বযূথ ও কামান-গাড়ীর বলীবর্দের দল অনাহারে মরিতে আরম্ভ করে।

অনাহারক্লিষ্ট মারাঠারা মরিয়া হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, এবং ১৭৬১ সালের ১৪ই জানুয়ারী বাহির হইয়া আসে। যে সকল সৈন্য বাস্তবিক যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা এইরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে : আফগান ৬০,০০০ ; মারাঠা ৪৫,০০০—ইহা হইতে অনিয়মিত সৈন্যদল ও শিবিরসঙ্গীদের বাদ দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ চলে প্রত্যূষ হইতে অপরাহ্ণ প্রায় ৩ ঘটিকা অবধি। ইহার চেয়ে নিরবশেষ বিজয়লাভ বোধহয় আর কখনও ঘটে নাই, কোন পরাভবও বোধ হয় ইহার চেয়ে নিশ্ছিদ্র হইয়া উঠে নাই। মারাঠাদের মধ্যে নিতান্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজনই প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিল, তাহাদের মধ্যে ছিলেন নানা ফড়নবীশ এবং মহাদাজী সিন্ধিয়া—ইঁহাদের দু'জনই ভবিষ্যতে মারাঠাদের মধ্যে গৌরবময় ভূমিকায় অভিনয় করেন। পেশোয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বাস রাও ছিলেন নামেমাত্র সেনাপতি ; তিনি ও স্বয়ং ভাউ সহ "এক পুরুষের যাবতীয় নেতৃবৃন্দ প্রাণ হারান। ফ্লোডেন ফীল্ডের যুদ্ধের মতো ইহাও ছিল একটি সমগ্র জাতিগত দুর্দৈব ; মহারাষ্ট্রে কাহারও-না-কাহারও জন্য শোক করিতে হয় নাই এমন কোনও সংসার ছিল না, বহু সংসারে একেবারে সংসারের কর্তার জন্যই শোক করিতে হয়।" এই ভয়ানক দুর্দৈবের সংবাদ পেশোয়ার অন্তিমকাল ঘনাইয়া আনিল, ১৭৬১ সালের জুন মাসে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি চূড়ান্ত ঘটনা বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। সেই সংহারক্ষেত্রে মারাঠা সাম্রাজ্যবাদ সর্বাপেক্ষা কঠিন আঘাত লাভ করে, পেশোয়ার মর্যাদাও রূঢ়ভাবে বিপর্যস্ত

হইয়া পড়ে। মালব, রাজপুতানা, এবং দোয়াব মারাঠাদের হস্তচ্যুত হইয়া যায়; দাক্ষিণাত্যে বিনষ্ট হইয়া যায় উদ্‌গীরে বিজয়লাভের ফল, ভরসা পাইয়া নিজাম মাথাচাড়া দিয়া উঠেন। অবশ্য হৃতগৌরবের পুনরুজ্জীবনে বিশেষ বিলম্ব ঘটে না; পেশোয়া ১ম মাধব রাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠারা নিজামকে পরাভূত করে, উত্তর-ভারতের উপরও তাহাদের কর্তৃত্ব ফিরাইয়া আনে, এবং সম্রাট ২য় শাহ আলমকে তাহাদেরই রক্ষণাবেক্ষণে লইয়া আসে। কিন্তু ততদিনে ভারতভূমিতে বহু পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। ব্রিটিশ জাতি বঙ্গ ও বিহারকে নিজেদের মুঠির মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে, অযোধ্যার উপরও স্থাপন করিয়াছে নিজেদের কর্তৃত্ব। পাণিপথের ফলে মারাঠাদের পক্ষে গাঙ্গেয় উপত্যকায় ব্রিটিশ-শক্তির অভ্যুদয় রোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে মারাঠা-শক্তি সাময়িকভাবে রাহুগ্রস্ত হইয়া পড়ায় মহীশূরে হায়দার আলীর পক্ষে নিজ শক্তি সংহত করিয়া তোলার অবকাশ ঘটে। ১৭৭২ সালের পর মারাঠা শক্তি-সমবায়ের মধ্যেও গুরুতর পরিবর্তন দেখা দেয়; সিন্ধিয়া, হোলকার, ভোঁসলে এবং গায়কোয়াড় কার্যতঃ পেশোয়ার অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইয়া যান। এখন হইতে উত্তর ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্যবাদ বলিতে বুঝায় সিন্ধিয়া ও হোলকারের আধিপত্য, পেশোয়ার একাধিপত্য নয়।

পেশোয়াগণের বংশসূচী

- ১. বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-২০)
  - ২. ১ম বাজী রাও (১৭২০-৪০)
    - ৩. বালাজী বাজী রাও (১৭৪০-৬১)
      - বিশ্বাস রাও (নিহত, ১৭৬১)
      - ৪. ১ম মাধব রাও (১৭৬১-৭২)
      - ৫. নারায়ণ রাও (১৭৭২-৭৩)
        - ৭. মাধব রাও নারায়ণ (২য় মাধব রাও) (১৭৭৪-৯৬)
    - ৬. রঘুনাথ রাও (১৭৭৩-৭৪)
      - ৮. ২য় বাজী রাও (১৭৯৬-১৮১৮)
  - চিমনাজী আপ্পা
    - সদাশিব রাও ভাউ (নিহত, ১৭৬১)
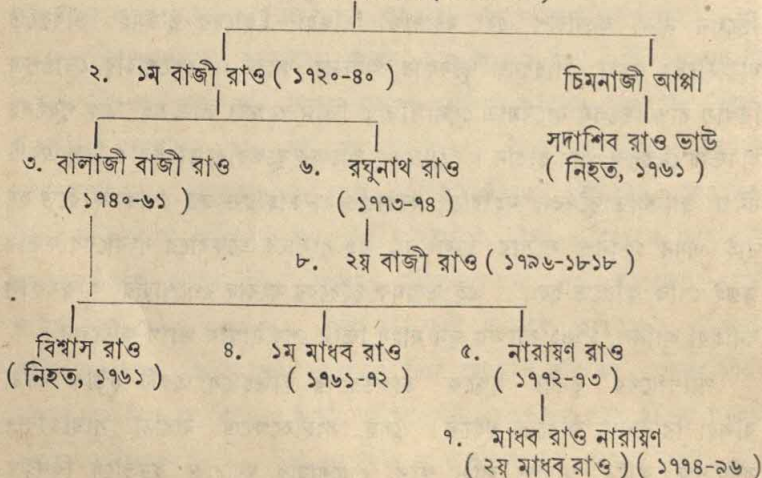
চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিখ, জাঠ ও রাজপুতগণ

১৭শ শতকে শিখজাতি: কয়েকটি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে গুরু অর্জুনের নিষ্ঠুর মৃত্যু অবধি (১৬০৬) শিখজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী হরগোবিন্দের আমলে (১৬০৬-৪৫) সামরিক ভাবের দিকে গতি শিখজাতির ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠে। হরগোবিন্দ ছিলেন রণপ্রিয়; তিনি ৮০০ অশ্ব এবং ৩০০ সশস্ত্র অনুচর প্রতিপালন করিতেন। "তরবারি হস্তে তাঁহার অনুরক্ত শিষ্যদের সঙ্গে সাম্রাজ্যের সৈন্যগণের মধ্যে কুচকাওয়াজ করিয়া বেড়াইতেন তিনি, অথবা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কিংবা ব্যক্তিগত শত্রুদের বাধাদান বা পরাভূত করার জন্য অকুতোভয়ে তাহাদের পরিচালনা করিতেন। হরগোবিন্দ গুরুপদে সমাসীন থাকাকালীন শিখদের প্রচুর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, এবং অর্জুনের অর্থ-সংক্রান্ত কর্মনীতি এবং তাঁহার পুত্রের অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কিত ব্যবস্থা তাহাদিগকে সাম্রাজ্যের মধ্যেই এক প্রকারের পৃথক রাষ্ট্রবন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তোলে।"

হরগোবিন্দ তাঁহার পুত্রদের ডিঙাইয়া তাঁহার পৌত্র হর রায়কে (১৬৪৫-৬১) নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। তিনি ছিলেন শান্ত প্রকৃতি, কিন্তু সিংহাসনের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধে দারা শুকোর পক্ষে যোগদান করার জন্য তাঁহাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাম রায়কে মোগল দরবারে প্রতিভূস্বরূপ প্রেরণ করিতে হয়। তাঁহার উত্তরাধিকার লাভ করেন তাঁহার মধ্যমপুত্র হরকিষণ (১৬৬১-৬৪)। তাঁহাকে দিল্লীতে তলব করিয়া পাঠানো হইলে পর সেখানে তিনি বসন্তরোগে মারা যান; মারা যাইবার সময় হরগোবিন্দের মধ্যমপুত্র তেগ বাহাদুরকে তিনি মনোনয়ন করিয়া যান নবম গুরুরূপে।

গুরুপদে সমাসীন হওয়ার অতি অল্পকালের মধ্যেই, তাঁহার ক্রিয়াকলাপ প্রতিষ্ঠিত শাসনকর্তৃপক্ষের মনঃপূত না হওয়ায়, তাঁহাকে দিল্লীতে তলব করিয়া পাঠানো হয়; কিন্তু অম্বরের মীর্জা রাজা জয় সিংহের পুত্র রাম সিংহ তাঁহাকে রক্ষা করেন, এবং তাঁহার সঙ্গে গুরু পাটনা এবং সেখান হইতে আসামে যান।

তিনি পঞ্জাবে ফিরিয়া আসিলে পর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজধানীতে লইয়া যাওয়া হয়, সেখানে ১৬৭৫ সালে এক বাদশাহী ফর্মানের বলে নৃশংসভাবে তাঁহার প্রাণবিনাশ করা হইল।

শোনা যায় তিনি অসংযত জীবন যাপন করিতেন বলিয়াই তাঁহার প্রাণবিনাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু শিখদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে তিনি নিরীহ ভক্ত পরিব্রাজকের জীবন যাপন করিতেন। যাহা হউক, এই ঘটনা শিখদের একটি সামরিক জাতিতে পরিণতি লাভে প্রবল গতিবেগ সঞ্চার করিল। বাদশাহী সমন অনুসারে দিল্লী যাত্রার প্রাক্কালে, যদি তাঁহার প্রাণদণ্ড হয় তাই, তিনি তাঁহার তরুণ পুত্র গোবিন্দের কটিদেশে হরগোবিন্দের তরবারি ঝুলাইয়া দিয়া তাঁহাকে নিজের উত্তরাধিকারী রূপে অভিনন্দন করিয়া যান।

গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮): শিখদের শেষ গুরু তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে এক নবজীবনের উন্মেষ সাধন করেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন খালসা, অর্থাৎ সিংহদের ধর্মতন্ত্র। ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি অপরিবর্তিতই রহিল, কিন্তু বহিরঙ্গ এবং আচার অনুষ্ঠানে ঘটিল রূপান্তর। তদবধি তাঁহার অনুচরবর্গের উপাধি হইল সিংহ। দীক্ষা পদ্ধতির নাম হইল পহুল। মন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল "জয় গুরু"। তাহাদিগকে গুরু নানক ও তাঁহার অধস্তন পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে। তাহাদিগকে রাখিতে হইবে কেশ, কৃপাণ, কঙ্কতী (কাঁকুই বা চিরুনি), কঙ্কণ, কঞ্চুক (বর্ম বা পায়জামা)। তাহাদের কর্মশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে একমাত্র ইস্পাত সম্পর্কে, সদাসর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ ও শত্রুনিপাতে রত থাকিতে হইবে। নূতন নাম, নূতন বেশ, নূতন উপকরণ, এবং নূতন আচার-অনুষ্ঠানের বলে "তিনি অন্যান্য সকল দিক হইতে শিখদের মানবিক উৎসাহ-উদ্যমকে একটিমাত্র নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। এইভাবেই একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের ছাঁচে ঢালাই হইয়া গেল শিখজাতি।" একাধারে তিনি ছিলেন ধর্মগুরু, সামরিক নেতা, এবং বিদ্রোহী, তাঁহার ক্রিয়াকলাপের যথাযথ পারম্পর্য নির্ণয় করা সহজ নয়। পঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলের রাজারাজড়াদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছেন তিনি, যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছেন মোগল সাম্রাজ্যের সৈনিকদের সঙ্গে; তাঁহার পুত্রদের প্রাণদণ্ড বিধান করেন সিরহিন্দের মোগল ফৌজদার। সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধে বাহাদুর শাহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যান, সেখানে ১৭০৮ সালে

জনৈক আফগান তাঁহাকে হত্যা করে। তিনি বলিয়া যান অতঃপর খালসাই গ্রহণ করিবে গুরুর স্থান। এইভাবেই ঘটে ব্যক্তিগত গুরুপদের অবসান।

শিখ গুরুগণ

১. নানক (জন্ম ১৪৬৯, মৃত্যু ১৫৩৮)
২. অঙ্গদ (গুরুপদে স্থিতিকাল : ১৫৩৮-৫২)
৩. অমর দাস (১৫৫২-৭৪)
|
কন্যা
বিবি ভানী = ৪. রাম দাস (১৫৭৪-৮১)
৫. অর্জুন (১৫৮১-১৬০৬)
৬. হরগোবিন্দ (১৬০৬-৪৫)

গুরুদিত্তা	৯. তেগ বাহাদুর (১৬৬৪-৭৫)
৭. হর রায় (১৬৪৫-৬১)	১০. গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮)
৮. হর কিষণ (১৬৬১-৬৪)	
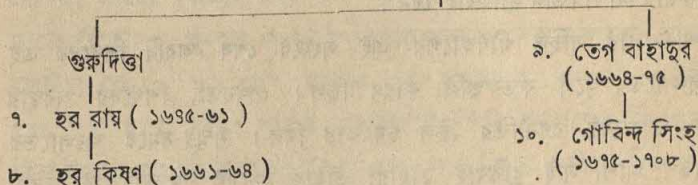
১৮শ শতকে শিখদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম: গুরু গোবিন্দ সিংহের পর বান্দা হইয়া দাঁড়ান শিখদের পার্থিব জীবনের নেতা। তিনি সিরহিন্দ অধিকার করিয়া, গুরু গোবিন্দ সিংহের পুত্রদের হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ফৌজদারের প্রাণ হরণ করিলেন। পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে তিনি দেশের কিয়দংশ অধিকার করিয়া বসেন, কিন্তু বাহাদুর শাহ ও মুনিম খাঁর দ্বারা তিনি লৌহগড় দুর্গ হইতে বিতাড়িত হন। ফরুখ সিয়রের আমলে সিরহিন্দে তাঁহার পুনরাবির্ভাব ঘটে; কিন্তু গুরুদাসপুরের দুর্গে গিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হন, সেখানে উপবাসক্লিষ্ট অবস্থায় বাধ্য হইয়া তিনি আত্মসমর্পণ করেন। ১৭১৬ সালে তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত দিল্লীতে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। পঞ্জাবের প্রদেশপালগণ শিখদের উপর নির্যাতন চালাইয়া যাইতে থাকেন। কিন্তু নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণের ফলে শিখদের পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়; গুরু গোবিন্দ সিংহ তাহাদের অন্তরে যে ছাপ রাখিয়া যান, ঘোরতর বিপর্যয়ের মধ্যেও তাহা তাহাদের স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যায় নাই।

১৭৫২ সালের পর অন্ততঃ পঞ্জাবে মোগল শক্তি আর. ধর্তব্যের মধ্যেই রহিল না, শিখদিগকেই আহম্মদ শাহ আবদালীর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। পাণিপথে মারাঠাদের বিরুদ্ধে আবদালীর বিপুল জয়লাভের (১৭৬১) পর আশা হইয়াছিল যে পঞ্জাবের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব দৃঢ় হইয়া উঠিবে। কিন্তু শিখ হানাদারদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ক্রমাগত তাঁহার পিছনে লাগিয়া থাকিয়া পদে পদে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল, অথচ তিনি পিছু ফিরিয়া দাঁড়াইলে তাহাদের খুঁজিয়াও পাওয়া যাইত না; ফলে শিখদের বিধ্বস্ত করিবার পরিবর্তে মহাবল আবদালী নিজেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ১৭৬২ সালে লুধিয়ানার নিকট শিখদের বিরুদ্ধে তিনি এক বিরাট জয়লাভ করেন, তাহাতে ১২,০০০ শিখ নিহত হয়, কিন্তু তাঁহার সে বিজয়লাভে কোনরূপ ফলোদয় হয় না। ১৭৬৭ সালের দিকে কার্যতঃ তাঁহাকে পরাভব মানিতে হয়, শিখদের দমন করার আশা তিনি ছাড়িয়াই দেন।

আবদালীর সহিত দীর্ঘকালের এই সংঘর্ষে শেষ অবধি শিখদের এই সাফল্যলাভের মূলে কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, শিখদের অবস্থার সহিত তাহাদের রণনীতির ছিল চমৎকার মিল। সম্মুখ-সমরে জয়লাভের কোনরূপ আশা নাই বুঝিয়াই তাহারা তাঁহার রসদের পথ আটকাইয়া বিনা যুদ্ধে তাঁহার শক্তিহরণের চেষ্টা করিত। আহম্মদ শাহ পর্বতকন্দরে গিয়া তাহাদের শাস্তিবিধান করিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, শিখরা যাহাতে তাহাদের হৃত সম্পত্তি ও শক্তির পুনরুদ্ধার সাধন করিতে না পারে সেজন্য তিনি পঞ্জাবে যথোপযুক্ত সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখিতে পারিতেন না। তৃতীয়তঃ, আফগানিস্তানে বিদ্রোহ প্রায় লাগিয়াই থাকিত, তাহাতে সর্বদা ভারতবর্ষের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিত না। তা' ছাড়া, কেহ যত বড় প্রতিভারই অধিকারী, কিংবা যত অসামান্য পুরুষই হউন না কেন, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিজেদের নির্বন্ধ সম্বন্ধে চেতনায় উদ্দীপ্ত একটি সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অর্থ অসম্ভব সাধনের প্রয়াস মাত্র। কথিত আছে আহম্মদ শাহ একবার এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে শিখশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিতে হইলে তাহাদের ধর্মোন্মাদনার অবসান ঘটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় শিখজাতি প্রায় সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ভাবে শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছিল; সে সংগ্রামের সাফল্যময় পরিণতির

গৌরব কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রাপ্য নয়, সমগ্র জাতিরই প্রাপ্য। তারপর আবদালীর ক্ষমতার যখন কার্যতঃ বিলুপ্তি ঘটে তখন গুরু গোবিন্দ সিংহের শিষ্যবর্গ পঞ্জাবের অধিকাংশ নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া লন, ফলে শিখদের মধ্যে গড়িয়া উঠে বারোটি মিস্‌ল, অর্থাৎ এক-একজন শক্তিমান সর্দারের নেতৃত্বাধীন যোদ্ধপুরুষদের এক-একটি দল, এবং এইভাবেই সেখানে যে সংস্থার উদ্ভব ঘটে তাহাই "ধর্মতান্ত্রিক যুক্তশক্তি সামন্ততান্ত্রিক-সংস্থা" রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

জাঠদের অভ্যুত্থান ও পতন: জাঠদের একটি শাখা যমুনার দক্ষিণে আগ্রা ও দিল্লীর মধ্যবর্তী ভূভাগে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এই দুই রাজধানী এবং সেখান হইতে আজমীঢ় হইয়া দাক্ষিণাত্যে গমনাগমনের প্রধান পথের পার্শ্বে তাহারা একটি স্থান অধিকার করিয়া বসে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই বলশালী জাতি গোলযোগ সৃষ্টি করিতে থাকে। ১৬৬৯ সালে গোকলা জাঠের বিদ্রোহ দমন করা হয়, ১৬৮৮ সালে দমন করা হয় রাজারাম জাঠের বিদ্রোহ। পুনরায় ১৭০৫-১৭০৭ সালে ভাজ্জার নেতৃত্বে জাঠরা গোলযোগ বাধাইয়া দেয়। ১৭০৭ সালে ভাজ্জার পুত্র চূড়ামনকে বাদশাহী চাকুরীতে গ্রহণ করা হয়। মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে তিনি কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন, এবং থুন নামে একটি স্থানে এক দুর্গ নির্মাণ করিয়া নিজ শক্তির দৃঢ়তা সম্পাদন করেন। তাঁহাকে দমন করার চেষ্টা করা দরকার মনে হয়। ১৭১৬ সালে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন অম্বরের রাজা সওয়াই জয় সিংহ। তিনি আসিয়া থুন অবরোধ করেন, কিন্তু দিল্লীর সভাসদবর্গের চেষ্টায় সম্রাট জাঠ সর্দারের পক্ষে অনুকূল শর্তাবলী মঞ্জুর করিতে সম্মত হন। ফলে বাদশাহী রাজধানীর একান্ত সন্নিকটেই দুর্ধর্ষ শক্তির অধিকারী হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন জাঠ নেতা। চূড়ামনের পুত্রেরা থুন-দুর্গে আশ্রয় লইয়া গোলযোগ বাধাইয়া দেন। চূড়ামনের ভ্রাতুষ্পুত্র বদন সিং বাদশাহী দলে যোগদান করেন, ১৭২১ সালে বাদশাহী ফৌজ থুন অধিকারে সমর্থ হয়। তখন বদন সিং-ই হইয়া দাঁড়ান জাঠদের সর্দার।

বদন সিং-এর মৃত্যুর (১৭৫৬) পর তাঁহার উত্তরাধিকারী দত্তক পুত্র সূরজমল হিন্দুস্থানে জাঠদের এক অত্যন্ত দুর্ধর্ষ শক্তিতে পরিণত করিয়া তোলেন। বদন সিং ও সূরজমল তাঁহাদের রাজ্যে দীগ, কুম্ভের, ভরতপুর ও বের এই চারিটি অভেদ্যপ্রায় দুর্গ নির্মাণ অথবা মেরামত করিয়াছিলেন। সূরজমল আবার

নিজস্ব এক রীতিতে একদল অশ্বারোহী সৈন্যকে শিক্ষাদান করেন। মারাঠারা এবং আহম্মদ শাহ আবদালীও একাধিক বার তাঁহার দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এইরূপ সময়ে তিনি তাঁহার দুর্গগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আক্রমণকারীদের অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। ১৭৫৭ সালে আফগানদের আক্রমণের সময় আফগানরা যখন মথুরা লুণ্ঠনের চেষ্টা করে তখন জাঠরা তাহাদের সর্বাপেক্ষা কঠিন বাধা দিয়াছিল। অবশ্য জাঠরা আক্রমণের বেগ প্রতিহত করিতে পারে নাই, কিন্তু আবদালীকে প্রতিরোধ করার যত কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে সেগুলির মধ্যে তাহাদের এই প্রতিরোধই সম্ভবতঃ ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল।

পাণিপথের যুদ্ধের পর আহম্মদ শাহ আবদালী যখন ভারত ত্যাগ করেন তখন 'সম্পূর্ণ অক্ষত সৈন্যদল এবং উৎপ্লবমান কোষাগারের' অধিকারী জাঠ রাজাই উত্তর-ভারতে ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নরপতি। ১৭৬১ সালের জুন মাসে তিনি আগ্রাদুর্গ অধিকার করেন। জাঠ রাজ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে ১৭৬৩ সালে নজীব-উদ্দৌলার সহিত সামান্য একটি খণ্ডযুদ্ধে সূরজমল নিহত হন। নজীব-উদ্দৌলা তখন ছিলেন দিল্লীর সর্বেসর্বা। সূরজমলের পুত্র জবাহীর সিংহ পিতার স্থান অধিকার করেন। তাঁহার কর্মজীবন ছিল ঝটিকাবিক্ষুব্ধ। ১৭৬৮ সালে তিনি প্রাণ হারান। এইবার জাঠশক্তির অধঃপতন দেখা দেয়। পারিবারিক বিভেদ ও দলগত বাধাবিপত্তিতে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে থাকে। মীর্জা নজফ খাঁর নেতৃত্বে ২য় শাহ আলমের বাদশাহী ফৌজ ১৭৭৩ সালে আগ্রার এবং ১৭৭৬ সালে দীগের পুনরুদ্ধার সাধন করে। ক্ষীয়মাণ জাঠশক্তি ভরতপুরের অভেদ্য দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া অস্তিত্বটুকু বজায় রাখিয়া চলিতে থাকে।

১৮শ শতকে রাজপুতগণ: ১৬৮০ সালে মেবারের রাণা রাজসিংহ পরলোকগমন করেন। তাঁহার রাজ্য—হিন্দু-ভারতের চক্ষে তখনও গৌরবে অদ্বিতীয়—তাঁহার উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতা এবং মোগল দরবার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে পিছনে পড়িয়া যায়। অম্বর রাজ্য ভগবানদাস, মান সিংহ ও মীর্জা রাজা জয় সিংহের নেতৃত্বে মোগল যুগের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। মোগল যুগে যোধপুরের বৈশিষ্ট্যও সম্ভবতঃ কম ছিল না, মোগল বাহিনীর একটি বিশিষ্ট অংশই ছিল রাঠোর সৈন্যের দল। যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধের ফলে কিছুকালের জন্য রাজ্যটি রাহুগ্রস্ত হইয়া পড়ে। মহম্মদ শাহের আমলে

রাজপুতানার দুইজন বিশিষ্ট সামন্ত নরপতি, জয়পুরের সওয়াই জয় সিংহ এবং মাড়ওয়াড়ের অভয় সিংহ, মোগল দরবারে সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করেন। ১৭৪৩ সালে জয় সিংহের মৃত্যু হয়, অভয় সিংহের মৃত্যু হয় ১৭৪৯ সালে।

মোগল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িলে, মোগলদের আধিপত্যের ফলে যে শান্তি স্থাপিত হইয়া প্রায় দুই শতাব্দীকাল অব্যাহত ছিল, রাজপুতানা হইতে তাহা অন্তর্হিত হয়। "রাজপুতানা হইয়া দাঁড়ায় খাঁচাগুলির দরজাখোলা, রক্ষিহীন এক চিড়িয়াখানা।" ঝটিকা-কেন্দ্র ছিল তিনটি—বুন্দি, জয়পুর ও মাড়ওয়াড়। এ কয়টি রাজ্যে উত্তরাধিকারের জন্য প্রতিযোগীদের মধ্যে রেষারেষি লাগিয়াই থাকিত। সুযোগ বুঝিয়া মারাঠারা যে-কোন একজন দাবিদারের পক্ষ লইয়া অন্যের সহিত লড়াই করিবার অজুহাতে এই সকল রাজ্যে হানা দিতে থাকে। হোলকার ও সিন্ধিয়া গৃহবিবাদে দীর্ণ রাজপুতানাকে লুণ্ঠনের প্রশস্ত ক্ষেত্র জ্ঞান করিতেন। অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটিলেও মারাঠাদের উপদ্রব থামিত না। ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপিত না হওয়া অবধি ইহাই ছিল রাজপুতানার ইতিহাস—এই গৃহযুদ্ধ ও বহিঃশত্রুর উপদ্রব এবং তাহারই অনিবার্য ফলস্বরূপ অরাজকতা ও অর্থনৈতিক সর্বনাশের কাহিনী। মনে হয় অষ্টাদশ শতকে রাজপুতরা এক হতবীর্য জাতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বাধীন উপরাজতন্ত্র (অযোধ্যা, বঙ্গ, হায়দরাবাদ)

স্বাধীন উপরাজতন্ত্রের অভ্যুদয়ের কারণ: মহামোগলেরা ছিলেন কর্মিষ্ঠ শাসক। প্রাদেশিক শাসন-ব্যাপারে রাজপুরুষদের মধ্যে পরস্পরের ক্ষমতার দ্বারা পরস্পরকে সংযত রাখা এবং সকলের মধ্যে শক্তিসাম্য বিধানের জন্য তাঁহারা এমন এক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, সুবাদারদের পক্ষে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে নির্বীর্য মোগল বাদশাহদের অধীনে (আরও যথাযথ ভাবে বলিতে গেলে মহম্মদ শাহের আমল হইতে) মাত্র একজন রাজপ্রতিনিধির হাতে একাধিক প্রদেশের শাসনভার অর্পণের ক্ষতিকর প্রথা অনুসরণের ফলে, এবং তাহারই

সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ অধীক্ষার অভাববশতঃও, প্রাদেশিক শাসকদের পক্ষে কার্যতঃ স্বাধীন হইয়া উঠিবার পথ প্রশস্ত হইয়া গেল। দাক্ষিণাত্যের সব কয়টি মোগল সুবার ঐশ্বর্যসম্পদ ছিল নিজামের আয়ত্তে, তিনি স্থাপন করিলেন হায়দরাবাদ রাজ্য। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া গঠিত হইল আর-একটি স্বাধীন উপরাজতন্ত্র। প্রাদেশিক শাসনব্যাপারেও বংশানুক্রমিক ধারা স্বীকৃতি লাভ করিতে থাকে। এই সকল উপরাজতন্ত্রের অবস্থান ছিল কেন্দ্রীয় শাসনপীঠ হইতে বহুদূরে। কিন্তু অযোধ্যার নবাবগণের ন্যায় দিল্লীর নিকটতর রাজপ্রতিনিধিগণও কার্যতঃ স্বাধীন হইয়া উঠিলেন।

অযোধ্যার নবাবগণ: সাদ'ত খাঁ পারস্যের নিশাপুর হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। ১৭২০ সালে তাঁহাকে হিন্দুয়ান ও বিয়ানার ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। তখনকার দিনে একমাত্র যে কাজে জীবনে উন্নতি করা যাইত, রাজদরবারে সেই চক্রান্তজাল রচনার কাজে তিনি প্রভূত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কিছুকালের জন্য তাঁহার হস্তে অর্পণ করা হয় আগ্রার শাসনভার, তা' ছাড়া তিনি অযোধ্যার শাসনকর্তার পদেও নিযুক্ত হন। তাঁহাকে দেওয়া হয় বুরহান-উল-মুল্ক উপাধি। জাঠদের সহিত সংঘর্ষে ব্যর্থতার পর তাঁহাকে আগ্রার শাসনভার হইতে অপসারিত করা হয়, কিন্তু অযোধ্যায় তিনি অর্ধ-স্বাধীন পদেই বহাল থাকেন। কর্নালের যুদ্ধে (১৭৩৯) নাদির শাহের হাতে তিনি বন্দী হন, এবং মোগল সম্রাটকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে গমন করিবার জন্য তাঁহাকে প্ররোচনা দান করেন, কিন্তু শাহী রাজধানীতে প্রতিশ্রুত মুক্তিপণ সংগ্রহ করিতে অপারগ হওয়ার জন্য তাঁহাকে দৈহিক শাস্তিবিধানের ভয় প্রদর্শন করা হইলে তিনি অবমাননার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আত্মহত্যা করেন।

অযোধ্যায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আবুল মনসুর খাঁ—ইনি তাঁহার সফদর জঙ্গ উপাধিতেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি শেষ অবধি সম্রাট আহম্মদ শাহের উজীরের পদেও উন্নীত হন। ১৭৫৪ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শুজা-উদ্দৌলা অযোধ্যার স্বাধীন তক্ত লাভ করেন। তিনি অকর্মণ্য মোগল সম্রাট ২য় শাহ আলমের উজীর-পদেরও অধিকারী ছিলেন। বক্সারের যুদ্ধের (১৭৬৪) পর তিনি হইয়া দাঁড়ান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন অধীন সামন্ত নরপতি।

বঙ্গদেশের নবাবগণঃ ঔরঙ্গজেবের সুবিখ্যাত দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁর অধীনে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা কার্যতঃ হইয়া দাঁড়ায় একটি স্বাধীন উপরাজতন্ত্র। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষভাগে মুর্শিদকুলী খাঁ ছিলেন বঙ্গদেশের দেওয়ান, আজিম-উস-শান ছিলেন সুবাদার ; আজিম-উস-শানের দীর্ঘকালের অনুপস্থিতিতে বঙ্গ ও উড়িষ্যার সামরিক শাসনভারও মুর্শিদকুলী খাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়। ফর্‌রুখ সিয়র যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তিনি বঙ্গের অনুপস্থিত প্রদেশপালের দায়িত্ব পালনের জন্য উপ-প্রদেশপাল নিযুক্ত হন, তা' ছাড়া স্বনামেই তাঁহাকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ আনুষ্ঠানিক ভাবে বঙ্গের সুবাদার নিযুক্ত হন ১৭১৭ সালে, ১৭২৭ সালে তাঁহার মৃত্যুকাল অবধি তিনি সেই পদেই বহাল থাকেন।

বঙ্গদেশে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য মুর্শিদকুলী খাঁ ঠিকা দিতেন (ইজারা-ব্যবস্থা)। পুরাতন জমিদারদের অনেকেই রহিয়া গেলেন বটে, তবে তাঁহারা সব হইয়া পড়িলেন নূতন ইজারাদারদের তাঁবেদার মাত্র। দ্বিতীয় কি তৃতীয় পুরুষে এই সব ইজারাদার জমিদার নামেই অভিহিত হইতে থাকেন। রাজস্ব সংগ্রহের জন্য মুর্শিদকুলী খাঁ একমাত্র বাঙ্গালী হিন্দু ছাড়া আর কাহাকেও নিয়োগ করিতেন না। এইভাবে বঙ্গদেশে তিনি গড়িয়া তোলেন নূতন এক অভিজাত ভৌমিক শ্রেণী। ব্রিটিশ সরকার ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহা ছিল প্রধানতঃ তাঁহারই সৃষ্টি।

মুর্শিদকুলী খাঁর পর বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার শাসনভার প্রাপ্ত হন তাঁহার জামাতা শুজা-উদ্দীন মহম্মদ খাঁ। তাঁহারই শাসনকালে বিহার বঙ্গদেশের উপরাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৩৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে যথাবিধি তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ প্রাদেশিক শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। ১৭৪০ সালের এপ্রিল মাসে গিরিয়ার যুদ্ধে আলিবর্দি খাঁর হাতে সরফরাজ খাঁর পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে। আলিবর্দি তাঁহারই পিতার একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁহার পিতাই তাঁহাকে বিহারের উপ-প্রদেশপাল নিযুক্ত করিয়া যান। ১৭৪০ সালের মে মাসে মোগল সম্রাট আলিবর্দিকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার রাজপ্রতিনিধি রূপে স্বীকার করিয়া লন।

নূতন সুবাদার দেখিলেন তাঁহার প্রদেশ কয়টি নাগপুরের মারাঠা হানাদারদের লুণ্ঠনাভিযানের উন্মুক্ত ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গদেশে বর্গীর হাঙ্গামা শুরু

হয় ১৭৪২ সালে, তারপর ১৭৫১ সাল অবধি তাহা অবাধে চলিতে থাকে। তাহাদের সহিত অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে আলিবর্দি খাঁ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার রাজ্যের এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ১৭৫১ সালে নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলের সহিত নিম্নলিখিত শর্তে তিনি এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন: উড়িষ্যা প্রদেশটি কার্যতঃ রঘুজীর হস্তেই সমর্পণ করা হইল, আর বঙ্গদেশ সম্বন্ধে শর্ত হইল চৌথ হিসাবে নবাব বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা কর দান করিবেন। বঙ্গদেশের সীমানা হিসাবে নির্দিষ্ট হইল স্বর্ণরেখা নদী। ১৭৫৬ সালের এপ্রিল মাসে আলিবর্দি খাঁ পরলোক গমন করিলেন; সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তাঁহার দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌলা। সিরাজ-উদ্দৌলার জীবনকথা হইল বঙ্গদেশে ব্রিটিশ-শক্তি উত্থানের ইতিহাসে একটি অধ্যায় মাত্র।

হায়দরাবাদের নিজাম-বংশ: হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নিজাম-উল-মুল্ক রূপে সমধিক পরিচিত মীর কমর-উদ্দীন ছিলেন বুখারা হইতে আগত জনৈক ব্যক্তির পৌত্র। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথমভাগে তিনি মোগল সরকারে চাকুরীতে প্রবেশ করেন। বাহাদুর শাহ তাঁহাকে দান করেন অযোধ্যার প্রদেশপালের পদ। তিনি প্রথম দাক্ষিণাত্যের প্রদেশপাল নিযুক্ত হন ১৭১৩ সালে, কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁহার স্থানে নিয়োগ করা হয় সৈয়দ হুসেন আলীকে। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনের পর পুনরায় তিনি দাক্ষিণাত্যের প্রভু হইয়া বসেন। ১৭২২ সালে মহম্মদ শাহ তাঁহাকে নিযুক্ত করেন সাম্রাজ্যের উজীর; কিন্তু রাজদরবারের চটুলতায় তিনি এমনই বিরক্ত হইয়া উঠেন যে ১৭২৩ সালে দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার বিশ্বস্ততায় সন্দিহান হইয়া মহম্মদ শাহ দাক্ষিণাত্যের উপ-রাজপ্রতিনিধি মুবারিজ খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্ররোচিত করেন; কিন্তু ১৭২৪ সালে (বেরারে) শাকরখোদা নামক স্থানে নিজামের সহিত যুদ্ধে মুবারিজ নিহত হন। তাঁহার ক্ষমতাহানি করিতে না পারিয়া সম্রাট তাঁহাকে আসফ জাহ্ উপাধি দিয়া তাঁহার পদে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বাজী রাওয়ের সহিত শক্তি পরীক্ষায় নিজামকে সর্বদাই পরাভব মানিতে হইত, কিন্তু পালখেড়ের যুদ্ধে অথবা ভূপাল-সরোবরের নিকট পরাজয়ের ফলে তাঁহার দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবার রাজপ্রতিনিধি-পদের কোনরূপ হানি হয় নাই। ১৭৩৬ হইতে ১৭৪০ সাল পর্যন্ত তাঁহার প্রথমে মারাঠাদের, তারপর নাদির শাহের হাত হইতে মোগল

সাম্রাজ্য রক্ষার বৃথা চেষ্টায় উত্তর ভারতেই কাটিয়া যায়। ভূপাল এবং কর্নালে তাঁহার পরাভব হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় পতনশীল মোগল সাম্রাজ্যের ত্রাণকর্তার ভূমিকা গ্রহণের যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। ১৭৪১ সালে তিনি দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার মধ্যম পুত্র নাসির জঙ্গের বিদ্রোহ দমন করেন; তাঁহার অনুপস্থিতিকালে এই নাসির জঙ্গই তাঁহার প্রতিনিধির কাজ করিতেছিলেন। ১৭৪৩ সালে নিজাম-উল-মুল্ক আর্কট ও ত্রিচিনোপল্লীতে তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারই মনোনীত আনওয়ার-উদ্দীনকে আর্কটের নবাব-পদে স্থাপন করা হয়। ১৭৪৮ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহাকে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের দিনে যুদ্ধ অপেক্ষা কূটনীতিতে অধিকতর দক্ষ সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনি হায়দরাবাদ রাজ্যের সিদ্ধকাম প্রতিষ্ঠাতা রূপে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন।

উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদবিসংবাদের জন্য তিনি ছয় পুত্র রাখিয়া যান। মধ্যমপুত্র নাসির জঙ্গ হায়দরাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন; জ্যেষ্ঠপুত্র গাজী-উদ্দীন থাকেন দিল্লীতে শাহী দরবারে বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয়ের চেষ্টায়। কিন্তু নিজাম-উল-মুল্কের এক প্রিয় পৌত্র মুজফ্‌ফর জঙ্গ তখন ছিলেন বিজাপুর ও আড়োনীর প্রদেশপাল, সেখানে তিনি নাসির জঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ান। ফরাসীরা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করে। নাসির জঙ্গ তাঁহার সহিত শক্তি-পরীক্ষায় অগ্রসর হন, কিন্তু আততায়ীর হাতে তাঁহার প্রাণ যায়। মুজফ্‌ফর জঙ্গ রাজপ্রতিনিধি-পদে উন্নীত হন, কিন্তু অচিরে তাঁহাকেও আততায়ীর হস্তে প্রাণদান করিতে হয়। সুযোগ্য ফরাসী নেতা বুসী এক ফরাসী রক্ষিবাহিনী পরিচালনা করিয়া আনেন এবং নাসির জঙ্গের এক ভাই সলাবৎ জঙ্গকে ঘোষণা করেন মুজফ্‌ফর জঙ্গের উত্তরাধিকারী রূপে। ১৭৫১ সাল হইতে ১৭৫৮ সালে ফরাসী গবর্ণর লালী তাঁহাকে ফিরাইয়া না আনা পর্যন্ত বুসীই হায়দরাবাদের ব্যাপারে কর্তৃত্ব করিতে থাকেন। সলাবৎ জঙ্গের কোনরূপ যোগ্যতাই ছিল না। বুসীকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার পর তিনি তাঁহার ভাই নিজাম আলীর উপর পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করেন। পেশোয়া বালাজী বাজী রাও হায়দরাবাদের প্রতি তাঁহার পিতার বিরুদ্ধতার নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিতেন। সদাশিব রাও ভাউয়ের নেতৃত্বে এক বিরাট মারাঠা বাহিনী উদ্‌গীরের যুদ্ধে (৩রা ফেব্রুয়ারী,

১৭৬০) নিজামকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। মারাঠাদের হাতে তিনি ছাড়িয়া দেন ৬০ লক্ষ টাকা রাজস্বের এক ভূমিভাগ, অসিরগড় ও দৌলতাবাদের দুর্গ, এবং বিজাপুর ও বুরহানপুর শহর; রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ মারাঠাদিগকে চৌথ প্রদানের শর্তে তাঁহাকে স্বহস্তেই রাখিতে দেওয়া হয়। ইহাই হইয়া উঠিতে পারিত আসফ জাহী বংশের অন্তিমদশার সূচনা, কিন্তু দাক্ষিণাত্য অবধি ছড়াইয়া পড়ে পাণিপথে মারাঠাদের বিপর্যয়-ভোগের প্রতিঘাত। তাহার পরই আবার ঘটে পেশোয়া বালাজী বাজী রাওয়ের মৃত্যু। মারাঠা-শক্তির এই সাময়িক পঙ্গুত্ব নিজামকে তাঁহার হৃতরাজ্যের বহুলাংশ পুনরুদ্ধারের সুযোগ দান করে। উদ্গীরের কাজ পণ্ড করিয়া দেয় পাণিপথ। সাফল্য অর্জনের পর নিজাম আলী সলাবৎ জঙ্গকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন, সেখানেই দুই বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৭৬২ সালে নিজাম আলীব সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় আসফ জাহী বংশ নিরাপত্তার মুখাবলোকন করে, এবং সে যুগে যতখানি স্থিতিশীলতা লাভ করা সম্ভবপর ছিল, অবিসংবাদিত উত্তরাধিকারের ফলে তাহা লাভ করে সেই স্থিতিশীলতা। ১৭৯৫ সালে খর্দার যুদ্ধে মারাঠাদের হাতে নিজাম আলীর পরাভব ঘটিয়াছিল। চল্লিশ বৎসর রাজত্বের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন সামন্ত নরপতিরূপে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

সামরিক দুর্বলতা ঃ আর্ভিন তাঁহার 'ভারতীয় মোগলদের সৈন্য-বাহিনী' শীর্ষক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "সামরিক দুর্বলতাই ছিল পরিণামে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের—একমাত্র যদি না-ও হয় তবুও—প্রধান কারণ। অন্যান্য সকল প্রকারের ত্রুটি ও দুর্বলতা ইহার তুলনায় একেবারে কিছুই ছিল না। সাম্রাজ্যের রাজস্ব ও বিচার-ব্যবস্থা মোটের উপর ছিল প্রজাদের অভ্যস্ত ধারার উপযোগী; তাহারা অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষা করিত না; কেবল এই সকল বিষয়ের ব্যাপার হইলে, বহু যুগ অবধি সে সাম্রাজ্য টিকিয়া থাকিত। কিন্তু উহার

কেন্দ্রভাগ সম্পূর্ণরূপে সামরিক উদ্যম হারাইয়া বসিয়াছিল। উহাকে অতল গহ্বরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য কোন পারসিক অথবা আফগান দিগ্বিজয়ীর, কোন নাদিরের, কোন আহম্মদ শাহ আবদালীর পরুষ হস্তের, অথবা কোন য়ুরোপীয় ভাগ্যান্বেষীর, কোন ডুপ্লে বা ক্লাইবের প্রতিভার প্রয়োজন ছিল না। ইহাদের কেহ ঘটনাস্থলে পদার্পণ করিবার পূর্বেই মোগল সাম্রাজ্যের অন্তিমদশা ঘনাইয়া আসিয়াছিল।"

সৈন্যবাহিনীর সংগঠন ছিল যার-পর-নাই শিথিল। রণক্ষেত্রে অশ্বারোহীকে আনিতে হইত তাহার নিজের অশ্ব, তাহা নিহত হইলে ক্ষতির ভাগী হইতে হইত তাহাকেই। অশ্বারোহী প্রায়ই রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিত—ভীরুতার বশে নয়, অশ্বের প্রাণরক্ষার জন্য, কেননা উহাই ছিল তাহার জীবিকা অর্জনের একমাত্র অবলম্বন। সেনাবাহিনীর গঠনবিধি অনুসারে সে ছিল তাহার ঠিক ঊর্ধ্বতন সেনানায়কের আজ্ঞাধীন সৈনিক মাত্র, একমাত্র তাঁহারই মুখের দিকে ছাড়া আর কোনদিকে চাহিতে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইত না। এমন কি শাহজাহানের আমলেও, তিন-তিনবার কান্দাহার অবরোধের সময় আমরা দেখিতে পাই যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধকৌশল, এই দুইদিক দিয়াই মোগলেরা পিছনে পড়িয়া ছিল। একমাত্র মহামোগলদের বিমুগ্ধকর ব্যক্তিগত গুণাবলীই তাঁহাদিগকে অন্যদিক দিয়া কার্যসাধনের অনুপযোগী এই সামরিক মন্ত্রটির সুষ্ঠু প্রয়োগ সাধনের সামর্থ্য দান করিয়াছিল। পরবর্তীকালের মোগলদের বিষয়ে আর্ভিন লিখিয়াছেন, "ব্যক্তিগত সাহসের অভাব ছাড়া সামরিক ক্রটিবিচ্যুতির তালিকায় আর যে সব দোষের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার প্রত্যেকটি দোষই অধঃপতিত মোগলদের প্রতি আরোপ করা যাইতে পারে—নিয়মানুবর্তিতা ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার অভাব, বিলাসিতার অভ্যাস, নিষ্ক্রিয়তা, রসদভাণ্ডারের অব্যবস্থা এবং সাজসরঞ্জামের অনাবশ্যক প্রাচুর্য।"

অভিজাত শ্রেণীর চরিত্রের অধোগতি ঃ দিল্লীশ্বরের পতাকাতলে সমবেত আফগান ও তুর্কি, রাজপুত ও হিন্দুস্থানী সৈন্যদের লইয়া গঠিত যৌথ বাহিনী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল স্থিরবুদ্ধি, ধৈর্যশীল, বীর্যবান ও শাসনযোগ্যতাসম্পন্ন নেতৃপুরুষের, কিন্তু স্যর যদুনাথ সরকার যথার্থই বলিয়াছেন, "মোগল যুগের ইতিহাসের চিন্তাশীল পাঠকের চিত্তে অভিজাত শ্রেণীর অধঃপতনের ন্যায় আর কিছুই এমন বিস্ময় উৎপাদন করে না।"

সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া রক্তাক্ত সমর, প্রাদেশিক শাসনকর্তৃত্ব লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী ওমরাহগণের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত, হিন্দুদের মনোভঙ্গ, দুর্বলচেতা সম্রাটদের যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনে অক্ষমতা, নির্লজ্জ পক্ষপাত, কার্যক্ষেত্রে জঘন্যতম নীচতা অবলম্বন, এই সবই ছিল অভিজাত শ্রেণীর এই বিস্ময়কর অধোগতির কারণ। এইরূপ অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে বুখারা ও খোরাসান হইতে অসমসাহসী ব্যক্তিগণ আর ভাগ্যের সন্ধানে ভারতবর্ষে আগমন করিতে পারিতেন না। এ বিষয়ের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হইল মহম্মদ ইয়ার খাঁর দৃষ্টান্ত। মহম্মদ ইয়ার খাঁ নাদির শাহের সুকঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োগে ক্লান্ত হইয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়া ভারতবর্ষেই রহিয়া যান, কিন্তু এখানকার অবস্থা দর্শনে তাঁহার অন্তরে এমনই বিরাগের সঞ্চার হয় যে অচিরেই তিনি পারস্যে প্রত্যাগমন করেন। নাদির শাহ তাঁহাকে বলেন, "আমার প্রমত্ত ক্রোধ তোমার কাছে আতঙ্কের বিষয় ছিল ; তবে আবার আমারই কাছে ফিরিয়া আসিলে কেন ?" উত্তর হইল, "একপাল ভীরুর সাহচর্যে জীবন অতিবাহিত করার চেয়ে আপনার ন্যায় ব্যক্তির হস্তে প্রাণদান করাও শ্রেয়ঃ।"

পারসিক, মধ্য-এশিয়াবাসী ও আফগান স্বার্থসন্ধানীদের লইয়া গঠিত বাহিনীতে দেশপ্রেম বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। বাদশাহের ব্যক্তিত্বের প্রতি কিছুটা ভয়ভক্তি ছিল বটে, তবে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বাদশাহগণও ছিলেন বলশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কিন্তু ফর্রুখ সিয়রের মতো কোন নির্বোধ কুচক্রী, কিংবা মহম্মদ শাহের ন্যায় একজন নিরীহ ও অস্থিরমতি ব্যক্তির পক্ষে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা আকর্ষণ এবং দলগত চক্রান্ত নিবারণ করা সম্ভবপর ছিল না। প্রিয়পাত্রদের দ্বারা বিপথে চালিত এবং কমর-উদ্দীনের ন্যায় গভীর ইন্দ্রিয়াসক্ত, অথবা ইমাদ-উল-মুল্কের ন্যায় অযোগ্য ও স্বার্থপর উজীরদের মন্ত্রণায় পরিচালিত মোগল সম্রাটগণের সে যোগ্যতা ছিল না যাহার বলে তাঁহারা অকর্মণ্যতা ও দলগত চক্রান্ত নিবারন করিয়া সাম্রাজ্যের সর্বনাশ প্রতিরোধ করেন। ইরানী, তুরানী ও হিন্দুস্থানী দলের মধ্যে বিবাদবিসংবাদ লাগিয়াই থাকিত। একজন তুরানীর পদোন্নয়নের জন্য প্রভুর বিশ্বাসহানি করিয়া তাঁহাকে শত্রুর কবলে নিক্ষেপ করিতে ইরানী দলের সাদ'ত খাঁর অভিরুচিতে বাধিত না ; ইরানী সফদর জঙ্গ সঙ্কটকালে পঞ্জাবের প্রদেশপালকে সাহায্য করিতে আসিলেন না, কেননা তিনি ছিলেন একজন তুরানী প্রতিযোগী। আকবর ও

তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ রাষ্ট্রাধিপতির প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করিয়াছিলেন, তাহার অভাবে ওমরাহগণকে সংযত রাখার কোন উপায়ই আর ছিল না।

গৃহশত্রু ও বহিঃশত্রুর দল ঃ দোয়াবে মারাঠাদের বারংবার হানাদারি, মারাঠাদের গুজরাট, মালব ও বুন্দেলখণ্ড জয়, এবং বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মোগল সরকার গৃহশত্রুদের সম্মুখীন হইবার মতো ক্ষমতাটুকুও হারাইয়া বসিয়াছিলেন। নাদির শাহ যখন ভারত আক্রমণ করেন, তাহার পূর্বেই দেশময় শুরু হইয়া গিয়াছিল অরাজকতার তাণ্ডবলীলা। ইতিপূর্বেই যে ভগ্নদশা বহুদূর অবধি অগ্রসর হইয়াছিল, নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহের আক্রমণ কেবল তাহারই পূর্ণতা সাধন করে মাত্র। স্ব-স্ব-প্রধান প্রাদেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ, বিজয়গৌরবে উদ্দীপ্ত মারাঠাগণ, অদম্য শিখজাতি, এবং দৃঢ়সঙ্কল্প জাঠেরা ত্বরিতগতিতে আকবর ও শাহজাহানের কৃতকর্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া চলিতেছিল, এমন সময় দেখা দিল বৈদেশিক আক্রমণকারীদের দল, তাহাদেরই হাতে ঘটিল এ প্রক্রিয়ার পূর্ণ পরিণতি !
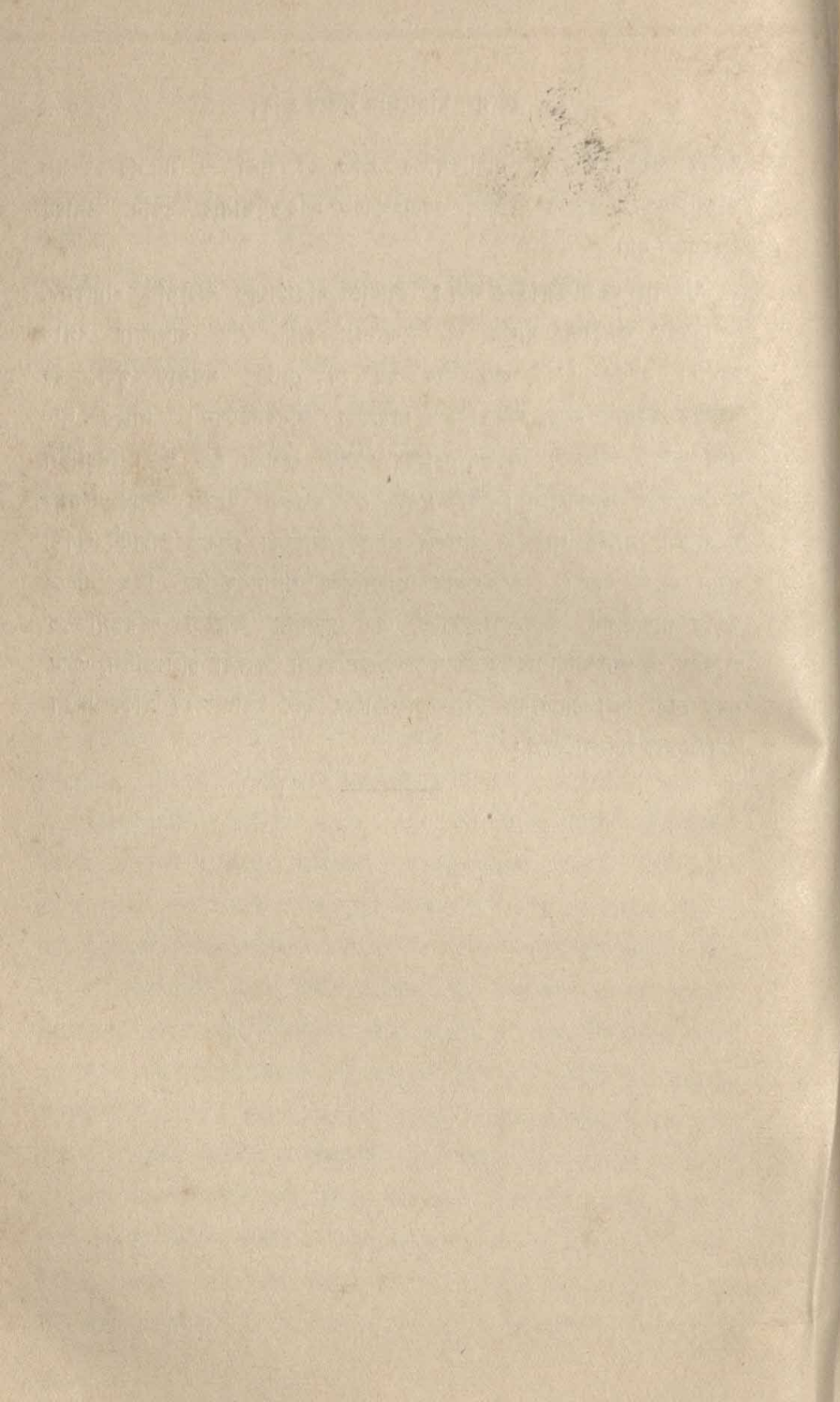
ভারতের ইতিহাস

তৃতীয় খণ্ড

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ইউরোপীয়গণের আগমন

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতে পোর্তুগীজ জাতি

ভাস্কো দা গামা ঃ ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই মে ভাস্কো দা গামা (Vasco da Gama) ও তাঁহার নাবিকগণ ভারতের উপকূলে আসিয়া উপনীত হন এবং কালিকট বন্দরে অবতরণ করেন। সরাসরি ভারতবর্ষে আসিবার সামুদ্রিক পথ আবিষ্কার ছিল এক বিরাট ঘটনা। নৌ-অভিযাত্রীদের সহায় কুমার হেন্‌রীর (Prince Henry the Navigator) পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এ কার্য সাধনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছিলেন দোঁ জোয়াও (Dom Joao)। বার্থোলোমিউ দিয়াজ (Bartholomew Diaz) কর্তৃক উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কারে পরিকল্পনাটিকে কার্যে পরিণত করার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল; ভাস্কো দা গামা অর্ধশতাব্দীর নানা অভিযানের ফলে সংগৃহীত যথার্থ তথ্যসম্ভারে পরিপুষ্ট এই একটি পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করেন মাত্র। ইহার পর যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে তাহার ফলে তিনি জনচিত্তে কলম্বসের সহিত একই আসন গ্রহণ করিয়াছেন। ১৫০২ খ্রীস্টাব্দে পোপ পোর্তুগালের রাজাকে "ইথিওপিয়া, আরব, পারস্য ও ভারতে নৌ-অভিযান, দিগ্বিজয় ও বাণিজ্যের অধীশ্বর" রূপে নিজেকে অভিহিত করার অনুমতি দান করেন।

ভাস্কো দা গামার এই সামুদ্রিক পর্যবেক্ষণাভিযান পোর্তুগীজদিগকে মালাবারের বাজারে কী কী পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা যাইতে পারে সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা দান করে। তিনি ছিলেন স্থূলবুদ্ধি নাবিক মাত্র; তিন-তিনটি মাস একটি হিন্দু-রাজ্যে বসবাস করিয়াও হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যান। ১৪৯৯ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি পোর্তুগালে প্রত্যাবর্তন করেন।

তাঁহার পরে আসেন কাব্রাল (Cabral)। তিনি কালিকটে উপনীত হন ১৫০০ সালের সেপ্টেম্বরে ; সেখানে তিনি একটি কুঠি স্থাপন করেন, কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি জামোরিনের (Zamorin) সঙ্গে বিবাদ বাধাইয়া দেন। ফলে পোর্তুগীজ কুঠি ভাঙ্গিয়া মাটিতে মিশাইয়া দেওয়া হয়। কাব্রাল কোচিন ও কান্নানোর হইতে মূল্যবান পণ্য সংগ্রহ করেন। কোচিনের রাজার সঙ্গে কালিকটের জামোরিনের শত্রুতা ছিল, কোচিন-রাজ পোর্তুগীজদের বন্ধু হইয়া দাঁড়াইলেন। "কেবল ভারতবর্ষের সহিত লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের ব্যবসায়-বাণিজ্যে যতদূর সম্ভব বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করাই এখন পোর্তুগীজদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল না, তাহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল ইউরোপের সহিত প্রাচ্যের সকল প্রকারের ব্যবসায়-বাণিজ্যেরই মোড় পোর্তুগালের দিকে ঘুরাইয়া দেওয়া।"

১৫০২ খ্রীস্টাব্দে ভাস্কো দা গামা দ্বিতীয় বার এ দেশে আসিলেন। এবার তাঁহার অধীনে আসিল এক বিরাট নৌবহর। তিনি ছিলেন হৃদয়হীন, লোভপরবশ নাবিক মাত্র ; তিনি অমানুষিক নিষ্ঠুরতার তাণ্ডব বাধাইয়া দিলেন, নির্বিচারে তীর্থযাত্রীদের জাহাজ ডুবাইয়া দিতে তাঁহার এতটুকু বাধিত না, আরব বণিকদের অন্তরে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া তিনি ভারতবর্ষের সঙ্গে তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোচিনে একটি ক্ষুদ্র কুঠি খাড়া করিয়া তিনি লিস্‌বনে ফিরিয়া গেলেন, যাইবার সময় উপকূল-প্রদেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া পাহারা দিবার জন্য রাখিয়া গেলেন ক্ষুদ্র একটি নৌবহর। কালিকটের জামোরিন কোচিন-রাজ্য আক্রমণ করিলেন ; কিন্তু তখন ক্ষুদ্র একটি নৌবল লইয়া আসিয়া পৌছিয়াছেন আফ্‌ফোন্‌সো দ্য আল্‌বুকার্ক (Affonso de Albuquerque), তিনি কোচিন হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। জামোরিনের আক্রমণ হইতে কোচিন রক্ষার জন্য একশত লোক দিয়া সেখানে রাখা হইল দুয়ার্তে পাচেকো নামে একজন যোদ্ধৃপুরুষকে। মাত্র আট হাজারের মতো কোচিন-সৈনিক লইয়া প্রায় চারমাস কাল তিনি অসম্ভব বাধাবিপত্তির মুখে অটল হইয়া রহিলেন—জামোরিনের বাহিনীতে ছিল প্রায় ৬০,০০০ সৈন্য। তারপর এক সন্ধির ব্যবস্থা হইল।

এবার পোর্তুগীজরা বৎসর বৎসর অভিযান প্রেরণের রীতি পরিহার করিল। ১৫০৫ সালে স্থির হইল তিন বৎসরের মেয়াদে একজন করিয়া রাজ-

প্রতিনিধি নিয়োগ করা হইবে। প্রথম রাজপ্রতিনিধি হইলেন ফ্রান্সিস্কো দ' আলমেইদা (Fradcisco d'Almeida)। তাঁহাকে অঞ্জদ্বীপ (মালাবার উপকূলের নিকট একটি ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ), কান্নানোর এবং কোচিনে দুর্গনির্মাণের নির্দেশ দান করা হইল। অঞ্জদ্বীপ কোন কাজে আসিল না, কিন্তু কোচিন-রাজ হইয়া দাঁড়াইলেন পোর্তুগীজদের হাতের পুতুল। কান্নানোরে একটি পোর্তুগীজ বাহিনী প্রতিপক্ষের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিল। জামোরিনের নৌবাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া ফেলা হইল। মিশরের স্থলতান ভারত মহাসাগর হইতে পোর্তুগীজ হানাদারদের তাড়াইয়া দিবার জন্য যে নৌবহর প্রেরণ করিয়াছিলেন, আল্‌মেইদা দিউ বন্দরের অনতিদূরে তাহার সহিত সংঘর্ষেও জয়লাভ করেন।

আল্‌বুকার্ক ঃ ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে আল্‌মেইদার পর আফ্‌ফোন্‌সো দ্য আল্‌বুকার্ক গভর্নর-পদ লাভ করেন। পর বৎসর তিনি গোয়া অধিকার করেন। বিজাপুরের স্থলতান ইউস্থফ আদিল শাহ্ উহা পুনরধিকার করেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই উহার পুনরুদ্ধার সাধন করেন আল্‌বুকার্ক। তিনি উহা স্থরক্ষিত করিয়া উহার বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন এবং উহাকে প্রাচ্যজগতে পোর্তুগীজদের প্রধান ঘাঁটি করিয়া তোলেন। একটি স্থায়ী জনশক্তি গড়িয়া তুলিবার জন্য পোর্তুগীজরা যাহাতে ভারতীয় স্ত্রীলোকদের পত্নীরূপে গ্রহণ করে সেজন্য তাঁহার চেষ্টার বিরাম ছিল না। ১৫১১ খ্রীস্টাব্দে তিনি মলক্কা অধিকার করেন, ১৫১২ সালে শত্রুর আক্রমণ হইতে গোয়া রক্ষা করেন, কিন্তু তাঁহার এডেন আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া যায়। ওর্‌মুজের উপর পোর্তুগীজ-প্রাধান্য স্থাপনে তিনি সফলকাম হন। ১৫১৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি রাখিয়া যান ওর্‌মুজ হইতে মলক্কা অবধি নানা স্থানে নৌঘাঁটির দ্বারা স্থরক্ষিত এক পোর্তুগীজ সাম্রাজ্য, এই সকল নৌঘাঁটি হইতে তাহারা যাবতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করিত এবং অন্যান্য সকল জাতির জাহাজ হইতে মুক্তিপণ আদায় করিত। আল্‌মেইদার ভরসা ছিল কোচিন ও অন্যান্য ঘাঁটি হইতে বহির্গত উপকূলরক্ষী এবং যাতায়াতের পথে প্রহরারত নৌবলের উপর। আল্‌বুকার্কের পদ্ধতি ছিল স্বতন্ত্র। তিনি বিশেষ কতকগুলি প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করিয়া সে সকল স্থানে নিজস্ব শাসন প্রবর্তন করিতেন, তারপর নির্বাচিত ক্ষেত্রসমূহে মিশ্র বিবাহের ফলে

গড়িয়া তুলিতেন এক-একটি উপনিবেশ, প্রত্যেকটি বিশিষ্ট সঙ্কটক্ষেত্রে স্থাপন করিতেন দুর্গ, এবং যেখানেই সম্ভবপর মনে হইত সেখানেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় নায়কদের—প্রয়োজন হইলে বার্ষিক করস্বরূপ স্বর্ণসম্ভার প্রদানে সম্মত করিয়া—পোর্তুগালের অধিনায়কত্ব স্বীকারে প্ররোচিত করিতেন।

পোর্তুগীজ-শক্তির বিস্তার সাধন ঃ আল্‌বুকার্কের পরবর্তী পোর্তুগীজ গভর্ণরগণ তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকেন। ১৫৩৪ সালে তাঁহারা বেসিন করায়ত্ত করেন, ১৫৩৭ সালে দিউ হস্তগত করেন, ১৫১৮ সালে কলম্বোয় এক দুর্গ নির্মাণ করেন, এবং যোড়শ শতকের মধ্যভাগে সিংহল দ্বীপের উপর তাঁহাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। ভারতবর্ষে পোর্তুগীজ গভর্ণরের প্রধান ঘাঁটি ছিল গোয়া ; তাঁহার অধীনে যথাক্রমে মোজাম্বিক, ওর্‌মুজ, মস্কট, সিংহল ও মলক্কা শাসন করিতেন পাঁচ-পাঁচজন গভর্ণর। কিন্তু পোর্তুগীজরা কখনও ভারতবর্ষের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশের চেষ্টা করে নাই : 'পোর্তুগীজ ভারত' একটা ঐতিহাসিক সত্য নয়। ভারতবর্ষে তাহারা কখনও তাহাদের রণতরী-সমূহের গোলাবর্ষণক্ষমতার বহির্ভূত কোন স্থান শাসন করে নাই।

সমগ্র যোড়শ শতক ব্যাপিয়া পোর্তুগাল 'ঐশ্বর্যসমারোহে সমুজ্জল প্রাচ্য জগৎকে পদানত করিয়া রাখিয়াছিল'। কিন্তু সপ্তদশ শতকে তাহার ভারতীয় উপনিবেশগুলি একটির পর একটি করিয়া ওলন্দাজদের হাতে চলিয়া যায় ; পরে ইংরেজরা আসিয়া ওলন্দাজদের স্থান অধিকার করে। ১৭৩৯ সালে মারাঠারা কাড়িয়া লয় সালসেটি ও বেসিন। পোর্তুগীজদের হাতে থাকে কেবল গোয়া, দমন ও দিউ।

পোর্তুগীজ-শক্তির অধঃপতনের কারণ ঃ প্রাচ্যদেশে শেষ অবধি পোর্তুগীজ-শক্তির অধঃপতনের নানা কারণ ছিল। পোর্তুগীজদের মিশ্র বিবাহ-পদ্ধতির ফলে একটি অধঃপতিত জাতির সৃষ্টি হয় ; সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে সকল সামরিক গুণের প্রয়োজন তাহা তাহাদের মধ্যে ছিল না। কেহ কেহ বলেন, প্রথমদিককার পাশ্চাত্ত্য হানাদারদের আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের অধোগতি সম্পাদনের দ্বারা পাশ্চাত্ত্যের হামলাদারির প্রতি প্রাচ্যদেশ বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে। পোর্তুগীজদের শাসন-পদ্ধতিও ছিল 'অদ্ভুতরকমে নিষ্ফল', জামোরিন কিংবা আদিল শাহের শাসন-পদ্ধতি হইতেও নিকৃষ্ট। কর্মচারীদের কোনরূপ নিষ্ঠার বালাই ছিল না, সৈন্যদের পর্যন্ত ব্যক্তিগত

ব্যবসায়ের অধিকার ছিল, দুর্নীতিতে চারিদিক ছাইয়া গিয়াছিল। দুর্নীতি ও অনাচারের ফলেই পোর্তুগীজদের প্রবর্তিত বিধানের কার্যকারিতা বিনষ্ট হইয়া যায়।

পোর্তুগীজদের অধঃপতনের আর-একটি গুরুতর কারণ ছিল তাহাদের ধর্মান্ধতা। ১৫১৭ সালে সন্ত ফ্রান্সিসের (St. Francis) মতানুবর্তী প্রচারকগণ গোয়ায় আসিয়া উপনীত হন। সেখানে হিন্দু-মন্দিরগুলি ধ্বংস করা হয়। ১৫৬০ সালে গোয়ায় স্থাপন করা হয় 'ইন্‌কুইজিশন' (Inquisition), অর্থাৎ অধর্ম উৎসাদনের জন্য (রোমান ক্যাথলিকসম্প্রদায় কর্তৃক প্রবর্তিত) বিচার-ব্যবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইয়া যায় ধর্মমত লইয়া অমানুষিক উৎপীড়ন। গোয়ায় ধর্মযাজকদের যে একাধিপত্য স্থাপিত হয় কেবল তাহাই ছিল প্রাচ্যজগতে পোর্তুগীজ-সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনের পক্ষে যথেষ্ট। মুসলমানদের সঙ্গে ব্যবহারে পোর্তুগীজদের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা, যাহারা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের পর পুনরায় স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করিত তাহাদের জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা, এই সব ব্যাপার হইতে স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে—কেন আরও পূর্বেই পোর্তুগীজ-শক্তির অন্তিম কাল ঘনাইয়া আসে নাই।

বিজয়নগরের পতনের পর বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গোয়ার গুরুত্বহানি ঘটে। পোর্তুগীজদের একচেটিয়া কারবারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে আসিয়া উপস্থিত হয় ওলন্দাজ ও ইংরেজরা। ১৫৮০ সালে স্পেনের সহিত পোর্তুগালের ভাগ্য একসূত্রে জড়িত হইয়া পড়ে। ইউরোপে স্পেনের হইয়া যুদ্ধবিগ্রহ করিবার জন্য নিয়োজিত হয় তাহার নৌবল, তাহার জনশক্তি। প্রথমে ওলন্দাজদের হাতে, তারপর ইংরেজদের হাতে পরাভবের ফলে প্রাচ্য সমুদ্রে পোর্তুগীজদের আধিপত্যহানি ঘটে, তাহাদের নৌশক্তির দৈন্য সে প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করিয়া তোলে মাত্র।

পোর্তুগীজ-শাসনের ফলাফল : পশ্চিম-উপকূলে পোর্তুগীজ-শাসনের সর্বাপেক্ষা গুরুতর রাজনৈতিক ফল ছিল ঐক্যসাধনের দিকে মালাবারের অগ্রগতির পথরোধ। পোর্তুগীজরা না থাকিলে কালিকটের জামোরিন একটিমাত্র রাজ্যসৃষ্টির চেষ্টায় সফলকাম হইতে পারিতেন; কিন্তু পোর্তুগীজরা স্থানীয় দলপতিদের মনোরঞ্জন করিয়া, নিজেদের নৌশক্তিবলে এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলপতিদের সহায়তায় তাঁহার সে চেষ্টা পণ্ড করিয়া

দেয়। পোর্তুগীজদের পরে এই অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করে ওলন্দাজেরা, তাহারাও মালাবারে রাজনৈতিক অনৈক্যের পরিপোষণ করিতে থাকে। ইহারই ফলে পরে মালাবার অতি সহজেই হায়দর আলীর গ্রাসে নিপতিত হয়।

বের্নিয়ে সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালা দেশের পোর্তুগীজদের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, তাহারা ছিল "শুধু নামেই খ্রীস্টান; তাহারা যেভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত তাহা ছিল যার-পর-নাই ঘৃণার্হ, পরস্পরকে হত্যা অথবা বিষপ্রয়োগ করিতে তাহাদের চিত্তে বিবেকের দংশন বা অনুতাপ বোধ হইত না।" 'ফিরিঙ্গীদের' নামের সহিত যে ভীতি ও ঘৃণার ভাব বিজড়িত হইয়া আছে তাহাতে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পোর্তুগীজদের স্থান সম্বন্ধে কিছু উল্লেখমাত্রই প্রায় বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। তবে আকবরের রাজসভায় যে কয়জন জেস্যুইৎ (Jesuit) প্রচারককে প্রেরণ করা হইয়াছিল—১৫৭৯ সালে প্রেরিত হন আকুয়াবিবা (Aquaviva) ও মন্‌সেরাতে (Monserrate), এবং ১৫৯৪ সালে নিমন্ত্রিত হন জেবিয়ের (Xavier) ও পিন্‌হিয়েরো (Pinhiero)—তাঁহারা ছিলেন সাধুসজ্জন, বিদ্বান এবং অনলস ধর্মযাজক, ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাঁহাদের কিছু কিছু দান আছে বটে। মোগল সম্রাট ও তাঁহার সভাসদগণের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই দেখিয়া তাঁহারা নিরাশ হন, তবে মন্‌সেরাতের 'মন্তব্যমালা' (*Commentaries*) এবং জেবিয়েরের পত্রাবলী মোগল যুগের ঐতিহাসিকের কাছে তথ্যসম্পদের খনিস্বরূপ।

শোনা যায় পোর্তুগীজরা তাহাদের উপর তুর্কীদের সমস্ত আক্রমণ সফলতার সহিত প্রতিরোধ করিয়াছিল। "যদিও একথা বিশ্বাস করিবার মতো কোনও লিপিবদ্ধ তথ্যপ্রমাণ আমাদের হাতে নাই যে, তুর্কীরা কখনও ভারতবর্ষে নৌঘাঁটি, এবং তাহার চেয়েও যাহার সম্ভাবনা কম ছিল সেই সামরিক ঘাঁটি, স্থাপনের সঙ্কল্প অন্তরে পোষণ করিত, তবুও একথা বেশ সহজেই মনে করিতে পারা যায় যে, তাহাদের কোন একটি নৌবহর যদি ভারতের উপকূলস্থিত দুর্গসমূহ হইতে পোর্তুগীজদের বহিষ্কার সাধনে সক্ষম হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় শক্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভবতঃ অনন্তকালের জন্য স্থগিত থাকিত।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ

ভারতবর্ষে ওলন্দাজগণ ঃ ওলন্দাজেরা প্রাচ্যের সহিত পোর্তুগীজদের একচেটিয়া কারবার নষ্ট করিবার চেষ্টা আরম্ভ করে ১৫৯৫ সালে। "সমুদ্রের কোন একটি বাঁধ কাটিয়া দিলে যেমন হয়, ওলন্দাজ বণিকশ্রেণীর অবরুদ্ধ উৎসাহ-উদ্যমও যেন তেমন করিয়াই বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিল।" নেদারল্যাণ্ডের ইউনাইটেড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয় ১৬০২ সালে। তাঁহাদের মনোযোগ গিয়া পড়িল স্পাইস দ্বীপপুঞ্জের (Spice Islands) উপর। পোর্তুগীজদের কবল হইতে প্রথম কাড়িয়া লওয়া হয় মলক্কাস। মলক্কা কাড়িয়া লওয়া হয় ১৬৪১ সালে। এইভাবেই ওলন্দাজেরা সুদূর প্রাচ্যের বাণিজ্য করায়ত্ত করে। ১৬৩৮ এবং ১৬৫৮ সালের মধ্যে সিংহল তাহাদের করতলগত হয়। হল্যাণ্ড হইতে প্রেরিত হন কোয়েন নামে একজন নৌ-সেনাপতি ; প্রাচ্যজগতে ওলন্দাজ কাজকারবারের দায়িত্ব গ্রহণে যাঁহারা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বাটাভিয়া শহর স্থাপন করেন এবং প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ হইতে ব্রিটিশদের বহিষ্কার সাধনে সমর্থ হন, আর তাহারই ফলে তাহারা ভারতবর্ষের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে বাধ্য হয়। সুমাত্রা, যাভা ও মলক্কাসে উৎপন্ন লঙ্কা আর মশলাপাতির খুব বেশী চাহিদা ছিল, এ সকল পণ্যের ব্যবসায়ও ছিল সবচেয়ে লাভের কারবার। প্রাচ্যজগতে তাহাদের ক্রিয়াকলাপের প্রথমদিকেই ওলন্দাজেরা এক ভুল করিয়া বসে ; ভারতবর্ষের পরিবর্তে তাহারা বাছিয়া লয় প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ। প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জকে যথার্থই 'জগতের উপর কর্তৃত্ব লাভের রাজপথ হইতে ভুলাইয়া পথভ্রষ্ট করিবার একটি পার্শ্ববর্তী গলিপথ' রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অচিরেই ওলন্দাজেরা দেখিতে পাইল লঙ্কা আর মশলাপাতির জন্য অর্থব্যয় করা সুবিধার ব্যাপার নয়, তাহাদের চোখে পড়িল মালয় দ্বীপমালায় গুজরাট ও করমণ্ডল উপকূল হইতে চালানি কার্পাসদ্রব্যের বিপুল চাহিদা রহিয়াছে। তাহারা স্থির করিল আরব ও ভারতীয় বণিকদের হাত

হইতে এই কারবার কাড়িয়া লইয়া আমদানি কার্পাসদ্রব্য দিয়া লঙ্কা আর মশলাপাতির মূল্য শোধ করিবে। মালয় দ্বীপমালায় নিরাপদে ঘাঁটি গাড়িয়া বসিয়া ওলন্দাজেরা মালাবার হইতে পোর্তুগীজদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ফেলিল ; তাহাদের হাতে আসিল কুইলোন, ক্রাঙ্গানোর ও কোচিন ; এ অঞ্চলে পোর্তুগীজদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তাহা এখন গিয়া বর্তিল তাহাদেরই উপর। ভ্যান গোয়েনস্ (Van Goens) ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের সর্বত্র পোর্তুগীজ-শক্তির ধ্বংস সাধন করেন ; তাঁহার অধীনে নেগাপত্তম (নাগাপত্তন) হইয়া উঠে ভারতে ওলন্দাজদের প্রধান ঘাঁটি।

"ওলন্দাজদের নৌশক্তি তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের হতাশার কারণ হইলেও, তাহাদের মনে প্রায়ই ইংরেজদের প্রতি ঈর্ষ্যার ভাব দেখা দিত ; কারণ নৌবহর ও দুর্গাদি রক্ষার এবং সৈন্যদের পুষিবার জন্য যে বিপুল ব্যয়ভার বহনের প্রয়োজন তাহাতে ওলন্দাজ কোম্পানীর আয়ব্যয়ের হিসাব ভারাক্রান্ত হইয়া থাকিত, কিন্তু এ সব বাদ দিয়াই ইংরেজরা দিব্য ব্যবসায় চালাইয়া যাইতে পারিতেছিল।" সমগ্র অষ্টাদশ শতক ব্যাপিয়া ওলন্দাজ কোম্পানীর ব্যয়ভার বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। ইংরেজরা শুরু করিল 'সুবিজ্ঞ ওলন্দাজদের' জোরজবরদস্তির পন্থা অনুকরণের চেষ্টা। প্রথমদিকে তাহারা সাফল্য লাভ করিতে পারিল না। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি আমরা দেখিতে পাই ওলন্দাজ নৌবহর অযত্নে পড়িয়া আছে, আর ব্রিটিশ ও ফরাসীদের শক্তি-বৃদ্ধি ঘটিতেছে। বাঙ্গালা দেশে ক্লাইভের সাফল্য লাভের পর ওলন্দাজেরা তাহাদের অবস্থার উন্নতি বিধানে তৎপর হইয়া উঠে। ১৭৫৯ সালে বিদেরায় তাহারা অকৃতকার্য হয় ; তাহাদের নৌবহর হুগলী নদীর উজান বাহিয়া আসিলে তাহা বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া হয়। ১৭৮১ সালে ওলন্দাজেরা আবার ব্রিটিশদের ক্ষেপাইয়া তোলে, ফলে নাগাপত্তন এবং সিংহলের ত্রিঙ্কোমালী বন্দর তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। পরে তাহারা তাহাদের মিত্রশক্তি ফরাসীদের সহায়তায় ত্রিঙ্কোমালী পুনরুদ্ধার করে। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিলে, চিরকালের মতো তাহাদের নাগাপত্তন হারাইতে হয়। ভারতবর্ষে ওলন্দাজদের পক্ষে আর ইংরেজদের মারাত্মক প্রতিযোগী হইয়া উঠিবার কোন উপায় থাকে না।

ভারতে ফরাসীগণ (১৬৬৪—১৭৪০)ঃ ফরাসীরা বড়ই বিলম্বে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপনীত হয়। ফরাসীদের আগমনের পূর্বেই ইংরেজ এবং

দিনেমারগণ (Danes) ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিয়াছিল। ১৬৬৪ সালে গঠিত হয় ফরাসীদের ভারতীয় কোম্পানী। ফরাসী বণিক-সম্প্রদায়ের কিন্তু উৎসাহ-উদ্যমের অভাব ছিল, কোলবার্টের (Colbert) উৎসাহ-উদ্যমেও ফরাসীদের এই নূতন প্রচেষ্টা সাফল্যের পথে অগ্রসর হইল না। ১৬৭৩ সালে পন্দিচেরীর পত্তন হইল। ফ্রাঁকোয়া মার্টিনের উৎসাহ, যোগ্যতা এবং সাহসের ফলে উহার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে ; শেষ অবধি উহাই হইয়া দাঁড়ায় ভারতবর্ষে ফরাসী বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির রাজধানী। কিন্তু ১৬৯৭ সালের পূর্বে ভারতবর্ষে ফরাসী কোম্পানীর ক্রিয়াকলাপ প্রকট হইয়া উঠিতে দেখা যায় নাই। তাহাদের সুরাটের কুঠিও তখন যেন আচ্ছন্ন ভাব কাটাইয়া জাগিয়া উঠে। তাহাদের মসুলিপত্তন, কালিকট, মাহে, কারিকল ও চন্দননগরের কুঠিগুলিতে বেশ ব্যবসায়ের সাড়া পড়িয়া যায়, তবে ১৭৪০ সালে অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধের (War of Austrian Succession) পূর্বে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ব্যাপার ঘটে নাই।

ভারতবর্ষে দিনেমার ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি : দিনেমারদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয় ১৬১৬ সালে। ১৬২০ সালে তাহারা ত্রাঙ্কুবারে এবং ১৭৫৫ সালে শ্রীরামপুরে কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহারা কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজ করিতে পারে নাই। ১৮৪৫ সালে তাহাদের কুঠি কয়টি ব্রিটিশদের কাছে বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়।

১৭২৩ সালে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্লান্দার্সের এক বণিকসঙ্ঘকে একটি ব্যবসায়ের সনদ মঞ্জুর করেন। উহার নাম হয় অস্টেণ্ড কোম্পানী (Ostend Company)। ১৭৩১ সালে উহার বিলোপ সাধন করা হয়। ১৭৫৫ সালে আর একটি অষ্ট্রিয়ান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠনের চেষ্টা হয়। কিছু উঠতি-পড়তির পর এসব পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইয়া যায়।

ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (১৬০০-১৭৪০) : ১৬০০ সালে রাণী এলিজাবেথ "ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসায়ে রত লণ্ডনের বণিকসঙ্ঘ" ("The Governor and Company of Merchants of London trading into the Indies") এই নামে বর্ণিত একদল ইংরেজ ব্যবসায়ীকে ১৫ বৎসরের জন্য উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে মাজেলান প্রণালী অবধি ইংলণ্ডের

ব্যবসায়-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার মঞ্জুর করেন। এই কোম্পানীই সাধারণের নিকট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে পরিচিত। জেমস ল্যাঙ্কাস্টারের অধীনে প্রথম ও দ্বিতীয়বার সমুদ্রযাত্রা হয় স্পাইস দ্বীপপুঞ্জে; যাঁহারা ব্যয়ভার বহন করেন, লাভের অংশও তাঁহারাই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লন। তৃতীয় বার সাগর পাড়ি দিয়া একখানি জাহাজ স্থরাটে আসিয়া হাজির হয়; সেখানে কিছু কারবার চলে। জাহাজখানির কাপ্তেন উইলিয়ম হকিন্স তুর্কী ভাষায় কথাবার্তা বলিতে পারিতেন, ১ম জেমসের একখানি পত্র লইয়া তিনি আসিয়া জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কিছুকাল (১৬০৯-১১) মোগল দরবারে থাকিতে দেওয়া হয়; কিন্তু দরবারে পোর্তুগীজদের অন্ততঃ এটুকু ক্ষমতা ছিল যাহাতে মোগল বন্দরগুলিতে ইংরেজদের ব্যবসায়ের অধিকার লাভ হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে। ১৬১২ সালে টমাস বেস্ট-এর অধীনে দুইখানি জাহাজ স্থরাটের অনতিদূরে পোর্তুগীজদের এক নৌবহরকে পরাভূত করিতে সক্ষম হয়। ইহাতে ইংরেজদের মর্যাদা বাড়িয়া যায়। ১৬১৩ সালে এক বাদশাহী ফর্মান মঞ্জুর করা হয়, এবং স্থরাটে একটি স্থায়ী ব্রিটিশ কুঠির পত্তন ঘটে। ১৬১৫ সালে স্থরাটের অদূরে ইংরেজরা পোর্তুগীজদের সহিত আর একটি জলযুদ্ধে জয়লাভ করে। এ পর্যন্ত ব্রিটিশরা খুব সামান্য মালপত্রই দেশে আনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু পোর্তুগীজদের ব্যবসায় বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছিল।

স্যার টমাস রো (Sir Thomas Roe) যখন ১ম জেমস-এর পরিচয়পত্রাদি বহন করিয়া রাজদূতরূপে মোগল দরবারে আসিয়া উপনীত হন তখনও ব্রিটিশ বণিকদের অবস্থা টলমল করিতেছিল। তিনি তিন বৎসর মোগল দরবারে ছিলেন। বঙ্গদেশ ও সিন্ধুতে ব্যবসায়ের কোন স্থবিধা তিনি লাভ করিতে পারিলেন না, তবে তাঁহাকে গুজরাটে ব্যবসায় করিবার স্থযোগ দান করা হয়। স্থরাটের কুঠিয়ালের অধীনে আগ্রা, আহমদাবাদ ও বরোচে ইংরেজরা কুঠি স্থাপন করে, স্থরাটের কুঠিয়ালের পদবী হয় 'প্রেসিডেন্ট'। ১৬২২ সালে ব্রিটিশরা ওরমুজ অধিকার করে, ফলে প্রাচ্য সমুদ্রে পোর্তুগীজদের যথেষ্ট ক্ষমতাহানি ঘটে। ১৬১৬ সালে মস্থলিপত্তনে একটি এবং ১৬২৬ সালে (পুলিকটের উত্তরে) আর্মাগাঁওয়ে আর-একটি কুঠি স্থাপন

করা হয়। মোগল রাজপুরুষেরা পোর্তুগীজদের প্রতিবন্ধস্বরূপ ইংরেজ ও ওলন্দাজদের সাদরে গ্রহণ করিতে থাকেন। কিন্তু এই দুই প্রোটেস্ট্যাণ্ট শক্তির মধ্যে কোনরূপ সহযোগিতার ভাব গড়িয়া উঠিতে পারে নাই; সামান্য যেটুকু সহযোগিতা ছিল তাহাও ১৬২৩ সালে বিখ্যাত "আম্বোয়নার হত্যাকাণ্ডে" দুর্গ অধিকারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে এক বিধিবহির্ভূত বিচারকার্যের ফলে দশজন ইংরেজের প্রাণদণ্ডের পর বিনষ্ট হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, ১৬৩৫ সালে ইংরেজ ও পোর্তুগীজদের মধ্যে হয় যুদ্ধবিরতির এক চুক্তি, তারপর ১৬৪২ সালে ইঙ্গ-পোর্তুগীজ সন্ধির ফলে পূর্বের এই দুই শত্রুর মধ্যে স্পষ্টতঃই গড়িয়া উঠে এক সম্প্রীতির ভাব।

এই ইঙ্গ-পোর্তুগীজ মৈত্রীর একটি প্রত্যক্ষ ফল হইল পোর্তুগীজদের সেণ্ট তোম দুর্গের সন্নিকটে মাদ্রাজে ইংরেজদের এক বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন। চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে জমির ইজারা লওয়া হয়। এই নূতন বাণিজ্যকেন্দ্রের নাম হয় ফোর্ট সেণ্ট জর্জ। মসুলিপত্তনকে ছাড়াইয়া করমণ্ডল উপকূলে ইহাই হইয়া উঠে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান ঘাঁটি। মহানদীর বদ্বীপে হরিহরপুরে কুঠি স্থাপন করা হয়; বাঙ্গালা দেশের রেশম, চিনি, আর সোরা সংগ্রহ করার জন্য হুগলী, পাটনা এবং কাশিমবাজারেও পৃথক পৃথক কুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৩০-৩১ সালে দেখা দেয় এক নিদারুণ দুর্ভিক্ষ; গুজরাট, আহমদনগর, বিজাপুর এবং গোলকোণ্ডা উহার কবলিত হইয়া পড়ে। অনাহারে মারা যায় হাজার হাজার লোক, অনেকে আত্ম-হত্যা করে, কেহ কেহ নরমাংস ভোজন শুরু করিয়া দেয়। এই বিপৎপাতের ফল স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়। সুরাট বন্দর হইতে রপ্তানী করিবার মতো কার্পাসবস্ত্র জনশূন্য গুজরাটে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তাঁতিরা 'মরিয়া নয় পলাইয়া' গিয়াছিল। কার্পাসবস্ত্রের ব্যবসায় তাই গুজরাট হইতে মাদ্রাজে স্থানান্তরিত হয়। ইহার উপর আবার প্রতীচ্য দ্বীপপুঞ্জের প্রতিযোগিতার ফলে সুরাট বন্দরের অন্যতম রপ্তানী-মাল নীল ইউরোপের বাজার হইতে হটিয়া যায়। এইভাবে ইউরোপীয়দের কাজকারবার ভারতের পশ্চিমাঞ্চল হইতে পূর্বাঞ্চলে সরিয়া আসে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নানারূপ আভ্যন্তরীণ গোলমাল ছিল। ১৬৩৭ সালে ইংলণ্ডে কোর্টেনের অ্যাসোসিয়েশন (Courten's Association)

নামে একটি প্রতিযোগী সংস্থা গঠিত হয়। রাজা ১ম চার্লসের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের ফলে উহা একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়সঙ্ঘ রূপে বাড়িয়া উঠে। রাজাপুর, ভাটকল এবং কারওয়ারে ইহার কুঠি স্থাপিত হয়, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না, অচিরেই উহা উঠিয়া গিয়া পুরাতন কোম্পানীর উদ্বেগের অবসান ঘটায়। ১৬০৯ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শনদ নূতন করিয়া মঞ্জুর করা হয়, তিন বৎসর পরে নোটিশ দিয়া রদ করিতে পারা যাইবে এই কড়ারে কোম্পানী অনির্দিষ্ট কালের জন্য সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার লাভ করে। কিন্তু কোর্টেনের অ্যাসোসিয়েশন গঠনের ফলে কারবারের যে একচেটিয়া অধিকার একবার ভঙ্গ হইয়াছিল, তাহা এত সহজে ফিরিয়া পাওয়ার বস্তু ছিল না। আস্‌সাদা কোম্পানী (Assada Company) নামে আর-একটি নূতন বণিকসঙ্ঘ মাদাগাস্কার দ্বীপের আস্‌সাদা এবং ভারতীয় উপকূলের কোথাও কোথাও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করে। কিন্তু এই নূতন প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৬৫৭ সালে ক্রমওয়েল চলতি কোম্পানীকেই একটি একচেটিয়া শনদ মঞ্জুর করেন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রাজপদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে উহা অবৈধ হইয়া যায়। কিন্তু রাজা ২য় চার্লস একটি নূতন শনদ মঞ্জুর করেন। ১৬৯৫ সালে একটি স্কটিশ কোম্পানী খুলিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৬৯৮ সালে যখন "প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসায়ে রত ইংরেজ কোম্পানী" (The English Company Trading to the East Indies) নামে একটি নূতন কোম্পানীকে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দান করিয়া, পুরাতন চল্‌তি কোম্পানীকে শুধু তিন বৎসরের নোটিশের মেয়াদ অবধি কারবার চালাইবার সুযোগ দেওয়া হয়, তখন পুরাতন কোম্পানীর অবস্থা বাস্তবিকই ভয়ের কারণ হইয়া উঠে। নানা প্রকারের জটিলতা দেখা দেয়। পুরাতন কোম্পানী এবং নূতন কোম্পানী একে অন্যের পথের কণ্টক হইয়া উঠে। অতএব ১৭০২ সালে "প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসায়ে রত ইংলণ্ডের বণিককুলের সংযুক্ত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান" (The United Company of Merchants of England Trading to the East Indies) নামে কোম্পানী দু'টি একীভূত হইয়া যায়। দুই কোম্পানীর অংশ সমভাবে ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া লওয়া হয়, এবং ১৭০৮ সালে ইংলণ্ডের তৎকালীন

প্রভাবশালী মন্ত্রী গোডোল্‌ফিনের (Godolphin) সালিশীর ফলে দুই কোম্পানীর একীভবন পূর্ণতা লাভ করে।

এই সকল গোলযোগ সত্ত্বেও প্রাচ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ছিল। কিন্তু কোম্পানীর কেরাণী (writers), কুঠিয়াল (factors), নূতন বণিক (junior merchants) ও প্রবীণ বণিক (senior merchants), সকল স্তরের কর্মচারীদেরই বেতন ছিল এতই সামান্য যে তাহা হাসির উদ্রেক করিত ; তবে কর্মচারীদের সকলেরই ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবসায় করিবার অধিকার ছিল। ফলে তাহারা কোম্পানীর কারবারের মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। তাহাদের কারবার বন্ধ করিয়া দেওয়ারও কোন উপায় ছিল না, কেননা প্রয়োজন হইলে তাহারা ভারতীয় বণিকদের নামেই কারবার চালাইতে পারিত। তাই কোম্পানী বন্দর হইতে বন্দরে মাল আমদানী-রপ্তানীর কারবার বন্ধ করিয়া দিয়া হাতে রাখিল কেবল ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে সরাসরি ব্যবসায় চালাইবার ভার। ভারতবর্ষের উত্তরভাগে যে সব কুঠি ছিল সেগুলি ছাড়িয়া দেওয়া হইল ; কোম্পানীর কাজকারবার নিবদ্ধ রহিল স্থরাট, মাদ্রাজ, আর হুগলীতে।

পোর্তুগালের রাজকুমারী ক্যাথেরিন অব ব্রাগাঞ্জা ২য় চার্লসের রাণী হইয়া আসেন ; তাঁহার বিবাহের যৌতুকের অংশস্বরূপ ১৬৬১ সালে লাভ হয় বোম্বাই দ্বীপটি। রাজা তাহা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে সমর্পণ করেন। জেরাল্ড ঔঞ্জিয়ার (Gerald Aungier) ছিলেন স্থরাটের প্রেসিডেণ্ট আর বোম্বাইয়ের গভর্নর (১৬৬৯-৭৭) ; তিনি বাণিজ্যকেন্দ্রটি গড়িয়া তোলেন। ১৬৮৭ সালে স্থরাটের স্থলে উহাই হইয়া দাঁড়ায় ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি। ১৬৮৬ সালের দিকে ইংলণ্ডে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর প্রধান স্যর জোশিয়া চাইল্ড (Sir Josiah Child) কারবারের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে স্থানীয় রাজপুরুষদের মনস্তুষ্টি বিধানের জন্য কঠিন প্রয়াসের পরিবর্তে ওলন্দাজদের অনুকরণে বজ্রমুষ্টি প্রসারণের পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন স্থির করেন। কিন্তু "চিরদিনের মতো ভারতবর্ষে ইংরেজ জাতির ব্যাপক, সুদৃঢ় ও অবিচলিত আধিপত্যের ভিত্তিস্বরূপ শাসনগত ও সামরিক শক্তি সংস্থাপনের এবং এতদুভয় সংরক্ষণের উপযুক্ত বিপুল রাজস্ব সৃষ্টি ও সংগ্রহের জন্য"

তাঁহার প্রচেষ্টা মারাত্মক ভাবে ব্যর্থ হইয়া যায়। চট্টগ্রাম অধিকারের এক নিষ্ফল চেষ্টা হয়। পশ্চিমাঞ্চলেও সেখানকার জাহাজগুলি আটক করা হয়। প্রত্যুত্তরে মোগল বাহিনী বোম্বাই অবরোধ করে। হুগলী হইতেও ইংরেজদের পলায়ন ছাড়া গতি থাকে না। মোগল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদ মিটে ১৬৯০ সালে। ইংরেজরা দীনভাবে নতিস্বীকার করে; একটি শর্ত হয় বোম্বাইয়ের গভর্নর স্যর জন চাইল্ডকে পদচ্যুত করিতে হইবে, কেননা তিনিই মোগলদের কতকগুলি পণ্যসম্পদপূর্ণ জাহাজ আটক করিয়াছিলেন। আলাপ-আলোচনা শেষ হইবার পূর্বেই স্যর জন চাইল্ড মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বঙ্গদেশে ব্যর্থতার পর ইংরেজরা মাদ্রাজে আসিয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের নায়ক জব চার্নককে (Job Charnock) মোগল সুবাদার বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন। ১৬৯০ সালে ফিরিয়া আসিয়া একটি নিকৃষ্টস্থানে তিনি কলিকাতা শহরের পত্তন করেন। এক বাদশাহী ফরমানের বলে পুনরায় পুরাতন সুযোগ-সুবিধা ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনাটির কিপলিং (Kipling) যে বর্ণনা দান করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত নয়:

> "বর্ষ দুইশত পূর্বে একদা আসিল বণিক
> বিনম্র সুজন,
> নম্র পদক্ষেপ তার ক্ষান্ত হ'ল যেথা,
> স্থিতিলাভ করিল সে সেথা,
> পরিশেষে সামান্য সে ব্যবসায় তার
> লভিল যে সাম্রাজ্যের বিপুল আকার—"

১৭১৪ সালে জন সুরম্যানের (John Surman) নেতৃত্বে দিল্লীতে একদল দূত প্রেরণ করা হয়; উদ্দেশ্য—তিনটি প্রদেশেই ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা লাভের চেষ্টা করা। দীর্ঘকাল আলাপ-আলোচনার পর ১৭১৭ সালে তিনখানি বাদশাহী ফরমান মঞ্জুর হয়; সে কয়খানিই কোম্পানীর ব্যবসায়ের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া উঠে। বার্ষিক ৩,০০০ টাকা নজরানা দানের বিনিময়ে বাঙ্গলা দেশে বিনা শুল্কে ব্যবসায়ের অধিকার দেওয়া হয়। মাদ্রাজের জন্য যে খাজনা দেওয়া হইত তাহারই বিনিময়ে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দাক্ষিণাত্যেরও সর্বত্র শুল্ক প্রদানের দায় হইতে

মুক্তি দেওয়া হয়। সুরাটে যাবতীয় শুল্ক বাবদ দেওয়া স্থির হয় এককালীন ১০,০০০ টাকা। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল, অচিরেই কোম্পানীকে নূতন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া নূতন নূতন কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিযোগিতা

কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধ (১৭৪৬-৪৮) ঃ ১৭৪০ সালে ইউরোপে বাধিয়া যায় অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ; ১৭৪৬ সালে তাহা ভারতবর্ষেও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সে যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ছিল দুই বিপরীত পক্ষে। তখন পন্দিচেরীতে ফরাসী গভর্নর ছিলেন জোসেফ ফ্রান্সিস ডুপ্লে (Joseph Francis Dupleix)। ইতিপূর্বেই তিনি প্রভূত সংগঠনক্ষমতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। ফরাসী অধিকৃত মরিশিয়াস দ্বীপের (অথবা ফ্রান্সের দ্বীপের) গভর্নর ছিলেন মাহে দ্য লা বুর্দোনে (Mahe de La Bourdonnais); তিনি ছিলেন অসম্ভব ফিকিরবাজ লোক, উৎসাহ-উদ্যমের অবতার। পোতাশ্রয় (পোর্ট লুই) সমেত মরিশিয়াস দ্বীপটিকে তিনি ভারত মহাসাগরে একটি সুদৃঢ় শক্তিকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেলে, লা বুর্দোনে তাঁহার নৌবহর লইয়া করমণ্ডল উপকূলে আসিয়া হাজির হইলেন। ইংরেজদের নৌবহর ছিল পেটন নামে নিরুদ্যম প্রকৃতির এক নাবিকের অধীনে। এক জলযুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত থাকিয়া যায়, কিন্তু তিনি নৌবহর লইয়া সিংহলে চলিয়া যান; কিছুকাল পরে তিনি ফিরিয়া আসেন বটে, কিন্তু ভয় পাইয়া হুগলীতে চলিয়া যান। লা বুর্দোনে তাঁহার নৌবহর এবং পন্দিচেরী হইতে কিছু সৈন্য লইয়া একেবারে মাদ্রাজের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। ক্ষীণবীর্যের ন্যায় মাদ্রাজ আত্মসমর্পণ করে (১৭৪৬)। তিনি ক্ষতিপূরণের

বিনিময়েই স্থানটি প্রত্যর্পণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু ডুপ্লে তাহাতে সম্মত হইলেন না, ১৭৪৯ সাল অবধি স্থানটি তিনি মাদ্রাজ অধিকার করিয়াই বসিয়া রহিলেন। ১৭৪৬ সালে এক ঝড়ে লা বুর্দোনের নৌবহর পঙ্গু হইয়া পড়িল, তিনি নৌবহর লইয়া চলিয়া গেলেন।

১৭৪৩ সালে নিজাম-উল-মুল্ক নবাব আনোয়ারউদ্দীনকে কর্ণাটকের শাসকপদে নিয়োগ করিয়াছিলেন; তাঁহারই রাজ্যে এই সব কাণ্ডকারখানা ঘটিতেছে দেখিয়া তিনি নিশ্চেষ্ট দর্শক মাত্র সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার বিনা অনুমতিতে মাদ্রাজ দখল করা হইয়াছে বলিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মাদ্রাজের ফরাসীরা আর্কট-বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদিগকে সেন্ট তোমে (St. Thome) হটিয়া যাইতে বাধ্য করিল। তারপর পারাদিসের (Paradis) অধীনে নববলে বলীয়ান ক্ষুদ্র একটি সৈন্যদল অগ্রসর হইয়া আসিয়া আর্কট-বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়া সেন্ট তোমের পথ পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। ফরাসীদের পক্ষে এত সহজে জয়লাভ করা কৌতুকেরই বিষয় ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই ব্যাপারটিকে ন্যায্যতঃই একটি চূড়ান্ত ঘটনারূপে বিবেচনা করা হইয়া থাকে। ওর্ম (Orme) নামে একজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন, "কোন ইউরোপীয় জাতির পক্ষে মোগলের সামরিক কর্মচারীদের সহিত যুদ্ধে ঠিকমতো আঁটিয়া উঠিবার পর তখন এক শতাব্দীর উপর কাটিয়া গিয়াছে। পূর্বেকার নানা ব্যর্থ প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা এবং সব কয়টি উপনিবেশেই দীর্ঘকাল অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে অনভ্যস্ত থাকার ফলে সামরিক ক্ষমতার দৈন্য হইতে তাহাদের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, প্রতিপক্ষরূপে মূরেরা ছিল এক দুর্ধর্ষ সাহসী জাতি; এমন সময় একটি সমগ্র বাহিনীকে একটিমাত্র সৈন্যদলের সহায়তায় পরাভূত করিয়া তৎক্ষণাৎ ফরাসীরা সেই ভীতিপূর্ণ বিশ্বাসের মোহবন্ধ নাশ করিয়া ফেলিল।" ভারতবর্ষে অশ্বারোহী সৈন্যদের যে যুদ্ধকৌশল গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা রণক্ষেত্রে সুনিয়ন্ত্রিত গোলন্দাজ-বাহিনীর সম্মুখে কোন কাজে লাগিত না; আর পদাতিক বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া না পড়িলে এবং গুলিবর্ষণের ক্ষমতা অটুট রাখিতে পারিলে, অশ্বারোহী সৈন্যদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইত। সাগরবক্ষে সর্বদাই

ছিল ইউরোপীয়দের অবিসংবাদিত প্রাধান্য ; এবার স্থলভাগেও ইউরোপীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব দেখা দিল। প্রসঙ্গতঃ এ বিষয়টি লক্ষ্য করা উচিত যে, সেণ্ট তোমের ফরাসী-বাহিনী কেবল ইউরোপীয়দের লইয়াই গঠিত ছিল না, তাহাতে সিপাহীদেরও কয়েকটি দল—অর্থাৎ ইউরোপীয়দের দ্বারা যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত ভারতীয় পদাতিকও—ছিল।

ডুপ্লে ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড অধিকার করিতে পারিলেন না, তবে পন্দিচেরীতে ইংরেজদের নৌবহরের এক আক্রমণ প্রতিহত করিয়া দিলেন (১৭৪৮)। আয়-লা-শাপেলের সন্ধির (১৭৪৮) সংবাদ যখন ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিল, তখন ইংরেজদের মাদ্রাজ ফিরাইয়া দেওয়া হইল (১৭৪৯)। তাহারা এখন সন্ধির শর্ত অনুসারে উহা ফিরিয়া পাইল বলিয়া, পূর্বে স্বাধীন-ভাবে ভোগদখলের বিনিময়ে কর্ণাটকের নবাবকে বার্ষিক ১,২০০ প্যাগোডার যে কর দিত তাহা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে কর্ণাটকের এই প্রথম যুদ্ধের দৃশ্যতঃ কোন গুরুত্ব ছিল না বটে, কিন্তু ইহারই ফলে 'ডুপ্লে যে মহতী পরিকল্পনা রচনা করিতে থাকেন তাহা কার্যে পরিণত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া উঠে'।

কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৭৪৯-৫৪)ঃ মাদ্রাজের গভর্নর এবং পন্দিচেরীর গভর্নর দু'জনের হাতেই এখন বিস্তর বাড়তি সৈন্য আসিয়া জুটিল ; সমুদ্রযাত্রার মরশুম না পড়া পর্যন্ত তাঁহারা তাহাদের দেশে পাঠাইয়া দিতেও পারেন না। তাই খরচ বাঁচাইবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহাদের কোন ভারতীয় রাজারাজড়ার কাজে ঢুকাইয়া দেওয়া যায় কি না। মাদ্রাজের গভর্নর ফ্লয়ার তাঞ্জোরের সিংহাসনের দাবীদারের পক্ষ লইয়া দেবী কোট্টাই ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অধিকার করিয়া বসিলেন। ডুপ্লের পরিকল্পনা ছিল আরও দূরপ্রসারী, ইউরোপস্থিত কর্তৃপক্ষের সমর্থন ব্যতিরেকেই ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানীর প্রতিনিধিদের মধ্যে শেষ অবধি এক বে-সরকারী যুদ্ধ বাধাইয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

১৭৪৮ সালে নিজাম-উল-মুল্কের মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তখন দিল্লীতে বাদশাহী রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয়ের চেষ্টায় ব্যস্ত। হায়দরাবাদের তক্তে বসিলেন মধ্যম পুত্র নাসির জঙ্গ। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মুজফ্‌ফর জঙ্গ তাঁহার দাবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। এদিকে আর্কটের

নবাবীরও একজন দাবীদারের আবির্ভাব হইল ; তিনি ছিলেন কর্ণাটকের পরলোকগত নবাব দোস্ত আলীর জামাতা চাঁদা সাহেব। দোস্ত আলী ১৭৪০ সালে মারাঠাদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। চাঁদা সাহেবকে বন্দী করিয়া পুনায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সাত বৎসর পরে তাঁহাকে মুক্তিদান করা হয়। পারিবারিক বিষয়সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় তিনি আসিয়া মুজফ্‌ফর জঙ্গের সঙ্গে কাজ করিতে থাকেন। ডুপ্লে স্থির করিলেন তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদারীর জন্য মুজফ্‌ফর জঙ্গের এবং আর্কটের নবাবীর জন্য চাঁদা সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিবেন।

ফরাসীরা তাহাদের মিত্রপক্ষে যোগ দিয়া ভেলোরের নিকটে অম্বুরের যুদ্ধে আনওয়ারউদ্দীনকে পরাভূত ও নিহত করে (১৭৪৯); তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মাহ্‌ফুজ খাঁ বন্দী হন, মধ্যমপুত্র মহম্মদ আলী পলায়ন করিয়া ত্রিচিনোপল্লীতে গিয়া আশ্রয় লন। সেখানে বসিয়া তিনি চাঁদা সাহেব ও তাঁহার মিত্রপক্ষকে বাধাদানের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। তাঁহাকে সাহায্য করিতে থাকে ব্রিটিশেরা, কেননা তাহাদের মনে হয় ফরাসীদের প্রভাব আর বাড়িতে দেওয়া ঠিক হইবে না। এই সব ব্যাপারের নিষ্পত্তি এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের দাবী বাতিল করিবার জন্য নাসির জঙ্গ কর্ণাটকে আসিয়া উপনীত হন। কিছু ইংরেজ সৈন্য আসিয়া তাঁহার পক্ষে যোগ দেয়; মুজফ্‌ফর জঙ্গের বিরুদ্ধাচরণের শেষ হয়, তিনি তাঁহার পিতৃব্যের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। নাসির জঙ্গ আর্কটে বৃথা আমোদ-প্রমোদে কালহরণ করিতেছেন, সেই অবসরে ডুপ্লে যাবতীয় আয়োজন সমাপ্ত করিয়া ফেলিলেন। বুসী (Bussy) আসিয়া জিঞ্জি অধিকার করিয়া বসিলেন। তখন ফরাসীদের সম্মুখীন হইবার জন্য নাসির জঙ্গকে আর্কট ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতে হইল। ১৭৫০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ভেলিমাডুপেতের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি যখন শত্রুর সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন তখন ডুপ্লের সহিত যোগসাজসে রত কুদ্দাপার বিশ্বাসঘাতক পাঠান নবাব রণক্ষেত্রেই তাঁহাকে হত্যা করেন। নাসির জঙ্গের শিবির লুণ্ঠন করিয়া ফরাসীরা এমনই অপরিমেয় ধনসম্পদ লাভ করিল যে "সচিব হইতে কেরানী, ক্যাপ্টেন হইতে সাধারণ সৈনিক, প্রত্যেকেই ভাগ পাইল, এবং সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা পরে আসিয়া কাজে যোগদান করেন তাঁহারা সখেদে সেই সুখের দিনের

কথা ভাবিতেন যখন সামান্য এক-একজন পতাকাধারীর ভাগেও পড়িয়াছিল ৬০,০০০ টাকা। ইহার পূর্বে পন্দিচেরীতে কখনও এত স্বর্ণসম্ভার চোখে পড়ে নাই। উহার তুলনা হইত শুধু পলাশীর খাঁটি লাভের সঙ্গে।" মুজফ্ফর জঙ্গকে তাঁহার মৃত পিতৃব্যের স্থলে সুবাদার ঘোষণা করা হইল। বুসীর সঙ্গে একদল ফরাসী দেহরক্ষী লইয়া তিনি উত্তরদিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু পথিমধ্যেই ১৭৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আততায়ীর হস্তে তাঁহার প্রাণ গেল। তখন সিংহাসনে স্থাপন করা হইল নিজাম-উল-মুল্কের তৃতীয় পুত্র সলাবৎ জঙ্গকে। বুসী তাঁহার ৯০০ ইউরোপীয় সৈন্য এবং ৪,০০০ সিপাহী লইয়া হায়দরাবাদেই রহিয়া গেলেন। তিনি ছিলেন আজন্ম কূটনীতিক, মনোরঞ্জনে উৎসুক অথচ দৃঢ়চেতা; ১৭৫৮ সালে লালী (Lally) তাঁহাকে ফিরাইয়া না আনা অবধি তিনি হায়দরাবাদেই প্রতিপত্তির সহিত বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার সৈন্যদলের ব্যয়ভার বহনের জন্য তাঁহাকে মঞ্জুর করা হয় চারিটি সরকার—মুস্তাফানগরের উপকূলীয় অঞ্চল, এলোর, রাজমহেন্দ্রী ও চিকাকোল। এইভাবে বুসীর দক্ষতা ও সুবিবেচনার ফলে দাক্ষিণাত্যে ডুপ্লের কর্মনীতি বিশেষ সাফল্য অর্জন করে।

কিন্তু সৈন্যদলের ভাগাভাগি ডুপ্লের পরিকল্পনার পক্ষে কাল হইয়া দাঁড়াইল। "যদিও তিনি দাক্ষিণাত্যে অভূতপূর্ব গৌরব এবং প্রায় অবিশ্বাস্য রাজ্যখণ্ডের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তবুও কর্ণাটক অধিকারের ক্ষমতা হইতে তিনি বঞ্চিত হন, এবং উহাই ইংরেজদের সেই ভাঙ্গন ধরাইবার সময় ও সুযোগ দান করে যাহার ফলে তাহারা সমগ্র সৌধটি ভূমিসাৎ করিয়া দেয়।" মাদ্রাজে এখন আসেন এক নূতন গভর্নর—এক স্বল্পবাক, বলশালী, কর্মিষ্ঠ ব্যক্তি। ১৭৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সণ্ডার্স (Saunders) নিযুক্ত হন, তিনি স্থির করেন ত্রিচিনোপল্লীতে মহম্মদ আলীকে বাধাদানে উৎসাহিত করিবেন। ১৭৫১ হইতে ১৭৫৪ অবধি দুই কোম্পানী কর্ণাটকে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে থাকে, শেষ অবধি ইংরেজরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হয়। ফরাসীরা ত্রিচিনোপল্লী অবরোধ করিয়াই বসিয়া থাকে (১৭৫১)। মহম্মদ আলী তখন চাঁদা সাহেবের রাজধানী আর্কট আক্রমণের প্রস্তাব করেন। সণ্ডার্স সে কাজের ভার অর্পণ করেন কোম্পানীর বে-সামরিক বিভাগের রবার্ট ক্লাইভের উপর; মেজর ষ্ট্রিঙ্গার লরেন্সের (Stringer

Lawrence) অধীনে মাদ্রাজ-সরকার যে একটি ক্ষুদ্র সেনাদল গঠন করিয়াছিলেন, তাহাতে ক্লাইভ যোগদান করিয়াছিলেন। সাহসে নির্ভর করিয়া ক্লাইভ আসিয়া আর্কট অধিকার করিয়া বসিলেন; চাঁদা সাহেবের সৈন্যদলের বিরুদ্ধে ৫৩ দিন ধরিয়া উহা রক্ষা করিয়া চলিতে হইল। ইহা ছিল অস্ত্রবিদ্যা প্রয়োগের এক গৌরবময় নিদর্শন; ইহাতে যুদ্ধের গতি ফিরিয়া গেল। ১৭৫২ সালের জুন মাসে জেক্স্ ল'-এর নেতৃত্বে ত্রিচিনোপল্লীর সম্মুখস্থ ফরাসী-বাহিনী আত্মসমর্পণ করিল। তাঞ্জোরের রাজার সৈন্যদল লরেন্সের অধীনে ব্রিটিশপক্ষে যুদ্ধে রত ছিল। চাঁদা সাহেব তাঞ্জোরের রাজার সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। চাঁদা সাহেবের শিরশ্ছেদ করা হইল, লরেন্স সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। ফলে মহম্মদ আলী কর্ণাটকে অবিসংবাদী নবাব হইয়া উঠিলেন।

তবুও ডুপ্লের ছিল অদম্য উৎসাহ। মহীশূরবাসীরা এবং গুটির মারাঠা সর্দার মুরার রাও ত্রিচিনোপল্লীতে ইংরেজদের মিত্ররূপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের দলে টানিয়া লইলেন। তাঞ্জোরের রাজা নিরপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু এক পন্দিচেরী আর জিঞ্জি ছাড়া ক্লাইভ কর্ণাটকের সমস্ত ফরাসী ঘাঁটি পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। ১৭৫৪ সালে অর্থাভাবে পন্দিচেরী-মহীশূর-গুটির শক্তি-সমবায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল; তবুও ডুপ্লে কখনও এ কথা ভাবিতে পারেন নাই যে ত্রিচিনোপল্লী অধিকার করিতে পারিবেন না, তিনি নিজস্ব তহবিল হইতে ৩,৫০,০০০ পাউণ্ডের অধিক ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ফরাসী কোম্পানী ইতিপূর্বেই শান্তি স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; ১৭৫৪ সালের আগস্ট মাসে গোদেহু নামে কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর পন্দিচেরীতে আসিয়া অবতরণ করিলেন। ইহার ফল হইয়া দাঁড়াইল ডুপ্লেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দান এবং কর্ণাটক সম্পর্কে তাঁহার যে পরিকল্পনা ছিল তাহা প্রত্যাহার। এইভাবে বে-সরকারী যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিল। দুই কোম্পানীই স্থির করিল ভারতীয় রাজারাজড়াদের বিবাদ-বিসংবাদে তাহারা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। ডুপ্লে ফ্রান্সে ফিরিয়া গেলেন, সেখানে ১৭৬৩ সাল অবধি তিনি জীবিত ছিলেন।

ডুপ্লের কর্মনীতি ও উহার ব্যর্থতার কারণ ঃ ডুপ্লে তাঁহার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে আপনা হইতেই দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, ভারতীয় সৈন্যদলসমূহ ইউরোপীয় নিয়মানুবর্তিতার কাছে ছিল অসহায়, কিন্তু ভারতীয়দের ইউরোপীয়দের অধীনে চাকুরিতে নিয়োগ করিলে তাহাদের মধ্যেও সে নিয়মানুবর্তিতা সঞ্চার করা যাইত। ভারতবর্ষে তখন যে বিশৃঙ্খল অবস্থা চলিতেছিল তাহাতে তাঁহার ইউরোপীয় ও ভারতীয় সেনাদল লইয়া কোন একজন দাবীদারের পক্ষে দাঁড়াইলে অনায়াসেই তিনি ফরাসী প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিতেন। তাঁহার অভিলাষ ছিল তাঁহার কর্তৃপক্ষের সম্মুখে তিনি কেবল তাঁহার কৃতকর্মটুকুই উপস্থাপিত করিবেন। ফরাসী কোম্পানীকে ভারতীয় পণ্যের বিনিময়ে ভারতে রৌপ্যসম্ভার আমদানি করিতে হইত। কিন্তু কোম্পানী যে মূলধন নিয়োগ করিয়াছিল তাহা উঠিয়া আসে এইরূপ উদ্বৃত্ত অর্থ লাভের উপযুক্ত কোন রাজ্যখণ্ড ভারতবর্ষে অধিকার করিতে পারিলে বৎসর বৎসর ফ্রান্সের রৌপ্যসম্ভারের এই অপচয় নিবারণ করা যাইত ঃ "উহার ভারতীয় রাজ্যখণ্ডের উদ্বৃত্ত রাজস্বই রপ্তানি হইত পণ্যদ্রব্যের আকারে।" কিন্তু কোম্পানীর নিকট তাঁহার এই মনোভাব ব্যক্ত না করাই হইল তাঁহার ভুল। তিনি শেষ অবধি যখন আর সময় নাই তাহার পূর্বে কখনও তাঁহার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তাঁহার সমগ্র পরিকল্পনা জানিতে দেন নাই।

তাঁহার একটি মারাত্মক ত্রুটি ছিল সৈন্যদলকে ভাগাভাগি করিয়া ফেলা। যদি হায়দরাবাদ হইতে বুসীকে সৈন্যদলসমেত ত্রিচিনোপল্লীতে লইয়া আসা হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি সে স্থান অধিকার করিয়া কর্ণাটক করায়ত্ত করিতে পারিতেন; কিন্তু নিজামের দরবারে ফরাসী-প্রভাব রক্ষার জন্য ডুপ্লে বিশেষ উদ্গ্রীব ছিলেন। শেষের দিকে কর্ণাটকে ঘটনাচক্র যেভাবে ঘুরিতে লাগিল তাহাতে বাধ্য হইয়াই বুসীকে ডাকিয়া আনিতে হইল, সঙ্গে সঙ্গে হায়দরাবাদেও ঘটিল ফরাসী-প্রভাবের অন্তর্ধান। ডডওয়েল যথার্থই বলিয়াছেন, "যুগপৎ দুইটি উদ্দেশ্য সাধন এবং হাতে যে উপায় আছে তাহার অধিক কিছু সম্পাদনের চেষ্টা বিজ্ঞের কাজ নয়"। ডুপ্লের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার জন্য প্রয়োজন ছিল কর্ণাটকে দ্রুতগতিতে জয়লাভ করা।

অধিকন্তু, যুদ্ধ যতই দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে লাগিল ততই দেখা দিতে লাগিল অর্থের অনটন। যে জন্যই হউক, ফরাসী কোম্পানীর নিকট অর্থ চাহিয়া পাঠানো তিনি উচিত বিবেচনা করিতেন না, বরং সর্বদাই তাঁহার স্বদেশীয় কর্তৃপক্ষের নিকট অবস্থার উজ্জ্বল বিবরণ দান করিতেন। তাঁহার যে অর্থের প্রয়োজন হইত, বুসী তাহা তাঁহাকে দিতে পারিতেন না। ডুপ্লের সামরিক পরিকল্পনা বহুলাংশে কেবল যুদ্ধের মালমশলার অভাবেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বুসী ছিলেন হায়দরাবাদে; কর্ণাটকে তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য ফরাসী সৈন্যেরা লরেন্সের যোগ্যতা ও বীর্যবত্তা এবং ক্লাইভের বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। সণ্ডার্স ছিলেন সঙ্কল্পে অচল অটল, নিজের অনুসৃত কর্মনীতির মর্ম উপলব্ধিতে সম্পূর্ণ সক্ষম, ইংরেজ কোম্পানীর সকল সম্বল লইয়া মহম্মদ আলীর পৃষ্ঠপোষকতা করিবার জন্য ফরাসীদের বিরুদ্ধে চাল চালিতে সর্বদা প্রস্তুত। ডুপ্লের ব্যর্থতার জন্য এইভাবে তিনিই ছিলেন বহুলাংশে দায়ী।

নৌশক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে ডুপ্লের কোনও ধারণা ছিল না, অথচ ভারতবর্ষে ইউরোপীয় প্রাধান্য স্থাপনের যে-কোনও পরিকল্পনার উহাই ছিল একটি মূলসূত্র। তবুও, ডুপ্লের ব্যর্থতা সত্ত্বেও, ভারতের বুকের উপর বসিয়া এ দেশকে ইউরোপের পদানত করার যে পন্থা, তিনি ছিলেন তাহারই পথিকৃৎ; এই ফরাসী ভদ্রলোক এবং তাঁহার যে সহযোগী হায়দরাবাদে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর শিবিরে বসিয়া কর্তৃত্ব পরিচালনা করিতেছিলেন, এই দুইজনের অন্তরের অভিলাষ বাঙ্গালা দেশে ব্রিটিশ-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আকারে মূর্ত হইয়া উঠে।

তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩): ১৭৫৬ সালে ইউরোপে সপ্তবর্ষ-ব্যাপী সমর (Seven Years' War) আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষে ফরাসী এবং ইংরেজ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিও পুনরায় যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু যুদ্ধের সংবাদ যখন ভারতে আসিয়া পৌঁছে তখন মাদ্রাজ এবং পন্দিচেরীর কর্তৃপক্ষের হাতে কর্ণাটকে ঠিক ভাবে যুদ্ধ করিবার মতো যথেষ্ট সৈন্য ছিল না। ব্রিটিশরা ছিল বাঙ্গালায় সিরাজ-উদ্দৌলার বিরুদ্ধে ব্যস্ত, আর এদিকে শাহ নওয়াজ খাঁর চক্রান্তে হায়দরাবাদ হইতে বুসীর চাকুরী যাওয়ার পর ১৭৫৬

সালের আগস্ট মাসের আগে তাঁহাকে পুনরায় কার্যে নিয়োগ করার সুবিধা হয় নাই। তাঁহার এই বিসদৃশ ভাবে পদচ্যুতির পর তিনি ছিলেন উত্তর-সরকার অঞ্চলে (১৭৫৭) ফরাসী-প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত, সুতরাং তাঁহার পক্ষে বাঙ্গালা অথবা মাদ্রাজে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কার্যে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ ছিল না। ফলে ক্লাইভের পক্ষে ফরাসীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া চন্দননগর অধিকার (২৩শে মার্চ ১৭৫৭) এবং সিরাজ-উদ্দৌলার ধ্বংসসাধন (২৩শে জুন ১৭৫৭) সহজসাধ্য হইয়া উঠিল।

ফরাসীদের নির্বাচিত সেনাপতি কাউণ্ট দ্য লালী (Count de Lally) পন্দিচেরীতে আসিয়া পৌঁছিলেন ১৭৫৮ সালের এপ্রিল মাসে। তিনি ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড অধিকার করিয়া মাদ্রাজ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই মহৎ কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি মনে করিলেন বুসীকে হায়দরাবাদ হইতে ফিরাইয়া আনা দরকার। স্ট্রিঙ্গার লরেন্সের সহায়তায় মাদ্রাজের ব্রিটিশ গভর্নর পিগোট অমিতবিক্রমে বাধা দান করিতে লাগিলেন; একটি ব্রিটিশ নৌবহর আসিয়া উপনীত হইল, লালীকেও অবরোধ প্রত্যাহার করিতে হইল (১৭৫৮)। বাঙ্গালা দেশ হইতে ক্লাইভ কর্নেল ফোর্ডকে প্রেরণ করিলেন; বুসী উত্তর-সরকারে ফরাসী-বাহিনীর যে দলটিকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, ফোর্ডের হাতে তাহার পরাজয় হইল (১৭৫৮)। মাদ্রাজে ফরাসীদের ব্যর্থতার ফলে তাহাদের শক্তি হ্রাস হইয়াছিল, কোন্দুর ও মসুলিপত্তনে ফোর্ডের জয়লাভের পর তাহাদের প্রতিষ্ঠা খর্ব হইল। পন্দিচেরীর অনতিদূরে দা'কের (D'Ache) অধীনে ফরাসী নৌবহর পরাজিত হইয়া ফিরিয়া গেল, করমণ্ডল উপকূলে ব্রিটিশরাই হইয়া উঠিল সর্বময় প্রভু। ব্রিটিশ সেনাপতি স্যর আয়ার কূট (Sir Eyre Coote) বন্দিবাসের যুদ্ধে লালীকে পরাভূত করিলেন (২২শে জানুয়ারী ১৭৬০)। পন্দিচেরী অবরোধ করা হইল, তখন আত্মসমর্পণ ভিন্ন গতি রহিল না (১৬ই জানুয়ারী ১৭৬১)। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে ফরাসীদের হাতে অবশিষ্ট রহিল জিঞ্জি ও মাহে, অচিরে সে দু'টিরও পতন হইল। এইভাবে ১৭৬০-৬১ সালের মধ্যেই ডুপ্লে ও বুসীর কাজ বিনষ্ট হইয়া গেল; ভারতে ফরাসী-শক্তির পতন ঘটিল। প্যারিসের সন্ধির (১৭৬৩) ফলে ফরাসীদের অধিকৃত ঘাঁটিগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ ঃ ফরাসীদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল সমুদ্রবক্ষে ব্রিটিশদের প্রাধান্য। সমুদ্রবক্ষে তাহাদের শক্তি এতই বেশি ছিল যে তাহারা যেমন অনায়াসে বাঙ্গালা দেশ হইতে কর্ণাটকে রসদ সরবরাহ করিতে পারিত, তেমনই ইউরোপ হইতে সৈন্যদল লইয়া আসিতে পারিত; আর এদিকে সমুদ্রে আধিপত্য না থাকার দরুন ফরাসীরা তাহাদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করিতে পারিত না বলিয়া যুদ্ধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তুলনায় দুর্বল হইয়া পড়িত। এই যুদ্ধেই দেখা যায় যে করমণ্ডল উপকূলে নৌযুদ্ধ ফলপ্রসূ করিয়া তুলিবার পক্ষে মরিশিয়াস ছিল বড় বেশি দূরের নৌঘাটি।

কর্ণাটকের তৃতীয় যুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের হাতে ছিল বাঙ্গালার সম্পদরাশি, সে সময় বাঙ্গালাও ছিল সমৃদ্ধিশালী দেশ। বাঙ্গালা হইতে যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহের ফলেই মাদ্রাজ সরকার মালপত্রের অভাবে বিশেষ কোনরূপ অসুবিধা ভোগ না করিয়াই তিন বৎসর যুদ্ধবিগ্রহ চালাইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। শেষ অবধি মীর জাফর আর ব্রিটিশদের আর্থিক চাহিদা মিটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। ব্রিটিশরা বাঙ্গালা হইতে যাহা চায় তাহাই পাইবার জন্য ১৭৬০ সালে তাঁহাকে মসনদ হইতে নামাইয়া মীর কাশিমকে বাঙ্গালার নবাবী দান করে। লালীর আগমনের পর এই চূড়ান্ত সংগ্রামের ব্যয়ভার বহনের জন্য ফরাসী ভারত বিশ লক্ষ ফ্রাঙ্কের অধিক আর্থিক সাহায্য পায় নাই।

হায়দর আলী তখন মহীশূরে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন; তিনি ব্রিটিশদের সহিত যুদ্ধে লালীকে সাহায্য করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইলেন। কিন্তু ১৭৬০ সালের আগস্ট মাসে মহীশূরের নিষ্কর্মা রাজার দেওয়ান খণ্ডে রাও রাজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া হায়দরকে ক্ষমতার আসন হইতে অপসারণ করেন, পন্দিচেরীর পতনের পূর্বে হায়দর পুনরায় ক্ষমতা হস্তগত করিতে পারেন নাই। লালীকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া আনিতে হয়। একমাত্র ফরাসীদের নিপাত সাধন ছাড়া ব্রিটিশদের আর কোনদিকে মনোযোগ দিতে হয় নাই।

ব্যক্তিত্বের বিষয়টিও এ ক্ষেত্রে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। লালীর ছিল বিরক্তিকর শ্লেষাত্মক বুদ্ধি আর অদম্য কোপন স্বভাব, প্রাচ্য ভূখণ্ডে ফরাসীদের এই সঙ্কটকালে নেতৃত্বভার গ্রহণের তিনি সম্পূর্ণ অযোগ্য ব্যক্তি

ছিলেন। পন্দিচেরীর সংসদ এবং ফরাসীদের এই নেতৃপুরুষের মধ্যে কলহের ফলে কাজকর্ম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, মতৈক্য ও প্রযত্নের স্থলে দেখা দেয় স্থলভাগে ভেদবিভেদ এবং জলভাগে নিরুদ্যম। লালীর আত্মসমর্পণের পর তাঁহার কর্মসচিব দুবয় (Dubois) দেফের (Defer) নামে আর-একজন ফরাসীর অস্ত্রাঘাতে ভূপাতিত হন, কারণ দুবয়ের হাতে ছিল সরকারী দুর্নীতি প্রমাণের দলিলপত্র। অবমানিত ফরাসী সেনাপতির এই বৃদ্ধ, অন্ধপ্রায় কর্মসচিব বৃথাই আত্মরক্ষার জন্য তরবারি কোষমুক্ত করিয়াছিলেন। এই যে অসিযুদ্ধ, ইহা ছিল 'ভারতবর্ষে ফরাসীদের শেষ তিন বৎসরের ইতিহাসের যথোপযুক্ত প্রতিচ্ছবি ও চুম্বকবিশেষ'। ব্রিটিশদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল নেতৃত্বের গুণাবলীতে এবং লরেন্স ও ক্লাইভ, ফোর্ড ও কূটের ন্যায় ব্যক্তিবর্গের সামরিক শ্রেষ্ঠতায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বাঙ্গালা ও অযোধ্যায় ব্রিটিশজাতির প্রাধান্যলাভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পলাশী

ব্রিটিশের সহিত সিরাজ-উদ্দৌলার সংঘর্ষ—সিরাজ-উদ্দৌলা ছিলেন আলিবর্দি খাঁর দৌহিত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র। আলিবর্দির পর ১৭৫৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বাঙ্গালার সুবাদারী লাভ করেন। তিনি ছিলেন তেইশ বৎসরের যুবক। তাঁহার মসনদ লাভের দুই মাস পরে তিনি কাসিমবাজারের ইংরেজ কুঠি হস্তগত করিয়া কলিকাতার দিকে অগ্রসর হন, শহরটি দখল করিতে তাঁহাকে কোনরূপ বেগ পাইতে হয় নাই। যাহারা আত্মসমর্পণ করে তাহাদিগকে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আটক রাখা হয়, সেটি সামরিক কারাগাররূপে ব্যবহৃত হইত। কথিত আছে বন্দীদের অধিকাংশেরই শ্বাসরোধের ফলে মৃত্যু হয়। ইতিহাসে ইহারই নাম 'অন্ধকূপ হত্যা' ('Black Hole Tragedy')।

'অন্ধকূপের' কাহিনীর যাথার্থ্য সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার বিশদ বিবরণ আমরা পাই হলওয়েলের (Holwell) নিকট হইতে। ইহা মোটেই অসম্ভব নয় যে কাহিনীটির মধ্যে নিজের ভূমিকা খুব ফলাও করিয়া জাহির করিবার জন্য হামবড়া হলওয়েল তাহাতে প্রচুর হস্তাবলেপ করিয়াছেন। ঠিক কত জন লোক সেখানে আত্মসমর্পণের জন্য ছিল তাহা প্রমাণ করিবার মতো কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রমাণও আমাদের হাতে নাই। 'অন্ধকূপের' প্রচলিত বিবরণের মধ্যে এমন সব হতবুদ্ধিকর বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটিয়াছে যে তাহার সহিত উহার যাথার্থ্যের সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না। সেদিন সন্ধ্যায় একেবারে ১৪৬ জন ইউরোপীয়কে কলিকাতায় ফেলিয়া রাখিয়া যাওয়া সম্ভব হইতে পারে না। প্রকৃত সংখ্যা হয়তো ছিল মাত্র ৬০। কলিকাতার যে সব পূর্বতন বাসিন্দার কিভাবে মৃত্যু হইয়াছে তাহা সেই সপ্তাহকালব্যাপী নিরতিশয় বিশৃঙ্খল যুদ্ধবিগ্রহ এবং ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দৌর্বল্যের মধ্যে নির্ণয় করা যায় নাই, তাহাদের বিষয়ই পরে "অন্ধকূপে নিহত" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

সিরাজ-উদ্দৌলার ব্রিটিশ-বিরোধী নীতির কারণ ঃ সিরাজ-উদ্দৌলার ইংরেজদের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাবের কারণ ছিল ইংরেজদের আক্রমণের ভয়। নাসির জঙ্গের হত্যাকাণ্ড এবং হায়দরাবাদে ফরাসীদের আর আর্কটে ইংরেজদের প্রভাব স্থাপনের কাহিনী বাঙ্গালা দেশে অজ্ঞাত ছিল না। 'সিয়র-উল-মুতাখ্‌খেরিন' (Siyar-ul-Mutakkherin) গ্রন্থের লেখক গোলাম হোসেন বলেন যে আলিবর্দির আশঙ্কা ছিল দরবারের কোন চক্রীদল কবে না ইংরেজদের কাজে লাগায় আর তাঁহার উত্তরাধিকারীকে নাসির জঙ্গের দুর্ভাগ্যের সাথী হইতে হয়। সিরাজের মাসী ঘাসেটি বেগম এবং তাঁহার মন্ত্রণাদাতা রাজবল্লভ ইংরেজ কোম্পানীর শক্তি ও সম্ভ্রমের মূল্য বুঝিতেন, তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল কোম্পানীর সাহায্যে তাঁহারা তরুণ নবাবের উৎসাদন করেন ; নবাব কিন্তু চক্রীদের পূর্বেই কাজে অবতীর্ণ হন। সিরাজের এক জ্ঞাতিভ্রাতা সৌকৎ জঙ্গ পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ করেন। তাঁহাকে সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের পরামর্শ দান করা হয়। সুতরাং প্রথম হইতেই তরুণ নবাব অনুভব করিতে থাকেন যে বাঙ্গালায় ইংরেজদের শক্তি এমন ভাবে খর্ব করা দরকার যে 'তাহারা (মুর্শিদকুলি) জাফর খাঁর

আমলে যে অবস্থায়' ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত তাহাতেই যেন সন্তুষ্ট থাকে। হলওয়েলের কথা বিশ্বাসযোগ্য হইলে, আলিবর্দিও 'তাহাদের ব্যবসায়কে আর্মেনিয়ানদের স্তরে নামাইয়া আনিবার কথা' চিন্তা করিতেন।

সিরাজ-উদ্দৌলা ও ফরাসীগণঃ মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য ক্লাইভের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হইল। পুনরায় সিরাজ সসৈন্যে ক্লাইভের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ক্লাইভের এক নৈশ আক্রমণ—সাফল্যের ধারকাছ দিয়া না গেলেও—নবাবকে বিচলিত করিয়া তুলিল; তিনি ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া বসিলেন; তাহাতে ইংরেজরা যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত সে সব সমর্থন করা হইল, কলিকাতা হইতে যে সব বস্তু তিনি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন সে সব ফিরাইয়া দিলেন, তাহা ছাড়া তাহাদের শহর সুরক্ষিত করা ও মুদ্রা তৈয়ারির অধিকারও তিনি মঞ্জুর করিলেন। ইতিপূর্বেই সপ্তবর্ষব্যাপী সমর আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। ক্লাইভ চন্দননগর আক্রমণ করিয়া ১৭৫৭ সালের মার্চ মাসে ফরাসীদের হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লইলেন। আহমদ শাহ আবদালী দিল্লী প্রবেশ করিয়া তাহার পর মথুরা ও অন্যান্য স্থান লুণ্ঠনে ব্যাপৃত ছিলেন। কিছুকাল হইতে গুজব রটিয়াছিল যে তাঁহার পূর্বদিকে অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প আছে। আফগানদের আক্রমণের ভয়ে নবাব ব্রিটিশদের ঘাঁটাইতে সাহস করিলেন না। যদিও তিনি ছিলেন ফরাসীদের পক্ষপাতী তবুও সে অবস্থায় ব্রিটিশদের বিরূপ করিয়া তোলার মতো অবস্থা তাঁহার ছিল না। ক্লাইভ এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন; এইভাবেই নবাব ব্রিটিশদের বিপক্ষে তাঁহার স্বাভাবিক মিত্রদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িলেন। ইংরেজরা অবশ্য বুঝিত যে নবাবের অন্তর তখনও তাহাদের প্রতি বিরূপ হইয়াই আছে। তিনি দাক্ষিণাত্যে প্রায়ই বুসীর নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন। চন্দননগরের পলাতক ফরাসীদের তিনি তাঁহার আপন আশ্রয়ে গ্রহণ করিলেন।

সিরাজ-উদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রঃ এইরূপ সময়ে ক্লাইভ এবং কলিকাতার সংসদের গোচরে আসিল মুর্শিদাবাদে সিরাজের কর্তৃত্ব উচ্ছেদের জন্য এক ষড়যন্ত্র হইতেছে। এই যুবক 'মূর্খ ও কোপনস্বভাব হওয়ায় নিজের পছন্দ অপছন্দ গোপন করিতে পারিতেন না'; ফলে তিনি শেঠদের মতো বিরাট মহাজনদের এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে মীরজাফর,

রায় দুর্লভ, ইয়ার লতিফ খাঁ এবং মুর্শিদাবাদের অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরাগভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য হইল সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে নবাবী দান—তিনি ছিলেন আলিবর্দির আমলের একজন অগ্রগণ্য সেনাপতি। অষ্টাদশ শতকে প্রতিদ্বন্দ্বী ওমরাহদের মধ্যে প্রাদেশিক শাসনকর্তৃত্ব লাভের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি অঙ্গস্বরূপ। উহা ছিল সাম্রাজ্যের পতনদশায় অরাজকতার অনিবার্য পরিণাম। সৈন্যবাহিনীতে পারসিক, মধ্য-এশীয় এবং আফগান ভাগ্যান্বেষীরা প্রচুরসংখ্যক ছিল; যে সব চেয়ে চড়া দাম হাঁকিবে তাহারই সেবায় অসি নিয়োগ করিতে তাহারা সতত উৎসুক ছিল। এই সব সৈন্য ছিল তাহাদের নিকটতম রণনায়কের মুখাপেক্ষী; রাষ্ট্রের প্রতি কোনরূপ আনুগত্য তাহাদের ছিল না। যে সব ভারতীয় মুর্শিদাবাদের এই ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের চোখে ইহা ছিল একজন নায়কের বিরুদ্ধে আর-একজন নায়ককে উপস্থাপন করা মাত্র—'এক রাজ্যাপহারীর দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌলার বিরুদ্ধে প্রাদেশিক ওমরাহদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিমান তাঁহাকে উপস্থাপিত করা।'

পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) : ইংরেজদের মনে হইল "কর্মহীন উদাসীন দর্শক হইয়া বসিয়া থাকিলে রাজনীতির দিক দিয়া এক মারাত্মক ভ্রম হইবে"। ৩,০০০ সৈন্যের (২,২০০ সিপাহী ও দোভাষী ; ৮০০ ইউরোপীয়) একটি দল লইয়া ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা পরিবৃত নবাবের নিজ সৈন্যদলের উপর আস্থা ছিল না। মুর্শিদাবাদের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ওয়াট্‌স্ (Watts) ইতিপূর্বেই মীর জাফর, রায় দুর্লভ এবং ইয়ার লতিফ খাঁর ন্যায় যাঁহাদের হাতে নবাবের বাহিনীর অধিকাংশ পরিচালনার ভার ছিল তাঁহাদের সঙ্গে এক বোঝাপড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহারা এইরূপ প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন যে নবাব এবং কোম্পানীর মধ্যে কোনরূপ যুদ্ধ বাধিলে তাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন। নদীয়া জেলায় পলাশীর পথে অগ্রসর হইয়া ভাবী বিজেতা (অর্থাৎ ক্লাইভ) ওয়াটস্-এর চক্রান্তের ফলাফল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা না থাকায় দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু শেষ অবধি স্থির করিলেন সম্মুখেই অগ্রসর হইবেন। তাঁহার দিনপঞ্জীতে দেখা যায় পলাশীতে আসিয়াও তিনি নৈশ আক্রমণেরই সিদ্ধান্ত করেন, তাই নবাবের বাহিনীর

গোলাবর্ষণের প্রত্যুত্তরস্বরূপ গোলাবর্ষণ ছাড়া আর কিছুই করা হয় না। কিন্তু নবাবের বাহিনী শিবিরের দিকে পিছু হঠিতেছে দেখিয়া, রণক্ষেত্রে ক্লাইভের সাময়িক অনুপস্থিতিকালে, কিল্‌প্যাট্রিক সম্মুখে অগ্রসর হইবার আদেশ দান করেন। একবার আদেশ দান করিয়া তাহা আর প্রত্যাহার করা গেল না। নবাব ভাবিলেন তাঁহার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে, তিনি পলায়ন করিলেন। তাঁহার পক্ষে পাঁচশতের অধিক লোকক্ষয় হয় নাই। ইংরেজ-বাহিনীতে ১৮ জন নিহত এবং ৫৬ জন আহত হয়। তাহাদের ছয়-পাউণ্ড গোলাবর্ষী কামানের সারি হইতে ৫১১ বার গোলা বর্ষণ করা হইয়াছিল। ইংরেজ-বাহিনীর অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছিল মীর জাফর, রায় দুর্লভ, এবং ইয়ার লতিফের অধীন অগণিত অশ্বারোহী সেনার দয়ার উপর। "কিন্তু নাসির জঙ্গের ধ্বংসের জন্য ডুপ্লে যে সব পাঠান নবাবদের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল তাহারা।"

ইহাই হইল পলাশীর সেই যুগান্তকারী যুদ্ধ (২৩শে জুন, ১৭৫৭)। ইহাকে ক্লাইভের কোন মহতী সামরিক কীর্তি রূপে বিবেচনা করা যায় না। ম্যালিসন যথার্থই বলিয়াছেন, যে বিপুলসংখ্যক সৈন্যের বিরুদ্ধে ক্লাইভ তাঁহার তুচ্ছ দলটিকে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে অবশ্যই বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সুদীর্ঘ সারিবদ্ধ বাহিনীর প্রতি চাহিতে চাহিতে এ চিন্তা অবশ্যই তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে বারবার আনাগোনা করিতেছিল—"যদি তাহারা প্রভুর প্রতি বিশ্বাস রক্ষা করে তবে কী হইবে!" চক্রান্ত আপন কর্ম সমাধা করিল, দূর হইতে গোলাবর্ষণের ফলেই নবাবের সম্পূর্ণ পতন ঘটিল। নবাবের বাহিনীতে ছিল প্রায় ৫০,০০০ সৈন্য, কিন্তু কেবল দক্ষিণপার্শ্বের ১২,০০০-এর মতো সৈন্য এবং মাত্র ১২-টি কামান যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। অবশিষ্ট সৈন্যেরা সকলে বাহুতে বাহু আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তারপর সচকিতে পলায়ন করে। সিরাজের ব্যর্থতা হইয়া দাঁড়ায় কলঙ্কের বিষয়। তিনি পলায়ন করেন, তারপর ধৃত হইয়া মীর জাফরের পুত্র মীরনের হাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কয়েকদিন পরেই ক্লাইভ মীর জাফরকে বাঙ্গালার মসনদে স্থাপন করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মীর জাফর ও মীর কাসিম

মীর জাফর (১৭৫৭-৬০)ঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হইয়া দাঁড়াইল নৃপ-স্রষ্টা, শুরু হইল পুতুল নবাবদের যুগ। বাহ্যতঃ পলাশীর যুদ্ধ কেবল ইংরেজরা সিরাজ-উদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা অধিকারের পূর্বে যে অবস্থায় ছিল তাহাদের সেই অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। মীর জাফর ইহার উপর তাহাদের দান করেন চব্বিশ-পরগণা জেলার জমিদারি, কিন্তু তাঁহার হতভাগ্য পুরোগামীও ১৭৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের সন্ধিতে এ ব্যাপারে সম্মতি দান করিয়াছিলেন। তাহাদের ক্ষতিপূরণও করা হয়। ১৭৫৭ সালের ১৫ই জুলাইয়ের সন্ধির দু'টি শর্ত কিন্তু ছিল ব্রিটিশজাতির রাজনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্য লাভের নিদর্শন ঃ "ইংরেজদের শত্রুরা আমারও শত্রু, তা' তাহারা ভারতীয় অথবা ইউরোপীয় যাহাই হউক না কেন"; "যখন আমি ইংরেজদের সহায়তা চাহিয়া পাঠাইব, তখনই আমি তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য দায়ী থাকিব"। এই দু'টি শর্তের ফলে মীর জাফর নিজেকে কোম্পানীর দয়ার পাত্র করিয়া তুলিলেন। মোগল রাজকুমার আলী গওহরের (পরে যিনি ২য় শাহ আলম রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন) আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত, মারাঠাদের ভয়ে উৎকণ্ঠিত, নিরতিশয় আর্থিক দুরবস্থায় নিপতিত, আর তাঁহার সৈন্যদলের বেতন দানে অসমর্থ এই দুর্বলচেতা ও অস্থিরমতি নবাব ক্রমশঃই ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। মীর জাফরের এই দুরবস্থার কারণ হইল এক বিপুল আর্থিক দায়িত্ব স্বীকার করিয়া কাজ শুরু করা। কলিকাতা অবরোধের সময় যাহারা দুর্দশা ভোগ করে তাহাদের তিনি ক্ষতিপূরণস্বরূপ ১,৭৭,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত দিতে সম্মত হন। ইংরেজ স্থলবাহিনী, নৌবহর এবং কর্মচারীদের তিনি যে সকল উপহার ও এককালীন অর্থদান করেন তৎসমুদয়ের মোট মূল্য হিসাব করা হইয়াছে প্রায় ১,২৫০,০০০ পাউণ্ড, তন্মধ্যে ২৩৪,০০০ পাউণ্ড ছিল একা ক্লাইভেরই অংশ। কিন্তু এসব হইল কেবল

সেই সকল উপহার-উপঢৌকনেরই কথা যাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে অথবা যাহা স্বীকৃত হইয়াছে। ক্লাইভের জন্য আবার ইহার উপর ১৭৫৯ সালে নির্দিষ্ট হয় কোম্পানীর চব্বিশ-পরগণার জমিদারি-বাবদ নবাবকে দেয় অর্থের একভাগ। আমরা যখন মীর জাফরের অসহনীয় আর্থিক দুরবস্থার কথা পাঠ করি তখন ক্লাইভ পরে ইংলণ্ডে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহাতে বিস্ময় বোধ না করিয়া থাকিতে পারি না: "পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে আমি যে অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়ি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। মস্তবড় একজন রাজা আমার খোশখেয়ালের অধীন। এক সমৃদ্ধিশালী নগর—লণ্ডন অপেক্ষাও সমৃদ্ধতর এবং অধিকতর জনবহুল—আমার কৃপার প্রত্যাশী, সেখানকার শ্রেষ্ঠ মহাজনদের মধ্যে আমার মৃদুহাস্যটুকুর জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। কেবল আমারই জন্য উন্মুক্ত কোষাগারের পর কোষাগারের মধ্যে বিচরণ করিতাম আমি, উভয় পার্শ্বে থাকিত স্তূপাকার স্বর্ণ ও মণিমুক্তা। সভাপতি মহাশয়, এই মুহূর্তে আমি আমার লোভের সামান্যতার কথা স্মরণ করিয়া বিস্ময়ে বিহ্বল বোধ করিতেছি।"

১৭৫৭ সালের বিপ্লব, এবং যেভাবে তাহা সংঘটিত হয় তাহা, নবাব-সরকারের ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া দিল। কিন্তু কলিকাতা সংসদের কর্ণধার রূপে ক্লাইভ যতদিন এখানে ছিলেন ততদিন তাহা নিয়ন্ত্রণ করিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন। ১৭৫৯ সালে আলী গওহর বিহার আক্রমণ করিলে তাঁহার বহিষ্কারে মীর জাফরকে তিনি সাহায্য দান করেন। কোম্পানীর আধিপত্যের ভারে ক্ষুণ্নমনা মীর জাফর ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হন। তাহারাও বাঙ্গালা দেশে ব্রিটিশদের প্রাধান্যলাভে বড়ই উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছিল। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকখানি জাহাজ ওলন্দাজদের কতকগুলি জাহাজ কাড়িয়া লয়, এবং কর্ণেল ফোর্ড উত্তর-সরকার হইতে ফিরিয়া আসিলে ক্লাইভ তাঁহাকে ওলন্দাজ স্থলসৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন; ১৭৫৯ সালের নবেম্বর মাসে বিদেরায় তাহাদের পরাজয় ঘটে। মীর জাফর 'এক বৈদেশিক কর্তৃপক্ষের স্থানে এক বৈদেশিক মিত্রপক্ষকে স্থানদানে' অকৃতকার্য হন। ওলন্দাজেরা ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়। ক্লাইভ ১৭৫৬ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৭৬০ সালের ফেব্রুয়ারী অবধি বাঙ্গালায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ণধার ছিলেন, তারপর

বাঙ্গালায় ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সীর গভর্নরের আসন ত্যাগ করিয়া তিনি ইংলণ্ডে রওনা হন।

ক্লাইভের পরে হলওয়েল (ফেব্রুয়ারী—জুলাই ১৭৬০) এবং ভ্যান্সিটার্ট (জুলাই ১৭৬০-৬৪) এই ব্যবস্থা চালাইয়া যাইতে পারিলেন না। প্রধান সামরিক শক্তিরূপে কোম্পানী নবাব-সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ করিয়া চলিতেছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশের হাতে তৈয়ারি, প্রভুর রাজ্যাপহারক নবাব কোম্পানীকে প্রতিশ্রুত অর্থের যোগান দিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। ১৭৫৯ সালের নভেম্বরে আলী গওহরের পিতা আততায়ীর হস্তে প্রাণদান করেন; আলী গওহর তখন নামেমাত্র মোগল সম্রাট হন; তিনি তখনও বিহারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। বিহার হইতে তাঁহার বহিষ্কার সাধনের চেষ্টা সফল হয়, এবং যে সব জমিদার তাঁহাকে সাহায্য দান করিতেন তাঁহাদের শাস্তিবিধান হয়। মীর জাফরের পুত্র মীরনকে পিতার পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচন করা হয়, কিন্তু তিনি বজ্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন নবাবের পদে কাহাকে নিয়োগ করা যায় সে প্রশ্ন ওঠে। ভ্যান্সিটার্ট হলওয়েলের প্রস্তাব অনুসারে ১৭৬০ সালে স্থির করেন মীর জাফরকে পদচ্যুত করিয়া সেখানে তাঁহার জামাতা মীর কাসিমকে নিয়োগ করিবেন। নীরবে বিপ্লব সাধিত হইল, মীর জাফর মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন।

মীর কাসিম (১৭৬০-৬৩) : মীর কাসিমের সঙ্গে এক নূতন চুক্তি হইল। তিনি এমন সব উপঢৌকন দিতে বাধ্য হইলেন যে 'সমগ্র কারবারটার মধ্যে হীন অর্থলোলুপতার এক বিষাক্ত আবহাওয়া বহিতে লাগিল'। শর্ত হইল যে "ইংরেজ বাহিনীর ইউরোপীয় আর তেলিঙ্গারা নবাব মীর মহম্মদ কাসিম খাঁ বাহাদুরকে তাঁহার কাজকর্ম পরিচালনায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবে", এবং "কোম্পানীর ও উক্ত বাহিনীর যাবতীয় পাওনা এবং রণক্ষেত্রে মালমশলা সরবরাহ ইত্যাদির ব্যয় বাবদ নির্ধারিত থাকিবে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের ভূমিভাগ...এবং কোম্পানী এই তিনটি জেলার যাবতীয় ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য থাকিবে ও লাভ আত্মসাৎ করিতে পারিবে।"

মীর কাসিম ছিলেন শাসনপটু নবাব। কিছুকালের মধ্যেই তিনি তাঁহার

ইংরেজ উত্তমর্ণদের প্রচুর অর্থদানে সমর্থ হইলেন ; ফলে কলিকাতার সরকার মাদ্রাজে আড়াই লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিতে পারিলেন, তাহাতেই ইংরেজদের পক্ষে সাফল্যের সহিত পণ্ডিচেরী অবরোধ চালাইয়া যাওয়া সম্ভবপর হয়। শোণ নদীতীরে মেজর কার্নাক (Carnac) নামশেষ মোগল সম্রাট ২য় শাহ আলমকে পরাভূত করিতে সক্ষম হন। তিনি এখান হইতে বিদায় হইলে পর মীর কাসিম শাহ্ আলমকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিছুকাল হইতে তাঁহার ভয় হইয়াছিল ব্রিটিশরা পলাতক সম্রাটের নিকট হইতে বাঙ্গালা দেশ দান হিসাবে আদায় করিতে পারে। তিনি তাঁহার রাজস্ব-ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করেন ; হিসাবপত্রের কাজে তাঁহার এমনই অসামান্য দক্ষতা ছিল যে তাহা হইতে কোন ফাঁকে কাহারও পলাইবার সুযোগ ছিল না। কথিত আছে, দুই বৎসরে তিনি দেশের পুরাতন রাজস্বের দ্বিগুণ আদায় করিয়াছিলেন।

প্রথম হইতেই মীর কাসিম ছিলেন কলিকাতা-সংসদের (Calcutta Council) অধিকাংশ সদস্যেরই সন্দেহ ও শত্রুতার পাত্র ; তাঁহারা ন্যায়নীতির কোনও ধার ধারিতেন না ; ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তাঁহাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না, তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল নিজেদের লাভ। মীর জাফরের আমলে ইংরেজদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে দুর্নীতি অসম্ভব রকমে বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহারই ফলে কলিকাতা-সংসদের সঙ্গে মীর কাসিমের খোলাখুলি যুদ্ধের আশঙ্কা আসন্ন হইয়া উঠিল। বাদশাহী ফরমানের বলে বাঙ্গালা দেশের মধ্য দিয়া কোম্পানীর মালপত্র চলাচলের জন্য কোনরূপ পথকর দিতে হইত না। কোম্পানীর কর্মচারীদের বেতন ছিল এত কম যে তাহা ছিল হাসিতামাসার জিনিস, কিন্তু দেশের মধ্যে ব্যবসায় করিবার অধিকার তাহাদের ছিল, উহার সহিত কোম্পানীর কারবারের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। তাহারা দাবী করিতে লাগিল যে পথকর হইতে এই যে অব্যাহতি, তাহা তাহাদের ব্যক্তিগত কারবারের উপরও প্রযোজ্য ; এ দাবী অবশ্যই ছিল একান্ত অসঙ্গত। ভ্যান্সিটার্ট (Vansittart) যথার্থই বলিয়াছিলেন, "মোগল রাজার এরূপ কোনও বাসনা থাকিতেই পারিত না যে বে-সরকারী বিদেশী ব্যবসায়ীদের অবস্থা হইবে বে-সরকারী দেশী ব্যবসায়ীদের চেয়ে ভালো।" পলাশীর যুদ্ধের পর মীর জাফর এই মর্মে এক হুকুম জারি করেন যে, কোন ইংরেজ কুঠির বড়

সাহেব কোন মালের জন্য ছাড়পত্র (দস্তক) দিলে সে মালের জন্য কোনরূপ শুল্ক দিতে হইবে না। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদের প্রবল শক্তি লোকের ভয়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল, ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যে দুর্নীতির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এই যে বিশেষ সুবিধা ভোগের অধিকার, ইহার এমনই অপব্যবহার হইতে থাকে যে মীর কাসিমের মনে হয় ইহার একটা বিহিত করা দরকার। এই সব 'দস্তক' কেবল যে কোম্পানীর কর্মচারীরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়েই ব্যবহার করিত তাহাই নয়, অনেক সময় এগুলি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছেও বিক্রয় করা হইত। ১৭৬২ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে এইরূপ কোন ব্যবস্থা "নবাবের রাজস্ব, দেশের শান্তি, অথবা আমাদের জাতির গৌরবের পক্ষে শুভলক্ষণ নয়।" নবাব ভ্যান্সিটার্ট ও ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে একটি বিশেষ যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা করেন, একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তেও উপনীত হন। কিন্তু কলিকাতা-সংসদ কিছুতেই তাহাতে সম্মতি দান করিলেন না, প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া গেল। ইহাতে ক্ষেপিয়া গিয়া মীর কাসিম সমভাবে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় সকল শ্রেণীর বণিকদেরই যাবতীয় শুল্ক মকুব করিয়া দিলেন। অবস্থা পাটনায় একেবারে আসিয়া চরমে উঠিল, সেখানকার ইংরেজ কুঠির বড়কর্তা এলিস (Ellis) শহর অধিকারের চেষ্টা করিলেন ; তাঁহাকে পরাভূত করা হইল বটে, কিন্তু যুদ্ধ বাধিয়া গেল (১৭৬৩)।

ডডওয়েল বলেন যে "ঘটনাচক্রেই এ যুদ্ধ বাধিয়া যায়, ঠিক যে কাহারও ইচ্ছায় বাধিয়াছিল তাহা নয়।" পলাশীর পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও বাঙ্গালার নবাবের মধ্যে সাম্যভাব প্রত্যাশা করা অসঙ্গত, সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়াই উঠিয়াছিল। কলিকাতা-সংসদের এবং পাটনায় এলিসের দৌরাত্ম্যের কাজ দেখিয়া এ বিষয়ে আমাদের অন্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না যে ভ্যান্সিটার্টের ব্যবস্থার ব্যর্থতা ছিল অনিবার্য। মীর কাসিম কোম্পানীর ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার সৈন্যদের বকেয়া বেতন চুকাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার দরবারের ব্যয়ভার হ্রাস করিয়াছিলেন, জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করিয়াছিলেন, এবং একটি কার্যকরী শাসনসংস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে সমরু (Samru) নামে অধিক পরিচিত

আল্‌সাসের রেইন্‌হার্ড (Reinhard of Alsace) এবং আর্মেনিয়ার মার্কার-এর (Marker) ন্যায় ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীদের সহায়তায় ইউরোপীয় আদর্শে একটি বাহিনী গড়িয়া তুলিতেছিলেন।

এলিসের পাটনা শহরের উপর আক্রমণের ফলে যুদ্ধ যখন আসন্ন হইয়া উঠিল তখন ১,০০০ ইউরোপীয় ও ৪০০ সিপাহী লইয়া রণক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন মেজর অ্যাডাম্‌স্‌। মীর কাসিমের বাহিনীতে ছিল ১৫,০০০ হইতে ২০,০০০ লোক। কিন্তু মীর কাসিমের কোনরূপ সামরিক প্রতিভা ছিল না; ভাগ্যান্বেষীদের দ্বারা পরিচালিত, কেবল স্বার্থভাবে প্রণোদিত তাঁহার সৈন্যেরা অজয় নদের তীরের নিকটে কাটোয়া, ঘেরিয়া এবং উদয়নালায় (১৭৬৩) পর পর যুদ্ধে হারিয়া যাইতে থাকে। অ্যাডাম্‌স্‌ মুঙ্গের আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন, মীর কাসিম পাটনায় পলায়ন করেন। সেখানে যেসব ইংরেজ বন্দী তাঁহার হস্তে নিপতিত হয় তাহাদের তিনি হত্যা করেন। দুর্দশার কশাঘাতে তাঁহার চিত্তবৃত্তির নৃশংস দিকটি জাগিয়া উঠে, তাই দুর্ভাগ্যের বশে যাহারাই তাঁহার হাতে পড়ে তাহাদেরই প্রাণনাশ করেন।

তারপর তিনি পলায়ন করেন অযোধ্যায়, সেখানে গিয়া নামশেষ মোগল সম্রাটের উজীর অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্দৌলাকে, এবং মোগল সম্রাট ২য় শাহ আলমকেও, মিত্ররূপে নিজ পক্ষে টানিয়া লন। সহযোগিতার সর্তাদি স্থির হইয়া যায়। ব্রিটিশ বাহিনীর পরিচালক তখন কার্নাক (Carnac)। তিনি ছিলেন অলসপ্রকৃতি। মীর কাসিমের সহযোগীর দল পাটনা অবধি অগ্রসর হন, কিন্তু শহর অধিকার করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে পিছু হঠিয়া আসিতে হয়। কার্নাকের পরে আসেন মেজর হেক্টর মন্‌রো (Hector Munro)। তিনি আসিয়া ব্রিটিশ দলে নিয়মানুবর্তিতার পুনঃপ্রবর্তন করেন, তারপর সুরু করেন আক্রমণ। সুজা-উদ্দৌলা তখন একাকীই যুদ্ধ করিতেছিলেন, বক্সারের যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন (১৭৬৪)। অতঃপর তিনি রোহিলাদের দেশে পলায়ন করেন। অযোধ্যা বিধ্বস্ত হয়। শাহ আলম ইংরেজ শিবিরে যোগদান করেন। মীর কাসিম পলাতক হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। ১৭৭৭ সালে দিল্লীতে নিরতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মীর জাফরের পুনর্নিয়োগ (১৭৬৩-১৭৬৫): ইতিমধ্যে ১৭৬৩ সালের জুলাই মাসে মীর জাফরকে পুনরায় নবাবীতে বহাল করা হইয়াছিল। তিনি এক নূতন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। তাহাতে তিনি যে সকল সৈন্য রাখিবেন তাহাদের সংখ্যাহ্রাস করিতে, তাঁহার দরবারে একজন স্থায়ী রেসিডেন্ট রাখিতে, এবং ইংরেজদের লবণের কারবারের উপর মাত্র শতকরা ২½% হারে শুল্ক ধার্য করিতে স্বীকৃত হন। যুদ্ধের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা, এককালীন দান হিসাবে ব্রিটিশ স্থলসৈন্যদলকে ২৫ লক্ষ টাকা এবং ব্রিটিশ নৌবহরকে তাহার অর্ধেক, আর এদিকে যাহারা ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিভোগ করিয়াছে তাহাদের ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে তিনি অঙ্গীকার করেন। স্ক্র্যাফ্‌টনের ভাষায় "নবাব হইয়া দাঁড়াইলেন কোম্পানীর কর্মচারীদের মহাজন ছাড়া আর কিছুই নয়, তাহারা যখন খুশি তখনই আর যত টাকা ইচ্ছা তত টাকাই তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিতে পারিত।"

১৭৬৫ সালের প্রথমদিকেই মীর জাফর মারা গেলেন। তাঁহার স্থলে বসিলেন নজম্‌-উদ্দৌলা। তাঁহাকে ইংরেজদের মনোনীত একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিতে স্বীকৃত হইতে হইল, স্থির হইল ইংরেজদের সমর্থন ব্যতিরেকে সে মন্ত্রীকে বরখাস্ত করা যাইবে না। তিনি কেবল 'তাঁহার ব্যক্তিগত সম্ভ্রম রক্ষা এবং প্রদেশগুলিতে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য' যেরূপ সৈন্যদলের প্রয়োজন তদতিরিক্ত সৈন্য রাখিতে পারিবেন না। এইভাবে নবাব তাঁহার নির্বাহী-বিভাগের জন্য যে স্বাধীন সামরিক পোষণশক্তির প্রয়োজন তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন। তিনি হইয়া দাঁড়াইলেন নামে মাত্র প্রভু, তাঁহার শাসনবিভাগ আসিয়া পড়িল ইংরেজদের মনোনীত ব্যক্তিদের হাতে। কলিকাতা-সংসদের সদস্যেরা আবার মোটাহাতে উপহার লইলেন, তবে এবার নবাবী লইয়া কারবারের সঙ্গে তাঁহারা করিলেন বাঙ্গালায় নিরঙ্কুশ সামরিক প্রাধান্য আত্মসাতের সংযোগ। তবুও ১৭৬৫ সালের মে মাসে ক্লাইভ যখন দ্বিতীয়বার বাঙ্গালার গভর্ণর হইয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন তখন অন্যান্য সর্ববিধ বিষয়ে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা চলিতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেওয়ানী ও দ্বৈতশাসন

ক্লাইভের সম্মুখে সমস্যা (১৭৬৫-৬৭) : ক্লাইভকে যুগপৎ এক রাজনৈতিক এবং এক শাসন-সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। তাঁহার কাজ হইয়া দাঁড়াইল ব্রিটিশের সঙ্গে মোগল সম্রাট, অযোধ্যার নবাব-উজীর এবং বাঙ্গালার নবাবের যথাযথ সম্পর্ক স্থির করা। শাসন-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানও কম কঠিন ছিল না; তাহা হইল কোম্পানীর সামরিক ও বে-সামরিক উভয় বিভাগেই নিয়মানুবর্তিতার পুনঃপ্রবর্তন এবং অতীতের দুর্নীতি দূরীকরণ।

অযোধ্যায় নবাবের সহিত সন্ধি (১৭৬৫) : ভ্যান্সিটার্ট প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন মোগল সম্রাটকে অযোধ্যা দান করিবেন। কিন্তু ক্লাইভ সুজা-উদ্দৌলার সহিত মৈত্রী স্থাপনই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। এলাহাবাদের সন্ধির শর্ত অনুসারে সুজা-উদ্দৌলাকে পূর্বের যুদ্ধের ব্যয় বাবদ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে এবং কোম্পানীর সহিত সংরক্ষণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইতে হইল। মোগল সম্রাট ২য় শাহ্ আলমকে তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষা ও ব্যয়ভার বহনের জন্য রাজকীয় ভূসম্পত্তিস্বরূপ দান করা হইল কোরা ও এলাহাবাদের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। সুজা-উদ্দৌলা ও কোম্পানীর মধ্যে মৈত্রী শেষ অবধি দৃঢ়ই থাকে। রাজ্যবিস্তারের নীতি অনুসরণের ইচ্ছা ক্লাইভের ছিল না। তিনি লিখিয়াছিলেন, "রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছাই যদি হয় আমাদের ক্রিয়াকলাপের নিয়ামক নীতি, তবে আমি মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই রাজ্যখণ্ডের পর রাজ্যখণ্ড জয় করিয়া চলিতে হইবে, শেষ অবধি সমগ্র সাম্রাজ্যই আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উদ্বেল হইয়া উঠিবে।" তাঁহার আশা ছিল অযোধ্যা কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল একটি সীমান্ত রাজ্য হইয়া থাকিবে।

শাহ্ আলম কর্তৃক দেওয়ানী মঞ্জুর (১৭৬৫)ঃ বাঙ্গালা দেশে নবাবের কর্তব্যকর্মের ভার নিঃশেষ করিয়া ফেলার প্রক্রিয়াই অনুসৃত হইতে লাগিল। ১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্ট ক্লাইভ মোগল সম্রাটের নিকট হইতে এক ফরমান আদায় করিলেন। তাহাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করা হইল বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী। বিনিময়ে কোম্পানী রাজকর রূপে নিয়মিত ভাবে ২৬ লক্ষ টাকা সম্রাটের নিকট প্রেরণের জন্য অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইল। বাঙ্গালার নবাব একেবারে নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন সামান্য একজন বৃত্তিভোগীর পর্যায়েঃ স্থির হইল নিজামত পরিরক্ষণের জন্য তাঁহাকে দেওয়া হইবে বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা। রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়া ক্লাইভ স্থাপন করিলেন দ্বৈতশাসন (Double Government); কোম্পানী হইল দেওয়ান, নবাব থাকিলেন নাজিম। কিন্তু নিজের নির্বাহী-বিভাগের যাবতীয় স্বাধীন সামরিক ও আর্থিক অধিকার হারাইয়া নবাব হইয়া পড়িলেন সামান্য একজন উপাধিধারী বৃত্তিভোগী। ক্লাইভ অবশ্য দেশের শাসনভার গ্রহণ করিলেন না। সাধারণ শাসনভার রহিল সহকারী নবাবদের হাতে— বাঙ্গালায় রেজা খাঁর আর বিহারে সিতাব রায়ের করতলগত। ক্লাইভ যে ব্যবস্থা করিয়া যান তাহাতে কোম্পানী সহকারী নবাবদের হাতেই ফেলিয়া রাখেন দেওয়ান এবং নাজিমের কাজ—ভূমি-রাজস্ব ও বাণিজ্য-শুল্ক সংগ্রহ, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার, এবং আরক্ষা। সহকারী নবাব দু'জনকে আসলে কোম্পানীর স্বার্থেই বাঙ্গালার শাসনকার্য নির্বাহ করিতে হইত, শুধু তাঁহাদিগকে মানিয়া চলিতে হইত মোগল সম্রাটের সার্বভৌম অধিকারের অলীক কল্পকথা এবং নবাবের আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব। বাঙ্গালায় সুশাসন প্রবর্তন সম্বন্ধে ক্লাইভের বিন্দুমাত্র দায়িত্ববোধ ছিল না। তিনি যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তাহাতে বাঙ্গালায় কোম্পানীর কর্মচারীদের একমাত্র অতিরিক্ত কাজ হইয়া দাঁড়াইল 'রাজস্ব সংগ্রহের কাজ তদারক করা আর নবাবের কোষাগার হইতে টাকা আনিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী কোষাগারে তাহা জমা করা।'

ক্লাইভ এই যে 'মুখাবরণে আবৃত' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন—যাহাতে ক্ষমতার সঙ্গে ঘটে দায়িত্বের বিচ্ছেদ—রাজনৈতিক কারণ দেখাইয়া তাহা সমর্থনও করা হইয়াছে। মিল-এর (Mill) মতে ইহা ছিল 'ক্লাইভের মনের মতো পন্থা; মনে

হয় তাঁহার কাছে এই খানিকটা কুটিল কারসাজিই বেশ কিছুটা আত্মপ্রসাদের সঙ্গে সুগভীর ও সুনিপুণ রাজনীতি রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।' কিন্তু খোলাখুলিভাবে কর্তৃত্ব অধিকার করিয়া বসিলে ফরাসী এবং ওলন্দাজদের দিক হইতে গোলযোগের সৃষ্টি হইতে পারিত এবং সম্ভবতঃ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে তিক্ত বিরোধ জাগাইয়া তুলিত। ফার্মিঙ্গার (Firminger) যথার্থই বলিয়াছেন, "নবাবের ক্ষমতা ও সম্পদের দিক দিয়া তিনি বেশ বুঝিতেন যে ইংরেজরা যেন কমলা লেবুটি চুষিয়া নিঙড়াইয়া খাই-য়াছে, তবে তিনি মনে করিতেন টেবিলের উপরে যে খোসা আর কোয়া পড়িয়া আছে তাহা দেখিয়াই বাঙ্গালার অন্যান্য বিদেশী অতিথিরা ভুল করিয়া ভাবিবে ইংরেজরা এখনও খাইবার মতো সব কিছুই খাইয়া উজাড় করিয়া ফেলে নাই।"

কোম্পানীর কর্মচারীদের সম্পর্কে বিধান ঃ দ্বিতীয় বার গভর্ণরের পদে কাজ করার সময় ক্লাইভ এই ব্যাপারটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে থাকেন যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সব বড় বড় কর্মচারী চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া চাকুরি লাভ করেন তাঁহারা সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া কোথাও উপহার লইতে পারিবেন না। ইহা ছিল ডিরেক্টরসভারই (Court of Directors) আদেশ অনুযায়ী বিধান। কিন্তু অনেকেরই ধারণা ছিল যে চুক্তি-পত্রে তাঁহাদের স্বাক্ষর ছিল কেবল একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। ডিরেক্টর-সভার মনোভাব তখন যেরূপ ছিল তাহাতে ক্লাইভ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের তেমন কিছু বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাব করিতে পারিলেন না; তবে ডিরেক্টর-সভা দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে কোম্পানীর কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়া যে আদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে কোনরূপ অস্পষ্টতা ছিল না; তাই এই অসুবিধা কাটাইয়া বাহির হইবার চেষ্টায় তিনি কলিকাতা সংসদের নিয়ন্ত্রণাধীন এক ব্যবসায়-সঙ্ঘ স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন। ক্লাইভ কেবল কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্মচারীদেরই আর্থিক সংস্থান করিতে চান; তাঁহাদের এই ব্যবসায়-সঙ্ঘে অংশ দান করা হয়; এই সঙ্ঘেরই হাতে থাকে 'সাম্রাজ্যে শস্যের পরেই যে তিনটি জিনিসের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি' সেই লবণ, সুপারি আর তামাকের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার। গভর্ণরসমেত মোট পঞ্চান্ন জন ছিলেন এই সঙ্ঘের লাভালাভের অংশীদার। ১৭৬৭ সালে ক্লাইভ তাঁহার দুইজন সহকর্মীর নিকট তাঁহার নিজের অংশগুলি

৩২,০০০ পাউণ্ডে বেচিয়া দেন। ১৭৬৮ সালে এই দানবীয় পরিকল্পনা ডিরেক্টর-সভা কর্তৃক অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক কর্মচারীরা যে ভাতা (field allowance) পাইতেন তাহা ক্লাইভ কমাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে কোম্পানীর ইউরোপীয় সামরিক কর্মচারীরা বিদ্রোহের উদ্যোগ করিলে ক্লাইভ সাহসের সহিত তাঁহাদের বাধার সম্মুখীন হন। অধিকাংশ কর্মচারী আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন, বিদ্রোহের নেতৃগণকে কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হয়।

ক্লাইভের গুরুত্ব নিরূপণ ঃ ১৭৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্লাইভ ভারত পরিত্যাগ করেন। তাঁহাকে ব্রিটেনের পক্ষে একটি ভারতীয় সাম্রাজ্যের সংগ্রাহক রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু মার্ভিন ডেভিস যথার্থই বলিয়াছেন, মোগল সাম্রাজ্য যেমন বাবরের কীর্তি ছিল না—ছিল আকবরের কীর্তি, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও তেমনই ক্লাইভের কীর্তি ছিল না, তাহা ছিল তাঁহার অনুগামীদের কীর্তি। "তাঁহার গুণাবলী ছিল সে বৃহত্তর কর্ম সম্পাদনের পক্ষে যার-পর-নাই সঙ্কীর্ণ। একটি অভিনব বিপুল সংস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্ম যে সমত্ববোধ, যে কল্পনা, যে বিদ্যা, যে বোধশক্তি, যে ধৈর্য, যে সহনশীলতার প্রয়োজন, তাহার কিছুই তাঁহার মধ্যে ছিল না।"

কার্যক্ষেত্রে দ্বৈতশাসন (১৭৬৭-৭২) ঃ ক্লাইভের নামের সঙ্গে যে ব্যবস্থা জড়িত হইয়া আছে তাহা তাঁহার অনুগামী ভেরেল্স্ট (Verelst) (১৭৬৭-৬৯) এবং কার্টিয়ারের (Cartier) (১৭৬৯-৭২) আমলেও অব্যাহত থাকে—নবাব থাকেন শুধু নামেমাত্র, শাসনকার্য থাকে কোম্পানীরই মনোনীত 'নায়েব সুবা' রেজা খাঁর হাতে, কিন্তু আসলে প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ই নির্ধারণ করিতে থাকেন দরবারের ইংরেজ রেসিডেণ্ট। ক্ষমতার সঙ্গে দায়িত্বের বিচ্ছেদ অব্যাহতই রহিয়া যায়। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি চলিতেই থাকে। ১৭৬৯ সালে বেচার (Becher) নামে কোম্পানীর জনৈক কর্মচারী লেখেন, "এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে এই যে সুন্দর দেশ, যাহা সর্বাপেক্ষা অত্যাচারী ও যথেচ্ছ শাসন-ব্যবস্থার মধ্যেও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে।" ভেরেল্স্ট দেওয়ানী জেলাগুলির জন্ম জনকয়েক ইংরেজ তদারককারী কর্মচারী (Super-

visors) নিযুক্ত করিয়া যথেচ্ছাচার ও উৎকোচগ্রহণ নিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্টিয়ারের আমলে দেখা যায় যে তাহাতে গোলযোগ আরও দুর্বার হইয়া উঠে, এবং তাঁহাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় চালাইয়া যাইবার অনুমতি ছিল বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের কর্তৃত্বের অপব্যবহার করিতে থাকেন। বস্তুতঃ যে জিনিসটির অভাব ছিল তাহা হইল বাস্তবের অনুগামী শাসননীতি। ফার্মিঞ্জারের ভাষায়, "ডিরেক্টর সভা মনে করিতেন তাঁহাদের কর্মচারীদের একমাত্র করণীয় কাজ হইতেছে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া সুপক্ক ফলটি মুখব্যাদান করিয়া গ্রহণ করা।"

১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ: ১৭৭২ সালের পূর্বে কোম্পানী 'দেওয়ান রূপে দণ্ডায়মান হওয়া' এবং দেশের শাসন-দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা স্থির করে নাই। তবে এই সঙ্কল্পের প্রত্যক্ষ কারণ সম্ভবতঃ ছিল ১৭৭০ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। উহার ফলে বাঙ্গালা দেশ পরিণত হয় 'একটি নিস্তব্ধ ও জনশূন্য প্রদেশে'। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে সরকারের আর্তত্রাণ-প্রচেষ্টার 'দৌড় ছিল তিন কোটি লোকের মধ্যে ৯০০০ পাউণ্ড অবধি ব্যয় করা—যে তিন কোটির প্রত্যেক ষোল জনের মধ্যে ছয়জন সরকারী স্বীকৃতি অনুসারেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়'। দুর্ভিক্ষের কারণ ছিল অনাবৃষ্টি, কিন্তু তদারককারীরা (Supervisors) নিজ নিজ জেলায় যথোপযুক্ত শস্য মজুত করিবার জন্য এক-একটি 'আড়ত' তৈয়ারি করিয়াছিলেন বলিয়া দোষের ভাগী হইয়া আছেন। কিন্তু 'আতঙ্কের বীভৎস দৃশ্যে' পরিপূর্ণ এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও ১৭৭১ সালে সংগৃহীত মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৭৬৮ সালে সংগৃহীত রাজস্বের চেয়ে বেশি। রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা ছিল পাশবিক ও অমানুষিক ; ডিরেক্টর-সভা পর্যন্ত উপলব্ধি করেন যে ইহার একমাত্র প্রতিকার হইতেছে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

মারাঠা-শক্তির পুনরুজ্জীবন ও মহীশূরের অভ্যুদয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পেশোয়া ১ম মাধব রাও

১৭৬১ খ্রীস্টাব্দের পর মারাঠা-শক্তির পুনরুজ্জীবন ঃ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ বুঝি মারাঠা-প্রাধান্যের অবসান সূচনা করিয়াছিল। কিন্তু মারাঠা-শক্তি যেন চক্ষের নিমেষে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে। পাণিপথের নিদারুণ আঘাত সামলাইয়া উঠিয়া মারাঠা সাম্রাজ্য যে একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে পুনরায় নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে, সেজন্য শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন বালাজী বাজী রাওয়ের পুত্র পেশোয়া ১ম মাধব রাও (১৭৬১-৭২)।

নিজাম আলীর সহিত যুদ্ধ ঃ ১ম মাধব রাও যখন পেশোয়া-পদ লাভ করেন তখন তাঁহার বয়স সপ্তদশ বৎসর মাত্র। তাঁহার খুল্লতাত রঘুনাথ রাও ছিলেন অভিজ্ঞ যোদ্ধপুরুষ এবং নিরতিশয় ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তি। পেশোয়ার অভিভাবক রূপে তিনিই রাজকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। সে সময় হায়দরাবাদে নিজাম আলী কার্যতঃ নিজাম সালাবৎ জঙ্গের যাবতীয় ক্ষমতা গ্রাস করিয়া বসিয়াছিলেন। মারাঠাদের ভাগ্যবিপর্যয়ে উৎসাহিত বোধ করিয়া তিনি প্রায় ৬০,০০০ সৈন্যের পুরোভাগে পুণা অভিমুখে অগ্রসর হন। মারাঠারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রতিরোধ করে। ১৭৬২ সালের জানুয়ারী মাসে এক যুদ্ধে নিজাম আলীর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। কিন্তু রঘুনাথ রাও, সম্ভবতঃ ক্ষমতা হস্তগত করার ব্যাপারে ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবার সম্ভাবনা অনুমান করিয়াই, নিজাম আলীর পক্ষে অনুকূল সর্তে এক সন্ধি স্থাপন করেন। তারপর বাস্তবিকই খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া উঠে। নিজাম আলী রঘুনাথের পক্ষ সমর্থন করিতে থাকেন।

পেশোয়াকে খুল্লতাতের নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু এই তরুণ যুবকের অলোকসামান্য চরিত্রগুণে ধীরে ধীরে শেষ অবধি তাঁহারই প্রাধান্য স্থাপিত হইয়া যায়। ১৭৬৩ সালে তাঁহারই সহায়তায় তাঁহার খুল্লতাত গোদাবরী তীরে রাক্ষসভুবনের যুদ্ধে নিজাম আলীকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন, কিন্তু সন্ধি স্থাপনের সময় রঘুনাথ পুনরায় হায়দরাবাদের অধিপতিকে অনুকূল সর্ত মঞ্জুর করিয়া বসেন।

হায়দর আলীর সহিত যুদ্ধঃ এদিকে তখন হায়দর আলীর ক্রমবর্ধমান শক্তি কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্তী মারাঠা রাজ্যখণ্ডের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল; মহীশূরের উত্তরে মারাঠা প্রভাব-পরিমণ্ডলের অন্তর্গত ভূভাগে হানা দিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। পেশোয়া এবার তাই হায়দর আলীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে মনোনিবেশ করিলেন। ১৭৬৪-৬৫ সালে হায়দর আলীর সম্পূর্ণ পরাভব ঘটিল; কিন্তু রঘুনাথ রাওয়ের আগ্রহাতিশয্যে পেশোয়া হায়দর আলীকে অনুকূল সন্ধিসর্তই মঞ্জুর করিলেন। ১৭৬৬-৬৭ সালের অভিযানে ও যুদ্ধেও হায়দর আলীর ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রতিরুদ্ধ হয়। বেরারের জনোজী ভোঁস্‌লে ছিলেন মারাঠা শক্তি-সমবায়েরই অন্যতম সদস্য, কিন্তু নিজাম ও হায়দর আলীর ন্যায় মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিপক্ষ দলেরই সঙ্গে তাঁহার যোগ-সাজস ছিল। পেশোয়া তাঁহাকেও সম্পূর্ণ স্ববশে আনয়নে সমর্থ হন। ক্ষমতালাভে উদ্‌গ্রীব এবং মারাঠাদের প্রতিপক্ষ দলের সহিত মিলনে আগ্রহ-শীল রঘুনাথ রাওয়েরও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইল।

উত্তর ভারতে মারাঠা-শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠাঃ ইহার পর পেশোয়া দুইটি অভিযান প্রেরণ করেনঃ একটি যায় উত্তর ভারতে, উদ্দেশ্য পাণিপথের যুদ্ধের পূর্বে মালব, রাজপুতানা ও দোয়াব অঞ্চলে মারাঠাদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। অপর অভিযানটি প্রেরিত হয় হায়দর আলীর ক্ষমতা চূর্ণ করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে। দাক্ষিণাত্যের অভিযানটি (১৭৬৯-৭২) চমকপ্রদ রূপে সাফল্যমণ্ডিত হয়। পেশোয়া স্বয়ং ইহা পরিচালনা করিতে থাকেন, কিন্তু অচিরেই তিনি অসুস্থ হইয়া পুণায় প্রত্যাবর্তন করিলে ত্র্যম্বক রাওকে অভিযানের নেতৃপদে মনোনয়ন করা হয়। তিনি শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকট হায়দর আলীকে সম্পূর্ণরূপে

পরাজিত করেন। কিন্তু পেশোয়ার তখন মুমূর্ষু অবস্থা, সে সংবাদ হায়দর আলীর চিত্তে নূতন আশার সঞ্চার করে। রণক্ষেত্রে ত্র্যম্বক রাও তখন অবিসংবাদী শক্তির অধিকারী হইলেও, হায়দরের শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিবার মতো অবস্থা তখন নয়। তাই সন্ধি করিতে হইল। তাহাতে হায়দরের হাতে এমন সব স্বযোগ-স্ববিধা রহিয়া গেল যে তিনি তখনও মারাঠাদের প্রবল প্রতিপক্ষ রূপে দাঁড়াইবার মতো ক্ষমতার অধিকারী হইয়াই রহিলেন। উত্তরাঞ্চলে মারাঠা অভিযানের নায়কগণ মালব ও বুন্দেলখণ্ড পুনরধিকারে, রাজপুত রাজারাজড়াদের নিকট হইতে কর আদায়ে, জাঠ ও রোহিলাদের শক্তি ধূলিসাৎ করিতে, এমন কি দিল্লী অধিকারে পর্যন্ত সমর্থ হন। পলাতক মোগল সম্রাট ২য় শাহ্ আলম তখন ব্রিটিশের বৃত্তিভোগী রূপে এলাহাবাদে বাস করিতেছিলেন; তাঁহারা তাঁহাকে তাঁহার সাম্রাজ্যের পুরাতন রাজধানী দিল্লী নগরীতে ফিরাইয়া আনেন (১৭৭২)। ১৭৭২ সালের নবেম্বর মাসে পেশোয়ার অকাল মৃত্যুর দরুণ মারাঠা বাহিনী দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া আসে; এই দ্রুত প্রত্যাবর্তনের ফলে উত্তর ভারতে যে কাজ হইয়াছিল তাহা একেবারে পণ্ড হইয়া যায়। গ্র্যাণ্ট ডাফের (Grant Duff) ভাষায়, "পাণিপথের প্রান্তরে মারাঠাদের যত না ক্ষতি হইয়াছিল, এই স্বযোগ্য শাসকের অকাল মৃত্যুতে তাহাদের হয় তদপেক্ষা মারাত্মক ক্ষতি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হায়দর আলী

প্রথম জীবন ঃ যে সময় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে পুনরায় মারাঠা-প্রতাপ অনুভূত হইতেছিল সে সময় হায়দর আলীর নেতৃত্বে ক্ষুদ্র মহীশূর রাজ্য তখনকার দিনের সেই রাজনৈতিক শক্তি-সংঘাতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসে। হায়দর ছিলেন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন জনৈক ভাগ্যান্বেষী পুরুষ। মহীশূর রাজ্যের প্রধান সেনাপতি নঞ্জরাজের বাহিনীতে সামান্য একজন নায়ক রূপে তাঁহার কর্মজীবনের সূত্রপাত হয়। অতি

অল্পকালের মধ্যেই তিনি নঞ্জরাজের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। এই চাকুরির মধ্যেই ত্রিচিনোপল্লীতে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করায় যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মে। ১৭৫৫ সালে তাঁহাকে ডিণ্ডিগুলের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। মহীশূর রাজ্য তখন চরম আর্থিক সঙ্কটে কবলিত, সৈন্যদের মনোভাবও বিদ্রোহের অনুকূল ঃ সেই সুযোগে নঞ্জরাজকে অপসারিত করিয়া তিনিই হইয়া দাঁড়ান কার্যতঃ মহীশূরের অধীশ্বর—রাজা কেবল নামে মাত্রই রাজা ছিলেন, সিংহাসনের শোভাবর্ধনের জন্য তাঁহাকে রাজপদেই বহাল রাখা হয়। এদিকে আবার রাজ্যের দেওয়ান খণ্ডে রাও হায়দরের অপসারণের জন্য মারাঠাদের সাহায্য ভিক্ষা করিয়া পাঠান। কিন্তু মারাঠারা তখন পাণিপথের যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত ছিল, খণ্ডে রাওকে যথোপযুক্ত সাহায্য প্রেরণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইল না, হায়দর অনায়াসেই তাঁহার বাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। ১৭৬১ সালে মহীশূরের সর্বময় কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপেই তাঁহার করায়ত্ত হইয়া গেল।

রাজ্যবিস্তার ও মারাঠাদের সহিত সংঘর্ষ ঃ এবার হায়দর রাজ্য-বিস্তারে মন দিলেন। সিরা, বিদনূর (নাগর), সুন্দা এবং আরও কয়েকটি স্থান অধিকৃত হইল। কিন্তু মারাঠাদের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ না হইয়া তাঁহার কোন উপায় ছিল না। পেশোয়া মাধব রাও এ বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। ১৭৬৪-৬৫, ১৭৬৬-৬৭ এবং ১৭৬৯-৭২ সালের মারাঠা-মহীশূর সংঘর্ষে হায়দরের শক্তিহ্রাস এবং মর্যাদাহানি উভয়ই ঘটিতে থাকে ; পেশোয়া কালব্যাধিতে আক্রান্ত এবং অকালে কালগ্রাসে নিপতিত না হইলে হায়দরেরই ছিল সর্বনাশের সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু পেশোয়া মাধব রাওয়ের মৃত্যুতে মারাঠাদের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা ও বিমূঢ়তা দেখা দেয় সেই সুযোগে হায়দর বেল্লারী, গূটী, চিতলদ্রুগ এবং কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্তী মারাঠা রাজ্যখণ্ড জয় করিয়া ফেলেন। কুদ্দাপ্পাও তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়া পড়ে। দক্ষিণে ইতিপূর্বেই তিনি কুর্গ ও মালাবার তাঁহার অধীনে আনয়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৭৬-৭৮ সালের মধ্যে কৃষ্ণা নদী অভিমুখে তাঁহার অগ্রগতি প্রতিরোধের জন্য মারাঠাদের যাবতীয় প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়—তাঁহার এই অগ্রগতির বন্যাস্রোত নিবারণের জন্য নিজামের সহিত মারাঠাদের মৈত্রী-বন্ধনেও কোনরূপ ফল হয় না। জনৈক ফরাসী লেখক যথার্থই বলিয়াছেন

"নিরবচ্ছিন্ন সৌভাগ্যের বলে ধীর অথচ অবিরাম প্রচেষ্টায় তিনি এমন এক নবশক্তি গঠন করিয়া তুলিয়াছেন যে তাহা দুর্বার স্রোতের ন্যায় সম্মুখে যাহাই পায় তাহাই ভাসাইয়া লইয়া যায়।"

ইংরেজদের সহিত সম্পর্ক : ইংরেজদের সঙ্গে হায়দরের প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। তাহাদের আশ্রিত মিত্র আর্কটের নবাব মহম্মদ আলীর সঙ্গেও তাঁহার শত্রুতা ছিল। পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন; ব্যক্তিগত অসম্প্রীতির সঙ্গে এই দুই মুসলমান শাসকের মধ্যে আবার ঘটিয়াছিল কয়েকটি অঞ্চলের আধিপত্য লইয়া বিবাদ। মাদ্রাজের ব্রিটিশ সরকার ছিলেন আর্কটের নবাবের পৃষ্ঠপোষক; তাঁহাদেরই অবিবেচনাপ্রসূত কূটনৈতিক চালের ফলে সঙ্কট ঘনাইয়া আসে। ১৭৬৬ সালে মাদ্রাজ সরকার নিজামের সহিত এক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ব্রিটিশ-বাহিনীর একটি দল দিয়া সাহায্য করিতে সম্মত হন। পেশোয়া ১ম মাধব রাও হায়দরকে ভয়ানক ভাবে চাপিয়া ধরিয়াছেন, এমন সময় সুযোগ বুঝিয়া ব্রিটিশ সৈন্যবলে বলীয়ান নিজাম আসিয়া মহীশূর রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। হায়দরের তখন উভয়সঙ্কট। বহুকষ্টে পেশোয়াকে তিনি যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত করেন; তারপর নিজামকেও দলে টানিয়া লন—স্থির হয়, তাঁহার পরিকল্পনা অনুসারে নিজাম আর্কটের নবাব ও ব্রিটিশদের রাজ্য আক্রমণে তাঁহার সহিত যোগদান করিবেন। ব্রিটিশদের অহেতুক শত্রুতায় হায়দর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; নিজামের সহিত মিলিত হইয়া তিনি কর্ণাটক আক্রমণ করিলেন। শুরু হইয়া গেল প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৬৭-৬৯)।

চঙ্গম ও ত্রিনোমালীর যুদ্ধে (১৭৬৭) কর্ণেল স্মিথ্-এর হাতে হায়দর ও নিজামের পরাভব ঘটিল। নিজাম রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন, কিছুকাল পরে (১৭৬৮) মাদ্রাজ সরকারের সঙ্গে তাঁহার পৃথক ভাবে এক সন্ধিও হইল। কিন্তু হায়দর এত সহজে পরাভব স্বীকার করিবার পাত্র ছিলেন না। পরাজয়ের কুফল পরিপাক করিবার কৌশল তাঁহার বিলক্ষণ জানা ছিল। কর্ণেল স্মিথকে পরাজিত করিতে না পারিলেও, অন্যান্য ব্রিটিশ সেনানীদের সহিত সংঘর্ষে তিনি কিয়দংশে সফলকাম হন। রণনিবৃত্তির কোন লক্ষণই দেখা গেল না। ১৭৬৯ সালের মার্চ মাসে নিজ ক্ষিপ্রগতি অশ্বারোহী বাহিনীর পুরোভাগে হায়দর অকস্মাৎ আসিয়া একেবারে মাদ্রাজ শহরের

সম্মুখীন হন। ভীতত্রস্ত মাদ্রাজ-সংসদ তখন সন্ধি না করিয়া পথ পান না; পরস্পরের বিজিত স্থানসমূহ প্রত্যর্পণ এবং সঙ্কটকালে পারস্পরিক সাহায্যের সর্তে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয় (এপ্রিল, ১৭৬৯)।

বাস্তববুদ্ধি হায়দর এই পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তিকেই তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির মূলভিত্তি রূপে ধরিয়া লইলেন। নিজামকে কোনরূপ বিশ্বাস ছিল না। পেশোয়া ছিলেন তাঁহার প্রধান প্রতিপক্ষ, তাঁহার হাতে হায়দরকে তুই-তুইবার পরাস্ত হইয়া প্রভূত ভূমিভাগ প্রত্যর্পণ করিতে হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় মারাঠারা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তাঁহার পক্ষে ব্রিটিশের সামরিক শক্তির সদ্ব্যবহার করার সম্ভাবনা রহিল। কিন্তু মারাঠারা যখন পুনরায় আসিয়া যথার্থই হায়দরকে আক্রমণ করিল (১৭৬৯-৭২) তখন তিনি ব্রিটিশের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিফলমনোরথ হইলেন। মাদ্রাজ সরকার তখন পদে পদে ছলনা, অনমনীয়তা এবং বিশ্বাসহানির পরিচয় দিতে লাগিলেন। এমন কি, ১৭৭২ সালের পরও তিনি মহম্মদ আলী এবং মাদ্রাজ সরকারের সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের ছলচাতুরীতে শেষ অবধি তাঁহাকে একান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতে হয়। তিনি বেশ বুঝিতে পারেন যে ভবিষ্যতে তাঁহারা তাঁহাকে আক্রমণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইতে পারেন, সেজন্য তাঁহাকে সজাগ থাকিতে হইবে। তারপর যেবার প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৫-৮২) আরম্ভ হয় সেবার মারাঠারা বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে প্রকৃষ্টতর বোধশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারণ করে, তিনিও আজীবনের মতো তাঁহার অন্তর হইতে মারাঠাদের প্রতি তাঁহার সক্রিয় বৈরভাব পরিহার করেন। ইহার পর ব্রিটিশের সহিত সংগ্রাম একরূপ অনিবার্যই হইয়া উঠিল, তাঁহার এবং পরে তাঁহার পুত্রের জীবনের প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইল ব্রিটিশের উচ্ছেদ সাধনের প্রচেষ্টা। তাই হায়দর পরে একজন ব্রিটিশ রাজদূতকে বলেন তিনি কর্ণাটক হইতে ইংরেজদের নামটুকু পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হেস্টিংসের পররাষ্ট্রনীতি

ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক ক্লাইভের পররাষ্ট্রনীতির সংস্কার সাধন: ১৭৬৯ সালে উত্তর-ভারতে যখন পুনরায় মারাঠাদের আবির্ভাব ঘটে এবং তারপর ১৭৭১ সালে তাহারা যখন দিল্লী অধিকার করিয়া মোগল সম্রাটকে দিল্লীতে আসিয়া মারাঠা শক্তির আশ্রয়ে বাস করিতে প্ররোচিত করে, তখন বাঙ্গালার গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস (১৭৭২-৭৪) স্বভাবতঃই দেখিলেন যে সেই পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে ক্লাইভের পররাষ্ট্রনীতির সংস্কার সাধনের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার পূর্বে মোগল সম্রাটকে কোরা আর এলাহাবাদ জেলা দু'টি দান করা হইয়াছিল। হেষ্টিংস স্থির করিলেন মোগল সম্রাট তখন মারাঠাদের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিবেন বলিয়াই স্থির করিয়াছেন, এবং মারাঠাদের বলবিক্রমও যখন প্রকৃত উদ্বেগের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি কোরা ও এলাহাবাদ জেলা দু'টি অযোধ্যার নবাবকে প্রত্যর্পণ করিবেন, এবং উহার বিনিময়ে অযোধ্যার নবাবকে মূল্যস্বরূপ দিতে হইবে ৫০ লক্ষ টাকা। শাহ্ আলমকে বার্ষিক যে ২৬ লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইত তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ব্রিটিশের পররাষ্ট্রঘটিত আর একটি প্রধান সমস্যা হইল রোহিলখণ্ড সম্পর্কে।

অযোধ্যার সহিত ব্রিটিশের চুক্তি (১৭৭৩): "অযোধ্যার সহিত মৈত্রী ছিল হেষ্টিংসের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান স্তম্ভ।" তিনি সর্বপ্রকারে অযোধ্যাকে বলশালী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে বারাণসীতে অযোধ্যার নবাবের সহিত তাঁহার এক চুক্তি হইল। এতকাল সুজা-উদ্দৌলার সঙ্গে ব্রিটিশের কাজকর্ম চলিতেছিল শিথিলভাবে; হেষ্টিংস তাহার পরিবর্তে তাঁহার সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট বোঝাপড়ার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রোহিলখণ্ডের তখন যে অবস্থা তাহাতে যে কোন সময়ই তাহা মারাঠাদের দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা ছিল। নবাব রোহিলখণ্ডের প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। হিমালয়ের পাদদেশে

এক উর্বর ভূমিভাগে ছিল রোহিলা আফগান নায়কদের শিথিলভাবে পরিচালিত যৌথ শাসন। রোহিলখণ্ডের সামরিক গুরুত্ব প্রসঙ্গে ওয়ারেন হেষ্টিংস বলিয়া গিয়াছেন, "রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালের পূর্বে ইংলণ্ডের নিকট স্কটল্যাণ্ড যাহা ছিল, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের দিক্ দিয়া অযোধ্যার নিকট রোহিলখণ্ড ছিল ঠিক তাহাই। এই অঞ্চলটি পদানত করিতে পারিলে উজীরের রাজ্যের আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা যেমন সম্পূর্ণ হয় তেমনই আমাদেরও পররাজ্যরক্ষার দায়িত্ব হ্রাস পায়, কেননা তিনি আমাদেরই শক্তির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।" ইহাই ছিল তথাকথিত 'রোহিলা যুদ্ধের' মূল নীতি।

রোহিলা যুদ্ধ (১৭৭৪) : যে সকল কারণ-পরম্পরা শেষ অবধি রোহিলা যুদ্ধে পর্যবসিত হয় সে সকল এবং যুদ্ধের বিবরণ মোটেই প্রীতিপ্রদ নহে। ১৭৭২ সালের জুন মাসে রোহিলা সর্দার হাফিজ রহমৎ খাঁ স্বজা-উদ্দৌলার সহিত এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হইলেন যে, স্বজা-উদ্দৌলা যদি মারাঠাদিগের রোহিলখণ্ড ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে ৪০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। ব্রিটিশ সেনাপতি রবার্ট বার্কারের (Barker) উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মারাঠাগণ রোহিলখণ্ড ছাড়িয়া গেল, ১৭৭৩ সালে আবার আসিল, আবার চলিয়া গেল। অল্পকাল পরেই পেশোয়া ১ম মাধব রাওয়ের মৃত্যুতে মারাঠা রাজ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দেওয়ায় তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। স্বজা-উদ্দৌলা রোহিলাদের নিকট প্রতিশ্রুত অর্থ দাবী করিলেন, কিন্তু তাহারা অর্থপ্রদানে অস্বীকৃত হইল। বারাণসীতে ব্রিটিশের সহিত নবাবের চুক্তি সম্পাদিত হইলে তিনি রোহিলাদিগকে শাস্তি দান ও রোহিলখণ্ড জয়ের জন্য ব্রিটিশের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি এই অভিযানের সকল ব্যয়ভার বহন করিতে, উপরন্তু ইংরেজদিগকে ৪০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। হেষ্টিংস এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু নবাব তাঁহার মত পরিবর্তন করিলেন। অবশেষে ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে অস্থিরমতি নবাব বারাণসী চুক্তির সর্ত অনুযায়ী পুনরায় ব্রিটিশ সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। কর্ণেল চ্যাম্পিয়নের (Champion) নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী রোহিলখণ্ড অভিমুখে অভিযান করিল এবং অযোধ্যার

সৈন্যদলের সহায়তায় ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মিরন কাটরায় হাফিজ রহমৎ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিল। রোহিলাগণ স্বভূমি হইতে উৎখাত হইল, রোহিলখণ্ড অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত হইল।

নবাব-উজীর এক পর্যায়ে রোহিলখণ্ড অভিযান পরিহারের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস তৎক্ষণাৎ সে প্রস্তাবে সম্মত হন। হেস্টিংস সেই সময় লিখিয়াছিলেন, "রোহিলখণ্ড অভিযানের দায়মুক্ত হইয়া আমি বরং খুশীই হই, কেননা স্বদেশে উহা কী চক্ষে দেখা হইবে সে বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহই ছিল; বরাবরই দেখিয়া আসিয়াছি সেখানে মূলনীতির উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে, অবস্থাবিশেষে তাহার যে ব্যতিক্রমও স্বীকার করা প্রয়োজন কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত নন।" সমগ্র ব্যাপারটাতে যে রাজনৈতিক অসাধুতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে লায়াল (Lyall) তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, "দুর্বল সীমান্তরেখা অপেক্ষা দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত কর্মনীতির অনুসরণ বহুগুণে অধিকতর বিপজ্জনক।" রোহিলাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ ছিল একান্তই এক অহেতুক ব্যাপার, অযোধ্যার সৈন্যদলের কার্যকলাপ ছিল অনিয়ন্ত্রিত। রোহিলাদের স্বাধীনতা "যেজন্য পদদলিত করা হয় তাহার সহিত পোলাণ্ডের রাজনৈতিক অস্তিত্বের বিলোপ সাধনের পশ্চাতে যে কারণ ছিল তাহার বাস্তবিক বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না; অধিকতর শক্তিশালী রাজ্যসমূহের প্রত্যন্তদেশে ছিল তাহাদের গুরুত্বময় অবস্থান; তাহারা যে উহা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে, তাহাদের উপর সে বিশ্বাস স্থাপন করা যাইত না।" মারাঠাদের প্রতাপ ক্রমশঃ আশঙ্কার বস্তু হইয়া উঠিতেছিল; তাহাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জন্য অযোধ্যাকে বলশালী করিয়া তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়; তাই সেই প্রয়োজনের যূপকাষ্ঠে রোহিলাদের বলিদান করা হইল। এই কারবারে টাকাকড়ি লেনদেনের ব্যাপারটিই প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে জঘন্যতম বিষয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। হেস্টিংস নিজেই মন্তব্য করিয়াছেন, "মারাঠাদের অনুপস্থিতি এবং রোহিলাদের দুর্বল অবস্থা দেখিয়া মনে হইল তাহাদের পরাজিত করিতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইবে না; তা' ছাড়া এ কথা আমি স্বীকার করি যে, স্বদেশে কোম্পানীর শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে আমার এমনই ধারণা হইয়াছিল

যে, বিদেশে তাঁহাদের অভাব অনটন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান তাহার সহিত যুক্ত হওয়ায় আমি তাঁহাদের সৈন্যবল নিয়োগ করিয়া সৈন্যদের বেতন ও অন্যান্য ব্যয়ভার যতটুকু সম্ভব লাঘব করিবার যে কোন সুযোগ পাইলেই খুশী হইতাম।"

গভর্ণর-জেনারেল রূপে ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৪-৮৫): অযোধ্যাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়া ও উহাকে সামরিক সাহায্য দান করিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস উত্তরভারত অবিরাম লুণ্ঠনাভিযানের যে তরঙ্গবিক্ষোভে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল তাহা প্রতিরোধের এক সুদৃঢ় প্রাচীর গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণর-জেনারেল (১৭৭৪-৮৫) পদে আসীন হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট ভারতে ইংরেজ শক্তিকে মারাঠাগণের সহিত সংঘর্ষে জড়িত করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের অপর এক কূটনৈতিক চালের ভুলের দরুণ হায়দর আলী ও নিজামের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। হেষ্টিংস ভারতের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত শক্তিগুলির সজ্যবদ্ধ জোটের বিরুদ্ধে আপনাকে ভয়াবহ সংগ্রামে লিপ্ত দেখিতে পাইলেন। এই জোটের এক প্রান্তে মারাঠাগণ, নিজাম ও হায়দর আলী; অন্য প্রান্তে ভারতে ইংরেজের প্রধান ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী—ফ্রান্স।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সূত্রপাত: ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে পেশোয়া মাধব রাওয়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া-পদ লাভ করেন। কিন্তু নয় মাসের মধ্যেই তিনি তাঁহার খুল্লতাত রঘুনাথ রাওয়ের কতিপয় অনুচরের হস্তে নিহত হন। সঙ্গে সঙ্গেই মারাঠাদের ইতিহাসে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়। রঘুনাথ রাও পেশোয়া রূপে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে সজ্যবদ্ধ প্রতিরোধের সৃষ্টি হইল। নারায়ণ রাওয়ের শিশুপুত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে পেশোয়া রূপে বৃত হইলেন; রঘুনাথ রাও দেশত্যাগী হইলেন, কিন্তু দাবী ছাড়িলেন না। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী সাল্‌সেটি দ্বীপ কুক্ষিগত করিবার লোভে রঘুনাথ রাওয়ের সহিত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহারা বলপূর্বক সাল্‌সেটি দ্বীপ

অধিকার করিয়া ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ই মার্চ তারিখে রঘুনাথ রাওয়ের সহিত ইংরেজরা এক সন্ধি করিলেন; ইহাকে বলে স্বরাটের সন্ধি। রঘুনাথ রাও সাল্‌সেটি ও বেসিন দ্বীপ ইংরেজকে চিরতরে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। ব্রোচ এবং স্বরাট জিলার আয়ের অংশও ইংরেজ লাভ করিবে এইরূপ স্থির হইল। ইংরেজগণ ২,৫০০ সৈন্যের এক বাহিনীর দ্বারা রঘুনাথ রাওকে সাহায্য করিতে রাজী হইল। কথা রহিল, সৈন্যদলের ব্যয়ভার বহন করিবেন রঘুনাথ রাও। এইরূপে পুণার মারাঠা নায়কগণ ও বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হইল।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৫-৮২): রঘুনাথ রাও গুজরাটে ছিলেন, তাঁহার সহিত মিলিতভাবে কার্য করিবার জন্য সৈন্যদল সহ কর্ণেল কীটিংকে (Keatinge) গুজরাটে প্রেরণ করা হইল। ছোটখাট কয়েকটি সংঘর্ষের পর ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে আড়াসে মারাঠা সৈন্যদলের সহিত ইংরেজের এক যুদ্ধ হইল। কীটিং জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে প্রভূত ক্ষতিস্বীকার করিতে হইল। ইংরেজ পক্ষে বিস্তর লোকক্ষয় হইল। ইতিমধ্যে কলিকাতার কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাটের চুক্তির বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা এই যুদ্ধকে "অযৌক্তিক, বিপজ্জনক, অননুমোদিত ও অন্যায়" যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের প্রতিবাদ সত্ত্বেও কলিকাতা হইতে কর্ণেল আপ্‌টনকে (Upton) পুণার মারাঠা সরকারের সহিত সন্ধির কথাবার্তা চালাইবার জন্য সেখানে প্রেরণ করা হইল। তিনি মারাঠাদের সহিত এক সন্ধি করিলেন। উহা পুরন্দরের সন্ধি (মার্চ, ১৭৭৬) নামে পরিচিত। আনুষ্ঠানিকভাবে স্বরাটের চুক্তি বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। স্থির হইল রঘুনাথ রাও প্রচুর বৃত্তি লাভ করিবেন, তাঁহাকে গুজরাটে বসবাস করিতে হইবে। গভর্ণর-জেনারেলের ইচ্ছাসাপেক্ষে সাল্‌সেটির অধিকার ইংরেজদের হস্তেই থাকিবে। এই সন্ধির সর্তগুলির মধ্যে ব্রোচের রাজস্ব প্রত্যর্পণ এবং যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ ১২ লক্ষ টাকা দিবার কথাও ছিল।

রঘুনাথ রাও এইরূপ হস্তক্ষেপের মর্ম অনুধাবন করিতে না পারিয়া স্থির করিলেন তিনি এই সকল সর্ত অগ্রাহ্য করিবেন। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট

পুরন্দরের সন্ধি লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে সুরাটে আশ্রয় দিলেন। এইরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে ডিরেক্টর-সভা হইতে এক বিজ্ঞপ্তি আসিয়া পৌঁছিল; তাহাতে তাঁহারা 'সর্বাবস্থায়' সুরাটের চুক্তি সমর্থন করিয়া পাঠাইলেন। ফলে সাহস পাইয়া বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট পুরন্দরের সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া রঘুনাথ রাওকে বোম্বাইয়ে আহ্বান করিলেন। ডিরেক্টর-সভার ১৭৭৮ সালের আর এক বিজ্ঞপ্তির বলে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের ভরসা আরও বাড়িয়া গেল, তাঁহারা রঘুনাথ রাওয়ের সহিত সুরাট চুক্তির ভিত্তিতে নূতন করিয়া সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। ফরাসীরা পুনরায় কূটনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত রহিয়াছে এই সন্দেহে অবস্থা আরও জটিল হইয়া উঠিল। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন, রঘুনাথ রাওকে শিশু পেশোয়া মাধব রাও নারায়ণের অভিভাবকরূপে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং সচিবদের নেতৃস্থানীয় নানা ফড়নবীশকে এবং যে অমাত্য-পরিষদ পেশোয়ার অভিভাবকের কাজ করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে শাসন-ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত করিতে হইবে। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহারা পুণা অভিমুখে এক অভিযান প্রেরণ করিলেন। বাহিনীতে সর্বশুদ্ধ তিন সহস্র সৈন্য ছিল। উহা পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে এমন সময় এক বিরাট মারাঠা বাহিনীর সম্মুখীন হওয়ায় পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল। অবশেষে ওয়াড়গাঁওয়ে আসিয়া পৌঁছিলে দেখা গেল আর পশ্চাদপসরণের পথ নাই। ওয়াড়গাঁওয়ে ব্রিটিশদের রাজনৈতিক ও সামরিক মর্যাদার পক্ষে সবিশেষ হানিকর এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল; মারাঠারা অপমানিত ব্রিটিশ বাহিনীকে নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্তন করিতে দিল (জানুয়ারী, ১৭৭৯)। আত্মসমর্পণের দায় এড়াইবার জন্য রঘুনাথ রাও মারাঠা নায়ক মহাদাজী সিন্ধিয়ার শরণাপন্ন হইলেন।

হেস্টিংস ওয়াড়গাঁওয়ের চুক্তি স্বীকার করিলেন না। তিনি ইতিমধ্যেই লেস্‌লীর (Leslie) অধিনায়কতায় এক বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। লেস্‌লীকে তিনি স্থলপথে বোম্বাই যাইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। লেস্‌লী বুন্দেলখণ্ডের সর্দারদের সহিত সংঘর্ষে জড়াইয়া পড়িলেন। কিন্তু ১৭৭৮ সালের অক্টোবর মাসে তাঁহার মৃত্যু হইল, তখন তাঁহার স্থলে সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন গডার্ড (Goddard)। তিনি তাঁহার বাহিনীকে নিরাপদে

সুরাটে লইয়া আসেন। ভারতীয় উপমহাদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এই সফল অভিযান ব্রিটিশের সামরিক মর্যাদা বৃদ্ধি করিল। রঘুনাথ রাও মহাদাজী সিন্ধিয়ার আশ্রয় হইতে পলায়ন করিয়া গডার্ডের শরণ লইলেন। গ্রাণ্ট ডাফের মতে এই পলায়নের পশ্চাতে মহাদাজীর প্রশ্রয় ছিল। কিন্তু রঘুনাথ রাওকে আর প্রাধান্য দানের কোন প্রয়োজন ছিল না; মারাঠা ও ইংরেজের এই সংঘর্ষে এখন ইংরেজরাই হইয়া উঠিল অন্যতর মূল পক্ষ।

ইংরেজের বিরুদ্ধে এক শক্তি-সমবায় গঠিত হইল। এই সমবায়ের ভিতর ছিলেন হায়দর আলী, নিজাম ও মারাঠাগণ। অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে একমাত্র নিজেদের চেষ্টায় কী করিতে পারেন বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের তাহা প্রদর্শনের উন্মত্ত অভিলাষকেও অতিক্রম করিয়া গেল মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের বিবিধ ভ্রান্ত কূটনৈতিক চাল। ১৭৭৯ সালে মাদ্রাজ সরকার নিজামের ভ্রাতা বাসালৎ জঙ্গের সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করিয়া নিজামের বিরাগভাজন হন। স্থির হয় বাসালৎ জঙ্গ মাদ্রাজ সরকারকে গুণ্টুর জেলা ইজারা দিবেন, বিনিময়ে মাদ্রাজ সরকার তাঁহার নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করেন। হায়দরের ইংরেজ-বিদ্বেষের কারণ ছিল তৃতীয় পক্ষের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ সরকারকে তাঁহার সহিত পারস্পরিক সাহায্য দানের চুক্তিতে আবদ্ধ করিতে তাঁহার অক্ষমতা; তাঁহার আশা ছিল মাদ্রাজ সরকার তাঁহার সহিত এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে, তিনি সেই চুক্তি মারাঠাদের বিরুদ্ধে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিবেন। মালাবার অঞ্চলে মাহে ছিল ফরাসীদের অধিকারে; ব্রিটিশরা তাহা অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই জন্য এবং বাসালৎ জঙ্গের ব্যাপারটা, প্রায়ই রাজ্যসীমা লইয়া বিবাদ, এবং মালাবারে অবিরাম রেষারেষির ভাব—এই সব কারণে তিনি উত্ত্যক্ত হইয়া উঠেন। ওয়াড়গাঁওয়ের চুক্তি এই বিরোধভাবাপন্ন শক্তি-সমবায় গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করে। পুণা সরকার কৃষ্ণা নদী অবধি হায়দরের বিজিত রাজ্যের সীমা বলিয়া মানিয়া লন। স্থির হয় নিজাম আক্রমণ করিবেন উত্তর-সরকার অঞ্চল, হায়দর আক্রমণ করিবেন কর্ণাটক, বেরারের মুধোজী ভোঁসলে আক্রমণ করিবেন বাঙ্গালা দেশ, আর পুণা সরকার বোম্বাইয়ের দিকে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে থাকিবেন। ফরাসীদের সহযোগিতার আশাও হায়দরের ছিল। ১৭৭৮ সাল হইতে ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল।

সবলে আঘাত হানিলেন হেস্টিংস। মুধোজীকে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করা হইল; ১৭৮০ সালে গুণ্টুর প্রত্যর্পণ করার ফলে নিজাম নিরপেক্ষ হইয়া রহিলেন। গডার্ড আসিয়া সন্ধি করিলেন ফতে সিং গায়কোয়াড়ের সঙ্গে; তারপর তিনি আহমদাবাদ আক্রমণ করিয়া তাহা জয় করিয়া ফেলিলেন। গোহড়ের রাণা মহাদাজী সিন্ধিয়াকে যথেষ্ট বিব্রত রাখিতে পারিবেন মনে করিয়া তাঁহাকেও দলে টানিয়া আনিলেন হেস্টিংস। তাঁহাকে সাহায্য দানের অভিপ্রায়ে হেস্টিংস বাঙ্গালা দেশ হইতে পাঠাইলেন ক্যাপ্টেন পপ্‌হ্যামকে (Popham)। রাণার গুপ্তচরদের সহায়তায় ১৭৮০ সালের আগস্ট মাসে পপ্‌হ্যাম মই দিয়া গোয়ালিয়রের সুদৃঢ় দুর্গে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। পপ্‌হ্যাম পরে এ কথা স্বীকার করিয়াছিলেন যে রাণার লোকজনের সাহায্য ছাড়া তিনি উহা অধিকার করিতে পারিতেন না। এই সাফল্য লাভের ফলে কয়েকটি গুরুতর ব্যাপার দেখা দিল। সিন্ধিয়াকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতে হইল উত্তরাভিমুখে। ১৭৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে গডার্ড বেসিন অধিকার করিয়া, কোঙ্কন অঞ্চলে মারাঠা বাহিনীকে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু ভোরঘাটের দিকে অগ্রসর হওয়া তাঁহার পক্ষে ভুল হইল। না বুঝিয়াই তিনি আসিয়া জড়াইয়া পড়িলেন নানা ফড়নবীশের সঙ্গে নিষ্ফল আলাপ-আলোচনায়, তারপর বর্ষাগমে সেনানিবাসে প্রত্যাগমনের চেষ্টা করিতে গেলে তাঁহার পরাজয় ঘটিল।

বোম্বাইয়ের উপকূল অঞ্চলে যখন এই সকল ঘটনা ঘটিতেছিল তখন সিন্ধিয়ার রাজ্যের একেবারে কেন্দ্রভাগে গোলযোগ পাকাইয়া তুলিবার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসের পরিকল্পনা বহুদূর অগ্রসর হয়। কর্ণেল ক্যামাক মালব আক্রমণ করেন; তারপর ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি শিপ্রি জয় করিয়া শিরোঞ্জ পর্যন্ত অগ্রসর হন। অতর্কিতে সিন্ধিয়ার শিবির আক্রমণ করিয়া তিনি সিন্ধিয়াকে ভড়কাইয়া দেন। সিন্ধিয়া তাঁহার সহিত আপোষ-মীমাংসার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে ব্রিটিশের সহিত তাঁহার এক স্বতন্ত্র সন্ধি হয়; তিনি নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন। ব্রিটিশ বাহিনী যমুনা নদী পুনরতিক্রম করে।

সলবই-এর সন্ধি (১৭৮২)ঃ প্রথমদিকে ওয়ারেন হেস্টিংসের পরিকল্পনা ছিল মুধোজী ভোঁসলের মধ্যস্থতায় আপোষের কথাবার্তা চালাইবেন,

কিন্তু এখন মহাদাজী সিন্ধিয়ার মারফৎ পুণা দরবারের সহিত আলাপ-আলোচনা চালানোই সমধিক যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইল। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে সলবই-এর সন্ধি নিষ্পন্ন হয়, সিন্ধিয়া একই সঙ্গে পেশোয়ার প্রতিনিধির এবং সন্ধির সর্তগুলি যাহাতে যথাযথভাবে পালিত হয় সেজন্য উভয় পক্ষের জামীনের কাজ করিলেন। সালসেটি দ্বীপ ব্রিটিশের হাতে রহিল, কিন্তু পুরন্দরের সন্ধির পর যে সকল স্থান ব্রিটিশের অধিকারে আসিয়াছিল তাহার সবই প্রত্যর্পণ করা হইল। পুণা সরকার রঘুনাথ রাওকে বেশ মোটা অঙ্কের একটি বৃত্তি মঞ্জুর করিলেন। পেশোয়া ও ইংরেজরা এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাঁহাদের নিজ নিজ মিত্রগণ পরস্পরের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিবেন। সন্ধির একটি সর্ত এই ছিল যে, হায়দর ইংরেজদের এবং আর্কটের নবাবের যে সকল এলাকা দখল করিয়াছিলেন তাহা তিনি ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন। অবশ্য সর্তটি কখনও কার্যে প্রয়োগ করা হয় নাই; বস্তুতঃ, ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে হায়দরের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পুণায় সলবই-এর সন্ধি আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুমোদন করাই হয় নাই। মারাঠা প্রধান মন্ত্রী (অর্থাৎ নানা ফড়নবীশ) ছিলেন রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিতে অতিশয় ধুরন্ধর ব্যক্তি; তিনি দেখিলেন বিবদমান পক্ষগুলির মধ্যে সন্ধির সর্তগুলিকে যদি তিনি অনিশ্চিত কালের জন্য ঝুলাইয়া রাখিতে পারেন তাহা হইলে একদিকে হায়দর আলী ও টিপু, অন্যদিকে হেস্টিংসের মধ্যে শক্তিসাম্য তিনি আপনার করধৃত রাখিতে পারিবেন। ইংরেজের পক্ষে সন্ধির সাকুল্য লাভ হইল এই যে, তাহারা সালসেটি লাভ করিল ও মারাঠাগণের সহিত আগামী কুড়ি বৎসরের জন্য তাহাদের আর কোন বিবাদ বাধিল না। কিন্তু যুদ্ধবাবদে তাহাদের প্রভূত অর্থক্ষয় হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৮০-৮৪)ঃ দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে। যদিও ইহাতে নিজাম ও ভোঁসলে সহযোগিতা করেন নাই, তবুও—মাদ্রাজের সহকারী সেনাধ্যক্ষ ম্যাকলীয়ডের ভাষায়—হায়দর ব্রিটিশদের "হাতের আঙুলের গ্রন্থিতে বিশ্রী ঠোকর মারিয়াছিলেন।" তিনি প্রায় নব্বই হাজার সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া কর্ণাটকে প্রবেশ করিলেন। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না; তদুপরি

ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ সুবিখ্যাত বক্সার-বিজয়ী বীর সার হেক্টর মন্‌রো অভিযানের গোড়ার দিকে বলিতে গেলে প্রায় চরম অস্থিরমতিত্বের—নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিতে লাগিলেন। হায়দর মাদ্রাজের চারিপাশে এবং শহরের যোগাযোগ-ব্যবস্থার ও ভেলোরের চতুর্দিকেও একটি জনহীন বৃত্ত রচনা করিয়া ফেলিলেন। উহা নিরঙ্কুশ, নির্বিচার ধ্বংসলীলা ছিল না, উহা ছিল যুদ্ধের প্রয়োজনে অবলম্বিত ব্যবস্থা। সামরিক প্রয়োজনঘটিত কতিপয় ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, ঘাট পর্বতমালার নিম্নে তিনি যে সকল অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন তাহা যতদূর সম্ভব সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। পুত্র টিপুর সহায়তায় তিনি পল্লিলোরে বেইলীর (Baillie) নেতৃত্বচালিত চারি সহস্র সৈন্যের এক বাহিনীকে পরাভূত করেন। এই বাহিনী মন্‌রোর চালিত সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইবার জন্য গুণ্টুর হইতে কাঞ্জিভরমের অভিমুখে যাইতেছিল। শত্রুর কামান গর্জন কর্ণগোচর হওয়া সত্ত্বেও মন্‌রো দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার দ্বারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন, পল্লিলোরের এই বিপর্যয়ের পর তিনি মাদ্রাজ অভিমুখে পলাইবার পথ খুঁজিয়া পাইলেন না।

ওয়ারেন হেষ্টিংস এই সংবাদ পাইয়া অবস্থার প্রতিকারসাধনে বিশেষভাবে যত্নবান হইলেন। তিনি স্যার আয়ার কূটকে (Eyre Coote) অতিরিক্ত অর্থ ও সৈন্যবল সমভিব্যাহারে হায়দর আলীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার্থে পাঠাইলেন। দ্য'অর্‌ভ্‌সের (D' Orves) অধিনায়কতায় এক ফরাসী নৌবহর ইতিমধ্যে মাদ্রাজ উপকূলে আবির্ভূত হইয়াছিল। মাদ্রাজ হইতে স্যার আয়ার কূট যখন তাঁহার বাহিনী সমেত কুড্ডালোরে আসিয়া পৌঁছাইলেন, ফরাসী বহর সমুদ্রপথে তাঁহার রসদ সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিল। হায়দর স্থলপথে তাঁহার যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করিয়া দিলেন। ইয়র্কটাউনে কর্ণওয়ালিশের অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল কূটের অবস্থা সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এক দুর্জ্ঞেয় কারণে দ্য'অর্‌ভ্‌সের পরিচালিত ফরাসী নৌবহর মাদ্রাজ ছাড়িয়া চলিয়া গেল; কূটের পক্ষে সমুদ্রপথে মাদ্রাজ হইতে রসদ পাইবার পথে আর কোন বাধা রহিল না। ফরাসী নৌ-সেনাপতির অক্ষমতার জন্য হায়দর তাঁহার সামরিক জীবনের শ্রেষ্ঠ সুযোগ হারাইলেন। স্যার আয়ার কূটের কুড্ডালোর হইতে নিষ্ক্রমণ ইঙ্গ-ভারতীয় ইতিহাসের এক প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ইহার পর কূট হায়দরের বিরুদ্ধে পর পর তিনটি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন—পোর্টো নোভো (১লা জুলাই, ১৭৮১), পল্লিলোরের দ্বিতীয় যুদ্ধ (২৭শে আগস্ট, ১৭৮১), ও শোলিঙ্গুর (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮১)। কিন্তু ব্রিটিশদের এই সকল জয়ের দ্বারা বিশেষ কিছু লাভ হইল না। হায়দর কেবলমাত্র যে ভূমির উপর দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন তাহা হারাইলেন। তিনি তাঁহার দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থার উপর অচিরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইলেন। ইংরেজ পর্যাপ্ত পরিমাণ রসদের অভাবে সমুদ্রোপকূল হইতে অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিতে পারিল না। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে সুযোগ্য নৌ-সেনাপতি গু'সাফ্রেনের (de Suffrein) অধিনায়কত্বে এক শক্তিশালী ফরাসী নৌবহর ভারত মহাসাগরে আবির্ভূত হইল। ইংরেজ নৌ-সেনাপতি স্যার এডওয়ার্ড হিউজেস ও তাঁহার মধ্যে পাঁচটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হইল, কিন্তু কোনটির দ্বারাই কিছু নিষ্পত্তি হইল না। কেবল এই সকল সংঘর্ষের ফলে নৌ-যুদ্ধে ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্ব আরও ভালভাবে প্রমাণিত হইল। ফরাসীদের মতলব ছিল ডুপ্লে ও লালীর সময়কার পুরাতন ফরাসী সেনাপতি বুসিকে তাহারা জলপথে হায়দর আলীর সহিত সহযোগিতা করিতে পাঠাইবে, কিন্তু হায়দরের মৃত্যুর পূর্বে বুসির দেখা মিলিল না। পরিচালন-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যই হউক আর ভাগ্যের বিরূপতার জন্যই হউক, ফরাসীরা ভারতবর্ষে প্রয়োজনের মুহূর্তে একজন সুযোগ্য স্থল-সেনাপতি কিংবা একজন সুযোগ্য নৌ-সেনাপতির সাহায্যলাভে বঞ্চিত ছিল। সাফ্রেন যখন পণ্ডিচেরীতে পৌঁছাইলেন তখন বৎসরাধিক কাল বিলম্ব হইয়া গিয়াছে; এদিকে হায়দরের ভাগ্য যখন অতিশয় সুপ্রসন্ন, গু'অর্ভসের শৈথিল্য অথবা কাপুরুষতা হায়দরকে সুনিশ্চিত জয়লাভের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিল।

১৭৮২ খ্রীস্টাব্দের অভিযানে হায়দর কেবলমাত্র একটি যুদ্ধে বড় রকমের জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঞ্জোরে টিপু ব্রেথওয়েট (Braithwaite) চালিত ২,০০০ সৈন্যের এক বাহিনীকে পরিবৃত করিয়া তাহাদিগকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। হায়দর ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও যুদ্ধ চলিতে থাকে। কিন্তু ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সন্ধি হইল। ইংরেজ কর্তৃক বিদনূর জয়ের

এক চেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইল। টিপু ম্যাঙ্গালোর অবরোধ করিলেন। ইংরেজরা ইতঃপূর্বে ম্যাঙ্গালোর দখল করিয়া লইয়াছিল। কর্ণেল ফুলার্টনের (Fullarton) নেতৃত্বে এক ইংরেজ বাহিনী ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কোইয়াম্বাটোর দখল করিল। মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড ম্যাকার্টনী (Macartney) সন্ধির জন্য অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন; টিপু ইংরেজের সন্ধির প্রস্তাবে রাজী হইলেন। অবশেষে ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। বিজিত অঞ্চল পরস্পরকে প্রত্যর্পণ ও যুদ্ধবন্দী-দিগকে মুক্তিদানের সর্তে যুদ্ধ শেষ হইল। সন্ধির সর্তগুলি হেস্টিংসের বিশেষ মনঃপূত হয় নাই।

হেস্টিংসের কৃতিত্ব : প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংস নিম্নোক্তরূপ উক্তি করিয়া গিয়াছেন—"মারাঠা যুদ্ধের উদ্ভবের কারণ ও সূচনার উপর আমার কোন হাত ছিল না। কলঙ্কের হাত হইতে একটি প্রেসিডেন্সীকে এবং ধ্বংসের কবল হইতে উভয় প্রেসিডেন্সীকে রক্ষার ব্যাপারে আমি নিমিত্তমাত্র হইয়াছিলাম।" বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী রক্ষায় তিনি যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন উহার গুরুত্ব বিবেচনা করিলে, তাঁহার দাবীকে নম্র বলিতে হয়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার প্রসার (১৭৭২-১৭৯৩)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওয়ারেন হেস্টিংস

দ্বৈত শাসনের অবসান—ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাঙ্গালার গভর্ণর নিযুক্ত হন ; ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁহাকে গভর্ণর-জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়। স্যার আলফ্রেড লায়াল বলিয়াছেন যে, হেস্টিংস শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কোম্পানী আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা বর্জনের সিদ্ধান্ত করেন। গভর্ণররূপে বারো-তেরোজন সদস্য লইয়া গঠিত কাউন্সিল পরিচালনা করিতে হেস্টিংসের মোটেই অসুবিধা হইত না ; তিনি সকলের উপরে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হন। তিনি বাঙ্গালার ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার নীতি প্রবর্তনে সচেষ্ট হন। হেস্টিংস 'দস্তক' প্রথা একেবারেই তুলিয়া দিলেন। এই প্রথায় কোম্পানীর কর্মচারী অথবা কোম্পানীর নিযুক্ত দালালদিগকে সরকারের প্রাপ্য কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত ; এবিষয়ে নানারূপ দুর্নীতি লাগিয়াই ছিল। কোম্পানীই যখন এখন গভর্ণমেণ্ট তখন এই কুপ্রথাকে উঠাইয়া দিতে বেগ পাইতে হইল না। হেস্টিংস জমিদারী 'চৌকী' অর্থাৎ শুল্ককেন্দ্রসমূহের (Customs house) বিলোপ সাধন করিলেন। অতঃপর কেবলমাত্র কলিকাতা, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, পাটনা ও ঢাকা এই পাঁচ জায়গায় পাঁচটি কেন্দ্রীয় শুল্ককেন্দ্র থাকিবে এইরূপ স্থির হইল। বাণিজ্য-শুল্কের হার হ্রাস করিয়া শতকরা আড়াই ভাগে বাঁধিয়া দেওয়া হইল, স্থির হইল সকলকেই এই শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। লবণ, সুপারি ও তামাক এই তিনটি একচেটিয়া পণ্য বাদে আর সকল দ্রব্যই এই শুল্ক নীতির আওতায় পড়িল।

ওয়ারেন হেস্টিংস ডিরেক্টর-সভার (Court of Directors) নির্দেশে এই দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত সংস্কার কার্যে পরিণত করেন।

অতঃপর কোম্পানী সাব্যস্ত করিলেন তাঁহারাই এখন হইতে দেওয়ানের কার্য করিবেন; ফলে বাঙ্গালা ও বিহারের নায়েব-দেওয়ানের সেরেস্তা অবলুপ্ত হইল। নায়েব-দেওয়ান রেজা খাঁ ও সিতাব রায় ডিরেক্টর-সভার আদেশক্রমে শুধু যে তাঁহাদের পদ হইতেই অপসারিত হইলেন তাহা নহে, কোম্পানীর অর্থ আত্মসাতের দায়ে অভিযুক্ত হইলেন। কিন্তু উভয়েই সসম্মানে মুক্তিলাভ করেন। নবাবের বৃত্তি ইতিপূর্বেই হ্রাস করিয়া করিয়া (বার্ষিক) ৩২ লক্ষ টাকা ধার্য হইয়াছিল; হেস্টিংস তাহা ১৬ লক্ষ টাকায় নামাইয়া আনিলেন।

হেস্টিংসের রাজস্ব-ব্যবস্থা: তবে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের একটি সহজ প্রণালী উদ্ভাবনে হেস্টিংসকে সর্বাধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এ কাজে তিনি সাফল্য লাভ করিতেও পারেন নাই। প্রচলিত ব্যবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে জনৈক লেখক বলিয়াছেন উহা ছিল এমনই এক 'অপ্রবেশ্য গোলকধাঁধা যাহার রহস্যভেদের চাবিকাঠির সন্ধান পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই ছিল না'। ক্লাইভ পুরাতন ব্যবস্থাই বহাল রাখিয়াছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের চেষ্টা হইল রাজস্ব নির্ধারণ ও রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নিজস্ব নূতন প্রণালী উদ্ভাবন। আকবরের আমলেও বাঙ্গালার জমিদারেরা ছিলেন 'বিত্তশালী, শক্তিমান এবং সংখ্যায় অগণন'। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে, মুর্শিদকুলী খাঁ যখন ছিলেন বাঙ্গালার দেওয়ান ও নাজিম তখন—যদিও তিনি তাঁহার শাসন-ক্ষমতার বলে নিজেকে জমিদারকুলের সন্ত্রাসস্থল রূপে প্রতিপন্ন করার ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন তবুও—জমির উপর জমিদারের মৌরসী স্বত্ব স্বীকার করা হইত। জমিদার ছাড়া রাজস্ব-সংক্রান্ত আর-এক শ্রেণীর কর্মকর্তা ছিলেন কানুনগো; তিনি ছিলেন জেলার নিবন্ধক, উহার লেখ্য-রক্ষক।

হেস্টিংস এই সকল কর্মকর্তাদের সঙ্গে সহযোগিতায় পরাঙ্মুখ ছিলেন। বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণের জন্য তিনি নিয়োগ করিলেন এক ভ্রাম্যমাণ মণ্ডলী (Committee of Circuit)। স্থির হইল জমির যথার্থ মূল্য নির্ধারণের জন্য, যিনি সর্বোচ্চ মূল্যদানে স্বীকৃত হইবেন তাঁহাকেই পাঁচ বৎসরের মেয়াদে জমি বিলি করিয়া দেওয়া হইবে। স্বভাবতঃই এ ব্যবস্থার

ফল হইয়া দাঁড়াইল মারাত্মক ; ইতিপূর্বেই দেশ ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল, এবার তাহা গিয়া পড়িল ফাট্‌কাবাজদের হাতে. তাহারা প্রজাদের শোষণ করিয়া গা ঢাকা দিতে শুরু করিল। ক্রমশঃ সকলের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া উঠিতে লাগিল যে, জমিদার-দের সঙ্গে ব্যবস্থা করাই বহুগুণে সমীচীন হইবে, কেননা তাঁহারা অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তি নহেন, তাঁহাদের মধ্যে চরিত্রবত্তা আছে, তাঁহাদের উপর নির্ভর করা চলে। সভাপতি (অর্থাৎ গভর্ণর) ও তাঁহার সংসদকে লইয়া একটি রাজস্ব-মণ্ডলী (Committee of Revenue) গঠন করা হইল ; রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজকর্মের ভার অর্পণ করা হইল প্রত্যক্ষভাবে সেই মণ্ডলীরই উপর। খাল্‌সা (অর্থাৎ কোষাগার) মুর্শিদাবাদ হইতে তুলিয়া আনা হইল কলিকাতায়। প্রত্যেক জেলায় রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য দায়ী রহিলেন সমাহর্তা (Collector) নামধেয় অধীক্ষক, তাঁহার সহায়ক রূপে নিযুক্ত হইলেন একজন করিয়া ভারতীয় দেওয়ান।

১৭৭২ সালে ডিরেক্টর-সভা সমাহর্তাদের (Collectors) স্থানান্তরিত করিয়া রাজস্বসংগ্রহের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের আদেশ দিয়া পাঠাইলেন। বিভিন্ন জেলায় কাজকর্ম অধীক্ষণের জন্য কাউন্সিলের দুইজন সদস্য এবং কাউন্সিল হইতে নিম্নতর তিনজন প্রধান কর্মচারীকে লইয়া কলিকাতায় একটি রাজস্বমণ্ডলী (Committee of Revenue) গঠন করা হইল। ভারতীয় দেওয়ানদের কাজকর্ম অধীক্ষণ করিতেছিলেন রায় রায়ান উপাধিধারী জনৈক ভারতীয় কর্মচারী ; স্থির হইল তিনিই রাজস্ব-মণ্ডলীর সদস্যগণকে তাঁহাদের কাজকর্মে সাহায্য করিবেন। সময় সময় পরিদর্শক প্রেরণ করাও যাইত। স্থির হইল প্রদেশ তিনটিকে সাময়িক ভাবে ছয়টি বিভাগে বিভক্ত করা হইবে, প্রত্যেকটি বিভাগ থাকিবে এক-একটি প্রাদেশিক সংসদের (Provincial Council) অধীনে, প্রত্যেকটি সংসদ কোম্পানীর একজন প্রধান (Chief) এবং চারিজন প্রবীণ কর্মচারী লইয়া গঠিত হইবে। সমাহর্তৃগণের অপসারণের পর এক-একটি জেলার ভার থাকিবে এক-একজন ভারতীয় দেওয়ানের উপর।

হেস্টিংসের বিচার-বিষয়ক বিধান : ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন গভর্ণর ছিলেন তখনই প্রথম দেখা দেয় বাণিজ্য-সংস্থা হইতে শাসন-কৃত্যক পৃথকী-

করণের স্থচনা। গভর্ণর রূপে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব ছিল বিভিন্ন ধর্মাধিকরণ সৃষ্টি। মোগলদের আমল হইতেই ভূমি-রাজস্ব ও দেওয়ানী বিচারের মধ্যে ছিল নিবিড় সম্বন্ধ। ভ্রাম্যমাণ সংসদের (Committee of Circuit) সুপারিশ অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় স্থাপন করা হইল দুইটি করিয়া ধর্মাধিকরণ—মফস্বল দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারী আদালত। মফস্বল দেওয়ানী আদালতে সভাপতির কাজ করিতেন সমাহর্তা (কালেক্টর), আর ফৌজদারী আদালতে কাজী অথবা মুফ্‌তী আইনের ব্যাখ্যা ও দণ্ডদান করিতেন এবং আদালতের কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণের জন্য উপস্থিত থাকিতেন সমাহর্তা। ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সীতে স্থাপিত হইল দুইটি উচ্চতর ধর্মাধিকরণ—মফস্বল দেওয়ানী আদালতগুলি হইতে আবেদন শুনানীর জন্য সদর দেওয়ানী আদালত এবং ফৌজদারী আদালতগুলি হইতে আবেদন শুনানীর জন্য সদর নিজামত আদালত। সদর দেওয়ানী আদালতে অধ্যক্ষতা করিতেন কাউন্সিলের দুইজন সদস্যসহ স্বয়ং প্রেসিডেন্ট বা গভর্ণর; সদর নিজামত আদালতে অধ্যক্ষের কাজ করিতেন নাজিম অর্থাৎ নবাব কর্তৃক নিযুক্ত একজন বিচার-বিভাগীয় প্রধান কর্মচারী। যাহাতে মোগল সম্রাটের দেওয়ানরূপী কোম্পানীর শাসন-বিধানে কোনরূপ বাধা না জন্মে সেজন্য ফৌজদারী দণ্ডবিধি অধীক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। "উচ্চতম ধর্মাধিকরণসমূহ, রাজস্ব-সংক্রান্ত শ্রেষ্ঠ শাসনাধিকার এবং খাল্‌সাকে মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করায় হেষ্টিংস জ্ঞাতসারেই এমন একটি কর্মনীতিকে রূপদান করিয়া চলিতে-ছিলেন যাহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল শেষোক্ত স্থানকে ব্রিটিশ-বঙ্গের রাজধানীতে পরিণত করা।" "মোগল সাম্রাজ্যের সংবিধান অনুসারে কাজ করার অজুহাতে কোম্পানীর কর্মচারীরা গড়িয়া তোলেন একটি আভ্যন্তরীণ শাসনযন্ত্র, তারপর যখন তাঁহাদের সেই শাসনযন্ত্রের প্রাকার একটি বিশেষ উচ্চতায় আসিয়া উপনীত হয় তখন তাহার মধ্যরেখায় আসিয়া উদয় হইল ব্রিটিশ মুকুট-রবি, আর মোগল সাম্রাজ্যের অস্তাচলশায়ী নক্ষত্রপুঞ্জ যে ছায়া বিস্তার করিতেছিল তাহা চিরতরে অদৃশ্য হইয়া গেল।"

হেস্টিংস ও তাঁহার কাউন্সিল : রেগুলেটিং অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হওয়ার

পর ১৭৭৪-৭৬ সালের মধ্যে, গভর্ণর-জেনারেল রূপে ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহার ক্ষুদ্র কাউন্সিলে ফ্রান্সিস, ক্লেভারিং ও মন্‌সনের দ্বারা ভোট-যুদ্ধে অনবরত পরাভূত হইতে থাকেন। ১৭৭৬ সালে মন্‌সনের মৃত্যু হয়, তখন নিজের অতিরিক্ত ভোটের বলে হেষ্টিংস স্বকীয় প্রাধান্য রক্ষার সুযোগ লাভ করেন। ১৭৭৭ সালের আগস্ট মাসে ক্লেভারিং-এরও মৃত্যু হয়, ফলে কাউন্সিলের উপর হেষ্টিংসের কর্তৃত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। মোটের উপর বলিতে গেলে ১৭৮৫ সালে হেষ্টিংসের ভারত-ত্যাগ অবধি তিনি তাঁহার কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাউন্সিলের সহিত তাঁহার বিবাদের একটি ফল হইয়াছিল যাবতীয় কর্মচারীর মধ্যে একটা রেষারেষির ভাব সৃষ্টি, কিন্তু নূতন কাউন্সিলের মারফৎ একটি নূতন অনুসন্ধিৎসার ভাবও সৃষ্টি হইয়াছিল। স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস (Philip Francis) রাজস্ব-সংক্রান্ত সমস্যার স্বরূপ অনুধাবনে অপূর্ব পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন; তাঁহার বিভিন্ন মন্তব্য-লিপিতে দেখা যায় তিনি জমিদারদের সঙ্গে কোন-একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করার জন্য ওকালতি করিতেছেন। কোন কোন জেলা-কর্মচারী হয়তো এরূপ বন্দোবস্তের কথা প্রথম উত্থাপন করিয়া থাকিবেন, তবুও 'বাঙ্গালাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আদি সমর্থক' রূপে কাহাকেও বর্ণনা করিতে হইলে সে সম্মান ফ্রান্সিসকেই দান করিতে হয়।

হেস্টিংসের রাজস্ব-নীতির ক্রমাভিব্যক্তিঃ ক্রমশঃ হেষ্টিংসের মনে এই ধারণার উদয় হইল যে একজনের জীবৎকাল অথবা দুইজনের যুগ্ম জীবৎকালের জন্য একটা বন্দোবস্ত করাই সমীচীন। ১৭৭৬ সালে তিনি আমিনী কমিশন নামে এক কমিশন নিয়োগ করিলেন; কমিশন কর্তৃক বিস্তর মূল্যবান তথ্য সংগৃহীতও হইল। কিন্তু তথ্যসমূহের আভ্যন্তরীণ বৈষম্যের জন্য ডিরেক্টরগণ সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন; ফলে বৎসর বৎসরই নূতন নূতন বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। যাহা হউক, কাউন্সিলে কর্তৃত্ব লাভ করিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহার অভীপ্সিত কেন্দ্রীকরণনীতিকে কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণতা দান করেন। প্রাদেশিক সংসদগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া তৎসমুদয়ের যাবতীয় ক্ষমতা রাজস্ব-মণ্ডলীর (Committee of Revenue) উপর অর্পণ করা হইল। সমাহর্তৃগণ পুনরায় নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু রাজস্ব সম্পর্কে যে

নূতন বন্দোবস্ত হইল তাহার উপর তাঁহাদের কোন হাত রহিল না। "আশা হইল দেশময় যে দুর্নীতি ওতঃপ্রোত হইয়া ছিল তাহার প্রভাব-সীমার বাহিরে থাকিয়া কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অপরের সহায়তা ব্যতীতই এই একটি অপরিজ্ঞাত ও জরাজীর্ণ ব্যবস্থাকে আয়ত্তে রাখিতে পারিবেন।" কিন্তু ১৭৮২ সালে স্যার জন শোর যথার্থই বলেন যে "বর্তমানে ১৭৭৪ সালের তুলনায় জেলাগুলির প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কম, রাজস্বের হেরফেরও আমরা তেমন বুঝিতে পারি না।" এইভাবেই ওয়ারেন হেষ্টিংস ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে ব্যর্থকাম হন।

সিভিল সার্ভিসের সূত্রপাত ঃ ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার ক্রমাভিব্যক্তিতে আরও একটি ত্রুটি লক্ষণীয়। হেষ্টিংস বাণিজ্য-ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক 'সিভিল সার্ভিস' বা পালন-কৃত্যকের ভিত্তি স্থাপন করেন বটে, কিন্তু তিনি উহার সম্মুখে কোন উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই, কেননা ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য তাঁহাকে অনেক অযোগ্য প্রার্থীকে কার্যে নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে সমগ্র ব্যবস্থাটি কলুষিত হইয়া উঠে। ইয়র্কের আর্চবিশপের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য তিনি তাঁহার ২১ বৎসর বয়স্ক পুত্রের উপর বারাণসীর কর্তৃত্বভার অর্পণ করেন; ডিরেক্টর-সভার সভাপতি স্থলিভ্যান-এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য তাঁহার পুত্রকে মঞ্জুর করেন অহিফেন-ব্যবসায়ের সনদ, স্থলিভ্যান-পুত্র তাহা ৪০,০০০ পাউণ্ডের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া দেন। অবশ্য এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে হেষ্টিংস ছিলেন এক সনন্দপ্রাপ্ত বণিকসঙ্ঘের মুখ্য ভৃত্য মাত্র, কর্ণওয়ালিস এবং ওয়েলেস্‌লীর ন্যায় পার্লামেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট রাজ্যশাসক ছিলেন না, তাই তাঁহার পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতার জন্য তাঁহাকে বহু ক্ষেত্রে অন্যায়ের সঙ্গে রফা করিয়া চলিতে হইত। তবে ইহারই মধ্যে আবার একটি সুলক্ষণও চোখে পড়ে। তাঁহারই স্থাপিত ভিত্তির উপর ছিল লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, তবুও লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতীয় কর্ম-সংস্থাসমূহকে যেরূপ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন হেষ্টিংসের চিত্তে সেরূপ কোন সংশয়ের ভাব ছিল না।

হেস্টিংসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ (১৭৮৮—১৭৯৫) ঃ শাসকরূপে হেষ্টিংসের কৃতিত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইলেই কতিপয় বিতর্কমূলক

প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে কমন্স সভা চৈৎ সিংহ ও অযোধ্যার বেগমদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার, তাঁহার দ্বারা অন্যায়ভাবে চুক্তিপত্র (contract) বিতরণ এবং উৎকোচ ও উপঢৌকন গ্রহণ, এই সকল গুরুতর অভিযোগে তাঁহাকে লর্ড্‌স্ সভার নিকট অভিযুক্ত (impeach) করেন। রোহিলা যুদ্ধের জন্যও তাঁহাকে অভিযুক্ত করার চেষ্টা হয়, কিন্তু কমন্স সভা এই বিষয়টিকে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তালিকায় স্থানদানের অনুমতি প্রদান করে নাই।

নন্দকুমার সংক্রান্ত মামলা (১৭৭৫)ঃ নন্দকুমার সংক্রান্ত মামলা সম্পর্কেও তাঁহার প্রতি সন্দেহ পোষণের অবকাশ আছে। এই মামলার তথ্যসমূহ সর্বজনবিদিত। নন্দকুমার ছিলেন জনৈক প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ; নবাবদের অধীনে তিনি বিবিধ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কাউন্সিলে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে এই মর্মে এক অভিযোগ আনেন যে হেষ্টিংস মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী মণি বেগমকে নবাবের অভিভাবিকা রূপে মনোনয়নের জন্য প্রচুর উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ হেষ্টিংস যখন মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তিনি নিজের হাতখরচা বাবদ ১,৫০,০০০ টাকা লইয়াছিলেন। সুতরাং নন্দকুমারের এই অভিযোগের মূলে কিছু সত্য ছিল। এ বিষয়ে তদন্ত হইতেছে এমন সময় এক কুসীদজীবীর দালাল নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা আনে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে বিচারার্থে উপস্থিত করা হয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হন, এবং তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়—প্রায় সকলেরই মনে হইল কেবল নামেমাত্রই জালিয়াতির জন্য তাঁহার প্রাণ গেল, আসলে তাঁহার প্রাণ গেল স্বয়ং গভর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার অপরাধে। এ বিষয়ে গভর্ণর-জেনারেল এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মধ্যে যোগসাজস ছিল কি না তাহা প্রমাণ করার কোন উপায় নাই। তবে স্যার আল্‌ফ্রেড লায়ালের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে প্রধান বিচারপতি ইম্পে হেষ্টিংসের মুশ্‌কিল আসানের জন্য সদাসর্বদাই সজাগ থাকিতেন এবং পরে তিনি 'বেগমদের অর্থকোষে হাম্‌লা করার কাজটিকেও আইনের মন্ত্রে শোধন করিতে' পশ্চাৎপদ হন নাই। যে আইনের বলে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হয় ভারতবর্ষে তাহা প্রযোজ্য ছিল কি না তাহা ছিল সন্দেহের বিষয়; তাহা ছাড়া

জালিয়াতির জন্য প্রাণদণ্ড-বিধান ছিল এ দেশের চিরাচরিত বিধিবিধানের বিপরীত ; সুতরাং অভিযোগ প্রমাণিত হইয়া থাকিলেও ন্যায়নীতির দিক দিয়া প্রাণদণ্ড মকুব করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। নন্দকুমারের পরে জালিয়াতির অপরাধে আর কোন ভারতবাসীরই প্রাণদণ্ড হয় নাই, এবং পরে, ১৮০২ সালে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ স্পষ্টভাষায়ই এ কথা স্বীকার করেন যে ইহা প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধ নয়। নন্দকুমারের বেলায় দণ্ডার্হ ব্যক্তি আবার ছিলেন গভর্ণর-জেনারেলের ফরিয়াদী। প্রধান বিচারপতির হাতে দণ্ড হ্রাস করার ক্ষমতাও ছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার সে ক্ষমতা কার্যে প্রয়োগ করেন নাই ; তাহা ছাড়া এরূপ প্রমাণও আছে যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের একজন আশ্রিত ব্যক্তি নন্দকুমারের কৌঁসুলী ফারের সাহেবকে দণ্ডহ্রাসের আবেদন-পত্র দাখিল করিতে বাধা দিয়াছিল।

চৈৎ সিংহ সংক্রান্ত ব্যাপার (১৭৭৮-১৭৮১) ঃ বারাণসীর রাজা চৈৎ সিংহের প্রতি হেষ্টিংসের ব্যবহার 'নৃশংস ও প্রতিহিংসাপ্রণোদিত' রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ফ্রান্স এবং মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তাঁহার অর্থের প্রয়োজন হয়। বারাণসী-রাজ ছিলেন প্রচুর বৈভবের অধিকারী। তদুপরি তিনি হইয়া উঠিয়াছিলেন হেষ্টিংসের বিরাগভাজন। ১৭৭৭ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস পদত্যাগ করিয়াছেন কি না এই প্রশ্ন লইয়া এক বিতর্ক উপস্থিত হয় এবং ক্লেভারিং নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণর-জেনারেল রূপে জাহির করেন ; তখন বারাণসীরাজ ক্লেভারিং-এর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুপ্রীম কোর্ট হেষ্টিংসের পক্ষেই রায় দেন। সম্ভবতঃ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করার জন্য হেস্টিংস বারাণসী-রাজকে কখনও ক্ষমা করিতে পারেন নাই। তারপর মারাঠাযুদ্ধ এবং ফ্রান্সের সহিত সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিলে গভর্ণর-জেনারেল যখন তাঁহার কোষাগার পূর্ণ করিয়া তুলিবার উপায় অন্বেষণে বাধ্য হন তখন তিনি স্থির করেন যুদ্ধের জন্য বারাণসী-রাজের নিকট ৫ লক্ষ টাকার এক বিপুল সাহায্য দাবী করিয়া পাঠাইবেন। এই দাবীর টাকা প্রদত্তও হয় (১৭৭৮)। ১৭৭৯ সালে নূতন করিয়া সেই একই দাবী পেশ করা হইল ; কিছুদিন বিলম্বের পর এবারও বারাণসী-রাজ দাবী পূরণ করিলেন। ১৭৮০ সালে গভর্ণর-জেনারেল তলব করিয়া পাঠাইলেন ২,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের একটি দল। রাজা ইহাতে আপত্তি জানাইলে

সৈন্যসংখ্যা ১,০০০ অশ্বারোহীতে নামাইয়া আনা হইল। রাজা কোনক্রমে ৫০০ অশ্বারোহী ও ৫০০ পদাতিক সংগ্রহ করিয়া সে সংবাদ হেষ্টিংসকে জানাইলেন। কিন্তু হেষ্টিংস ততদিনে মনে মনে এই সঙ্কল্প স্থির করিয়াই বসিয়াছিলেন যে তিনি রাজার উপর ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা প্রদানের এক পর্বতপ্রমাণ বোঝা চাপাইয়া দিবেন। হেষ্টিংস নিজেই লিখিয়াছেন, "তাঁহার অপরাধের দণ্ডবিধান করিয়া আমি কোম্পানীর দুর্দশা অপনোদনের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলাম।" রাজা যদি এই দাবী পূরণে বিমুখ হন তবে তাঁহাকে অপসরণ করিবার জন্য তিনি নিজেই বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। রাজার উত্তর তাঁহার নিকট দ্ব্যর্থব্যঞ্জক প্রতিভাত হইল; তিনি তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিলেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ বোধ করিয়া রাজার সৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; তাহাদের হাতে একদল সিপাহী ও সামরিক কর্মচারীর প্রাণ গেল। হেষ্টিংসের চুনারে পলায়ন ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না। তারপর আসিয়া পৌঁছিল ব্রিটিশ সেনাদল। চৈৎ সিংহ গোয়ালিয়রে পলায়ন করিলেন। তাঁহার রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহা তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে দান করা হইল, করভার ধার্য হইল প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু এ ব্যাপারে কোম্পানীর কণামাত্রও লাভ হইল না সৈন্যরা লুটপাট করিয়া যাহা পাইল সবই নিজেদের লাভের কড়ি হিসাবে আত্মসাৎ করিয়া বসিল। অতিরিক্ত করভারের চাপে বারাণসী জেলা উৎসন্ন হইয়া পড়িবার উপক্রম দেখা দিল; এই অভূতপূর্ব আর্থিক চাপ হ্রাস না করা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলটি সে ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই।

চৈৎ সিংহ একজন প্রায় স্বাধীন রাজা ছিলেন, না কি তিনি ছিলেন 'সামান্য একজন জমিদার মাত্র'—ইহা লইয়া বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে তিনি সামান্য একজন জমিদারমাত্রই ছিলেন, উহার অধিক আর কিছুই ছিলেন না, তবুও একথা ভাবিয়া বিস্ময় বোধ না করিয়া থাকা যায় না যে অন্য কোন জমিদারের নিকট কখনও এরূপ অসম্ভব টাকা দাবী করা হয় নাই, সাধারণভাবে জমিদারদের উপর কর ধার্য করাও হয় নাই। হেষ্টিংসের অবিবেচনার ফলেই বারাণসীতে এই বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। অতএব এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে অন্যায় হইবে না যে, চৈৎ সিংহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

অবলম্বনের ব্যাপারে হেস্টিংস তাঁহার 'অবিবেচনাপ্রসূত কঠোরতা ও হঠকারিতার' জন্য দোষারোপেরই পাত্র।

অযোধ্যার বেগমদের উপর নিপীড়ন (১৭৮২)ঃ বারাণসী হইতে অর্থসংগ্রহে অসমর্থ হইয়া হেস্টিংস অযোধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের অবস্থার জন্যই অগৌণে অর্থ প্রেরণের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। সুজা-উদ্দৌলার পুত্র ও উত্তরাধিকারী অযোধ্যার নবাব আসফ-উদ্দৌলা কোম্পানীর নিকট ঋণবদ্ধ ছিলেন। তিনি ঋণ পরিশোধে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া লিখিলেন যে পূর্বতন নবাবের প্রভূত ধনসম্পদ তাঁহার মাতা ও পিতামহীর হস্তগত হইয়াছে; তাঁহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতে না পারিলে তাঁহার পক্ষে ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব। কিন্তু ১৭৭৫ সালে কোম্পানী অযোধ্যার ঐ দুই বেগমের নিজ নিজ অর্থভাণ্ডার ও ভূসম্পত্তির উপর অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া তাহা মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। হেস্টিংস সে প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। নবাব ঋণ পরিশোধে টালবাহনা করিতে থাকিলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার রেসিডেণ্ট মিড্‌ল্‌টন্ (Middleton) জবরদস্তি করিয়া টাকা আদায়ের ব্যাপারে যথেষ্ট দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে না পারায় ব্রিস্টো (Bristow) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। বেগমদ্বয়ের সচিবগণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন, তাঁহাদিগকে সেখানে বহু মাস অবস্থান করিতে হইল, কখনও কখনও তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও খাদ্যবঞ্চিত করিয়াও রাখা হইল। বেগম মহলের খোজাদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হইল। অবশেষে ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বেগমদ্বয়ের সম্পদ দখল করা হইল।

বেগমেরা নাকি চৈৎ সিংহের বিদ্রোহে সহায়তা করিয়াছিলেন, এই ছিল হেস্টিংসের অজুহাত। ইম্পে সাক্ষীদের জবানবন্দি লইয়া গভর্ণর-জেনারেলের অভিযোগ সমর্থন করেন। কিন্তু সে সব সাক্ষ্য বিশ্বাস-যোগ্য ছিল না। রবার্টস্-এর মতে, 'আগাগোড়া ব্যাপারটাই ছিল হীনতা, নীচতা ও কলঙ্কের বিষয়'। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, চৈৎ সিংহ যেমন তাঁহার দায়মুক্ত হইবার জন্য হেস্টিংসকে কুড়ি হাজার টাকা উপহার দিয়াছিলেন, অযোধ্যার নবাবও তেমনই তাঁহার

বৃদ্ধা জননী ও পিতামহীর নিকট জোর-জবরদস্তি করিয়া টাকা আদায়ের দায় হইতে রেহাই পাইবার জন্য হেস্টিংসকে দশ লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে চান। হেস্টিংস ঘুষ লইয়া কোম্পানীর কাজেই টাকাটা খরচ করিলেন, কিন্তু নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। হেস্টিংসের বিরুদ্ধে যাঁহারা অভিযোগ আনয়ন করিতেছিলেন তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ অর্থপ্রদানকে 'শক্তিমানের নিকট আর্তের উপঢৌকন, অত্যাচারীর নিকট দুর্গতের উপহার নিবেদন' রূপে বর্ণনা করার সঙ্গত কারণ ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের এই সকল নীচ আর্থিক কার্যকলাপ ছিল অন্যায় এবং সমর্থনের অযোগ্য। তাঁহার পক্ষে একমাত্র যুক্তি হইল রাজ্যের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা।

বিচারের ফলাফল ঃ দীর্ঘকাল ধরিয়া হেস্টিংসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের বিচার হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত সকল অভিযোগ হইতেই তিনি মুক্তিলাভ করেন, তাহা হইলেও চৈৎ সিংহ ও বেগমদের প্রতি তাঁহার আচরণ সম্পর্কিত অভিযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে সর্বাধিক ভোট প্রদত্ত হইয়াছিল। হুইগ দল এই উপলক্ষ্যটিকে 'তাঁহাদের মানবতাবাদী মনোভাব ও হেস্টিংসের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশের সুযোগস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।' হেস্টিংসের 'শাসনকালের কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার যাহাতে প্রাচ্যে ব্রিটিশ নীতির নজির হইয়া উঠিতে না পারে' সেজন্য তাঁহার কার্যাবলীর বিচারের প্রয়োজন ছিল বটে, তবে সেই বিচারপর্ব দীর্ঘস্থায়ী হইয়া তাঁহাকে যে কার্যতঃ কপর্দকহীন করিয়া ফেলে, এই ব্যাপারটিকে ব্রিটিশ জাতির অকৃতজ্ঞতারই এক নিদর্শনরূপেও গণ্য করিতে হইবে। ওয়ারেন হেস্টিংসের কৃতিত্বের বিবরণ তাঁহার নিজের ভাষায়ই সর্বাপেক্ষা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন : "বিবিধ সমস্যার ভারে জর্জরিত বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করিয়া···আমি তাহাকে দান করি একটি বিশিষ্ট রূপ, সেখানে প্রবর্তন করি নিয়মের বন্ধন। সেখানে আপনারা যে রাজ্যখণ্ডের অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাহা অন্যান্য অনেকের বীর্যবলে অর্জিত, আমি তাহার বিস্তার সাধন করি, তাহাকে দান করি রূপ ও সংহতি ; তাহাকে রক্ষা করি আমি। ফলপ্রদভাবে অথচ অর্থের অপব্যয় না ঘটাইয়া আমি উহার সৈন্যবাহিনীকে অজ্ঞাত ও শত্রু-সমাকীর্ণ অঞ্চলের মধ্য দিয়া আপনাদের অধিকারভুক্ত অন্যান্য

রাজ্যখণ্ডের সঙ্কটত্রাণের জন্য প্রেরণ করি,—একটিকে উদ্ধার করি হীনতা স্বীকার ও অবমাননার কবল হইতে, অপর একটিকে উদ্ধার করি সর্বনাশ ও অধীনতার বন্ধনপাশ হইতে।...আপনাদের সেবায় আমি আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছি, আর উহার পুরস্কার স্বরূপ আপনারা আমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, আমার নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন, আমাকে দীর্ঘ বিচারদশার অধীন করিয়াছেন।"

বিদ্যোৎসাহী হেস্টিংস: ভারতীয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব হইল সাহিত্য, বিদ্যাচর্চা ও শিল্পকলা-চর্চার পৃষ্ঠপোষকরূপে তাঁহার অবদান। প্রাচ্য বিদ্যানুশীলনের ক্ষেত্রে ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড ও স্যার চার্লস উইলকিন্স্ ছিলেন পথিকৃৎ, সার উইলিয়ম জোনস্ ও হেনরী টমাস কোলব্রুক ছিলেন পণ্ডিত, আর হেষ্টিংস ছিলেন তাঁহাদের সকলেরই উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট, ১৭৭৩: ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের পর ভারতবর্ষের শাসন-কার্যে সুনিশ্চিত কর্তৃত্ব সমেত পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য ছিল। ১৭৭৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আর্থিক সঙ্কট এই হস্তক্ষেপকে ত্বরান্বিত করিয়া তোলে। লর্ড নর্থের প্রবর্তনায় গৃহীত ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট (Regulating Act) বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে সকল পার্লামেন্টের শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হয় উহাদের মধ্যে প্রথম শাসন-সংস্কার। ইংলণ্ডে কোম্পানীর গঠনতন্ত্র পরিবর্তিত হইল; কিন্তু উহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হইল ভারতে গভর্ণমেণ্টের কাঠামোয়।

ইংলণ্ডে কোম্পানীর মালিক সমিতির (Court of Proprietors) ভোটাধিকার সংকুচিত করিয়া এইরূপ বিধান বলবৎ হয় যে ডিরেক্টরগণ চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। ডিরেক্টরদের সংখ্যা নির্দিষ্ট হইল ২৪; স্থির হইল তাঁহাদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ প্রতি বৎসর বিদায় গ্রহণ করিবেন। ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠিপত্র ডিরেক্টরগণ অর্থ মন্ত্রণালয়ে পেশ করিতে বাধ্য রহিলেন; শাসনকার্য ও সামরিক ব্যাপার সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার একজন মন্ত্রীর নিকট দাখিল করিবার নির্দেশ থাকিল। এইভাবে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা সর্বপ্রথম ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার লাভ করেন, যদিও ঐ অধিকার অসম্পূর্ণ রহিল।

ভারতের শাসন পরিচালন বিষয়ে নূতন আইনে এইরূপ বিধান রহিল যে, বাঙ্গালা দেশ একজন গভর্ণর-জেনারেল দ্বারা শাসিত হইবে। চারিজন পারিষদ (কাউন্সিলর) তাঁহাকে শাসনকার্যে সহায়তা করিবেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হইল।[১] কোর্ট অব ডিরেক্টর্স্-এর সুপারিশ অনুযায়ী স্বয়ং রাজা ছাড়া আর কেহই তাঁহাদিগকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কার্য হইতে অপসারিত করিতে পারিতেন না। অবশ্য ভবিষ্যতে এই সকল পারিষদ নিয়োগের ক্ষমতা কোম্পানীকেই দান করা হইল। শাসন-পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন; যেখানে দুই পক্ষে সমান সমান ভোট হইবে সেই স্থলে গভর্ণর-জেনারেল তাঁহার বিশেষ ভোটাধিকার (casting vote) প্রয়োগ করিতে পারিবেন। সপারিষদ গভর্ণর-জেনারেল ফোর্ট উইলিয়মের এক্তিয়ারভুক্ত প্রদেশের বেসামরিক ও সামরিক শাসনের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা নূতন অধিকৃত শাসন এলাকা এবং বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনেরও ভারপ্রাপ্ত হইলেন। এতাবৎ এই সকল কার্য সপারিষদ প্রেসিডেণ্ট কিংবা সিলেক্ট কমিটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। ইহা ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা কিংবা সন্ধিস্থাপন কার্যে অধস্তন মাদ্রাজ ও বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের ক্রিয়াকলাপের তদারকির ভারও উহাদের উপর অর্পিত হইল। তবে আশু প্রয়োজনের বেলায় অথবা লণ্ডনস্থ সরকারের নিকট হইতে বিশেষ আদেশ প্রাপ্ত হইলে মাদ্রাজ ও বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট স্বাধীনভাবে কার্য করিতে পারিবেন এইরূপ বিধানও রহিল। নূতন আইনে একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপনের সুপারিশ করা হইল। রাজকীয় সনদবলে একজন প্রধান বিচারপতি (স্যার এলিজা ইম্পে) ও তিনজন সাধারণ বিচারপতি লইয়া এই বিচারালয় গঠিত হইল। গভর্ণর-জেনারেল, কাউন্সিলের সদস্য চতুষ্টয় ও বিচারপতিগণ মোটা মাহিনার অধিকারী হইলেন।

রেগুলেটিং অ্যাক্টের ফলাফলঃ ইলবার্ট লিখিতেছেন, "১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্টের বিধানাদি কি সপারিষদ গভর্ণর-জেনারেলের ক্ষমতার প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে, কি সুপ্রীম কোর্টের অধিকার-সীমা সম্পর্কে, কি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ও কোর্টের সম্বন্ধ সম্পর্কে অস্পষ্ট ও ত্রুটিপূর্ণ।" গভর্ণর-জেনারেলকে যে চূড়ান্ত পর্যায়ে কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত নাকচ করিবার ক্ষমতা

১। ক্লেভারিং, মনসন, বারওয়েল, ফিলিপ ফ্রান্সিস।

দেওয়া হয় নাই ইহা অতীব পরিতাপের বিষয়। হেস্টিংস এই অধিকারের সপক্ষে বার বার আবেদন করিয়াও কোন ফল পান নাই; অবশেষে ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে এই অধিকার স্বীকৃত হইল। কাউন্সিলের বৈঠকে নিয়ত পরিবর্তন-শীল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা সাম্রাজ্য শাসনের এই পরিকল্পনাকে স্যার জন স্ট্র্যাচী "অবাস্তব" ও "মূঢ়" আখ্যা দিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই গভর্ণমেন্টের উপর কলিকাতা গভর্ণমেন্টের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নঙর্থক ক্ষমতা মাত্র ছিল; উহার বেশী কিছু ছিল না। এই দুই গভর্ণমেণ্ট এতাবৎ স্বাধীন ছিল; আইনে উহাদের সম্পর্কে যে সকল ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা করা হইল তাহাতে উহারা অন্যায় রকমের কতকগুলি সুবিধা-সুযোগের অধিকারী হইল। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধকালে পুণা দরবারের সহিত বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের সম্পর্ক, অথবা দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ সংঘটিত হইবার কালে নিজাম ও হায়দর আলীর সহিত মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের আচরণ স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে যে, সর্বোচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন গভর্ণমেণ্টের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ঐতিহ্যের বিকাশে রেগুলেটিং অ্যাক্ট সহায়ক হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, ভারতে ব্রিটিশ প্রজার উপর সুপ্রীম কোর্টের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু আইনে 'ব্রিটিশ প্রজা' কথাটির সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয় নাই। সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সরাসরি ঘোষণা নূতন আইন এড়াইয়া গিয়াছিল। ১৮১৩ সনের সনন্দ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই ভুলের সংশোধন হয় নাই। নূতন আইনের বিধানে বিচারপতি ও আইনজীবীদের লইয়া রাজকীয় বিচারালয়ের (Supreme Court) সৃষ্টি হইল; কিন্তু বিচারালয়ের এক্তিয়ার, বিচারালয়ে প্রযোজ্য আইন এবং গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিল ও বিচারালয়ের মধ্যে সম্পর্ক প্রভৃতি সুনিরূপিত ও সুব্যাখ্যাত হইল না। এইরূপে বিচার-বিভাগ ও শাসন-বিভাগের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল। বিচারকগণের ধারণা হইল, শাসন-বিভাগের অনাচার ও অত্যাচার দমনের ভার তাঁহাদিগের উপরই ন্যস্ত; এদিকে দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের কার্যকলাপে সুপ্রীম কোর্টের হস্তক্ষেপে দেশের শাসনকার্য প্রবলভাবে ব্যাহত হইতে লাগিল। প্রসিদ্ধ কাশীজোড়ার মামলায় সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করিলেন যে, ব্যক্তিগত ঋণের দাবী সংক্রান্ত মোকদ্দমায় জমিদার সুপ্রীম কোর্টের গণ্ডির অধীন। পাটনার

মামলায় কোর্ট কোম্পানীর কর্মচারীদের বিচার-বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস ইম্পেকে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণে স্বীকৃত করাইয়া অসুবিধা হইতে উদ্ধারের পথ খুঁজিতে লাগিলেন। দেওয়ানী আদালতসমূহের তত্ত্বাবধানের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য ইম্পেকে মোটা মাহিনা দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। মেকলে এই মাহিনাকে 'উৎকোচ' আখ্যা দিয়াছেন ; তাঁহার বর্ণনায় প্রধান বিচারক ইম্পে 'ধনী, শান্ত, দুর্নীতিপরায়ণ' রূপে চিত্রিত হইয়াছেন। প্রধান বিচারক উল্লিখিত মাহিনা গ্রহণ করিয়া সুপ্রীম কোর্টের স্বাধীন মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, সাধারণের এইরূপ ধারণা। সদর দেওয়ানী আদালতের কর্তৃত্ব প্রধান বিচারকের উপর অর্পণ করা হয় ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে ; ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে ডিরেক্টর-সভার নির্দেশ অনুসারে স-কাউন্সিল গভর্ণর-জেনারেল পুনরায় উহা স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

১৭৮১ খ্রীস্টাব্দের আইন : ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দের এক সংশোধন আইনে ১৭৭৩ সনের বিধি-ব্যবস্থায় কিছু গুরুতর রদবদল করা হয়। এই নূতন আইনে বলা হয় যে, স-কাউন্সিল গভর্ণর-জেনারেল কি যুক্ত ভাবে, কি স্বতন্ত্রভাবে অতঃপর আর সুপ্রীম কোর্টের আওতার মধ্যে থাকিবেন না ; রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে অতঃপর আর সুপ্রীম কোর্টের কর্তৃত্ব খাটিবে না। কোন্ কোন্ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের কর্তৃত্ব খাটিবে উহাও যথাযথভাবে নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইল। দেশীয় প্রথায় যে সকল বিচারালয়ের (পঞ্চায়েৎ) কাজ চলিত, সেগুলিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। উভয় প্রথাই পাশাপাশি প্রচলিত থাকিবে এইরূপ স্থির হইল। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে এই দুই প্রথার মধ্যে একটি চূড়ান্ত সমন্বয় সাধিত হয়।

পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৭৮৪ : রেগুলেটিং অ্যাক্ট এগার বৎসর যাবৎ চালু ছিল। অবশেষে ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (Pitt's India Act) উহাকে স্থানচ্যুত করে। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের আইন মুখ্যতঃ লণ্ডনে কোম্পানীর যে কর্তৃপক্ষ ছিল উহার গঠন ও কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে রচিত হয়। কোম্পানীর সামরিক ও বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের জন্য আইনে একটি বোর্ড অব্ কমিশনারস্ (Board of Commissioners) গঠনের ব্যবস্থা হয়। উহা লোকমুখে বোর্ড অব্ কন্‌ট্রোল (Board

of Control) নামে পরিচিত হয়। ইংলণ্ডের অর্থমন্ত্রী (Chancellor of the Exchequer), অন্যতর আর একজন মন্ত্রী ও রাজা কর্তৃক নিযুক্ত চারিজন প্রিভি কাউন্সিলের সভ্যের সমবায়ে বোর্ড গঠিত হইল। তিনজন পরিচালকের সমবায়ে গঠিত একটি আভ্যন্তরীণ সমিতির (Secret Committee) তত্ত্বাবধানে বোর্ডের গোপন আদেশসমূহ ভারতবর্ষে প্রেরণের ব্যবস্থা হইল। বোর্ড এবং এই সমিতি মিলিয়া যে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন উহা বাতিল করিবার বা স্থগিত রাখিবার অধিকার কোম্পানীর মালিক সমিতির রহিল না। গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিল তিনজন সভ্যের দ্বারা গঠিত হইল। এই তিন সভ্যের একজন হইলেন সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ। কূটনীতি, যুদ্ধ এবং রাজস্ব সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে অধীনস্থ প্রদেশগুলির (মাদ্রাজ বোম্বাইর) উপর বাঙ্গালার কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত করা হইল। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে গৃহীত একটি পরিপূরক আইনে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গভর্ণর-জেনারেলকে কাউন্সিলের মতের বিরুদ্ধে কাজ করিবার অধিকার দেওয়া হয়। তিনি তৎসঙ্গে সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষের পদ গ্রহণেরও অধিকার প্রাপ্ত হন।

১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের আইন গঠনের পশ্চাতে বিশেষ চাতুর্য পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক আপোষ-চেষ্টার সকল লক্ষণই উহাতে পরিস্ফুট। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের হাতে স্বতন্ত্র শাসন-ক্ষমতা রাখা হয় নাই। উহার ক্ষমতা ছিল প্রচ্ছন্ন ও সীমাবদ্ধ। তবে কোম্পানীর সমুদয় কাগজপত্র পরীক্ষা করিবার অধিকার বোর্ডের ছিল, এবং যে সকল আদেশনামা নিছক বাণিজ্যঘটিত নয় তাহাতে উঁহাদের সমর্থন প্রয়োজন হইত। জরুরী ব্যাপারে বোর্ড স্বীয় মনোমত আদেশনামা মুসাবিদা করিয়া উহা আভ্যন্তরীণ পরিচালক সমিতির (Secret Committee) নিকট পাঠাইতে পারিতেন। আভ্যন্তরীণ সমিতির সদস্যগণ উহাতে সহি করিয়া সমিতির নামে পাঠাইয়া দিতেন। এইভাবে আইনের বিধানবলে কোম্পানীর সামরিক ও বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থাকে ইংলণ্ডের সরকারের পরিচালনাধীনে আনা হইল। কিন্তু কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ উহাতে বিশেষ বিচলিত হইলেন না। তাঁহাদের মনোমত কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করিবার অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই ভাবিয়া তাঁহারা বরং সন্তুষ্টই রহিলেন। মিল (Mill) লিখিয়াছেন, যে

ক্ষমতা ডিরেক্টরগণের হস্তধৃত রহিল উহার অধিকাংশ খুঁটিনাটি ব্যাপারের পরিচালনার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এতদ্ব্যতীত ইহাও লক্ষণীয় যে, বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল কিছুদিনের মধ্যেই কার্যতঃ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল। ইহার সভাপতি ডাণ্ডাস (Dundas) অন্যান্য সভ্যদিগকে ক্ষমতারহিত করিতে সমর্থ হইলেন। বোর্ডের পরিচালনভার কার্যতঃ উহার প্রেসিডেণ্টের উপর গিয়া বর্তাইল, তিনি পরবর্তীকালীন ভারত-সচিবের (Secretary of State for India) ন্যায় নিরঙ্কুশভাবে কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এইভাবে ভারত সংক্রান্ত কার্যকলাপ ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার অন্যতম বিচার্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট এইরূপে সত্তর বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ কোম্পানীর স্বদেশীয় ও ভারতীয় ক্রিয়া-কলাপের পরিচালন-নীতির রূপরেখা স্থিরীকৃত করিয়া দিল। আইনে ইহাও উল্লিখিত থাকিল যে, "ভারতে রাজ্যজয় ও রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি অনুসরণ করিয়া চলা ইংরেজ জাতির অভিপ্রায়, সম্মান ও আদর্শের পরিপন্থী"। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই ঘোষণা অনুযায়ী ভারতে কার্য হয় নাই, বরং উহা লঙ্ঘিতই হইয়াছে বেশী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লর্ড কর্ণওয়ালিস

কর্ণওয়ালিসের সুবিধা ঃ ওয়ারেন হেষ্টিংসের পদত্যাগের পর স্যার জন ম্যাক্‌ফারসন এক বৎসরের অধিককাল অস্থায়িভাবে গভর্ণর-জেনারেল রূপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অতঃপর নবনিযুক্ত গভর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনিই ইংলণ্ডের প্রথম যথার্থ রাজপ্রতিনিধি। তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয় ছিলেন। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের প্রেসিডেণ্ট হেনরী ডাণ্ডাস এবং প্রধান মন্ত্রী পিটের তিনি ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ডিরেক্টর-সভারও তিনি সবিশেষ বিশ্বাসভাজন ছিলেন। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের আইনের বিধানবলে গভর্ণর-জেনারেল তাঁহার কাউন্সিলের মতের বিরুদ্ধে কাজ করিবার অধিকার লাভ করেন। সুতরাং লর্ড

কর্ণওয়ালিস তাঁহার শাসনকালের সূচনা হইতেই এই সুবিধার অধিকারী হইলেন। তিনি মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের পরিচালন-ব্যবস্থার উপর ফলপ্রদ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বিস্তার করেন। সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষরূপে সামরিক ক্ষমতায়ও তিনি ভূষিত হন। কমন্স সভার সমর্থন সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত ছিলেন, সুতরাং ব্যক্তিগত দায়িত্বে নীতিনির্ধারণে তাঁহার অসুবিধা হইত না। পার্লামেণ্টের বিশ্বাসভাজন ও মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রিয়পাত্র প্রথম গভর্ণর-জেনারেল রূপে তাঁহার পদ স্বতঃই খুব নিরাপদ ছিল, এবং তিনি তাঁহার সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে তাঁহার প্রধান মনোযোগের বিষয় হইল শাসন-সংস্কার। এই কার্যে তিনি কতিপয় সুযোগ্য ব্যক্তির সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ এই সকল ব্যক্তি ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন, যথা—রাজস্ব-সম্বন্ধীয় কার্য ও সাধারণ শাসন পরিচালনার ব্যাপারে জন শোর, জেমস গ্রাণ্ট ও জোনাথান ডানকান, বাণিজ্যিক ব্যাপারে চার্ল্‌স্ গ্র্যাণ্ট এবং বিচার বিভাগীয় কার্যে উইলিয়ম জোন্স। লর্ড কর্ণওয়ালিসের খুব বেশী উচ্চস্তরের যোগ্যতা ছিল এমন নহে, তবে তাঁহার শ্রমশীলতা, সততা ও জনসেবার আগ্রহের অভাব ছিল না।

বাণিজ্যিক ব্যবস্থার সংস্কার : তিনি প্রথমে বাঙ্গালা দেশে কোম্পানীর বাণিজ্য পরিচালন-ব্যবস্থার সংস্কারে হাত দিলেন। এগার জন সভ্য লইয়া গঠিত একটি বাণিজ্য-বোর্ডের (Board of Trade) দ্বারা পূর্বে কোম্পানীর মূলধন-বিনিয়োগের কার্য সম্পাদিত হইত ; তিনি বোর্ডের সভ্য-সংখ্যা এগার হইতে পাঁচে নামাইয়া আনিলেন। কোম্পানীর কর্মচারিগণের মধ্যে তখন যথেষ্ট দুর্নীতিপরায়ণতা ছিল। দুর্নীতি-নিরোধের জন্য তিনি কোম্পানীর কর্মচারিগণের হাতে সরবরাহের ঠিকাদারীর দায়িত্ব না রাখিয়া উহা বাহিরের ব্যবসায়ীদের হস্তে অর্পণ করেন। ইহার পূর্বে কোম্পানীর 'গোমস্তা'গণ তন্তুবায় সম্প্রদায়ের উপর অবর্ণনীয় উৎপীড়ন করিত ; বস্ত্র-ব্যবসায়ের প্রায় একচেটিয়া অধিকার এই সকল গোমস্তাদেরই করধৃত ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস গোমস্তাদের অত্যাচার হইতে তন্তুবায় শ্রেণীকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু ডিরেক্টর-সভা এই ব্যাপারে খুব বেশী সংস্কার ঘটিতে দেন নাই। এই অত্যাচার—একচেটিয়া অধিকার ও জুলুম—

ব্যবসায়ের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক হইয়া উঠিতেছিল ; কাজেই উৎপাদনকারী এবং দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীদের স্বার্থে তাহাদের উপর সংঘটিত অত্যাচার নিরোধের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইনকানুন বিধিবদ্ধ করাইবার ব্যবস্থা হইল। লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের এক ঘোষণায় গর্বভরে বলেন যে, বাণিজ্যাদির পরিচালন-ব্যবস্থা এক্ষণে সুবিহিত হইয়াছে—কোম্পানী ন্যায্য দরে দ্রব্যাদি ক্রয় ও বিক্রয় করিতেছে। কিন্তু কোম্পানীর বাণিজ্য ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল ; ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী ভারতের সহিত বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার হারায়।

বিচার-বিভাগীয় সংস্কার ঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় বিভাগের বিচারকার্যেই সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি পুলিস বিভাগেরও সংস্কার করেন। ১৭৯০ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে ঘোষিত এক বিধান বলে তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের ফৌজদারী মামলা বিচারের অধিকার হরণ করেন এবং সদর নিজামত আদালত কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। এখন হইতে সদর নিজামত আদালতের বিচার স-কাউন্সিল গভর্ণর-জেনারেলের দ্বারা নিষ্পন্ন করাইবার ব্যবস্থা হইল ; তাঁহাদিগের কার্যে সহায়তা করিবার জন্য রহিলেন প্রধান কাজী ও মুফতিগণ। চারিটি ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় (Courts of Circuit) প্রতিষ্ঠিত হইল। উহাদের প্রত্যেকটিতে দুইজন করিয়া ইংরেজ বিচারক বহাল হইলেন, তাঁহাদের সহায়তার জন্য রহিলেন কাজী ও মুফতিগণ। বৎসরে দুইবার তাঁহারা জেলায় জেলায় পরিভ্রমণ করিয়া যাহাতে সেই সেই অঞ্চলের বিচার সম্পাদন করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা হইল। ২৩টি জেলার কালেক্টরদিগকে (Collector) আরও অধিক শাসন-ক্ষমতা দেওয়া হইল। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতার জন্য কতিপয় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ সৃষ্টি হইল। একটি জেলাকে কতকগুলি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া উহাদের শান্তিরক্ষার ভার এক একজন দারোগার উপর ন্যস্ত করা হইল ; দারোগারা থানার কর্তা হইলেন। তাঁহারা তাঁহাদের কার্যের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দায়ী রহিলেন। এইভাবে যথার্থ একটি পুলিশ বাহিনী সৃষ্টির সূচনা হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইবার পর লর্ড কর্ণওয়ালিস রাজস্ব-বিভাগ হইতে দেওয়ানী বিচার-বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করার ব্যবস্থা করেন। তিনি

কালেক্টরের নিকট হইতে বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা প্রত্যাহার করিয়া উহা জেলা বিচারকের হস্তে অর্পণ করেন। কালেক্টরকে রাজস্ব সংক্রান্ত বিচারে দায়িত্বও দেওয়া হইল না। রাজস্ব-বিচারালয়গুলির বিলোপ সাধন করা হইল এবং এতৎসম্পর্কিত মোকদ্দমাদি জেলা আদালতে বিচারের জন্য প্রেরিত হইল। নূতন ব্যবস্থায় তিনটি নগর আদালত ও তেইশটি জেলা আদালতের পত্তন হইল। প্রত্যেক আদালতের ভারপ্রাপ্ত হইলেন এক একজন ইংরেজ বিচারক। কলিকাতা, পাটনা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ শহরে চারিটি প্রাদেশিক আপীল আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল। জেলা-আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতের মধ্যে উহারা যোগসূত্র স্বরূপ বিদ্যমান রহিল। স-কাউন্সিল গভর্ণর-জেনারেল দ্বারা গঠিত সদর দেওয়ানী আদালতে বড় বড় মোকদ্দমায় আপীল করা চলিত; বৃহত্তর মোকদ্দমাগুলির বেলায় স-কাউন্সিল ইংলণ্ডের রাজার নিকট আপীল পেশের ব্যবস্থা ছিল। প্রাদেশিক আদালতগুলির জন্য তিনজন ইংরেজ বিচারক নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ শহরে ভ্রাম্যমাণ ফৌজদারী বিচারালয়েরও বিচারকার্য নিষ্পন্ন করিতে হইত। রাজস্ব সংগ্রাহক (কালেক্টর) ও সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তাঁহাদের সরকারী কার্যের জন্য এই সকল আদালতের নিকট দায়ী ছিলেন। ভারতীয় মুন্‌সিফ্ ও সদর আমীনদিগকে নিতান্ত তুচ্ছ মোকদ্দমাগুলির ভার দেওয়া হইত; পঞ্চাশ টাকার অধিক জরিমানা করিবার অধিকার তাঁহাদের ছিল না। আদালতের রেজিস্ট্রারগণ দুইশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিতেন। তবে তাঁহাদের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা চলিত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইহার পূর্বেই ওয়ারেন হেষ্টিংস ফৌজদারী বিচারকার্যকে ইংরেজ বিচারকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়াছিলেন। তিনি গভর্ণর-জেনারেল থাকিতেই রাজস্ব সংগ্রহকার্য হইতে বিচারকার্যকে পৃথক্ করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। পূর্ব হইতেই তিনি বিচারালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; নূতন বিচারালয়সমূহ যাহাতে প্রদেশের সর্বত্র সমদূরত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় তৎপ্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল। সুতরাং কর্ণওয়ালিস্ হেষ্টিংস-প্রবর্তিত সংস্কার পরিকল্পনার সম্প্রসারণ ও সম্পূর্ণতা সাধনই করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের বিচার-বিভাগীয় ব্যবস্থায় নিয়ম (procedure) প্রণালীর উপরই সমধিক ঝোঁক ছিল। একটি সুসম্পূর্ণ আইনবিধি প্রবর্তিত

ও মোটামুটি ক্ষিপ্রতার সহিত বিচার নিষ্পন্ন হইতে আরও বেশ কিছুকাল লাগিয়াছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঃ লর্ড কর্ণওয়ালিসের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল ভূমি-রাজস্বের সংস্কার সাধন। হেষ্টিংসের সময় হইতেই এই ধারণা সবিশেষ বলবৎ হইয়া উঠিতেছিল যে, জমিদারদিগের দেয় ভূমি-রাজস্ব চিরকালের জন্য বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস ইংলণ্ডে এই মতটিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় তৎকালপ্রচলিত অবস্থার জটিলতা ও অনিশ্চয়তার স্থলে একটি সকলের প্রতি সমপ্রযোজ্য সরল নিয়মের উদ্ভব হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিসকে কোনক্রমেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্ভাবক বলা যায় না। তাঁহার প্রতি জমিদারদিগের সহিত দশসালা অর্থাৎ দশ বৎসরের জন্য ভূমি-রাজস্বের ব্যবস্থা করার নির্দেশ ছিল। এই ব্যাপারে তিনি তাঁহার উপদেষ্টা স্যার জন শোরের সহিত একমত হইতে পারিলেন না। তাঁহার সিদ্ধান্ত হইল, ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্তের সময় যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল উহার বলে কোম্পানী দশসালা ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত করিলে কোন দোষ হয় না। তাঁহার অভিমত ইংলণ্ডে গৃহীত হইল। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement) বাঙ্গালা দেশে কায়েম হইল।

হাণ্টার সাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপূর্ণতা ও মৌলিক ত্রুটিবিচ্যুতি-গুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। জমিদারী ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করিবার সময় জমিদারীগুলির ভূ-সম্পত্তির পরিমাণ অজ্ঞাত ছিল, নিষ্কর ও দেবোত্তর সম্পত্তিসমূহের পরিমাণ নির্ধারিত হয় নাই, তদুপরি গোচারণ ও অনাবাদী জমির পরিমাণও অনির্ণীত ছিল। ইহার ফলে অন্তহীন জটিলতার সৃষ্টি হইল, মামলা মোকদ্দমার আর অবধি রহিল না। এই সকল ত্রুটির তবু সংশোধনের পথ ছিল, কিন্তু ভূমি বিক্রয় সংক্রান্ত আইনের কড়াকড়ি খুবই ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইল। বাঙ্গালার প্রাচীন বংশীয় রাজগণ—যাঁহারা এতকাল নিজ নিজ ক্ষুদ্র রাজদরবার ও পাইক, পেয়াদা, সিপাহী, বরকন্দাজ লইয়া স্ব স্ব অঞ্চলে আধিপত্য করিতেছিলেন তাঁহারা—সহসা এক একজন নিয়মিত রাজস্ব-সংগ্রাহকে পরিবর্তিত হইবেন এইরূপ আশা করা বাতুলতা

মাত্র। বাঙ্গালার প্রাচীন জমিদার পরিবারগুলি এই নূতন ব্যবস্থার চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইবার ২০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার জমিদারী ভূসম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হইতে অর্ধেক পরিমাণ ভূমি ঠিক এই কারণে বিক্রয় হইয়া গেল। প্রাচীন জমিদার পরিবারগুলির একমাত্র উদ্ধারের পথ ছিল মধ্যস্বত্বভোগীদিগের নিকট জমি ইজারা দেওয়া। জমি ইজারা দেওয়া যদিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্যের বিরোধী ছিল, তৎসত্ত্বেও উহাকে ঐ বন্দোবস্তের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে স্বীকার করিয়া লইতে হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণেতারা জমিদারদিগের ন্যায় খাতকদিগেরও খাজনার পরিমাণ ও শ্রমের সুফল ভোগ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা বিধানের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এই কার্যের জন্য যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল, নূতন আরব্ধ কর্মের পরিমাণবাহুল্যের দরুন উহা অসম্ভব হইয়া উঠিল। নূতন ব্যবস্থার সুফল সম্বন্ধে কৃষকদের মনও সংশয়রহিত ছিল না, তাহারা চুক্তিনামা করিতে রাজী হইল না। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী কুড়ি বৎসরের মধ্যে জনসংখ্যা হ্রাসের ফলে খাজনার হার কমিয়া যায়, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইবার কুড়ি বৎসরের ভিতর খাতকদের মধ্যে জমি সংগ্রহের জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল, ফলে জমিদার শ্রেণীর বিশেষ লাভ হইল। খাজনার পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়ার জন্য ত্রস্তব্যস্ততায়ও ভীষণ অনর্থের সূত্রপাত হইল। অবশ্য পরবর্তীকালে খাতকদের অনুকূলে বিশেষ বিশেষ আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা হয় এবং উহার দ্বারা ঐ শ্রেণীর সমূহ উপকার সাধিত হইয়াছিল। বিচারালয়গুলিতেও খাতকদের অনুকূলে বিচার হইতে লাগিল। কৃষকদিগের ভিতর সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের শক্তি জাগ্রত হইল। জমিদারবৃন্দ আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য ও আলস্যে দিনাতিপাত করিতেন বটে, তবে তাঁহাদের জীবন একেবারে আত্মকেন্দ্রিক ছিল না। জমিদার শ্রেণীর এই ঢিলেঢালা জীবনযাত্রায় মন্দের ভাল হইয়াছিল। জমিদার শ্রেণী ও খাতক শ্রেণী মিলিয়া আইনের ত্রুটি সংশোধনের বাস্তব উপায় বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। খাতকেরা অপেক্ষাকৃত কম সংযত ও অধিকতর অসহিষ্ণু হইলে হয়ত কৃষক বিদ্রোহ জাতীয় বিপর্যয় সংঘটিত হইতে পারিত।

সরকারী কর্মচারী শ্রেণীঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস কোম্পানীর সরকারী

কর্মচারীদের জন্য এক নূতন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেন। তিনি শৃঙ্খলাবোধ ও নৈতিক মান সংরক্ষণের উপর বিশেষ জোর দিতেন। ইংলণ্ডের সরকারী কার্যে যে নীতির মান প্রচলিত তাহা তিনি ভারতে কোম্পানীর কর্মচারীদের পক্ষে গ্রহণীয় করিলেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে প্রচলিত দুর্নীতি ও অর্থগৃধ্নুতার শোধনকল্পে তাঁহার প্রতিষেধক ছিল উচ্চ বেতন, সুদক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং ভারতীয়ের স্থলে ইংরেজ কর্মচারী নিয়োগ। ১৭৮১ সাল পর্যন্ত উচ্চ সরকারী কর্মচারীদিগের মধ্যে ইংরেজ ও ভারতীয় উভয় শ্রেণীর কর্মচারী ছিল। ১৭৮১ সালে পুনরায় ইউরোপীয় কালেক্টর নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। স্যার জন ম্যাকফারসন ইউরোপীয় সরকারী কর্মচারী নিয়োগের যে নূতন নীতি ব্যাপক ভাবে অনুসরণ করেন তদনুযায়ী ঐ ব্যবস্থা হয়। স্যার জন ম্যাকফারসনের অনুসৃত নীতি লর্ড কর্ণওয়ালিস অধিকতর পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করেন। উহাতে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা হইল। স্বয়ং লর্ড কর্ণওয়ালিস এবং স্যার জন শোরের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইউরোপীয় কর্মচারিগণ ভারতীয় কর্মচারিবৃন্দ অপেক্ষা কোন অংশে কম দুর্নীতিপরায়ণ ছিল না। কর্ণওয়ালিসের প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় যদি ইউরোপীয়দিগের দুর্নীতির শোধন সম্ভব হইয়া থাকে তবে ভারতীয়দিগকেও দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভবপর ছিল। কর্ণওয়ালিসের নূতন ব্যবস্থায় কালেক্টরের মাসিক মাহিনা বারো শত টাকা হইতে দেড় হাজার টাকায় উন্নীত হইয়াছিল। বারোশত টাকা অপ্রতুল বিবেচনায় ঐ মাহিনা বৃদ্ধি। শুধু তাহাই নহে, সংগৃহীত রাজস্বের উপর শতকরা এক টাকা হারে তাঁহার একটি উপরিও (কমিশন) প্রাপ্য ছিল। বর্ধমান জেলার কলেক্টরের এই খাতে পাওনা হইত বৎসরে সাড়ে সাতাশ হাজার টাকা। ১৭৯৩ সালের সনন্দ আইনে (Charter Act of 1793) কোম্পানীর সিভিল সার্ভিস হইতে ভারতীয় বহিষ্করণের নীতি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইল। আইনে এই বিধান রহিল যে, কোম্পানীর চুক্তিবদ্ধ (covenanted) কর্মচারী নহে এমন কাহাকেও পাঁচশত টাকার অধিক বেতনের স্থায়ী চাকুরি, পদ বা নিয়োগপত্র অর্পণ করা চলিবে না ; তিন বৎসরের কম সময়ের জন্য অস্থায়ী ভাবে নিয়োগ চলিতে পারিত। ভারতীয়দিগের কোম্পানীর চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী হইবার সুবিধা ছিল না, সুতরাং ভারতীয়দিগের বহিষ্করণ প্রকারান্তরে আইনগত ভাবে সুসিদ্ধ করাইয়া লওয়া হইল।

ভারতীয় দৃষ্টিতে এই ব্যবস্থার ফলাফল সর্বাপেক্ষা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন স্যার টমাস মনরো (Thomas Munro)। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে তিনি একজন বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং কর্মকুশলতাবলে শেষ পর্যন্ত মাদ্রাজের গভর্ণর হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "ইংরেজ-শাসিত প্রদেশসমূহের ভারতীয়গণ ব্যবসায়ী কিংবা 'মীরাশিদার' (কৃষক) রূপে নিজ নিজ বৃত্তি অবাধে অনুসরণ করিতে পারে, কিন্তু এই নিরুদ্বিগ্ন অকিঞ্চিৎকর জীবিকা অপেক্ষা উচ্চতর কোন বৃত্তি তাহাদের প্রত্যাশার অতীত। যাহারা উচ্চ সরকারী কার্যে নিযুক্ত অথবা সেই কার্যে নিয়োগযোগ্য, তাহাদের নিকট হইতেই অপরেরা প্রেরণা লাভ করিয়া থাকে। ভারতীয়দের সমক্ষে এইরূপ কোন দৃষ্টান্ত ছিল না। স্বশ্রেণীতে উচ্চপদস্থ কর্মচারীর অভাবে তাহাদের ভিতর কোন উদ্দীপনা ছিল না। সামরিক বিভাগে সুবাদারের অপেক্ষা উচ্চতর পদ যাহাদের অনায়ত্ত তাহাদের মধ্যে চরিত্র-মাহাত্ম্য আশা করা যায় না। বেসামরিক কর্মেও যে ব্যক্তি বিচার কিংবা রাজস্ব বিভাগের কোন সাধারণ অধস্তন পদের উপরে চাকুরি পায় না তাহার চরিত্রও অনুন্নত থাকে। এরূপ ব্যক্তি তাহার স্বল্প বেতন-জনিত ক্ষতি দুর্নীতির পথে পরিপূরণের চেষ্টা করে।" ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় কোম্পানীর কর্মে ইউরোপীয় নিয়োগ এবং ভারতীয়দের প্রতিপত্তি হ্রাস উভয় জাতির মধ্যে একটা ব্যবধানের সূচনা করিল। ১৮১৫ সালের পূর্ব হইতেই এই জাতিবৈর সমসাময়িক ভারতীয় ইতিহাসের পর্যবেক্ষকদের নিকট ক্রমপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের সনন্দ আইন : নিয়ামক আইন (রেগুলেটিং অ্যাক্ট) প্রবর্তিত হইবার সময় কোম্পানীর সনন্দ আরও কুড়ি বৎসরের জন্য সম্প্রসারিত হইয়াছিল। যখন উহার পুনঃ সম্প্রসারণের সময় ঘনাইয়া আসিল তখন ইংলণ্ডে এক আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য বেসরকারী ব্যবসায়ীদের নিকট উন্মুক্ত করিবার দাবীতে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিস কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায় বিলোপের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধচারণ করিলেন এই যুক্তিতে যে বেসরকারী ব্যক্তিদের নিকট বাণিজ্য সুগম হইলে উহার আকর্ষণে ইংলণ্ড হইতে দলে দলে ফাটকাবাজ শ্রেণীর বেপরোয়া লোক ভারতে আসিয়া ভিড় জমাইবে। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে বিশেষ কোন পরিবর্তন ব্যতিরেকেই সনন্দের মেয়াদ আরও কুড়ি বৎসরের জন্য

বাড়াইয়া দেওয়া হইল। কোম্পানীর সুযোগসুবিধাসমূহ কিছুই পরিত্যক্ত হইল না। এই সনন্দ আইনের দ্বারা বস্তুতঃপক্ষে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনই সংসাধিত হয় নাই।

বাঙ্গালায় সার্বভৌম অধিকারের সমস্যা : বাঙ্গালা দেশে আইনগত মোগল সার্বভৌমত্ব আর কার্যক্ষেত্রে বাস্তবতঃ প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ-প্রভুত্বের মধ্যে যে একটা জোড়াতালির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর গোটা দ্বিতীয়ার্ধ কাল জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। ডড্‌ওয়েল ১৭৭৩ সালের নিয়ামক আইন, ১৭৮৪ সালে বিধিবদ্ধ পিটের ভারতশাসন আইন এবং ১৭৯৩ সালের সনন্দ আইন বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের দাবী জোরের সহিত ঘোষিত হয় নাই। তবে ঠিক কোন্ মুহূর্তে সার্বভৌমত্ব কার্যকরী হইল উহা অদ্যাবধি রহস্যাবৃত রহিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের ঘটনাবলী পর্যালোচনার পরিবর্তে আমরা যদি ভারতের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার সুবাদারদিগের সহিত পর পর যে সকল চুক্তিতে আবদ্ধ হন, সেই সকল চুক্তির ফলে সার্বভৌম ক্ষমতা ক্রমশঃ হস্তান্তরিত হইয়া যায়। এই সকল চুক্তি এবং দায়িত্বভার হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ পরীক্ষা করিয়া আমরা বুঝিতে পারি কেমন করিয়া স্তরে স্তরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে ক্ষমতা ও দায়িত্ব ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। অবশেষে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে বাঙ্গালায় ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব পুরাপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে তিনি নায়েব নাজিমকে গদি ত্যাগে বাধ্য করেন। সনন্দ আইনের নির্দেশ যাহাই হউক না কেন, ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই নবাবের ক্ষমতা বিলোপের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং ১৭৯০ হইতে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাঙ্গালার বৈদেশিক ব্যবসায়িগণ ও বাঙ্গালার জনসাধারণ ইহা অনুভব করিতে পারে যে নবাবের এই 'নবাব' উপাধিটি ব্যতীত গর্ব করিবার মত আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। শূন্যগর্ভ কতকগুলি খেতাব অর্পণ করিবার অধিকার অবশ্য তখনও তাঁহার হাতে ছিল, কিন্তু উহাতে তাঁহাকে আরও হাস্যাস্পদ করিয়াই তুলিয়াছিল। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের পর বাঙ্গালায় মোগল আধিপত্যের ছায়ামাত্র বিদ্যমান থাকে। তবে মুদ্রা পূর্ববৎ মোগল সম্রাটের নামেই প্রচারিত হইত। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই অব্যাহত ছিল।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

মহীশূরের পতন ও মারাঠাগণের শক্তিহ্রাস (১৭৮৬-১৮০৫)

প্রথম পরিচ্ছেদ

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

মারাঠাগণ ও নিজামের সহিত টিপুর যুদ্ধ (১৭৮৬-৮৭)ঃ লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা হইল তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। টিপু ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি দ্বারা দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সাফল্যজনক পরিণতি ঘটাইয়াছিলেন। ইংরেজের দিক হইতে হেস্টিংসের নিকট তাহা 'দন্তে তৃণ কাটিয়া শান্তি ভিক্ষা' রূপে প্রতিভাত হয়। তিনি এরূপ অভিমতও প্রকাশ করেন যে 'পাছে কোম্পানীর কাজকর্মে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে' তাই তিনি উহা প্রত্যাখ্যান অথবা নাকচ করেন নাই। কিন্তু এদিকে টিপু অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। শীঘ্রই তাঁহার সহিত মারাঠাদের সংঘর্ষ বাধিল। মারাঠাগণের নিজামের সহিত যোগ ছিল। এইখানেই ছিল পিতাপুত্রে প্রধান পার্থক্য। হায়দর এমন কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতেন যাহাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের প্রচেষ্টা তাঁহার হাতে ছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। যাহাতে তাঁহার শত্রুরা অর্থাৎ মারাঠা, নিজাম ও ইংরেজ কখনও তাঁহার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ না হইতে পারে তৎপ্রতি তিনি অবহিত ছিলেন। সাধারণতঃ তিনি এককালে একটিমাত্র শত্রুপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি তাবৎ ভারতীয় শক্তিকে ইংরেজের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে হায়দরের সহিত টিপুর ঠিক সেই পার্থক্য ছিল যে পার্থক্য পরে দেখা যায় বিসমার্ক ও জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিমের মধ্যে। টিপু তাঁহার পিতার অনুসৃত বৈদেশিক নীতির প্রতিটি বিধান ভঙ্গ করিয়া পরস্পরবিরোধী

শত্রুপক্ষকে তাঁহার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে প্রবৃত্ত করেন। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি উভয় পক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। সংঘর্ষে যদিও তিনি জয়ী হইয়া চলিয়াছিলেন তথাপি যুদ্ধবিরতি ঘটাইতে তাঁহার আপত্তি ছিল না, কারণ ইংরেজরা শত্রুসঙ্ঘের সহিত যোগ দিতে পারে এমন আশঙ্কা তাঁহার ছিল। তাঁহার প্রদত্ত সন্ধিসর্তাদি মারাঠাশক্তি ও নিজামের বিশেষ অনুকূলে গিয়াছিল। সংঘর্ষ যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল তাহাতে শত্রুপক্ষের প্রতি এতদূর আনুকূল্য প্রদর্শন না করিলেও চলিত।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা ঃ টিপুর আচরণ ছিল খামখেয়ালী। মারাঠাদিগের সহিত সন্ধি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাহাদের সঙ্গে পুনরায় সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইলেন। মারাঠাদের সম্পর্কে নিজামের ভয় ছিল, ব্রিটিশদের প্রতি ছিল সন্দেহ। তিনি টিপুর সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে চান, কিন্তু টিপু বৈবাহিক বন্ধনের প্রস্তাব করেন; নিজাম রোষভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া ব্রিটিশদের সহিত ঘনিষ্ঠতর বন্ধনে আবদ্ধ হইতে অভিলাষী হন। টিপু ফরাসী দেশে দূত প্রেরণ করেন; ফরাসী মহল হইতে তিনি কিঞ্চিৎ উৎসাহও লাভ করেন, তবে ফরাসীদের পুরাপুরি সমর্থন লাভ তদবস্থায় সম্ভব ছিল না। এদিকে তিনি ভিতরে ভিতরে ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণের জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল তিনি দক্ষিণ দিক হইতে ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করিবেন, ইংরেজ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে না হইতেই কাবেরী নদীকে করমণ্ডল উপকূল বরাবর উত্তর সীমান্ত করিয়া তিনি যুদ্ধ শুরু করিয়া দিবেন। ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দ হইতেই মহীশূরের শাসকেরা এই সীমান্তের জন্য নিরন্তর ব্যগ্র প্রত্যাশায় ছিলেন।

কর্ণওয়ালিস টিপুর সহিত বিচ্ছেদ অনিবার্য জ্ঞানে নিজাম ও মারাঠাগণের সহিত সক্রিয় সহযোগিতার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। পিটের ভারত-শাসন আইনের ধারা অনুযায়ী অবশ্য তাঁহার পররাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপের পথে বাধা ছিল, কিন্তু তিনি ঐ দুই পক্ষের সঙ্গে সামরিক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য এতই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তৎপক্ষে তিনি একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জুলাই তিনি নিজামকে লিখিলেন যে, নিজামকে তিনি এক অতিরিক্ত

সৈন্যবাহিনী দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন, তবে এই সাহায্যের সর্ত এই যে কতিপয় বিশেষ বিশেষ শক্তির বিরুদ্ধে ঐ বাহিনী প্রযুক্ত হইতে পারিবে না। বিশেষ বিশেষ শক্তি কাহারা তালিকায় তাহার উল্লেখ ছিল, শুধু টিপুর নাম অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। কর্ণওয়ালিস নিজামকে জানাইলেন যে তাঁহার এই পত্র সন্ধিপত্রের মতই পবিত্র ও উহার সর্তাদি সন্ধির সর্তাদির মতই বাধ্যতামূলক। টিপুর প্রতি ইংরেজের মনোভাব ও নীতির ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর ঘোষণা আর কিছু হইতে পারিত না।

১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে টিপু প্রসিদ্ধ ত্রিবাঙ্কুর রক্ষারেখা (Travancore Lines) বরাবর তাঁহার আক্রমণ চালাইলেন। সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে এই রক্ষারেখা নির্মিত হইয়াছিল। তিনি প্রথমে সফল হইলেন না। তবে ১৭৯০ সালের এপ্রিল মাসে তাঁহার পরবর্তী আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হইল। ত্রিবাঙ্কুর ইংরেজের সহিত মৈত্রীবদ্ধ ছিল, কর্ণওয়ালিস এই সময়ে ত্রিবাঙ্কুরের পক্ষে হস্তক্ষেপ করিলেন। ১৭৯০ সালের জুলাই মাসে তিনি পেশোয়া ও নিজামের সহিত এক আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষাত্মক মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। ইংরেজ বাহিনীকে সহায়তা দানের জন্য পেশোয়া ও নিজাম প্রত্যেক দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইলেন। স্থির হইল বিজিত অঞ্চলসমূহ তিন পক্ষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হইবে, তবে পূর্বে যে সকল জমিদার ও পলিগার মারাঠাদিগের উপর নির্ভরশীল ছিলেন তাঁহাদের অধিকৃত ভূখণ্ড তাঁহাদিগকে পূর্ণস্বত্ব সহ ফিরাইয়া দিতে হইবে। পেশোয়া ও নিজামের যুদ্ধে যোগদানের পূর্বে ইংরেজরা একক চেষ্টায় যে সকল অঞ্চল অধিকার করিবে সেইগুলি ইংরেজেরই থাকিবে।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯০-৯২)ঃ এক্ষণে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল তাহা প্রায় দুইবৎসর কাল স্থায়ী হইল। তিনটি অভিযানে ইহা পরিসমাপ্তি লাভ করে। ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে জেনারেল মেডোস (Medows) পঞ্চদশ সহস্র সৈন্যসহ অভিযান করিলেন। ইংরেজের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধান সৈন্যদলের কোয়ম্বাতুর জেলা জয় করিয়া মহীশূর অবধি অগ্রসর হইবার কথা ছিল। অপর এক ইংরেজ বাহিনী, প্রথম কেলী (Kelly) পরে ম্যাক্সওয়েলের (Maxwell) নেতৃত্বে মহীশূর হইতে কর্ণাটকে উপনীত হইবার পথস্বরূপ গিরিবর্ত্মগুলি পর্যবেক্ষণ

করিবে এইরূপ স্থির হইল। তৃতীয় এক বাহিনীর (বোম্বাই বাহিনী) উপর মালাবারে টিপুর অধিকারস্থ ভূভাগ দখলের ভার অর্পণ করা হইল। টিপু ম্যাক্সওয়েলের বাহিনীকে প্রায় বিপন্ন করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেডোস ম্যাক্সওয়েলের সহিত মিলিত হইতে সমর্থ হন।

প্রথম বৎসরের অভিযানের ফলে ইংরেজবাহিনী দিন্দিগুল, কোয়ম্বাতুর ও পালঘাট অধিকারে সমর্থ হইলেও, যুদ্ধাবস্থার অনিশ্চয়তার জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস যুদ্ধের সর্বাধিনায়কত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস নূতন একটি আক্রমণের পথ উদ্ভাবন করিলেন—তিনি বাঙ্গালোর অধিকারের জন্য ভেলোর ও অম্বুরের পথ বাছিয়া লইলেন। বাঙ্গালোর দখলের পর তিনি শ্রীরঙ্গপত্তন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু টিপুর অনুসৃত 'পোড়া মাটি' নীতির ফলে কর্ণওয়ালিসের সৈন্য শিবিরে দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি হইল—কর্ণওয়ালিস তাঁহার কামানসমূহ ধ্বংস করিয়া অবরোধ প্রত্যাহারে বাধ্য হইলেন। তাঁহার পশ্চাদপসরণ কালে, মিত্র মারাঠা বাহিনী উত্তরে ধারওয়ার জয় করিয়া তাঁহার সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইবার জন্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা প্রচুর খাদ্যসম্ভার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, উহাতে কর্ণওয়ালিসের সৈন্যদলের খাদ্যাভাব দূর হইল। পরবর্তী অভিযান ইংরেজ বাহিনীর পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনুকূল হইল। কর্ণওয়ালিস শ্রীরঙ্গপত্তনের চারিদিক ঘিরিয় অবরোধ বিস্তারে সমর্থ হইলেন। টিপুর রাজধানীর বহির্ভাগ তিনি দখল করিলেন, টিপুর সন্ধি প্রার্থনা ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না।

যুদ্ধের ফলাফল: শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি (মার্চ, ১৭৯২) অনুযায়ী টিপু তাঁহার রাজ্যের অর্ধেক ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। মারাঠাদের গগে পড়িল প্রধানতঃ ওয়ার্ধা ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। বেল্লারীর নিকটবর্তী সুন্দুর উপত্যকাও তাহারা পাইল। নিজামের অংশে পড়িল গুটি ও কুদাপ্পাসহ কৃষ্ণা নদী হইতে পেন্নার নদীর নিম্নদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ। ইংরেজেরা পাইল দিন্দিগুল, বরমহল, কুর্গ ও মালাবার। কওয়ালিস ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের নিকট এই সমস্ত অঞ্চল দখল সমর্থন করিলেন এ যুক্তিতে যে, উহার দ্বারা একটি শক্তিশালী আত্মরক্ষার সীমান্ত সৃষ্টি হইল।

সন্ধির সর্তাদি কর্ণওয়ালিস চূড়ান্ত জ্ঞান করিয়াছিলেন। মারাঠাদের ও নিজামের সহিত এই মৈত্রী তাঁহার শাসননীতির ভিত্তিস্বরূপ লি। যুদ্ধের

সমাপ্তিতে তিনি সম্ভবতঃ ভবিষ্যতের জন্য এই নীতি আরও সুদৃঢ় করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ধির সর্তাদি কেবলমাত্র আত্মরক্ষামূলক বিধানাবলীতেই সীমাবদ্ধ ছিল, টিপু তিন শক্তির মধ্যে কোন এক পক্ষকে উত্তেজনার সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে আক্রমণ না করিলে ঐ বিধানাবলী কার্যকর করিবার উপায় ছিল না। পরাক্রান্ত টিপু সুলতানের শক্তি দমনের নীতি ব্যর্থ প্রমাণিত হইল ; কয়েক বৎসরের মধ্যেই পুনরায় যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্যার জন শোর ও ঔদাসীন্য নীতি

ঔদাসীন্য নীতির (Policy of Non-intervention) **যৌক্তিকতা ঃ** স্যার জন শোর (Sir John Shore) ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের স্থলাভিষিক্ত হইলেন। তিনি কোম্পানীর একজন বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি অন্যান্য রাজ্য সম্পর্কে কঠোর ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন। বাস্তব অবস্থার সহিত সংস্পর্শশূন্য তাঁহার এই নীতির জন্য সাম্রাজ্যবাদিগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ দোষারূপ করিয়াছেনঃ ইহার ফলে ব্রিটিশ মর্যাদার হানি ঘটে। কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই যে, "তাঁহার এবং কর্ণওয়ালিসের এই হস্তক্ষেপবিমুখ নীতির মূলে ছিল এই প্রত্যয় যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যবাহিনী সম্মিলিত পঞ্চ মারাঠা শক্তি (পেশোয়া, সিন্ধিয়া, হোলকার, ভোঁসলে, গাইকোয়াড়)-কে ও তাঁহাদের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত টিপুর বাহিনীকে প্রতিহত করিবার মত বলের অধিকারী ছিল না। টিপু মিত্রসন্ধানে চেষ্টার ত্রুটি করিতেছিলেন না।" এতদ্ব্যতীত তৎকালে ভারতে সুযোগ্য কোন ইংরেজ সেনাপতিও ছিলেন না। ব্রিটিশ বাহিনীতে ভারতীয় সৈন্য ইংরেজ সৈন্যসংখ্যার তুলনায় ছয়-সাত গুণ অধিক ছিল, উহা শাসকদের নিকট নিরাপদ বিবেচিত হয় নাই। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে প্রভূত ঋণ হইয়াছিল, নূতন যুদ্ধ চালাইবার মত আর্থিক সঙ্গতি ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে স্যার জন শোরের ছিল না। তিনিও কর্ণওয়ালিসের ন্যায় বিশ্বাস করিতেন যে, মারাঠাদিগকে না ঘাঁটাইলেই ফল ভাল হইবে—তাহাদের আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদই তাহাদের ক্ষমতার অবলোপ ঘটাইবে।

অন্যপক্ষে, তাহাদের উপর আক্রমণ হইলে তাহারা উহাকে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের উপর আক্রমণ অথবা জাতীয় মর্যাদার উপর আঘাত বলিয়া বিবেচনা করিবে এবং তখন ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় যেরূপ ঘটিয়াছিল ঠিক সেইরূপভাবে মারাঠা-মহীশূর শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ইংরেজের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবে। সাম্রাজ্যবাদী সমালোচকেরা ভুলিয়া যান যে, পেশোয়া মাধব রাও নারায়ণ যখন জীবিত আছেন এবং নানা ফড়নবীশ যখন মারাঠা জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, সেই ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে যে রাজনৈতিক অবস্থা ছিল তাহা ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলী ভাগ্যক্রমে যে অবস্থা পাইয়াছিলেন তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের কার্যক্রমের মধ্যেও মাঝে মাঝে শান্তি ও সংকোচনের নীতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়—ইহাও তাঁহারা বিস্মৃত হন। ইংরেজের ভারত-বিজয়কে জীবদেহের স্পন্দন প্রক্রিয়ার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যুদ্ধ ও রাজ্যজয়, তারপর কিছুকাল বিরাম, তারপর আবার যুদ্ধ—এইভাবে ইংরেজের অভিযান অগ্রসর হইয়াছে। বিরতির অধ্যায়গুলিতে ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের জন্য শক্তি সংগ্রহ করা হইয়াছে। শোর, বার্লো ও মিণ্টো তাঁহাদের বহু-নিন্দিত ঔদাসীন্য নীতির দ্বারা এমন এক প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছিলেন যাহা পরবর্তী কালের উদ্দাম জয়াভিযানগুলির সাফল্যের ভূমিকাস্বরূপ ছিল। লর্ড ওয়েলেসলী ও লর্ড হেষ্টিংসের কৃতিত্বের ভিত্তি প্রকারান্তরে তাঁহারাই প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

নানা ফড়নবীশঃ স্যার জন শোর যখন গভর্ণর-জেনারেল হন তখন প্রধানতঃ যে দুইজন ব্যক্তির দ্বারা মারাঠা ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁহারা হইলেন নানা ফড়নবীশ ও মহাদাজী সিন্ধিয়া। নানা ফড়নবীশের হস্তে তরুণ পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাও (বা মাধব রাও নারায়ণ) ক্রীড়নক স্বরূপ ছিলেন। সমসাময়িক ইউরোপীয়গণ তাঁহাকে মারাঠা জাতির ম্যাকিয়াভেলি বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গ্র্যাণ্ট ডাফ বলিয়াছেন যে, "তাঁহার বিচারবুদ্ধির বলিষ্ঠতা, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তিসমাবেশের নৈপুণ্য সমগ্র ভারতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।" যদিও টিপুর প্রতি তাঁহার বিশেষ বিদ্বেষ ছিল, তথাপি মহীশূরের সর্বনাশ সাধনেরও তিনি ভয়ানক বিরোধী ছিলেন।

মহাদাজী সিন্ধিয়া ঃ উত্তরে মহাদাজী সিন্ধিয়া ছিলেন ঘটনাবলীর নিয়ন্তা। মালব প্রদেশে তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি দিল্লীর শাসনভার গ্রহণ করেন। মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম তাঁহার ক্রীড়নকে পর্যবসিত হন। ১৭৮৭-৮৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার শত্রুরা উত্তরে তাঁহার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইলে তিনি সবিশেষ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হন। জয়পুরের নিকটবর্তী তুঙ্গার যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হয়। রোহিলা সর্দার গোলাম কাদির ও তাঁহার সহায়ক ইসমাইল বেগ দিল্লী অধিকার করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহাদাজী সিন্ধিয়ার হস্তে উভয়েরই পরাভব ও মৃত্যু ঘটে। সিন্ধিয়া মারাঠাদের সনাতন রণনীতি বহুলাংশে পরিহার করিয়া স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তোলেন। তৎনিযুক্ত ফরাসী যুদ্ধকুশল ব্যক্তিগণ তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত ও পরিচালিত করেন। দ্য বয়েন (De Boigne) ছিলেন ইহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। মহাদাজী সিন্ধিয়া টিপুর রাজ্য সমগ্রভাবে অধিকারের (১৭৯২) বিরোধী ছিলেন। ইংরেজরা তাঁহার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিত। তাহাদের সতর্ক ঈর্ষাপরায়ণতার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্র্যাণ্ট ডাফের ভাষায় সিন্ধিয়া ছিলেন "ক্ষুরধার রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, প্রতিভাধর, কূটনীতিজ্ঞ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ।" ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহার প্র-পৌত্র দৌলত রাও তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। মহাদাজী এক হিসাবে নানা ফড়নবীশের প্রতিপক্ষ ছিলেন। মহাদাজীর আকস্মিক পরলোক গমনে নানা ফড়নবীশ মারাঠাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন।

১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজের সহিত মারাঠাদের সম্পর্ক মারাঠা ইতিহাসের প্রসিদ্ধ রচয়িতা গ্র্যাণ্ট ডাফ এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, "নিজাম ইংরেজের মধ্যে তাঁহাকে সহায়তা দানের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সহযোগিতায় তাঁহার ও মারাঠাগণের মধ্যে একটি ব্যবধান সৃষ্টির যে পরিকল্পনা বহুদিন যাবৎ তাঁহার মনে ছিল তাহা চরিতার্থ করিবার সুযোগ সন্ধান করিলেন। এতদ্বারা তিনি মারাঠাদের বর্তমান দাবী-দাওয়া ও ভবিষ্যৎ আক্রমণ-সম্ভাবনা নিরোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। নিজাম ও ইংরেজের এই সম্ভাব্য মৈত্রী প্রতিরোধের যৌক্তিকতা সম্পর্কে নানা ফড়নবীশ

ও মহাদাজী সিন্ধিয়ার মধ্যে মতভেদ ছিল না। তবে ইংরেজের কার্যক্রম কি হইতে পারে সে বিষয়ে তাঁহারা একমত হইতে পারেন নাই। সিন্ধিয়া অনুমান করিলেন, ইংরেজেরা যে নিজাম আলীর সহিত মৈত্রীবদ্ধ হইতে চাহিতেছে তাহা অন্য কোন অভিপ্রায়ে নহে, নিজামের সৈন্যসামন্ত উপকরণাদির উপর অধিকার লাভ করিয়া উহা মারাঠাগণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। এই মনোভাবের বশবর্তী হইয়া তিনি তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে টিপু সুলতানের সহিত বন্ধুতাপূর্ণ পত্র বিনিময় করিতে থাকেন। নানা ফড়নবীশের ধারণা ছিল অধিকতর যুক্তিযুক্ত; তিনি অনুমান করিতেন, ইংরেজরা মধ্যস্থতা করিতেই ইচ্ছুক। হায়দরাবাদ রাজ্যকে সর্বনাশের হাত হইতে উদ্ধার করার প্রয়োজন দেখা না দিলে তাহারা যুদ্ধের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না।"

নিজামের সহিত মারাঠাদের যুদ্ধ (১৭৯৫) ঃ মহাদাজীর মৃত্যুর পর অবস্থা দ্রুত অবনতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিজামের নিকট মারাঠাদের 'চৌথ' এবং 'সরদেশমুখী' বাবদ বিস্তর প্রাপ্য ছিল। দশ বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ এই বিষয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল; নিজাম মারাঠাদের দাবী-দাওয়ারও কিছু কিছু স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। টিপুর সহিত যুদ্ধের পর নিজাম প্রথমে লর্ড কর্ণওয়ালিস, পরে স্যার জন শোরের নিকট হইতে নিরাপত্তার আশ্বাস লাভে সচেষ্ট হন। স্যার জন শোর মারাঠাগণ ও নিজামের মধ্যে বিসম্বাদ নিষ্পত্তিকল্পে মধ্যস্থতায় স্বীকৃত হইলেন না। তিনি নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিলেন। গ্র্যান্ট ডাফ মন্তব্য করিতেছেন, "গভর্ণর-জেনারেলের প্রস্তাবিত হস্তক্ষেপে সুফল কি হইত বলা যায় না, তবে উহার দ্বারা নিজাম আলীর কূট অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলে মারাঠাদিগের প্রতি অবিচার হইত।" নিজাম স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠনের উদ্যোগ করিতেছিলেন; রেমণ্ড (Raymond) নামক একজন স্যাভয়বাসী ফরাসী সৈনাধ্যক্ষের নিকট সৈন্যগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছিল। নিজামের প্রধান মন্ত্রী নিজামের শক্তি সম্পর্কে এতদূর প্রত্যয়শীল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে যেসকল মারাঠা দূত মারাঠাদের দাবী-দাওয়া আলোচনার জন্য আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে তিনি বলেন যে নানা ফড়নবীশের উচিত হায়দরাবাদের দরবারে হাজিরা দেওয়া। তিনি এই গর্বোদ্ধত উক্তি করেন

যে পেশোয়াকে "কৌপীন পরিয়া একপাত্র জল হাতে করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিবার জন্য" বারাণসী প্রেরণ করা হইবে।

অনিবার্য যুদ্ধ অতি সংক্ষেপেই সমাপ্ত হইয়া গেল। সমুদয় মারাঠা সামন্ত পুণার আহ্বানে সাড়া দিলেন। খর্দার যুদ্ধ (মার্চ, ১৭৯৫) অবশ্য তেমন কিছুই ছিল না। নামমাত্র যুদ্ধ হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে দুইশত জন লোকও বোধ হয় নিহত হয় নাই। তরুণ পেশোয়া মাধব রাও নারায়ণ এই জয়লাভে আহ্লাদিত হইতে পারিলেন না। তিনি নাকি মন্তব্য করেন, "উভয়পক্ষ স্পষ্টতঃই এই যে হীনতা প্রদর্শন করিয়াছে তাহাতে আমার মনে ধিক্কার উপস্থিত হইয়াছে। মোগলেরা হীনবীর্যের ন্যায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে, আর আমার সৈন্যেরা সেই অনায়াসলব্ধ বিজয়লাভেই গর্বপ্রকাশ করিয়া বেড়াইতেছে।" নিজামের পরাজয় সম্বন্ধে অবশ্য কোন সংশয় ছিল না। তিনি চূড়ান্ত ভাবে বিজিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পূর্বোক্ত দাম্ভিক মন্ত্রীকে মারাঠাদিগের প্রতি প্রদর্শিত অপমানের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মারাঠাদের হস্তে সমর্পণ করেন, তাঁহার স্বীয় অধিকারভুক্ত অঞ্চলসমূহের অর্ধেক ছাড়িয়া দেন এবং প্রচুর অর্থ খেসারত দেন। তিনি ভারতের এক প্রধান ও নেতৃস্থানীয় শক্তি হইতে সাধারণ এক শাসকে পর্যবসিত হন। নিষ্ফল ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া তিনি তাঁহার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ফরাসী সৈনাধ্যক্ষগণ কর্তৃক শিক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত ও চালিত হইতে থাকে। ইংরেজের সৌভাগ্যক্রমে, খর্দার যুদ্ধের অত্যল্পকাল মধ্যেই নাবালক পেশোয়া মাধব রাও নারায়ণের আত্মহত্যায় মারাঠাদের মধ্যে ক্ষমতা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। নিজামের উপর মারাঠাদের জয়লাভের ফল নষ্ট হয়। মারাঠা রাজ্য সংহতি হারায়। পুণার এই বিপর্যয় ইংরেজদের হস্তে মহা সুযোগ আনিয়া দিল। অত্যল্পকাল মধ্যেই তাহারা মারাঠাদের আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারতে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইল।

অযোধ্যা : অযোধ্যায় স্যার জন শোর ঔদাসীন্য নীতি অনুসরণ করেন নাই। ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে নবাব আসফ-উদ্দৌলার মৃত্যুতে দুইজন দাবীদার অযোধ্যার উত্তরাধিকারের দাবী জানাইয়া তাঁহার সমক্ষে আবেদন উপস্থাপিত করিলেন। একজন মৃত নবাবের ভ্রাতা সাদাৎ আলী, অন্যজন মৃত নবাব

কর্তৃক উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত ওয়াজির আলী। স্যার জন শোর সাদাৎ আলীর দাবী স্বীকার করিয়া লইলেন। তিনি তাঁহাকে এক চুক্তির (১৭৯৮) দ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইতে বাধ্য করিলেন। এই চুক্তির বলে নবাব কর্তৃক কোম্পানীকে দেয় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইল এবং অযোধ্যা প্রদেশের সামরিক চাবিকাঠিস্বরূপ এলাহাবাদ দুর্গ কোম্পানী স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লর্ড ওয়েলেসলী ও অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি

লর্ড ওয়েলেসলীর সাম্রাজ্যবাদঃ ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে লর্ড ওয়েলেসলী স্যার জন শোরের স্থলে গভর্ণর-জেনারেল হইলেন। লর্ড কার্জন ব্যতীত অন্য কোন গভর্ণর-জেনারেল মার্কুইস অব্ ওয়েলেসলীর ন্যায় ভারত শাসনের সমস্যাবলীর সহিত এত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত ছিলেন না। তিনি একজন বিদ্বান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন; বোর্ড অব কন্ট্রোলের অন্যতর সদস্য হিসাবে কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি ভারতবর্ষীয় ঘটনাবলীর সহিত সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি একজন ঋজু সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। তাঁহার নিজের কথায় বলিতে গেলে, তাঁহার ভারতশাসনের উদ্দেশ্য ছিল—"হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণাত্যের প্রতিটি অঞ্চলে মৈত্রী ও রাজনৈতিক সম্পর্কের এক দৃঢ়বদ্ধ জাল রচনা করা।" অর্থাৎ তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে ভারতবর্ষে এক সার্বভৌম ক্ষমতায় রূপান্তরিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয় যে উহা 'বিশৃঙ্খলা হইতে শৃঙ্খলায় বিবর্তনের এক ক্রমিক আলোড়ন প্রয়াস মাত্র।' বলা হইয়াছে যে তাঁহার গভর্ণর-জেনারেল থাকা কালেই **ভারতে স্থিত** ব্রিটিশ সাম্রাজ্য **ভারতীয়** ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছিল। কথাটা লর্ড ওয়েলেসলী সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রচলিত।

মহীশূরের সম্পর্কে ওয়েলেসলীর নীতির যৌক্তিকতাঃ পূর্বোক্ত রূপান্তরক্রিয়ার সূচনাপর্বে ইংরেজের কূটনীতি ও সামরিক শক্তির প্রথম

উল্লেখযোগ্য জয় হইল মহীশূরের পতনে। মিল বলিয়াছেন যে টিপুকে ধ্বংস করিবার (১৭৯৯) কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার সহিত সন্ধির আলোচনার সূত্রপাত হইতে কোন সময়েই এই কারণ বিদ্যমান ছিল না। মিলের মতে টিপু ও ফরাসীদের মধ্যে বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না; তাহাদের যোগাযোগের পদ্ধতি ছিল শিশুসুলভ, হাস্যকর। অন্যপক্ষে, মিলের গ্রন্থের সম্পাদক উইলসন (Wilson) লর্ড ওয়েলেসলীর সমর্থনে ভিন্ন এক যুক্তিপরম্পরা উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, গভর্ণর-জেনারেল উচিত কার্যই করিয়াছিলেন। টিপুর শক্তিসংগ্রহের প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হওয়া অবধি, ফ্রান্সের সহিত তাঁহার আলোচনা পর্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়া পর্যন্ত, অথবা তিনি হায়দরাবাদে রেমণ্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন চৌদ্দ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্যের মূল্যবান সহায়তা লাভে সমর্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিলে ইংরেজ সরকার মহা ভুল করিতেন। ব্রিটিশ নৌবহরের শ্রেষ্ঠত্ব ও সতর্কতা সত্ত্বেও ফরাসী প্রতিপক্ষের বিরাট বাহিনী ঠিক এই সময়েই যে কারণে মিশরে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছিল ঠিক অনুরূপ কারণের সদ্ব্যবহার করিয়া তাহারা টিপু সুলতানের নিকটও সুযোগ্য সেনাবাহিনী ও সেনাধ্যক্ষগণকে পাঠাইতে পারিত, এবং তাহাদের বলে বলী হইয়া টিপুর পক্ষে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপদ ঘটানো অসম্ভব ছিল না। আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ আবদালীর পৌত্র জমান শাহ টিপুর প্রতি সদ্ভাবসম্পন্ন ছিলেন, তিনি উত্তর-পশ্চিম দিক্‌ হইতে ভারত আক্রমণের তোড়জোড় করিতেছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলী ক্ষিপ্রতা ও দৃঢ়তা সহকারে পরিস্থিতির সম্মুখীন না হইলে অবস্থা কি দাঁড়াইত বলা কঠিন। গভর্ণর-জেনারেলের নিজের ভাষায়, তাঁহার শাসনের সেই অধ্যায় ছিল এক প্রচণ্ড সংকটের কাল। মহীশূর জয়কে ওয়েলেসলী তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার রচনাদিতে বারবার এই জয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ভিতর ও বাহির হইতে ফরাসী আক্রমণের বিপদ সম্ভাবনা সম্ভবতঃ অতিরঞ্জিত আকারে প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, মহীশূরের পতনের ফলে ভারতে ব্রিটিশ শক্তি দৃঢ়তর হইয়াছিল। ঠিক যেভাবে সাদোয়ার (Sadowa) যুদ্ধজয়ের দ্বারা ফরাসীদের বিরুদ্ধে জার্মান শক্তি দৃঢ়তর হইয়াছে, এই ক্ষেত্রেও অল্পবিস্তর সেই

অবস্থারই সৃষ্টি হইয়াছিল। উহাতে ইংরেজের চূড়ান্ত বিজয়ের সহায়তা হইয়াছে।

নিজামের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতা (Subsidiary Alliance) : ওয়েলেসলী টিপুর সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য সবিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। স্বভাবতঃই টিপু ঐ সকল প্রয়াসকে কিঞ্চিৎ সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। ইংরেজের পক্ষে উহা সময় লাভের অভিসন্ধিপরায়ণ চেষ্টা বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু হায়দরাবাদে আলাপ-আলোচনার ফল ভিন্নরূপ হইল। নিজামের রাজধানীতে ফরাসী বাহিনীর স্থলে ইংরেজ বাহিনী অধিষ্ঠিত হইল। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে নিজামের সহিত এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। নিজাম স্যার জন শোরের নিকট এই মর্মে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ইংরেজ পক্ষ যদি তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে রক্ষার আশ্বাস দান করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার বাহিনী হইতে ফরাসী সেনাধ্যক্ষদিগকে কর্মচ্যুত করিতে ও ফরাসী রণপদ্ধতিতে শিক্ষিত সৈন্যদলকে ভাঙ্গিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। স্যার জন শোর নিজামের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। ওয়েলেসলী নিজামকে সকল সময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যনির্বাহার্থ অতিরিক্ত সৈন্যদল দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। নিজাম এই সৈন্যবাহিনীর জন্য বৎসরে ২৪,১৭,০০০ টাকা দিতে চুক্তিবদ্ধ হইলেন ; উপরন্তু, ইংরেজ নয় এমন ইউরোপীয় সেনাধ্যক্ষদিগকে তাঁহার বাহিনী হইতে উৎখাত করিতে এবং ইংরেজের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁহার বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেও তিনি সম্মত হইলেন। ফরাসী বাহিনী বিনারক্তপাতে অপসারিত হইল ; নিজাম ইংরেজের মিত্ররূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯৯) : গভর্ণর-জেনারেল ও টিপু সুলতানের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দের আগস্টে ব্যর্থতায় পরিসমাপ্তি লাভ করিল। উভয় পক্ষ ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হইল। সংঘর্ষের সূত্রপাতে ওয়েলেসলীর উদ্দেশ্য ছিল কানাড়া জয় করিয়া ফরাসীদের সহিত টিপুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা, তাঁহার নিকট হইতে বলপূর্বক ক্ষতিপূরণ আদায় করা এবং তাঁহার রাজধানীতে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট গ্রহণ করিতে তাঁহাকে বাধ্য করা। ইংরেজের পরিকল্পনাই শুধু সুরচিত হয় নাই ; তাহাদের অভিযানও সুপরিচালিত হইয়াছিল। বিভিন্ন সেনাদলের

মধ্যে সংযোগ সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। জেনারেল হ্যারিস (Harris) ভেল্লোর হইতে, জেনারেল স্টুয়ার্ট কন্নুর হইতে অগ্রসর হইলেন। আর্থার ওয়েলেসলী, যিনি ইতিহাসে পরবর্তী কালে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন (Duke of Wellington) রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন, তিনি হায়দরাবাদ বাহিনীর অধিনায়ক হইলেন। টিপুর রণ-চাতুর্য ইংরেজ রণ-চাতুর্যের নিকট পরাহত হইল। ইংরেজ বাহিনী ক্রমশঃ শ্রীরঙ্গপত্তনকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া ধরিল। ১৭ই এপ্রিল শ্রীরঙ্গপত্তনের অবরোধ আরম্ভ হইল, ৪ঠা মে শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকৃত হইল। টিপু নিহত হইলেন। তাঁহার পুত্র আত্মসমর্পণ করিলেন। এইভাবে হায়দর আলীর বংশের পতন ঘটিল।

টিপুর রাজ্যের মূল ও কেন্দ্রস্থ ভূভাগ মহীশূরের প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের একজন উত্তরাধিকারীকে অর্পণ করা হইল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কানাড়া স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লইল। উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ভূভাগ নিজামকে দেওয়া হইল। পরে নিজাম ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর সহিত তাঁহার দ্বিতীয় চুক্তিতে এই অঞ্চল ইংরেজকে সমর্পণ করেন। এইভাবে নূতন মহীশূর রাজ্য চারিদিকে ইংরেজ এলাকার দ্বারা সম্পূর্ণ বেষ্টিত হইল ও সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। মহীশূরের নূতন রাজা ছিলেন নাবালক। টিপুর শাসনকালীন অর্থমন্ত্রী পূর্ণিয়া শাসনকার্যের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। আর্থার ওয়েলেসলী সাময়িক ভাবে রাজ্যের সামরিক অভিভাবকের পদে আপনাকে অধিষ্ঠিত করিলেন।

টিপুর পতনের কারণঃ মহীশূর রাজ্যে এইরূপ একটি প্রবচন প্রচলিত আছে যে, "হায়দর একটি সাম্রাজ্য গঠনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, টিপু জন্মগ্রহণ করেন উহা হারাইবার জন্য।" জীবনের শেষভাগে টিপু তাঁহার সামরিক প্রস্তুতির তাবৎ উদ্যম নিঃশেষ করিয়াছিলেন শ্রীরঙ্গপত্তনের রক্ষাব্যূহ দৃঢ়তর ও সম্ভাবিত অবরোধ আশঙ্কায় খাদ্যসম্ভার দ্বারা উহাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে। তাঁহার পিতা একাধিক বার বর্ষাগম পর্যন্ত রাজধানী রক্ষা করিয়া শত্রুকে পরাভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রণকৌশল পুরাপুরি আত্মরক্ষামূলক ছিল, এমন নহে। তিনি আক্রমণাত্মক নীতিতেও বিশ্বাস করিতেন। যে অশ্বারোহী বাহিনী হায়দরের অভিযানসমূহে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পূরণ করতঃ হায়দরের পরাজয়ের ফলাফলকে একটি

সংকুচিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই অশ্বারোহী বাহিনীর প্রতি টিপু তাদৃশ মনোযোগ আরোপ করেন নাই। হায়দর কথনও কথনও যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অভিযান পরিচালনায় ত্রুটি ছিল না। উইল্‌ক্‌সের মতে, যুদ্ধের সামরিক পরিচালনা অপেক্ষা রাজনৈতিক পরিচালনায় হায়দর সমধিক দক্ষ ছিলেন।

হায়দরের সহিত টিপুর অন্য এক বিষয়ে পার্থক্য ছিল। টিপুর মন ছিল সক্রিয়, তিনি তাঁহার সজাগ মন লইয়া খুঁটিনাটির প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিতেন; কোন বিষয়কে উহার অখণ্ডতায় ও সমগ্রতায় বিচার করিবার মত মানসিক সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। নূতনত্বের প্রতি অদম্য আগ্রহ ও খুঁটিনাটির প্রতি একান্ত ঔৎসুক্য থাকায় তিনি শাসক হিসাবে সবিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। উইলক্‌স্ লিখিয়াছেন, "হায়দর ছিলেন শাসন পরিচালনার প্রতি যত্নশীল একজন পরিবর্তনবিমুখ রাজা। টিপু সর্বদাই অভিনবত্ব ও পরিবর্তনের সন্ধান করিতেন, ফলে তাঁহার শাসনে রাজ্যের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই।" টিপুর পরধর্ম অসহিষ্ণুতা ও নৃশংসতা বিষয়ে সম্ভবতঃ কিছু অতিরিক্ত গাল-গল্প প্রচারিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মিলের উক্তি স্মরণীয়ঃ "তাঁহার নিষ্ঠুরতার কাহিনী আমাদের ভিতর সমধিক প্রচারিত হইয়াছে এইজন্য যে, আমাদের স্বদেশবাসীদেরও তাহা ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মাত্র কতিপয় ক্ষেত্রে,—উহার প্রমাণও আবার খুব নিশ্চিত নহে—তাহাদের লাঞ্ছনা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে; অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহাদিগকে সশ্রম কারাভোগের অতিরিক্ত দুঃখ সহিতে হয় নাই।"

তাঞ্জোর ও কর্ণাটক অধিকারঃ লর্ড ওয়েলেসলী উত্তরাধিকার সংক্রান্ত এক বিসম্বাদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া (১৭৯৯) তাঞ্জোর রাজ্য কোম্পানীর শাসনাধীনে আনয়ন করেন। তাঞ্জোরের মারাঠা রাজাকে বৃত্তিদান করা হয়। ওয়েলেসলী কর্ণাটকও কোম্পানীর অধিকারভুক্ত করেন (১৮০১)। টিপুর মৃত্যুর পর শ্রীরঙ্গপত্তনে যে সকল কাগজপত্র পাওয়া যায় তাহাতে নাকি কর্ণাটকের নবাব উমদৎ-উল-উমরার সঙ্গে টিপুর যোগসাজস প্রমাণিত হয় এমন কিছু তথ্যাদি ছিল, উমদৎ-উল-উমরা টিপুর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে রাজ্যচ্যুত হইলেন। উমদৎ ছিলেন মহম্মদ আলীর পুত্র।

কোম্পানী মহম্মদ আলীকে এই সর্তে নিরাপত্তার আশ্বাস দান করিয়াছিলেন যে মহম্মদ আলী কোম্পানীকে মাসিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়মিত প্রদান করিয়া যাইবেন। মহম্মদ আলী এই সর্ত পালন করিলে কোম্পানী আর তাঁহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। মহম্মদ আলী তাঁহার সর্ত পালনের জন্য ইংরেজের নিকট হইতেও অর্থ ঋণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই, ঋণদাতা ঐ সকল ইংরেজের মধ্যে মাদ্রাজ কাউন্সিলের সদস্যও দুই একজন ছিলেন। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ আলীর মৃত্যু হয়। ইংরেজ উত্তমর্ণদিগকে কয়েকটি জেলা ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ঐ সকল জেলার অধিবাসিগণ অত্যাচারিত হইত, কুশাসন ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইংরেজের অর্থগৃধ্নুতা এত প্রবল ছিল যে সর্বদাই তথায় বিপত্তি লাগিয়া থাকিত। ওয়েলেসলী উমদৎ-উল-উমরার বিরুদ্ধে উল্লিখিত সাক্ষ্য প্রমাণের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে রাজ্য ছিনাইয়া লইলেন এবং মহম্মদ আলীর এক প্রপৌত্রকে নবাবের আসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। এই-ভাবে তিনি কর্ণাটক রাজ্যে বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটাইলেন।

নিজামের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি (১৮০০)ঃ ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে নিজামের সহিত এক নূতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ অঞ্চল এই চুক্তির বলে তত্রস্থ ইংরেজ সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহার্থে ইংরেজের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হইল। ওয়েলেসলী অর্থ আহরণের এই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া সঙ্গত কার্যই করিয়াছিলেন। ইংরেজের সহিত আত্মরক্ষামূলক চুক্তির দ্বারা নিজামেরও সমূহ উপকার হইয়াছিল। তিনি এতদ্দ্বারা মারাঠাগণ সহ সর্বশ্রেণীর বহিঃশত্রুর আক্রমণ সম্ভাবনা হইতে স্বীয় রাজ্যরক্ষার আশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন।

অযোধ্যার সহিত চুক্তি (১৮০১)ঃ অযোধ্যার নবাবের সহিত এক নূতন চুক্তির বলে লর্ড ওয়েলেসলী অযোধ্যা রাজ্যের এক বৃহৎ অংশ কোম্পানীর অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। গোরক্ষপুর ও রোহিলখণ্ড বিভাগ এবং দোয়াবের কতকাংশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত ছিল। পরিবর্তিত অবস্থায় অযোধ্যার বিশেষ কোন উন্নতি হইল না, যদিও উহাতে হস্তান্তরিত অঞ্চলের উপর ইংরেজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। ইংরেজ অধিকৃত জেলাগুলি 'হস্তান্তরিত অঞ্চল' (the Ceded Districts) নামে পরিচিত

হইল। ওয়ারেন হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিস ও স্যার জন শোরের প্রবর্তিত ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রধানতঃ ইংরেজ বাহিনীর উপর অযোধ্যার আত্মরক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। এই বাবদে অযোধ্যার নবাবকে বৎসরে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা দিতে হইত। ব্রিটিশের নিরাপদ আশ্রয়ে অযোধ্যায় দুর্নীতি ও শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। দেয় টাকা বাকি পড়িতে লাগিল। "ইংরেজ ভাগ্যান্বেষীর দল রাজধানীতে ভিড় করিয়া আসিতে লাগিল, তাহাদের প্রশ্রয়ে দরবারে ব্যভিচারের মাত্রা বাড়িয়া গেল।" আফগানিস্থানের জমান শাহের সম্ভাবিত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ওয়েলেসলী ঐ দিকের রক্ষাব্যবস্থা দৃঢ়তর করা প্রয়োজনীয় বোধ করিলেন। নূতন চুক্তির বিধান অনুসারে নবাব তাঁহার সাধারণ সিপাহীর দ্বারা গঠিত সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিয়া তৎস্থলে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় কোম্পানীর সৈন্য নিয়োগ করিতে লাগিলেন। ঐ সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহার্থেই তিনি পুর্বোক্ত অঞ্চলগুলি ইংরেজের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। নবাবের স্বীয় অধিকারের যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহাও ব্রিটিশ সৈন্যের দ্বারা চতুর্দিকে সম্পূর্ণ বেষ্টিত হইয়া রহিল। তাঁহার নিজের অঞ্চলগুলিতে নবাব সুশাসন প্রবর্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অযোধ্যা আর নিরপেক্ষ রাজ্য রহিল না। এই অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে, এবং ইহার পর আরও যে সকল চুক্তি হয় সেগুলির পর ইহা স্পষ্টই হইয়া উঠিল যে কোম্পানীই এক্ষণে অযোধ্যার আলস্য ও বিলাসে এবং বিদ্রোহ ও অরাজকতায় জর্জরিত অপদার্থ শাসন-ব্যবস্থা বাঁচাইয়া রাখিবার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির সমালোচনা : ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে নিজামের সহিত চুক্তি এবং ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যার সহিত চুক্তি ছিল ওয়েলেসলীর অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির পরিণত রূপ। ইংরেজের উপর নির্ভরশীলতার ফলে কি কি অশুভের উদ্ভব হইয়াছিল মিল তাহার এক ফিরিস্তি দিয়াছেন— "দেশীয় শাসকগণের অত্যাচার অনাচার তাঁহাদের দুর্বলতার জন্য কখনও সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারিত না। কিন্তু যখন হইতে তাঁহারা ইংরেজের সামরিক বলের আশ্রয় লাভ করিলেন তখন তাঁহাদের অত্যাচারের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না।...ভারতের ছোটখাট রাজ্যগুলির বেলায় দেখা যায়, কুশাসন দুর্বলতার সৃষ্টি করিত এবং দুর্বলতার ফলে ঘটিত বহিরাক্রমণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কর্ণাটক

ও অযোধ্যায় কুশাসন দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকিলে অবধারিতভাবে ঐ দুইটি রাজ্যে বহিরাক্রমণ দেখা দিত। কর্ণাটক টিপু কর্তৃক বিজিত হইত, অযোধ্যা চলিয়া যাইত মারাঠাদের অধিকারে; আবার সাধারণতঃ একমাত্র সুশাসনের ফলেই রাজার শক্তিবৃদ্ধি হইত বলিয়া শক্তিমানের দ্বারা বিজিত হওয়া প্রজাদের পক্ষে ছিল বিশেষ ভাগ্যের কথা।" "ইংরেজের আশ্রয়ে নিজ নিজ রাজ্যে সুরক্ষিত হইয়া দেশীয় শাসকগণ ইংরেজের ক্রীড়াপুত্তলি স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের আত্মসম্মান অপহৃত হইল, স্বাভাবিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইল।" ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখের এক বিবরণীতে ওয়েলিংটন নিজামের রাজ্যের অবস্থাকে 'ঘোরতর নৈরাজ্যপূর্ণ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দুরারোগ্য কুশাসন হেতু রাজ্যদখল (যেমন অযোধ্যার বেলায় পরে ঘটিয়াছিল) ওয়েলেসলীর অনুসৃত নীতির স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র।

ওয়েলেসলী কর্তৃক অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির সমর্থন সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব হইতে উপজাত হইয়াছিল। ওয়েলেসলী এই বিষয়ে পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে তাঁহার অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির ফলে দেশীয় রাজ্যগুলির স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি ও উদ্যম ব্যাহত হইতেছিল; তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁহার অনুসৃত নীতি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন নাই, বরং ঐ হেতু আরও তাঁহার নীতির যৌক্তিকতা প্রতিপাদনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "ফল হইয়াছে এই যে, মারাঠাদের সহিত এই যুদ্ধে—যে যুদ্ধ দুইদিন অগ্রে কিংবা পশ্চাতে ঘটিতই—কোম্পানীর অধিকারভুক্ত অঞ্চল আক্রান্ত হয় নাই; আমাদের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার আধারস্থলগুলি হইতে যুদ্ধের অনিষ্ট সম্ভাবনাকে দূরে রাখা সম্ভব হইয়াছে।" ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন ইংলণ্ডের মন্ত্রী ক্যানিংকে এই মর্মে লিখেন যে, অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রকৃতি অন্যান্য মৈত্রীর প্রকৃতি হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র; উহা পেশোয়া ও নিজাম ভিন্ন অন্য কোন শক্তির ক্ষেত্রে প্রসারিত হওয়া উচিত নহে। অধীনতামূলক মিত্রতার প্রধান ত্রুটি হইল এই যে, উহা আভ্যন্তরীণ শাসনের একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রাখিতে অপারক হয়। কিন্তু ওয়েলেসলীর সময়ে এই নীতি অনুসরণ করাই কোম্পানীর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। উহা কোম্পানীর অবস্থা দৃঢ়তর করে এবং যে সৈন্যবাহিনীর দ্বারা দেশীয় রাজন্যবর্গের মনে ভীতির উদ্রেক

করা কোম্পানীর অভীষ্ট ছিল সেই সৈন্যদলের ব্যয়বহনে রাজন্যবর্গকে বাধ্য করিয়া এই নীতি কোম্পানীর আর্থিক পরিস্থিতি সহজ করিয়া তুলে।

মারাঠা সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা : ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে নানা ফড়নবীশের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা শাসনশক্তির প্রজ্ঞা ও মিতাচারেরও অবসান হয়। মারাঠা শক্তিজোটের এখন আর নেতা বলিয়া কেহ রহিল না। ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বাজীরাও মাধব রাও নারায়ণের স্থলে পেশোয়া হইলেন। তিনি ছিলেন দুর্বল, শঠ ও বিশ্বাসহন্তা। পূর্ব হইতেই বিভিন্ন মারাঠা শক্তিগুলির মধ্যে যে ক্ষমতাদ্বন্দ্ব চলিতেছিল তাহা এইক্ষণে চূড়ান্ত আকার ধারণ করিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে যে সকল বিশিষ্ট স্ত্রী ও পুরুষ মারাঠা রাজনীতিতে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে অপসারিত করিয়া ভাগ্য যেন এক ক্রূর আনন্দস্বাদ লাভ করিতেছিল। পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক দৌলত রাও সিন্ধিয়া মহাদাজীর রাজ্য ও সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু যে জটিল শক্তিদ্বন্দ্বের খেলা শুরু হইয়াছিল উহাতে বিজয়ী হইতে তিনি অপারক হইলেন। মলহর রাও হোলকারের পুত্রবধূ রাণী অহল্যা বাঈ ৩০ বৎসর যাবৎ ইন্দোর রাজ্য সাফল্যের সহিত শাসন করিয়া ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তুকোজী হোলকার ছিলেন অহল্যা বাঈয়ের সেনাদলের অধ্যক্ষ। তিনি রাজ্যশাসনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল (১৭৯৭)। কিছুকাল বিশৃঙ্খলা চলিবার পর যশোবন্ত রাও হোলকার ক্ষমতা দখল করিলেন। তিনি ছিলেন তুকোজীর জারজ পুত্র। শীঘ্রই তিনি পুণায় আধিপত্যলাভের বাসনায় দৌলত রাওয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর পুণা শহরের অতি সন্নিকটে তিনি পেশোয়া ও সিন্ধিয়ার বাহিনীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন।

পেশোয়ার সহিত অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি (১৮০২) : দ্বিতীয় বাজীরাও পুণা হইতে কোঙ্কন উপকূল অভিমুখে পলায়ন করিলেন। বেসীনে উপনীত হইয়া তিনি ব্রিটিশের সহিত এক অধীনতামূলক মিত্রতাচুক্তি সম্পাদন করিলেন (৩১ ডিসেম্বর, ১৮০২)। চুক্তির সর্ত অনুযায়ী পেশোয়ার রাজ্যে ছয় সহস্রের অনধিক এক স্থায়ী ইংরেজ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখা সাব্যস্ত হইল। কতকগুলি জেলা লইয়া গঠিত ২৬ লক্ষ টাকা আয়বিশিষ্ট একটি

অঞ্চল ঐ সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহার্থ ইংরেজের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হইল। নিজাম ও গাইকোয়াড়ের সহিত পেশোয়ার যে সকল দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত বিরোধ ছিল উহাদের নিষ্পত্তিতে পেশোয়া ব্রিটিশ সালিশী মানিয়া লইলেন। পূর্বোক্ত দুই শক্তি ইতঃপূর্বেই ইংরেজের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়াছিল। ইংরেজ সরকার পেশোয়ার বৈদেশিক নীতিরও নিয়ন্ত্রণভার লইল। এইরূপে পেশোয়া তাঁহার নিরাপত্তার মূল্য বাবদে তাঁহার স্বাধীনতা হারাইলেন। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী কর্তৃক তিনি পুণায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। যশোবন্ত রাও হোলকার পুণা হইতে উত্তরাভিমুখে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সিডনী ওয়েন লিখিয়াছেন, "মারাঠাদের সহিত আচরণে ওয়েলেসলী যে কার্যক্রম অনুসরণ করিয়াছিলেন উহা ভারতে ডুপ্লে ব্যতীত অন্য যে কোন ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞের অনুসৃত পন্থা অপেক্ষা অধিকতর বলিষ্ঠ ও মৌলিক পন্থা ছিল।" মারাঠা শক্তিজোটের অন্তর্ভুক্ত পেশোয়া ও অন্যান্য বিশিষ্ট নায়কদিগকে পরস্পর বিশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র ও স্বাধীন শক্তিরূপে গণ্য করা, তাঁহাদের রাজনৈতিক সংহতি চিরকালের জন্য ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গের উপর মারাঠাদের অস্পষ্ট রাজনৈতিক দাবী অস্বীকার—এই সকল ওয়েলেসলীর লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ ত্রিবিধ লক্ষ্যসাধনে তৎকালীন অবস্থা ওয়েলেসলীর বিশেষ সহায়ক হইল। পেশোয়া ইংরেজের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইলেন। মারাঠা শক্তিজোটকে আমরা পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের (Holy Roman Empire) ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠানই মনে করি অথবা পেশোয়া ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলির একটা ঘরোয়া বন্ধন বলিয়াই ভাবি, ঐ জোট কার্যতঃ অবলুপ্ত হইল। পেশোয়ার সহিত চুক্তি ইংরেজের কূটনৈতিক বেষ্টনীর সম্পূর্ণতা বিধান করিল; এই বেষ্টনীর দ্বারা নিজামকে সীমা বহির্ভূত রাখার সুবিধা হইল। উপরন্তু, পেশোয়ার এলাকার উপর অধিকার অন্যান্য মারাঠা নায়কদের সামরিক তৎপরতার উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তারে সহায়তা করিল।

সিন্ধিয়া মারাঠাদের উপর ইংরেজের আধিপত্য বিস্তার বিনা বাধায় স্বীকার করিয়া লইবেন বলিয়া ওয়েলেসলী যদি মনে করিতেন তাহা হইলে তদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইত যে, তিনি তাঁহার প্রতিপক্ষের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ ওয়েলেসলী ভাবিয়াছিলেন যে মারাঠা নায়ক-

দিগের পারস্পরিক বিভেদ ও ঈর্ষা যুদ্ধ এড়াইবার কাজে সহায়তা করিবে, সেই ক্ষেত্রে তিনি তাঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে নিষ্ক্রিয় করিয়া ঐ সুযোগে কোম্পানীর শান্তিপূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইবেন। কিন্তু ইংরেজের সামরিক প্রস্তুতির পূর্ণাঙ্গতা হইতে বুঝা যায় যে ওয়েলেসলী যুদ্ধের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়াইয়া দেন নাই।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৮০৩-৫)ঃ বেরারের রঘুজী ভোঁসলে, দৌলত রাও সিন্ধিয়া ও যশোবন্ত রাও হোলকার—এই তিন মারাঠা-প্রধান মারাঠা শক্তিজোটের অবলুপ্তি এবং সার্বভৌম ক্ষমতায় ইংরেজের প্রতিষ্ঠা সহজে মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। বেরারের রাজা সিন্ধিয়া ও হোলকারের মধ্যে একটা জোড়াতালি-দেওয়া শান্তি চুক্তি নিষ্পাদনে সমর্থ হইলেন, কিন্তু হোলকার ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযানে আশু তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার পরিবর্তে ঘটনার গতির দ্বারা চালিত হওয়ার নীতি গ্রহণ করিলেন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দৌলত রাও সিন্ধিয়ার যে সকল কার্যের ফলে যুদ্ধ বাধিল উহা বুদ্ধিহীনতা, অব্যবস্থিতচিত্ততা ও দীর্ঘসূত্রতার দৃষ্টান্তস্থল। তিনি ক্রমাগত ইতস্ততঃ ও অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, এই সুযোগে লর্ড ওয়েলেসলী তাঁহার যুদ্ধপ্রস্তুতি সমাপ্ত করিয়া লইলেন। অবশেষে 'আলোক শিখার চতুর্দিকে ঘূর্ণ্যমান এবং অবশেষে একসময় আলোক শিখায় অন্ধবৎ ঝটিতি প্রবিষ্ট পতঙ্গের' ন্যায় সিন্ধিয়া সহসা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসিলেন। তাঁহার ফরাসী সেনাধ্যক্ষগণ ইতঃপূর্বেই ওয়েলেসলী কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিলেন, সুযোগ বুঝিয়া তাঁহারা সিন্ধিয়ার স্থায়ী সেনাবাহিনীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন।

সেনাপতি আর্থার ওয়েলেসলী দাক্ষিণাত্যে ইংরেজের যুদ্ধ পরিচালনায় নিযুক্ত হইলেন, লর্ড লেক উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। সেনাপতি ওয়েলেসলী আহম্মদনগর অধিকার করিলেন। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি আসাইতে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সংযুক্ত বাহিনীকে পরাজিত করিলেন। গভর্ণর-জেনারেলের কূটনৈতিক চাতুর্যের বলে পূর্বেই এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে বেগম সমরুর সৈন্যবাহিনী যতশীঘ্র সম্ভব ইংরেজের সহিত আসিয়া যোগ দিবে। আসাইতে সিন্ধিয়ার অন্যতম সেনানায়ক পহ্‌লমান (Pohlman) ইতঃপূর্বেই ইংরেজের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ওয়েলিংটন আসাইতে

তাঁহার স্বল্পসংখ্যক তেজস্বী সৈন্য লইয়া অগণিত সংখ্যক শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই; স্ফীতকায় মারাঠা বাহিনীর কেবলমাত্র এক ক্ষুদ্র অংশের
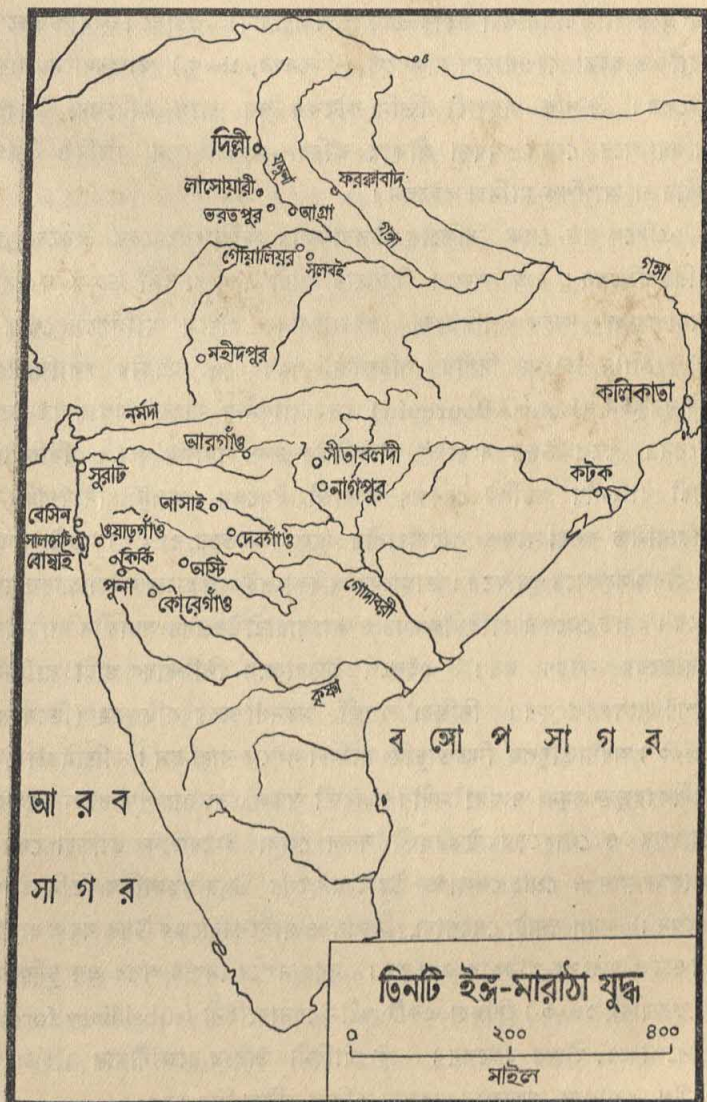
সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। সিন্ধিয়ার পাঁচ ব্যাটালিয়ন সেনা মাত্র ইংরেজের

বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। রঘুজী ভোঁসলে ভীরুর ন্যায় পলায়ন করিলেন। কিন্তু আরগাঁওয়ের যুদ্ধে (নভেম্বর, ১৮০৩) ভোঁসলেকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া স্বয়ং দূরে থাকিয়া সিন্ধিয়া উহার প্রতিশোধ লইলেন। ভোঁসলে সুনিশ্চিতরূপে পরাজিত হইয়া দেওগাঁয়ের সন্ধিসর্তে (ডিসেম্বর, ১৮০৩) স্বাক্ষরদানে বাধ্য হইলেন। ঐ সন্ধি অনুযায়ী তিনি কটকের স্বত্ব ত্যাগ করিলেন, উপরন্তু সিন্ধিয়া পরে যেরূপ অবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন তিনিও ঐরূপ অধীনতা আংশিক মানিয়া লইলেন।

এদিকে লর্ড লেক সিন্ধিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় অধিকারসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ঐ অঞ্চলে সিন্ধিয়ার স্থায়ী সেনাবাহিনী উহার ফরাসী সেনাধ্যক্ষদ্বয় কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। প্রথমে আলিগড়ে পেরোঁ (Perron), তৎপর দিল্লীর সন্নিকটস্থ পৎপরগঞ্জে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত লুই বুরকুইন (Louis Bourquin) সেনাবাহিনীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন। ফলে উভয় সংঘর্ষেই বাহিনীটির দ্রুত পরাজয় ঘটে। সিন্ধিয়ার স্থায়ী বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যগণ অম্বাজী ইঙ্গলের অপটু নির্দেশাধীনে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও লাসোয়ারীর যুদ্ধে (নভেম্বর, ১৮০৩) যথেষ্ট দৃঢ়তা ও বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে। তাহাদের অধিকাংশই অস্ত্র হাতে লইয়া প্রাণত্যাগ করে। লর্ড লেকের বাহিনীর জাঠ ও আলোয়ারী সৈন্যগণ অম্বাজীর বাহিনীর পরাজয়ের কারণ হয়। এইরূপে উত্তরাঞ্চলে সিন্ধিয়ার স্থায়ী বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সিন্ধিয়া সুরজী অঞ্জনগাঁওয়ের সন্ধিসূত্রে (ডিসেম্বর, ১৮০৩) অধীনতামূলক মিত্রতাচুক্তি মানিয়া লইতে বাধ্য হন। তিনি তাঁহার অধিকারভুক্ত যমুনা ও গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং রাজপুত রাজ্য জয়পুর, যোধপুর ও গোহড়ের উত্তরবর্তী সকল জেলা ইংরেজকে ছাড়িয়া দেন। আহম্মদনগর ও ব্রোচ জেলা ও উহাদের দুর্গের উপর স্বত্বস্বামিত্ব তিনি ত্যাগ করেন। মুঘল সম্রাট, পেশোয়া, নিজাম ও গাইকোয়াড়ের উপর সকল দাবী-দাওয়াও এতৎসহ পরিহার করা হয়। বুরহানপুরে নিষ্পন্ন অপর এক চুক্তিতে (ফেব্রুয়ারী, ১৮০৩) সিন্ধিয়া একটি অধীন সেনাবাহিনী (subsidiary force) পরিপোষণে স্বীকৃত হইলেন। এই বাহিনী তাঁহার রাজ্যসীমার বহির্ভাগে ব্রিটিশ এলাকার অভ্যন্তরে অবস্থান করিবে বলিয়া স্থির হয়।

গ্র্যান্ট ডাফ লিখিতেছেন, "অভিযান সমূহের দ্রুতগতি ও যুদ্ধের আশু পরি-

সমাপ্তি সারা ভারতকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল।" মারাঠা সামরিক শক্তির বিপর্যয়ের যে কারণ স্যার টমাস মনরো বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এই—"আমি ভাবিয়াছিলাম তাহাদের (মারাঠাদের) অশ্বারোহী বাহিনী অধিকতর উদ্যম প্রদর্শন করিবে, কিন্তু শত্রুপক্ষ অশ্বারোহী বাহিনীর মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দিয়া তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া দেয় যে শত্রুপক্ষ উহার জয়ের জন্য পদাতিক বাহিনীর উপর নির্ভরশীল, অশ্বারোহী বাহিনীর উপর নহে। ইহা অশ্বারোহী বাহিনীর সম্পূর্ণ বিনাশের কারণ হয়। পদাতিক বাহিনী লইয়া অগ্রসর হওয়ার ফলে শত্রুপক্ষ আমাদের হাতে আকাঙ্ক্ষিত সর্ববিধ সুযোগ আপনা হইতে তুলিয়া দিয়াছিল। সেনাধ্যক্ষগণের মনে জাতীয় চেতনার অভাবে তাহারা যে সকল সৈন্য আমাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিল উহারা কখনও আমাদের সৈন্যের সমকক্ষতা অর্জন করিতে পারে নাই।" মারাঠা স্থায়ী সেনাবাহিনীর সম্পর্কে তিনি ইহার পুর্বে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, "ইহাদের শৃঙ্খলাবোধ, অস্ত্রশস্ত্র এবং পোষাক এতই দীন যে মনে হয় ঐ বাহিনী বলিদানের জন্যই গঠিত হইয়াছে।"

কিন্তু মারাঠাদের পুরাতন লুঠতরাজের নীতি, যাহার প্রধান সমর্থক ছিল হোলকার বংশ, এক্ষণে (১৮০৪-৫) এক বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হইল। সেনাপতি লেক যশোবন্ত রাওয়ের উপর নজর রাখিয়াছিলেন। ভোঁসলে ও সিন্ধিয়ার আত্মসমর্পণের পর যশোবন্ত রাও স্বীয় শক্তিবলে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইংরেজের অভিপ্রায় ছিল হোলকারকে সকল দিক হইতে চাপিয়া ধরা ; কিন্তু বর্ষাগমে লেক যখন কানপুরে তাঁহার শিবিরে বিশ্রাম মানসে প্রস্থান করিলেন, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মনসন হোলকারকে শায়েস্তা করিতে যাইয়া অযোগ্যতার পরিচয় দিলেন। কোটার ৩০ মাইল দক্ষিণে রাজপুতানার মুকুন্দ দারা গিরিবর্ত্মে তাঁহার বাহিনী কার্যতঃ পরাজয় স্বীকার করিল। ছত্রভঙ্গ সৈন্যসামন্ত লইয়া চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনি আগ্রা যাইয়া পৌছিলেন। বেইলির পরাজয়ের পর এত বড় অবমাননা ইংরেজকে আর কখনও সহিতে হয় নাই। হোলকার যখন দিল্লী আক্রমণ করিলেন তখন ভরতপুরের রাজা ইংরেজের সহিত মৈত্রী ত্যাগ করিয়া হোলকারের পক্ষাবলম্বন করিলেন। ইংরেজের দুর্দশাই তাঁহার মনে এই সাহস যোগাইয়াছিল। কিন্তু দিল্লী আক্রমণ ব্যর্থ হইল। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের

১৩ই নভেম্বর দীগের যুদ্ধে হোলকারের পদাতিক বাহিনী প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সহ পরাজিত হইল। দোয়াব অঞ্চল বরাবর দ্রুতধাবমান অশ্বারোহী বাহিনীর এক অভিযানের নায়ক হইলেন লেক ; তাঁহার হস্তে হোলকারের অশ্বারোহী বাহিনী ফরক্কাবাদে পরাজিত হইল। হোলকার যখন ইংরেজ অধিকারভুক্ত প্রদেশগুলিতে তুমুল লড়াই চালাইতেছিলেন সেই সময় বোম্বাই বাহিনীর এক সৈন্যদল হোলকারের রাজধানী ইন্দোর দখল করিয়া লইল। তবে ১৮০৫ সালের গোড়ার দিকে ভরতপুরের জাঠ সৈন্যগণ লেকের বিজয়ী বাহিনীর চারিটি আক্রমণ পরপর প্রতিহত করিয়া যুদ্ধের গতি কতকটা ফিরাইতে সমর্থ হয়। লেক ভরতপুরের রাজার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। মন্দভাগ্য হোলকার অবশ্য সেনাপতি লেক কর্তৃক তীব্রভাবে পশ্চাদনুসৃত হইয়া পঞ্জাব অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

সিন্ধিয়ার নূতন আদর্শ বাহিনীর যে কলঙ্কর পরিণাম হইয়াছিল মারাঠা লুঠতরাজী বাহিনীর পরিণামও প্রায় ঐরূপ হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মনসনের ব্যর্থতা ও লেকের আংশিক ব্যর্থতার জন্য ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই লর্ড ওয়েলেসলীকে স্বদেশে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও তাঁহার স্থলে লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পুনরায় গভর্ণর-জেনারেল করিয়া ভারতে প্রেরণ করিলেন। ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষ ওয়েলেসলীর আক্রমণাত্মক নীতি কখনও খুব প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। ইংলণ্ডের প্রবল জনমতের বিচারে ওয়েলেসলী হঠকারী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যুদ্ধপ্রিয় রাজনীতিকরূপে ধিক্কৃত হইলেন। তাহারা টিপুর শক্তিহননকারী বর্ষীয়ান সৎ অভিজাত রাজনীতিক লর্ড কর্ণওয়ালিসকেই নূতন করিয়া বরণ করিয়া লইল।

ওয়েলেসলীর শাসনের মূল্যনিরূপণ ঃ ওয়েলেসলীকে দ্রুত স্বদেশে ফিরাইয়া আনা হইলেও এবং তাঁহার স্থলে কর্ণওয়ালিস ও বার্লোকে শাসন-দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদের অধীনে ভীরু শান্তি-নীতি অনুসরণ করা হইলেও ইহা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না যে মারাঠা সামরিক মর্যাদা ওয়েলেসলীর দ্বারা সর্বাংশে প্রতিহত হইয়াছিল। মারাঠা শক্তি আর ইংরেজের প্রতিযোগী শক্তি ছিল না, কোম্পানী সার্বভৌম বা চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিল। ব্রিটিশ ভারতের সর্বাপেক্ষা সাফল্যমণ্ডিত সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ওয়েলেসলীর উহাই ছিল শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

স্মিথ বলিতেছেন, "লর্ড ওয়েলেসলী পরবর্তীকালীন লর্ড লিটন ও লর্ড ডাফরিনের ন্যায় সম্রান্ত ইংরেজ অভিজাত ও ইংরেজ রাজনীতিকের ভঙ্গিমায় বৈদেশিক নীতির দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ভারতের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি শাসক যত না ছিলেন তদপেক্ষা অধিক ছিলেন রাজনীতিজ্ঞ; শাসন পরিচালনার উচ্চ নীতিসমূহ লইয়া প্রধানতঃ তিনি মাথা ঘামাইতেন, বিভাগীয় শাসনের খুঁটিনাটির প্রতি তাঁহার তেমন মনোযোগ ছিল না।" কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলী একটি শক্তিশালী কর্মনিপুণ শাসনযন্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, বিশুদ্ধ সত্যনিষ্ঠ সর্বত্র সমভাবে প্রযোজ্য ন্যায়বিচার এবং রাজস্ব আহরণের বিজ্ঞোচিত অনুগ্র ব্যবস্থা—এই তিন মৌলিক নীতি অনুসরণের দ্বারা সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব অবশ্যই বিধান করিতে হইবে।" ইংলণ্ড হইতে সদ্য-আগত যুবক সিভিলিয়ানদের শিক্ষার্থে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে তাঁহার শাসনকাল একটি দিক্‌চিহ্নস্বরূপ। দায়িত্বপূর্ণ কর্মে যোগ্য তরুণ কর্মীদের মনোনয়নে তিনি সবিশেষ পটু ছিলেন। ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি, যথা মনরো, ম্যালকম্‌, মেটকাফ ও এলফিনস্টোন—কার্যতঃ তাঁহার অধীনেই তাঁহাদের কর্মজীবন আরম্ভ করেন, তাঁহার নিকট হইতেই তরুণ বয়সে তাঁহাদের জীবন গঠনের অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেন। ম্যালকম লিখিয়াছেন, "সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা তাঁহার বিরাট মনের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল—যাঁহাকেই তিনি কর্মে নিয়োগ করিতেন তাঁহারই ভিতর তাঁহার মনোভাব কতকাংশে সঞ্চারিত হইত।" লর্ড ওয়েলেসলীর অসমাপ্ত সাম্রাজ্য গঠনকার্য হয়ত লর্ড হেস্টিংস আসিয়া সমাপ্ত করিয়াছেন, কিন্তু লর্ড হেস্টিংস যে সকল সামরিক ও বেসামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মচারীকে কর্মে প্রবৃত্ত করান, উপযুক্ত শাসক ও উপদেষ্টারূপে তাঁহাদের যোগ্যতার ভূমিকাটি প্রস্তুত করিয়া যান লর্ড ওয়েলেসলী।

মুঘল সার্বভৌমত্বের অবসান ঃ লর্ড লেক পৎপরগঞ্জের জয়ের পর ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লী প্রবেশ করিলেন। দ্বিতীয় শাহ আলম ইংরেজের নিয়ন্ত্রণাধীনে আপনাকে স্থাপন করিলেন। লর্ড ওয়েলেসলী তাঁহার সহিত কোনরূপ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন নাই। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩ মে

তারিখের আদেশ অনুযায়ী সম্রাটের স্থায়ী ভরণ পোষণের ব্যবস্থা হয়। লাল কেল্লার বাহিরে যে এলাকায় সম্রাটের বসবাস নির্দিষ্ট হয়, উহারও শাসন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত হইতে থাকে। বাদশাহ স্বীয় গণ্ডির মধ্যেও কর্তৃত্বের অধিকার পাইলেন না, অথচ দেশীয় রাজ্যের রাজারা ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব মানিয়া লইয়াও এই কর্তৃত্বের অধিকারী হইতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীশ্বর রহিলেন না। ইংলণ্ডের রাজার সার্বভৌম অধিকারভোগী মিত্রও তাঁহাকে বলা যায় না। সুরজী অঞ্জনগাঁওয়ের সন্ধি (ডিসেম্বর, ১৮০৩) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে মুঘল সাম্রাজ্যের যথার্থ ধ্বংসের নিশানা স্বরূপ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ইংরেজের চূড়ান্ত আধিপত্য লাভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঔদাসীন্য নীতির কাল (১৮০৫-১৮১৩)

গভর্ণর-জেনারেলরূপে লর্ড কর্ণওয়ালিসের দ্বিতীয় বার ভারত আগমন (**১৮০৫**) **ঃ** লর্ড ওয়েলেসলীর প্রত্যাবর্তনের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস দ্বিতীয় বার ভারতের গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন। ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষ এই বর্ষীয়ান রাজনীতিজ্ঞকে পুনরায় ভারতে প্রেরণ করিলেন এই সুদৃঢ় প্রত্যয়ের বশবর্তী হইয়া যে, তিনি তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত ঔদাসীন্য নীতিকে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিবেন। ঔদাসীন্য নীতির পুনঃপ্রবর্তনের জন্য কোম্পানীর অংশীদারগণ কিছুদিন যাবৎ বুঝিয়া না-বুঝিয়া সোরগোল পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালার সরকারের আর্থিক দুরবস্থার কারণেও এই নীতি অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল।

কর্ণওয়ালিস যখন পুনরায় ভারতে আসিলেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ছেষট্টি বৎসর। আসিয়াই তিনি সিন্ধিয়ার প্রীতিসাধন এবং হোলকারের সহিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের অবসানের জন্য সচেষ্ট হইলেন। মহীশূর, অযোধ্যা, নিজাম ও পেশোয়ার সম্পর্কে ওয়েলেসলী যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন উহার পরিবর্তন বোধ হয় আর সম্ভব ছিল না, কিন্তু সিন্ধিয়া ও হোলকারের সহিত যুদ্ধনীতির কুফল নিরোধে তিনি সমর্থ হইবেন এইরূপ তাঁহার আশা হইল। সিন্ধিয়াকে তিনি গোয়ালিয়র, গোহড় এবং আগ্রা ব্যতীত যমুনা নদীর পশ্চিমস্থ সমগ্র অঞ্চল ফিরাইয়া দিয়া তুষ্ট করিতে চাহিলেন। কর্ণওয়ালিস শান্তির জন্য এতই ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন যে তিনি সিন্ধিয়াকে দিল্লী ফিরাইয়া দিবার কল্পনা করিতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। সেই ক্ষেত্রে শাহ আলমকে ব্রিটিশ এলাকার অভ্যন্তরে অন্য কোথাও স্থানান্তরের বিষয়ে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। হোলকারের শক্তির

বিপর্যয় আসন্ন—ইহা তিনি ধরিতে না পারিয়া যে কোন মূল্যে শান্তি ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার এই দুর্বল নীতি ওয়েলেস্‌লীর অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদিগের মনে অনাস্থা ও আশঙ্কার সঞ্চার করিল। যে সকল রাজপুত রাজা মারাঠা শক্তির কবল হইতে অব্যাহতির আশায় বিগত যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে বিশ্বস্ততার সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মারাঠাদের তুষ্টি সাধন করিতে লর্ড কর্ণওয়ালিস অগ্রসর হইলে লর্ড লেক এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু কর্ণওয়ালিস তাঁহার নীতিকে কার্যকরী করিয়া যাইতে পারেন নাই। ভারতে আসিবার তিন মাসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

স্যার জর্জ বার্লো (১৮০৫-৭): লর্ড কর্ণওয়ালিসের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁহার জায়গায় সাময়িক ভাবে গভর্ণর-জেনারেলরূপে অধিষ্ঠিত হন কাউন্সিলের প্রধান সদস্য স্যার জন বার্লো। তিনি একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী হইলেও তাঁহার রাজনৈতিক মতামত ছিল সঙ্কীর্ণ এবং আচরণ ছিল জনপ্রিয়তার পরিপন্থী। তিনি কোম্পানীর নির্দেশসমূহ যে কোন প্রকারে কার্যকর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; পূর্ববর্তী বড়লাটের প্রবর্তিত নীতি অনুসরণে তিনি অযথা উদ্যমের পরিচয় দিলেন।

সিন্ধিয়ার সহিত এক নূতন চুক্তিতে (নভেম্বর, ১৮০৫) সুরজী অঞ্জনগাঁওয়ের সন্ধির কোন কোন বিধানের পরিবর্তন করা হইল। উহার দ্বারা আত্মরক্ষামূলক মিত্রতা চুক্তি নাকচ করা হইল, কোম্পানীর এলাকা ও সিন্ধিয়ার এলাকার মধ্যে চম্বলকে সীমারেখা বলিয়া নির্দেশ করা হইল এবং রাজপুতানার ব্যাপারে ব্রিটিশের নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি মিলিল। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার মাস দুই পরেই (জানুয়ারী, ১৮০৬) হোলকারের সহিত শান্তি স্থাপিত হইল। লর্ড লেক হোলকারকে পঞ্জাবে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থান কালে রণজিৎ সিংহের নিকট বারম্বার সাহায্যের প্রার্থনা করিয়া তিনি ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার বিপন্ন অবস্থার সুযোগ গ্রহণের পরিবর্তে বার্লো তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিয়া এবং রাজপুতানায় তাঁহার হস্তক্ষেপের অধিকার স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত শান্তি সম্পাদন করেন। গ্র্যাণ্ট ডাফের মতানুসারে, "সিন্ধিয়া, হোলকার ও ভোঁসলের সহিত চুক্তি নিতান্তই সদ্ভাবমূলক চুক্তি ছিল—তাঁহাদের

পারস্পরিক মেলামেশা সম্পূর্ণ অবাধ রহিল, ইংরেজ সরকারের মিত্র-রাজ্যসমূহের স্বার্থের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র তাঁহাদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের আর কোন উপায় রহিল না।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "ঐ গোটা শান্তিনীতি যে বিচক্ষণতাপ্রসূত ও রাজনীতিসম্মত হইয়াছিল তাহা মনে করিবার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণের অভাব নাই। রাজ্যজয়ের প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হইল, প্রত্যেক রাজন্যের হস্তে প্রায় সমপরিমাণ ভূমির দখল রহিল এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, তাঁহাদের প্রতিবেশীদের উপর দৌরাত্ম্য ও স্ব-সম্পত্তি হারাইবার আশঙ্কা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বৈর ক্রিয়াকলাপ হইতে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে এইরূপ আশা করা যাইতে লাগিল।"

১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে ওয়েলেসলী জয়পুরের সহিত যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা বাতিল করা হয়। জয়পুরের রাজা চুক্তির সর্ত পালন করেন নাই ইহাই ছিল অজুহাত।

লর্ড মিণ্টো (১৮০৭-১৮১৩)ঃ বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের প্রেসিডেণ্ট লর্ড মিণ্টো ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে স্থায়ী গভর্ণর-জেনারেল রূপে ভারতে আসিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস ও স্যার এলিজা ইম্পের বিচারে তিনি ছিলেন অন্যতম পরিচালক। কাজেই ভারতীয় ঘটনাবলীর সহিত তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল। তিনি নিরপেক্ষতা নীতির পরিপোষক ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে তিনি ওয়েলেসলীর অনুসৃত রাজ্যজয় নীতি পরিহারের জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হন। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের কাল হইতে ভারতীয় রাজাদিগের সহিত কোম্পানীর সম্পর্ক হইতে উদ্ভূত রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলি সম্পর্কে অবহিত না হওয়া ক্রমেই অধিকতর অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল। সমসাময়িক কালের তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অন্যতম ম্যালকম লিখিয়া গিয়াছেন যে, "লর্ড মিণ্টোর শাসনের সর্বাপেক্ষা গুরুতর ফল দাঁড়াইয়াছিল এই যে তাঁহার আমলেই ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষ বুঝিতে পারেন নিরপেক্ষতা নীতি কার্যতঃ অনুসরণ করা অসম্ভব ব্যাপার।"

মারাঠা রাজনীতিঃ ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দের চুক্তি নিষ্পন্ন হওয়ার অত্যল্পকাল মধ্যেই যশোবন্ত রাও হোলকারের সক্রিয় কর্মজীবন সহসা বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি লাভ করিল। ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি উন্মাদ রোগগ্রস্ত হন ও তাঁহাকে

অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তিন বৎসর পরে অতিশয় শোচনীয় অবস্থার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। আমীর খাঁ নামক এক দুর্দান্ত পাঠান সর্দার কার্যতঃ হোলকার রাজ্যের শাসক হইয়া দাঁড়াইল। তাহার অধীনে প্রধানতঃ পিণ্ডারী দস্যুদের লইয়া গঠিত এক বিশাল সেনাবাহিনী ছিল। যশোবন্ত রাওয়ের নাবালক পুত্র মলহর রাও হোলকারের নামে এক রাজপ্রতিনিধি-মণ্ডলীর দ্বারা রাজ্য শাসিত হইত। কিন্তু কার্যতঃ কর্তা ছিল আমীর খাঁ। আমীর খাঁ হিংসাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা রাজপুত রাজগণের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ হস্তগত করিয়াছিল; ভূপাল রাজ্য তাহার পদানত হয়। লর্ড মিণ্টোর নিরপেক্ষতা নীতির প্রতি আনুগত্য ক্রমেই তাহাকে অধিকতর আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণে প্ররোচিত করিয়া তোলে। কিন্তু আমীর খাঁ যখন ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে বেরার আক্রমণ করিল, গভর্নর-জেনারেল নিষ্ক্রিয় দর্শক হইয়া থাকিতে পারিলেন না। বেরারে উৎপাত নিজামের রাজ্যের নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটাইবে, এই আশঙ্কায় তিনি পাঠান সর্দারের বিরুদ্ধে ভোঁসলেকে সাহায্য করিবার মানসে এক বাহিনী প্রেরণ করেন।

ইংরেজের সহিত সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর হইতে দৌলত রাও সিন্ধিয়া রাজপুতানার রাজগণ ও মালবের সামন্ত রাজগণের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। তিনি গোয়ালিয়রে তাঁহার সদর কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। তদবধি 'সিন্ধিয়ার শিবির' (গ্র্যাণ্ট ডাফের মতানুযায়ী) একটি বৃহৎ শহরে পরিণত হইল। সিন্ধিয়ার সামরিক কর্মতৎপরতার বহর তাঁহার আর্থিক সঙ্গতিকে বহুদূর ছাড়াইয়া গিয়াছিল। হোলকারের ন্যায় তিনিও তাঁহার নামমাত্র শাসনাধীন অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন স্থলে সৈন্য প্রেরণ করিতেন—উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত অঞ্চলের উপর নির্ভর করিয়াই সৈন্যদলগুলির বাঁচিয়া থাকার ব্যবস্থা করা।

বেসীনের চুক্তির পর শাসন-ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও বিধিবদ্ধ অত্যাচারের ফলে তাঁহার প্রজাবৃন্দের বিরাগভাজন হইলেন। বিশেষতঃ কতিপয় শক্তিশালী প্রভাবপ্রতিপত্তিযুক্ত সর্দার তাঁহার উপর খুবই বিমুখ হইয়া উঠিলেন। মাউণ্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে পুণায় রেসিডেণ্ট হইয়া আসেন। তিনি পেশোয়া ও মারাঠা জায়গীরদারদিগের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি সাধনে সমর্থ হন। তাঁহারই কূটনৈতিক প্রয়াসের ফলে কোহ্লাপুর ও সাবন্তওয়াদির শাসকদ্বয় কার্যতঃ

পেশোয়ার আধিপত্যের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের ফলে স্বাধীন সত্তা লাভ করেন।

ফরাসী আক্রমণের আতঙ্কঃ নেপোলীয়নীয় যুদ্ধ লর্ড মিণ্টোর শাসনকালের সমসাময়িক ঘটনা। পারস্য ও আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া ফরাসী ও রুশ সৈন্য যুক্তভাবে ভারত আক্রমণ করিতে পারে এই আশঙ্কা তখনকার কালের ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ ও ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদিগের কল্পনাকে চকিত করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতবর্ষ সম্পর্কে নেপোলিয়নের কোনরূপ অভিসন্ধি ছিল কি ছিল না এ সম্বন্ধে আজ অপেক্ষাকৃত যুক্তিযুক্ত মনোভাব পোষণ করা সম্ভব, কিন্তু তৎকালে, যখন ইউরোপের প্রাচীন রাজ্যখণ্ডগুলি নেপোলিয়নের আক্রমণের অভিঘাতে শুষ্ক বৃক্ষপত্রের ন্যায় ঝরিয়া পড়িতেছিল, তখন তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও শক্তির যথাযথ পরিমাণ করা বোধ হয় কাহারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না। রাশিয়া ও পারস্যের ভিতর সনাতন বৈরিতা, ফ্রান্স ও রাশিয়ার অস্থির সম্পর্ক, আফগানিস্থানে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা—এই সকল হিসাব ভারত সাম্রাজ্য রক্ষায় অতিমাত্র ব্যাকুল সন্ত্রস্ত ইংরেজের মগজে প্রবেশ করে নাই।

লর্ড ওয়েলেসলী ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে জন ম্যালকমকে পারস্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পর বৎসর পারস্যের শাহের সহিত ইংরেজের এক চুক্তি নিষ্পন্ন হয়। ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে লর্ড মিণ্টো পুনরায় তাঁহাকে পারস্যে প্রেরণ করেন। একই সময়ে স্যার হারফোর্ড জোন্স ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দূত হইয়া তেহেরানে আসেন এবং শাহের সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করেন। গভর্ণর-জেনারেলকে উহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। শাহ নেপোলিয়নের প্রেরিত রাজদূতকে শূন্যহস্তে ফিরাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দান করেন; তৎসহ পারস্যের ভিতর দিয়া ফরাসী-রুশ বাহিনীর ভারতের অভিমুখে সম্ভাব্য অগ্রগতি নিরোধের প্রতিশ্রুতিও তাঁহাকে দিতে হয়। পারস্যে অবস্থানকালে ম্যালকম তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক History of Persia-র বহু মালমসলা সংগ্রহ করেন।

১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে এলফিনস্টোনকে কাবুলে প্রেরণ করা হয়। ঐ দেশে ফরাসী কূটক্রিয়া নিরোধের জন্যই এই ব্যবস্থা। আফগানিস্থানে প্রবেশের পূর্বে, পেশোয়ারে, আমীর শাহ সুজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আমীর তাঁহাকে কতগুলি অনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু

কিছুকালের মধ্যেই আভ্যন্তরীণ গোলযোগ হেতু তিনি তাঁহার সিংহাসন হারান ও ভারতে পলায়ন করেন। অতএব কাবুলে এলফিনস্টোনের দৌত্য রাজনীতির দিক দিয়া ব্যর্থ প্রমাণিত হইল। কিন্তু তিনিও ম্যালকমের ন্যায় ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহান্বিত ছিলেন। আফগানিস্থান সম্বন্ধে তাঁহার সংগৃহীত তথ্যাদি তাঁহার An Account of the Kingdom of Caubul গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হয়। পুস্তকটি আফগানদের ইতিহাস, ভূগোল, আচার ব্যবহার, প্রথা ইত্যাদি সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

পারস্য ও আফগানিস্থানের সহিত একদিকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছিল, অন্যদিকে লর্ড মিণ্টো গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তরাজ্য সিন্ধুদেশ ও পঞ্জাবের শিখ রাজ্য সম্পর্কেও অনবহিত ছিলেন না। কার্যতঃ স্বাধীন কতিপয় মুসলমান আমীর সিন্ধুদেশ শাসন করিতেন। তাঁহারা কাবুলের আমীরের প্রতি নামমাত্র আনুগত্যপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের সহিত সম্পাদিত এক চুক্তিতে তাঁহাদের এলাকা হইতে ফরাসী বহিষ্কারের প্রতিশ্রুতি মিলিল। অন্যপক্ষে শিখ রাজা রণজিৎ সিংহের সহিত লর্ড মিণ্টোর সম্পর্কের একটি ইতিবৃত্ত পরে দেওয়া যাইবে।

১৮১০ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সম্পর্কচ্ছেদ ঘটিল। উহার ফলে ফরাসী-রুশ বাহিনীর যুক্ত উদ্যোগে ভারত আক্রান্ত হওয়ার দুঃস্বপ্ন মিলাইয়া গেল। ক্রমে ব্রিটিশেরা পূর্বাঞ্চলে ফরাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিল। পর্তুগাল ফরাসীদের পদানত হইলে গোয়া অধিকৃত হইল। ভারত হইতে প্রেরিত এক বাহিনী ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে বুর্বোঁ দ্বীপ ও মরিসাস দখল করিল। সেই বৎসরই অ্যাম্বয়না ও স্পাইস দ্বীপ বিজিত হইল। যবদ্বীপ বিজিত হইল ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে। লর্ড মিণ্টো স্বয়ং এই অভিযানের সহযাত্রী হইয়া গিয়াছিলেন। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে বুর্বোঁ দ্বীপ ফরাসীদিগকে ও যবদ্বীপ ওলন্দাজ-দিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন

লর্ড ময়রা (১৮১৩-১৮২৩)ঃ ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে লর্ড মিণ্টোর স্থলে গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসেন লর্ড ময়রা। নেপাল যুদ্ধ জয়ের জন্য ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁহাকে মার্কুইস অব্ হেস্টিংস পদবীতে ভূষিত করা হয়। সামরিক বৃত্তি হইতে অবসর গ্রহণের পর (তাঁহার সামরিক চাকুরির কালকে খুব বেশী গৌরবান্বিত বলা চলে না) তিনি ইংলণ্ডের যুবরাজ—পরে রাজা চতুর্থ জর্জের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গৃহীত হন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে ভারতের এই উচ্চ দায়িত্ব-পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি তাঁহার নামের পশ্চাতে কোনরূপ রাজনৈতিক দক্ষতার খ্যাতি লইয়া এদেশে আসেন নাই। উইলিয়াম পামার অ্যাণ্ড কোম্পানীর কুখ্যাত ব্যাপারে তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকেই আত্মীয়ানুগ্রহের অভিযোগ করিয়া থাকেন। তৎসত্ত্বেও তিনি নিঃসন্দেহেই ছিলেন ভারত-শাসকদের মধ্যে ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। ভারত শাসনের উচ্চ পদে যখন তিনি নিযুক্ত হন তখন তাঁহার বয়স ৫৯ বৎসর, কিন্তু এই বয়সেও তিনি কর্তব্যপালনে আশ্চর্য শ্রমকুশলতা ও উদ্যমের পরিচয় দেন। ইংলণ্ডে থাকিতে তিনি ওয়েলেসলীর সম্প্রসারণ নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। ভারতে আসিয়া তিনি কর্ণওয়ালিস, বার্লো ও মিণ্টোর অনুসৃত শান্তি ও সদ্ভাবের আদর্শ অনুসরণ করিতে থাকেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহাকে তাঁহার নীতি পরিবর্তন করিতে হয়। তিনি যখন ভারত ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন ভারত সাম্রাজ্যের আয়তন তিনি আসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেকখানি বৃহত্তর হইয়াছিল। এই আয়তন-স্ফীতি ছিল তাঁহারই চেষ্টার ফল।

পেশোয়া ও ভোঁসলের সহিত সন্ধিঃ পেশোয়া ২য় বাজীরাও ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অসহনীয় বোঝা নামাইয়া ফেলিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার জায়গীরদারদের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হইয়া উঠে। ত্র্যম্বকজী ডাংলিয়া নামক এক বিবেকবোধশূন্য প্রিয় পার্শ্বচরের প্রভাববশে তিনি সিন্ধিয়া, হোলকার ও ভোঁসলের সহিত ব্রিটিশ-বিরোধী সলাপরামর্শে নিয়োজিত হন। ১৮১৪ সালে

গাইকোয়াড়ের দেওয়ান গঙ্গাধর শাস্ত্রী তাঁহার প্রভুর উপর পেশোয়ার কতকগুলি দাবীদাওয়া সম্পর্কে আলোচনার জন্য পুণায় আসেন। ত্র্যম্বকজীর প্ররোচনায় তাঁহাকে নিতান্ত বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় হত্যা করা হয়। এলফিনস্টোন ত্র্যম্বকজীকে বিচারের জন্য সমর্পণের অনুরোধ করিলে পেশোয়া ঐ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। শেষে রেসিডেন্ট যখন তাহাকে এক দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখেন বাজীরাও তখন তাহাকে পলায়ন করিতে সহায়তা করেন। পেশোয়ার বিরুদ্ধ মনোভাব ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি এড়াইল না। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে তিনি এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরে বাধ্য হন। এই চুক্তির সর্ত অনুযায়ী তাঁহাকে মারাঠা সাম্রাজ্যের নেতৃপদ এবং ব্রিটিশ রেসিডেন্টের মধ্যস্থতা ভিন্ন অন্যান্য শক্তিবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবার অধিকার ত্যাগে সম্মতিদান করিতে হয়; পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী সৈন্য সরবরাহে অপারক হইয়া তিনি কোম্পানীকে চৌত্রিশ লক্ষ টাকা রাজস্বের ভূমিভাগ ছাড়িয়া দেন, এতদ্ব্যতীত মালব, বুন্দেলখণ্ড ও হিন্দুস্থানে তাঁহার যে সকল স্বত্ব-স্বামিত্ব ছিল সে সকলও তিনি কোম্পানীকে অর্পণ করেন। গাইকোয়াড়ের উপর তাঁহার যে সকল দাবী-দাওয়া ছিল সেগুলিও তিনি বার্ষিক চারিলক্ষ টাকা প্রাপ্তির বিনিময়ে পরিহার করেন। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই চুক্তি পেশোয়ার পক্ষে মৃত্যুশেলের তুল্য হইয়াছিল। সুতরাং ইহাকে তিনি কোম্পানীর সহিত ও তাঁহার পূর্বতন অধীনস্থ ব্যক্তিদের সহিত তাঁহার সম্পর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিরূপে কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিতেছিলেন না।

এইরূপ সময়েই আবার ভোঁসলে রাজ্য সিংহাসনের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিবাদ-বিসম্বাদ ও অন্যান্য নানাবিধ দলীয় কূটচক্রে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে দ্বিতীয় রঘুজী ভোঁসলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার দুর্বলমস্তিষ্ক পুত্র পার্শোজী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। পার্শোজীর উচ্চাকাঙ্ক্ষী পিতৃব্যপুত্র আপ্পা সাহেব রাজপ্রতিনিধির পদ দখল করেন। ব্রিটিশ সরকার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া আপ্পা সাহেবের সহিত এক অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি সম্পাদন করেন (মে, ১৮১৬)। এই চুক্তি শুধু যে নাগপুরের স্বাধীনতাই হরণ করিল তাহা নহে, উহা মারাঠা শক্তিজোটেরও পতন ত্বরান্বিত করিল। ম্যালকম লিখিতেছেন যে, "ভারতের তৎকালীন

অবস্থায় নাগপুরের সহিত মিত্রতাচুক্তি সম্পাদন অপেক্ষা অধিকতর সুফলদায়ক ব্যাপার আর কিছুই ঘটিতে পারিত না।”

পিণ্ডারী যুদ্ধ (১৮১৭-১৮)ঃ পিণ্ডারীরা ছিল নিম্নস্তরের এক দস্যুদল। বহুকাল অবধি মারাঠা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ ছিল। গত শতাব্দীর প্রথমদিকে তাহারা ছিল বিভিন্ন সর্দারের অধীনে দলবদ্ধ। তাহাদের মধ্যে করিম খাঁ, চিতু, দোস্ত মহম্মদ, নামদার খাঁ এবং শেখ তুল্লো বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। তাহারা সকলেই আবার বিভিন্ন সময়ে পাঠান দলপতি আমীর খাঁর অধিনায়কত্ব মানিয়া চলিত। গ্র্যাণ্ট ডাফ বলেন, “মারাঠাদের বিস্তার লাভের পর্ব যখন বন্ধ হইয়া যায় তখন পিণ্ডারীদল, যাহারা ঐ বাহিনীর সহিত যুক্ত ছিল, নিছক বাঁচিবার তাগিদে তাহাদের রক্ষকদের এলাকায় লুঠতরাজ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।···ক্রমশঃ নূতন নূতন সৈন্যযোগে তাহাদের দল পুষ্ট হইতে লাগিল। ভারতের বেকার সৈন্যদলের নিকট, বিশেষ করিয়া মুসলমান সৈন্যদলের নিকট, পিণ্ডারীর জীবন বহুবিধ আকর্ষণে পূর্ণ ছিল। পিণ্ডারীদের আক্রমণের মারাত্মক ফলাফল যাঁহারা সে আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেন নাই তাঁহাদের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। কিছুকাল যাবৎ তাহারা মালব, মাড়বার, মেবার সহ সমগ্র রাজপুতানা এবং বেরার চষিয়া বেড়ায়; শেষে ঐ সকল অঞ্চলের সম্পদ নিঃশেষ হইলে তাহারা অধিকতর ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজ্যগুলিতে হানা দিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠে। ইহাদের কয়েকটি দল প্রতি বৎসর নিজাম ও পেশোয়ার এলাকায় হানা দিত। ইংরেজ সরকার তাঁহাদের নিজ এলাকায় ও তাঁহাদের নিজ প্রজাদের উপর আক্রমণ না হওয়া পর্যন্ত পিণ্ডারীদের বিষয়ে তেমন তৎপর হন নাই।”

১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে পিণ্ডারীরা উত্তরাঞ্চলে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত এলাকা লুঠপাট করিতে শুরু করে। লর্ড হেস্টিংস পিণ্ডারীদিগকে উৎখাত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এক লক্ষ কুড়ি হাজার সৈন্য ও তিনশত কামানের শক্তিযুক্ত এক বিরাট বাহিনী পিণ্ডারীদিগকে তাহাদের আস্তানা হইতে নিশ্চিহ্ন করিতে সমর্থ হয়। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগ ও ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার কয়েক মাস ব্যাপিয়া এই অভিযান পরিচালিত হয়। করিম খাঁ আত্মসমর্পণ করে। সংযুক্ত প্রদেশের এক ক্ষুদ্র রাজ্য আত্মসমর্পণের মূল্যস্বরূপ তাঁহাকে প্রদান

করা হয়। চিতু আসীরগড়ের নিকট এক জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে, তথায় বাঘের কবলে তাহার প্রাণ যায়। যুদ্ধ শুরু হইবার পূর্বেই আমীর খাঁ শান্তি প্রার্থনা করিয়াছিল, রাজপুতানার টঙ্ক নামক এলাকা ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে তুষ্ট করা হয়।

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৮১৭-১৮) : লর্ড হেস্টিংস জানিতেন যে পিণ্ডারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত মারাঠা শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ যুদ্ধে পর্যবসিত হইতে পারে, কারণ পিণ্ডারীগণ সিন্ধিয়া ও হোলকারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল এবং তাহাদের দ্বারা উপদ্রুত অঞ্চল মারাঠা প্রভাব-সীমার অন্তর্গত ছিল। কাজেই তিনি মারাঠা ও রাজপুতদিগের সহিত বিশেষ চুক্তি সম্পাদন করিয়া কোম্পানীর কূটনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধান করিতে চাহিয়াছিলেন। পুণা ও নাগপুরের সহিত চুক্তির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে দৌলত রাও সিন্ধিয়ার সহিত এক চুক্তি হইল। সিন্ধিয়া পিণ্ডারীদের বিরুদ্ধে অভিযানে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং চম্বল নদীর বামতীরবর্তী রাজপুত রাজ্যগুলির সহিত চুক্তি সম্পাদনে কোম্পানীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিলেন।

কিন্তু কূটনৈতিক প্রয়াসের দ্বারা মারাঠাদিগকে তুষ্ট করা গেল না। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে পেশোয়া পুণাস্থিত ব্রিটিশ দূতনিবাস পোড়াইয়া দিলেন এবং শহরের চারি মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কিরকির ইংরেজ শিবির আক্রমণ করিলেন। এক ক্ষুদ্র ইংরেজ বাহিনী ঐ আক্রমণ প্রতিহত করে। পরে নূতন সৈন্যদল আসিয়া পৌছিলে ইংরেজরা পুণা অধিকার করে। পেশোয়ার বিদ্রোহ অন্যান্য মারাঠা শক্তির নিকট সঙ্কেতস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। নাগপুরের আপ্পা সাহেবের সৈন্যদল ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের শেষাশেষি নাগপুরের সন্নিকটস্থ সীতাবলদির যুদ্ধে পরাজিত হইল। নাগপুরের যুদ্ধে (ডিসেম্বর, ১৮১৭) তাহারা আবার পরাজিত হইল। আপ্পা সাহেব পঞ্জাবে পলায়ন করিলেন। উহার কিছুকাল পর তিনি যোধপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মহিদপুরের যুদ্ধে ২য় মলহর রাও হোলকারের সৈন্যদল সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয়। এই যুদ্ধকে ১৮০৪ সালের পরেকার একমাত্র উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

পুণা হইতে বিতাড়িত পেশোয়ার বাহিনী কোরগাঁও দখলে অসমর্থ হইল (জানুয়ারী, ১৮১৮)। ঐ বৎসরেরই ফেব্রুয়ারী মাসে শোলাপুর জেলার অন্তঃপাতী অষ্টির যুদ্ধে পেশোয়ার বাহিনী পরাজিত হয়। বাজী রাওয়ের বিশ্বস্ত সুযোগ্য সেনাপতি বাপু গোখেল ওরফে গোকলা নিহত হইলেন। বাজী রাও স্যার জন ম্যালকমের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন (জুন, ১৮১৮)। আসীরগড়ের দুর্গ ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে অধিকৃত হইল।

মারাঠা অঞ্চলের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত (১৮১৮)ঃ মারাঠাগণ তাহাদের সামরিক পরাজয়ের রাজনৈতিক ফলাফল স্বীকার করিয়া লইল। মহিদপুরের যুদ্ধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর হোলকার আর বাধা প্রদান করেন নাই। নাবালক হোলকারের সুযোগ্য মন্ত্রী তান্তিয়া যোগের সহিত ম্যালকম আলাপ-আলোচনা চালান এবং ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে এক চুক্তি নিষ্পন্ন হয়। হোলকার রাজপুত রাজ্যগুলির উপর, পাঠান সর্দার আমীর খাঁয়ের রাজ্যখণ্ডের উপর এবং সাতপুরা পর্বতমালার অভ্যন্তর-ভাগে ও দক্ষিণে স্থিত তাঁহার নিজ রাজ্যগুলির উপর তাঁহার দাবী-দাওয়া ত্যাগ করেন। তিনি স্বীয় রাজ্যে একটি ইংরেজ বাহিনী পরিপোষণে স্বীকৃত হইলেন এবং ব্রিটিশ রেসিডেন্টের মধ্যস্থতা ভিন্ন কোন রাজ্যের সহিত আলাপ-আলোচনা না চালাইবার প্রতিশ্রুতি দান করিলেন।

পেশোয়া সম্পর্কে লর্ড হেষ্টিংস কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। পেশোয়া বংশ যাহাতে রাজ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অংশবিশেষেরও সুযোগ গ্রহণের অধিকার হইতে চিরতরে বঞ্চিত হয় এবং পেশোয়ার নাম ও কর্তৃত্ব চিরতরে লোপ পায় তিনি সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। মারাঠা শক্তির ঐক্যের কোন চিহ্নই আর রাখা হইবে না বলিয়া স্থির হইল। মারাঠাগণ যাহাতে তাহাদের চিরাভ্যস্ত প্রভুকে ঘিরিয়া আর সঙ্ঘবদ্ধ না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইল। বার্ষিক আট লক্ষ টাকা মাসোহারার বন্দোবস্ত করিয়া কানপুরের নিকটস্থ বিঠুরে বাজী রাওকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার প্রিয়-পাত্র ত্র্যম্বকজী ডাংলিয়া চুনারের দুর্গে যাবজ্জীবন অন্তরীণাবদ্ধ হন। পেশোয়ার রাজ্য হইতে এক ক্ষুদ্র অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া শিবাজীর বংশধর প্রতাপ সিংহকে প্রদান করা হয়। প্রতাপ সিংহ সাতারায় তাঁহার

রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। একজন সমসাময়িক লেখক লিখিতেছেন, "সাতারায় মারাঠা রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঐ বংশের পুরাতন শক্তি ও গৌরবের পীঠস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা মাত্র। ইহাতে তৎকালীন পেশোয়া বংশ ও তাহার কর্তৃত্বের বিলোপ পুরাতন মারাঠা সর্দার বংশগুলির পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইয়াছিল।" পেশোয়া রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ ইংরেজ শাসনের অন্তর্গত করিয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সীভুক্ত করা হয়। বিজিত অঞ্চলসমূহের শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন এলফিনস্টোন এবং তাঁহাকে এই কার্যে প্রভূত সাহায্য করেন মারাঠা জাতির সুপরিচিত ইতিহাস-লেখক গ্র্যাণ্ট ডাফ।

ভোঁসলে রাজ্যের একাংশ (সাগর ও নর্মদা এলাকা) ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করিয়া আপ্পা সাহেবের বিদ্রোহ প্রয়াসের প্রতিশোধ লওয়া হইল। অবশিষ্ট জেলাসমূহ ভোঁসলে বংশীয় এক মিত্র রাজার শাসনাধীনে আনা হয়।

রাজপুতানায় ইংরেজ আধিপত্য স্থাপন (১৮১৮)ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজপুতানার অধিকাংশ অঞ্চল মারাঠাদের দৌরাত্ম্যে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। রাজপুতগণ দুর্বলতাবশতঃ মারাঠাদিগকে প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হয়। রাজপুতগণ সকলে একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইলে মারাঠাদিগকে প্রতিরোধ করা যাইত, কিন্তু তাঁহারা পরস্পরের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং সেই কারণে একে অন্য হইতে বিশ্লিষ্ট ছিলেন। এমন কি, আত্মরক্ষার অবিসম্বাদী প্রয়োজনও তাঁহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া প্রত্যেক রাজ্যের অভ্যন্তরেও যথেষ্ট বিরোধ এবং বিশৃঙ্খলা ছিল। মেবারে চুণ্ডাবৎ ও শক্তাবৎদের মধ্যে যেমন বৈরিতা ছিল, পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতেও অনুরূপ বিবদমান গোষ্ঠীর অভাব ছিল না।

ইংরেজদের সহিত আত্মরক্ষামূলক চুক্তি হইলে রাজপুত রাজারা ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহারা যদিও এইরূপ মৈত্রীচুক্তির জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কোন সাড়াই আসিল না। লর্ড ওয়েলেসলী জয়পুর ও যোধপুরের সহিত মৈত্রী সম্পাদন করিলেন, কিন্তু মেবারের সহিত মৈত্রীবদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হইলেন। যোধপুরের সহিত যে চুক্তি হয় তাহা শেষ পর্যন্ত যোধপুরের রাজার অনুমোদন পায় নাই। জয়পুরের সহিত চুক্তি বার্লো নাকচ করিয়া দেন। লর্ড মিণ্টো রাজপুতানা সম্পর্কে ক্রমাগত ঔদাসীন্য নীতি অনুসরণ করিয়া

চলিয়াছিলেন। জয়পুর ও যোধপুরের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ রাজপুতানার প্রভূত ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। মেবারের রাণা ভীম সিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর বিবাহব্যাপার উপলক্ষ করিয়া এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। লর্ড মিণ্টো এই যুদ্ধে আগাগোড়াই নিষ্ক্রিয় দর্শকবৎ আচরণ করিয়াছিলেন, এদিকে দৌলত রাও সিন্ধিয়া ও আমীর খাঁ রাজপুতানার মরুভূমি নিঃশেষে শোষণ করিয়া আপনাদের সম্পদ ভাণ্ডার পুষ্ট করিয়া লইতেছিলেন।

ভারতে পদার্পণের কিছুকালের মধ্যেই লর্ড হেস্টিংস রাজপুত রাজগণ সম্পর্কে এক নূতন নীতির প্রবর্তন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সিন্ধিয়া কিংবা আমীর খাঁর হেফাজতে তুলিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে মেটকাফ জয়পুরের সহিত আলাপ আলোচনার সূত্রপাত করিলেন। পিণ্ডারী যুদ্ধ সকল রাজপুত রাজ্যকে ইংরেজের নিরাপত্তাধীনে আনয়ন অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছিল, কারণ তাহাদের সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক সহায়তা ভিন্ন লুণ্ঠন-তৎপর দস্যুদলকে নির্মূল করা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের চুক্তি অনুযায়ী সিন্ধিয়া রাজপুত রাজগণের উপর তাঁহার দাবী-দাওয়া প্রত্যাহার করিয়া লন, ফলে লর্ড হেস্টিংস রাজপুতানা সম্পর্কে স্বাধীন আচরণের সুবিধা লাভ করেন। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মেটকাফ উদয়পুর ও যোধপুরের সহিত সন্ধি চুক্তি নিষ্পন্ন করেন। জয়পুরের সহিত সন্ধি চুক্তি নিষ্পন্ন হয় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের মধ্যে ছোট-খাট রাজপুত রাজ্যগুলির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। রাজপুত রাজ্যগুলি কোম্পানীর আধিপত্য মানিয়া লইল। তাহারা কোম্পানীকে কর প্রদান ও প্রয়োজন হইলে সামরিক সাহায্য দান করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইল। ব্রিটিশ রেসিডেন্টের মধ্যস্থতা ভিন্ন কোন শক্তির সঙ্গে আলোচনা না চালাইবার প্রতিশ্রুতিও তাহাদের দিতে হইল। বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার রাজপুত রাজগণকে এই নিশ্চয়তা দান করিলেন যে তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন নৃপতির ন্যায় সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন, তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরেজ হস্তক্ষেপ করিবে না।

মধ্য ভারতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা: পিণ্ডারী যুদ্ধ মধ্য ভারতে ইংরেজ-প্রভাব সম্প্রসারিত ও সুদৃঢ় করিতে সহায়তা করিল। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের

ফেব্রুয়ারী মাসে ভূপালের নবাব কোম্পানীর সহিত এক অধীনতামূলক মিত্রতাচুক্তি সম্পাদন করিলেন। ধার ও দেওয়াস সহ মালবের ছোটখাট রাজ্যগুলি ইংরেজ আধিপত্য মানিয়া লইল। ম্যালকম বহুসংখ্যক সামন্ত সর্দারের সহিত সন্ধি সম্পাদন করেন। পেশোয়ার পরাজয়ের পর বুন্দেলখণ্ডের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ইংরেজ প্রভাবাধীন হইল। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের এক রচনায় প্রিন্সেপ এই মর্মে মন্তব্য করিয়াছেন, "এই যুদ্ধের (৩য় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের) ফলে ইংরেজ আধিপত্য ও প্রভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে ভারতীয়দিগের সহিত ইহাই বোধ হয় আমাদের শেষ যুদ্ধ হইয়া রহিল।"

ভরতপুরের পতন (১৮২৬) ঃ লর্ড আমহার্স্ট যখন গভর্ণর-জেনারেল তখন ভরতপুরে এক বিদ্রোহ ঘটে। এখানে সেই বিদ্রোহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভরতপুরের নাবালক রাজার পিতৃব্যপুত্র দুর্জনসাল নাবালক রাজার দাবী উপেক্ষা করিয়া অন্যায়ভাবে সিংহাসন দখলের চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ সরকার প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে সিংহাসন দানের সঙ্কল্প করিয়া ভরতপুর আক্রমণের সিদ্ধান্ত করেন। লর্ড কম্বারমিয়ার ভরতপুরের দুর্গ অধিকার করেন। কুড়ি বৎসর পূর্বে লর্ড লেকের ব্যর্থতার এইভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ইংরেজ প্রভাবের সম্প্রসারণ (১৮১৪-৫২)

হিমালয়পারে বাণিজ্য ঃ তিব্বতের সহিত ভারতের ব্যণিজ্যপ্রয়াস অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি শুরু হইয়াছিল। ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দের পর মাঞ্চু আধিপত্য কালে তিব্বত একটি নিষিদ্ধ দেশ বলিয়া ঘোষিত হইল। তদুপরি ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে গোর্খা জাতি কর্তৃক নেপাল বিজয় উত্তর ভারতের সহিত হিমালয়-পারের বাণিজ্য সম্ভাবনা সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিয়া দিল। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে বাংলা দেশে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় তাহা কোম্পানীর পরিচালকবর্গকে বাংলা দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন করিয়া তুলে এবং

উহার ফলে বাংলার বাণিজ্য সম্প্রসারণ প্রয়াস পরোক্ষতঃ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। তিব্বতে ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে জর্জ বোগলের দৌত্য এবং ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে সামুয়েল টার্নারের দৌত্য উভয়ই ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্তৃক ব্যবস্থিত হইয়াছিল। জর্জ বোগল ইউরোপীয় বণিকদিগের লাসা ভ্রমণে অনুমতিলাভে ব্যর্থ হইলেন। টার্নারের কূটনৈতিক প্রয়াসও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। মাঞ্চুগণ পরবর্তী কালে তিব্বতের গোর্খা আক্রমণকারীদিগকে বহিষ্কৃত করিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদিগের নিকট হইতে বাংলা ও তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্যের অনুমতি পাওয়া গেল না। তিব্বত ভারতের পক্ষে রুদ্ধ হইয়াই ছিল, শেষে ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের শাসনকালে ইয়ংহাজব্যাণ্ড তিব্বতে দৌত্য উপলক্ষে যে অভিযান লইয়া যান তাহার ফলে ব্রিটিশ ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

নেপালের সহিত ইংরেজের সম্পর্ক ঃ পৃথ্বীনারায়ণ নামে এক গোর্খা সর্দার ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে নেপাল অধিকার করেন। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার গোর্খাদের সহিত এক বাণিজ্যিক চুক্তি নিষ্পন্ন করেন এবং কর্ণেল কার্কপ্যাট্রিককে কাঠমাণ্ডু শহরে এক দৌত্য উপলক্ষে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ঐ দৌত্যের ফল বিশেষ লাভজনক হয় নাই। কয়েক বৎসর পর অপর এক বাণিজ্যিক চুক্তি নিষ্পন্ন হয় এবং ক্যাপ্টেন নক্স কাঠমাণ্ডুতে দুই বৎসরের জন্য (১৮০২-৪) রেসিডেণ্ট হিসাবে কার্য করেন। লর্ড ওয়েলেসলী তাঁহাকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেন এবং নেপালের সহিত মৈত্রীসম্পর্ক ছিন্ন করেন।

পূর্বে তিস্তা নদী হইতে পশ্চিমে শতদ্রু নদী পর্যন্ত হিমালয় অঞ্চলের গোটা বলয় গোর্খাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ কর্তৃক গোরক্ষপুর জেলা অধিকৃত হইবার পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্তর-সীমা আর গোর্খা রাজ্যের দক্ষিণ সীমা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া পড়িল। অনিশ্চিত সীমান্তরেখা এবং গোর্খাদের আক্রমণাত্মক মনোভাব সীমান্ত-সংঘর্ষ অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল। ১৮১৪ সালে গোর্খারা কতকগুলি ব্রিটিশ থানার উপর আক্রমণ চালাইলে যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

নেপাল যুদ্ধ (১৮১৪-১৬) ঃ লর্ড হেষ্টিংস শীঘ্রই উপলব্ধি করিলেন যে আশু জয় অসম্ভব। গোর্খারা যুদ্ধ করিতে জানে, তাহা ছাড়া যুদ্ধ যে অঞ্চলে হইতেছিল উহার প্রাকৃতিক অবস্থান গোর্খাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক

ছিল। কয়েকটি সংঘর্ষে বিপর্যয়ের পর সেনাপতি অক্টারলোনী গোর্খা নেতা অমর সিংহকে মালাওঁয়ের শক্তিশালী দুর্গ হস্তান্তরকরণে বাধ্য করেন (মে, ১৮১৫)। গোর্খারা সন্ধির প্রস্তাব মানসে আলাপ-আলোচনা শুরু করে এবং ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সগৌলির চুক্তি নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু এই চুক্তি গোর্খাগণ কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। অক্টারলোনী নেপালের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া মাকোয়ানপুরের যুদ্ধে জয়লাভ করেন (ফেব্রুয়ারী, ১৮১৫)। সগৌলির চুক্তি এই পর্যায়ে গোর্খাগণ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। গোর্খারা গাড়োয়াল ও কুমায়ুন জেলা এবং 'তরাই' অঞ্চলের এক বিরাট অংশ ইংরেজদের অনুকূলে ছাড়িয়া দেয়, সিকিমের উপর দাবী-দাওয়া ত্যাগ করে এবং কাঠমাণ্ডুতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট গ্রহণে সম্মত হয়। ভারতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পার্বত্য নিবাস—যথা সিমলা, মুসৌরী, আলমোড়া, ল্যাণ্ডোর, নৈনীতাল—গোর্খাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অঞ্চলে অবস্থিত। নেপাল ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে নিষ্পন্ন সন্ধিচুক্তির সর্ত কখনও ভঙ্গ করে নাই।

সিকিমের সহিত এক চুক্তি (ফেব্রুয়ারী, ১৮১৭) অনুযায়ী গোর্খাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত তরাই অঞ্চলের একাংশ ঐ রাজ্যের শাসককে প্রদান করা হয়।

প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮২৪-২৬)ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে ব্রহ্মের ইতিহাসে এক নূতন পর্বের সূচনা হয়। আলংপায়া নামক একজন দুঃসাহসী আঞ্চলিক রণনায়ক এক শক্তিশালী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্মদেশকে তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং পশ্চিমে মণিপুর ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে শ্যামদেশ পর্যন্ত তাঁহার বিধ্বংসী আক্রমণ চালান। ইংরেজের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বিশেষ সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না। তাঁহার অন্যতম বংশধর বোদাপায়া (১৭৮২-১৮১৯) ১৭৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দে আরাকান জয় করেন। ইঙ্গ-ব্রহ্ম সম্পর্কের ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। বহু শতাব্দী যাবৎ আরাকান একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল, এবং বাংলার সহিত উহার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। আরাকানের অধিবাসীদিগকে বাংলাদেশে 'মগ' নামে অভিহিত করা হইত। উহারা এক্ষণে বর্মী নৃশংসতার বলি হইয়া

উঠিল। কিছু কিছু মগ আরাকান ও ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত চট্টগ্রাম জেলার মধ্যবর্তী নাফ নদী অতিক্রম করিয়া কোম্পানীর ভূভাগে আশ্রয় লইল। বর্মীরা স্বভাবতঃই তাহাদের বিজিত প্রজাদের এই পলায়নে ক্রুদ্ধ হইল এবং ১৭৮৬ হইতে ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বহুবার তাহাদের অনুসরণে ব্রিটিশ সীমা অতিক্রম করিতে সচেষ্ট হইল। চট্টগ্রাম-আরাকান সীমান্তের গোলযোগ ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে চূড়ান্ত অবস্থায় আসিয়া পৌছিল। এই সময় কিছু সংখ্যক বর্মীসেনা নাফ নদীর ইংরেজ অধিকারভুক্ত পার্শ্বভাগে অবস্থিত সাহপুরী নামক ক্ষুদ্র দ্বীপ অধিকার করিয়া বসে। তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩-২৮) ব্রহ্ম সরকারের সহিত এক সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু দুইজন ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে যখন বর্মীরা বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় ছিনাইয়া লইল তখন তাঁহার ধৈর্য অতিক্রান্ত হইবার উপক্রম হইল।

ইতোমধ্যে আসামে সংঘর্ষ স্থরু হইয়া গিয়াছিল।

বহু শতাব্দী ধরিয়া আসাম উপত্যকা আহোম রাজাদের দ্বারা শাসিত এক স্বাধীন রাজ্য ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই অঞ্চলে আভ্যন্তরীণ অবস্থায় বহুবিধ ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। গৌরীনাথ সিং (১৭৮০-৯৪) ছিলেন একজন দুর্বল কিন্তু অত্যাচারী শাসক। তিনি কোম্পানীর সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস ক্যাপ্টেন ওয়েলসের নেতৃত্বে আহোম রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এক বাহিনী প্রেরণ করেন। ক্যাপ্টেন ওয়েলস রাজকীয় আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সেই সময়ে আঞ্চলিক সম্প্রসারণ নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া তিনি ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে আসাম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই আবার অশান্তি জীয়াইয়া উঠিল এবং উহার ফলে আক্রমণেচ্ছু বর্মীরা আসাম দখলের এক চমৎকার স্থযোগ পাইয়া গেল। ১৮১৭-২২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বর্মীরা আহোম সিংহাসন দাবীকারী দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুত্রকে আসাম হইতে বিতাড়িত করে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তেও এই ধ্বংসলীলার প্রতিক্রিয়া অনুভূত হইল। বর্মীরা ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে কয়েকটি ইংরেজ অধিকার-ভুক্ত গ্রামে লুঠপাট চালাইল। লর্ড আমহার্স্ট লিখিয়াছেন যে সেই সময়

বর্মীদের পক্ষে ঢাকা আক্রমণ ও সন্নিহিত জেলাসমূহ লুণ্ঠনকার্য নিষ্পাদনে কোন প্রতিবন্ধক ছিল না।
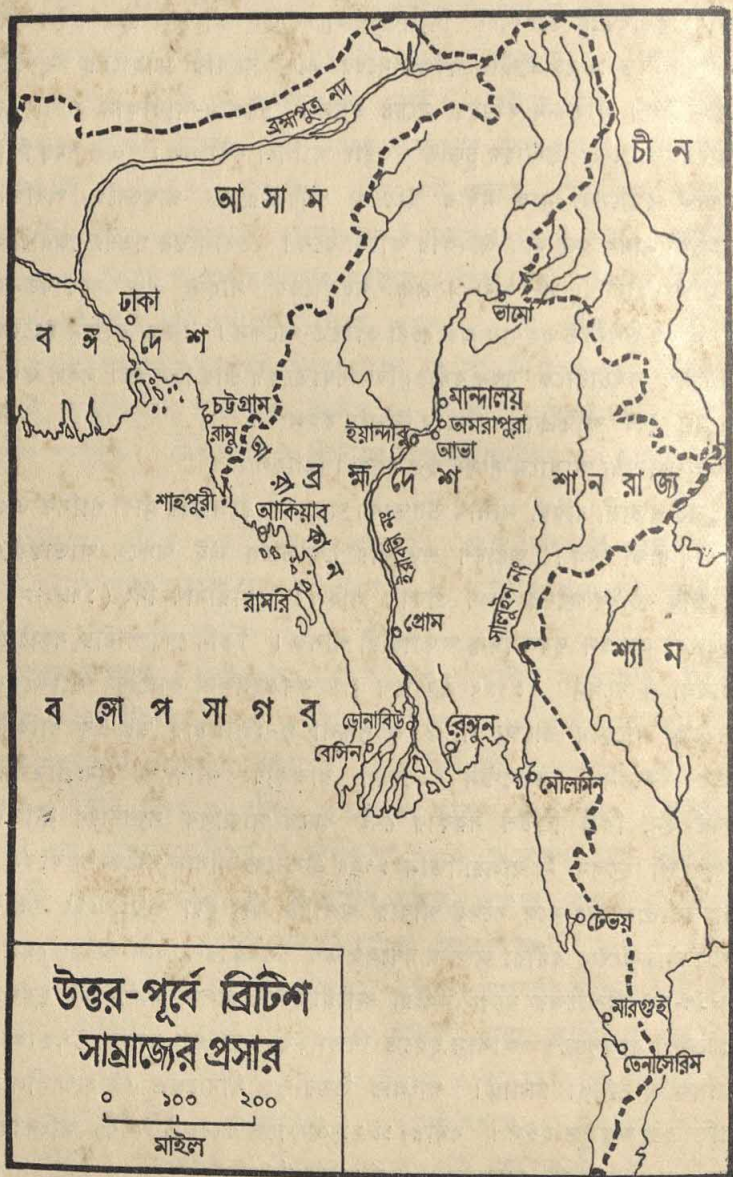
ইংরেজ ও বর্মীদের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ বাধিল শ্রীহট্টের সন্নিকটে। শ্রীহট্ট তখন পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত ছিল। ইহা ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ঘটনা। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে আনুষ্ঠানিক ভাবে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। উহা সমাপ্ত হইল ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। চারিটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া যুদ্ধ হইল—আসাম, আরাকান, ইরাবতী নদীর নিম্ন-উপত্যকা ও টেনাসেরিম। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে চট্টগ্রাম জিলার অন্তঃপাতী রামুর যুদ্ধে এক ব্রিটিশ বাহিনী ঘোরতর ভাবে পরাজিত হইল। এদিকে প্রধান বর্মী সেনাপতি বন্দুলা নিম্ন-ব্রহ্মের ডোনাবিউর যুদ্ধে সার আর্চিবল্ড ক্যাম্বেলের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। ইংরেজ বাহিনী বর্মার রাজধানী অমরাপুরা হইতে চারিদিনের পথের মধ্যে অবস্থিত ইয়ান্দাবু গ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হইল। তথায় ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে এক সন্ধিচুক্তি নিষ্পন্ন হয়। ব্রহ্মনৃপতি আহোম রাজ্য এবং আসামের কাছাড়, জয়ন্তিয়া, মণিপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির উপর সকল দাবী-দাওয়া ত্যাগ করেন। তিনি আরাকান ও টেনাসেরিম প্রদেশ ইংরেজদের ছাড়িয়া দেন এবং এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দানে ও তাঁহার দরবারে একজন ব্রিটিশ দূত গ্রহণে স্বীকৃত হন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার একাংশ একজন আহোম রাজার শাসনাধীনে আনয়ন করা হয়। তিনি অপুত্রক অবস্থায় মারা যাওয়ায় কাছাড় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়। জয়ন্তিয়া কয়েক বৎসর এক মিত্র রাজা কর্তৃক শাসিত হয়, তারপর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহাও ইংরেজ শাসনাধিকারভুক্ত হয়। মণিপুর অবশ্য তত্রত্য প্রাচীন রাজবংশকেই ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

ব্রহ্মের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক : বহু বৎসর যাবৎ কোম্পানী ব্রহ্মদেশের সহিত লাভজনক বাণিজ্য চালাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বাণিজ্যের অগ্রগতি বর্মীদের খামখেয়ালী ও স্থানীয় রীতিনীতির অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের জন্য মাঝে মাঝে ব্যাহত হইত। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সার জন শোর ক্যাপ্টেন সাইম্‌স্‌কে ব্রহ্মদেশে এক বাণিজ্যিক দৌত্যকার্যে প্রেরণ করেন, কিন্তু সাইম্‌স্‌ যে সকল সুবিধা সুযোগ লাভ করেন তাহা শেষ পর্যন্ত অলীক প্রতিপন্ন হয়। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অনুবর্তী হইয়া ক্যাপ্টেন কক্স ব্রহ্মে যান। ব্রহ্মে ফরাসী-প্রভাব যেরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছিল উহা প্রতিরোধের একমাত্র উপায় কক্সের মতে ছিল ব্রহ্মের সহিত এক সুদৃঢ় ও সবল

মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করা। লর্ড ওয়েলেস্‌লী ১৮০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল সাইম্‌স্ ও লেফটেনান্ট ক্যানিংকে ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেন। তাঁহার অভিপ্রায় ও নির্দেশ ছিল ব্রহ্মদেশকে সম্ভব হইলে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির আওতায় আনিয়া ইংরেজের প্রভাবাধীন করা। কিন্তু বর্মী শাসকগণ ও তাঁহাদের মন্ত্রিবর্গ ইংরেজ দূতদ্বয় অপেক্ষাও অধিক কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন। চট্টগ্রামে আশ্রয়প্রাপ্ত মগদের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য ক্যানিং আর একবার বর্মায় গিয়াছিলেন।

ইয়ান্দাবুর সন্ধিচুক্তির ধারা অনুযায়ী, জন ক্রফোর্ড ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রহ্মদেশে দূতরূপে প্রেরিত হইলেন। তিনি ব্রহ্মের সহিত এক বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করিলেন, সেই চুক্তির বলে বর্মায় বাণিজ্যকারী ইংরেজ ব্যবসায়ীদিগের কথঞ্চিৎ সুবিধা হইল। ব্রহ্ম সরকার একজন স্থায়ী ব্রিটিশ দূত গ্রহণে খুবই অনিচ্ছুক ছিলেন। ক্রফোর্ডের প্রত্যাবর্তনের (ডিসেম্বর, ১৮২৬) পর তিন বৎসরের জন্য আর কোন ব্রিটিশ দূত প্রেরণ করা হয় নাই। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মেজর হেনরী বার্নীকে দূত প্রেরণ করেন। তিনি ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মদেশে অবস্থান করেন। ইয়ান্দাবুর চুক্তি হইতে যে সকল গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল তিনি উহার কতকগুলির সমাধানে সমর্থ হইয়াছিলেন। মেজর হেনরী বার্নীর পরে যাঁহারা বর্মায় দূত হইয়া যান তাঁহাদের খুবই তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কারণ ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মের সিংহাসন অন্যায়ভাবে দখলকারী রাজা থেরাবডী ইংরেজদের সম্পর্কে খুবই বৈর মনোভাব অবলম্বন করেন। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মে ব্রিটিশ দূতনিবাস তুলিয়া দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮৫২)ঃ লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে বাণিজ্যিক প্রশ্নে ব্রহ্মদেশের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মস্থিত কতিপয় ব্রিটিশ বণিক্ বর্মী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ আনিল। লর্ড ডালহৌসী কমোডোর ল্যাম্বার্ট নামক একজন উদ্ধত প্রকৃতির নৌ-বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে এই অভিযোগের প্রতিকারার্থ ব্রহ্মদেশে পাঠাইলেন। ল্যাম্বার্ট রেঙ্গুনস্থিত বর্মী গভর্ণরের সকাশে তাঁহার যে সকল কর্মচারীকে পাঠাইয়াছিলেন তাঁহারা অপমানিত হইলেন। যুদ্ধ বাধিল।

গভর্ণর-জেনারেল যদি কমোডোর ল্যাম্বার্টের পরিবর্তে রাজনৈতিক বিভাগীয় একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বর্মায় প্রেরণ করিতেন তাহা হইলে হয়ত বিসম্বাদের শান্তিপূর্ণ আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হইলেও হইতে পারিত। ডালহৌসী স্বয়ং নৌ-বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহাদের স্বভাব এতই উত্তেজনায় পরিপূর্ণ যে আলাপ-আলোচনা চালাইবার পক্ষে উঁহারা মোটেই উপযোগী নহেন। যাহা হউক, লর্ড ডালহৌসী ল্যাম্বার্টের কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। পূর্বাঞ্চলে ব্রিটিশ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই, ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত হইল।

যুদ্ধকাল বেশীদিন স্থায়ী হইল না। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের মার্চে শুরু হইয়া ডিসেম্বরেই উহা শেষ হইয়া গেল। কিন্তু উহার ফল হইল চূড়ান্ত। যে সকল ভুলের জন্য প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ অযথা বিলম্বিত হইয়াছিল এবার সে সকল এড়াইয়া যাওয়া হইল এবং গভর্ণর-জেনারেলের সোৎসাহ সমর্থনে পুষ্ট হইয়া জেনারেল গডউইন কয়েক মাসের মধ্যেই নিম্ন ব্রহ্মের সব কয়টি প্রধান প্রধান শহর দখল করিয়া লইলেন। কিন্তু যুদ্ধ যদিও শেষ হইল, কোন চুক্তি হইল না। ব্রহ্মের রাজা প্যাগানমিন তাঁহার ভ্রাতা মিণ্ডন কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। মিণ্ডন ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যদিও নূতন রাজা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বৈরী তৎপরতা চালাইয়া যাইবার পক্ষপাতী ছিলেন না তথাপি তিনি ইংরেজের পেগু দখল স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। (লর্ড ডালহৌসী এক ঘোষণাবলে ইতোমধ্যে পেগু প্রদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।) তিনি ইংরেজের সহিত আনুষ্ঠানিক কোন চুক্তিতেও আবদ্ধ হন নাই। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে কতিপয় বর্মী দূত কলিকাতায় আগমনপূর্বক গভর্ণর-জেনারেলকে পেগু প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানাইলে ডালহৌসী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "যাবৎ সূর্য কিরণ প্রদান করিবে তাবৎ এই সকল অঞ্চল আভা রাজ্যকে (ব্রহ্মদেশকে) প্রত্যর্পণ করা হইবে না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

আহম্মদ শাহ আবদালীর বংশধরগণ : আহম্মদ শাহ আবদালীর পুত্র ও উত্তরাধিকারী তৈমুর শাহ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৭৯৩) তখন আফগানিস্তানের কাবুল, বল্‌খ্‌, কান্দাহার ও হিরাত প্রদেশকয়টি ছাড়াও ভারতবর্ষের পেশোয়ার, লাহোর, কাশ্মীর এবং মূলতান এই কয়টি প্রদেশ ছিল কাবুল-রাজতন্ত্রের অধীন; তাহার উপর আবার সিন্ধুপ্রদেশের আমীরগণ এবং বেলুচিস্তানের নায়কগণ ছিলেন সে রাজতন্ত্রের সামন্ত-শ্রেণীভুক্ত। তৈমুর শাহের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পঞ্চম পুত্র জমান শাহ (১৭৯৩-১৮০০); তিনি হিন্দুস্থান আক্রমণ করিবেন এই আশঙ্কায় স্যর জন শোর এবং লর্ড ওয়েলেস্‌লীর আমলে 'ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠার ভাব স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়।' লর্ড ওয়েলেস্‌লীর নির্দেশে বুশায়ার-স্থিত ব্রিটিশ এজেন্ট 'পারস্যের রাজসভাকে শাহ জমানের পথের কণ্টক হইয়া দাঁড়াইতে প্ররোচনা দান করিতে থাকেন।' তাহা ছাড়া শাহ জমানকে প্রায়ই আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের জন্য বিব্রত থাকিতে হইত। শেষ অবধি তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মামুদ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও অন্ধদশা-প্রাপ্ত হইয়া পঞ্জাবের অন্তর্গত লুধিয়ানা শহরে ব্রিটিশের একজন বৃত্তিভোগী রূপে জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইতে বাধ্য হন। মামুদ (১৮০০-১৮০৩) আবার তাঁহার ভ্রাতা শাহ শুজা (১৮০৩-১৮০৯) কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। শাহ শুজার রাজত্বও প্রায় তাঁহার পুরোগামীদের রাজত্বের ন্যায়ই এক বিড়ম্বনার ব্যাপার ছিল। ঐতিহাসিক Kaye এইভাবে তাঁহার ব্যর্থতার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন : "তাঁহার ছিল উৎসাহের অভাব, ছিল উদ্যমের অভাব, ছিল বিচারবুদ্ধির অভাব, এবং সর্বোপরি ছিল অর্থের অনটন।" অবশ্য বাস্তবিকই তাঁহার চরিত্রে এতগুলি দুর্বলতার সমাবেশ ঘটিয়াছিল কি না তাহাতে সন্দেহ করা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার যে ভ্রাতার অপসারণ সাধন করিয়াছিলেন সেই মামুদই আবার ১৮০৯ সালে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। শাহ শুজা বৎসর কয়েক রণজিৎ সিংহের

অতিথি রূপে কাটাইয়া দেন; তারপর লুধিয়ানায় আসিয়া ব্রিটিশের বৃত্তিভোগী রূপে বাস করিতে থাকেন। মামুদ কয়েক বৎসর (১৮০৯-১৮) শক্তিশালী বরক্জাই দলপতিদের ক্রীড়া-পুত্তলিকা রূপে রাজত্ব করার পর ১৮১৮ সালে তাঁহাদেরই দ্বারা সিংহাসন হইতে অপসৃত হন। তাঁহার পুত্র কামরান হিরাতে রাজত্ব করিতে থাকেন।

এই সময়ে দুইটি কারণে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আফগানিস্তানের ব্যাপারে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। জমান শাহের আমলে তাঁহাদের ভয় হইয়াছিল আবার না ভারতবর্ষে আহম্মদ শাহ আবদালীর ক্রিয়াকলাপের পুনরাবর্তন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, পারস্যের মধ্য দিয়া ফ্রান্স ও রুশিয়ার যৌথ আক্রমণের আশঙ্কায় স্বভাবতঃই তাঁহারা আফগানিস্তানের অধিপতিদের সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষায় আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ফরাসী আতঙ্ক বাতাসে মিলাইয়া গেলে, এবং রণজিৎ সিংহ কর্তৃক পঞ্জাবে শিখ-রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে আফগানিস্তান ও ব্রিটিশ ভারতের মধ্যস্থলে শতদ্রুর পরপারে অবস্থিত পঞ্জাবের অংশটুকু লইয়া একটি মধ্যবর্তী সীমান্ত রাজ্যের (buffer State) প্রতিষ্ঠা হইলে দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইয়া যায়, এবং ইহার পর বৎসর কয়েক ভারতের ব্রিটিশ শাসকগণ আর আফগানিস্তানের ব্যাপারে কোনরূপ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন নাই।

আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ (১৮২৬-৬৩): বরক্জাই দলপতিগণ মামুদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজেরাই স্বাধীনভাবে আফগানিস্তানের এক এক অঞ্চল শাসন করিতে থাকেন; তারপর ১৮২৬ সালে দোস্ত মহম্মদ নামে তাঁহাদেরই একজন আসিয়া কাবুল অধিকার করিয়া বসেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা সকলেই তাঁহাকে আমীর বলিয়া মানিয়া লন। দ্বাদশ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি অবিসংবাদী প্রতিপত্তি ভোগ করেন। Kaye বলেন, "এই সময় শাসক হিসাবে দোস্ত মহম্মদের চরিত্রে যে এরূপ বহু কিছুই প্রতিফলিত হইয়াছিল যাহা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদেরও সবিস্ময় অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে, তাহা লইয়া কোনরূপ প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না।" রণজিৎ সিংহ ১৮৩৪ সালে পেশোয়ার হইতে তাঁহার এক ভ্রাতার বহিষ্কার সাধন করেন; সেই বৎসরই দোস্ত মহম্মদ সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য শাহ শুজার প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দেন।

রুশ আতঙ্ক ঃ নেপোলিয়নের পতনের পূর্বেই পারস্যে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য রুশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গিয়াছিল। রুশিয়া ও পারস্যের মধ্যে গুলিস্তাঁর মৈত্রীচুক্তির (১৮১৩) ফলে শাহ হইয়া দাঁড়ান রুশ সম্রাটের প্রায় আজ্ঞাবহ ভৃত্যের সামিল। কিন্তু এ অবস্থার প্রতিকার সাধন হয় ইংলণ্ড ও পারস্যের মধ্যে তেহেরানের মৈত্রীচুক্তি (১৮১৪) সম্পাদনের ফলে ; ইহাতে স্থির হয় যে "গ্রেট ব্রিটেনের প্রতি বৈর-ভাবাপন্ন যাবতীয় ইউরোপীয় বাহিনীরই পারস্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ।" উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে রুশিয়ায় আরম্ভ হয় এশিয়া-সংক্রান্ত বিভিন্ন পরি-কল্পনার উপর গুরুত্ব আরোপণ ; ফলে লর্ড পামারস্টনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতিতে রুশিয়ার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকট হইয়া উঠিতে থাকে। রুশিয়ার প্ররোচনায় পারস্য যখন হিরাত আক্রমণ করে (১৮৩৭-৩৮) তখন ঘটে এ ব্যাপারের চরম পরিণতি। হিরাত ছিল ভারতের প্রবেশদ্বার ; পারস্য উহা অধিকার করিয়া বসিতে পারিলে তাহা হইয়া দাঁড়াইত ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রবেশপথের উপর রুশিয়ারই কর্তৃত্ব লাভের নামান্তর। কিন্তু পটিঞ্জার নামে জনৈক তরুণ ব্রিটিশ সেনানীর নির্দেশ লাভে বহুলাংশে বলীয়ান হইয়া অকুতোভয় আফগানগণ পারসিকদের প্রত্যাবৃত্ত করে।

প্রথম আফগান যুদ্ধের সূত্রপাত ঃ ১৮৩৬ সালে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসেন। লর্ড পামারস্টনের ন্যায় তিনিও প্রাচ্যে রুশিয়ার মনোগত অভিপ্রায় সম্পর্কে অতিরিক্ত সন্ত্রাসগ্রস্ত ছিলেন ; পারস্য হিরাত আক্রমণ করিলে তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়তর হইয়া উঠে। ১৮৩৬ সালের জুন মাসে ডিরেক্টর-সভা তাঁহাকে এই মর্মে এক নির্দেশ দান করিয়া পাঠান যে 'ঐ অঞ্চলে (অর্থাৎ আফগানিস্তানের দিকে) পারসিক আধিপত্যের বিস্তার নিবারণ, অথবা রুশীয় প্রভাবের আসন্ন অভিযান প্রতিরোধ-কল্পে সময়োচিত বাধা সৃষ্টির জন্য আফগানিস্তানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিঃসন্দেহেই প্রয়োজন হইয়া উঠিবে।' তদনুযায়ী লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড অভিজ্ঞ কূটনীতিক আলেকজাণ্ডার বার্নেসকে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে দৌত্যকার্যের জন্য কাবুলে প্রেরণ করেন। কিন্তু এই দৌত্যকার্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ঃ বার্নেস নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল 'নানা বিষয়ের সন্ধান এবং অতঃপর কী কর্তব্য তাহার

বিচার করা।' দোস্ত মহম্মদ ব্রিটিশের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে সম্পূর্ণই প্রস্তুত ছিলেন; বিনিময়ে তিনি দাবি করেন রণজিৎ সিংহ্ কর্তৃক বিজিত পেশোয়ারের পুনরুদ্ধার সাধনে ব্রিটিশের সহায়তা। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড কিছুকাল দোস্ত মহম্মদ ও রণজিৎ সিংহের মধ্যে কাহাকে গ্রহণ এবং কাহাকে বর্জন করিবেন তাহা লইয়া দ্বিধা করিতে লাগিলেন; অবশেষে তিনি স্থির করিলেন শিখ-রাজের মৈত্রীই অধিকতর কাম্য। পেশোয়ার প্রত্যর্পণের জন্য তিনি রণজিৎ সিংহের উপর চাপ দিতে অসম্মত হইলেন। এইভাবে তিনি খাইবারের অপরদিকে অবস্থিত একটি শক্তিশালী সরকারকে ব্রিটিশ প্রভাব-পরিমণ্ডলের মধ্যে আনয়নের সুযোগ হেলায় হারাইলেন।

ইহাতে স্বভাবতঃই দোস্ত মহম্মদের চিত্তে হতাশার সঞ্চার হয়। এতদিন তিনি তাঁহার রাজসভাস্থ রুশীয় দূত বিক্তোবিচ্-এর প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াই আসিতেছিলেন, এবার তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে থাকেন। বার্নেস কাবুল পরিত্যাগ করেন ১৮৩৮ সালের এপ্রিল মাসে। রুশীয়গণের প্রতি আমীরের মনোভাবের এই পরিবর্তন লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। তিনি দোস্ত মহম্মদের উচ্ছেদসাধনের জন্য এক মারাত্মক সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া বসিলেন: স্থির হইল রণজিৎ সিংহের সহায়তায় লুধিয়ানায় নির্বাসিত হতভাগ্য শাহ শুজাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের আফগাননীতি নির্ধারণে সরকারের কর্মসচিব ম্যাক্‌নটনের অনেকখানি হাত ছিল; তাঁহাকে লাহোরে প্রেরণ করা হইল। ১৮৩৮ সালের জুন মাসে শাহ শুজা, রণজিৎ সিংহ এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে হইল এক 'ত্রিশক্তি-চুক্তি'। ১৮৩৮ সালের অক্টোবর মাসে সিমলা হইতে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড এক ফতোয়া জারি করিয়া আসন্ন আফগান-যুদ্ধের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করিলেন। স্যার হারবার্ট এড্‌ওয়ার্ডেসের মতে এই ফতোয়ায় "দোস্ত মহম্মদের মতামত এবং ক্রিয়াকলাপের এমনই বিকৃত বর্ণনা দান করা হয় যে তাহা যে-কোন রুশীয় রাজনীতিকেরই ঈর্ষ্যার বিষয় হইয়া উঠিতে পারিত।" ১৮৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পারসিকদের হিরাত ত্যাগের ফলে যুদ্ধের সবচেয়ে বড় অছিলাই দূর হইয়া গেল, কিন্তু ১৮৩৮ সালের নবেম্বর মাসে গবর্ণর-জেনারেল ঘোষণা করিলেন যে 'আফগানিস্তানে...এক বৈরভাবাপন্ন শক্তির পরিবর্তে

এক মৈত্রীভাবাপন্ন শক্তির প্রতিষ্ঠা এবং আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা যাহাতে বিফল হয় তদুদ্দেশ্যে আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একটি স্থায়ী বাধা সৃষ্টির জন্য' যুদ্ধ আরম্ভ করা হইবে।

লর্ড অক্ল্যাণ্ডের এই কর্মনীতি তাঁহার কাউন্সিলের সমর্থন লাভ করে, কিন্তু প্রধান সেনাপতি ইহার বিরোধিতা করেন; ইংলণ্ডে তিনি ক্যাবিনেটের (মন্ত্রিসভার) সমর্থন লাভ করেন, কিন্তু ডিরেক্টর-সভার সমর্থন হইতে বঞ্চিত হন। দোস্ত মহম্মদ ছিলেন একজন স্বাধীন নরপতি; তিনি রুশীয়গণকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারেন না, লর্ড অক্ল্যাণ্ডের এরূপ দাবি করার কোনও নৈতিক অধিকারই ছিল না—বিশেষতঃ ব্রিটিশের সহিত আমীরের মৈত্রী স্থাপনের প্রস্তাব অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যানের পর। আফগানিস্তান সে সময় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল দুর্‌রানী বংশ ও বরক্‌জাইদের মধ্যে রাজপদ লইয়া তীব্র দ্বন্দ্বের লীলাভূমি; সে দ্বন্দ্বে বরক্‌জাইরাই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় দোস্ত মহম্মদের ন্যায় একজন শক্তিমান ও জনপ্রিয় বরক্‌জাই নৃপতির স্থলে শাহ শুজার ন্যায় একজন নির্বাসিত দুর্‌রানীকে সিংহাসনে স্থাপনের চেষ্টা যে এক বিষম রাজনৈতিক প্রমাদ হইয়া দাঁড়ায় তাহা পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরায় প্রকৃষ্টরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া যুদ্ধের প্রকৃত কোন কারণও বিদ্যমান ছিল না; হিরাত আত্মরক্ষায় কৃতকার্য হইয়াছিল, লণ্ডন হইতে চাপের ফলে রুশীয় সরকারও নিজ প্রতিনিধিদের দেশে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইনেস যথার্থই এই প্রথম আফগান-যুদ্ধকে 'ভারতবর্ষে ব্রিটিশজাতির সমগ্র ইতিহাসে অনুষ্ঠিত সর্বাপেক্ষা গুরুতর অবিমিশ্র প্রমাদ' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রথম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৮-১৮৪২): এই অভিযানের প্রধান নেতৃত্বভার অর্পণ করা হয় স্যার জন কীনের উপর; ইহার রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার ভার রহিল ম্যাক্‌নটনের হাতে, তাঁহার মন্ত্রণাদাতার পদ লাভ করিলেন বার্নেস। মূল বাহিনী ফিরোজপুর হইতে অগ্রসর হইয়া বাহাওয়ালপুর, সিন্ধুপ্রদেশ ও বেলুচিস্তান অতিক্রম করিয়া বোলান ও খোজাক গিরিপথের মধ্য দিয়া আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়াই এইভাবে এক দীর্ঘ ও সর্পিল গতিপথ অনুসরণ করিয়া 'যাবতীয় যুক্তিসিদ্ধ সামরিক সূত্র ভঙ্গ করেন', কেননা রণজিৎ সিংহ তাঁহার রাজ্যের মধ

দিয়া ব্রিটিশ বাহিনীকে অগ্রসর হইবার অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। শিখ-বাহিনী পেশোয়ার ও খাইবার গিরিপথ ধরিয়া অগ্রসর হয়। ১৮৩৯ সালের এপ্রিল মাসে কান্দাহারের পতন ঘটে। ১৮৩৯ সালের আগস্ট মাসে শাহ শুজা কাবুলে প্রবেশ করেন। আফগানদের চোখে তিনি ছিলেন বৈদেশিক আক্রমণকারীদের হাতের পুতুল মাত্র। Kaye বলেন, "তাঁহার কাবুলে প্রবেশের সঙ্গে কোন রাজার রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর রাজধানীতে প্রবেশের চেয়ে বেশী সাদৃশ্য ছিল বরং এক শবযাত্রার সঙ্গে।" ১৮৩৯ সালের নবেম্বর মাসে দোস্ত মহম্মদ ম্যাক্‌নটনের নিকট আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়।

ব্রিটিশের অস্ত্রবল ব্যতিরেকে শাহ শুজা আফগানদের আস্থাভাজন হইয়া উঠিতে এবং নিজেকে সিংহাসনে সমাসীন রাখিতে পারিতেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু তাঁহার ব্রিটিশ মিত্রগণ তাঁহাকে একজন স্বাধীন আফগান নরপতি রূপে আফগানিস্তান শাসনের কোন সুযোগই দিলেন না; তাঁহারা প্রকাশ্যেই তাঁহাকে তাঁহাদের হস্তস্থিত পুত্তলিকারূপে ব্যবহার করিতে থাকেন; ইহার ফলে তিনি আফগানদের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইয়াই রহিলেন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড স্থির করিলেন সেনাপতি এল্‌ফিন্‌স্টোন নামে একজন বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য সামরিক কর্মচারীর অধীনে আফগানিস্তানে ১০,০০০ সৈন্য মোতায়েন রাখিবেন। আফগানিস্তানে ব্রিটিশ সৈন্যদলের এই উপস্থিতি আফগানদের নিকট অসন্তুষ্টির কারণ ছিল; তাহা ছাড়া ইহার জন্য ভারতের অর্থকোষের উপর প্রভূত চাপও পড়িতে লাগিল। ১৮৪০ সালের শেষের দিকে ডিরেক্টর-সভা প্রস্তাব করিলেন, ব্রিটিশ বাহিনী হয় আফগানিস্তান পরিত্যাগ করুক, নয় আরও অনেক সৈন্য প্রেরণ করিয়া উহার শক্তিবৃদ্ধি করা হউক। ম্যাক্‌নটনের মন্ত্রণায় লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড আফগানিস্তান হইতে সৈন্যদল অপসারণ করিয়া নিজের কর্মনীতির ব্যর্থতা স্বীকারে পরাঙ্মুখ হইয়া রহিলেন।

১৮৪১ সালের শেষের দিকে আফগানদের অসন্তোষ এক ভয়াবহ বিদ্রোহের আকারে ফাটিয়া পড়িল। বিক্ষোভের কারণ হইল আফগানিস্তানে অবস্থিত ব্রিটিশ বাহিনীর কলুষিত আচরণ। যে সমস্ত কর্মচারী চরিত্রদোষের জন্য আফগানদের তীব্র বিতৃষ্ণার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, বার্নেস ছিলেন

তাঁহাদের একজন। বার্নেস এবং আরও কয়েকজন ব্রিটিশ কর্মচারীর প্রাণনাশ করা হইল। আকবর খাঁ নামে দোস্ত মহম্মদের এক পুত্র আফগানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যদল পরাভূত হইল। ম্যাক্‌নটন অবিলম্বে দেশত্যাগের প্রতিশ্রুতি দান করিলেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করা হইল। ব্রিটিশ কর্মচারী ও সৈন্যদলের এইরূপ হীনতা স্বীকারের জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল তাহাদের নেতৃবৃন্দের অকর্মণ্যতা। ১৮৪২ সালের জানুয়ারী মাসে কাবুল পরিত্যক্ত হয়; তারপর পথিমধ্যে তুষারপাত, ঝটিকাবিক্ষোভ এবং আফগানদের বন্দুকের গুলিতে ব্রিটিশ বাহিনী নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। এই ঘোর বিপৎপাতের মধ্যে মৃত্যুর কবল হইতে নিস্তার লাভ করেন মাত্র একজন—ডাঃ ব্রাইডন; তিনিই এই মর্মান্তিক কাহিনী জালালাবাদে বহন করিয়া লইয়া আসেন। যাহা হউক, নট ও সেল কান্দাহার ও জালালাবাদ রক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হন।

১৮৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসেন লর্ড এলেনবরা। নবনিযুক্ত গভর্ণর-জেনারেল কাবুল ও কান্দাহার পরিত্যাগেরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কাবুলে জনৈক বরকৃজাই নায়কের হস্তে শাহ শুজা প্রাণ হারান। ১৮৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পোলক আকবর খাঁকে পরাস্ত করিয়া কাবুলে ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলন করেন। নট অধিকার করেন গজনী; সেখানে বহু শতাব্দী পূর্বে সুলতান মামুদ কর্তৃক নীত প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দিরের তোরণ-রূপে কথিত কয়েকখানি দ্বার তাঁহার হস্তগত হয়। বিজয়গৌরবে উদ্দীপ্ত ব্রিটিশ বাহিনী তোপ দাগিয়া কাবুলের বৃহৎ বাজার উড়াইয়া দেয়, তারপর ১৮৪২ সালের অক্টোবর মাসে কাবুল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। গভর্ণর-জেনারেল ঘোষণা করেন যে 'জনগণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের উপর কাহাকেও নরপতি রূপে চাপাইয়া দেওয়া...ব্রিটিশ সরকারের...কর্মনীতির পরিপন্থী ব্যাপার হইয়া উঠিবে।' দোস্ত মহম্মদকে মুক্তিদান করা হইল। তিনি কাবুলে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

দোস্ত মহম্মদের শেষজীবন ঃ লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের আফগান-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানের সিংহাসনে কোন মিত্ররাজের প্রতিষ্ঠা সাধন।

যুদ্ধের ফলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। দোস্ত মহম্মদের সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির পর বৎসর কয়েক ব্রিটিশ জাতির প্রতি তিনি বিরূপ মনোভাবই পোষণ করিতে থাকেন। তারপর পুনরায় হিরাতের উপর পারসিক আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলে তিনি ১৮৫৫ এবং ১৮৫৭ সালে কোম্পানীর সহিত মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনে তৎপর হন। এইরূপে যে সদ্ভাবের সৃষ্টি হয় তাহাই ছিল সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশের প্রতি আমীরের বিশ্বস্ততার মূল কারণ। ১৮৬৩ সালে দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু হয়।

সিন্ধুপ্রদেশ আত্মসাৎ (১৮৪৩) ঃ অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে সিন্ধুপ্রদেশ শাসন করিতেন হায়দরাবাদ, খয়েরপুর ও মীরপুরের তালপুর আমীরগণ। আফগানিস্তানের নরপতিদের অধিরাজত্ব ছিল নামেমাত্র। ১৮০৯ সালে আমীরগণ ব্রিটিশের সহিত এক চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন; তাহাতে তাঁহারা এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন যে সিন্ধুদেশে তাঁহারা 'ফরাসী উপজাতিকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার' অনুমতি দান করিবেন না। ১৮২০ সালে এই চুক্তি নূতন করিয়া সম্পাদনের সময় তাহাতে এই ধারাটি সন্নিবেশিত হয় যে 'যে-সকল হানাদারের দল ক্রমাগত সীমান্তের শান্তিভঙ্গ করিতেছে' তাহাদিগকে দমন করিতে হইবে।

সিন্ধুপ্রদেশের পথ মুক্ত হয় ১৮৩১ সালে আলেক্জাণ্ডার বার্নেসের সিন্ধুনদ বরাবর লাহোর যাত্রার ফলে। তখনই প্রথম সিন্ধুনদের নিম্ন-উপত্যকার রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্বের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। জনৈক বিচক্ষণ সিন্ধী তখন এইরূপ মন্তব্য করেন, "হায়! এবার সিন্ধু গেল, নদীর উপর ইংরেজদের চোখ পড়িয়াছে।"

সিন্ধুপ্রদেশের উপর রণজিৎ সিংহেরও চোখ ছিল। অমৃতসরের সন্ধি (১৮০৯) পূর্বদিকে শতদ্রু নদীকে এক অলঙ্ঘনীয় বাধায় পরিণত করিয়াছিল; পশ্চিমদিকে দোস্ত মহম্মদের ক্রমবর্ধমান শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল নানারূপ অসুবিধার ব্যাপার। শিখ-শক্তির বিস্তারলাভের স্বাভাবিক ক্ষেত্রই হইয়া দাঁড়াইল সিন্ধুপ্রদেশ। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার আর নূতন করিয়া রণজিৎ সিংহের শক্তিবৃদ্ধি সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। শিখদের দূরে ঠেকাইয়া রাখার সর্বোত্তম পন্থা ব্রিটিশের কাছে মনে হইল সিন্ধুপ্রদেশকে ব্রিটিশ প্রভাব-পরিমণ্ডলের মধ্যে লইয়া আসা। ১৮৩২ সালে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক

হায়দরাবাদের আমীরের সঙ্গে এক সন্ধি করিলেন; তাহাতে স্থির হইল ব্রিটিশ প্রজারা ব্যবসায় উপলক্ষ্যে সিন্ধুনদের মধ্যে নৌবাহন করিতে পারিবে। ১৮৩৮ সালে আমীরগণের সঙ্গে আর এক সন্ধি করেন লর্ড অক্ল্যাণ্ড; তাহাতে তাঁহারা হায়দরাবাদে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্টকে গ্রহণ করিতে সম্মত হন। ১৮৩৮ সালের ত্রিশক্তি-চুক্তিতে শাহ শুজা সিন্ধুর উপর তাঁহার ছায়ামাত্রে পর্যবসিত অধিরাজত্বের অধিকার পরিহার করেন, এবং এই দাক্ষিণ্যের (যাহার প্রকৃত মূল্য ছিল সন্দেহেরই বিষয়) বিনিময়ে লর্ড অক্ল্যাণ্ড আমীরগণের নিকট হইতে আদায় করেন প্রভূত অর্থ। তারপর ১৮৩৯ সালে আমীরগণকে এমনই এক সন্ধিতে সম্মতিদানে বাধ্য করা হয় যে কার্যতঃ তাঁহারা হইয়া পড়েন ব্রিটিশের রক্ষণাবেক্ষণের অধীন। ১৮৩২ সালের সন্ধিতে সামরিক বাহিনীর যাতায়াতের জন্য সিন্ধুনদের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু ১৮৩৯-৪০ সালে ব্রিটিশ বাহিনী সিন্ধুপ্রদেশের মধ্য দিয়াই আফগানিস্তান অভিমুখে অগ্রসর হয়।

আফগানিস্তানে যখন ব্রিটিশ বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হয়, আমীরগণ তখন কোনরূপ গোলযোগই সৃষ্টি করেন নাই; তবুও তাঁহাদের প্রতি আনা হয় বিশ্বাসহানির অভিযোগ, এবং এলেনবরা তাঁহাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য পাঠান স্যার চার্ল্স্ নেপিয়ারের ন্যায় এক রূঢ়স্বভাব যোদ্ধ্পুরুষকে। নেপিয়ার এই ভাবের বশবর্তী হইয়া তাঁহার ক্রিয়াকলাপ পরিচালন করিতে থাকেন যে 'সিন্ধুপ্রদেশ গ্রাস করা হইবে এমন একটা সুফলদায়ী অপকর্ম যে সে কার্য সাধনের জন্য একটা ছল খুঁজিয়া বাহির করাই হইল তাঁহার আসল কাজ।' খয়েরপুরে তিনি এক উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিবাদে হস্তক্ষেপ করেন, এবং আমীরদের উপর এমন একটি নূতন সন্ধির বোঝা চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করেন যাহার ফলে তাঁহাদিগকে রাজ্যের বহু অংশ ছাড়িয়া দিতে হয় এবং তাঁহারা নিজেদের মুদ্রা তৈয়ারির অধিকার হইতেও বঞ্চিত হন। এইভাবে তিনি আমীরদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। সকলের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য তিনি ইমামগড়ের সুদৃঢ় দুর্গটি ধূলিসাৎ করিয়া দেন। দুর্দান্তস্বভাব বেলুচিদের এক আক্রমণই হইয়া দাঁড়াইল যুদ্ধের সঙ্কেত। ১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে (হায়দরাবাদের নিকটে) মিয়ানীতে নেপিয়ার জয়লাভ করিলেন। আমীরদের মধ্যে কেহ কেহ

তৎক্ষণাৎ বশ্যতা স্বীকার করেন ; হায়দরাবাদ অধিকার করা হইল। মার্চ মাসে (হায়দরাবাদের নিকট) দাবোতে ঘটিল মীরপুরের আমীরের পরাভব। জুন মাসে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল। আগস্ট মাসে সিন্ধুপ্রদেশ গ্রাস করা হইল। আমীরগণ নির্বাসিত হইলেন। চারি বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকার্য নির্বাহ করেন নেপিয়ার।

ডিরেক্টর-সভা এলেনবরা ও নেপিয়ারের ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করিতে পারিলেন না, কিন্তু যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা মানিয়াই লইতে হইল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ব্রিটিশ লেখকগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, যেরূপ যথেচ্ছাচারমূলক কর্মনীতি গ্রহণ করিয়া আমীরগণের উচ্ছেদ সাধন করা হয় তাহা অবলম্বনের মূলে কোনরূপ নীতিগত যুক্তিযুক্ততা অথবা সদ্য উদ্ভূত কোনরূপ রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ছিল না। নেপিয়ার নিজেও মন্তব্য করেন, "সিন্ধুদেশ গ্রাস করার কোন অধিকার আমাদের নাই, তবুও আমরা উহা গ্রাস করিব......।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিখ রাজতন্ত্রের অভ্যুদয় ও পতন

মিস্‌ল্‌সমূহ ঃ আহম্মদ শাহ আবদালী শেষবারের মতো ভারত আক্রমণ করেন ১৭৬৭ সালে। তাহার পর হইতে শিখ মিস্‌ল্‌গুলিই পঞ্জাব শাসন করিতে থাকে। এগুলির গঠন-বর্ণনায় বলা হইয়াছে এগুলি ছিল 'ধর্মতান্ত্রিক শক্তিসমবায়ী ফিউডাল সংস্থা' ("theocratic confederate feudalism")। কেন্দ্রীয় সরকার ছিল যার-পর-নাই দুর্বল, কিছুকাল পরেই তাহার কাজ বন্ধ হইয়া যায়। যে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সকলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাঁহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইয়া গেল আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা। প্রথমে ভাঙ্গি মিস্‌ল্ এবং তাহার পর কাহ্নেয়া মিস্‌ল্ অন্যান্য দলগুলির উপর যাহা হউক এক প্রকারের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে, কিন্তু 'তাহাদের সেই সাধারণতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ হইতে রাজতন্ত্রের পতাকা আন্দোলনের কাজ' নির্দিষ্ট হইয়া ছিল স্থকেরচুকিয়া মিস্‌লের অধিনায়ক রণজিৎ সিংহেরই জন্য।

রণজিৎ সিংহের প্রথম জীবন ঃ রণজিৎ সিংহের জন্ম হয় ১৭৮০ সালের নবেম্বর মাসে। ১৭৯০ সালে তাঁহার পিতা মহা সিংহ মারা যান। সতেরো বৎসর বয়সে রণজিৎ স্বহস্তে কার্যভার তুলিয়া লন; সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লিপ্ত হইয়া পড়েন ছোটখাটো যুদ্ধবিগ্রহে আর নিয়মিত ভাবে পররাজ্য আক্রমণের পালায়। ১৭৯৮ সালে আহম্মদ শাহ আবদালীর পৌত্র কাবুল-রাজ জমান শাহ পঞ্জাব আক্রমণ করিলে তিনি তাঁহার সহিত যোগদান করেন। দুর্‌রানী-বংশের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, কিন্তু ১৭৯৯ সালে রণজিৎ সিংহ লাহোরের শিখ অধিনায়কদের হাত হইতে লাহোর কাড়িয়া লন। তাঁহার পরবর্তী গুরুত্বময় রাজ্যাধিকার হইল ১৮০৫ সালে অমৃতসর অধিকার। তাঁহার শ্বাশুড়ী সদা কাউর ছিলেন কাহ্নেয়া মিস্‌লের অধিনায়িকা, এবং আহ্‌লুওয়ালিয়া মিস্‌লের নায়ক ছিলেন তাঁহার বন্ধু ফতে সিংহ; এই দুজনের সহযোগে রণজিৎ প্রায় অপ্রতিহত প্রভাবে পঞ্জাবের রাজারাজড়াদের রাজ্য গ্রাস করিয়া চলিতে লাগিলেন; ১৮২৩ সালের দিকে এই কার্য পরিপূর্ণতা লাভ করে। এইভাবে একের পর এক করিয়া শতদ্রুর পরপারে অবস্থিত যাবতীয় শিখ-রাজ্য অধিকার করার ফলে ফতে সিংহের অবস্থা ক্রমশঃ হইয়া দাঁড়াইল অধীন মিত্ররাজ্যের মতো, কিন্তু কর্তৃত্বাভিমানিনী সদা কাউর অনতিবিলম্বেই নিজের বিপদ নিজে ডাকিয়া আনিলেন; ১৮২১ সালে তাঁহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাঁহার রাজ্যখণ্ড লাহোর রাজ্যের সহিত যুক্ত করা হইল। এইভাবেই ঘটিল বংশপরম্পরায় শাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অবসান, তৎপরিবর্তে হইল এক সুসংহত রাজতন্ত্রের অভ্যুদয়।

ব্রিটিশের সহিত রণজিৎ সিংহের সন্ধি (১৮০৯) ঃ কিন্তু রণজিৎ সিংহ শতদ্রুর এপারে অবস্থিত শিখ মিস্‌ল্‌গুলিকে আয়ত্তে আনিতে ব্যর্থকাম হন, শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগে অধিকার বিস্তারেরও কোন ক্ষমতা তাঁহার আর থাকে না। শতদ্রুর এপারে অবস্থিত অঞ্চলে তিনি তিনটি অভিযান পরিচালনা করেন। সাফল্য প্রায় তাঁহার করতলগত এমন সময় ব্রিটিশ সরকার তাহাতে বাদ সাধিলেন। লর্ড মিণ্টো তাঁহার দূত মেট্‌কাফের মারফৎ এইরূপ দাবি করিয়া বসিলেন যে রণজিৎ সিংহ যেন নিজের ক্রিয়াকলাপ শতদ্রুর পরপারে অবস্থিত ভূভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

রাখেন। ব্রিটিশ সরকারের গুরুগম্ভীর মনোভাব, ঠিক সেই সময়ে ব্রিটিশ শক্তির সম্মুখীন হইতে তাঁহার নিজের অক্ষমতা, শতদ্রুর পরপারে তাঁহার নিজেরই দিকে যে সকল শিখ নায়কের বাস ছিল তাঁহারা সঙ্কটকালে সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন, এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া শেষ অবধি তিনি ব্রিটিশ দাবি মানিয়াই লইলেন, এবং তাহারই ফলে ১৮০৯ সালের এপ্রিল মাসে হইল অমৃতসরের সন্ধি। তাহাতে শতদ্রু নদীকে সীমানা রূপে নির্ধারণ করা হইল; ব্রিটিশ দূতের আবির্ভাবের পূর্বে রণজিৎ সিংহ শতদ্রুর বামতীরে যে সকল স্থান জয় করিয়াছিলেন সেগুলি অবশ্য রহিল তাঁহারই অধিকারে।

রণজিৎ সিংহ কর্তৃক রাজ্যের বিস্তার সাধন ঃ অমৃতসরের সন্ধির পর রণজিৎ সিংহ পঞ্জাবের পার্বত্য রাজ্যসমূহ অধিকার করেন, মূলতানও তাঁহার কুক্ষিগত হয়। আফগানদের হাত হইতে তিনি কাশ্মীর কাড়িয়া লন, এবং কোহাট, টঙ্ক, বান্নু, ডেরা গাজী খাঁ, ডেরা ইসমাইল খাঁ এবং পেশোয়ার তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়া যায়। ব্রিটিশের হস্তক্ষেপ না ঘটিলে তিনি যে সিন্ধুও জয় করিয়া ফেলিতেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার অধিকার সমুদ্র অবধি বিস্তৃত হয়, ইহা ছিল ব্রিটিশ সরকারের একান্ত অনভিপ্রেত। শতদ্রু হইতে খাইবারের প্রবেশপথ এবং উত্তরে তিব্বতের একটি ক্ষুদ্র অংশ হইতে দক্ষিণে সিন্ধুদেশের সীমা অবধি ছিল রণজিৎ সিংহের রাজ্যের বিস্তার।

আফগানদের সহিত রণজিৎ সিংহকে বহুবার যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। ১৮১৩ সালে আটকের অনতিদূরে চর্চ নামক স্থানের সমভূমিতে এক খণ্ডযুদ্ধ হয়। দুর্‌রানী-রাজের উজীরের ইচ্ছা ছিল রণজিৎ সিংহ কিছুকাল পূর্বে যে আটকের দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন তাহার পুনরুদ্ধার সাধন; কিন্তু যুদ্ধে আফগানদের সম্পূর্ণ পরাভব ঘটে। ১৮২৩ সালে নওশেরায় আবার হয় এক খণ্ডযুদ্ধ; আফগানদের চেষ্টা হইল শতদ্রুর বামতীরে রণজিৎ সিংহের অধিকারের দৃঢ়তা সম্পাদনে বাধাদান। এবারও আফগানদের পরাজয় হয়। জামরুদ ও শুব কুদুর ছিল গিরিপথের উপর শিখদের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ; ১৮৩৭ সালে কাবুল-রাজ দোস্ত মহম্মদ সে দু'টি অধিকারের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠেন। আফগানবাহিনী দুর্গ দু'টি

অধিকারে অসমর্থ হয়, তবে এক হানাহানির মধ্যে তাহারা পেশোয়ারের শাসনকর্তা হরি সিংহ নালোয়ার প্রাণনাশ করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে স্বাধিকার রক্ষায় রণজিৎ সম্পূর্ণই সমর্থ ছিলেন, সীমান্তের বিভিন্ন উপজাতির নিয়ন্ত্রণেও তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

রণজিৎ সিংহের শাসন-ব্যবস্থা: রণজিৎ সিংহ এক সুদৃঢ় এবং কর্ম-তৎপর শাসন-ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেন। এ ব্যাপারে তাঁহার সর্বাপেক্ষা মহৎ গুণের কথা এই ছিল যে তিনি কোনরূপ সংস্কারের বশবর্তী না হইয়া সকল ধর্মেরই উপযুক্ত ব্যক্তিদের কার্যে নিয়োগ করিতেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে তিনি পাশ্চাত্ত্য আদর্শে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন; সৈন্যদের রণবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য আলার্দ (Allard), ভেঞ্চুরা (Ventura) এবং আরও কয়েকজন ফরাসী কর্মচারী তাঁহার অধীনে কাজ করিতেন। তাঁহার স্থায়ী বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০,০০০; অধিকাংশই ছিল পদাতিক; সকলকেই রাজভাণ্ডার হইতে সাজসরঞ্জাম ও বেতন দেওয়া হইত। তাঁহার কামানগুলি ছিল চমৎকার। "সুদক্ষ সামরিক কর্মচারীদের শিক্ষাধীনে শিখ-বাহিনীর অধস্তন সৈনিকেরা পৃথিবীর অধস্তন সৈনিকদের মধ্যে নিপুণতম যোদ্ধায় পরিণত হইয়াছিল। অপরাজেয় হইয়া উঠিবার জন্য তাহাদের অভাব ঘটিয়াছিল কেবল যথোপযুক্ত সেনানীবৃন্দের।"

রণজিৎ সিংহের কৃতিত্ব: রণজিৎ সিংহকে তাঁহার বর্ণজ্ঞানহীন মূর্খতা সত্ত্বেও ব্যবহারিক সদ্বুদ্ধির অবতার রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁহার সামরিক অভিযানে তিনি তাঁহার সেনানীদের এমনই খুঁটিনাটি নির্দেশ দানে অভ্যস্ত ছিলেন যে তাঁহাদের নিজেদের বুদ্ধিতে বড়-একটা কিছু করার অবকাশই হইত না। সেনানীবৃন্দ ও সৈনিকদের চিত্তে তিনি তাঁহার প্রতি এমনই এক অনুরাগ ও বিশ্বস্ততার ভাব উদ্রেক করিয়াছিলেন যে তাহাই তাঁহাদের কর্তব্য সাধনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। আফগানদের আক্রমণ হইতে তাঁহার সদ্যোজাত রাজ্যকে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত রক্ষা করাকে আমরা তাঁহার প্রধান কীর্তির মধ্যে গণ্য করিতে বাধ্য। একজন ভারতীয় শাসক—যিনি শিখ, হিন্দু ও মুসলমান সকল শ্রেণীর লোকেরই অনুরক্তিভাজন হইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন, নববলদৃপ্ত আফগানিস্তান এবং সীমান্তের দুর্ধর্ষ উপজাতি-

সমূহের কবল হইতে উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্তদেশ রক্ষার এবং কৃতিত্বের সহিত তাহা শাসন করার যাঁহার সামর্থ্য ছিল, যিনি সুশিক্ষা প্রদানের ফলে এমন এক সেনাবাহিনী সংগঠন করিয়া গিয়াছিলেন যে তাহার রণনৈপুণ্য ব্রিটিশ প্রতিদ্বন্দ্বীদের চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দিয়াছিল, যিনি কিয়দংশে হইলেও ভারতের জাতীয় জীবনে যাহার বিশেষ অভাব ছিল সেই শক্তি-মত্তার ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন—ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনি চিরকালই অনন্যসাধারণ পুরুষগণের পুরোভাগে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

রণজিৎ সিংহের উত্তরাধিকারিগণ ঃ রণজিৎ সিংহের জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য এবং যুবরাজ খড়ক সিংহের দুর্বল চরিত্রের জন্য তাঁহার চারিপাশে চতুর সভাসদ্‌গণ নানা দল-উপদল গড়িয়া তোলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় পরস্পর বিভেদ, অবিশ্বাস ও অনিয়ম। এই সবই শিখ-রাজতন্ত্রের পতন ত্বরান্বিত করিয়া দেয়। রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয় ১৮৩৯ সালের ২৭শে জুন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র খড়ক সিংহ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, কিন্তু ১৮৪০ সালের নভেম্বর মাসে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন, এবং তাহার পরদিনই তাঁহার পুত্র নও নিহাল সিংহ দৈবদুর্ঘটনায় অথবা চক্রান্তের ফলে প্রাণ হারান। এই নও নিহাল সিংহের চরিত্রেই তাঁহার পিতামহের বিস্তর গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে আসিয়া বর্তিয়াছিল। তখন সিংহাসনে অভিষিক্ত হন রণজিৎ সিংহের আর-এক পুত্র শের সিংহ। ১৮৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে আততায়ীর হস্তে তাঁহার প্রাণ যায়। এবার সৈন্যবাহিনীর হাতেই চলিয়া গেল রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব। সৈন্যবাহিনী নিজেকে জনগণের প্রতিনিধি জ্ঞান করিতে লাগিল, উহাই যেন হইয়া দাঁড়াইল খাল্‌সা। রণজিৎ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র দলীপ সিংহের বয়স তখন ছয় বৎসর; তাঁহাকেই রাজপদে অভিষিক্ত করা হইল। ঘটনাচক্র দ্রুতবেগে আবর্তিত হইতে লাগিল। রণজিৎ সিংহের জীবনের শেষ কয়েক বৎসরে যে সকল দল-উপদল গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার আর কোন চিহ্ন রহিল না; সেনাবাহিনীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাই হইয়া দাঁড়াইল চরম ব্যাপার; তাহারই নির্দেশে উজীরগণের বিনিয়োগ ও অপসারণ ঘটিতে লাগিল। ১৮৪৫ সালের দিকে লাহোরে অবস্থিত স্থায়ী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা হইয়া দাঁড়াইল প্রায় দ্বিগুণ। উহা আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল হইয়া উঠিল। ১৮৪৫ সালের নভেম্বর

মাসের প্রথমদিকে রাজা লাল সিংহ উজীর মনোনীত হইলেন, প্রধান সেনাপতির পদে সর্দার তেজ সিংহের নিয়োগ পাকা করা হইল।

লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫-৪৬)ঃ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল পঞ্জাবের সরকারী শাসনযন্ত্র অচিরেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে ; তাঁহারা প্রত্যন্তভাগের দুর্গগুলি সুরক্ষিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। শিখ সৈন্যদের মনে আবার ছিল এই প্রতিবেশীর ক্রমবর্ধমান শক্তির ভয়, তাহারা বুঝিয়াই উঠিতে পারিল না কেন 'শাসনকার্যে অকর্মণ্যতার নিদর্শনকে শত্রুভাব-প্রণোদিত দুরভিসন্ধি জ্ঞান করা হইবে।' মনে হয় শিখ সৈন্যগণ এবং ব্রিটিশ সরকার উভয় পক্ষেরই নিকট এই আসন্ন যুদ্ধ কেবলমাত্র আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। ইংরেজগণ কয়েকটি সৈন্যদল শতদ্রু অভিমুখে প্রেরণ করিল। এদিকে আবার শতদ্রুর এপারে অবস্থিত ব্রিটিশ এজেণ্ট মেজর ব্রডফুট এমন কতকগুলি কাণ্ড করিয়া বসিলেন যাহার শেষ পর্যন্ত একমাত্র অর্থই হইতে পারে যুদ্ধ ; শিখ-বাহিনীরও মনে এই বিশ্বাস জন্মিল যে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য। লাহোরের নায়কগণ এই মনোভাবকে নিজেদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য কার্যে প্রয়োগ করিলেন, যাহাতে সৈন্যদল বিনাশ প্রাপ্ত হয় সেজন্য তাঁহারা সেনাবাহিনীকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন।

শিখেরা ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে শতদ্রু অতিক্রম করিল, ইংরেজরাও তাহাদের বাধা দিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। শিখ নেতা লাল সিংহ ও তেজ সিংহ মুখে রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতি অনুরক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তাঁহারা 'কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ বিজয়ীদের দ্বারা এক পরাধীন রাজ্যের মন্ত্রিপদে বহাল হইবার জন্য উদ্গ্রীব' হইয়া উঠিয়াছিলেন। পর পর চারিটি যুদ্ধে মুদ্‌কী (ডিসেম্বর, ১৮৪৫), ফিরোজশহ্‌র (ডিসেম্বর, ১৮৪৫), আলিওয়াল (জানুয়ারী, ১৮৪৬) এবং সোব্রাওঁ (ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৬) এই কয়টি স্থানে শিখদের পরাভব ঘটিল, কিন্তু নেতৃত্বের ত্রুটি অপেক্ষা বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল এই ব্যর্থতার জন্য অধিকতর দায়ী। ফিরোজশহ্‌রের যুদ্ধ সম্পর্কে ম্যালেস্‌ন (Malleson) বলিয়াছেন, "এই সব সরল বীর সৈনিকের দল যে বিশ্বাসহন্তা সেনাপতিদের নির্দেশে পরিচালিত হইতেছে তাহা যদি

শুধু একটি বার বুঝিতে পারিত তবে জয়লাভ করিতে পারিত।" যাহা হউক, লাল সিংহ ও তেজ সিংহ আর সম্মুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন না, ইংরেজদের হাতে বিজয়মাল্য তুলিয়া দিয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। শিখ-বাহিনীর চিত্তের দৃঢ়তা এবং কঠিন সঙ্কল্প সত্ত্বেও নেতাদের 'গা বাঁচাইয়া চলার নীতি এবং নির্লজ্জ বিশ্বাসহানির' ফলে সোব্রাওঁয়ের যুদ্ধে তাহাদের পরাভব ঘটিল।

ইংরেজরা শতদ্রু পার হইয়া আসিয়া ১৮৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোর অধিকার করিয়া বসিল; কিছুকাল আলাপ-আলোচনার পর হইল এক সন্ধি। স্থির হইল জলন্ধর-দোয়াব ব্রিটিশদের সমর্পণ করিতে হইবে এবং শিখ-কোষাগার হইতে যুদ্ধের ব্যয়-বাবদ দিতে হইবে ১৫ লক্ষ স্টার্লিং। শিখ-বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা হ্রাসের শর্তও হইল। দেখা গেল যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে অর্থ দাবি করা হইয়াছে তাহার দুই-তৃতীয়াংশ মিটাইবার ক্ষমতাও শিখ-দরবারের নাই। দরবার তখন কাশ্মীর প্রদেশ ছাড়িয়া দিলেন, তাহা আবার দশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বেচিয়া দেওয়া হইল জম্মুর ডোগ্‌রা সর্দার গুলাব সিংহের কাছে। ইহাতে লাহোর রাষ্ট্রের আয়তন ক্ষুণ্ণ হইল। লাল সিংহ উজীরের পদেই বহাল রহিলেন। তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার-স্বরূপ এইভাবে তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ও ভয়ের পাত্র গুলাব সিংহকে তাঁহার পথ হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল। ১৮৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আবার হইল ইহারই এক অনুপূরক ব্যবস্থা; তদনুযায়ী দলীপ সিংহকে করা হইল ব্রিটিশের রক্ষণাবেক্ষণের অধীন। রাজ্যশাসনের ভার কার্যতঃ অর্পণ করা হইল ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট স্যার হেন্‌রী লরেন্সের হাতে; তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য লাহোরে রহিল একদল ব্রিটিশ সৈন্য। এইভাবেই ব্রিটিশ সরকার '(লাহোর) রাজের প্রত্যেকটি বিভাগের যাবতীয় কার্যকলাপ পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের সমুদয় কর্তৃত্ব' হস্তগত করিয়া বসিলেন।

লর্ড ডালহৌসী এবং দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-৪৯): ইহা ছিল লর্ড হার্ডিঞ্জের ব্যবস্থা। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসী দেখিলেন এ ব্যবস্থা কার্যকরী নয়। ১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসে মূলতানের শাসনকর্তা মূলরাজের নেতৃত্বে সেখানে হয় এক স্থানীয় বিদ্রোহ; তাহাতে দুইজন ব্রিটিশ কর্মচারীর প্রাণনাশ করা হয়। আবহাওয়ার উষ্ণতার

জন্য তখন তখনই কোন ব্রিটিশ অভিযান প্রেরণ করা হয় না। ইত্যবসরে বালক রাজার জননী রাণী ঝিন্দনকে তাঁহার ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের জন্য চুনারের দুর্গে নির্বাসন দেওয়া হয়। ঘটনাচক্র দ্রুতগতিতে আবর্তিত হইতে থাকে। হাজারার শাসনকর্তা ছত্র সিংহ বিদ্রোহ করেন। তাঁহার পুত্র

উত্তর-পশ্চিমে ব্রিটিশ অধিকার প্রসার

শের সিংহ ছিলেন দরবারের সৈন্যদলের অধিনায়ক; তিনি এই আন্দোলনে সম্মতি দান করেন; দেখিতে দেখিতে আন্দোলন চারিদিকে ছড়াইয়া

পড়ে। লর্ড ডালহৌসী স্থির করিলেন শিখেরা যখন যুদ্ধই চায় তখন "প্রাণ ভরিয়া তাহাদের যুদ্ধের সাধ মিটাইতে হইবে।"

শের সিংহ হইলেন শিখ বাহিনীর নেতা। চিলিয়ানওয়ালা (জানুয়ারী, ১৮৪৯) এবং গুজরাট (ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৯) নামক স্থান দু'টিতে দুইটি যুদ্ধ হইল। ব্রিটিশের দৃষ্টিতে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ ছিল 'এক ভয়াবহ ও কঠিন ব্যাপার।' তাহাতে শুধু যুদ্ধের বিধিবিধানের দিক দিয়াই সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্রিটিশদের জয়লাভ ঘটে। কিন্তু গুজরাটে ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড গাফ সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করেন। তবে ইহাও লক্ষণীয় যে "শিখদের চেয়ে ভালোভাবে যুদ্ধ করা অপর কোন বাহিনীর পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না, অপর কোন বাহিনীর পক্ষেই ইহার চেয়ে খারাপভাবে পরিচালিত হওয়াও ছিল অসম্ভব।" ১৮৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে মূলতান বিধ্বস্ত হইল। ১৮৪৯ সালের মার্চ মাসে ছত্র সিংহ ও শের সিংহ আত্মসমর্পণ করিলেন।

১৮৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসের সন্ধি অনুসারে ব্রিটিশ সরকারের ছিল পঞ্জাবের যাবতীয় ব্যাপার পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার, এবং লাহোরে অবস্থিত ব্রিটিশ বাহিনীর ব্যয়ভার বহনের জন্য লাহোর রাজ্য দিয়া আসিতেছিল বাৎসরিক ২২ লক্ষ টাকা। অতএব স্বভাবতঃই ব্রিটিশ সরকার ছিলেন তরুণ মহারাজার অভিভাবক ও রক্ষকস্থানীয়। ব্রিটিশের এই রক্ষণাবেক্ষণের বিরুদ্ধেই শিখ বাহিনী বিদ্রোহ করিয়াছিল। বিদ্রোহ দমন করা হইল, কিন্তু নিরপরাধ নাবালক মহারাজাকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না। কিন্তু লর্ড ডালহৌসীর উগ্র সাম্রাজ্যবাদ কোনরূপ নৈতিক এবং আইনগত বাধা মানিল না, ১৮৪৯ সালের ৩রা মার্চের এক ঘোষণাবলে পঞ্জাব আত্মসাৎ করিয়া লওয়া হইল। নাবালক মহারাজাকে একটি বৃত্তি প্রদান করিয়া অপসরণ করা হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক বিভিন্ন রাজ্য গ্রাস

লর্ড ডালহৌসীর শাসনকাল (১৮৪৮-৫৬) ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে একটি সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় অধ্যায়। তিনি যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন

তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর ; এদেশে আসিয়া তিনি এমনই অমানুষিক পরিশ্রম করিতে থাকেন যে অচিরেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় ; ফলে কার্য হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি আর বড় বেশিদিন বাঁচেন নাই। রাজকার্য পরিচালনার ব্যাপারে তিনি খুবই শ্রমশীল ছিলেন, এবং শাসক হিসাবেও মোটের উপর ছিলেন সদিচ্ছাসম্পন্ন। কিন্তু আজ অবধিও লোকে তাঁহাকে প্রধানতঃ একজন রাজ্যাপহারক বলিয়াই মনে রাখিয়াছে। অস্ত্রবলে তিনি গ্রাস করেন পঞ্জাব ও পেগু। কিন্তু অপর কয়েকটি রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য তিনি অস্ত্রবলের উপর নির্ভর করেন নাই, সে সকল ক্ষেত্রে তিনি করেন 'স্বত্বলোপ নীতি'র প্রয়োগ, অথবা আনেন কুশাসনের অভিযোগ।

স্বত্বলোপ নীতি ঃ 'স্বত্বলোপ নীতি' (Doctrine of Lapse) বলিতে বুঝায় যে, ব্রিটিশের অধীন কিংবা ব্রিটিশের সৃষ্ট কোন রাজ্যের রাজার যদি আপন সন্তান না থাকে তবে তাঁহার মৃত্যুর পর সে রাজ্যের অধিকার সার্বভৌম শক্তিতে (অর্থাৎ কোম্পানীতে) বর্তিবে ; এরূপ কোন রাজ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো কোন পোষ্যপুত্রের অধিকারে আসিবে না। তবে ইহাতে এরূপ স্বীকৃতিও ছিল যে ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ অনুমতি-সাপেক্ষে এরূপ রাজ্যের উত্তরাধিকার পোষ্যপুত্রে বর্তাইতেও পারে। ১৮৩৪ সালে ডিরেক্টর-সভা এইরূপ এক বিধান জারি করেন যে এইরূপ অনুমতি কেবল 'ব্যতিক্রম হিসাবেই দেওয়া চলিবে, নিয়ম হিসাবে নয়, এবং কোন ক্ষেত্রেই তাহা বিশেষ অনুগ্রহ ও গুণগ্রহণের নিদর্শনস্বরূপ না হইলে দান করা যাইবে না।' ১৮৪১ সালে আবার এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে 'ন্যায়সঙ্গত ভাবে এবং আত্মমর্যাদা রক্ষা করিয়া যে রাজ্যখণ্ড অথবা রাজস্ব লাভ করা যাইতে পারে তাহা' পরিহার করা চলিবে না। সুতরাং লর্ড ডালহৌসী এই কুখ্যাত 'নীতির' প্রবর্তক ছিলেন না। তাঁহার শাসনকালে যে এই নীতি কার্যে প্রয়োগের কয়েকটি প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ছিল নিতান্তই এক দৈবনির্দিষ্ট ঘটনা। তবে বৎসর কয়েক পূর্বে নীতি হিসাবে ব্যক্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য তিনি যে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রদর্শন করেন, এ কথা বলিলে তাঁহার অন্যায় সমালোচনা করা হয় না। "তিনি যে সকল রাজ্য গ্রাস করেন তাহার প্রত্যেকটিই গ্রাস করিবার যথোপযুক্ত কারণ তাঁহার পূর্বেও সমভাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাঁহার পূর্ববর্তী শাসকগণ এই মূলনীতি অনুসারে কাজ করিয়া

যান যে যদি কোন রাজ্য আত্মসাৎ না করিলে চলে তবে তাহা আত্মসাৎ না করাই উচিত; ডালহৌসী এই মূলনীতি অনুসারে কাজ করিতে থাকেন যে ন্যায়সঙ্গতভাবে যদি কোন রাজ্য আত্মসাৎ করা চলে তবে তাহা আত্মসাৎ করাই কর্তব্য।" এই যে একটি নীতি, যাহা ছিল হিন্দুদের ধর্মগত সংস্কার এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহা কঠোরহস্তে প্রয়োগের ফলাফল কী হইতে পারে তিনি বিচার করিয়া দেখেন নাই।

এই 'স্বত্বলোপ-নীতি'র যূপকাষ্ঠে প্রথম বলি হইল সাতারা রাজ্য। ১৮৪৮ সালে অপুত্রক অবস্থায় সাতারার রাজার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি ব্রিটিশ সরকারের অজ্ঞাতে এবং সম্মতি না লইয়াই এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ব্রিটিশের অনুগ্রহেই ১৮১৮ সালে সাতারা রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, সুতরাং এই পোষ্যপুত্র গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল তাঁহাদের অনুমোদন-সাপেক্ষ। তাহা অনুমোদন করা হইল না। ডিরেক্টর-সভা মন্তব্য করিলেন, "......এ বিষয়ে আমরা কৃতনিশ্চয় যে ভারতবর্ষের সাধারণ বিধিবিধান এবং আচার-অনুষ্ঠান অনুসারে সাতারার ন্যায় একটি পরাধীন রাজ্যের উত্তরাধিকার সার্বভৌম শক্তির সম্মতি-ব্যতিরেকে পোষ্যপুত্রে বর্তাইতে পারে না।"

১৮৫৩ সালে নাগপুরের ভোঁসলে রাজ্যেরও অনুরূপ দুর্দশা ঘটিল। অপুত্রক অবস্থায় রাজা মারা যান, তিনি কোন পোষ্যপুত্রও রাখিয়া যান না। কিন্তু ১৮১৮ সালে যে বিধি-ব্যবস্থা হয় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেও নাগপুরকে ব্রিটিশ-সৃষ্ট রাজ্যের পর্যায়ে গণ্য করা যায় কি না তাহাতে সন্দেহ থাকে। লী-ওয়ার্নার দেখাইয়াছেন যে সাতারা ও নাগপুরের ক্ষেত্রে লর্ড ডালহৌসী 'সাম্রাজ্যবাদীসুলভ বুদ্ধিবিবেচনা'র দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই কাজ করিয়াছিলেন: "......রাজ্য দু'টির অবস্থান ছিল বোম্বাই ও মাদ্রাজ এবং বোম্বাই ও কলিকাতার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার যে পথ তাহার ঠিক উপর দিয়াই। অতএব সাম্রাজ্যের সংহতি-বিধানের জন্য এ দু'টিকে কুক্ষিগত করার প্রয়োজন ছিল।"

১৮৫৩ সালে ঝাঁসির রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান; তাঁহার পোষ্যপুত্রকে সরাইয়া দিয়া রাজ্যটি অধিকার করা হয়। অনুরূপ কারণে বাঘাত ও উদয়পুর রাজ্যও কাড়িয়া লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল, পরে লর্ড ক্যানিং সে ব্যবস্থা নাকচ করিয়া দেন। ১৮৫০ সালে উড়িষ্যার অন্তর্গত

সম্বলপুর রাজ্যের রাজার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে রাজ্যটি কাড়িয়া লওয়া হয়। করৌলি রাজ্য আত্মসাৎ করার ব্যবস্থা ডিরেক্টর-সভা নাকচ করেন।

কয়েকজন ভারতীয় রাজার উপাধি এবং বৃত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। ইহা ছিল সেই 'স্বত্বলোপ নীতির'ই অনুসিদ্ধান্ত বিশেষ। প্রাক্তন পেশোয়া ২য় বাজী রাওয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বৃত্তি বন্ধ হইয়া গেল, তাঁহার দত্তকপুত্র নানা সাহেবকে আর বৃত্তি মঞ্জুর করা হইল না। পরে এই নানা সাহেবই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৮৫৩ সালে মারা গেলেন কর্ণাটকের নামশেষ নবাব; কাহাকেও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত বলিয়া স্বীকার করা হইল না। ১৮৫৫ সালে তাঞ্জোরের মারাঠা রাজার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে রাজপদেরই বিলোপ সাধন করা হইল।

অন্যান্য রাজ্য গ্রাসঃ ১৮৫০ সালে সিকিমের রাজা একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে আটক এবং দুইজন ব্রিটিশ প্রজার উপর উৎপীড়ন করেন; সেজন্য তাঁহার রাজ্যের একাংশ গ্রাস করা হয়। নিজাম কোম্পানীকে তাঁহার দেয় অর্থ প্রদানে অসমর্থ হন বলিয়া তাঁহাকে বেরারের ন্যায় উর্বর প্রদেশটির শাসনভার ব্রিটিশের হাতে তুলিয়া দিতে হয় (১৮৫৩)।

কুশাসনঃ অযোধ্যার নবাবগণ পুরুষ-পরম্পরায় রাজ্যশাসনে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছেন এই অজুহাতে অযোধ্যা রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হইল (১৮৫৬)। নবাবদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনীত হইয়াছিল তৎসমুদয়ের বিচার না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে লর্ড ওয়েলেস্‌লীর অধীনতামূলক মৈত্রী বিধানের অনিবার্য ফলস্বরূপই ভারতীয় রাজ্যগুলিতে কুশাসনের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। ইহার কুফল দায়িত্বশীল ব্রিটিশ রাজ-পুরুষদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। স্যার টমাস মন্‌রো অভিমত প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "যেখানেই এই অধীনতামূলক বিধান প্রবর্তন করা হইতেছে সেখানেই শ্রীহীন পল্লীগ্রাম ও জনসংখ্যা হ্রাসে প্রকট হইয়া উঠিতেছে ইহার ক্ষতচিহ্ন।" ১৮৪৮ সালে স্যার হেন্‌রী লরেন্স লেখেন, "যদি কখনও শাসন-কার্যে বিশৃঙ্খলা সাধনের কোন অব্যর্থ কৌশল অবলম্বন করা হইয়া থাকে তবে তাহা হইল দেশীয় রাজা এবং তাঁহার মন্ত্রী উভয়েরই বিদেশীর অস্ত্রবলের উপর নির্ভরতা এবং কোন ব্রিটিশ রেসিডেন্টের নির্দেশ পালন।" অধীনতা-

মূলক মৈত্রী প্রবর্তনের পর বহু বৎসর ধরিয়া হায়দরাবাদের প্রজারা ভয়ানক দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাইতে বাধ্য হয়। ১৮৩১ সালে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক মহীশূরের রাজাকে অকর্মণ্যতার জন্য বৃত্তি দিয়া সরাইয়া দেন; তাঁহার রাজ্য অর্ধ-শতাব্দীকাল ব্রিটিশের শাসনাধীন ছিল।

অযোধ্যা গ্রাস (১৮৫৬): ১৮০১ সালের সন্ধির পর অযোধ্যার আভ্যন্তরীণ অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতে থাকে; ইহার জন্য নবাবদের অকর্মণ্যতা কিয়দংশে দায়ী হইলেও, ইহার প্রধান কারণ ছিল অধীনতামূলক মৈত্রীর ক্রিয়া। শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণের কোনরূপ প্রকৃত ক্ষমতা নবাবের ছিল না, কেননা ব্রিটিশ রেসিডেন্টের মতৈক্য ব্যতীত কোন প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা যাইত না। তাঁহার জানা ছিল যতদিন তিনি রেসিডেন্টের নির্দেশ মানিয়া চলিবেন ততদিন তাঁহার অবস্থা নিরাপদ: ব্রিটিশ সৈন্যদল তাঁহাকে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের কবল হইতে রক্ষা করিবে। এইরূপ অবস্থায় নৈতিক দায়িত্ববোধ স্তিমিত হইয়া আসিল; এমন কি গভর্ণর-জেনারেলদের সনির্বন্ধ উপদেশ এবং ভীতিপ্রদর্শনেও কোনরূপ সুফল ফলিত না। ১৮৩১ সালে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ভয় দেখান যে অবস্থার উন্নতি না হইলে তিনি রাজ্যশাসনভার কাড়িয়া লইবেন। ১৮৩৭ সালে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড অযোধ্যা-রাজের[১] উপর এইরূপ এক সন্ধিশর্ত চাপাইয়া দেন যে, হয় তিনি শাসনকার্যের উন্নতি বিধান করিবেন, নতুবা ব্রিটিশ সরকারের হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলিয়া দিয়া মহীশূরের রাজার ন্যায় সামান্য বৃত্তিভোগীর পর্যায়ে নামিয়া যাইবেন। যদিও এই সন্ধি ডিরেক্টর-সভার অনুমোদন লাভ করে নাই, তবুও লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড এবং তাঁহার পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেলগণ এমন ভাবে কাজ চালাইতে থাকেন যাহাতে ইহা বৈধ বিধান বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। ১৮৪৭ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ এই সাবধানবাণীর পুনরাবৃত্তি করেন।

১৮৫৫ সালে অযোধ্যার রেসিডেন্ট কর্ণেল শ্লীম্যান ও কর্ণেল আউট্র্যাম উভয়ের বিবরণ হইতেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা গেল যে অযোধ্যার অবস্থা

১ লর্ড হার্ডিঞ্জ অযোধ্যার নবাবকে মোগল সম্রাটের নামেমাত্র কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করিয়া রাজকীয় উপাধি গ্রহণে প্ররোচিত করেন। নিজামকেও এই পথ অবলম্বনের পরামর্শদান করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তিনি অস্বীকৃত হন।

শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, কোনও উন্নতিরই আর আশা নাই। লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যাকে মহীশূরের পর্যায়ে আনিতে চাহিলেন: তাহাতে রাজা তাঁহার আনুষ্ঠানিক পদমর্যাদার অধিকারীই থাকিবেন, কিন্তু শাসনকার্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নির্বাহ হইবে। কিন্তু ডিরেক্টর-সভা রাজ্য গ্রাসেরই সঙ্কল্প করিলেন। তদনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। ওয়াজিদ আলী শাহ্‌কে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তিদান করিয়া কলিকাতায় দৃষ্টিবন্দী করিয়া রাখা হইল। শ্লীম্যান ছিলেন তীক্ষ্ণধী ও অভিজ্ঞ রাজকর্মচারী; অযোধ্যা গ্রাস তাঁহার নিকট একটি রাজনৈতিক প্রমাদ রূপে প্রতিভাত হইল।

কোম্পানীর আমলে গভর্ণর-জেনারেলগণ[২]

ওয়ারেন হেস্টিংস (অক্টোবর, ১৭৭৪—ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৫)[১]
[স্যার জন ম্যাক্‌ফার্‌সন (ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৫—সেপ্টেম্বর, ১৭৮৬)]
লর্ড কর্ণওয়ালিস (সেপ্টেম্বর, ১৭৮৬—অক্টোবর, ১৭৯৩)
স্যার জন শোর (অক্টোবর, ১৭৯৩—মার্চ, ১৭৯৮)
[স্যার এ. ক্লার্ক (মার্চ—মে, ১৭৯৮)]
লর্ড ওয়েলেস্‌লী (মে ১৭৯৮—জুলাই, ১৮০৫)
লর্ড কর্ণওয়ালিস (জুলাই—অক্টোবর, ১৮০৫)
[স্যার জর্জ বার্লো (অক্টোবর, ১৮০৫—জুলাই, ১৮০৭)]
১ম লর্ড মিণ্টো (জুলাই, ১৮০৭—অক্টোবর ১৮১৩)
লর্ড হেস্টিংস (অক্টোবর, ১৮১৩—জানুয়ারী, ১৮২৩)
[জন অ্যাডাম (জানুয়ারী—আগস্ট, ১৮২৩)]
লর্ড আমহার্স্ট (আগস্ট, ১৮২৩—মার্চ, ১৮২৮)
[উইলিয়ম বি. বেইলী (মার্চ—জুলাই, ১৮২৮)]

১ যাঁহারা অস্থায়ী ভাবে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহাদের নাম তৃতীয় [ ] বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

২ হেস্টিংস বাঙ্গালার গভর্ণর, নিযুক্ত হন ১৭৭২ সালের এপ্রিল মাসে। ১৭৭৪ সালের অক্টোবর মাসে রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে তিনি হন 'বাঙ্গালার' গভর্ণর-জেনারেল।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক (জুলাই, ১৮২৮—মার্চ, ১৮৩৫)[৩]

[স্যার চার্ল্‌স্‌ মেট্‌কাফ (মার্চ, ১৮৩৫—মার্চ, ১৮৩৬)]

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড (মার্চ, ১৮৩৬—ফেব্রুয়ারী, ১৮৪২)

লর্ড এলেনবরা (ফেব্রুয়ারী, ১৮৪২—জুন, ১৮৪৪)

[উইলিয়ম ডাব্‌লিউ. বার্ড (জুন—জুলাই, ১৮৪৪)]

১ম লর্ড হার্ডিঞ্জ (জুলাই, ১৮৪৪—জানুয়ারী ১৮৪৮)

লর্ড ডালহৌসী (জানুয়ারী, ১৮৪৮—ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬)

লর্ড ক্যানিং (ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬—নভেম্বর, ১৮৫৮)[৪]

---

৩ বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী হন 'ভারতের' প্রথম গভর্ণর-জেনারেল।

৪ ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে ভারত-শাসনের ভার কোম্পানীর হাত হইতে রাণীর হাতে চলিয়া গেলে পর ক্যানিং হন রাণীর অধীন রাজপ্রতিনিধি ও গভর্ণর-জেনারেল।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রশাসনিক ও সামাজিক পরিবর্তন

১৮১৩ সালের সনন্দ আইন (Chrter Act)ঃ পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে (ভারত-শাসন আইনে) ভারতীয় সরকারের গঠনতন্ত্র যেভাবে নির্দিষ্ট হয়, ১৭৮৪-১৮১৩ এই সময়ের মধ্যে তাহাতে কোনরূপ গুরুতর পরিবর্তন সাধন করা হয় নাই। ১৮১৩ সালে নূতন করিয়া সনন্দ (charter) দানের পূর্বে কোম্পানী ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপারে যে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল তাহার যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়। নেপোলিয়ন যে মহাদেশীয় বিধান (Continental System) প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহার ফলে ইউরোপের বন্দরগুলিতে ব্রিটিশজাতির ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল ; দেখা গেল কোম্পানী এতকাল ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসায়ের যে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিল তাহা আর চলিতে পারে না। তাই ১৮১৩ সালের সনন্দ আইনে সমস্ত ব্রিটিশ বণিককেই ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসায়ের সুযোগ দান করা হইল, কোম্পানীর রহিল কেবল চায়ের কারবারে আর চীনদেশের সহিত ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার। কোম্পানী আরও বিশ বৎসরকালের জন্য ভারতবর্ষে রাজ্য ও রাজস্বের স্বত্ব লাভ করিল, তবে সে স্বত্ব 'এই সকল ব্যাপারে······রাজশক্তির অসংশয়িত সার্বভৌমত্বের প্রত্যবায়জনক হইতে পারিবে না' (অর্থাৎ কোম্পানীর অধিকার ইংলণ্ডরাজের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীন থাকিবে), এই সর্তের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল। এইভাবে হইল ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যের সংবিধানগত অবস্থার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা-নির্দেশ। ব্যবসায়-সংক্রান্ত ব্যাপার এবং রাজস্ব-

সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক হিসাব রাখার নির্দেশও দান করা হইল। বোর্ড অব কন্ট্রোলের ক্ষমতা বাড়াইয়া দেওয়া হইল। জনপালন-কৃত্যক অর্থাৎ সিভিল সার্ভিস রহিল কোম্পানীরই কর্তৃত্বাধীন। এই সনন্দ আইনের একটি কৌতূহলোদ্দীপক বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহাতে শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের বিধান ছিল।

১৮৩৩ সালের সনন্দ আইনঃ ইহার বিশ বৎসর পরে যখন পরবর্তী সনন্দ দান করা হয় তখন ইংলণ্ডে হুইগ দলের নীতির জয়জয়কার পড়িয়া গিয়াছিল; তাই সে সনন্দেরও ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইল হুইগ-নীতি। মেকলে তখন ছিলেন বোর্ড অব কন্ট্রোলের কর্মসচিব; বেন্থাম-শিষ্য স্বনামধন্য ঐতিহাসিক জেম্‌স্ মিল ছিলেন ইণ্ডিয়া হাউসে (অর্থাৎ কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে) এক বিশেষ উচ্চপদে সমাসীন। ১৮৩৩ সালের সনন্দ আইনে ইহাদের দুইজনের প্রভাব স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।

এবার কোম্পানীকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা হারাইতে হইল। আরও বিশ বৎসরের জন্য কোম্পানী 'মহামহিম ব্রিটেনাধিপ, তাঁহার উত্তরাধিকারিবৃন্দ ও অনুবর্তিগণের প্রতিভূরূপে' ভারতীয় রাজ্য শাসনের অধিকার লাভ করিল। 'বাঙ্গালার' গভর্ণর-জেনারেল এবার হইয়া দাঁড়াইলেন 'ভারতের' গভর্ণর-জেনারেল। চারিজন সদস্য লইয়া তাঁহার কাউন্সিল (পরিষদ) গঠনের ব্যবস্থা হইল, তন্মধ্যে একজনের উপর থাকিবে কেবল আইন প্রণয়নের ভার; প্রয়োজন-বোধে প্রধান সেনাপতিকে অতিরিক্ত সদস্যরূপে গ্রহণের বিধানও রহিল। বাঙ্গালাদেশ শাসনের জন্য গভর্ণর-জেনারেলই বাঙ্গালার গভর্ণর রহিলেন, তবে কার্যক্ষেত্রে তাঁহার দায়িত্বভার লাঘবের জন্য আইনে একজন ডেপুটি গভর্ণর নিয়োগের বিধানও দেওয়া হইল। স্থির হইল বোম্বাই এবং মাদ্রাজের গভর্ণরের কাউন্সিল (পরিষদ) দুইজন করিয়া সদস্য লইয়া গঠিত হইবে।

এই আইনে ভারতবর্ষে আইন-প্রণয়নের ব্যাপারে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়। বোম্বাই এবং মাদ্রাজ উভয় স্থানের সরকারই আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা হারাইলেন; সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্য আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইল সপারিষদ গভর্ণর-জেনারেলকে। পরিষদের চতুর্থ সদস্যের উপর রহিল আইন-প্রণয়নের বিধিনিষেধ-সংক্রান্ত মন্ত্রণা দানের ভার।

নীতির দিক দিয়া তিনি কেবল আইন-প্রণয়নের সময়ই পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের এবং ভোট দিবার অধিকার লাভ করিলেন। মেকলে ছিলেন এই পদের প্রথম অধিকারী; ডিরেক্টরবর্গের অভিপ্রায় অনুসারে কার্যকালে তাঁহাকে পরিষদের সকল অধিবেশনেই যোগদান করিতে দেওয়া হইত। ভারতীয় আইনসমূহ সংহত, লিপিবদ্ধ এবং সংশোধন করিবার জন্য একটি আইন কমিশন গঠন করা হইল।

লর্ড কর্ণওয়ালিস যাবতীয় উচ্চপদ হইতেই ভারতীয়গণকে বঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ১৭৯৩ সালের সনন্দ আইনেও এরূপ বিধানই দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু মন্‌রো, ম্যাল্‌কম ও এল্‌ফিন্‌স্টোনের ন্যায় অভিজ্ঞ শাসকগণ উহা সমর্থন করেন নাই। ১৮৩৩ সালের আইনে এইরূপ বিধান দেওয়া হইল যে, কোন ভারতীয় অথবা ভারতবর্ষে বসবাসকারী জন্মগতসূত্রে ব্রিটিশরাজের প্রজা তাহার ধর্ম, জন্মস্থান, বংশ, বর্ণ, অথবা এগুলির যে-কোনও একটির জন্য কোম্পানীর কাজে কোনও পদাধিকারেরই অযোগ্য বিবেচিত হইবে না। অবশ্য কার্যক্ষেত্রে এই সদভিপ্রায় খুব কমই প্রয়োগ করা হয়।

১৮৫৩ সালের সনন্দ আইনঃ পরবর্তী আইন হইল দুই বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে একটা আপোষরফার ফল। যাঁহারা কোম্পানীর শাসনাধিকার রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারা এই বিধানে সন্তুষ্ট হইলেন যে, পার্লামেণ্ট যতদিন না অন্যরূপ নির্দেশ দান করে ততদিন রাজশক্তির প্রতিভূরূপে কোম্পানীই ভারত শাসন করিতে থাকিবে। যাঁহারা কোম্পানীর শাসনের পরিবর্তে রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণ চাহিতেন তাঁহারাও ইহা দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন যে, ডিরেক্টরগণের সংখ্যা ২৪ হইতে ১৮-য় নামাইয়া আনা হইল এবং বিধান হইল যে এই ১৮ জন ডিরেক্টরের মধ্যে ৬ জন হইবেন রাজশক্তির দ্বারা মনোনীত ব্যক্তি; অধিকন্তু 'কোরাম' অর্থাৎ যে স্বল্পতম-সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি ভিন্ন কোন সভার অধিবেশন হইতে পারে না তাহার সংখ্যাও এমনভাবে হ্রাস করা হইল যে সময়বিশেষে 'রাজকীয় ডিরেক্টরগণ'ও অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সমর্থ হইবেন। ডিরেক্টরগণ এতদিন কর্মচারী নিয়োগের যে অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা হারাইলেন; স্থির হইল অতঃপর প্রতিযোগিতামূলক

পরীক্ষার দ্বারা কোম্পানীর কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতির অবস্থার উন্নতি হইল; তিনি রাজ্যসচিবের (Secretary of State) সমপর্যায়ভুক্ত হইলেন।

বাঙ্গালাদেশের শাসনকার্য নির্বাহের জন্য একজন গভর্ণর অথবা লেফ্‌টেন্যাণ্ট-গভর্ণর নিয়োগের বিধান হইল। ১৮৫৪ সালে একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট-গভর্ণর নিযুক্তও হইলেন। গভর্ণর-জেনারেলের পরিষদের চতুর্থ সদস্যকে (অর্থাৎ আইন সদস্যকে) দান করা হইল পূর্ণ পদমর্যাদা এবং সকল ব্যাপারেই ভোটদানের ক্ষমতা। আইন-প্রণয়নের জন্য হইল কয়েকটি বিশেষ বিধান। পরিষদেরও আয়তন-বৃদ্ধি হইল; স্থির হইল নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া পরিষদ গঠিত হইবে—গভর্ণর-জেনারেল, প্রধান সেনাপতি, পরিষদের সদস্য চতুষ্টয়, স্থানীয় সরকারের দ্বারা মনোনীত প্রত্যেকটি প্রদেশের এক-একজন প্রতিনিধি, বাঙ্গালার প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের অপর একজন বিচারপতি। আরও দুইজন সদস্যও লওয়া যাইত, তবে কার্যকালে এই ইচ্ছাধীন ব্যাপার প্রযুক্ত হয় নাই। জনকয়েক ভারতীয় সদস্য গ্রহণের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। এই যে বর্ধিতায়তন পরিষদ, ইহাকে পূর্বে যে ক্ষুদ্রায়তন পরিষদ কেবল নির্বাহী কাজকর্ম লইয়াই ব্যাপৃত থাকিত (Executive Council) তাহা হইতে স্বতন্ত্ররূপে ব্যবস্থাপক-পরিষদ (Legislative Council) আখ্যা দান করা যাইতে পারে। ইহার অধিবেশনে দর্শকদের প্রবেশাধিকার ছিল, অধিবেশনের কার্যবিবরণী সাধারণ্যে প্রকাশও করা হইত।

লর্ড হেস্টিংসের শাসন-সংস্কার ঃ যুদ্ধবিগ্রহের ব্যস্ততার মধ্যেও লর্ড হেষ্টিংস শাসন-সংস্কারে মনোনিবেশের অবসর পান। বার্লো কোম্পানীর আর্থিক সঙ্কটমোচনের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া গিয়াছিলেন তাহা যুদ্ধবিগ্রহের প্রচুর ব্যয়ভার সত্ত্বেও চালাইয়া যাওয়া হইতে থাকে; ফলে তাঁহার শাসনকালের শেষভাগে সরকারী আমানতী পাট্টার দর বেশ চড়িয়া যায়।

১৮১৩ সালের সনন্দ নূতন করিয়া দিবার সময় ইংলণ্ডে যে বিতর্ক আরম্ভ হয় তাহার ফলে ভারতের শাসন-সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহলের সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮১২ সালে প্রকাশিত হয় বিখ্যাত 'পঞ্চম বিবরণী' (Fifth Report); ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকে তদ্বিষয়ের উহাই হইল আমাদের উৎকৃষ্টতম

তথ্যপঞ্জী। যে সকল রাজকীয় ধর্মাধিকরণে ব্রিটিশ বিচারকগণ বিচারকার্য পরিচালনা করিতেন সেগুলির উপর চাপ কমাইবার জন্য বোর্ড অব কণ্ট্রোল ছোটখাটো মামলা বিচারের জন্য পুরাতন পঞ্চায়েৎ প্রথা পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব করেন। বোম্বাই সরকার ও মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক প্রস্তাব গৃহীতও হয়। বাঙ্গালাদেশে লর্ড হেষ্টিংস বিচারবিভাগের অধস্তন ভারতীয় কর্মচারীদের বেতন ও সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। কর্ণওয়ালিস বিচার-কৃত্যক ও রাজস্ব-কৃত্যক (Revenue Service) পৃথকী-করণের যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন তাহার নানারূপ অসুবিধা ইহার পূর্ব হইতেই অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। তাই সব কয়টি প্রেসিডেন্সিতেই ক্রমশঃ সমাহর্তা (Collector) ও জেলা-শাসকের (District Magistrate) পদদু'টির একত্রীকরণ হয়। আরক্ষা-বিভাগের জন্য প্রবর্তিত হয় একদফা সংশোধিত বিধিনিষেধ।

মাদ্রাজে স্যর টমাস মন্‌রো পুরাতন রায়ৎওয়ারী বিধানের পুনঃপ্রবর্তন করেন, তবে বর্তমান ব্যবস্থার প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয় আরও পরে—১৮৫৫ সালে। এই ব্যবস্থায় কৃষকগণ জমিদারদের মারফৎ রাজস্ব প্রদানের পরিবর্তে সরাসরি নিজেরাই তাহা রাজসরকারে জমা দিত। জমিদারী ব্যবস্থায় জমির উপর নির্বূঢ় স্বত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে ; রায়ৎওয়ারী ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয় মৌরসী স্বত্বে জমি ভোগদখল ও হস্তান্তর করার অধিকার।

মাউন্টস্টুয়ার্ট এল্‌ফিন্‌স্টোনের নামের সহিত বিজড়িত বোম্বাইয়ের ভূমিবণ্টন-ব্যবস্থার সহিত মাদ্রাজের ব্যবস্থার সাধারণভাবে মিল ছিল। ব্যবস্থাপনার দিক দিয়া উহাকে 'জরিপ-মূলক ব্যবস্থা' (survey tenure) নামে বর্ণনা করা হইয়া থাকে।

১৮২২ সালে এক বিশদ বিধানে আগ্রা প্রদেশে জমি জরিপ ও রাজস্ব নির্ধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুযায়ী ১৮২২ সালেই কাজ সুরু হয় বটে, তবে ১৮৩৩ সালেই প্রথম আর. এম. বার্ড তাহা ফলপ্রসূ ভিত্তির উপর স্থাপন করেন এবং ১৮৪৩ ও ১৮৫৩ সালের মধ্যে উহার সংহতি-বিধান হয়।

অনগ্রসর অথবা নবলব্ধ অঞ্চলসমূহের শাসনকার্য নির্বাহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ('নন-রেগুলেশন' বিধান অর্থাৎ যে বিধান যথানিয়মে সুনির্দিষ্ট নয়

তাহা) প্রবর্তিত হয় লর্ড হেষ্টিংসের আমলে, তবে লর্ড আম্‌হার্স্টের সময়ই তাহা বিশদীভূত হয়।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের শাসন-সংস্কার ঃ বেন্টিঙ্ক ১৮০৩-১৮০৭ সালে মাদ্রাজের গভর্ণর রূপে কাজ করিতেন। ভেলোরের বিদ্রোহের সময় তিনি যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই বলিয়া ডিরেক্টর-সভা তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়া তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া লইয়া যান। পুনরায় তিনি ভারতবর্ষে আসেন ১৮২৮ সালে। গভর্ণর-জেনারেল রূপে তাঁহার শাসনকাল কোনরূপ সামরিক অথবা কূটনৈতিক কীর্তি অর্জনের জন্য বিখ্যাত নয়। সম্ভবতঃ এইজন্যই থর্নটন বলিয়াছেন যে তিনি 'একমাত্র স্যার জর্জ বার্লো ব্যতীত ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভকাল হইতে অন্যান্য আর যাঁহারা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন তাঁহাদের সকলেরই তুলনায় ভারতের কল্যাণ সাধন এবং তাঁহার নিজের যশ অর্জনের জন্য সামান্য কাজই' করিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে শাসন পরিষদে তাঁহার সহকর্মী মেকলে তাঁহাকে প্রজাহিতৈষী শাসক রূপে বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে "তিনি প্রাচ্য স্বৈরাচারের মধ্যে আনয়ন করেন ব্রিটিশের স্বাধীন মনোবৃত্তি ; এ কথা সর্বদাই তাঁহার স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিত যে শাসিতের মঙ্গলবিধানই শাসনকার্যের উদ্দেশ্য ; নিষ্ঠুর প্রথাসমূহের বিলোপ সাধন করেন তিনি, দূর করিয়া দেন যত হীনতাজনক পার্থক্য ; জনমতের স্বাধীন অভিব্যক্তি তাঁহার অনুমোদিত ছিল ; যে শাসন-সংস্থার দায়িত্বভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল তাহার নৈতিক ও মানসিক প্রকৃতির উন্নতি বিধান সততই ছিল তাঁহার প্রযত্নের বিষয়ীভূত।" তাঁহার নামের সহিত যে সকল সংস্কারকার্য বিজড়িত হইয়া আছে তৎসমুদয় প্রণিধান করিলে উদাত্ত কণ্ঠের এই মুখর স্তুতিভাষণের খানিকটা সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্যয়বহুল ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে ভারতের আর্থিক সঙ্গতির ভয়ানক টান পড়িয়াছিল। তাই বেন্টিঙ্কের প্রথম কাজ হইল ব্যয়সঙ্কোচ। এ বিষয়ে ডিরেক্টর-সভাও তাঁহাকে কঠোর নির্দেশ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সৈন্য বাহিনীর সেনানীগণ শান্তিকালেও যে 'আধা-বাট্টা' অর্থাৎ যুদ্ধের ভাতা পাইতেন তিনি তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন ; ইহাতে তিনি বিশেষ অপ্রিয় হইয়া উঠেন। তারপর হইল অসামরিক শাসন বিভাগের ব্যয়হ্রাস। তাহারই সঙ্গে সঙ্গে হইতে লাগিল আয়বৃদ্ধির চেষ্টা। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে রবার্ট বার্ড

ভূমি-রাজস্বের যে বন্দোবস্ত করেন তাহা 'রাষ্ট্রের আয়বৃদ্ধি এবং জনগণের সুখসমৃদ্ধি বিধানের পথ প্রস্তুত করিতে সমভাবে ফলপ্রদ হইয়া উঠিল।' বন্দোবস্ত হইয়াছিল পল্লীসমাজের সঙ্গে, বন্দোবস্তের মেয়াদ হয় ত্রিশ বৎসর। ইহা অবশ্য যৌথ মালিকানা স্বত্বের ব্যাপার ছিল না। রাজস্ব প্রদানের দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছিল সমবেতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে মোটের উপর নিবিড় সূত্রে আবদ্ধ এক-একটি জনসমষ্টির উপর। মালবের আফিম ব্যবসায় সম্পর্কে এক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সরকারের আয়বৃদ্ধি হয়। আর্থিক ব্যাপারে বেন্টিঙ্কের শাসন-ব্যবস্থা মোটের উপর বেশ ফলপ্রসূই ছিল। ঘাটতিকে তিনি বাড়্তিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বেন্টিঙ্ক বিচার বিভাগেও কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রবর্তন করেন। কর্ণওয়ালিস যে সকল প্রাদেশিক আপীল-আদালত (Provincial Courts of Appeal and Circuit) সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন সেগুলি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল কেবলমাত্র 'এই কৃত্যকের যে সকল সদস্যকে উন্নততর দায়িত্বভার গ্রহণে অক্ষম বিবেচনা করা হইত তাঁহাদের বিশ্রামের স্থান'। এগুলি তুলিয়া দেওয়া হইল। এই ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে একই সঙ্গে হইল ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা এবং অনর্থক অর্থের অপচয় নিবারণ। বিচার বিভাগের কার্যে ভারতীয়গণকে নিয়োগ করার যে বিধি ছিল, তাহার প্রয়োগ-ক্ষেত্রের প্রসার সাধন করা হইল; তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও বাড়িয়া গেল। শাসক (Magistrate) ও সমাহর্তৃগণ (Collector) হইয়া দাঁড়াইলেন কমিশনারদের (Commissioners of Revenue and Circuit) পরিদর্শনাধীন; কমিশনারবর্গের প্রতি এইরূপ নির্দেশ দান করা হইল যে তাঁহারা যেন প্রায়শঃ ভ্রমণের মধ্য দিয়া সদাসর্বদা জন-সংযোগ রক্ষায় যত্নশীল থাকেন। ফার্সির পরিবর্তে মাতৃভাষা হইয়া দাঁড়াইল ধর্মাধিকরণের ভাষা। যে স্বচ্ছ দৃষ্টির বলে বেন্টিঙ্কই সর্বপ্রথম শাসন ব্যাপারের প্রকৃত কার্যকরী ও ফলপ্রদ কাঠামো তৈয়ারি করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন সেজন্য স্মিথ সঙ্গতভাবেই তাঁহাকে সাধুবাদ করিয়াছেন।

বেন্টিঙ্কের সমাজ-সংস্কার ঃ সাধারণ ভারতবাসীর স্মৃতিপটে বেন্টিঙ্ক আজ জনহিতৈষী সমাজ-সংস্কারকগণের মুখপাত্ররূপে অমর হইয়া আছেন।

সমাজ-শৃঙ্খলার বৈরী ঠগ দস্যুদলের দমনকল্পে লর্ড হেস্টিংস এবং লর্ড আমহার্স্ট প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বেন্টিঙ্কই তাহাদের উচ্ছেদ সাধনে সকলকাম হন। এ কার্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন নর্মদা অঞ্চলে গভর্ণর-জেনারেলের এজেন্ট এফ. সি. স্মিথ এবং তাঁহার স্বনামধন্য যুগ্ম-কর্মসচিব মেজর স্লীম্যান।

১৮২৯ সালে নিবারিত হয় সতীদাহ প্রথা। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলেই ইহা হইতে লোককে বিরত করার চেষ্টার জন্য ব্রিটিশ কর্মচারীদের উপর বিশেষ নির্দেশ ছিল, তবে তাঁহাদিগকে ইহা প্রতিরোধের কোনরূপ ক্ষমতা দান করা হয় নাই। লর্ড ওয়েলেস্‌লী এ বিষয়ে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত হইবে তাহা নিরূপণের ভার অর্পণ করেন সদর নিজামত আদালতের বিচারপতিগণের উপর; তাঁহারা ইহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধনের পরিবর্তে কতকগুলি নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। কিন্তু ১৮১৩ সালে লর্ড মিণ্টো তাঁহাদের সুপারিশগুলি এক ইস্তাহারের মারফৎ বিচার-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষগণের প্রতি নির্দেশস্বরূপ প্রেরণ না করা পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয় নাই। স্থির হয় কোন শাসক (Magistrate) অথবা আরক্ষা-অধিকারকের (Police officer) বিনা অনুমতিতে এবং আরক্ষা-বিভাগের কর্মচারীদের অনুপস্থিতিতে কোনও বিধবাকে জীবন্ত অবস্থায় চিতানলে দগ্ধ করা যাইবে না। কিন্তু এই সকল সাবধানতা অবলম্বনে বিশেষ কোনরূপ ফলোদয় হয় না; ১৮১৮ সালে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীতেই ৮০০ বিধবা চিতানলে প্রাণত্যাগ করে। পাছে হিন্দুদের ধর্মভাবে কোনরূপ আঘাত লাগে এজন্য লর্ড আমহার্স্ট বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন, তিনি মনে করিতেন সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধনে যে 'কুফল দেখা দিবে তাহা এই প্রথার কুফলের তুলনায় কোটি কোটি গুণ বেশি'। কিন্তু বেন্টিঙ্ক একেবারে চরম ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিয়াছিলেন। সদর নিজামত আদালতের বিচারপতিগণের এবং রামমোহন রায় ও 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুরের ন্যায় প্রগতিশীল হিন্দুদের সমর্থন লাভে তাঁহার শক্তিবৃদ্ধি ঘটিল।

দাসপ্রথার উচ্ছেদ সাধনঃ ১৮৩৩ সালের সনন্দ আইনে গভর্ণর-জেনারেলের প্রতি ক্রীতদাসদের অবস্থার উন্নতি বিধান এবং শেষ অবধি ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ সাধনের নির্দেশ ছিল। ১৮৪৩ সালে লর্ড

এলেনবরা এক আইন জারি করিয়া ভারতবর্ষে দাসপ্রথার আইনগত স্বীকৃতি নিরোধ করেন। উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলে ছিল ভয়াবহ নরবলি প্রথার অস্তিত্ব, লর্ড হার্ডিঞ্জ তাহা নিবারণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

শিক্ষাব্যবস্থা ঃ প্রাচ্য বিদ্যার উন্নতিকল্পে ওয়ারেন হেষ্টিংস ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৮১৩ সালের সনন্দ আইন বিধিবদ্ধ না হওয়া অবধি জনগণের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বীকৃত হয় নাই। ভারতীয় রাজন্যবর্গের অধীন রাজ্যসমূহে ব্রিটিশ অধিকারের ক্রমশঃ প্রসার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর কুফল বিস্তার করিয়াছিল। লর্ড মিণ্টোর মতে, "ভারতবর্ষে সাহিত্যের প্রতি বর্তমান অবহেলার প্রধান কারণ সন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় পূর্বে রাজন্যবর্গ, দলনেতৃগণ এবং দেশীয় সরকারগুলির অধীনে বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ যে পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন অধুনা তাহার অভাব ঘটিয়াছে।"

১৮১৩ সালের সনন্দ আইনে এইরূপ এক বিধান দেওয়া হয় যে "...... সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতিবিধান এবং ভারতবর্ষের দেশীয় পণ্ডিতগণকে উৎসাহ দানের জন্য, এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত অঞ্চলসমূহের অধিবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের প্রবর্তন ও উন্নয়ন কল্পে প্রত্যেক বৎসর অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা নির্ধারিত করিয়া তাহা ব্যয় করিতে হইবে।" শিক্ষা বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বীকার হিসাবে এই সুপ্রসিদ্ধ উক্তিটি ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশজাতির সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণাবলীর অন্যতম রূপে স্মরণযোগ্য। কিন্তু ভারতবাসীদের অজ্ঞতার অন্ধকারে ফেলিয়া রাখার পক্ষপাতী বড় বড় লোকের তখনও কোনও অভাব ছিল না, তাই লর্ড হেষ্টিংসকে উহার প্রতিবাদে বলিতে হইয়াছিল ঃ "জনগণের মধ্যে তথ্য বিস্তারের ফলে তাহাদের চিত্তবৃত্তি পূর্বাপেক্ষা অনমনীয় হইয়া উঠে এবং কর্তৃপক্ষের প্রতি তাহাদের আনুগত্য হ্রাস পায়, এই ভ্রমাত্মক ধারণার দ্বারা বর্তমান সরকার কখনই প্রভাবিত হইবেন না।"

সরকারী দৃষ্টিতে বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠিবার পূর্বেই কলিকাতার প্রগতিশীল হিন্দুগণ উদারহৃদয় স্কটিশ ঘড়ি-নির্মাতা ডেভিড হেয়ারের আনুকূল্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার মূল্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন, এবং ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষে শিক্ষার ইতিহাসে ইহা ছিল একটি

চূড়ান্ত তাৎপর্যময় পদক্ষেপ। ১৮৩৫ সালে ইহার ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০০। সাধারণ্যে গৃহীত মতবাদ এই যে ভারতবর্ষের সর্বত্র ইংরেজী শিক্ষা যেভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছে সেজন্য আমরা লর্ড মেকলের নিকট ঋণী। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী সংগঠিত শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্য বিদ্যা অনুশীলনের প্রারম্ভকাল ১৮৩৫ সালের পরিবর্তে বরং ১৮১৭ সাল ধরাই অধিকতর সমীচীন। বোম্বাই শিক্ষাসমাজ (Bombay Education Society) গঠিত হয় ১৮১৫ সালে। ১৮২২ সালে স্যার টমাস মন্‌রো মাদ্রাজে শিক্ষা-ব্যাপারের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে এক তদন্তের ব্যবস্থা করেন। ১৮৩৫ সালে দেখিতে পাওয়া যায় বাঙ্গালা ও বোম্বাইয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ইতিপূর্বেই শুরু হইয়া গিয়াছে এবং মাদ্রাজেও তাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে পত্তনের মুখে।

অনেকেরই মনে এইরূপ একটি ধারণা আছে যে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বুঝি মেকলের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে বিমূঢ় হইয়াই তাঁহার মতে সায় দিয়া ফেলিয়াছিলেন। ট্রেভেলিয়নের আলঙ্কারিক ভাষায়, "ইউরোপের সাহিত্য যখন এশিয়ার সাহিত্যের সহিত ওজনে তুলাদণ্ডে কম্পিত হইতেছিল, তখন ইউরোপীয় সাহিত্যের গুণগানে মুখর হইয়া উহার পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রসর হন মেকলে।" কিন্তু বেণ্টিঙ্ক তৎপূর্বেই ছিলেন ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার পরম অনুরাগী। ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার অনুরাগিগণ ইতিপূর্বেই চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কিত শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ও কলিকাতা মাদ্রাসায় চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষাদান বন্ধ করিবার জন্য আদেশও দেওয়া হইয়াছিল। রাষ্ট্র কোন্ শিক্ষার পক্ষপাতী তাহা ইতিপূর্বেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। মেকলের নিবন্ধ—তাঁহার ওজস্বিনী আলঙ্কারিক ভাষা—সেই চিন্তাধারাকে চরম পরিণতি দান করে এবং তাহাতে সংগ্রামাত্মক ভাব আরোপ করে।

হিন্দু কলেজ স্থাপনের প্রায় বিশ বৎসর পরে বাঙ্গালাদেশে শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য বেণ্টিঙ্ক নিয়োগ করেন উইলিয়ম অ্যাডামকে; ইনি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের একজন বন্ধু। তিনি যে সকল রিপোর্ট (বিবরণী) দাখিল করেন, মেকলের মতে তাহা ছিল 'জন-সমক্ষে উপস্থাপিত শিক্ষা-সম্পর্কিত সর্বোত্তম সংক্ষিপ্ত তথ্যপঞ্জী।' কিন্তু এই সকল রিপোর্ট কেবল মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যের আকরস্বরূপ হইয়াই রহিল, সরকারের

কর্মনীতি নিয়ন্ত্রণে এগুলি কোনও কাজেই আসিল না। অ্যাডামের রিপোর্ট-সমূহ প্রণয়নের পূর্বেই বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ তারিখের সেই সুপ্রসিদ্ধ প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন: "সপারিষদ গভর্ণর-জেনারেলের অভিমত এই যে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসার সাধনই ব্রিটিশ সরকারের মহৎ উদ্দেশ্যরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত; এবং শিক্ষাবিস্তারের জন্য নির্দিষ্ট যাবতীয় অর্থ একমাত্র ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা।" এ কথা প্রায় সর্বজনবিদিত যে এই সিদ্ধান্ত ছিল প্রধানতঃ মেকলের প্রভাবের ফল—এবং প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে তাঁহার যে ধারণা জন্মিয়াছিল তাহা এই হাস্যকর উক্তিতে ব্যক্ত হয় যে "ভারতবর্ষ ও আরবের যাবতীয় দেশীয় সাহিত্যের জন্য যে-কোনও মাঝারি গোছের ইউরোপীয় গ্রন্থাগারের একটিমাত্র তাকই যথেষ্ট।" যে সকল সরকারী কর্মচারী প্রাচ্যবিদ্যার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহাদের নেতা ছিলেন সরকারের কর্মসচিব এইচ. টি. প্রিন্সেপ, এবং এই দলের অধিকাংশই ছিলেন কোম্পানীর পুরাতন কর্মচারী। বেন্টিঙ্ক কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এই দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি লোপ পায়। তবে প্রাচ্যবিদ্যার সমর্থক দল এইটুকু সাফল্য লাভ করেন যে উক্ত প্রস্তাবে ইংরেজী বিদ্যার প্রতি যে আতিশয্য প্রদর্শন করা হইয়াছিল তাহা পরিত্যক্ত হয়; সরকারের আনুকূল্যেই সংস্কৃত ও আরবীর চর্চাও চলিতে থাকে। তবে ভারতবর্ষে শিক্ষার ধারা এক নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে শুরু করে, তদবধি ইহা প্রধানতঃ সেই একই খাতে চলিতেছে। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন যে যাহারা ইংরেজী জানে তাহাদিগকেই সরকারী কাজে নিয়োগের সময় প্রাধান্য দান করা হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক দলের ব্রিটিশ ও ভারতীয় মুখপাত্রদের সদুপদেশ অপেক্ষা সম্ভবতঃ এই কৃত্রিম উদ্দীপক কারণই এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার সাধনে অধিকতর কার্যকরী হয়।

১৮৫৪ সালে বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্ল্‌স্ উড শিক্ষা সম্পর্কে এক বিশদ বিধিনির্দেশ (Educational Despatch) প্রেরণ করেন; তাহাতে এক ক্রমবিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থার বিধান দান করা হয়। স্থির হয় প্রেসিডেন্সী তিনটির প্রত্যেকটিতে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাবে

এক একটি করিয়া জনশিক্ষা বিভাগ (Department of Public Instruction) স্থাপন করিতে হইবে। ব্রিটিশ ভারতের সর্বত্র স্থাপিত হইবে ক্রমানুসারে শ্রেণীবদ্ধ (graded) বিদ্যালয়। এই সকল বিদ্যালয়ের কতকগুলির জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে স্থাপন করিতে হইবে এক-একটি বিশ্ববিদ্যালয়,—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন একমাত্র কাজ ছিল পরীক্ষা গ্রহণ করা। লর্ড ডালহৌসী এই সকল বিধান সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। ১৮৫৭ সালে স্থাপিত হয় কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারতবর্ষে সংবাদপত্র: সংবাদপত্রের প্রশ্ন শিক্ষার প্রশ্নের সহিত নিবিড় ভাবে জড়িত। ভারতবর্ষে প্রথম সাংবাদিক পত্রিকা 'বেঙ্গল গেজেট' জে. এ. হিকীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারী। ১৮১৮ সালে ঘটে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম পত্রিকা 'সমাচার দর্পণে'র আবির্ভাব। তৎপূর্বে এদেশের যাবতীয় পত্রিকাই ব্রিটিশ সম্পাদকবর্গ এবং ব্রিটিশ স্বত্বাধিকারীদের দ্বারা ইংরেজী ভাষায় পরিচালিত হইত। প্রথম যুগের সেই ব্রিটিশ সাংবাদিকগণ পরবর্তী কালের সাংবাদিকগণের ন্যায় ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন সরকারের কঠোর সমালোচক। তাই কঠিন বিধিনিষেধ জারি করিয়া তাঁহাদের স্বাধীনতা খর্ব করিতে হইয়াছিল। ১৮১৮ সালে লর্ড হেস্টিংস সংবাদপত্রাদির উপর হইতে বাধানিষেধ (censorship) তুলিয়া লন, কিন্তু ১৮২৩ সালে নূতন বিধিনিষেধ জারি করা হয়। ১৮২৩ সালে সুপ্রীম কোর্টের জনৈক বিচারপতি ঘোষণা করেন যে "এই সরকার এবং সংবাদপত্রাদির স্বাধীনতা পরস্পরবিরোধী ব্যাপার, এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর নয়।" বেন্টিঙ্ক প্রচলিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার না করিলেও, মেটকাফের প্রভাবে উদারনীতিরই অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকেন। বেন্টিঙ্কের পর মেটকাফ যখন সাময়িক ভাবে গভর্ণর-জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি সংবাদপত্রাদিকে আইনগত স্বাধীনতা দান করেন (১৮৩৫)। অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যেই কলিকাতায় সংবাদপত্রাদির সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সংহতি লাভ ঘটে, ভারতবাসীরাও ইহার পরিচালনায় ক্রমবর্ধমান অংশ গ্রহণ করিতে থাকে।

জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী: ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসকদের মনোযোগ সচরাচর সামরিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সৌধাদি ও পথঘাট নির্মাণ এবং সংস্কার সাধনেই নিবদ্ধ থাকিত। লর্ড হেস্টিংস একটি পুরাতন খালের সংস্কার সাধন করিয়া দিল্লীতে উত্তম জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কলিকাতার সহিত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি নূতন বড় সড়কের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠেন। পরিকল্পনাটি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেন্যাণ্ট-গভর্ণর টমাসন এবং লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক কার্যে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের জন্য রেলপথ পরিকল্পনার প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। গঙ্গা খালও ছিল তাঁহারই একটি পরিকল্পনা।

রাজ্যগ্রাসে লর্ড ডালহৌসীর যেরূপ আন্তরিক উৎসাহ ছিল, জনকল্যাণ-কার্যে তাঁহার উৎসাহ তদপেক্ষা বিশেষ কম ছিল না। ১৮৫৪ সালে ভারত সরকারে তিনি কার্যের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ সৃষ্টি করেন; বোম্বাই এবং মাদ্রাজেও হয় অনুরূপ অধস্তন বিভাগের সৃষ্টি। জলসেচ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার কিরূপ আগ্রহ ছিল গঙ্গা খাল এবং বারি দোয়াব খাল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ১৮৫৩ সালে বোম্বাই ও থানার মধ্যে খোলা হয় প্রথম রেলপথ; ১৮৫৪ সালে কলিকাতার সহিত রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লাখনিগুলির ঘটে রেলপথে সংযোগ। তাহা ছাড়া লর্ড ডালহৌসী বৈদ্যুতিক তারবার্তার পত্তন করেন।

শাসকরূপে লর্ড ডালহৌসী ঃ পররাজ্য-গ্রাসে লর্ড ডালহৌসী যে কৃতিত্ব অর্জন করেন তাহাতে শাসকরূপে তাঁহার খ্যাতি চাপা পড়িয়া গিয়াছে; তবুও এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তৎকর্তৃক নানা রাজ্য গ্রাসের ব্যাপারটি বিশদ যুক্তি প্রদর্শনের অপেক্ষা রাখিলেও, তাঁহার শাসনকার্য ছিল একটি বিশিষ্ট কীর্তি। তিনি ছিলেন বিশেষ উদ্যমশীল ও বলিষ্ঠচেতা ব্যক্তি; কর্মনীতি প্রবর্তনে এবং শাসনকার্য তত্ত্বাবধানে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে যে পরিমাণ আয়াস স্বীকার করিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তাঁহার স্বভাবে দু'টি ত্রুটি ছিল। তাঁহার কর্তৃত্বাভিমানের জন্য তিনি সমালোচনা বড়-একটা সহ্য করিতে পারিতেন না, অপরের সহিত নির্বিরোধে কাজকর্ম করাও তাঁহার পক্ষে কঠিন হইত।

দ্বিতীয়তঃ, স্মিথ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, "তিনি ছিলেন কর্মকুশলতার একটু অতিরিক্ত ভক্ত, তাই সময়ে সময়ে একথা ভুলিয়া যাইতেন যে কর্মে অপটু লোকদেরও এরূপ হৃদয়বৃত্তি থাকিতে পারে যাহাতে আঘাত দান করা চলে না। স্যার হেন্‌রী লরেন্সের মতো বিশৃঙ্খলস্বভাব ভাবপ্রবণ ব্যক্তি তাঁহার ব্যবহারিক চিত্তে সাতিশয় বিরক্তি উৎপাদন করিতেন।"

নব-বিজিত পঞ্জাব ও পেগু প্রদেশদু'টি শাসনের জন্য ডালহৌসী যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ না করিলে তাঁহার শাসনবিধানের বিবরণ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। পঞ্জাবের শাসনভার অর্পিত হইয়াছিল হেন্‌রী ও জন এই দুই প্রথিতযশা লরেন্স ভ্রাতা এবং বাঙ্গালাদেশের একজন সিভিলিয়ানকে লইয়া গঠিত একটি পর্ষতের উপর। কিছুকাল পরে ডালহৌসী হেন্‌রী লরেন্সকে রাজপুতানায় স্থানান্তরিত করিয়া পর্ষৎ তুলিয়া দেন এবং জন লরেন্সকে নিয়োগ করেন চীফ কমিশনারের পদে। "লরেন্স ভ্রাতৃদ্বয়, হারবার্ট এডোয়ার্ডস, জন নিকলসন, রিচার্ড টেম্পল্, এবং এইরূপ আরও অনেক অল্পবিস্তর প্রথিতযশা ব্যক্তির চেষ্টায় এই আদর্শ প্রদেশটি গড়িয়া উঠে; কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই উপর থাকিত তাঁহাদের অক্লান্তকর্মা প্রভুর সদাজাগ্রৎ দৃষ্টি; শাসনকার্যে যে সুফল লাভ হয় তাহার জন্য তাঁহার এই সকল সুদক্ষ অধস্তন কর্মী অপেক্ষা সম্ভবতঃ তিনিই অধিকতর কৃতিত্বের ভাগী।" পেগুর শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন ভারত সরকারের অধীনে একজন কমিশনার। এই দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন স্যার আর্থার ফেয়ার (Phayre)। ১৮৬২ সালে তিনি হন ব্রিটিশ ব্রহ্মের চীফ কমিশনার। আধুনিক ব্রহ্মদেশের অন্যতম সংগঠক তিনি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক পরিবর্তন

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ভারতীয় শ্রমশিল্প: স্মরণাতীত কাল হইতেই ভারতবর্ষ ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কার্পাস বয়ন কেন্দ্র। ঢাকা ছিল ভারতবর্ষের ম্যান্‌চেস্টার, ঢাকাই মসলিন সৌন্দর্য ও স্থায়িত্বের জন্য সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধি

লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রপ্তানি মাল ছিল কার্পাস ও রেশম বস্ত্র, রেশম, সোরা এবং আফিম। কৃষি ও হস্তশিল্পের মধ্যে ছিল একটি সুষ্ঠু সামঞ্জস্য, বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে। ক্লাইভের পর বাঙ্গালার গভর্ণর হন ভেরেল্স্ট, তাঁহার প্রমুখাৎ আমরা জানিতে পারি আলিবর্দি খাঁর আমলেও মুর্শিদাবাদের আগমশুল্ক অধিকারের নথিপত্রে রেশম সম্পর্কে ৭০ লক্ষ টাকার একটি অঙ্ক দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছিল ইউরোপীয়দের কারবারের বহির্ভূত বিষয়; ইউরোপীয়রা হয় বিনা শুল্কে কারবার করিত, নয় হুগলীতে শুল্ক প্রদান করিত, তাই মুর্শিদাবাদের নথিপত্রে সে বিষয়ের কোনরূপ উল্লেখ থাকিত না। "কৃষিজীবী ছিল নিশ্চিন্ত, শ্রমশিল্পী পাইত উৎসাহ, বণিক হইয়া উঠিত বিত্তবান, আর রাজা থাকিতেন সন্তুষ্টচিত্ত।"

ভারতীয় শ্রমশিল্পের সর্বনাশ ঃ পলাশীর যুদ্ধের পর এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। ১৭৫৭ সালের পর ভারতীয় ধনৈশ্বর্যের যে অপচয় শুরু হয় তাহার ফলে ইংলণ্ডের নূতন নূতন শ্রমশিল্প মূলধন লাভে স্ফীত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে, তাহাতে ইংলণ্ডে শ্রমশিল্প বিপ্লবের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। এদিকে আবার বাঙ্গালাদেশের আভ্যন্তরীণ এবং রপ্তানি কারবারে অবৈধ উপায়ে ব্রিটিশ বণিকদের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়া যায়। দেশে দেখা দেয় রেশমবস্ত্র ও কার্পাসবস্ত্র বয়নের অবনতি। এমন কি ১৭৬৯ সালেই ডিরেক্টর-গণ এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন যে বাঙ্গালাদেশে রেশমের চাষ বৃদ্ধি এবং রেশম-বয়ন হ্রাসের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কার্পাসদ্রব্য এবং রেশমের কারবারে কোম্পানী প্রায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া বসে। সরকারী কাগজপত্র হইতেই উৎপীড়নের কাহিনী সমর্থিত হয়। যাহারা রেশমের সূতা কাটিত তাহাদের যাহাতে জোরজবরদস্তি করিয়া রেশমের সূতা কাটানো না যায় সেজন্য তাহারা নিজেদের হাতের বুড়া আঙ্গুল কাটিয়া ফেলে। উৎপীড়নের ফলে রেশম শিল্পের সর্বনাশ ঘটে।

পার্লামেন্টের ১৭০০ এবং ১৭২০ সালের আইন অনুযায়ী ভারতবর্ষ হইতে আমদানি কার্পাসদ্রব্য ও রেশমদ্রব্য 'ইংলণ্ডে পরিধান অথবা অন্য কোনও ভাবে ব্যবহার করা চলিত না।' এ সব জিনিস ইউরোপের অন্যান্য দেশে চালান যাইত। ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে এই কারবার বন্ধ হইয়া যায়। এতাবৎ কাল ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে

কার্পাসের ছাপা কাপড় আমদানি হইতেছিল, তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইত্যবসরে শ্রমশিল্প বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের সম্মুখে এক মহাসুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংলণ্ডে তৈয়ারী মসলিনের প্রথম নমুনা বাঙ্গালা-দেশে চালান আসিল ১৭৮৩ সালে। কার্পাসজাত দ্রব্যাদির উৎকর্ষ বিধানের কোনও চেষ্টাই হইল না। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ কার্পাসদ্রব্য আমদানি বন্ধ করিয়া ব্রিটিশ শ্রমশিল্পীদের বিরাগভাজন হইতে কোম্পানী সাহস পাইল না। ইহার উপর আবার ভারতীয় পণ্যের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল গুরুতর করভার, তাহাতে এ দেশের শ্রমশিল্প অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বিলোপের মুখে অগ্রসর হইল। যে দু'টি শ্রমশিল্প একরূপ বিলুপ্তই হইয়া গেল তাহার একটি ছিল বয়নশিল্প, অপরটি জাহাজ নির্মাণ। এমন কি ১৭৯৫-৯৬ সালেও কলিকাতায় তৈয়ারী হইয়াছিল ছয়খানি জাহাজ। ১৭৯৭-৯৮ সালে কলিকাতার ডকইয়ার্ড হইতে কয়েকখানি জাহাজ ভাসানোও হয়। কিন্তু কলিকাতা হইতে জাহাজ তৈয়ারীর কাজ একেবারেই উঠিয়া যায়। ১৭৮৮ সালের দিকে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় এক নূতন কর্মনীতি গ্রহণের লক্ষণ। আরম্ভ হয় কাঁচামাল রপ্তানির কারবারে আনুকূল্য প্রদর্শন, কেননা তাহা ছিল ইংলণ্ডের মনঃপূত কর্মপন্থা। তাই ব্রিটিশ শ্রমশিল্পসমূহের জন্য কাঁচামাল, বিশেষ করিয়া রেশম আর নীল, উৎপাদনেই উৎসাহ প্রদান করা হইতে থাকে।

ভারতীয় ব্যবসায়-বাণিজ্যের সর্বনাশ: ব্যবসায়-বাণিজ্যও চলিত ঘোরতর দুর্নীতির পথে। ১৮৪০ সালে কমন্স সভার এক সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য প্রদান করা হয় তাহাতে বিষয়টি প্রকাশ হইয়া পড়ে। ব্রিটিশ জাহাজে করিয়া ভারতবর্ষে ব্রিটিশ কার্পাসদ্রব্য ও রেশমদ্রব্য চালান দিতে হইলে শুল্কের হার ছিল শতকরা ৩½ ভাগ, আর ব্রিটিশ পশমদ্রব্যের উপর শুল্ক ছিল শতকরা ২ ভাগ মাত্র। কিন্তু ইংলণ্ডে আমদানি করিতে হইলে ভারতীয় কার্পাসদ্রব্যের জন্য শতকরা ১০ ভাগ শুল্ক দিতে হইত, ভারতীয় রেশমদ্রব্যের জন্য শুল্কের হার ছিল শতকরা ২০ ভাগ, আর ভারতীয় পশম-দ্রব্যের উপর ছিল শতকরা ৩০ ভাগ। ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই যে ১৮৩৭ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ কার্পাসদ্রব্য চালান আসে ৬,৪০,০০,০০০ গজের

উপরে, অথচ ১৮২৪ সালে উহার পরিমাণ ছিল ১০,০০,০০০ গজেরও নীচে। ঢাকার জনসংখ্যা ১,৫০,০০০ হইতে কমিয়া প্রায় ৩০,০০০-এ আসিয়া দাঁড়ায়। ভারতীয় জীবনের সমগ্র অর্থনৈতিক বনিয়াদ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, ভারতবর্ষ হইয়া দাঁড়ায় ইংলণ্ডের কৃষিক্ষেত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ

কয়েকটি পূর্বতন বিদ্রোহ : সৈনিকদের বিদ্রোহ ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে বিরল ব্যাপার ছিল না। ১৮০৬ সালে কর্ণাটকের অন্তর্গত ভেলোরে সিপাহীরা মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের অনুমোদন অনুসারে সেখানকার প্রধান সেনাপতি কর্তৃক বিধিবদ্ধ কতিপয় নূতন বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই সকল বিধি-বিধানে সিপাহীদের এক নূতন ধরণের উষ্ণীষ পরিধান করিতে, বিশেষ এক ছাঁটে তাহাদের দাড়ি ছাঁটাই করিতে, এবং কপালে জাতিবর্ণ অনুযায়ী ফোঁটাতিলক কাটা বন্ধ করিতে, আদেশ দেওয়া হয়। এই আদেশের ফলে সিপাহীদের মনে সন্দেহ জন্মে যে তাহাদের বুঝি বলপূর্বক খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করা হইবে। সিপাহীরা ভেলোরের দুর্গ অধিকার করিয়া কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক ও সেনানীর প্রাণনাশ করে। বিদ্রোহ দমনে কোনরূপ বেগ পাইতে হয় না; মাদ্রাজের গভর্ণর এবং প্রধান সেনাপতিকে পদচ্যুত করা হয়। ১৮০৮-৯ সালে বিদ্রোহ দেখা দেয় মাদ্রাজ বাহিনীর সেনানীদের মধ্যে; বিদ্রোহের 'সাক্ষাৎ কারণ ছিল ডিরেক্টরদের কড়া হুকুম মাফিক স্যার জর্জ বার্লো কর্তৃক শিবিরের ঠিকা সম্পর্কে কতকগুলি অতিরিক্ত পাওনা বন্ধ করিয়া দেওয়া।' স্যার জর্জ বার্লো তখন ছিলেন মাদ্রাজের গভর্ণর, এই বিদ্রোহের ফলে তাঁহার সুনামহানি হয়। ১৮২৪ সালে (কলিকাতার সন্নিকটে) ব্যারাকপুরে সিপাহীরা তাহাদের প্রতি সমুদ্রপথে ব্রহ্মদেশে যাইবার আদেশের প্রতিবাদে বিদ্রোহ করে। তাহাদের ভয় হয় প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য তাহাদের যদি সমুদ্রপথে প্রেরণ করা হয় তবে তাহাদের জাতি যাইবে। গোলযোগের প্রারম্ভেই যদি সদ্বিবেচনার

সহিত সিপাহীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা হইত তবে শাস্তিস্বরূপ তাহাদের প্রতি যে অমানুষিক আচরণ করা হয় তাহা এড়াইয়া যাওয়া চলিত।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কারণঃ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ স্থানীয় গোলযোগ মাত্র ছিল না, চর্বি-মাখানো কার্তুজের জন্য উহার উদ্ভব ঘটে নাই। উহার কারণসমূহ ছিল বিশেষ জটিল প্রকৃতির; নানারূপ সামরিক, রাজনৈতিক, ধর্মগত এবং সামাজিক ব্যাপারের যোগাযোগে এই উপপ্লব সংঘটিত হয়।

ভারত-সীমান্তের বাহিরে—ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্তান, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশে—যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়া সিপাহীদের মোটেই মনঃপূত ব্যাপার ছিল না; ইহাতে অনর্থক তাহাদিগকে অসুবিধার ভাগী হইতে হইত এবং তাহাদের সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মভাবের উপর চাপ পড়িত। ১৮৫৭ সালের অব্যবহিত পূর্বের ১৩ বৎসরের মধ্যে—১৮৪৪, ১৮৪৯, ১৮৫০ ও ১৮৫২ সালে—চারিবার বিদ্রোহ হইয়াছিল। কার্যভার গ্রহণের সামান্য কিছুকাল পরেই লর্ড ক্যানিং এই মর্মে এক আদেশ দান করেন যে বঙ্গীয় বাহিনীতে নবনিযুক্ত যাবতীয় সৈনিককেই মাদ্রাজ বাহিনীর সৈনিকদের ন্যায় যেখানেই প্রয়োজন সেখানেই গমন করিতে হইবে। এই আদেশ পুরাতন সৈনিকদের উপর প্রযোজ্য ছিল না, কিন্তু ইহা সন্দেহের সৃষ্টি করে।

জনৈক অভিজ্ঞ ব্রিটিশ কর্মচারী ১৮৫৭ সালেই লিখিয়া গিয়াছেন: 'ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় বিদ্রোহই, তাহা বাঙ্গালাদেশেই হউক অথবা অন্যত্র যেখানেই হউক না কেন, অল্পবিস্তর আমাদেরই দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, নতুবা কোন-না-কোন প্রকারে আমরাই তাহার ইন্ধন যোগাইয়া আসিয়াছি। প্রায়ই ঘটিয়াছে চুক্তির কোনরূপ অন্যথাচরণ, দেশীয় সৈনিকদের মনোভাব, স্বাস্থ্য কিংবা স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন, অথচ সেই একই সময়ে কোন-একটি ইউরোপীয় সৈন্যদলের প্রতি বর্ষিত হইয়াছে অপরিসীম প্রযত্ন; দেশীয় সৈনিকদের ধর্মবিশ্বাস অথবা সংস্কারে ঘটিয়াছে কোন-না-কোনরূপ অনভিজ্ঞজনোচিত হস্তক্ষেপ; তাহাদের বেতন অথবা অধিকারে, কিংবা তাহারা যাহাকে নিজেদের অধিকার বলিয়া বিবেচনা করে তাহাতে কোন-না-কোন রূপে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।"

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক স্পষ্টভাবেই সিপাহী বাহিনীর ত্রুটিসমূহের প্রতি

অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছিলেন; তাঁহার মতে ইহার পরিপোষণ ছিল এক ব্যয়বহুল ব্যাপার অথচ ইহা সেরূপ কার্যকরী ছিল না। বঙ্গীয় বাহিনীর নিয়মানুবর্তিতা ছিল শিথিল। ইহার কারণ ছিল তিনটি। বহু সুযোগ্য সামরিক কর্মচারীকে স্থানান্তরিত করিয়া রাজনৈতিক কার্যে নিয়োগ করা হইয়াছিল; ফলে সেনাবাহিনীর পরিচালনতন্ত্রে দুর্বলতা দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, পদোন্নয়ন কঠোর ভাবে কার্যকালের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে বহু অকর্মণ্য সেনানী উচ্চপদ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, অবসর গ্রহণের সুনির্দিষ্ট কোনও সময় ছিল না বলিয়া এমন অনেকেই চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন যাঁহাদের পক্ষে বহুকাল পূর্বেই অবসর গ্রহণ করা উচিত ছিল।

একবার শৈথিল্য পাকা হইয়া বসিয়া গেলে সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলার পুনঃপ্রবর্তন সহজ হয় না। বঙ্গীয় বাহিনী প্রায় যেন এক নিবিড় পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, অধিকাংশ সৈনিকই একটিমাত্র অঞ্চল—অর্থাৎ বর্তমান উত্তরপ্রদেশ—এবং একটিমাত্র সামাজিক শ্রেণী হইতে আসিয়া ভর্তি হইত। জাতিবর্ণের সংস্কার এমনই দৃঢ়মূল ছিল যে পাশ্চাত্ত্যের নিয়মানুবর্তিতার আদর্শে তাহার উচ্ছেদ সাধন ও সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয় নাই। স্যর চার্লস নেপিয়ার একবার মন্তব্য করেন, "উচ্চবর্ণ, অর্থাৎ বিদ্রোহ, আমল পাইতেছে।" কিন্তু বিদ্রোহ যে কেবলমাত্র বঙ্গীয় বাহিনীর উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ এবং রাজপুতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নয়। উদাহরণস্বরূপ, মীরাটে নিম্নবর্ণের সামরিক পরিখা-ও-পথ-নির্মাতারাও বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিল।

সামরিক বাহিনীতে ইউরোপীয়দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক হইলে বঙ্গীয় বাহিনীর অসন্তোষ এবং নিয়মানুবর্তিতার অভাব হয়তো এরূপ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিত না। কিন্তু ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে কোম্পানীর কর্মচারী ও সৈন্যদের মধ্যে ইউরোপীয়দের অনুপাত ছিল শতকরা ১৯ ভাগ। ইউরোপীয়দের অধিকাংশকেই আবার আনিয়া জড়ো করা হইয়াছিল নব-বিজিত পঞ্জাব প্রদেশে; বর্তমান উত্তরপ্রদেশে তাহাদের আনুপাতিক সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাহা ছাড়া বহু গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র এবং অধিকাংশ কামান ছিল সিপাহীদেরই মুঠার মধ্যে। লর্ড ডালহৌসী

ভারতবর্ষে উপযুক্তসংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্য পরিপোষণের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে সাবধান-বাণীতে কর্ণপাত করা হয় নাই।

এইভাবে একদিকে যখন সিপাহীদের সামরিক প্রাধান্য এবং কাজকর্মের ব্যাপারে তাহাদের অন্তরে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছিল, সেই সময়ই আবার লর্ড ডালহৌসীর রাজ্য-গ্রাসের নীতি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিচলিত করিয়া তুলিল। অযোধ্যা-গ্রাস এবং মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কে দিল্লীতে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের রাজপ্রাসাদ হইতে অন্যত্র অপসারণের প্রস্তাব মুসলমানদের অন্তরে হানিল নিদারুণ আঘাত। 'স্বত্বলোপ-নীতি' অনুসারে বিবিধ হিন্দু-রাজ্য গ্রাস এবং প্রাক্তন পেশোয়ার বৃত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে হিন্দুদের মধ্যে ঘটিল আতঙ্কের সঞ্চার। যে সব হিন্দু ও মুসলমান রাজারাজড়াদের রাজ্য তখনও কাড়িয়া লওয়া হয় নাই তাঁহারাও ভবিষ্যতে তাঁহাদের ভাগ্যে না সেই একই দশা ঘটে এই চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

ভারতীয় রাজ্যসমূহ গ্রাসের ফলে কেবল যে রাজারাজড়াদেরই সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা নয়। যে সকল পরিবার ছিল এই সকল রাজারাজড়ার অনুগ্রহে পরিপুষ্ট, যে সকল কর্মচারী ইঁহাদের রাজ্যে কাজকর্ম করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিত, যাহারা ছিল স্থানীয় রাজামহারাজাদের অকর্মণ্য বাহিনীর অন্তর্ভূত—ইহাদের সকলেই ভয়ানক বিচলিত হইয়া উঠিল, সকলেরই চিত্তে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল পরস্বগ্রাসী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। লর্ড ক্যানিং কোভার্লি জ্যাকসনকে ১৮৫৬ সালে অযোধ্যার চীফ কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার শাসন প্রাক্তন নবাবের অনুগ্রহভাজনদের পক্ষে এমনই দুর্বহ হইয়া উঠে যে তাঁহাকে অপসারিত করিয়া সেখানে স্যর হেনরী লরেন্সকে নিয়োগ করিতে হয়। স্মিথ যথার্থভাবেই মন্তব্য করিয়াছেন যে "সকল শ্রেণীর এবং সকল পদের বেসামরিক লোকের মন—হিন্দু-মুসলমান, রাজাপ্রজা সকলেরই অন্তর—উদ্বেগ এবং অজানিত আশঙ্কার ভারে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।"

বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া এই সব উদ্বেগের সঙ্গে আবার যোগ হইয়াছিল জাতি যাওয়া এবং বলপূর্বক খ্রীস্টধর্ম প্রবর্তনের অস্পষ্ট আশঙ্কা। সতীদাহ

ও গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনের ন্যায় ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠানের বিলোপ সাধন, বিধবা বিবাহকে আইনগত বৈধতা দান, স্বধর্মত্যাগীদের পৈতৃক সম্পত্তির উপর অধিকার স্বীকার, আলেকজাণ্ডার ডাফের ন্যায় খ্রীস্টধর্ম প্রচারকদের 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসার, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, রেলপথ ও বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ নির্মাণ—এই সকল ব্যাপার বিস্তর সিপাহী এবং অসামরিক ব্যক্তির চক্ষে ছিল হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ভারতবর্ষকে একটি খ্রীস্টান দেশে পরিণত করার পরোক্ষ প্রচেষ্টা। যুগযুগান্তের ধর্মগত সংস্কার এবং চিরাভ্যস্ত সামাজিক রীতিনীতির বিলোপ সাধনের আশঙ্কা হইল। "কেবলমাত্র প্রেসিডেন্সী শহরকয়টির ক্ষুদ্র এক শিক্ষিত সম্প্রদায় ছিলেন সরকার কর্তৃক সামাজিক আইন জারির এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী।...কিন্তু এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেও সরকারের ক্রিয়াকলাপ সমর্থনে মতৈক্য ছিল না।" শাসক-শ্রেণীর ঔদ্ধত্য তাঁহাদের নিকট অসহ্য বোধ হইত। উচ্চতর এবং অধিক বেতনের সরকারী চাকুরী হইতে ভারতবাসীদের বঞ্চিত রাখার যে নিয়মিত প্রচেষ্টা ছিল, তাঁহারা তাহার বিশেষ বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। "সরকারী চাকুরীতে ভারতবাসীর সম্ভবপর আকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল নির্বাহী বিভাগে উপ-সমাহর্তা (Deputy Collector) এবং বিচারবিভাগে সদর আমিনের পদ অবধি।"

এন্‌ফীল্ড রাইফেলের প্রবর্তন সিপাহীদের এই সকল সন্দেহ দৃঢ়ীভূত করিয়া তুলিল। সরকারের স্তোকবাক্যে কোনও ফলোদয় হইল না। ১৮৫৬ সালের মাঝামাঝি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে হাতে হাতে ফিরিতে লাগিল গোছা গোছা রহস্যজনক চাপাটি। ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে (বাঙ্গালা দেশের) বহরমপুরে দেখা দিল গোলযোগ, তারপর ২৯শে মার্চ (কলিকাতার নিকটে) ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ে নামে একজন সিপাহীর হাতে আহত হইলেন একজন ইউরোপীয় সামরিক কর্মচারী। শুরু হইয়া গেল বিদ্রোহ।

বিদ্রোহের গতি এবং বিদ্রোহ দমন : এই বিদ্রোহ সম্পর্কে যে সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় তাহা পাঁচটি প্রধান প্রধান ক্ষেত্র অনুসারে বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে : (১) দিল্লী, (২) লক্ষ্ণৌ, (৩) কানপুর, (৪) রোহিলখণ্ড, (৫) মধ্যভারত ও বুন্দেলখণ্ড।

১৮৫৭ সালের ১০ই মে মীরাটের সিপাহীরা প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ করিয়া

দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হয়, সেখানে গিয়া পরদিনই তাহারা শহরটি অধিকার করে। মোগল সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুদয় ঘোষণা করিয়া তাহারা শাহী মসনদে স্থাপন করে ২য় বাহাদুর শাহকে। আগ্রা প্রদেশময় ছড়াইয়া পড়ে বিদ্রোহ, তবে ব্রিটিশদেরই হাতে থাকে আগ্রা শহরটি। ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঘটে দিল্লীর পুনরধিকার ; সে যুদ্ধে মারা যান জন নিকলসন। দিল্লীর পুনরধিকার সম্ভবপর হয় পঞ্জাবের চীফ কমিশনার জন লরেন্সের উদ্যমের বলে এবং শিখদের আনুগত্যের ফলে। দিল্লীতে বিদ্রোহের উদ্ভব অথবা নিয়ন্ত্রণে বাহাদুর শাহের কোনরূপ হাত ছিল না। দিল্লীর পতনের পর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারে নির্বাসনদণ্ড দান করা হয়। ১৮৬২ সালে রেঙ্গুনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার দুই পুত্র ও এক পৌত্রকে হডসন নামে একজন ব্রিটিশ সেনানী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করে।

লক্ষ্ণৌয়ে সিপাহীরা রেসিডেন্সী অবরোধ করিলে স্যর হেনরী লরেন্স যুদ্ধে নিহত হন। ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আউট্র্যাম ও হ্যাভেলক অবরুদ্ধ রেসিডেন্সীর সাহায্যে অগ্রসর হন। দুই মাস পরে ব্রিটিশরা লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করে, কিন্তু ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে নূতন প্রধান সেনাপতি স্যার কলিন ক্যাম্‌বেল শহরটি পুনরধিকার করেন। ইহার পর অযোধ্যায় বিদ্রোহ আয়ত্তে আসে, এবং ১৮৫৮ সালের শেষাশেষি অধিকাংশ বিদ্রোহীই বিতাড়িত হইয়া নেপাল-সীমান্ত অতিক্রম করিতে বাধ্য হয়।

কানপুরে ব্রিটিশদের দুর্দশার প্রধান কারণ ছিল জেনারেল স্যার হিউ হুইলারের নির্বুদ্ধিতা ও দুর্বলতা ; তিনি তখন পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধ। সেখানে সিপাহীদের নেতা ছিলেন পূর্বতন পেশোয়া ২য় বাজী রাওয়ের পোষ্যপুত্র নানা সাহেব। বহু ব্রিটিশ সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিকে, এমন কি নারী ও শিশুদেরও, হত্যা করা হয়। তিনি নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৮৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কানপুর উদ্ধার করেন স্যার কলিন ক্যাম্‌বেল।

রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত বেরিলীতে বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৮৫৭ সালের মে মাসে। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলের সুপ্রসিদ্ধ রোহিলা সর্দার হাফিজ রহমৎ খাঁর এক পৌত্রকে নবাব নাজিম ঘোষণা করা হয় ; কিন্তু রামপুরের নবাব ব্রিটিশ সরকারের অনুগতই থাকেন। ক্যাম্‌বেল বেরিলী অধিকার করেন ১৮৫৮ সালের মে মাসে।

মধ্যভারত ও বুন্দেলখণ্ডে যুদ্ধ-বিগ্রহের ভার ছিল স্যার হিউ রোজের উপর। ঝাঁসিতে বিদ্রোহীদের নেত্রী ছিলেন রাণী লক্ষ্মী বাঈ। তিনি ছিলেন সেখানকার রাজার মহিষী। অপুত্রক অবস্থায় রাজার মৃত্যু হইলে লর্ড ডালহৌসী রাজ্যটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। স্যার হিউ রোজ রাণী লক্ষ্মী বাঈকে বিদ্রোহীদের মধ্যে 'সর্বোত্তমা ও সর্বাপেক্ষা সাহসিনী' রূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহকারী ছিলেন নানা সাহেবের সেনাপতি তাঁতিয়া তোপী। স্যার হিউ রোজ কর্তৃক ১৮৫৮ সালের এপ্রিল-মে মাসে ঝাঁসি ও কাল্পি অধিকারের পর রাণী ও তাঁতিয়া তোপী গোয়ালিয়র অধিকার করিয়া ব্রিটিশের অনুগত সিন্ধিয়াকে আগ্রায় আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করেন। কিন্তু ১৮৫৮ সালের জুন মাসে গোয়ালিয়র উদ্ধার হয়; পুরুষের বেশধারিণী রাণী বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেন। তাঁতিয়া তোপী ধরা পড়েন, এক বৎসর পরে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। নানা সাহেব পলায়ন করেন নেপালে, সেখানেই অজ্ঞাতবাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিহারে কুনওয়ার সিংহ নামে একজন রাজপুত জমিদারের নেতৃত্বে আরায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। তিনিও মধ্যভারত এবং উত্তর প্রদেশের স্থানে স্থানে বিদ্রোহীদল গঠনের চেষ্টা করেন। রাজপুতানা এবং মহারাষ্ট্র দেশেও কিছু কিছু গোলযোগ হইয়াছিল। মাদ্রাজে উল্লেখযোগ্য গোলযোগ হয় নাই। নব-বিজিত পঞ্জাব প্রদেশও শান্ত ছিল। অধিকাংশ ভারতীয় রাজ্যের রাজারাই ব্রিটিশ সরকারকে সক্রিয় সাহায্য করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়র, হায়দরাবাদ ও নেপালের মন্ত্রীদের সহায়তা বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল। বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সাধারণতঃ যে অসংযত প্রতিশোধ-স্পৃহা প্রদর্শন করেন তাহা লর্ড ক্যানিং-এর বিজ্ঞজনোচিত ঔদার্যের ফলে কিয়দংশে প্রশমিত হয়, এবং সেজন্য বহু ইউরোপীয় বিক্ষুব্ধচিত্তে তাঁহার নামকরণ করেন 'করুণার অবতার ক্যানিং' (Clemency Canning)।

বিদ্রোহের অসাফল্যের কারণ : গোড়া হইতেই এ বিদ্রোহের অসাফল্য ছিল অবধারিত, কেননা ইহা অসামরিক জনগণের ব্যাপক সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই, এবং ধনবল, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান ভারতীয় রাজন্যবর্গ ইহার প্রতি সক্রিয়ভাবে বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। বিদ্রোহের মূলেও কোনরূপ ঐক্যবদ্ধ পরিকল্পনা ছিল না। প্রত্যেকটি

স্থানে ছিল নিজস্ব স্থানীয় নেতৃবর্গ, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের ছিল পৃথক পৃথক স্থানীয় সমস্যা এবং পৃথক পৃথক লক্ষ্য। নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপী এবং লক্ষ্মী বাঈ, এই সকল প্রধান প্রধান নেতা ও নেত্রী সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহাদের প্রতিপক্ষদের তুলনায় বহু গুণে নিকৃষ্ট ছিলেন। ব্রিটিশ সৈনিকদের তুলনায় সিপাহীদের অস্ত্রশস্ত্র এবং নিয়মানুবর্তিতা দুই-ই ছিল অপকৃষ্ট। টেলিগ্রাফ এবং সংবাদ সরবরাহের অন্যান্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে সরকারের আয়ত্তে থাকায় সরকারের সমূহ শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছিল। পরিশেষে, সিপাহীদের অসংযত আচরণ অচিরেই অসামরিক জনগণকে তাহাদের প্রতি বিমুখ করিয়া তোলে, ফলে প্রথমদিকে তাহারা জনগণের যতটুকু সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল তাহা হইতেও বঞ্চিত হয়।

বিদ্রোহের পর্যালোচনা ঃ এ বিদ্রোহ যে পূর্ব-চিন্তিত, পূর্ব-পরিকল্পিত আন্দোলন ছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করার মতো কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণই নাই ; প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল সিপাহীদের অসন্তোষের এক স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ মাত্র। ইহার পশ্চাতে কোনও রাজনৈতিক দল অথবা সংস্থা কিছুই ছিল না, রুশিয়া বা পারস্যের ন্যায় কোন বৈদেশিক শক্তির উৎসাহ বা পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার উদ্ভব ঘটে নাই।

এ বিদ্রোহ কি কেবল সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ সামান্য বিদ্রোহ ছিল, না কি ইহা ছিল বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এক জাতীয় আন্দোলন ? প্রথম অবস্থায় নিঃসন্দেহেই ইহা ছিল সীমাবদ্ধ বিদ্রোহের অধিক আর কিছুই নয় ; এমন কি "সমগ্রভাবে সৈন্যবাহিনী এ বিদ্রোহে যোগদান করে নাই, বরং উহার মোটের উপর বেশ একটি বড় অংশই সক্রিয়ভাবে সরকারের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল।" কিন্তু ক্রমশঃ সকল শ্রেণীর লোকের মধ্য হইতেই বিদ্রোহীদের আবির্ভাব ঘটিতে থাকে, এবং তাহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিরই প্রচুর লোক ছিল। বেসামরিক জনগণের বিষয়ে বলিতে গেলে, একমাত্র অযোধ্যায়ই "বিদ্রোহ জাতীয় আন্দোলনের আকার ধারণ করিয়াছিল, তবে বিশেষ সঙ্কীর্ণ অর্থেই এ ভাষার প্রয়োগ করিতে হইবে, কেননা ভারতীয় জাতীয়তার ধারণা তখনও ছিল বীজাকারে সংগুপ্ত।" ভৌগোলিক দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হয় দেশের একটি বৃহৎ অংশের সহিত কার্যতঃ বিদ্রোহের কোনও সংশ্রব ছিল না। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী

আগাগোড়াই ছিল ইহার প্রভাবমুক্ত। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে মহারাষ্ট্রে দেখা গিয়াছিল "অসন্তোষের ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত ক্ষীণ প্রকাশ" মাত্র। বাঙ্গালাদেশে সিপাহীরা শিক্ষিত সম্প্রদায় অথবা জনসাধারণ কোনও শ্রেণীর লোকেরই সহানুভূতি আকর্ষণে কৃতকার্য হয় নাই। নবলব্ধ পঞ্জাবও ছিল ব্রিটিশের অনুগত। কেবলমাত্র উত্তর প্রদেশে এবং বিহার ও মধ্যভারতের স্থানে স্থানেই বিদ্রোহ কথঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

"বিদ্রোহীরা ছিল বিদেশী সরকারের কবল হইতে মুক্তিলাভে প্রয়াসী এবং দিল্লীর রাজা ছিলেন যাহার ন্যায্য প্রতিনিধি সেই পুরাতন ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছুক"—কেবল এইদিক দিয়াই এ বিদ্রোহকে "স্বাধীনতা-সমর" রূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় এক ধর্ম-সংগ্রাম হিসাবে এবং উহার মূলে কোনরূপ স্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিল না। অধিকন্তু, আন্দোলনের শেষের দিকেও ইহাতে ছিল সামন্ততান্ত্রিক ভাব ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থের প্রাধান্য, এবং ইহার লক্ষ্য ছিল যুগধর্ম হইতে অবান্তর এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থার—মোগল বাদশাহীর—পুনঃপ্রবর্তন করা যাহার সহিত অর্ধশতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক শক্তির প্রভাবে গঠিত নব-ভারতের কোনরূপ সামঞ্জস্যই সম্ভবপর ছিল না।

এই বিদ্রোহের ফলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের অভিব্যক্তি কতদূর প্রভাবিত হইয়াছিল? ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেন: "প্রথমে শিক্ষিত ভারতবাসীর সশস্ত্র বিদ্রোহে কোনরূপ আস্থা ছিল না, বিদ্রোহের অসাফল্য তাহার সেই মনোভাবকে আরও দৃঢ় করিয়া তোলে। তাহার আস্থা জন্মে ব্রিটিশের উদারনীতিতে, এবং এ বিষয়ে সে নিশ্চিত হইয়া উঠে যে সে নিজ উপযুক্ততার পরিচয় প্রদান করিলেই হ্যাম্পডেন, মিল্টন ও বার্কের স্বদেশবাসিগণ তাহাকে তাহার জন্মগত স্বত্ব প্রত্যর্পণ করিবে। কিন্তু আশা পূরণে কালহরণের ফলে তাহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে থাকে এবং তাহার আস্থা বিচলিত হইয়া পড়ে; তখন যে নূতন তরুণদলের উদ্ভব ঘটে তাহাদের আস্থা জন্মে অসার-প্রতিপন্ন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অপেক্ষা ইতালীয় কার্বোনারি ও রুশীয় নিহিলিস্টদের হিংসাত্মক পদ্ধতির উপর। বিদ্রোহের স্মৃতিও তাহাদের চিত্তে প্রেরণার সঞ্চার করে; তাই দুইটি

বিশ্ব-সমরের মধ্যে পুনরায় সামরিক বিদ্রোহ জাগাইয়া তুলিতে ভারতীয় বিপ্লবীদের চেষ্টায় শৈথিল্য দেখা যায় নাই। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকার ক্রমশঃ এ বিষয়ে অধিকতর নিশ্চিত হইয়া উঠিতে থাকে যে জাতীয়তাবাদী ভারতের সহিত শক্তিপরীক্ষায় তাঁহারা আর সম্পূর্ণরূপে সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিবে না।"

বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ ফলাফল ঃ উনবিংশ শতাব্দীর জনৈক পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ ইংরেজ রাজকর্মচারী স্যার লেপেল গ্রিফিন মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন যে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ "বহু মেঘ উড়াইয়া লইয়া গিয়া ভারতীয় আকাশ পরিষ্কার করিয়া দিয়া যায়। ইহার ফলে এমন এক অলস ও আদুরে সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় যাহা, উহার শতবর্ষব্যাপী জীবনে চমৎকার কাজ করিলেও, একেবারে অসহ্য ও অকর্মণ্য হইয়া উঠিয়াছিল ; ইহার ফলে এক অপ্রগতিশীল, স্বার্থপরায়ণ ও বাণিজ্যিক শাসন-সংস্থার স্থলে প্রবর্তিত হয় এক উদার ও আলোকপ্রাপ্ত শাসন-সংস্থা।..."

কিন্তু এ কথা সম্ভবতঃ স্বীকার করিতে হইবে যে ১৮৫৭ সালের পর ভারত-শাসনে ব্রিটিশের মনোভাবে এরূপ কোনও আমূল পরিবর্তন দেখা যায় নাই, তবে বিদ্রোহের ফলে এটুকু স্পষ্ট হইয়া উঠে যে ভারতের শাসনকার্য আর কোম্পানীর মাধ্যমে পরিচালনা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়, এবং এই বিশাল সাম্রাজ্যের ভার যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে স-পার্লামেণ্ট রাজহস্তে তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন বিদ্রোহের ফলে তাঁহাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়। বৃথাই কোম্পানী জন স্টুয়ার্ট মিলকে দিয়া তাঁহাদের কর্তৃত্বলোপের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক আবেদন-পত্র লিখাইয়া লন। ১৮৫৮ সালের ২রা আগস্ট যে ভারতশাসন-আইন বিধিবদ্ধ হয় তাহাতে নির্দেশ থাকে যে "ভারতবর্ষ রাজশক্তির (Crown) দ্বারা এবং রাজশক্তির নামে ১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কাউন্সিলের সহায়তায় রাজ্যের একজন প্রধান কর্মসচিবের (Secretary of State) মারফৎ শাসিত হইবে।" এতকাল ডিরেক্টর-সভা এবং বোর্ড অব কণ্ট্রোল যে ক্ষমতা উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, এবার তাহা গিয়া বর্তিল ভারত-সচিব (Secretary of State for India) নামে পরিচিত কর্মসচিবের উপর। এইভাবে ঘটিল পিটের ভারত-শাসন আইনের বলে প্রবর্তিত 'দ্বৈত-শাসনের' অবসান। স্থির হইল ভারত সচিবের কাউন্সিলের ১৫ জন

সদস্যের মধ্যে ৮ জন হইবেন রাজশক্তির দ্বারা নিযুক্ত এবং ৭ জন নিযুক্ত হইবেন ডিরেক্টরবর্গের দ্বারা। কাউন্সিলের থাকিবে কেবল মন্ত্রণাদানের অধিকার; অধিকাংশ ব্যাপারেই কর্মনীতি প্রবর্তন ও শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রহিল ভারত-সচিবের হাতে। গভর্ণর-জেনারেল লাভ করিলেন 'রাজ-প্রতিনিধি' (Viceroy) উপাধি। তিনি হইয়া দাঁড়াইলেন রাজশক্তির সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। তাঁহার বিধানগত কর্তৃত্ব না হউক, মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল।

অনেকেই এইরূপ ন্যায্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে রাজশক্তি কর্তৃক ভারত-শাসনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করা ছিল 'প্রকৃত পরিবর্তনের স্থলে বরং এক আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন'। ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ সালের দু'টি সনন্দ আইনেই এ কথা সুস্পষ্টরূপে ঘোষিত হইয়াছিল যে কোম্পানী কর্তৃক লব্ধ রাজ্যখণ্ডসমূহের উপর রাজশক্তিরই সার্বভৌম অধিকার বিদ্যমান। ভারতবর্ষের শাসন ব্যাপারে বহুকাল বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতিই ছিলেন কার্যতঃ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। জন স্টুয়ার্ট মিলের আবেদন পত্রে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল যে ভারতবর্ষের ব্যাপারে বহুকাল অবধি কার্যতঃ রাজশক্তির অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারেরই ছিল চরম নির্দেশ দানের অধিকার এবং সেইজন্যই ব্রিটিশ সরকারই ছিল 'যাহা কিছু করা হইয়াছে এবং যাহা যাহা স্থগিত রহিয়াছে অথবা কার্যে পরিণত করা হয় নাই তৎসমুদয়েরই জন্য পূর্ণমাত্রায় দায়ী'।

মহারাণীর ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বরের সুপ্রসিদ্ধ ঘোষণায় (Queen's Proclamation) ভারতীয় রাজন্যবর্গকে এই আশ্বাস দান করা হয় যে কোম্পানীর সহিত তাঁহাদের যে সকল সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই 'পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রক্ষিত' হইবে। ধর্মগত ব্যাপারে অনুসৃত হইবে পরমত-সহিষ্ণুতার নীতি, এবং সরকারী কাজকর্মে জাতি বা ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তিতে কোনরূপ পার্থক্য হইবে না। ভারত সরকার প্রকাশ্যেই 'স্বত্বলোপ নীতি' বর্জন করিল, পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দানের রীতি প্রবর্তন করা হইল।

সেনাবাহিনীর অনিবার্য পুনর্গঠন শুরু হইল। ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিল; ১৮৬৪ সালে ভারতীয় বাহিনীতে ২,০৫,০০০ লোকের মধ্যে ব্রিটিশের

সংখ্যা হইল ৬৫,০০০। এক রাজকীয় কমিশন প্রস্তাব করিল যে 'দেশীয় সৈন্যদলগুলি সাধারণভাবে সকল শ্রেণী ও সকল বর্ণের লোকের সংমিশ্রণে গঠন করাই উচিত'; তবে এ প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইল না। কামানসমূহের ভার দেওয়া হইল ইউরোপীয়দের হাতে।

উনত্রিংশ অধ্যায়

ব্রিটিশ রাজের শাসনাধীন ভারতবর্ষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈদেশিক নীতি

লর্ড এলগিন (১৮৬২-৬৩) এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ঃ বিদ্রোহ অবসানের পর লর্ড ক্যানিং আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার পুনর্গঠন-কার্যে মনোনিবেশ করেন। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁহার বন্ধু লর্ড এলগিন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসেন। তিনি ছিলেন ক্যানিং-এর সমসাময়িক ব্যক্তি এবং ঔপনিবেশিক শাসনকার্যে বিশেষ অভিজ্ঞ। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষেই লর্ড এলগিনের মৃত্যু হয়। কতিপয় পাঠান উপজাতির শাস্তিবিধানের জন্য তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে "উম্‌বেইলা অভিযান" পরিচালনা করিয়াছিলেন।

স্যার জন্‌ লরেন্স ও ভুটান যুদ্ধ ঃ ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্যার জন লরেন্স লর্ড এলগিনের স্থলাভিষিক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে আরূঢ় ছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাকে 'লর্ড' শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। ইতিপূর্বে এইরূপ একটি ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল যে সিভিল সার্ভিসের কোন সদস্যকে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ পদে নিয়োগ করা হইবে না; কিন্তু তাঁহার এই পদে নিয়োগ ছিল উহার একটি ব্যতিক্রম-স্থল। বিদ্রোহের সময় কর্তব্য-সম্পাদনে তিনি যে আগ্রহ ও উদ্যমের পরিচয় প্রদান করেন তাহা এবং সীমান্ত-সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান তাঁহাকে গভর্ণর-জেনারেলের পদে নিয়োগের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান গুণ রূপে বিবেচিত হয়।

ভারতবর্ষে পদার্পণের অল্পকাল পরেই লরেন্স ভুটানের সহিত এক

যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়েন। ভুটানের সহিত ব্রিটিশ-সম্পর্কের সূত্রপাত হয় ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলেই—১৭৭৪ এবং ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি এই অজ্ঞাত দেশের দ্বার উন্মোচন করিবার জন্য দুইটি ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে আসাম অধিকারের পর সীমান্ত-সংক্রান্ত নানা সমস্যা দেখা দেয়। সীমান্ত-অঞ্চলে লুটতরাজ চলিত ; সে বিষয়ে কোন একটি সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য লর্ড এলগিন অ্যাশ্‌লি ইডেনকে দূতরূপে ভুটানে প্রেরণ করেন ; ইডেন সেখানে এক অগৌরবজনক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। লরেন্স সে সন্ধি অগ্রাহ্য করেন। যুদ্ধ বাধিয়া যায়। দেওয়ানগিরির যুদ্ধে একটি ব্রিটিশ ফৌজ ভুটিয়াদের নিকট পরাস্ত হয় (জানুয়ারী, ১৮৬৫)। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে শান্তি স্থাপিত হয়। নির্দিষ্ট বার্ষিক নজরানার বিনিময়ে ভুটিয়ারা দুয়ার অঞ্চলের একটি বৃহৎ অংশ ছাড়িয়া দেয়।

লরেন্সের সীমান্ত-নীতি ঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কিরূপ কর্মনীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে সে বিষয়ে লরেন্সের পরিষ্কার মতামত ছিল। তথাকথিত 'অগ্রগামী গোষ্ঠী' ('Forward School') খোলাখুলি ভাবেই তাঁহার অভিমতের বিরোধিতা করিত। সীমান্তের যে সকল উপজাতি নামেমাত্র আফগানিস্থানের আমীরের আনুগত্য স্বীকার করিত কিন্তু কার্যতঃ নিজেদের দুর্দান্ত রীতিনীতি অনুযায়ীই শাসনকার্য চালাইত, তাহাদের সম্পর্কে লরেন্সের নীতি ছিল "উপজাতিগুলির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের পরিবর্তে তাহাদের শ্রদ্ধা অর্জনের প্রচেষ্টা করা" ; 'অগ্রগামী গোষ্ঠী' এই উদ্দাম উপজাতিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করার এবং সু-নির্ধারিত সীমান্ত প্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতী ছিল। আফগানিস্থান সম্পর্কে লরেন্সের নীতি ছিল "প্রকৃত শাসকদের প্রতি সৌহার্দ্য রক্ষা করা এবং আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদে মোটেই হস্তক্ষেপ না-করা" ; পক্ষান্তরে "যে শত্রুপক্ষ (অর্থাৎ রুশিয়া) ও আমাদের মধ্যে এখনও আছে মরুভূমি ও পর্বতের ছয় শত মাইল ব্যবধান, তাহাদের নিকট হইতে সাবধান থাকিবার জন্য" 'অগ্রগামী গোষ্ঠি' ছিল আফগানিস্থানকে অধিকার করিয়া লওয়া, অথবা বিভিন্ন শাসকদের মধ্যে তাহা ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী।

লরেন্স ও আফগানিস্থান ঃ ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে আমীর দোস্ত মহম্মদের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া এক যুদ্ধ বাধে। উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত আমীরের প্রিয় পুত্র শের আলি সিংহাসনে বসেন, কিন্তু তাঁহার দুই ভাই আজিম খাঁ ও আফজল খাঁ এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (আফজল খাঁর পুত্র) আবদুর রহমান খাঁ তাঁহার কর্তৃত্বের বিরোধিতা করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শের আলি কাবুল হইতে এবং ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে কান্দাহার হইতে বিতাড়িত হন। আফজল খাঁ আমীরের পদ অধিকার করেন। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়, এবং আজিম খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু শের আলি ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কান্দাহার এবং সেপ্টেম্বর মাসে কাবুল পুনরধিকার করেন। আজিম খাঁ পারশ্যে পলায়ন করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে সেখানেই মারা যান। আবদুর রহমান খাঁ তাশখন্দে পলাইয়া যান এবং সেখানে রুশিয়ার বৃত্তিভোগী রূপে বাস করিতে থাকেন। স্বীয় কর্তৃত্ব সুসংহত করিয়া শের আলি নির্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। লর্ড লিটনের আক্রমণাত্মক নীতি অনুসৃত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিরুদ্বেগেই ছিলেন।

সিংহাসন লইয়া দীর্ঘকালের এই যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে লরেন্স তাঁহার সেই 'প্রকৃত শাসকদের প্রতি হৃদ্যতা রক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকার' নীতিতে অবিচল ছিলেন। কোনও পক্ষই তাঁহার নিকট রাজনৈতিক, সামরিক বা আর্থিক সহায়তা লাভ করে নাই। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে শের আলি আফগানিস্থানের আমীর রূপে স্বীকৃত হইলেন; ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহাকে কান্দাহার ও হিরাটের এবং আফজল খাঁকে কাবুলের অধিপতি রূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়; আবার ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে আফজল খাঁ কাবুল ও কান্দাহারের এবং শের আলি হিরাটের অধিপতি রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। এই যে 'প্রকৃত শাসকদের প্রতি সৌহার্দ্য'—ইহাতে দুইটি বিপদ ছিল। প্রথমতঃ, ইহার ফলে পরোক্ষে আফগানিস্থানের রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রশ্রয় দান করা হইত, কেননা যে-কোনও সফলকাম বিদ্রোহীরই ব্রিটিশ স্বীকৃতি লাভের আশা ছিল। দ্বিতীয়তঃ, আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদে মোটেই হস্তক্ষেপ না-করার নীতির ফলে প্রতিপক্ষদের কেহই সন্তুষ্ট বোধ করিতেন না, কেননা প্রত্যেকেই অন্তরে অন্তরে ব্রিটিশের

সহায়তা লাভের আশা পোষণ করিতেন; শের আলি তাঁহার স্বার্থ সম্বন্ধে ব্রিটিশের এই ঔদাসীন্যের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন; তিনি নিজ ক্ষমতার পুনরুদ্ধার সাধন করার পর তাঁহাকে অর্থ ও অস্ত্রাদি প্রেরণ করিয়া শান্ত করিতে লরেন্সকে বিস্তর বেগ পাইতে হয়। তৎসত্ত্বেও লরেন্স কর্তৃক অনুসৃত নীতি মোটের উপর যুক্তিযুক্তই ছিল; অকল্যাণ্ড ও লিটনকে যে সকল গোলযোগের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়া দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল সে সব পরিহার করিয়া চলিবার ইহাই ছিল একমাত্র পন্থা।

মধ্য-এশিয়ায় রুশিয়ার প্রভাব ঃ লরেন্সের শাসনকালে রুশিয়া মধ্য-এশিয়ায় ধীরে ধীরে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করিয়া চলিতেছিল। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে রুশিয়া কর্তৃক তাশখন্দ অধিকৃত হয়, ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে অধিকৃত হয় সমরখন্দ ও বোখারা। ইংলণ্ডে জনৈক রুশ রাজদূত মন্তব্য করেন যে মধ্য-এশিয়া অধিকারের ফলে রুশিয়া কর্তৃক ভারতে হস্তক্ষেপের আশঙ্কা ইংলণ্ডকে সংযত থাকিতে বাধ্য করিবে। লরেন্স রুশ-আতঙ্কের গভীর তাৎপর্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন; এই সমস্যার সমাধানকল্পে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে তিনি একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গ-রুশ চুক্তি সম্পাদন করিয়া উভয় সাম্রাজ্যের নিজ নিজ প্রভাবপরিমণ্ডলের (sphere of influence) সীমারেখা নিরূপণে প্রয়াসী হইলেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে এইরূপ চুক্তির ফলে সমস্যার সমাধান হয় বটে, কিন্তু ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দেও এরূপ কোন সমাধান সম্ভবপর ছিল কি না সে কথা বলা কঠিন। ডড্‌ওয়েল বলিয়াছেন, "যে পর্যন্ত না ইংলণ্ড মধ্য-এশিয়ায় এইরূপ সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছে যে তাহাতে রুশিয়ার অন্তরে এইরূপ প্রতীতি জন্মে যে এদিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা একান্তই নিষ্ফল, সে পর্যন্ত কেবল ইউরোপীয় মহাদেশে রুশিয়ার নিকট ইংলণ্ডের স্বার্থ বলি দিয়াই এইরূপ চুক্তি সম্ভবপর হইতে পারিত।"

লর্ড মেয়োর আফগান-নীতি ঃ লরেন্সের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসেন লর্ড মেয়ো। তিন বৎসর (জানুয়ারী, ১৮৬৯—জানুয়ারী, ১৮৭২) কার্য নির্বাহের পর এক আততায়ীর ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হন। তিনি লরেন্সের আফগান-নীতিই অনুসরণ করিয়া যান।

লরেন্স শের আলির সহিত সাক্ষাতের জন্য এক সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ভারত ত্যাগের পূর্বে শের আলির পক্ষে সম্মেলনে

যোগদান করা সম্ভব হইয়া ওঠে নাই। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে লর্ড মেয়ো শের আলির সহিত আম্বালায় সাক্ষাৎ করেন। শোনা যায় যে বড়লাটের কূটনৈতিক সৌজন্যে শের আলির হৃদয়ে তাঁহার প্রতি 'প্রীতিমুগ্ধ বন্ধুত্বের' সঞ্চার হয়; ব্রিটিশ ভারতের জাঁকজমক এবং সামরিক শক্তিও তাঁহার অন্তরে গভীর রেখাপাত করে। কিন্তু যে সকল বিষয় তাঁহার একান্ত কাম্য ছিল সে সকল বিষয়ে প্রায় কোনরূপ সুযোগ-সুবিধাই তাঁহাকে দান করা হইল না। তিনি চাহিয়াছিলেন পাকাপোক্ত চুক্তি, নির্দিষ্ট বাৎসরিক বৃত্তি, চাহিবা-মাত্র সামরিক সাহায্যদান, সিংহাসনে তাঁহার নিজের ও নিজ বংশের দাবি সম্পর্কে ব্রিটিশের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি, এবং নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াকুব খাঁর পরিবর্তে প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লা জানকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকৃতিদান। এই সব সর্ত 'ব্রিটিশের শক্তি ও মর্যাদাকে অনিশ্চিত স্থায়িত্ব-সম্পন্ন প্রাচ্যের এক রাজবংশের সহিত বিপজ্জনকভাবে জড়াইয়া ফেলিতে পারিত।' লর্ড মেয়ো তাই শের আলিকে কিছু অস্পষ্ট আশ্বাস দিলেন, আপাততঃ তাহাতেই খানিকটা সন্তুষ্ট হইয়া শের আলি কাবুলে ফিরিয়া গেলেন।

আফগানিস্থান সম্পর্কে লরেন্স ও মেয়ো যে নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন রুশিয়ার সহিত মীমাংসা তাহার একটি অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ ছিল। ব্রিটিশ বৈদেশিক সচিব লর্ড ক্ল্যারেণ্ডন ও প্রখ্যাত রুশ মন্ত্রী প্রিন্স গর্ত্শাকফের (Gortschakoff) মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। সেণ্ট পিটার্সবার্গ-এ ভারত সরকারের মতামত পেশ করেন ডগলাস ফরসাইথ নামক বাঙ্গালা দেশের জনৈক রাজকর্মচারী। রুশিয়া (বদখ্শান্ সমেত) আফগানিস্থানের উপর শের আলির কর্তৃত্ব মানিয়া লয়। ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ এই হইয়া দাঁড়ায় যে আফগানিস্থান সম্বন্ধে রুশিয়া কোনরূপ ঔৎসুক্য পোষণ করিবে না। কিন্তু এইরূপ স্বীকৃতির ফলেও রুশিয়ার সুদূরপ্রসারী চক্রান্তজাল রচনা বন্ধ রহিল না। রুশীয় তুর্কীস্থানের গভর্ণর-জেনারেল কাউফ্মান্ (Kaufmann) আমীর শের আলির সহিত পত্রালাপ করিতে লাগিলেন। শের আলি এই সব চিঠিপত্র ভারত সরকারের নিকট পাঠাইয়া দেন। পরে সন্দেহের বিষয়রূপে গণ্য হইলেও প্রথমে এগুলিকে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই।

লর্ড নর্থব্রুকের আফগান-নীতি : পরবর্তী বড়লাট. লর্ড নর্থব্রুকের

শাসনকালে (১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের মে হইতে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত) রুশ আক্রমণের সন্ত্রাস প্রবল হইয়া ওঠে। তিনি ছিলেন স্থিরমস্তিষ্ক কূটনৈতিক এবং শাসনকার্য নির্বাহের ব্যাপারে সাবধান প্রকৃতির লোক। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে রুশরা খিভা অধিকার করিয়া লয়। রুশিয়ার এই অগ্রগতিতে ভীত হইয়া শের আলি বড়লাটের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া 'রুশ আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহায্যলাভ সম্পর্কে সুস্পষ্ট আশ্বাসবাণী' আদায়ের চেষ্টা করেন। নর্থব্রুক নিজে আনুষ্ঠানিকভাবে আশ্বাস প্রদানেরই পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন ভারত-সচিব ডিউক অফ অর্গাইল (Duke of Argyll) নর্থব্রুককে কেবল এইরূপ এক ঘোষণার নির্দেশ দিয়া পাঠান যে ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্থান সম্পর্কে পূর্ব স্থিরীকৃত নীতিই অনুসরণ করিয়া যাইবে। এইরূপ অস্পষ্ট ঘোষণার ফলে শের আলি স্বভাবতঃই হতাশ হন। ইহার কিছুদিন পরে ইয়াকুব খাঁকে গ্রেপ্তার করা এবং আবদুল্লা জানকে স্বীয় উত্তরাধিকারী রূপে ঘোষণা করার জন্য লর্ড নর্থব্রুক শের আলিকে 'সসম্ভ্রম ভর্ৎসনা' জ্ঞাপন করেন, তাহাতে তিনি বিরক্ত হন। সীস্তানে আফগানিস্থান ও পারস্যের মধ্যে রাজ্যের সীমানা লইয়া যে বিরোধ চলিতেছিল, তাহাতে মধ্যস্থতা করিয়া ভারত সরকার যে রায় দেয় তাহাও আমীরের অসন্তুষ্টির কারণ হইয়া উঠে। শের আলি তখন রুশদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। ১৮৭৫ সাল হইতে জেনারেল কাউফমানের সহিত তাঁহার আরও ঘন ঘন পত্র-বিনিময় হইতে থাকে, কাবুলেও রুশ চরদের আবির্ভাব দেখা দিতে আরম্ভ করে।

১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে ডিস্‌রেলী (Disraeli) ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হন এবং লর্ড স্যল্‌স্‌বেরী (Lord Salisbury) হন ভারত-সচিব। উদারনৈতিক দলের সাবধানতার পরিবর্তে অনুসৃত হইতে থাকে রক্ষণশীল দলের পররাজ্য-গ্রাসের প্রচেষ্টা। এই নূতন কর্মপন্থা অনুসরণের মূলে ছিল রুশিয়ার প্রতি গভীর অবিশ্বাস। স্যলস্‌বেরী প্রস্তাব করিলেন যে শের আলিকে তাঁহার রাজ্যে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখিতে বলা হউক। কাউন্সিলের সদস্যগণের পূর্ণ সমর্থনে নর্থব্রুক ইহার প্রতিবাদ জানাইলেন। ইহার অল্পকাল পরেই নর্থব্রুক পদত্যাগ করেন এবং ডিস্‌রেলীর "দৃপ্ত বৈদেশিক নীতি"-কে (spirited foreign policy) কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্য বড়লাট নিযুক্ত হইয়া আসিলেন লর্ড লিটন।

লর্ড লিটনের আফগান নীতি ঃ দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সূত্রপাত ঃ লর্ড লিটন ছিলেন একজন বহুদর্শী কূটনীতিবিদ এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কিন্তু ভারতে তাঁহার শাসননীতি সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির ফলে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ বাধিয়া যায়; তাঁহার আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থাও জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম প্রথম তাঁহার আফগান-নীতি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার নির্দেশেই নিয়ন্ত্রিত হইত; কিন্তু চূড়ান্ত সংকট ঘনাইয়া আসিবার পূর্বেই তিনি নিজ দায়িত্বে এক বিচিত্র দ্বন্দনীতির পথ গ্রহণ করেন। ডিস্‌রেলী ও স্যলস্‌বেরী প্রকাশ্য বক্তৃতায় তাঁহাকে সমর্থন জ্ঞাপন করিলেও তাঁহার অনুসৃত কর্ম-নীতির ফলাফল দর্শনে অন্তরে অন্তরে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। এইরূপ কর্মপন্থা অনুসরণের ফলে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় সেজন্য—সম্পূর্ণরূপে না হইলেও—প্রধানতঃ দায়ী করিতে হয় কেবল লর্ড লিটনকেই।

লর্ড লিটন যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন তাহাকে এইরূপ নির্দেশ দিয়া পাঠানো হইয়াছিল যে শের আলির সঙ্গে এমন এক 'স্পষ্টতর মৈত্রীচুক্তি' সম্পাদন করিতে হইবে যাহাতে 'উভয় পক্ষের মধ্যে সাম্য রক্ষা হয় এবং তাহা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে', কিন্তু এই নূতন নীতি কিভাবে এবং কখন কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে সে বিষয়ে তাঁহার প্রতি কোনরূপ বাধ্যতামূলক নির্দেশ ছিল না। সুতরাং কাবুলের সহিত আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিতে তিনি যে অতিমাত্র ব্যগ্রতার পরিচয় দেন, সে জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাকে দোষ দেওয়া যায় না। শের আলির নিকট সংবাদ গেল যে তিনি যদি হিরাটে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে গ্রহণ করিতে সম্মত থাকেন, তাহা হইলে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুকের নিকট তিনি যে-সকল শর্ত পেশ করিয়াছিলেন তাহার সবগুলিই মঞ্জুর করা হইবে। শের আলি উত্তরে জানাইলেন যে রুশিয়াকেও অনুরূপ অধিকার না দিয়া ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে গ্রহণ করা চলে না। তাঁহার এই উত্তর লর্ড লিটনের নিকট ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতি আমীরের 'অবজ্ঞামিশ্রিত ঔদাসীন্য'রূপে প্রতিভাত হইল। শের আলিকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল যে 'তিনি আফগানিস্থানকে ব্রিটিশের মৈত্রী এবং সমর্থন হইতে বিচ্ছিন্ন' করিয়া ফেলিতেছেন। বড়লাটের কাউন্সিলে তিনজন সদস্য শের আলির মনোভাবের যৌক্তিকতা স্বীকার

করিয়া লর্ড লিটনের সহিত নিজেদের মতান্তর প্রকাশ করিলেন। ব্রিটিশ সরকারের কাবুলস্থ মুসলমান এজেন্টের সঙ্গে সিমলায় বড়লাটের সাক্ষাৎ হইলে বড়লাট তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে শের আলি ইংলণ্ডের সঙ্গে শত্রুতা করিলে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি 'তাঁহাকে উলুখাগড়ার মতো টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারে'। এই অপ্রীতিকর মন্তব্য যাহাতে আমীরের কানে গিয়া পৌছায় সেইজন্যই উহা বলা হইয়াছিল।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের শেষাশেষি কালাতের খাঁর সহিত সম্পাদিত এক চুক্তিবলে ব্রিটিশরা কোয়েটা দখল করার অধিকার পায়। আফগানিস্থানে প্রবেশের অন্যতম পথ বোলান গিরিবর্ত্মের উপর খবরদারি করিবার পক্ষে কোয়েটার অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ কর্তৃক কোয়েটা অধিকার আমীরের চক্ষে সম্ভবতঃ কান্দাহার অভিমুখে অভিযানের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবেই প্রতিভাত হয়।

১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পেশোয়ারে ব্রিটিশ ও আফগান প্রতিনিধিদের এক বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়; হিরাটে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখার প্রশ্ন সম্পর্কে কোনরূপ মতৈক্য সম্ভব হইল না। লর্ড লিটন তখন (তাঁহার নিজের ভাষায়ই) 'আফগান শক্তি যাহাতে ধীরে ধীরে ব্যবচ্ছিন্ন ও দুর্বল হইয়া যায়' তাহার জন্য সচেষ্ট হইলেন। কাশ্মীরের মহারাজার সহিত এক ব্যবস্থাক্রমে গিল্‌গিটে একটি ব্রিটিশ ঘাঁটি (এজেন্সী) স্থাপিত হইল। সীমান্তের বহু অভিজ্ঞ রাজকর্মচারী এই ব্যবস্থার নিন্দা করিলেন। অধিকন্তু ইহার ফলে আমীরের আশঙ্কা ও বিরক্তি বৃদ্ধি পাইবারও সম্ভাবনা ছিল।

ইউরোপে রুশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে সংগ্রাম (১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল), সান্ স্টেফানোর সন্ধি (১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ), ডিস্‌রেলীর সমরায়োজন (ইহার ফলে ইউরোপে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রেরণের আয়োজন করা হইয়াছিল) এবং বার্লিন কংগ্রেস (১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের জুন-জুলাই)—মধ্য-এশিয়ায় রুশ কূটনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ইউরোপে কূটনীতির খেলায় ইংলণ্ডের নিকট হার স্বীকার করিয়া রুশিয়া এশিয়ায় তাহার শোধ তুলিতে চাহিল। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে জেনারেল কাউফমানের এক পত্র লইয়া জেনারেল স্তোলিয়েতফ্ (Stolietoff) নামক একজন সামরিক

কর্মচারী তাশখন্দ হইতে কাবুল অভিমুখে যাত্রা করেন। শের আলি তাঁহার অগ্রগতিতে বাধা দেন—অবশ্য দৃঢ়তা-সহকারে না শিথিলভাবে তাহা বলা যায় না। তবে তিনি জুলাই মাসে কাবুলে আসিয়া পৌঁছান এবং আমীরের সহিত চিরকালীন মৈত্রীবন্ধনের এক চুক্তি সম্পাদন করেন। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সমর্থনে লর্ড লিটন তখন আমীরকে কাবুলে এক ব্রিটিশ দূতকে গ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু ইহা লইয়া তাড়াহুড়া করার একান্ত প্রয়োজন কিছুই ছিল না, কেননা বার্লিনের সন্ধির ফলে ইউরোপে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল, এবং স্তোলিয়েতফ্ যখন শুনিলেন যে ব্রিটিশরা প্রতি-নিধিদল পাঠাইতে চাহে তখন তিনি কাবুল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। লর্ড লিটনও অশোভন দ্রুততার সহিত স্যার নেভিল চেম্বারলেনকে (Sir Neville Chamberlain) কাবুলে দৌত্যকার্যে প্রেরণ করিলেন। ডিস্‌রেলী ও স্যল্‌স্‌বেরী উভয়েই এই দ্রুততার নিন্দা করিলেন বটে, কিন্তু তখন আর সে অবাঞ্ছিত কার্য রোধ করিবার সময় ছিল না। আফগানরা দূতপ্রবরকে খাইবার গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করিতে দিল না। লর্ড লিটন ঘোষণা করিলেন যে দূতদলকে 'বলপ্রয়োগে প্রতিনিবৃত্ত' করা হইয়াছে। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ (১৮৭৮-৮১) : লর্ড লিটনের তাড়াহুড়া যে কিরূপ অবিবেচনার কাজ হইয়াছিল তাহা শের আলি কর্তৃক যুদ্ধের প্রাক্কালে কাউফ্‌মানের নিকট সাহায্যের আবেদনের সহানুভূতিহীন উত্তর হইতেই বুঝা যায়। রুশ জেনারেল কাউফ্‌মান আমীরকে ব্রিটিশের সহিত শান্তিস্থাপন করিবার পরামর্শ দেন।

ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরিয়া তিনটি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী আফগানিস্থান অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিল : খাইবার গিরিপথ ধরিয়া অগ্রসর হইলেন স্যার স্যামুয়েল ব্রাউন, কুর্‌রম উপত্যকা দিয়া অগ্রসর হইলেন জেনারেল রবার্টস্, আর বোলান গিরিপথ দিয়া অগ্রসর হইলেন জেনারেল স্টুয়ার্ট। কান্দাহার অধিকার করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। শের আলি রুশীয় তুর্কীস্থানে পলায়ন করিলেন। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র ইয়াকুব খাঁ ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে গণ্ডমকে এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। যে সমস্ত শর্তে তাঁহাকে আমীর বলিয়া স্বীকার

করা হইল সেগুলি এইঃ ব্রিটিশের পরামর্শানুযায়ী আফগানিস্থানের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রিত হইবে ; ব্রিটিশকে কুর্‌রম্‌, পিশিন ও সিবি জেলার অধিকার ছাড়িয়া দিতে হইবে ; কাবুলে স্থায়ীভাবে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট রাখিতে হইবে এবং হিরাট ও সীমান্তের অন্যান্য স্থানে ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা থাকিবেন ; আমীর বার্ষিক ছয় লক্ষ টাকা বৃত্তি ও বৈদেশিক আক্রমণ হইলে সামরিক সাহায্য পাইবেন।

কিন্তু স্বাধীনচেতা আফগানদের নিকট ইয়াকুব খাঁ অল্পকালের মধ্যেই শাহ সুজার ন্যায় অপ্রিয় হইয়া পড়েন, এবং ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার দরবারস্থ ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ক্যাভানারি (Canvagnari) ম্যাক্‌-নাটেনের (Macnaghten) মতই আফগানদের হাতে প্রাণ হারান। এই ব্যাপারের সহিত ইয়াকুব খাঁর যোগসাজস ছিল এই সন্দেহে তাঁহাকে ভারতে নির্বাসিত করা হয়। ১৯২৩ সালে ভারতেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ব্রিটিশ বাহিনী পুনরায় কান্দাহার ও কাবুল অধিকার করে। লর্ড লিটন কাবুল হইতে কান্দাহারকে পৃথক করার কথা চিন্তা করিতে থাকেন। এইরূপ অবস্থার মধ্যে আবদুর রহমান খাঁ রুশিয়া হইতে আফগানিস্থানে ফিরিয়া আসিয়া কাবুলের সিংহাসনের উপর নিজ দাবি ঘোষণা করিলেন। লর্ড লিটন তাঁহাকেই আমীর বলিয়া স্বীকার করা সাব্যস্ত করেন। কিন্তু তাহার পূর্বেই ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের ফলে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয় (১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস)।

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সাধারণ নির্বাচনে ডিস্‌রেলী পরাজিত হন। উদারনৈতিক দল পুনরায় শাসনক্ষমতা লাভ করে, প্রধান মন্ত্রী হন গ্ল্যাড্‌স্টোন। উদারনৈতিক দল ডিস্‌রেলী ও লিটনের আফগান-নীতির ঘোরতর বিরোধী ছিল। ভারতে নূতন কর্মনীতি প্রবর্তনের জন্য লর্ড রিপনকে বড়লাট রূপে প্রেরণ করা হয়। ভারতে আগমনের পর (১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস) লর্ড রিপন আবদুর রহমানের সহিত সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হন এবং তিনটি সর্তে তাঁহাকে আমীর বলিয়া স্বীকার করেন। সর্তগুলি এই : ব্রিটিশ ব্যতীত অন্য কোনও বৈদেশিক শক্তির সহিত আমীর রাজনৈতিক সম্পর্ক রাখিবেন না, পিশিন ও সিবি জেলা ব্রিটিশের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে, আমীর একটি বার্ষিক বৃত্তি পাইবেন। কাবুলে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট রাখার দাবী পরিত্যক্ত হয়।

অবশ্য আয়ুব খাঁ নামে শের আলির এক পুত্র নূতন গোলযোগের সৃষ্টি করিলেন ; তাঁহার অধিকারে ছিল হিরাট। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি মাইবন্দ নামক স্থানে একদল ব্রিটিশ সৈন্যকে পরাজিত করিয়া হতাবশিষ্ট সকলকে কান্দাহারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। কুড়ি দিনে দুইশত মাইল গিরিসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া জেনারেল রবার্টস্ কাবুল হইতে কান্দাহারে আসিয়া পৌছিলেন এবং আয়ুব খাঁর বাহিনীকে উৎখাত করিয়া অবরুদ্ধ ব্রিটিশ বাহিনীকে মুক্তি দিলেন। পরে আবদুর রহমানের নিকট আয়ুব খাঁর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। আফগানিস্থানকে বিভক্ত করিবার জন্য লিটনের যে পরিকল্পনা ছিল তাহা ত্যাগ করা হয়। সমগ্র দেশ আবদুর রহমানের শাসনাধীনে আসে এবং সমস্ত ব্রিটিশ সৈন্য সরাইয়া আনা হয়।

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের মূল কারণ হয়তো ছিল অসঙ্গত আশঙ্কা এবং অবিবেচনাপ্রসূত ত্বরা, কিন্তু রাজনৈতিক ও সামরিক দিক হইতে প্রথম আফগান যুদ্ধের ন্যায় ইহা নিষ্ফল হয় নাই। ইহার ফলে বহু গুরুত্বপূর্ণ লাভ হয়, যথা—মধ্য-এশিয়ায় রুশ উচ্চাভিলাষকে নিশ্চিতভাবে অবদমিত করা, আফগানিস্থানের বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন, সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কালাত রাজ্যের উপর ব্রিটিশ অধিকার স্থাপন, গিলগিট ও কোয়েটা দখল, ব্রিটিশ বেলুচিস্থানের সৃষ্টি (আমীরের নিকট হইতে অধিকৃত সিবি ও পিশিন জেলা ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।)

মধ্য-এশিয়ায় ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা (১৮৮১-১৯০৭) ঃ ব্রিটিশ ও আফগানরা যখন দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, তখন রুশরা ধীরে ধীরে মধ্য-এশিয়ায় অগ্রসর হইতে থাকে। খোকন্দ রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার পর (১৮৭৬) তেক্কে তুর্কোমানদের পদানত করা হয় (১৮৮১) এবং মার্ভের পতন ঘটে (১৮৮৪)। মার্ভ আফগান-সীমান্ত হইতে মাত্র ১৫০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত ছিল, সুতরাং রুশগণ কর্তৃক ইহা অধিকৃত হইলে ব্যাপারটিতে দুরভিসন্ধি আরোপ করা হয়। আফগানিস্থানের উত্তর সীমান্ত নির্ণয় করার জন্য রুশগণ এক যুক্ত ইঙ্গ-রুশ কমিশন গঠন করিবার প্রস্তাব করে ; লর্ড রিপন তাহা মানিয়া লন। তাঁহার পরবর্তী বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিন্‌কে এক সংকটের সমাধান করিতে হয়। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে যুক্ত কমিশনের আলোচনা যখন এক অচল অবস্থার মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায়

তখন রুশরা মার্ভ হইতে একশত মাইল উত্তরে পাঞ্জ্‌দেহ্‌ নামে একটি গ্রাম দখল করিয়া বসে। যুদ্ধ অনিবার্য বলিয়া মনে হইতে থাকে। কিন্তু বড়লাট ও আমীরের শুভবুদ্ধির ফলে যুদ্ধ বাধিল না: পাঞ্জ্‌দেহ্‌-এর ঘটনাকে যুদ্ধের কারণ বলিয়া গণ্য করিতে উভয়েই অস্বীকার করিলেন। অবশেষে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে এক চুক্তির ফলে সীমান্ত-চিহ্ন সম্পর্কে বিরোধের মীমাংসা ঘটিল। হিরাট অভিমুখে রুশিয়ার অগ্রগতি স্পষ্টতঃই প্রতিহত হইয়া গেল। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে রাওয়ালপিণ্ডিতে আমীর ও বড়লাটের এক বৈঠকে উভয় সরকারের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়।

লর্ড ডাফ্‌রিনের পরে লর্ড ল্যান্সডাউন যখন বড়লাট হইয়া আসিলেন (ডিসেম্বর, ১৮৮৮), তখন আবদুর রহমান ও ব্রিটিশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ল্যান্সডাউন ডাফ্‌রিনের ন্যায় কূটনীতিতে সুচতুর ছিলেন না। আমীর নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ল্যান্সডাউনের 'স্বৈরাচারী-সুলভ' পরামর্শদানকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিলেন না। 'অগ্রগামী গোষ্ঠি'র (Forward School) কার্যকলাপেও আমীর কিছুটা সন্দিগ্ধ হইয়া উঠেন। বোলান গিরিবর্ত্ম অবধি সামরিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি রেলপথ নির্মাণ করা হয়, কাশ্মীর-সীমান্তে চিত্রল ও গিলগিটে তৎপরতা দেখা যায়। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে স্যার মর্টিমার ডুরাণ্ড (Sir Mortimar Durand) কাবুলে এক প্রতিনিধিদল লইয়া যান, আমীরের সহিত একটি চুক্তি হয়। চুক্তির সর্তানুযায়ী আমীর আফ্রিদি, ওয়াজিরি ও সীমান্তের অন্যান্য উপজাতিগুলির উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করেন।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে রাজ্যসীমা সম্পর্কে রুশিয়ার সহিত এক চুক্তি হয়। তদনুযায়ী দক্ষিণে রুশ সাম্রাজ্যের সীমা নির্দিষ্ট হয় অক্ষু নদী অবধি। "এই যে ব্রিটিশ ও রুশ রাজপুরুষগণ কর্তৃক হিন্দুকুশ পর্বতে এবং অক্ষু নদী বরাবর সীমা রেখা টানা—ইহাই ছিল দুইটি ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে তাহাদের ক্রমবর্ধমান এশীয় সাম্রাজ্যের সংঘাত এড়াইবার প্রথম সুচিন্তিত ও বাস্তব প্রচেষ্টা।"

এই ব্যাপারে যাঁহাকে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল সেই বড়লাট লর্ড এলগিনকে ১৮৯৭-৯৮ খ্রীস্টাব্দে সীমান্ত অঞ্চলে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দমন করিতে হয়। চিত্রলের ব্যাপারে ব্রিটিশের হস্তক্ষেপই ছিল এই অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ কারণ, তবে প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল 'অগ্রগামী গোষ্ঠি'র

পররাজ্যগ্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপেরই চরম পরিণতি। এই উপদ্রুত এলাকায় শান্তি স্থাপনের কাজ সমাপ্তি লাভ করে লর্ড কার্জনের আমলে। তিনি ধীরে ধীরে উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল হইতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী সরাইয়া আনেন এবং উহার রক্ষাব্যবস্থা উপজাতীয় সৈন্যবাহিনীর উপরই ছাড়িয়া দেন। নূতন একটি প্রদেশ—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—গঠন করিয়া উপজাতি সংক্রান্ত ব্যাপারাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যবস্থাও হয়।

আমীর আবদুর রহমান ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সিংহাসন লাভ করেন তাঁহার পুত্র হবিবুল্লা—কোনরূপ গৃহযুদ্ধ দেখা দেয় না। পূর্বতন আমীরের সহিত ব্রিটিশের যে সন্ধি হইয়াছিল তাহাই আবার নূতন করিয়া নূতন আমীরের সহিত স্থাপন করার প্রশ্ন লইয়া কিছুকাল গোলযোগ চলিতে থাকে বটে, কিন্তু লর্ড কার্জন ছুটি লইয়া দেশে গেলে যাঁহার হাতে ছিল বড়লাটের কার্যভার সেই লর্ড অ্যাম্প্‌টহিল (Lord Ampthill) কাবুলে একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, নূতন করিয়া সন্ধি স্থাপিত হয় (১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস), হবিবুল্লার সঙ্গেও হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠে।

এই সময়ে মধ্য-এশিয়া ও পারস্যে ব্রিটিশ ও রুশ স্বার্থের মীমাংসার জন্য রুশিয়ার সহিত নূতন এক চুক্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইউরোপে জার্মানী ও ইংলণ্ডের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসম্প্রীতি, রুশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন, এবং ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী (Entente) (১৯০৪) স্থাপন—এই সকল পরিবর্তনের ফলে ইঙ্গ-রুশ চুক্তির পথে যে-সকল কূটনৈতিক বাধা ছিল তাহা দূরীভূত হয়। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের বিখ্যাত ইঙ্গ-রুশ চুক্তি (Anglo-Russian Convention) সম্পাদনের পূর্বে বড়লাট লর্ড মিণ্টো আমীরের সহিত আলোচনা প্রয়োজন ও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন ভারত-সচিব জন মর্লি (John Morley) বলেন, 'একেবারে চূড়ান্ত ব্যাপার বলিয়া আমীরকে চুক্তির সর্তগুলি জানাইয়া দিলেই চলিবে।' চুক্তি অনুযায়ী রুশিয়া আফগানিস্থানকে নিজ প্রভাব-পরিমণ্ডলের (sphere of influence) বহির্ভূত বলিয়া স্বীকার করিল এবং ব্রিটিশ সরকারের মারফৎই আমীরের সহিত নিজ সম্পর্ক বজায় রাখিতে স্বীকৃত হইল। স্থির হইল যে ব্রিটিশ ও রুশ প্রজাগণ আফগানিস্থানে বাণিজ্য সম্বন্ধে সমান সুবিধা ভোগ করিবে। আমীর তাঁহার অগোচরে সম্পাদিত

এই চুক্তিকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করিলেন; লর্ড মিণ্টো নিজেও ইহার উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন।

উত্তর ব্রহ্ম দখল (১৮৮৫-৮৬): ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে রুশিয়া যেমন ব্রিটিশের ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনই উত্তর-পূর্বে ব্রিটেনকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল ফ্রান্স। ইন্দো-চীনে ফ্রান্সের কার্যকলাপের ফলেই উত্তর-ব্রহ্মকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধের পরে ব্রহ্মের রাজসিংহাসন দখল করিয়া বসেন রাজা মিন্‌ডন। পেগুর পুনরুদ্ধার সাধনের জন্য তিনি বড়ই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠেন। লর্ড ডালহৌসী তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের নিকট এই অলীক আশায় দূত প্রেরণ করেন যে নেপোলিয়ন ভারত-সরকারের নীতি পরিবর্তন করাইবার জন্য রাণী ভিক্টোরিয়া ও ইংলণ্ডের মন্ত্রিবর্গকে সম্মত করাইতে পারিবেন। নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সের সহিত ব্রহ্মের এক সন্ধি হয়। ইটালীর সহিতও অপর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। রুশিয়ার সম্রাট ব্রহ্মের রাজদূত গ্রহণে অসম্মত হন, কিন্তু পারস্যের শাহ ব্রহ্মের রাজদূতকে ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে সাদরে গ্রহণ করেন। রাজা মিন্‌ডন কর্তৃক বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অবিরত প্রচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ রাজনৈতিক প্রভাব হইতে উত্তর ব্রহ্মের মুক্তি সাধন।

আভ্যন্তরীণ নীতিতে মিন্‌ডন বিশেষ সাবধান ছিলেন; যাহাতে ভারত-সরকারের কোনরূপ অসন্তুষ্টির উদ্রেক হইতে পারে সেরূপ কাজ হইতে বিচক্ষণের ন্যায় তিনি বিরত থাকিতেন। ১৮৬২ ও ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে সম্পাদিত দুইটি বাণিজ্য-চুক্তির দ্বারা তিনি ব্রহ্মে ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্রিটিশ প্রজাদের বিশেষ সুবিধা দান করেন। তবে তাঁহার রাজত্বকালের শেষ দিকে তিনি মান্দালয়স্থিত ব্রিটিশ প্রতিনিধির সহিত আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক বজায় রাখিতে অস্বীকৃত হন।

১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে মিন্‌ডনের পুত্র থিব মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার কোনরূপ রাজনৈতিক শিক্ষাদীক্ষা অথবা শাসনকার্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা ছিল না। ব্রিটিশ কূটনীতির গোলক-ধাঁধার মধ্যে পথ চিনিয়া চলিবার সম্ভাবনা তাঁহার পক্ষে খুব কমই ছিল।

লর্ড লিটন উত্তর-ব্রহ্মের উপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিলে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা তাঁহাকে সে চেষ্টা হইতে বিরত করেন। যে সকল প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রশ্নের তখনও কোন সমাধান হয় নাই সেগুলির মীমাংসাকল্পে লর্ড রিপন নূতন একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দেখা যায় কোনরূপ চুক্তিই সম্ভব নয়।

ফ্রান্সের সহিত নূতন করিয়া রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলেই থিব নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিলেন। গত শতাব্দীর অষ্টম দশকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। উত্তর-ব্রহ্মের অবস্থান ছিল ব্রিটিশ ব্রহ্ম এবং আসাম এই দুইটি ব্রিটিশ প্রদেশের সন্নিকটে, কোন বহিঃশত্রু কর্তৃক ঐ প্রদেশদ্বয়ের সম্ভাব্য আক্রমণ-পথের মুখেই; তাই উত্তর-ব্রহ্মে ফরাসী-প্রভাব বৃদ্ধি ইংলণ্ড মানিয়া লইতে পারিত না। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে থিবর দূতদল প্যারিসে গমন করেন; ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে মিন্‌ডনের সহিত সম্পাদিত পূর্বতন সন্ধিচুক্তির পুনর্নবীকরণ হয়। যদিও এই সন্ধিচুক্তিগুলি বাণিজ্যিক চুক্তি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না, তাহা হইলেও ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হইয়া উঠিল। পরে রাজা থিব একটি ফরাসী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে উত্তর-ব্রহ্মের কতিপয় চুণী-খনির ব্যবহার-অধিকার দান করিলে এই আশঙ্কা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বোম্বাই-বর্মা ট্রেডিং কর্পোরেশন নামক এক ইংরেজ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রাপ্য অর্থ লইয়া ব্রহ্ম সরকারের সহিত এক বিরোধ উপস্থিত হয়, ইহাই হইয়া দাঁড়াইল যুদ্ধের কারণ। লর্ড ডাফ্‌রিন কর্তৃক প্রেরিত এক ব্রিটিশ ফৌজ প্রায় বিনা বাধায় মান্দালয় অধিকার করে (১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর)। থিব আত্মসমর্পণ করেন। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী লর্ড ডাফ্‌রিন উত্তর-ব্রহ্ম অধিকার ঘোষণা করেন।

লর্ড কার্জনের বৈদেশিক নীতি ঃ ব্রিটেনের প্রাচ্যদেশীয় সাম্রাজ্য শাসনের জন্য প্রেরিত রাজপুরুষদের মধ্যে লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫) নিঃসন্দেহে ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ শাসক। গভর্ণর-জেনারেলদের মধ্যে একমাত্র লর্ড ডালহৌসী ব্যতীত তিনিই ছিলেন বয়ঃকনিষ্ঠ। শাসনকার্যে তাঁহার অপরিসীম উৎসাহ-উদ্যমের জন্য তিনি ছিলেন লর্ড ডালহৌসীর সহিত তুলনীয়। বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া এশিয়ার দেশগুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

তিনি সাহিত্য-প্রতিভা, বাগ্মিতা এবং কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার যাবতীয় ক্রিয়াকলাপে যে কর্তৃত্বাভিমান ও অসহিষ্ণু ত্বরা ফুটিয়া উঠিত সেজন্য তিনি ভারতবাসীর অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠেন, এবং তাঁহার সংস্কার-কার্যেরও গুরুত্বহানি ঘটে। তিনি ছিলেন জনহিতৈষী স্বৈরাচারীর এক উদাহরণস্থল স্বরূপ। বিধির বিধানে যে লক্ষ লক্ষ প্রজার শাসনভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল তিনি ছিলেন তাহাদের কল্যাণকামী, কিন্তু তাহাদের চিত্তে যে রাজনৈতিক আদর্শের স্ফুরণ হইয়াছিল তাহার প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণে অক্ষম। ভারত-ত্যাগের পর তিনি ইংলণ্ডের রাজনীতিতে এক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হন; তিনি যে তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা সফল করিতে—অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিতে পারেন নাই তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি লর্ড-সভার সভ্য ছিলেন, কিন্তু গণতান্ত্রিক যুগে প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে কমন্স-সভার সভ্যপদ অপরিহার্য ছিল।

সীমান্তের উপজাতিসমূহ এবং আফগানিস্থানের আমীরের সম্পর্কে লর্ড কার্জনের নীতির কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার পর পারস্যের উপর তাঁহাকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হয়। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে হিরাট অবরোধের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর হইতে পারসিকরা সামরিক দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ এই শহরটি দখল করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল। হিরাট অভিমুখে তাহাদের অগ্রগতির ফলেই ১৮৫৬-৫৭ খ্রীস্টাব্দে স্বল্পকালস্থায়ী ইঙ্গ-পারসিক যুদ্ধ বাধে।

ইহার পরে পারস্য উপসাগরের সমস্যা লইয়া ইঙ্গ-পারসিক সম্পর্কের ইতিহাসে নূতন এক অধ্যায়ের সূচনা হয়। পারস্য উপসাগরের উপর কর্তৃত্ব ব্রিটেনের পক্ষে ছিল জীবনমরণের প্রশ্ন: ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্যই এই উপসাগর অথবা ইহার উপকূলের কোনও অংশ অন্য কোনও ইউরোপীয় শক্তির প্রভাবাধীন না-হওয়া প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে কর্তৃত্ব করিবার জন্য ফ্রান্স, রুশিয়া, জার্মানী ও তুরস্ক ব্রিটেনের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইল। লর্ড কার্জন দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করিয়া পারস্য উপসাগরের উপকূলে এই সকল শক্তির অধিকার স্থাপনের কতিপয় প্রচেষ্টা নিষ্ফল করিয়া দেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ চুক্তির (Anglo-Russian Convention) ফলে পারস্যকে দুই প্রভাব-

পরিমণ্ডলে (sphere of influence) বিভক্ত করা হয়; উত্তর-পারস্য আসে রুশিয়ার এবং দক্ষিণ-পূর্ব পারস্য থাকে ব্রিটেনের প্রভাব-পরিমণ্ডলে। অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটেন এবং রুশিয়া উভয়েই পারস্যের অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের অঙ্গীকার করে।

ইহার পর তিব্বত। নামে মাত্র চীনের প্রভাবাধীন এই রাজ্যটি আসলে ছিল এক স্বাধীন ধর্মতন্ত্র; দলাই লামা নামে পরিচিত এক পুরোহিত তিব্বতে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ-বর্জিত এই দেশটির সহিত ব্রিটিশের সম্পর্কের সূত্রপাত হয় ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে; হেস্টিংস তখন তিব্বতে বোগ্‌ল্ (Bogle) নামে এক দূত প্রেরণ করেন। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিব্বতীরা সিকিম আক্রমণ করে, কিন্তু এক ব্রিটিশ ফৌজের দ্বারা তাহারা প্রতিহত হইয়া যায়। ১৮৯০ ও ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিব্বতের সীমান্ত ও ব্যবসায়িক ব্যাপারে ভারত ও চীনের মধ্যে যে সমস্ত চুক্তি হয়, তিব্বত নিঃশব্দে সেগুলি উপেক্ষা করিয়া চলিতে থাকে। লর্ড কার্জনের কার্যভার গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে দলাই লামা দোর্জিয়েফ্ নামক একজন রুশীয়ের প্রভাবাধীন হইয়া পড়েন এবং গুজব রটে যে চীনের সহিত এক গোপন চুক্তিবলে রুশিয়া তিব্বতে কতকগুলি অধিকার লাভ করিয়াছে। তিব্বতে এক প্রতিনিধিদল প্রেরণের জন্য লর্ড কার্জন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার অনুমোদন লাভ করেন। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে কর্নেল ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ড (Younghusband) সসৈন্যে লাসায় উপস্থিত হন এবং এক চুক্তি দ্বারা তিব্বতে বাণিজ্য বিপণি খোলা ও তিব্বত কর্তৃক ব্রিটিশ সামরিক অভিযানের জন্য ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করেন। ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ড লাসার অবগুণ্ঠন মোচন করিলেও তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত চুক্তির এমন রাজনৈতিক মূল্য ছিল না যাহার জন্য তাঁহার এই অভিযান যে বিপুল বিজ্ঞপ্তি লাভ করিয়াছে তাহা সমর্থন করা যায়। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে সম্পাদিত ইঙ্গ-রুশ চুক্তিতে ব্রিটেন ও রুশিয়া চীনের মারফৎ তিব্বতের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখিতে, তিব্বতের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে হস্তক্ষেপ না করিতে, এবং তিব্বতের কোনও অংশ দখল না করিতে স্বীকৃত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)ঃ ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে

ইউরোপে যে যুদ্ধ বাধিয়া যায়, ভারতের প্রতিরক্ষার সহিত তাহার কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকিলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি অংশ হিসাবেই ভারতবর্ষ যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে এবং যুদ্ধজয়ে যথেষ্ট সহায়তা করে। ভারতবর্ষ কেবল যে সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিয়াই ক্ষান্ত ছিল তাহাই নয়, যুদ্ধ-ঋণের মধ্যে ১০ কোটি টাকা পরিশোধেরও দায়িত্ব গ্রহণ করে। ভারত সচিব লর্ড বার্কেন্‌হেড (Birkenhead) বলেন, "ভারতের সাহায্য বিনা যুদ্ধ জিতিতে পারা যাইত বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও নিঃসন্দেহে ঐ সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধজয় বহুকাল বিলম্বিত হইত।" এস্থলে লক্ষণীয় যে ভারতের কোনও কোনও অংশে এই সময়ে অশান্তির লক্ষণ দেখা দেয়, অথচ এ-সময়ে ভারত হইতে "ফৌজ সরাইয়া লওয়ায় এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ভারতে মাত্র ১৫ হাজারের অধিক সৈন্য ছিল না।" আফগানিস্থানে জার্মান ও তুরস্কের চক্রান্তের ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গোলযোগ দেখা দেয় এবং ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ওয়াজিরিস্থানে একটি পূরাদস্তর বাহিনী প্রেরণ করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

তৃতীয় আফগান যুদ্ধ (১৯১৯) ও তাহার পরবর্তী ঘটনা : ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আমীর হবিবুল্লার নানা অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে কাবুলে তৎপর জার্মান চরদের কথায় তিনি কর্ণপাত করেন নাই। রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) পরে অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। রুশ আক্রমণের আশঙ্কা তিরোহিত হওয়ায় এবং অকস্মাৎ মিত্রশক্তি রুশিয়ার পতনের ফলে মধ্য-এশিয়ায় ব্রিটেনও দুর্বল হইয়া পড়ায় কাবুল প্রাচীন-পন্থীরা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে স্পষ্টতঃই প্রতিকূল মনোভাব অবলম্বন করে।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আমীর হবিবুল্লা আততায়ীর হস্তে নিহত হন; তাঁহার পুত্র আমানুল্লা সিংহাসনে আরোহণ করেন। নূতন আমীর তাঁহার পিতা ও পিতামহের অনুসৃত বিজ্ঞোচিত নীতি পরিহার করিয়া ব্রিটিশ এলাকা আক্রমণ করিয়া বসেন। তৃতীয় আফগান যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল ছিল সংক্ষিপ্ত, গতি ছিল দ্রুত। রাওয়ালপিণ্ডিতে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত এক সন্ধি দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটে। পরে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে অপর সন্ধিতে পূর্বতন সন্ধি সমর্থিত হয়। ইহার ফলে আফগানিস্থান বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইয়া পূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্রের

মর্যাদা লাভ করে। ব্রিটিশ সরকার লণ্ডনে একজন আফগান দূত রাখিতে এবং কাবুলে একজন ব্রিটিশ দূত নিয়োগ করিতে সম্মত হন। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে একটি বাণিজ্যিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।

আফগানিস্থানকে দ্রুতগতিতে একটি আধুনিক ভাবাপন্ন দেশে পরিণত করিতে গিয়া আমানুল্লাকে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। বাচ্চাই সাকো নামে এক দুর্ধর্ষ ব্যক্তি সিংহাসন হস্তগত করেন। প্রাক্তন আমীরের এক পূর্বতন কর্মচারী নাদির শাহের হস্তে তাঁহার পতন হয়। এই বিপ্লবের সময় ব্রিটিশ সরকার অটুট নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর নাদির শাহকে আমীর বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। নাদির শাহ ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে তাঁহার পুত্র জাহির শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বৈদেশিক ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও বহির্জগতের বিবিধ ব্যাপারে একরূপ উদাসীনই ছিলেন; রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শ্রেণীগুলির মনোযোগও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেই আচ্ছন্ন ছিল। ইহার একমাত্র ব্যতিক্রমস্থল ছিল রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ। জাপানের এই বিজয় জাতীয়তাবাদী মহলগুলিতে প্রতীচ্যের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের জয়লাভ এবং প্রতীচ্যের অধীনতাপাশ হইতে এশিয়ার বিভিন্ন জাতির মুক্তিলাভের প্রেরণারূপে ব্যাখ্যাত হইতে থাকে।

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তে বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধে, বিশেষতঃ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার যে সকল নূতন নূতন রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শবোধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ ছিল সেই সকল বিষয়ে, সাগ্রহ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের ফলে মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলিতে নানাদিক দিয়া প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটিতে থাকে; সেই সব দেশের ভাগ্যবিপর্যয়ের মর্ম অনুধাবনে ভারতীয়গণ, বিশেষতঃ ভারতীয় মুসলমানগণ, প্রচুর আগ্রহ প্রদর্শন করিতে থাকেন। তুর্কী খলিফার সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, খলিফা-পদের অবসান ঘটে, মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কে দেখা দেয় প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। মিশরে শুরু হয় ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন, প্যালেস্টাইনে ঘটে ইহুদীদের 'জাতীয় বাসভূমি'র প্রতিষ্ঠা,

পারস্যে হয় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পত্তন। এই সকল ঘটনা এদেশের সাম্প্রদায়িক এবং জাতীয় আদর্শবোধকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, এবং সামান্য কিছুকালের জন্য এই দুই পরস্পরবিরোধী আদর্শবোধের মধ্যে ঐক্যসূত্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় খিলাফৎ আন্দোলন। তারপর ১৯৩১ সাল হইতে জাতীয়তাবাদী চীন যখন জাপানের আক্রমণে পর্যুদস্ত হইয়া পড়িতে থাকে তখন ভারতের সহানুভূতি স্পষ্টতঃই চীনের প্রতি ধাবিত হয়। জাপান রাষ্ট্রসঙ্ঘকে (League of Nations) অগ্রাহ্য করিলে এবং ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করিলে ভারতে তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হয়। রুশিয়ায় কম্যুনিজম্ এবং ইটালী ও জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়ের ফলে ভারতে একদিকে যেমন গভীর আগ্রহ দেখা যায়, তেমনি ইহা হইতে ভারত গভীর রাজনৈতিক শিক্ষাও লাভ করে। ব্রিটিশ-শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া ভারত বিশ্ব-রাজনীতিতে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে অজ্ঞাতসারে তাহারই প্রস্তুতি চলিতেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) : ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ বাধে। সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে ভারতকে যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িতে হয়। ভারতের জনগণের মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই তাহাদিগকে যুদ্ধে জড়াইয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া জাতীয়তাবাদিগণ ছিলেন যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করার তীব্র বিরোধী, তবুও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় এই যুদ্ধেও ব্রিটেন ও তাহার মিত্রবর্গ ভারতের জনবল, অর্থবল এবং শ্রমশিল্পশক্তি সম্পূর্ণরূপে কার্যে প্রয়োগ করে। যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সংশ্রব হইতে ভারত একরূপ মুক্তই ছিল। কিন্তু ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাপান যুদ্ধে নামিয়া পড়ে, এবং নূতন বৎসরের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া আসাম-সীমান্তের পক্ষে ভীতির কারণ হইয়া উঠে। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষে আসিয়া দাঁড়ায়। হতাহতের সংখ্যা আসিয়া পৌঁছে ১ লক্ষ ৮০ হাজারের কাছাকাছি—তাহার মধ্যে নিহতের সংখ্যা ছিল প্রতি ছয়জনের মধ্যে একজন। ভারতীয় ফৌজ পশ্চিম-এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে লড়াই করে; ভারতীয় সেনানীগণ লাভ করেন (মোট ১৫৪টির মধ্যে) ২৭টি 'ভিক্টোরিয়া

ক্রশ।' ইহা ছাড়া ভারতে চীনা সৈন্যদের শিক্ষা দেওয়া হইতে থাকে, এবং বহুসংখ্যক মার্কিন ফৌজও ভারতের ঘাঁটিগুলিতে নিয়োজিত হয়। যুদ্ধে ভারত যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তাহার ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রচণ্ড পরিবর্তন আসে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার দুই বৎসরের মধ্যেই বৈদেশিক নীতির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতাসহ ভারত স্বাধীন হইয়া উঠে।

আন্তর্জাতিক সমাজে ভারত: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আন্তর্জাতিক আইনের চোখে ভারতের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। ভারত তখন ব্রিটেনের আশ্রিত দেশ ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণের কোনও ক্ষমতাও তাহার ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপারেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি স্বতন্ত্র অংশ রূপে ভারতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কিছুটা স্বীকৃতি মেলে। ১৯১৭ ও ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধ-সম্মেলনগুলিতে ভারতীয় সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধ-সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবের ফলে পরবর্তী সাম্রাজ্য-সম্মেলনগুলিতে (Imperial Conference) ভারত প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার লাভ করে। একজন ভারতীয় (স্যার এস. পি. সিংহ) ব্রিটিশ অভিজাতশ্রেণীতে (Peerage) উন্নীত হইয়া ইংলণ্ডে রাজার একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের নৌ-সম্মেলনের (Naval Conference) পরে সম্পাদিত এক চুক্তিতে ভারতকে ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বতন্ত্র সদস্য বলিয়া স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে অটোয়াতে অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সম্মেলনে (Imperial Economic Conference) ভারত প্রতিনিধি প্রেরণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ভারতের প্রতিনিধিবর্গ অন্যান্য ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিদের সহিত সামরিক মন্ত্রিসভায় (War Cabinet) যোগ দেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতের ক্রমবর্ধমান মর্যাদার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারত কিছুটা স্বীকৃতি লাভ করিতে থাকে। ভারতের প্রতিনিধিবর্গ ভার্সাই-এর সন্ধিপত্র এবং জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) সনদে (Covenant) স্বাক্ষর করেন। ভারতের প্রতিনিধিদল জাতিসঙ্ঘের বিধানসভার এবং আন্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থার (International Labour Organisation) কার্যক্রমে গঠনমূলকভাবে অংশগ্রহণ করেন। লণ্ডনে

অনুষ্ঠিত নৌ-সম্মেলন (Naval Conference) (১৯৩০) ও জেনিভাতে অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে (Disarmament Conference) (১৯৩২-৩৩) ভারত প্রতিনিধি প্রেরণ করে। অবশ্য এই সকল ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিনিধিগণ ব্রিটিশ সরকারের মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন, ভারতবাসীর নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে—তখনও ভারত ব্রিটেনের শাসিত রাজ্য—ভারত জাতিসঙ্ঘের (United Nations) মৌলিক সদস্যপদ লাভ করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন

লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-৬২) : ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহ দমনের পরে লর্ড ক্যানিং স্বভাবতঃই সহানুভূতিশীল সংস্কারকার্যের মধ্য দিয়া দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু বে-সরকারী ইউরোপীয় অধিবাসিগণের তীব্র সমালোচনার ফলে তাঁহার এই কার্য বাধাপ্রাপ্ত হয়; লর্ড ক্যানিং-এর "অন্ধ আচরণ, দুর্বলতা ও অক্ষমতা"-র দরুণই সমস্ত বিপদের উৎপত্তি—ইহাই ছিল ইউরোপীয়দিগের অভিযোগ। ইউরোপীয় বণিকদের এই মারমুখী মনোভাবের ফলেই বঙ্গদেশে নীলের চাষ লইয়া অশোভন বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহ দমনের জন্য যে আথক ঘাটতি হয়, সেইজন্য আর্থিক-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে ভারতে প্রেরিত অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ জেমস্ উইল্‌সন কর্তৃক এই কার্য আরম্ভ হয়। অকালে উইল্‌সনের মৃত্যু হইলে তাঁহার আরব্ধ কার্য ইংলণ্ড হইতে গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের নবপ্রেরিত অর্থসচিব স্যামুয়েল্ লেইং চালাইয়া যান। উইলসন আয়করের প্রবর্তন করেন এবং ঢালাওভাবে শতকরা দশ ভাগ হারে আমদানী-শুল্ক বাঁধিয়া দেন। কাগজের নোট

ছাপানো এবং কর্মচারী ছাঁটাই করিয়া খরচ কমানোর জন্য উইলসনের পরিকল্পনাকে লেইং কার্যকরী করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে প্রজাদের ক্ষতি হইয়াছে তাহা অনেকেই স্বীকার করিতে থাকেন। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ডিরেক্টর-সভা ঘোষণা করেন যে "বঙ্গীয় রায়তদের স্বত্ব নির্বিবাদে খারিজ হইয়া গিয়াছে এবং বাস্তবে ও কার্যক্ষেত্রে তাহারা স্বেচ্ছাধীন প্রজা হইয়া উঠিয়াছে।" ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের খাজনা আইন (Rent Act) প্রবর্তনের ফলে কতিপয় সর্তাধীনে জমিতে রায়তের স্বত্বাধিকার দেওয়া হয়। এই আইন অযোধ্যা ও পঞ্জাব ব্যতীত বঙ্গ, বিহার, আগ্রা ও মধ্যপ্রদেশে বলবৎ হয়। কিন্তু জমিদারদের মামলাবাজির জন্য ইহার সুফল নষ্ট হইয়া যায়।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে মেকলে দণ্ডবিধি লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, লর্ড ক্যানিং-এর আমলে সে কাজ সম্পূর্ণতা লাভ করে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন (Indian Penal Code) ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয় ফৌজদারী কার্যবিধি আইন (Criminal Procedure Code)। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দেই পুরাতন সুপ্রীম কোর্ট ও কোম্পানীর সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালতগুলির পরিবর্তে প্রতিটি প্রেসিডেন্সীতে একটি সনদসিদ্ধ (Chartered) হাইকোর্ট স্থাপিত হয়।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইন: ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের সনদ আইনের (Charter Act) বলে যে আইনসভা গঠিত হয়, তাহাতে সরকারের শাসনবিভাগ সম্বন্ধে স্বাধীন ও বিরুদ্ধ সমালোচনার সুর উঠিতে থাকে। ক্ষমতাপ্রিয় ডালহৌসী আইনসভার এই স্বাতন্ত্র্যকে সমর্থন করিলেও, আইনসভা যে একটি 'ইঙ্গ-ভারতীয় কমন্স সভা' (Anglo-Indian House of Commons) হইয়া দাঁড়াইবে তাহা মানিয়া লইতে বোর্ড অব কন্ট্রোলের তদানীন্তন সভাপতি স্যার চার্লস উড মোটেই রাজী ছিলেন না। লর্ড ক্যানিংও সমালোচনা সহিতে পারিতেন না, তিনি তাঁহাকে সমর্থন করেন। অতএব আইনসভার কাজকে যাহাতে বিশেষ করিয়া কেবল আইন-প্রণয়নকার্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে পারা যায় সেই ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন অনুভূত হইতে থাকে। তাহা ভিন্ন আইনসভার কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা

হইতে বিচ্যুত হওয়ার ফলে মাদ্রাজ ও বোম্বাই সরকার বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছিল। আইন-প্রণয়ন-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। প্রতিনিধিস্থানীয় ও প্রভাবশীল কতিপয় ভারতীয়কে আইনসভায় গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তাবোধ হইতেও এই ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজার প্রয়োজন অনুভূত হয়। স্যার চার্লস উড বলেন, আইনসভায় ভারতীয় সভ্য গ্রহণ "এদেশীয় উচ্চপদস্থদের নিকট আমাদের শাসন স্বীকার করিয়া লইবার সহায়ক হইবে।" ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরে "এদেশীয় উচ্চপদস্থদের" তোষণ করার জরুরী রাজনৈতিক প্রয়োজন দেখা দেয়।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইনে (Indian Councils Act) ব্যবস্থা হয় যে আইনসভা একান্তভাবে আইন-প্রণয়নকার্যেই নিয়োজিত থাকিবে; প্রশাসনিক বা আর্থিক ব্যবস্থাদির উপর ইহার কোনও নিয়ন্ত্রণ চলিবে না, প্রশ্নাদি করার অধিকারও ইহার থাকিবে না। মাদ্রাজ ও বোম্বাই সরকার নিজ নিজ আইন-প্রণয়নের অধিকার ফিরিয়া পাইল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়াবলীর কোনও সীমা নির্দিষ্ট হইল না, তবে যাবতীয় প্রাদেশিক আইনই নাকচ (Veto) করিবার ক্ষমতা গভর্ণর-জেনারেলকে দান করা হইল। বঙ্গদেশ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ (বর্তমানের উত্তর প্রদেশ) ও পঞ্জাবে যথাক্রমে ১৮৬২, ১৮৮৬ ও ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে আইনসভা স্থাপিত হয়। তৃতীয়তঃ, গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিল এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের দুইটি কাউন্সিলকে আইন-প্রণয়নের জন্য মোট সদস্যের অর্ধেক সংখ্যক বে-সরকারী সদস্য নিয়োগ করিয়া প্রসারিত করা হয়। ভারতীয়দের গ্রহণ করিবার কোনও আইনগত ব্যবস্থা না থাকিলেও, কার্যতঃ বে-সরকারী আসনগুলির কিয়দংশ "এদেশীয় উচ্চপদস্থদের" দেওয়া হইত। জরুরী অবস্থায় আইনসভার সমর্থন ব্যতিরেকেই গভর্ণর-জেনারেলকে অর্ডিন্যান্স জারী করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই অর্ডিন্যান্সগুলির মেয়াদ অবশ্য ছয় মাসের অধিক হইতে পারিত না।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের এই আইনটিতে ভারত সরকারের কার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য দপ্তর প্রথা (Portfolio system) প্রবর্তন করা হয়। লর্ড ক্যানিংয়ের আমল পর্যন্ত একটি নীতি প্রচলিত ছিল। তাহা এই : ভারত সরকার হইতেছেন সামগ্রিকভাবে শাসনপরিচালনা পরিষদের (Executive

Council) দ্বারা পরিচালিত সরকার। কাজে কাজেই সমস্ত সরকারী কাজকর্ম ও নথিপত্র পরিষদের সমস্ত সদস্যের গোচরেই আনা হইত। এই ব্যবস্থা বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের এই আইনে গভর্ণর-জেনারেলের উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে লর্ড ক্যানিং সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। "ইহার ফলে মন্ত্রিসভা পদ্ধতির (Cabinet system) দ্বারা ভারত শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়… প্রত্যেকটি প্রশাসনিক বিভাগের প্রধান ও মুখপাত্র সেই বিভাগটির পরিচালনা ও রক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ রহিলেন।"

স্যার জন লরেন্স (১৮৬৪-৬৯) : শাসন পরিচালনা কার্যে সবিশেষ খ্যাতি লইয়া লরেন্স বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার কার্যকালে দুইটি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, খুঁটিনাটি বিষয়ে অতিরিক্ত নজর দিবার ফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাধারণ পরিচালক হিসাবে স্বীয় কর্তব্য পালনে তিনি অসমর্থ হন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি "অতীতকালে পঞ্জাবে কার্যরত রাজপুরুষদের অভ্যাসাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই এবং বড়লাটের গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদের সম্ভ্রম রক্ষা করার প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটানোতে তিনি বিশেষভাবে উদাসীন ছিলেন, ইহা সর্বস্বীকৃত"

রেল, সেচ-ব্যবস্থা, পথ প্রভৃতির দিকে তিনি বিশেষ নজর দেন এবং এক্ষেত্রে ডালহৌসীর নীতিই চালাইয়া যাইতে থাকেন। দুইটি প্রজাস্বত্ব আইন (Tenancy Act) প্রবর্তন করিয়া তিনি অযোধ্যা ও পঞ্জাবের প্রজাদের কতকগুলি অধিকার দেন। ক্যানিং-প্রবর্তিত ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের আইনে (Rent Act) বঙ্গদেশের প্রজারা অনুরূপ অধিকার ভোগ করিত।

লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-৭২) : লরেন্সের পরে লর্ড মেয়ো শাসনভার গ্রহণ করিয়া দেখিলেন তাঁহার উপর প্রচুর ঘাটতির দায় চাপানো হইয়াছে। কাজেই তাঁহাকে আর্থিক সংস্কারক হিসাবে কাজ শুরু করিতে হয়। স্যার রিচার্ড টেম্পল ও স্যার জন স্ট্র্যাচির ন্যায় অভিজ্ঞ রাজকর্মচারীদের সাহায্যে তিনি আয়কর ও লবণের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করেন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে আয় বণ্টনের নূতন নিয়ম প্রচলিত করেন। এ যাবৎ কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বিশেষ কতকগুলি খাতের নাম করিয়া অর্থ মঞ্জুর করিতেন; সেই সকল খাতে খরচের পর

অর্থ উদ্বৃত্ত হইলে তাহা ফেরৎ দিতে হইত। এইবার প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর হইতে এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হইল। প্রাদেশিক সরকারগুলিকে নির্দিষ্ট বাৎসরিক অর্থ দিবার ব্যবস্থা হইল, কতিপয় সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এই অর্থ খরচ করিবার অধিকারও তাহাদের রহিল। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর এই মঞ্জুরী-ব্যবস্থা সংশোধন করিবার বিধান হইল। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে নূতন নূতন কর—বিশেষ করিয়া জমির উপর 'সেস্'—বসাইতে বাধ্য হইতে হইবে, ফলে করভার সাধারণভাবে বৃদ্ধি পাইবে—এই আশঙ্কায় বলিয়া নূতন ব্যবস্থার সমালোচনা ওঠে।

লর্ড মেয়ো ভারতে প্রথম লোকগণনা প্রবর্তন করেন (১৮৭১)। ভারত সরকারের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগ তাঁহার সৃষ্টি।

দুর্ভিক্ষ : ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী কালের ইতিহাস পর পর কয়েকবার দুর্ভিক্ষ ঘটার জন্য কলঙ্কিত। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে এক প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষে আগ্রা, পঞ্জাব, রাজপুতানা ও কচ্ছ পীড়িত হয়। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হয়। স্যার জন লরেন্স পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনিতে মোটেই সমর্থ হন নাই। ১৮৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দে বিহারে ও বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ হয়, যদিও ইহা পূর্বাপেক্ষা কম গুরুতর ছিল। স্যার রিচার্ড টেম্পল যোগ্যতার সহিত সঙ্কটত্রাণ-কার্য পরিচালনা করেন। ১৮৭৬-৭৮ খ্রীস্টাব্দে মহীশূর, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এবং মধ্য ও যুক্ত প্রদেশের বিরাট অংশ এবং পঞ্জাবের কোনও কোনও অংশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মাদ্রাজ সরকার দুর্ভিক্ষত্রাণে বহু ভুল করিল এবং দুর্গতি-নাশনে লর্ড লিটনও বিশেষ সফল হইতে পারিলেন না। "প্রচণ্ডতম বলিয়া পরিচিত" ১৮৯৬-৯৭ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ফলে যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও পঞ্জাবের কোন কোন অঞ্চল উৎসন্ন হইয়া যায়। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লর্ড কার্জন কর্তৃক নিযুক্ত এক 'দুর্ভিক্ষ কমিশন' (Famine Commission) ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের উপায় সম্বন্ধে সুপারিশ করেন।

আর্থিক নীতি : ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিক বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়, কোম্পানীর একমাত্র কাজ হইয়া দাঁড়ায় ভারতবর্ষের শাসনকার্য পরিচালনা করা। কিন্তু যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে বোর্ড অব কন্ট্রোলের হাতে। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে জন স্টুয়ার্ট মিলকে এইরূপ শাসনসংস্থার উপযোগিতা

সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, "এক দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য অন্য এক দেশে সরকার গঠন করিলে সে সরকারের জনকল্যাণ সাধনের বলবতী স্পৃহার লক্ষণ বড়-একটা দেখিতেই পাওয়া যায় না।" ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে ভারত-সচিব ইংলণ্ড হইতে যাবতীয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকেন। প্রতিবার সনদ পুনর্নবীকরণের সময়ে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ভারতীয় প্রসঙ্গ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা আর হইত না। শুধু আর্থিক-প্রসঙ্গ বিচার করিলে দেখা যায় যে ভারত-সচিবের প্রশাসনের ফলে ১৮৫৮ হইতে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে "ভারতের দেয়" (Home Charges) বাবদে ইংলণ্ডে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পাঁচগুণ বৃদ্ধি পায়। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বজায় রাখার জন্য এই ব্যয়বৃদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে "ভারতের দেয়" বাবদে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ভারতের বাৎসরিক রাজস্বের দশমাংশের সামান্য কিছু অধিক ছিল এবং সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ভারতের মোট ঋণ ছিল ৫ কোটি ৯৫ লক্ষ পাউণ্ড। ঐ বিদ্রোহের ফলে আরও এক কোটি পাউণ্ড ঋণ বৃদ্ধি পায়। কোম্পানীর হাত হইতে ভারত সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বভার ব্রিটিশ রাষ্ট্র গ্রহণ করে, কিন্তু এই জন্য কোম্পানীর অংশীদারদের যে মূল্য দান করা হয় তাহা ভারতীয় ঋণের সহিত যুক্ত হইল। ইংলণ্ড এই ঋণের গ্যারান্টি দিলে বাৎসরিক সুদের পরিমাণ ১০ লক্ষ পাউণ্ডের হারে হ্রাস করা চলিত, কিন্তু এটুকু রেয়াৎও করা হইল না। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে মোট ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া ২১ কোটি ২৬ লক্ষ পাউণ্ড হইল এবং "ভারতের দেয়" দাঁড়াইল ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। ভারত-সচিবের প্রত্যক্ষ শাসনে ঋণ ও ব্যয়বৃদ্ধি একটি বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইল।

ব্রিটিশ বাণিজ্য ভারতের আর্থিক নীতিকে প্রভাবিত করিতে লাগিল। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে বহু ভারতীয় কাঁচামালের উপর রপ্তানী-শুল্ক মকুব করা হয় এবং শিল্পজাত পণ্যের উপর আমদানী-শুল্ক বহুলপরিমাণে হ্রাস করা হয়। ইহা দ্বারা ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের তোষণ করা হইল এবং ভারতের চরম প্রয়োজনের সময়ে প্রচুর শুল্ক-রাজস্বের ক্ষতি হইল। ভারত ও ইংলণ্ডের স্বার্থ ভিন্ন ছিল। তাই বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইলেও শুল্ক-রাজস্ব কম আদায় হইতে লাগিল।

রাজস্ব আদায়ের এক আইনানুগ উপায় এইভাবে বিসর্জন দেওয়া

হইল। ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থে আর্থিক নীতি নির্ধারিত হইত। বোম্বাইয়ের নূতন সূতাকলগুলিকে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র-নির্মাতারা প্রীতির চক্ষে দেখিত না। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে শুল্ক আইন (Tariff Act) বলবৎ করিয়া তিনটি জিনিস ব্যতীত সর্বপ্রকার কাঁচামাল রপ্তানীর উপর হইতে রপ্তানী-শুল্ক আদায় খারিজ করা হয়, সূতীবস্ত্রাদির উপর শতকরা পাঁচ ভাগ আমদানী-শুল্ক বজায় রাখা হয় এবং লম্বা আঁশের তুলা আমদানীর উপর শতকরা পাঁচ ভাগ শুল্ক চাপানো হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ল্যাঙ্কাশায়ারের উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদির সহিত ভারতীয় মিলগুলির উৎপাদন প্রতিযোগিতা রোধ করা। প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয় যে মাদ্রাজে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের পরে গুরুতর আর্থিক দুরবস্থা ঘটা সত্ত্বেও লর্ড লিটন কতকগুলি আমদানী-পণ্যকে শুল্ক হইতে অব্যাহতি দিয়া একটি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় রাজস্ব আদায়ের পথ রুদ্ধ করিয়া দেন। উদ্দেশ্য : এই সমস্ত জিনিসের বাজারে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা করিতে না দেওয়া। লিটনের সরকার "৩০৫—কাউণ্ট" হইতে মিহি নয় এমন সূতায় প্রস্তুত সর্বপ্রকার আমদানীকৃত সূতীবস্ত্রাদির উপর হইতে আমদানী-শুল্ক আদায় রহিত করেন। বাকী আমদানী-শুল্কসমূহও ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে রদ করা হয়। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে বোঝা গেল যে আমদানী-শুল্ক বাবদে সুবিধাদানের ব্যাপারটি বহুদূর গড়াইয়াছে। সেইজন্য কয়েকটি পণ্য বাদে সমস্ত পণ্যের উপর মূল্যানুযায়ী শতকরা পাঁচ ভাগ আমদানী-শুল্ক ধার্য করা হইল। কিন্তু সেই সঙ্গে ল্যাঙ্কাশায়ারে প্রস্তুত সূতার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ ভারতীয় মিলজাত সূতার উপর শতকরা পাঁচ ভাগ হারে আবগারী-শুল্ক বসাইয়া ম্যাঞ্চেস্টারের ব্যবসায়ীদের তুষ্টিবিধান করা হইল। ইহাতেও ব্রিটিশ শিল্পপতিদের আশ মিটিল না। অতএব ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে একটি নূতন তুলা-শুল্ক আইন পাস করিয়া ভারতে জাত সমস্ত সূতীবস্ত্রাদির উপর আবগারী-শুল্ক বসানো হইল। এই আইনবলে ভারতে উৎপাদিত মোটা কাপড়ের উপরও কর চাপানো হইল, অথচ এই জাতীয় বস্ত্রতে ম্যাঞ্চেস্টার কখনও প্রতিযোগিতায় নামিতে চাহে নাই। ফলে দরিদ্র লোকের পরিবার কাপড়ের দাম চড়িয়া গেল। অন্যায্য আর্থিক ব্যবস্থার এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখা যায় না।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতের যে অর্থনৈতিক দুর্গতি ঘটে

তাহার জন্য দায়ী এমন এক নিরঙ্কুশ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা "করভার পীড়িত ভারতীয় কৃষক, বেকার ভারতীয় শিল্পপতি ও ক্ষুৎপীড়িত ভারতীয় শ্রমিকের" কথা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিল। স্বভাবতঃই, নিজের হাতে নিজেদের অবস্থার নিশ্চিত ও স্থায়ী উন্নতিবিধান করিয়া লইতে হইবে, এমন ধারণা ভারতীয়দের মধ্যে প্রবল হইতে থাকে।

লর্ড লিটন (১৮৭৬-১৮৮০) ঃ লর্ড লিটনের আভ্যন্তরীণ নীতি তাঁহার আফগান-নীতি অপেক্ষা বেশী জনপ্রিয় ছিল না। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে দেশীয় সংবাদপত্র আইন (Vernacular Press Act) সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে বিশেষভাবে খর্ব করে। অথচ ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রাদিকে এই আইনের আওতায় আনা হয় না। ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে স্বীয় বৈদেশিক নীতির তীব্র সমালোচনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া তিনি এই প্রতিক্রিয়াশীল আইনটি প্রণয়ন করেন। ভারতীয় নাগরিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া লিটন অস্ত্র আইন বলবৎ করেন। ভারতে ব্রিটিশ-শাসনকালের একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য স্বরূপ এই আইনটি বহাল থাকে। ১৮৭৬-৭৮ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ-দমনে তাঁহার ব্যর্থতা, অন্নাভাবে ও রোগে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর সময়ে বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ দরবার লইয়া তাঁহার মাতিয়া থাকা,—এইসব ঘটনা ভারতীয় জনগণের নিকট যথাযথভাবেই তাঁহাকে অপ্রিয় করিয়া তোলে। স্যার জন স্ট্রাচির অর্থনৈতিক সংস্কারাদি ভারতে অবাধ বাণিজ্যের সূত্রপাতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করে। আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসের (Statutory Civil Service) সৃষ্টি (১৮৭৯) করিয়া উচ্চতর প্রশাসনিক পদে ভারতীয়দের নিয়োগের সুযোগ দানের চেষ্টা করা হইলেও এই ব্যবস্থা বিফল হইয়া যায়। আট বৎসর বাদে এই ব্যবস্থা রদ করিয়া দেওয়া হয়।

লর্ড রিপন (১৮৮০-১৮৮৪) ঃ লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকালের ন্যায় লর্ড রিপনের শাসনকালও যুদ্ধবিগ্রহে কীর্তি অর্জন অপেক্ষা নানারূপ জনহিতকর কার্যের উপর গুরুত্ব আরোপের জন্য স্মরণীয়। লর্ড রিপন ছিলেন মধ্য-ভিক্টোরিয়া যুগের উদারনৈতিকদের প্রতিভূস্বরূপ। তিনি ছিলেন গ্ল্যাড্‌স্টোনের রাজনৈতিক মন্ত্রশিষ্য; বলদৃপ্ত বৈদেশিক নীতি অপেক্ষা স্থিরধীর প্রশাসনিক সংস্কারকার্যই তাঁহার অধিকতর কাম্য ছিল।

ঊনবিংশ শতকে ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের যে বৈশিষ্ট্য সেই প্রজানুরঞ্জক স্বৈরতন্ত্রের চরম বিকাশ তাঁহারই আমলে দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্থিক ক্ষেত্রে লর্ড লিটনের আমলে স্যার জন্ স্ট্রাচি যে নীতি অবলম্বন করেন তাহার ফল ফলে লর্ড রিপনের শাসনকালে। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ সত্ত্বেও কোন ঘাটতি হয় না। সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় লর্ড নর্থব্রুক ও লিটন কর্তৃক অনুসৃত অবাধ বাণিজ্যনীতিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া সম্ভব হয়। এভেলিন্ বেয়ারিং (পরে লর্ড ক্রোমার নামে বিখ্যাত) সুষ্ঠুভাবে অর্থ-দপ্তরের কাজ চালান। কেবলমাত্র মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্র ছাড়া প্রজাদের খাজনা-বৃদ্ধির দায় হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য লর্ড রিপন চেষ্টা করেন, কিন্তু ভারত-সচিবের হস্তক্ষেপে তাহা সম্ভব হয় না।

লর্ড রিপন দেশীয় সংবাদপত্র আইন রদ করিয়া দেন, ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে নেপাল ও কাশ্মীর ব্যতীত সমগ্র ভারতে লোকগণনা করেন, শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করেন, এবং ভারতের কারখানাগুলিতে কাজের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নত করার জন্য আইন প্রণয়ন করেন। এই সকল ব্যবস্থা করার জন্য ভারতের জনসাধারণের নিকট তিনি বিশেষ প্রিয় হইয়া ওঠেন, ইলবার্ট বিল লইয়া বিক্ষোভের সময়ে তাঁহার জনপ্রিয়তা চূড়ান্ত রূপ পায়।

লর্ড রিপনের কাউন্সিলের আইন-সদস্য মিঃ সি. পি. ইল্‌বার্ট (C. P. Ilbert) এক বিল আনিয়া ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি হইতে "কেবলমাত্র জাতিগত বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক সমস্ত বিচারবিভাগীয় অযোগ্যতা"র বিধান তুলিয়া দিতে চাহেন। ইহার ফলে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের ভারতীয় জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের এলাকাধীনে আনা হয়। এই সাধারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাটিতে ইউরোপীয়দের জাত্যাভিমান উগ্র হইয়া ওঠে এবং তাঁহারা প্রচলিত আইনের কোনরূপ সংশোধনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। ফলে ভারতীয়গণ বিক্ষুব্ধ হয়, কেননা তাহারা এই বিলের মধ্যে জাতিগত সমানাধিকারের স্বীকৃতি দেখিতে পাইয়াছিল। ইউরোপীয়দের নিকট রিপন বিশেষ অপ্রিয় হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে প্রতিবাদের নিকট নতিস্বীকার করিতে হয়। বিলের মূলসূত্র বর্জিত হইল; ভারতীয় জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের বিচার করিবার অধিকার লাভ করিলেন, তবে

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাগণের বিশেষ অধিকার যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য বিধান হইল তাঁহারা ইউরোপীয় জুরী নিয়োগের জন্য দাবী করিতে পারিবেন।

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের সূচনা ঃ প্রেসিডেন্সী শহরগুলির বাহিরে পৌর-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টা হয় ১৮৪২ সালে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পূর্বে বহু ব্রিটিশ-ভারতীয় শহরে পৌর-সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পৌর-পরিচালকগণকে সরকার মনোনীত করিত, সাধারণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার কোনও প্রশ্ন তখনও পর্যন্ত দেখা যায় নাই।

১৮৭০ সালে লর্ড মেয়ো স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে এক চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ভারত-সরকারের এক প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়, "শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা, দাতব্য চিকিৎসা ও স্থানীয় জনকল্যাণ-মূলক কার্যের সাফল্যের জন্য এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত অর্থাদি সম্পর্কে স্থানীয় আগ্রহ, তদারক ও প্রযত্ন প্রয়োজন। এই প্রস্তাবটি কার্যকরী করা হইলে ....তাহার ফলে স্বায়ত্ত-শাসনের বিকাশ, পৌর-সংস্থাগুলির দৃঢ়ীকরণ এবং প্রশাসন কার্যে এদেশীয় ও ইউরোপীয়গণের মধ্যে এ-যাবৎ যতটুকু সম্ভব হইয়াছে তদপেক্ষা অধিকতর মেলামেশার সুযোগ পাওয়া যাইবে।" এই প্রস্তাবের ফলেই নূতন পৌর-আইন (Municipal Act) বলবৎ হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশে নূতন পৌর-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে লর্ড রিপন লর্ড মেয়োর নীতিকে আরও প্রসারিত ও উদারভাবে প্রয়োগ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল "জনসাধারণের রাজনৈতিক ও সাধারণ শিক্ষার অগ্রগতি ও উন্নতি সাধন, সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান লোকদিগকে নিজস্ব স্থানীয় ব্যাপারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিতে উদ্বুদ্ধ করা এবং এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিবার উপযোগী করিয়া তাহাদের শিক্ষিত করিয়া তোলা।" ১৮৮৩-৮৪ খ্রীস্টাব্দে যে সকল আইন পাস হয় তাহা দ্বারা নির্বাচনের নীতিকে প্রসারিত করা হয় এবং ইহার ফলে পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলি আংশিকভাবে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণে আসে। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধনের পূর্ব পর্যন্ত লর্ড রিপনের এই ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে।

লর্ড রিপন গ্রামাঞ্চলে লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করেন। এগুলির কর্মকর্তা নিয়োগে নির্বাচনের সাহায্য গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং "এই সংস্থাগুলির উপর প্রয়োজনীয় সরকারী নিয়ন্ত্রণ ...সংস্থার ভিতরে থাকিয়া করার চেয়ে বাহির হইতে করাই শ্রেয়" বলিয়া অনুভূত হয়। ১৮৮৩-৮৫ খ্রীস্টাব্দে এই একই সাধারণ মূলসূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া গ্রামীন বোর্ড (Rural Board) স্থাপনের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে আইন পাস করা হয়।

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইন ঃ আইন প্রণয়নের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাহাতে বিশিষ্ট ভারতীয়গণ অংশগ্রহণ করিতে পারেন সেজন্য ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইনে তাহার কিঞ্চিৎ বিধান ছিল। কিন্তু আইনসভাগুলির কার্যসীমা কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন কার্যের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ ছিল বলিয়া ইহা দ্বারা দেশের অবস্থাকে উন্নত করিবার সুযোগ বিশেষ ছিল না। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের পর হইতে কংগ্রেস আইনসভাগুলির কর্তব্যসীমার প্রসার ও নির্বাচনের দ্বারা সভাগঠন করার মূলসূত্রটির ব্যাপ্তি দাবী করিতেছিলেন। লর্ড ডাফ্রিনের আমলে এই ব্যাপারের নিষ্পত্তির জন্য একটি কমিটি নিয়োজিত হয়। এই কমিটির বিচার-বিতর্কের উপর ভিত্তি করিয়াই ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইন লিপিবদ্ধ হয় এবং ভারত-সচিব লর্ড ক্রসের (Lord Cross) সুপারিশে ব্রিটিশ সরকার ইহা মঞ্জুর করেন। এই আইনের বিধানক্রমে স্থির হয় যে গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের অতিরিক্ত সদস্যের সংখ্যা দশজনের কম বা ষোলজনের বেশি হইবে না। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যসংখ্যাও বাড়াইয়া দেওয়া হইল। পূর্বের ন্যায় অতিরিক্ত সদস্যদের সরকার মনোনয়ন করিবে এই ব্যবস্থা থাকিলেও, আইনের আওতায় প্রণীত নিয়মের বলে পৌর-প্রতিষ্ঠান ও জেলা-বোর্ডগুলির মতো স্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থাগুলিকে প্রাদেশিক আইনসভার শূন্য আসনে সদস্য মনোনয়নের অধিকার দেওয়া হইল। নির্বাচনের নীতিকে এই পরোক্ষ স্বীকৃতিদানের সাংবিধানিক তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। আইনসভার সদস্যদের অধিকার দুইভাবে বৃদ্ধি পাইল। আইনসভায় উপস্থাপিত অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে (ইহার পূর্বে এই প্রসঙ্গ আইনসভায় তোলা হইত না) তাঁহাদের মতামত প্রকাশের

অধিকার রহিল, যদিও তাঁহাদের প্রস্তাবাদি উপস্থিত করা বা ভোট দাবী করার অধিকার ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, জনস্বার্থমূলক ব্যাপারে নির্ধারিত সীমার মধ্যে সরকারকে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতাও তাঁহারা পাইলেন।

অবশ্য ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের এই আইনটিতে জাতীয়তাবাদীদের সন্তুষ্টিবিধান করিতে পারা গেল না। কংগ্রেসের একের পর এক অধিবেশনে ইহার ন্যায্য সমালোচনা করা হয়। কিন্তু এই আইনের আওতায় গঠিত আইনসভাগুলিতে গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ এবং স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় বিশিষ্ট ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যোগ দেন। তাঁহাদের বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা শিক্ষিত ভারতীয়দের পার্লামেন্টীয় ব্যাপারে যোগ্যতা ও দেশপ্রেমের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক হইয়া থাকে।

লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫) ঃ প্রশাসনিক সংস্কারকার্যে লর্ড কার্জনের প্রগাঢ় অনুরাগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করে। প্রচলিত ব্যবস্থা ও প্রণালীর ত্রুটি অনুসন্ধানের জন্য তিনি কয়েকটি কমিশন নিয়োগ করেন এবং কমিটির সুপারিশ অবিলম্বে কার্যে পরিণত করেন। পুলিশী ব্যবস্থার কিছু কিছু উন্নতি সাধিত হয়। প্রজাদের দুর্দশা লর্ড কার্জনের দৃষ্টি এড়ায় নাই। পঞ্জাবে ফিকিরবাজ মহাজনরা যাহাতে আর কৃষকদের উচ্ছেদ করিতে না পারে সেজন্য পঞ্জাব ভূমি হস্তান্তর আইন (১৯০০) পাস করা হয়। ১৯০২ ও ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের রাজস্ব সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহের (Revenue Resolutions) বলে সরকার কর্তৃক খাজনা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয়। নামমাত্র স্বদে চাষীদের মূলধন যোগাইবার জন্য বহু সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপিত হয়। কৃষিব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী (Inspector-General of Agriculture) নিযুক্ত হন এবং ভারতের আদিম চাষ-আবাদ ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তুলিবার জন্য একটি রাজকীয় কৃষি-বিভাগ স্থাপিত হয়। সমগ্র সেচ-ব্যবস্থাকে উন্নীত করা হয়। রেল পরিবহন ব্যবস্থাকে নূতনভাবে উৎসাহদান করা হয় এবং প্রায় ৬০০০ মাইল নূতন লাইন পাতা হয়। একটি নূতন শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ খুলিয়া গভর্ণর-জেনারেলের পরিষদের ষষ্ঠ সদস্যের উপর উহার পরিচালন ভার অর্পণ করা হয়।

ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের ছাত্রগণ লর্ড কার্জনের নিকট কৃতজ্ঞ

থাকিবে, কেননা তিনি প্রাচীন সৌধাবলী ও স্মারকসমূহের ধ্বংসাবশেষগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষা সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁহার প্রচেষ্টার ফলে ভারতের জনসাধারণের নিকট তিনি বিশেষ অপ্রিয় হন। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করিয়া তিনি সমগ্র শিক্ষার মান, বিশেষ করিয়া উচ্চতর শিক্ষার মানকে উন্নীত করিতে চাহেন। কিন্তু ইহার দ্বারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া ফেলা হইবে বলিয়া ভারতীয় জনমত সন্দেহ করে।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য লর্ড কার্জন দুইটি নূতন প্রদেশ সৃষ্টি করেন। সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত পঞ্জাবের কয়েকটি জেলাকে ব্রিটিশ শাসনাধীন কয়েকটি উপজাতি এলাকার সহিত সংযুক্ত করিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠিত হয়, সরাসরি ভারত সরকারের আজ্ঞাবহ একজন চীফ কমিশনারের উপর এই প্রদেশের শাসনভার অর্পিত হয়। এই ব্যবস্থা বিজ্ঞজনোচিত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা (১৯০৫) ছিল অন্যরূপ। লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করেন : পূর্ব এবং উত্তরাংশের জেলাগুলিকে আসামের সহিত জুড়িয়া নূতন পূর্ববঙ্গ-ও-আসাম প্রদেশ এবং পশ্চিমাংশের জেলাগুলিকে বিহার ও উড়িষ্যার সহিত যুক্ত করিয়া নূতন বঙ্গ-প্রদেশ গঠনের ব্যবস্থা হয়। বাঙ্গালার মানুষ কৃত্রিমভাবে রাজনৈতিক সীমারেখা টানিয়া দেশের দুই অংশকে বিচ্ছিন্ন করিবার এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করে। বঙ্গভঙ্গ রদ করা জাতীয়তাবাদীদের যুদ্ধনিনাদ হইয়া উঠে। অবশেষে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদেশ পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়।

প্রশাসনিক সংস্কারকার্যের মত সামরিক সংস্কারকার্যেও লর্ড কার্জনের আগ্রহ ছিল। সেনাবাহিনীর পরিবহন-ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয়। নূতন অস্ত্রাদি ও কামান সরবরাহ করা হয়। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে অভিজাতবংশোদ্ভূত পুরুষদের লইয়া রাজকীয় ক্যাডেট্ বাহিনী (Imperial Cadet Corps) গঠিত হয়। সামরিক প্রশাসনের প্রশ্নে তদানীন্তন প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনারের (Lord Kitchener) সহিত লর্ড কার্জনের মতান্তর উপস্থিত হয়, এবং তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড কিচেনারকে সমর্থন করেন বলিয়া লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে পদত্যাগ করেন।

দেশীয় রাজ্যসমূহের সহিত সম্পর্ক : ভারতীয় রাজন্যবর্গকে রাণী

ভিক্টোরিয়ার আশ্বাস দান এবং 'স্বত্বলোপ নীতির' (Doctrine of Lapse) প্রত্যাহার পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

লর্ড নর্থব্রুকের আমলে (১৮৭২-৭৬) বরোদার গায়কবাড় মলহর রাওকে তাঁহার দরবারস্থিত ব্রিটিশ রেসিডেণ্টকে বিষপ্রয়োগের প্রচেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এক কমিশন তাঁহার বিচার করে। কমিশনের সদস্যগণ অপরাধ নির্ধারণের প্রশ্নে সমান-সমান ভাগে বিভক্ত হইয়া যান বলিয়া ভারত-সরকার গায়কবাড়কে শাস্তি দেন না। কিন্তু "কুখ্যাত দুর্ব্যবহার রাজ্যশাসনে চরম গাফিলতি ও প্রয়োজনীয় সংস্কারাদি সাধনে স্পষ্টতঃই তাঁহার অসামর্থ্যের" জন্য তাঁহাকে গদিচ্যুত করা হয়।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ডিসরেলীর সুপারিশক্রমে গৃহীত রাজকীয় খেতাব আইন বলে রাণীকে তাঁহার খেতাব সংশোধনের অধিকার দেওয়া হয়। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী লর্ড লিটনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত "এ-যাবৎ আয়োজিত সর্বাধিক আড়ম্বরপূর্ণ এক দরবারে" ইংলণ্ডের রাণীকে ভারত-সম্রাজ্ঞী* (Empress of India) বলিয়া ঘোষণা করা হয়। রাণীর এই খেতাবগ্রহণের ফলে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন হইয়া পড়িল। রাজন্যবর্গ আর মিত্র রহিলেন না, অনুগত রাজা হইয়া গেলেন।

১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে লর্ড রিপন মহীশূরের রাজাকে রাজ্যশাসনের ভার প্রদান করিয়া ঐ রাজ্য হইতে ব্রিটিশ প্রশাসন-ব্যবস্থা প্রত্যাহার করেন। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অর্ধ শতাব্দী যাবৎ প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকার পর এই মুখ্য রাজ্যটি পূর্বতন মর্যাদা ফিরিয়া পায়।

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ডাফ্‌রিন (১৮৮৪-১৮৮৮) গোয়ালিয়রের দুর্গ সিন্ধিয়াকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করেন।

লর্ড ল্যান্সডাউনকে (১৮৮৮-৯৪) মণিপুরে এক বিদ্রোহ দমন করিতে হয়। সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া এই ক্ষুদ্র রাজ্যে এক গোলযোগের পরে স্থানীয় সেনানায়ক টিকেন্দ্রজিৎকে নির্বাসন দিবার সিদ্ধান্ত করা হয়। মণিপুরের

*১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের বলে ইংলণ্ডের রাজা সম্রাট উপাধি পরিত্যাগ করেন। তখন তিনি হইলেন ভারত ও পাকিস্তান ডোমিনিয়নদ্বয়ের রাজা।

পরিস্থিতি আয়ত্তে আনিবার জন্য প্রেরিত এক ব্রিটিশ রাজপুরুষের সর্বসমক্ষে মস্তকচ্ছেদন করা হয় (১৮৯১)। অল্পকালের মধ্যেই টিকেন্দ্রজিৎকে ফাঁসী দেওয়া হয় এবং একজন রেসিডেন্টের উপর প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পিত হয়।

কালাতের খাঁ-কে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পুত্রকে সিংহাসনে বসাইতে লর্ড ল্যান্সডাউন বাধ্য করেন।

বেরারকে ব্রিটিশ ভারতের অঙ্গীভূত করিবার জন্য ডালহৌসী যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, লর্ড কার্জন তাহার চূড়ান্ত রূপ দান করেন। "হায়দরাবাদের নামেমাত্র সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য বরাবরের ইজারা লইবার ভূয়া সর্তে" নিজামকে এই রাজ্যটি ভারত সরকারের হস্তে তুলিয়া দিতে বাধ্য করা হইল।

লর্ড কার্জন ভারতীয় রাজন্যবর্গের দ্বারা গঠিত এক পরিষদের পরিকল্পনা করেন এবং পরে লর্ড মিণ্টো, লর্ড হার্ডিঞ্জ ও লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে 'একটি স্থায়ী পরামর্শদাতৃ-সংস্থা' গঠন করিবার জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী এক রাজকীয় ঘোষণাপত্র দ্বারা নরেন্দ্র-মণ্ডলের (Chamber of Princes) প্রতিষ্ঠা হয়।

ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞীর উপর ভারতের শাসনভার ন্যস্ত হইবার পর হইতে রাজন্যবর্গের উপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃ দৃঢ় হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হইল এই যে, লর্ড কার্জনের মতে, তাঁহারা ভারতে ব্রিটিশ শাসকবর্গের "সহকর্মী ও অংশীদার" হইয়া উঠিলেন। অথবা, মহাত্মা গান্ধীর কথায় বলিতে গেলে, রাজন্যবর্গ "ভারতীয় পোষাক-পরা ব্রিটিশ রাজপুরুষ" বনিয়া গেলেন। 'ভারতে রাজকীয় শাসন-ব্যবস্থার অচ্ছেদ্য অংশে' রূপান্তরিত হইয়া রাজন্যবর্গ স্বীয় প্রজাদের সহিত যোগহীন হইয়া পড়িলেন; দুঃখক্লিষ্ট প্রজাদের নিকট তাঁহাদের দেখা যাইত না, দেখা যাইত 'ঘোড়দৌড়ের মাঠে, পোলো-খেলার মাঠে অথবা ইউরোপীয় হোটেলে'। রাজন্যবর্গ ও তাঁহাদের প্রজাসাধারণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছেদের অবশ্যম্ভাবী কুফল সম্পর্কে কয়েকজন বিজ্ঞ ব্রিটিশ শাসক অবহিত ছিলেন। লর্ড ল্যান্সডাউন হইতে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো পর্যন্ত একের পর এক বড়লাট রাজন্যবর্গকে তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্য সুশাসনের পরামর্শ দিয়াছেন। বর্তমান শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতে যে পিতৃতান্ত্রিক

শাসন-ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল, এই পরামর্শের অন্তর্নিহিত মনোভাব তাহার সহিত সঙ্গতিপূর্ণই ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে ক্রমশঃ রাজনৈতিক সংস্কারাদি হইতে থাকিলে দেশীয় রাজ্যসমূহে স্থশাসন চালাইবার প্রায়শঃ ঘোষিত এই পরামর্শ অর্থহীন হইয়া পড়ে। দেশীয় রাজ্যসমূহের জনসাধারণ ব্রিটিশ ভারতের আদর্শে রাজনৈতিক সংস্কারাদি দাবী করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ প্রভুদের অনুগত আছেন ততক্ষণ ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাদের মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা চালাইয়া যাইতে বাধা দিত না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাংবিধানিক পরিবর্তন

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ঃ পশ্চিমী শিক্ষার প্রসারলাভের ফলেই ভারতের রাজনৈতিক জাগৃতি হয়। ব্রিটিশ অধিকার এদেশে কায়েম হইবার পর যে নব্য সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, বার্ক্, মেকলে, বেন্থাম্, মিল, হারবার্ট স্পেন্সার ও কঁতের ন্যায় প্রগতিশীল লেখকদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়। রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী ও স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ-চিন্তার দিকপালগণও ভারতীয়দের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া তোলেন। বঙ্গদেশের নীলকরদের অত্যাচার লইয়া বাকবিতণ্ডা, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায়শঃ দুর্ভিক্ষের প্রকোপের ন্যায় অর্থনৈতিক বিপদ এবং প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচার বুদ্ধিমান ভারতবাসীর নিকট স্বায়ত্ত-শাসনের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃই স্পষ্টতর করিয়া তোলে। জাপানের অভ্যুদয়ে সমগ্র প্রাচ্য খণ্ডে আশার আলোক দীপ্যমান হইয়া উঠে।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহের ফলে ইউরোপীয়গণ ভারতীয়দের নিকট হইতে বৈরীরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান, ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের সময়ে এই বৈরিতা নূতন করিয়া সঞ্জীবিত হয়। ডড্‌ওয়েল্ বলেন, "সর্ববিষয়ে

স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য ইউরোপীয়দিগের একনিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার জবাবে ভারতীয়গণ সমান জোরের সহিত সমানাধিকারের দাবী তুলিত।” ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের (১৮৭৬) ন্যায় সংস্থাগুলি রাজনৈতিক সংগঠনের যে কাজ শুরু করিয়াছিল, ব্রিটিশ রাজপুরুষ অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম (Allan Octavian Hume) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সেই কাজের দায় গ্রহণ করে।

প্রখ্যাত বাঙ্গালী ব্যবহারজীবী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। কংগ্রেসের ক্রমোন্নতির প্রথম পর্যায়ে কিছু কিছু পদস্থ রাজপুরুষ ইহাকে সমর্থন করিতেন, কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই ভারত সরকার কংগ্রেসকে সন্দেহের চোখে দেখিতে আরম্ভ করেন। 'আলিগড় আন্দোলনের' প্রবর্তক স্যার সৈয়দ আহম্মদ প্রথমে কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিতেন, পরে তিনি ইহার ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠেন। কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নিয়মতান্ত্রিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার আদায় করা। উগ্র দেশপ্রমিকগণ কিন্তু এইরূপ নরম কার্যসূচীতে সন্তুষ্ট হন না, এবং ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইন হইতে দেখা যায় যে আইনসভা গঠনের জন্য ভারত সরকার তখনও পর্যন্ত নির্বাচনকেই মূলসূত্ররূপে স্বীকার করিয়া লইতে নারাজ। মহারাষ্ট্রের মহান সন্তান বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে এক চরমপন্থী দলের উদ্ভব হইল। লালা লাজপৎ রায় ও বিপিনচন্দ্র পাল তিলকের যোগ্য সহকর্মী হইয়া উঠিলেন। বঙ্গভঙ্গের ফলে এই দলের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে বিভেদের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশে এক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সংগঠিত হয়। লর্ড মিণ্টো (১৯০৫-১০) দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, বিনা বিচারে কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নির্বাসিত করা হয়। কিন্তু দমনকার্যে যে বিশেষ কোন ফল হইবে না তাহা লর্ড মিণ্টোও জানিতেন। তদানীন্তন উদারনৈতিক ভারত-সচিব লর্ড মর্লির সমর্থনে তিনি যুগপৎ দমন ও মনোরঞ্জনের কর্মপন্থা অবলম্বন করিলেন।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা: জাতীয় মুক্তি দাবীর মুখপাত্র হিসাবে কংগ্রেস যখন শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল, ভারতের মুসলমানগণ তখন কংগ্রেস হইতে

দূরে দূরেই থাকিত। কুপ্‌ল্যাণ্ডের মতে জাতীয় আন্দোলনের প্রতি মুসলমানদের চিত্তের এই যে—ঠিক বিরূপতা না হউক, অন্ততঃ ঔদাসীন্য,—ইহার কারণ ছিল হিন্দুদের তুলনায় 'তাহাদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষায় উন্নতির অভাব এবং তাহারা যে ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র এক-চতুর্থাংশ তাহাদের মধ্যে এই বোধ'। স্যার সৈয়দ আহম্মদ যে নীতি সমর্থন করিতে থাকেন তাহার ফলে প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের মধ্যে দেখা দেয় 'ঔদাসীন্য'। পরে যখন ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র 'প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী শক্তি' হিসাবে কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে আতঙ্কিত হইয়া সুপরিকল্পিতভাবে ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিল, তখন মুসলমানদের 'ঔদাসীন্য' প্রায় 'বিরুদ্ধতায়ই' পর্যবসিত হইয়া গেল। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলমান নেতৃবৃন্দের এক প্রতিনিধিদলের নিকটে লর্ড মিণ্টোর উক্তিই ছিল সরকারের দিক হইতে কার্যক্ষেত্রে এই নীতির প্রথম অভিব্যক্তি। লর্ড মিণ্টো নেতৃবৃন্দকে 'পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার' আশ্বাস দিয়া বলিলেন "সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষিত হইবে।" হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য এই প্রচেষ্টার গুরুত্বকে ব্রিটিশ আমলারা স্পষ্টভাবেই অনুধাবন করেন। লেডী মিণ্টোকে জনৈক রাজপুরুষ লেখেন, "ভারত ও ভারতের ইতিহাসকে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রভাবিত করিতে পারে এমন এক কূটনীতির খেলা হইয়া গেল। ছয় কোটি বিশ লক্ষ লোক যাহাতে বিপজ্জনকভাবে আমাদের বিরোধিতা করিবার জন্য বিরোধী শক্তির সহিত ঐক্যবদ্ধ না হইতে পারে সেইজন্য তাহাদের রাশ টানিয়া ধরা ছাড়া এ-খেলা আর কিছুই নহে"। তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড মর্লি সবিস্তারে হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের কথা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, "হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা জীবনযাত্রা, ঐতিহ্য, ইতিহাস, সর্বপ্রকার সামাজিক ব্যাপার ও বিশ্বাসের আধার সম্পর্কে পার্থক্য।"

মর্লি-মিণ্টো সংস্কার (১৯০৭-১৯০৯)ঃ দেখা গেল রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন মুসলমানদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশের 'বিরোধিতা'র দ্বারা 'বিপজ্জনক বিরোধীশক্তিকে' টলানো শক্ত। অতএব লর্ড মর্লি ও লর্ড মিণ্টো আর এক দফা সংস্কারের সিদ্ধান্ত করিলেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে দুইজন ভারতীয়কে (স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও সৈয়দ হোসেন বিল্‌গ্রামী) ভারত-

সচিবের পরিষদের সদস্য মনোনয়ন করা হয়। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে স্যার সতেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে (পরে লর্ড সিংহ) বড়লাটের শাসন-পরিষদে (Executive Council) আইন বিভাগের ভার অর্পণ করা হয়। ইহার পরে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইন (Indian Councils Act) বিধিবদ্ধ হইয়া বহু গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পরিবর্তন ঘটায়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির আয়তন বর্ধিত হয়। বড়লাটের পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য-গণের সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়, স্থির হয় ইঁহাদের সংখ্যা ৬০-এর অধিক হইবে না। পঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশের আইনসভাগুলির অতিরিক্ত সদস্যসংখ্যা নির্ধারিত হয় ৩০ জনের অনধিক। অন্যান্য প্রদেশের সর্বোচ্চ সদস্যসংখ্যা হয় ৫০ জন। অবশেষে নির্বাচনের নীতিটিকেও খোলাখুলি মানিয়া লওয়া হইল। কেন্দ্রীয় আইনসভায় সরকার পক্ষের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখা হইল; প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে বেসরকারী সদস্যগণ (নির্বাচিত ও মনোনীত) সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকিলেন। কেবলমাত্র বঙ্গদেশে নির্বাচিত সদস্যরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইতে পারিলেন। 'পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা'য় (Separate Electorates) হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদ বাড়াইয়া দেওয়ায় এই সকল ব্যবস্থার সুফল বহুলাংশে ব্যর্থ হইল।

'পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা'র পত্তন এবং ভোটাধিকারের কতকগুলি ত্রুটির সমালোচনায় কংগ্রেস মুখর হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনকার মতো কংগ্রেস মর্লি-মিণ্টো পরিকল্পনার মৌলিক ত্রুটি দেখিয়াও দেখিতে চাহিল না। লর্ড মিণ্টো স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন যে পশ্চিমী ধাঁচের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ভারতের পক্ষে উপযোগী নহে। লর্ড মর্লি বলিলেন, ভারতকে 'স্বায়ত্ত-শাসিত উপনিবেশের সমপর্যায়ে' দেখিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। কাজে-কাজেই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া স্বায়ত্ত-শাসনের যে দাবী কংগ্রেস তোলে, মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের মৌলিক নীতি তাহাকে কোনরূপ আমল দিল না।

মণ্টেগু-চেম্স্ফোর্ড রিপোর্টে মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের প্রকৃতিগত অযৌক্তিকতা ও নিষ্ফলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উহার ব্যর্থতার কতকগুলি কারণ প্রদর্শন করা হয়। "সাধারণভাবে স্থানীয় সংস্থাগুলির কোনই অগ্রগতি হয় নাই প্রাদেশিক রাজস্বের উপর প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয় নাই,

সরকারী চাকুরীতে অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের নিয়োগ করা হয় না।" ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর নিজ নিয়ন্ত্রণ অবিচলিত রাখিয়াছিলেন বলিয়া প্রাদেশিক আইনসভাগুলি কর্তৃক সরকারের কার্যকলাপকে প্রভাবিত করার সীমা খুবই নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। জাতীয় চেতনায় নিরন্তর ব্যাপ্তির ফলে কার্যকরী রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবী প্রখর হইয়া ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) ঃ ইউরোপে যুদ্ধের অগ্রগতির ফলে ভারতের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা নূতন প্রেরণা লাভ করে। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ট 'হোম রুল লীগ' (Home Rule League) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যেকার মতভেদ মিটাইয়া ফেলা হইল। ঐ বৎসরেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ঐক্যবদ্ধভাবে সংস্কারকার্যের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। লীগ ইতোপূর্বেই স্বীয় প্রতিক্রিয়াশীল নীতি পরিত্যাগ করে এবং ঘোষণা করে যে 'অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করাই' ইহার লক্ষ্য (১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস)। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দেই 'পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা' স্বীকার করিয়া লইয়া কংগ্রেস মুসলিম লীগকে তুষ্ট করে। কুপল্যাণ্ড বলেন যে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের মর্লি-মিন্টো সংস্কার সম্পর্কে মুসলমানদের সমর্থন আদায় করার জন্য যে সকল সুবিধাদি দেওয়া হয়, কংগ্রেস তাহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক সুবিধা মুসলমানদের দিল। লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সমস্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হইল, এই চুক্তিটিকে বলা হইল 'ভারতের জাতীয়তাবাদের এতাবৎকালের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সার্থক ও লক্ষণীয় অভিব্যক্তি'।

যুদ্ধের শেষ দিকে ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব চরম হইয়া উঠে। রাজদ্রোহ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য নিয়োজিত রাউলাট কমিটির রিপোর্টে দেশের মধ্যে বহুবিস্তৃত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের অস্তিত্বের কথা প্রকাশ পায়। এই আন্দোলন দমনের জন্য উদ্দিষ্ট বিশেষ আইনটির বিরুদ্ধে সর্বস্তরের ভারতীয় জনমত তীব্র প্রতিবাদ জানায়। স্থানীয়ভাবে গোলযোগ দেখা দেয় এবং কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ইহার ফলেই সংঘটিত হয়। মুসলমান সম্প্রদায় খিলাফৎ প্রশ্নে অর্থাৎ তুরস্কের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গভীরভাবে

বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে মুসলমানগণ কংগ্রেসে যোগ দেয়, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। জনৈক ব্রিটিশ লেখক মন্তব্য করিয়াছেন, "যুদ্ধের পরবর্তীকালে অশান্তির যে তরঙ্গ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, পূর্বেকার সমস্ত বিক্ষোভ হইতে ইহা মূলতঃ ভিন্ন ছিল……জাতীয়তাবাদের এই নূতন পর্যায় ব্যাপকত্বের দরুণ মুসলমানদের এবং জনপ্রিয়তার দরুণ সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হয়।"

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার (১৯১৭-১৯)ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান শক্তির ফলে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবী সম্পর্কে বিবেচনা করিতে বাধ্য হয়। তখনও পর্যন্ত স্বরাজ লাভ করার জন্য সহিংস বা অহিংস কোনও প্রকার সংগ্রামের কোনও কথাই ওঠে নাই। তখনও 'আমাদের মানসিক, নৈতিক ও ঐহিক অবস্থার ক্রমান্বয়ে উন্নতির মাধ্যমেই' স্বরাজ আসিবে বলিয়া আশা করা হইত। কিন্তু ভারতীয় নেতৃবর্গের ঐক্য এবং যুদ্ধে ভারতবর্ষের সহযোগিতার ফলে ব্রিটিশ সরকার, অ্যাস্‌কুইথের কথায়, 'নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে' ভারতীয় সমস্যার পর্যালোচনা করিতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে এইভাবে বর্ণিত হয়ঃ 'ভারতীয়দের দায়িত্বগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কি চায় তাহা তাহাদিগকেই নির্ধারণ করিতে হইবে।'

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে আগস্ট ভারত-সচিব মিঃ ই. এস. মণ্টেগু (E.S. Montagu) কমন্স সভায় ঘোষণা করেনঃ "প্রশাসনের প্রতিটি বিভাগের সহিত ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান সংযোগ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভারতে দায়িত্বশীল সরকার ধীরে ধীরে প্রবর্তন—এই দুইটি উদ্দেশ্যে স্বায়ত্ত-শাসনমূলক সংস্থাগুলির ক্রমান্বয়ে বিকাশসাধনই সম্রাটের সরকারের নীতি, ভারত সরকার এই নীতির সহিত সম্পূর্ণ একমত।" এই ঘোষণায় দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং মর্লি-মিণ্টো নীতিকে অস্বীকার করা হয় বলিয়া ইহাকে 'আমূল পরিবর্তন' বলা চলে। ইহা ছিল 'উদারনৈতিক মতবাদের উপর বিশ্বাসের ঘোষণাপত্র'। 'একমাত্র স্বাধীনতার মধ্যেই স্বাধীনতার জন্য মানুষকে উপযুক্ত করিয়া তোলা সম্ভব' এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া এই ঘোষণাপত্র রচিত হয়। কিন্তু 'উদারনৈতিক

মতবাদের উপর বিশ্বাসের' উপর নির্ভর করিয়া যে সংগঠন গড়া হইল, স্বাধীনতার পথ সুগম করিতে তাহা যথেষ্ট ছিল না।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারত-সচিব ভারতে আসেন এবং তাঁহার সংস্কার-পরিকল্পনা সম্পর্কে বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড (১৯১৬-২১), কতিপয় বিশিষ্ট ব্রিটিশ রাজপুরুষ ও ভারতীয় রাজনীতিবিদদের সহিত আলোচনা করেন। এই সকল আলোচনার ফলাফলই ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টের (Montagu-Chelmsford Report) অঙ্গীভূত হয়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ভারত-শাসন আইন (Government of India Act) এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হয়।

এই আইনের বিধানমতে ব্রিটিশ ভারতে দুইটি সভা ও গভর্ণর-জেনারেলকে লইয়া বিধানমণ্ডলী গঠিত হইল। সভা দুইটির নাম হইল আইন-সভা (Legislative Assembly) ও রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of State)। রাষ্ট্রীয় পরিষদের ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ২৬ জনকে গভর্ণর-জেনারেল মনোনীত করিতেন, অপর ৩৪ জন নির্বাচিত হইতেন। আইনসভার ১৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ১০৫ জন নির্বাচিত সদস্য, অবশিষ্ট সদস্যেরা মনোনীত হইতেন। মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে 'পৃথক নির্বাচনব্যবস্থাকে' (Separate Electorates) 'স্বায়ত্ত-শাসনের বিকাশের পথে গুরুতর অন্তরায়' বলিয়া অভিহিত করা হইলেও, মর্লি-মিন্টো প্রবর্তিত এই ব্যবস্থা বাতিল করা হইল না। ফলে 'পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা' ভারতের রাজনৈতিক জীবনের এক আপাত চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য হইয়া রহিল। বিধানমণ্ডলীর সম্মতি ব্যতিরেকে অর্ডিন্যান্স (Ordinance) প্রণয়ন করিয়া আইন বলবৎ করার ক্ষমতা গভর্ণর-জেনারেলের হাতে রহিল। প্রশাসন-ব্যবস্থাপকগণ (Executive) আইনসভার নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত রহিলেন, অবশ্য অর্থব্যবস্থার উপর আইনসভার কিছুটা নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত হইল।

প্রাদেশিক আইনসভাগুলি সম্পর্কে আইনে বলা হইল যে সদস্যসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ সদস্যকে নির্বাচিত হইতে হইবে এবং সরকারী কর্মচারিগণ সদস্যসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগের বেশি আসন পাইবেন না। এখানেও 'পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা' বহাল রহিল। প্রাদেশিক প্রশাসন-ব্যবস্থা দুই অংশে ভাগ করা হইল: একদিকে গভর্ণরের কাউন্সিলের সভ্যগণ

(Executive Councillors : ইঁহাদের আইনসভার নিকট কোনও দায়িত্ব রহিল না) কর্তৃক পরিচালিত 'রক্ষিত' বিভাগ (Reserved Departments) সমূহ, অপরদিকে মন্ত্রিগণের (ইঁহারা আইনসভার নিকট দায়ী রহিলেন) পরিচালনাধীন হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ (Transferred Departments)। অবশ্য দুইদিকেই গভর্ণরের কর্তৃত্ব রহিল। এই ব্যবস্থারই নাম দ্বৈতশাসন (Dyarchy)।

অসহযোগ আন্দোলন : ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের এই আইনটিকে নরমপন্থীরা স্বীকার করিয়া লইলেন, তাঁহাদের নিকট ভবিষ্যতে ভারতের স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার স্বীকৃত হওয়াটাই বিরাট অগ্রগতির পথে পদক্ষেপ বলিয়া বিবেচিত হইল। কিন্তু কংগ্রেস ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। স্বরাজ্য দল নামক কংগ্রেসের অভ্যন্তরের একটি দল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে এই ব্যবস্থাকে ভিতর হইতে আঘাত করিয়া ধ্বংস করিবার জন্য আইনসভায় যোগ দেল।

মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার ঘোষণার সময়টি নিয়মতান্ত্রিক সংস্থা হইতে বিপ্লবী সংগঠনে কংগ্রেসের রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের সূচনাকাল। যুদ্ধের প্রভাব, অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড, সাময়িক ভাবে হইলেও হিন্দু-মুসলমানের বৈরিতার অবসানকারী খিলাফৎ আন্দোলন—এই সব কিছুর ফলে উদ্ভূত এক নূতন পরিস্থিতিতে নীতি ও কৌশলকে সম্পূর্ণভাবে ঢালিয়া সাজার দাবী ওঠে। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে মহাত্মা গান্ধী আসিলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বাণী ও সত্যাগ্রহের কৌশল লইয়া। তাঁহার মতে সত্যাগ্রহ কখনও বিফল হয় না। কংগ্রেস ইহাতে প্রভাবিত হইল, ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে গৃহীত গঠনতন্ত্রের প্রথম ধারায় কংগ্রেসের চরিত্রের মূলগত পরিবর্তন প্রতিবিম্বিত হইল : "ভারতের জনগণ কর্তৃক সর্বপ্রকার আইনসঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ্য লাভই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।" ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া স্বায়ত্ত-শাসন আর কংগ্রেসের লক্ষ্যবস্তু রহিল না, "যদিও তাহা সম্পূর্ণভাবে বাতিল করিয়া দেওয়া হইল না।" লক্ষ্য সাধনে কেবলমাত্র "আমাদের মানসিক, নৈতিক ও ঐহিক অবস্থার ক্রমান্বয়ে উন্নতি"-র উপর অথবা "নিয়মতান্ত্রিক উপায়ের" উপর কংগ্রেস নির্ভরশীল রহিল না; ইহা স্বীকৃত হইল যে নিয়মতান্ত্রিক নহে এমন উপায়াদি

গ্রহণ করা চলিতে পারে, তবে তাহা "আইনসঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ" থাকা দরকার।

মণ্ট-ফোর্ড পরিকল্পনার সমালোচনা: জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের আইনটির যে-সকল ত্রুটির কথা উল্লেখ করা হয়, তাহার মধ্যে 'দ্বৈতশাসন' (Dyarchy), কেন্দ্রে আংশিকভাবে দায়িত্বশীল সরকারের অনুপস্থিতি এবং 'পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা' পাকাপাকিভাবে গ্রহণ—এই কয়টিই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'দ্বৈতশাসন' এমনই জটিল যে তাহাকে স্বচ্ছন্দভাবে পরিচালনা করা শক্ত। কেন্দ্রীয় আইনসভা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিয়া বিব্রত করে। 'পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা' জীয়াইয়া রাখার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানগণ একত্র কাজ করিতে অপারক হয় এবং খিলাফৎ আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইয়া যায়।

এক হিসাবে বলিতে গেলে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দেই ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসের সূচনা। তিনটি ভারতীয় কাউন্সিল আইন (১৮৬১, ১৮৯২ ও ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের) দ্বারা ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় না, ইহা আইন-সভাগুলিতে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে সুস্থ ও গঠনমূলক দায়িত্বশীলতার মনোভাব গড়িয়া তুলিতেও সক্ষম হয় না। মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্টের প্রণেতৃগণ মন্তব্য করেন যে "মাত্র দশ বৎসরকালের স্বল্প সময়ের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষুধা মিটাইতে পারে নাই" বলিয়াই মর্লি-মিণ্টো পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। দেশের মনোভাব সত্যসত্য অনুভব করিতে পারিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে মর্লি-মিণ্টো সংস্কার যখন ঘোষিত হয় তখনও তাহার দ্বারা 'ভারতের রাজনৈতিক ক্ষুধা মিটে নাই'। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতের 'রাজনৈতিক ক্ষুধার' তীব্রতা যদি ব্রিটেন বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে মণ্ট-ফোর্ড পরিকল্পনা অধিকতর ঔদার্যসম্পন্ন হইত। ব্রিটেন ভারতকে যেটুকু সুবিধা দিল তাহা দিল ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ও সামরিক চাপের ফলে, কোনরূপ ঔদার্য বা রাজনৈতিক সহানুভূতির কারণে নয়। মিঃ মণ্টেগুর ঘোষণা প্রসঙ্গে জনৈক মার্কিন লেখক লিখিয়াছেন: "মোটামুটি পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া ইহা রচনা করা হয়। আনুগত্যের জন্য ভারতকে পুরস্কৃত করা দরকার এবং সাম্রাজ্য যখন জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত তখন

উৎকোচ দিয়া ভারতের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়াও প্রয়োজন।” ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের এই আইনটির মধ্যে পরস্পরবিরোধী ও অসঙ্গত বহু কিছুর ব্যাখ্যা এই ‘পরস্পরবিরোধী’ উদ্দেশ্যের দ্বারা করা যায়। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ইহা নিঃসন্দেহে অভিনব ঘটনা: ব্রিটিশ শাসনকালে এই প্রথম ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হইল, যদিও এই হস্তান্তরকরণ নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে হয় এবং হস্তান্তরিত ক্ষমতাও থাকে অতিশয় সীমাবদ্ধ।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের আইনের মধ্যে নিশ্চিত নিয়মতান্ত্রিক অগ্রগতির বীজ নিহিত ছিল কি না, ইহা লইয়া কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা সম্ভব। একজন লেখক বলেন, “রাজনৈতিক বাধাই মুখ্য ছিল, নিয়মতান্ত্রিক বাধা নহে। ভারতে একটি মাত্র বৃহদায়তন ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল বা ‘ব্লক’ই ছিল এবং তাহার সহিত নিষ্পত্তি ছিল অসম্ভব।” ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের আইনটির কার্যকরী হইবার পথে রাজনৈতিক ও নিয়মতান্ত্রিক বাধার মধ্যে প্রভেদ টানার এই প্রচেষ্টা হইতে কতকগুলি প্রশ্ন জাগে। দেশের মানুষের ‘রাজনৈতিক ক্ষুধা’ মিটাইতে ব্যর্থ হইলে কোনও সংবিধানই কোনও দেশে সফলভাবে কার্যকরী করিতে পারা যায় না। যদি সংগঠিত রাজনৈতিক জনমত কোনও সংবিধানের প্রতি এরূপ বিরোধী হইয়া থাকে যে কোনও নিষ্পত্তি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সেই সংবিধানের তত্ত্বগত গুণাগুণ আলোচনা করা নিরর্থক। ব্রিটিশ সরকার জানিত যে ভারতের একমাত্র ‘সুসংগঠিত দল’ কংগ্রেসের সহিত নিষ্পত্তি অসম্ভব। যদি ব্রিটিশ সরকার সত্যসত্যই প্রকৃত নিয়মতান্ত্রিক অগ্রগতি চাহিত তাহা হইলে তাহারা নরমপন্থী ও সাম্প্রদায়িক মুসলমান গোষ্ঠীকে উস্কানি দিয়া কংগ্রেসকে দুর্বল করিয়া ফেলা অপেক্ষা কংগ্রেসের তুষ্টিবিধানই করিত। মিঃ লয়েড জর্জের মতে যাহা ‘পরীক্ষা’, শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলেও বলিতে হইবে যে, তাহার সাফল্যকে ব্রিটিশ সরকার ও ভারতে তাহার প্রতিনিধিবর্গ সাধারণের ইচ্ছা ও মতামতের বিরুদ্ধে অবাঞ্ছিত বিরোধিতা সৃষ্টি করিয়া নষ্ট করিয়াছেন।

লর্ড রীডিং (Lord Reading) সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া স্বৈরাচারী ভারতীয় রাজন্যবর্গকে সমালোচনার হাত হইতে রক্ষা করেন এবং দেশের দরিদ্রতম মানুষের ক্ষতি করিয়া লবণ-কর বাড়াইয়া দেন। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ২রা আগস্ট কমন্স-সভায় প্রদত্ত বিখ্যাত “লৌহ কাঠামো”

বক্তৃতায় ("Steel Frame" speech) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ (Lloyd George) ঘোষণা করেন যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের নেতৃত্ব ও সাহায্য ছাড়া ভারতের কবে যে চলিবে তাহা তিনি বলিতে পারেন না। লী কমিশনের নিয়োগ ও ইহার সুপারিশে জনমতে সন্দেহ দৃঢ়ভাবে বাসা বাঁধে। জনৈক মার্কিন লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে "শ্রেণী হিসাবে ব্রিটিশ রাজ-পুরুষগণ...স্পষ্টতঃই সংস্কারসাধনের বিরোধী ছিলেন।" জাতীয়তাবাদীরা যদি ধ্বংসাত্মক সমালোচনা ও ধ্বংসমূলক কায়দা অবলম্বনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে বলিতে হইবে ধ্বংসমূলক বক্তৃতা ও উস্কানি দেওয়ার কাজে শাসকদের দোষও কিছুমাত্র কম ছিল না।

সাইমন কমিশন (১৯২৭-৩০)ঃ ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের আইনটির প্রতি বিরোধিতার শক্তি সহজে নিঃশেষিত হইল না, বরং ইহার উত্তরোত্তর শক্তি-বৃদ্ধি হইল, কার্যকারিতাও বাড়িল। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় আইনসভায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর প্রস্তাবক্রমে ভারতের সংবিধান রচনা করার উদ্দেশ্যে এক গোলটেবিল বৈঠকের দাবী সম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। বঙ্গদেশ ও মধ্যপ্রদেশে স্বরাজ্য দলের বাধাদানের নীতির ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হইত না। জনমতের চাপে ভারত সরকারকে বাধ্য হইয়া স্যার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যানের (Sir Alexander Muddiman) সভাপতিত্বে একটি সংস্কার অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করিতে হয়। কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠদের রিপোর্টে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত থাকেঃ "বর্তমান গঠনতন্ত্র (অর্থাৎ ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের আইন) বহাল থাকার সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়া ইহার সাফল্য সম্পর্কে দৃঢ়ভিত্তিক মতামত পোষণ করা শক্ত হইলেও আমাদের নিকট যে সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে তাহা দ্বারা গঠনতন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে এমন কথা বলা চলে না।" অথচ সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের রিপোর্টে বলা হইল যে "বর্তমান ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে এবং......ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে অধিকতর সুফল লাভের আশা নাই।"

১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে সাইমন কমিশন নিয়োগ করিয়া ব্রিটিশ সরকার কার্যতঃ মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারকে ব্যর্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াই লইল। এই কমিশনকে "ব্রিটিশ ভারতে শাসন-ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রসার ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাসমূহের বিকাশ" সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে বলা হইল। ইহা ছাড়া "দায়িত্বশীল

সরকার প্রতিষ্ঠার মূলসূত্রটিকে প্রয়োগ করা যায় কি না, বা গেলে কতটুকু পর্যন্ত করা যায় ; বর্তমানে যে দায়িত্বশীল সরকার আছে তাহার দায়িত্ব প্রসারিত, সংশোধিত বা সঙ্কুচিত করা উচিত কি না ; এবং স্থানীয় আইন-সভাগুলিতে একটির পরিবর্তে দুইটি কক্ষ প্রবর্তন করা উচিত হইবে বা হইবে না—এই সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করিতে" বলা হইল। একই সঙ্গে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে ভবিষ্যতের সম্পর্ক নির্ধারণ করার উপায়াদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেও কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হইল। কমিশনে কোনও ভারতীয়কে স্থান দেওয়া হইল না। সর্বস্তরের ভারতীয় জনমত শুধুমাত্র ব্রিটিশ সদস্য লইয়া কমিশন গঠন করার নিন্দা করিল এবং কংগ্রেস ইহাকে 'বয়কট' করিল। কিন্তু কমিশন নিজ অনুসন্ধানকার্য চালাইয়া যান এবং তাহার ফলাফল সংক্ষিপ্তভাবে তাঁহাদের রিপোর্টের অঙ্গীভূত করেন। রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে। ব্রিটিশ সরকার পুনর্বার "ভারতের একটিমাত্র বৃহদায়তন ও সুসংগঠিত দলের" মতামতকে উপেক্ষা করিলেন। ব্রিটিশ শাসকদের খেয়ালই হয় নাই যে জনমতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূগণ কর্তৃক বর্জিত রাজনৈতিক অনুসন্ধানকার্যের দ্বারা কোনও ফল হওয়াই সম্ভব নহে। চিরাচরিত ব্রিটিশ নীতি অনুযায়ী তদানীন্তন রক্ষণশীল ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড (Lord Birkenhead) "এই বলিয়া হিন্দু জনসংখ্যাকে সন্ত্রস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন যে কমিশন মুসলমানরা দখল করিয়া লইতেছে এবং কমিশন যে রিপোর্ট পেশ করিবে তাহা হিন্দুদের পক্ষে ধ্বংসাত্মকই হইবে।" জনৈক মার্কিন লেখক বলেন, "যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে লর্ড বার্কেনহেড ও তাঁহার সহযোগীরা ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতের জনসাধারণকে অপমানিত ও তাহাদের আত্মসম্মানকে ধূলায় লুণ্ঠিত করিতে চাহেন নাই, তাহা হইলে বলিতেই হইবে জাতিগত মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহারা দুঃখজনকভাবে অজ্ঞ ছিলেন।"

নেহেরু রিপোর্ট (১৯২৮) : ভারতীয় জনমত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাইমন কমিশন যখন অনুসন্ধানকার্য চালাইয়া যাইতেছিলেন তখন ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি একটি সর্বসম্মত রাজনৈতিক কার্যসূচী প্রণয়ন করিতে চেষ্টা করে। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের (১৯২৭) একটি প্রস্তাবানুযায়ী ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে দিল্লীতে এক সর্বদলীয় সম্মেলন

অনুষ্ঠিত হয় এবং কংগ্রেস ও সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সংগঠন পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকারের ভিত্তিতে ভারতের সংবিধান রচনা সংক্রান্ত সমস্যার আলোচনা করিতে স্বীকৃত হয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি এক রিপোর্ট পেশ করিলেন। রিপোর্টে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্' (Dominion Status) অর্জনই ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য বলিয়া বর্ণিত হইল—পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। ব্রিটিশ সরকার যদি এই রিপোর্টটি ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের মধ্যে মানিয়া লন, তাহা হইলে কংগ্রেসও ইহার ভিত্তিতে রচিত সংবিধান স্বীকার করিতে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার বিশেষ সাড়া দিলেন না। শুধু ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর তারিখে বড়লাট লর্ড আরউইন (Lord Irwin) এইটুকু বলিলেন: ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এইমাত্র বলিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে যে, "তাঁহাদের বিচারে, ভারতের নিয়মতান্ত্রিক অগ্রগতির স্বাভাবিক প্রশ্নটি যেভাবে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ঘোষণাপত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যেই 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্' নিহিত আছে বুঝিতে হইবে।"

এই অস্পষ্ট ঘোষণায় ভারত খুশী হইল না। কংগ্রেসের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতায় পরিবর্তিত হইল। কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের (১৯২৯) সভাপতিরূপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেন: "পূর্ণ স্বাধীনতা ও 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্' লইয়া আমাদের প্রভূত মতবিরোধ হইয়াছে এবং শব্দার্থ লইয়া আমরা বিবাদ করিয়াছি। কিন্তু আসল কথা হইল ক্ষমতা অধিকার করা সেই ক্ষমতাকে যে নামই দেওয়া হউক না কেন। আমার মনে হয় যে ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য কোনও ধরণের 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্' দ্বারাই আমরা সত্যকার ক্ষমতা লাভ করিতে পারিব না।"

গোলটেবিল বৈঠক (১৯৩০-৩২): ভারতের সাংবিধানিক সমস্যার সমাধানের জন্য সাইমন কমিশন এক গোলটেবিল বৈঠকে বিষয়টি আলোচনার সুপারিশ করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড (Ramsay Macdonald) ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই সুপারিশ গ্রহণ করেন। এই মাসেই লর্ড আরউইন উপরিউক্ত ঘোষণা করেন।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন হয়। ইহাতে যোগদানের পরিবর্তে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে

কংগ্রেস আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করিল। গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের হেমন্তকালে) কংগ্রেসের একমাত্র প্রতি-নিধিরূপে মহাত্মা গান্ধী যোগদান করেন। ইতিপূর্বে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখা হয়। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন বসে।

ভারতের সমস্ত বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ, দেশীয় রাজন্য-বর্গের প্রতিনিধিগণ ও ইংলণ্ডের তিনটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠকটি আয়তনে ছোট হইলে এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমভাবাপন্ন হইলে ইহার আলোচনা অধিকতর প্রয়োজনে আসিত। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলি ও দেশীয় রাজ্যসমূহকে লইয়া একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (Federation) গঠনের ধারণা সৃষ্টিই দৃশ্যতঃ বৈঠকের একমাত্র সাফল্য। কংগ্রেসের উপর আস্থাস্থাপনের জন্য মহাত্মা গান্ধীর আবেদনে ব্রিটিশ সরকার সাড়া দেয় না। শোনা যায়, ইউরোপীয় সমর্থনপুষ্ট কতিপয় মুসলমান নেতার বিরুদ্ধাচরণের ফলে মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিতে পারেন না বলিয়াই মিঃ র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার (Communal Award) সূত্রপাত হয়। লর্ড মিণ্টো ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে যাহার পত্তন করেন, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে তাহাই সুসংহত ও বিস্তৃত হইল। পরে অবশ্য পুণা চুক্তির (Poona Pact) ফলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা আংশিকভাবে সংশোধিত হয়। তথাকথিত 'বর্ণহিন্দু' (Caste Hindu) ও 'তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুদের' (Scheduled Caste Hindu) মধ্যে রাজনৈতিক অনৈক্য রোধ করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী অনশন শুরু করিলে হিন্দু নেতারা পুণা চুক্তি মানিয়া লন।

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত শাসন আইনঃ গোলটেবিল বৈঠকে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হয় তাহার উপর নির্ভর করিয়া ব্রিটিশ সরকার একটি 'শ্বেতপত্র' (White Paper) রচনা করে (১৯৩৩)। পরে উহাই হইয়া দাঁড়ায় ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত-শাসন আইনের মূলভিত্তি। ভারত-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর (Sir Samuel Hoare) কমন্স সভায় এই আইনটির আলোচনা পরিচালনা করেন।

এই আইনের বিবিধ জটিল বিধান এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়, তবে

ইহার বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলি ও দেশীয় রাজ্যসমূহকে লইয়া একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (Federation) গঠনের ব্যবস্থা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করা বা না-করা রাজ্যসমূহের শাসকদের স্বেচ্ছাধীন রহিল। রাষ্ট্রীয় পরিষদে (Council of State) যতগুলি রাজ্যের আসনসংখ্যা দ্বারা মোট ১০৪টি আসনের অর্ধেক হয় এবং যাহাদের মোট জনসংখ্যা ৩,৯৪,৯০,৯৫৩ হয়, ততগুলি দেশীয় রাজ্য যোগ না দিলে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতে পারিবে না। যে-যে সর্তে একটি রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে সেগুলি একটি যোগদান-সনদে (Instrument of Accession) নির্দেশ করিতে হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহী-সংস্থা গভর্ণর-জেনারেল ও একটি মন্ত্রিসভা লইয়া গঠিত হইবে। গভর্ণর-জেনারেলই মন্ত্রীদের মনোনীত করিবেন এবং তাঁহারা গভর্ণর-জেনারেলের যতদিন খুশী ততদিন পদাধিষ্ঠিত থাকিবেন।

কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে (যথা—ভারতে বা ভারতের কোনও অংশে শান্তিভঙ্গের গুরুতর আশঙ্কা দেখা দিলে তাহা নিবারণ করা) গভর্ণর-জেনারেলের 'বিশেষ দায়িত্ব' (Special Responsibility) রহিল। এই সকল বিষয়ে মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ বা বর্জনের ব্যাপারেও তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবেন। অপর কয়েকটি বিষয়ে (যথা—প্রতিরক্ষা, খ্রীস্টধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপার, বৈদেশিক ব্যাপার, উপজাতি অঞ্চলসমূহের প্রশাসন) তাঁহাকে স্বীয় 'বিচারবুদ্ধি' (discretion) অনুযায়ী কাজ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই সকল ব্যাপার চালাইবার জন্য তিনি তিনজন পরামর্শদাতা (Counsellors) নিয়োজিত করিবেন। দেখা যাইতেছে যে সাইমন কমিশন কর্তৃক দ্বৈতশাসন বর্জিত হইলেও তাহা ইচ্ছা করিয়াই ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আইনে বর্ণিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্রিটিশ ভারতের যে সকল বিষয় সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল, তাহার সবগুলির উপর গভর্ণর-জেনারেলের নির্বাহী ক্ষমতা (executive power) বর্তাইল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা যোগদান-সনদে যে সকল বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত হইয়াছে কেবল সেই সকল বিষয়েই মাত্র বর্তায়। তাহা ছাড়াও, যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি বিভাগ চালাইবেন মন্ত্রিগণ, অন্য বিভাগগুলির পরিচালনা-ভার থাকিবে পরামর্শদাতাদের উপর।

যোগদান-সনদে যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হইল, তাহা ব্যতীত দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে সম্রাটের অধিকার ও দায়িত্ব যাহা ছিল তাহাই রহিল। এই অধিকার ও দায়িত্ব পালনের ভার সম্রাটের প্রতিভূর উপর ন্যস্ত হইল। একই ব্যক্তির গভর্ণর-জেনারেল ও সম্রাটের প্রতিভূর (Crown Representative) পদাধিকারও স্বীকৃত হইল।

যুক্তরাষ্ট্রের বিধানমণ্ডলী রাজা (তাঁহার প্রতিভূরূপে গভর্ণর-জেনারেল), রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of State) ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা (Federal Assembly) লইয়া গঠিত হইবে। রাষ্ট্রীয় পরিষদ একটি স্থায়ী সংস্থা হইবে, ইহার সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ তিন বৎসর অন্তর অন্তর অবসর গ্রহণ করিবেন। পরিষদে ব্রিটিশ ভারতের ১৫৬ জন ও রাজ্যসমূহের অনধিক ১০৪ জন সদস্য থাকিবেন। ব্রিটিশ ভারতের সদস্যগণ 'পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার' ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন, শুধু ৬ জন সদস্যকে গভর্ণর-জেনারেল মনোনীত করিবেন। রাজ্যসমূহের সদস্যবর্গ শাসকদের দ্বারা মনোনীত হইবেন। আইনসভায় ব্রিটিশ ভারতের ২৫০ জন ও রাজ্যসমূহের অনধিক ১২৫ জন সদস্য থাকিবেন। ব্রিটিশ ভারতের সদস্যগণ সরাসরি জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত না হইয়া অপ্রত্যক্ষভাবে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে প্রাদেশিক আইন-সভার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। দেশীয় রাজ্যসমূহের সদস্যদের শাসকগণ মনোনয়ন করিবেন।

কেন্দ্রের ন্যায় প্রদেশগুলির নির্বাহী (executive) ক্ষমতা গভর্ণরের উপর ন্যস্ত হয়। গভর্ণরের পদটিকে অধিকাংশে গভর্ণর-জেনারেলের আদর্শেই গঠন করা হয়। গভর্ণরের কতকগুলি নির্ধারিত বিষয়ে 'বিশেষ দায়িত্ব' (Special Responsibility) থাকিবে (যথা—প্রদেশ বা প্রদেশের কোনও অংশে শান্তিভঙ্গের গুরুতর আশঙ্কা দেখা দিলে তাহা নিবারণ করা)। অপর কতকগুলি বিষয়ে তিনি স্বীয় 'বিচারবুদ্ধি' (discretion) অনুযায়ী কাজ করিতে পারিবেন। তাঁহাকে সহায়তা করিবার ও পরামর্শ দিবার জন্য এক মন্ত্রিসভাকে তিনি স্বীয় 'বিচারবুদ্ধি' অনুযায়ী নিয়োগ করিতে ও বরখাস্ত করিতে পারিবেন।

প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীগুলির গঠন স্বভাবতঃই এক এক প্রদেশে এক

এক ধরণের হইল। অবশ্য সর্বত্রই 'পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা' (Separate Electorate) বহাল রহিল। সমস্ত প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সদস্যদের প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হইতে হইবে। ছয়টি প্রদেশে (মাদ্রাজ, বোম্বাই, বঙ্গদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসাম) বিধানমণ্ডলীগুলি দুইভাগে বিভক্ত হইল—আইন-পরিষদ (Legislative Council) ও আইনসভা (Legislative Assembly)। প্রতিটি আইন-পরিষদের কতকগুলি আসনে সদস্যরা গভর্ণর কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশগুলি সরাসরি গভর্ণর-জেনারেলের শাসনাধীন রহিল এবং আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে ইহাদের উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর পূর্ণ কর্তৃত্ব রহিল। ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্র এক সংবিধানের অধীন করা হইল।

যে-কোনও যুক্তরাষ্ট্রেই আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ভাগাভাগি অবশ্যম্ভাবী। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আইনে তিনটি বিষয়নির্ধারক তালিকা ছিল,—যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়-তালিকা, প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীর এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়-তালিকা ও যুগ্ম এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়-তালিকা। একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court) প্রতিষ্ঠা করা হইল; যুক্তরাষ্ট্র, প্রদেশসমূহ বা যুক্তরাষ্ট্রভুক্ত রাজ্যসমূহের মধ্যেকার যে-কোনও বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ইহাকে প্রাথমিক এক্তিয়ার (Original Jurisdiction) দেওয়া হইল।

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আইনের সমালোচনাঃ ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আইনটিকে ভারতের কোনও বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলই সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিল না। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই আইনটির খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীতে রাজন্যবর্গের মনোনীত ব্যক্তিদের স্থানদান, গভর্ণর-জেনারেল ও গভর্ণরদের 'বিশেষ দায়িত্ব' ও মর্জিমত ক্ষমতা ব্যবহার, প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীতে দ্বিতীয় কক্ষের ব্যবস্থা, 'স্বায়ত্ত-শাসনের স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি ও বিকাশ' সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা না-থাকা ইত্যাদি নানা ত্রুটির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "(ইহার ফলে গঠিত) যুক্তরাষ্ট্রে নির্লজ্জ স্বৈরতন্ত্র ভারতের এক-তৃতীয়াংশে জাঁকাইয়া বসিবে এবং অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশে জনমতের শ্বাসরোধ করার জন্য প্রায়শঃই সচেষ্ট হইবে।" মুসলিম লীগ যুক্ত-

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া বলিল যে ইহার ফলে 'ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার স্থাপনের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সাধন সুপরিকল্পিত ভাবে ব্যাহত ও বিলম্বিত' হইবে ; তবে প্রাদেশিক ব্যবস্থাকে 'যতটুকু সম্ভব কাজে লাগাইতে হইবে'। রাজন্যবর্গও এই ব্যবস্থাকে স্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছিলেন, কেননা ইহার ফলে তাঁহাদের স্বৈরাচারী সুযোগ-সুবিধা অনেকটা হ্রাস পাইবার আশঙ্কা ছিল। অতএব যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন স্থগিত রাখিয়া ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইল।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের উদ্ভবঃ ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আইনটির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের সনদ আইনে প্রাদেশিক সরকারগুলি প্রশাসন ও আইন প্রণয়ন ব্যাপারে সম্পূর্ণ ই কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাধীন ছিল। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত শাসন আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়া উক্ত সনদ আইনের বিরোধী প্রতিক্রিয়াকে মিটাইয়া দেওয়া হইল। কেন্দ্রীকরণের ফলে অসুবিধা তো বটেই, মাঝে মাঝে সংঘর্ষের সৃষ্টি হইত। আইন প্রণয়ন ও প্রশাসন ক্রমশঃই জটিল হইয়া উঠিতেছিল বলিয়া ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে শিথিল করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের আইনে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা হয়। লর্ড মেয়োর আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের পরি-কল্পনার ফলে ভারতীয় প্রশাসন-ব্যবস্থায় নূতন ধারা প্রবর্তিত হয়। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ল্যান্সডাউন ঘোষণা করেন, "আমরা সকলেই আমাদের প্রশাসন-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিতে ভালবাসি।" দেশীয় রাজ্যসমূহে তিনি বিকেন্দ্রীকরণের সুন্দর উপায় দেখিতে পান। লর্ড কার্জনের আমলে কেন্দ্রীকরণের পুরাতন নীতি বহুলাংশে প্রচলিত হয়। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে লর্ড মর্লি কর্তৃক নিয়োজিত বিকেন্দ্রীকরণ কমিশন প্রাদেশিক প্রশাসনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার সুপারিশ করেন। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে আর্থিক প্রশাসন-ব্যবস্থায় কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়, তবে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও মূলগত পরিবর্তন করা হয় না।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১১ই আগস্ট তারিখে ভারত-সচিবের নিকট প্রেরিত এক পত্রে ভারত সরকারের নূতন এক নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে

বলা হয় : "……দেশের শাসন পরিচালনার ব্যাপারে অধিকতর অংশগ্রহণের জন্য ভারতীয়দের ন্যায্য দাবী যে কালক্রমে মানিয়া লইতে হইবে, ইহা নিশ্চিত। গভর্ণর-জেনারেলের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া কিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাইবে ইহাই প্রশ্ন উঠিবে। এই অসুবিধার একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান হইতে পারে এই : প্রদেশগুলিকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা দিতে হইবে, এইভাবে অবশেষে ভারতে কয়েকটি স্বাতন্ত্র্যভোগী প্রশাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে। প্রাদেশিক সমস্ত ব্যাপারে ইহাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকিবে। ইহাদের সবার উপরে থাকিবে ভারত সরকার—অপশাসন ঘটিলে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ভারত সরকারের থাকিবে, কিন্তু সাধারণতঃ ভারত সরকার সম্রাটের যে সকল বিষয়ে স্বার্থ আছে তাহার মধ্যেই নিজ কার্যাবলী সীমাবদ্ধ রাখিবে।" যদিও ভারত-সচিব লর্ড ক্রু (Lord Crewe) ঘোষণা করেন যে বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা ঘুণাক্ষরেও প্রাদেশিক প্রশাসনের উপর জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ বুঝায় না, তবু "সমস্ত প্রাদেশিক ব্যাপারে স্বায়ত্ত-অধিকারসম্পন্ন প্রশাসনের" ধারণাটি ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের মনে ধরিল। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস-লীগ কর্তৃক নির্ধারিত পরিকল্পনায় (Congress-League Scheme) বলা হইল : "ভারত সরকার সাধারণতঃ প্রদেশের স্থানীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না এবং যে-সকল ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে দেওয়া হয় নাই, সেগুলি ভারত সরকারের উপর ন্যস্ত আছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।" প্রাদেশিক প্রশাসনের উপর জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ যে অনুপাতে বলবৎ হইবে, সেই অনুপাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব সঙ্কুচিত করিয়া আনিতে হইবে বলিয়া মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের আইনে ক্ষমতা অর্পণ ও হস্তান্তরের ব্যবস্থা করিয়া প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বহুলাংশে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হইল, অবশ্য সংবিধান এককেন্দ্রিকই (unitary) রহিল।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার প্রচলিত হইবার পূর্বেই অবশ্য ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহকে লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়, কিন্তু গোলটেবিল বৈঠকের পূর্বে তাহা কার্যকরী রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রচারিত এক

স্মারকলিপিতে কংগ্রেসের মনোভাব এইভাবে বর্ণিত হয়: "ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় হইবে। নির্দিষ্ট বিষয়গুলি ব্যতীত অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত ক্ষমতা (residuary power) যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত খণ্ডগুলির (Units) উপর ন্যস্ত হইবে—অবশ্য যদি ইহা ভারতের স্বার্থের প্রতিকূল রূপে প্রতিপন্ন না হয়।" যুক্ত পার্লামেণ্টারী কমিটি (Joint Parliamentary Committee) প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার সুপারিশ করিতে গিয়া ভারতের ঐক্য রক্ষা করার উপর বিশেষ জোর দেন।

লর্ড লিন্‌লিথগো (Lord Linlithgow) ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আইনটির দ্বারা প্রচলিত স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারের রাজনৈতিক মূল্যের উপর বারংবার গুরুত্ব আরোপ করিলেও, ইহা কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। মুসলিম লীগ স্পষ্টতঃই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরোধী ছিল, কিন্তু মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে ক্ষমতা দখলের আশায় লীগ সিদ্ধান্ত করিল যে "গঠনতন্ত্রের প্রাদেশিক পরিকল্পনাকে যতটুকু সম্ভব কার্যে প্রয়োগ করা যাইবে।" ভারতকে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভক্ত করার ক্ষেত্র এইভাবে প্রস্তুত হইল।

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আইনাধীনে সাম্প্রদায়িক সমস্যা: খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের যে প্রতীক মূর্ত হইয়া উঠে, ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে তাহার চূড়ান্ত রূপ দেখা দেয়। কিন্তু তাহার অল্পকাল পর হইতেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্রমশঃই ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে ব্যর্থতার পর কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে নূতন ঐক্যবন্ধনের সমস্ত আশাই কার্যতঃ বিসর্জন দেওয়া হয়। ভারতে কোনও রূপ ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সংঘটন প্রবর্তনে বাধা দানের জন্য ব্রিটিশ সরকারের উদ্বেগের অন্ত ছিল না। মুসলিম লীগ-নেতা মিঃ জিন্না তাঁহার "চৌদ্দ দফা" দাবী প্রচার করিলেন। গোলটেবিল বৈঠকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কোনও প্রতিনিধি ছিলেন না। যখন মুসলিম লীগকে তোষণ করিবার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদে ঐক্য-সম্মেলন আহ্বান করেন, তখন ভারত-সচিব স্যার শ্যামুয়েল হোর তাহা অপেক্ষা ভাল সর্ত মুসলমানদের দিলেন (কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলীতে শতকরা ৩৩⅓ ভাগ প্রতিনিধিত্ব ও হিন্দুপ্রধান বোম্বাই প্রদেশ হইতে মুসলমানপ্রধান সিন্ধু দেশের পৃথকীকরণ)।

ঐক্য প্রতিষ্ঠার সকল আশাই এইভাবে নিশ্চিতভাবে নির্মূল হইয়া গেল। গোলটেবিল বৈঠক হইতে সৃষ্টি হইয়া আসিল ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পরিকল্পিত "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা"। "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" সম্পর্কে কংগ্রেস এক অস্বাভাবিক মনোভাব ধারণ করিল এবং এই দ্বিধান্বিত সুবিধাদান সত্ত্বেও মুসলমানগণ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। মিঃ জিন্না যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করিলেও, ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আইনের প্রাদেশিক পরিকল্পনা স্বীকার করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস যখন কতিপয় প্রদেশে সরকার গঠন করিল, তখন কংগ্রেস নেতৃগণ বিভিন্ন দলের সম্মিলিত (Coalition) মন্ত্রিসভা গঠনে সম্মত হইলেন না। অবশ্য যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসের সহযোগিতা-প্রস্তাব লীগ প্রত্যাখ্যান করে। বেশির ভাগ প্রদেশে মুসলিম লীগ ক্ষমতা দখল করিতে পারিবে না দেখিয়া মিঃ জিন্না "হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান" নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি "কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদে"র "চালাকি"র "মুখোশ খুলিয়া দেন" এবং কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির বিরুদ্ধে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করেন। কংগ্রেস এই অভিযোগগুলিকে অস্বীকার করে, মিঃ জিন্নাও তাঁহার অভিযোগ সপ্রমাণ করিবার কোনও প্রচেষ্টা করেন না। এখানে একজন মুসলিম লীগের সমর্থক পর্যবেক্ষক অধ্যাপক কুপল্যাণ্ডের কৌতূহলোদ্দীপক উদ্ধৃতি দেওয়া যায়: "...মতবিরোধের ব্যাপারটির তেমন বিশেষ গুরুত্ব নাই, কেননা যে প্রসঙ্গগুলি লইয়া বিরোধ দেখা দিয়াছে, কেবলমাত্র সেইগুলি মুসলমানদের বিদ্রোহের শক্তি ও ব্যাপ্তির নির্ধারক নহে। যে বিরাট এলাকা লইয়া ব্যাপার, তাহাতে এগুলি সংখ্যার দিক দিয়া প্রচুর নহে: তুলনামূলকভাবে তাহাদের বেশির ভাগেরই বিশেষ গুরুত্ব নাই এবং অতীতে বহু বৎসর ধরিয়া অনুরূপ ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটিয়া আসিয়াছে।"

কিন্তু মিঃ জিন্না এই সকল তথাকথিত "নিষ্ঠুর ঘটনার" গুরুত্বের উপর জোর দিলেন, এবং কংগ্রেস ভারতের জন্য সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদের (Constituent Assembly) দাবী তুলিলে মিঃ জিন্না ইহাকে "হিন্দু রাজত্ব" সংহত করার প্রচেষ্টা বলিয়া অভিহিত করিলেন। অতএব সর্বসম্মতভাবে সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান অসম্ভব হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় নূতন রাজনৈতিক সুযোগের দ্বার

খুলিয়া গেল বলিয়া মনে হইলেও, ইহার ফলে ব্রিটিশ সরকার, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে বিরোধ বাড়িয়া গেল। কতিপয় মুসলমান নেতা কর্তৃক পূর্বেই প্রস্তাবিত "দ্বি-জাতি" তত্ত্বকে মিঃ জিন্না বিকশিত করিতে লাগিলেন। সমস্ত দলের নিকট গ্রহণযোগ্য সংবিধান রচনার জন্য তিনি কোন গঠনমূলক প্রস্তাব আনিলেন না। তাঁহার গঠনমূলক প্রস্তাব আসিল ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের বিখ্যাত পাকিস্তান প্রস্তাবের ধোঁয়াটে আকার লইয়া। এই পরিকল্পনা মূলতঃ ধ্বংসমূলক ছিল, কেননা দুইশত বৎসর ধরিয়া ব্রিটিশ শাসনের ফলে যে ঐক্য সুসংহত হইয়াছিল এই প্রস্তাব তাহাকে অস্বীকার করার সামিল হইল।

দেশীয় রাজ্যসমূহ ও সার্বভৌম ক্ষমতা ঃ মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্টে দেশীয় রাজ্যসমূহকে "সাম্রাজ্যের গণ্ডীর মধ্যেই নৈকট্যদানের" প্রয়োজনের উল্লেখ করা সত্ত্বেও সেই সঙ্গেই ঘোষণা করা হয়ঃ "যে কোনও সাংবিধানিক পরিবর্তন ঘটুক না কেন, তাহা দ্বারা বিভিন্ন চুক্তি, সনদ অথবা প্রচলিত ব্যবহার প্রভৃতির ফলে (রাজন্যবর্গের) অর্জিত অধিকার, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ক্ষুণ্ণ হইবে না।" এই নীতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী নরেন্দ্রমণ্ডল (Chamber of Princes) গঠিত হয়। এই পরিষদের আলোচনাদি করিবার, পরামর্শ ও উপদেশ দিবার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু কোনও নির্বাহী ক্ষমতা ছিল না।

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে মার্চ লর্ড রীডিং নিজামের নিকট এক পত্র লেখেন, পত্রে সার্বভৌমত্বের (Paramountcy) তত্ত্ব অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যসমূহের সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতাধিকারীর মর্যাদা এইভাবে বর্ণিত হয় :

"ভারতে ব্রিটিশ সম্রাটের সার্বভৌমত্ব চূড়ান্ত। অতএব কোনও দেশীয় রাজ্যের শাসকই ন্যায্যভাবে ব্রিটিশ সরকারের সহিত সমানাধিকারের ভিত্তিতে আলোচনা করিবার দাবী করিতে পারেন না। এই সার্বভৌমত্বের অস্তিত্ব শুধুমাত্র সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদির ভিত্তিতেই নয়, বরং সকল সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীনভাবেই ইহা বিরাজমান। এই সমস্ত সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদির ফলে প্রাপ্ত বিদেশী শক্তি ও বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত অধিকার ব্যতিরেকেই, দেশীয় রাজ্যসমূহের সহিত সম্পাদিত চুক্তি ইত্যাদি নিষ্ঠার সহিত মান্য করার সঙ্গে সঙ্গে, ভারতের

সর্বত্র শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করা ব্রিটিশ সরকারের অধিকার ও কর্তব্য বলিয়া গণ্য।"

"চুক্তির ফলে অর্জিত অধিকারের" আইনগত ও ঐতিহাসিক দিক নেহেরু কমিটি (১৯২৮) এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্পর্কে অনুসন্ধান কমিটি (Butler Committee—স্যার হারকোর্ট বাটলার এই কমিটির সভাপতি ছিলেন) কর্তৃক আলোচিত হয়। এই আলোচনাদির ধরণ ছিল তাত্ত্বিক। নেহেরু কমিটি যথাযথভাবেই বলেন যে দেশীয় রাজ্যসমূহের সমস্যাটি "বিশ্লেষণধর্মী আইনজ্ঞ অপেক্ষা গঠনমূলক কূট-নীতিজ্ঞের আলোচ্য বিষয়"। এমন কি "বিশ্লেষণধর্মী আইনজ্ঞগণও" এ-কথা বুঝিতেন যে বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সহিত সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অবস্থায় এক শত বৎসর পূর্বে সম্পাদিত চুক্তিসমূহকে—যাহাকে সার্বভৌম শক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—জনসাধারণের নিকট অসহ্য এক ব্যবস্থার সমর্থনে টানিয়া আনা যাইত না। দেশীয় রাজ্যসমূহ আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা শাসিত হইত না ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী ব্যাখ্যার নীতিটি যে সুষ্ঠু বাস্তব বিবেচনার উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত ইহা কোনও কূটনীতিজ্ঞের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

ভারত 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্' পাইলে সম্রাটের সার্বভৌমত্ব (Paramountcy) ভারত সরকারকে অর্পণ করা হইবে কিনা, এ-সম্পর্কে নেহেরু কমিটি আলোচনা করেন। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আইনে নেহেরু কমিটির এই দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়। আইনের বিধানমতে কেবল সম্রাটের প্রতিনিধিই (Crown Representative) সার্বভৌমত্বের দাবী সম্পর্কে বিচার করিবেন, গভর্ণর-জেনারেল বা ভারত সরকার নন। দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্পর্কে কংগ্রেস সাবধানতার নীতি অবলম্বন করিল, কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অসন্তোষ দেশীয় রাজ্যসমূহকে প্রভাবিত না করিয়া পারিল না। লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো (১৯৩৬-৪৩) দেশীয় রাজ্যসমূহকে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে প্রলুব্ধ করিতে পারিলেন না।

দেশীয় রাজ্যসমূহ ও ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আইন: ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের বহু তীক্ষ্ণধী পর্যবেক্ষক মনে করেন যে ব্রিটিশ সরকার

কর্তৃক রাজন্যবর্গকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে বলা ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে সমতা আনয়ন করিবার সদিচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হয় নাই। বরং লিখিত-পঠিতভাবে যে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হইতে পারিতেন কার্যতঃ তাহাকে নাকচ করিবার জন্যই রাজন্যবর্গকে তাঁহারা ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন। যে জাতীয়তাবাদীরা সত্যকারের ক্ষমতা চাহিতেছিলেন, তাঁহারা রাজন্যবর্গকে মিত্র ও বিশ্বাসযোগ্য অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করিতে চাহিতেন না। অথচ ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আইনে রাজন্যবর্গের সহায়তার উপরই যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারটিকে নির্ভরশীল রাখা হয়। এই যুক্তরাষ্ট্র, কংগ্রেস সভাপতির মতে, হইবে: "এমন এক যুক্তরাষ্ট্র যাহাতে ভারতের এক-তৃতীয়াংশে আসন জাঁকাইয়া বসিবে নির্লজ্জ স্বৈরতন্ত্র এবং তাহা অপর দুই-তৃতীয়াংশের জনমতকে গলা টিপিয়া মারিবার জন্য প্রায়শঃই সচেষ্ট হইবে"।

রাজন্যবর্গ যে শেষ পর্যন্ত সার্বভৌম শক্তির ইঙ্গিত অমান্য করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের আওতায় আসিতে অস্বীকার করিবেন, ইহা বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। তাঁহারা যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে অস্বীকৃত হইলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নীতির কথা বাদ দিয়াও বলা যায়, রাজন্যবর্গের অসহযোগিতার ফলেই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বানচাল হইয়া গেল। দেশের মধ্যে এমন এক পরিবর্তন আসিয়াছিল যাহার ফলে রাজন্যবর্গ ভীত হইয়া পড়েন। যদি "ব্রিটিশ ভারত" "গণতান্ত্রিক মুক্তি" অর্জনে সক্ষম হয়, তাহা হইলে "রাজন্যবর্গের শাসনাধীন ভারতে" আর "নির্লজ্জ স্বৈরতন্ত্র" চালাইয়া যাওয়া যাইবে না। অতএব, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা স্থগিত রাখার মধ্য দিয়া ব্রিটিশ ভারতের "গণতান্ত্রিক মুক্তি"ও স্থগিত করা যাইবে এই কথা বিবেচনা করিয়া রাজন্যবর্গ পিছু হটিয়া আসিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বর্জনের পিছনে রাজন্যবর্গের সম্ভবতঃ আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে (১৯৩৪) ডাঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ সভাপতির অভিভাষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দেন :"......রাজন্যবর্গও বর্তমান অপেক্ষা অধিকতর অসহায় হইয়া পড়িবেন। ব্রিটিশ ভারতের জনসাধারণের ক্ষতিকর হস্তক্ষেপ হইতে তাঁহাদের মুক্ত করার—অথচ তাহারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বড়লাটের কর্তৃত্বাধীনে রাখার—জন্য যে যুক্তরাষ্ট্রের

পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহার ফল তাঁহারা অচিরেই পাইবেন।” যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে তাঁহাদের দ্বৈত-কর্তৃত্বের অধীনে আসিতে হইত। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কংগ্রেসের, সব সময়ে কার্যকরী না হইলেও, অন্ততঃ ব্যাপক প্রভাব নিশ্চয়ই থাকিত এবং ভারত সরকার অন্ততঃ কয়েকটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করিতেন। তাহা ছাড়া আধুনিক পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত খণ্ডগুলির (Units) স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া কেন্দ্রের ক্ষমতা সর্বদাই বাড়ে, এ-কথাও সুবিদিত ছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করিয়া লইলে সার্বভৌম শক্তির অনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ হইতেও রাজন্যবর্গের মুক্তি যে হইত, তাহার কোনও স্পষ্ট স্বীকৃতি ছিল না। বাটলার কমিটির রিপোর্টে সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে রাজন্যবর্গের মতামতকে অস্বীকার করা হয়। ১৯৩৫ সালের আইনটি প্রস্তুতির সময়ে রাজন্যবর্গ সার্বভৌমত্বের ক্ষমতাধিষ্ঠিত শক্তির সংজ্ঞা চাহেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যে উত্তর দেন তাহা অস্পষ্ট এবং হতাশাব্যঞ্জক বলিয়া মনে হয়। ভারত-সচিব বলিলেন, “সম্রাটের সহিত রাজন্যবর্গের সম্পর্ক এমনই একটি ব্যাপার যাহা লইয়া কোনও বিরোধ চলে না।” অর্থাৎ ঘুরাইয়া বলিতে গেলে, কংগ্রেস-প্রভাবিত যুক্তরাষ্ট্রের হাতে “আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের” কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলেও সার্বভৌম-শক্তি সার্বভৌমই থাকিয়া যাইবে। অতএব রাজন্যবর্গ একজন প্রভুর স্থলে দুইজন প্রভুর কর্তৃত্ব স্বীকার করিবেন কেন?

রাজন্যবর্গ কংগ্রেসকে ভয় করিতেন, তাঁহাদের সম্পর্কে কংগ্রেসের ভীতিও বড় কম ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় কংগ্রেসের একটি প্রধান আপত্তি ছিল যুক্তরাষ্ট্রে রাজন্যবর্গের স্থান লইয়া। আপত্তির অন্যান্য কারণও ছিল, যথা—কেন্দ্রের হাতে সত্যকার ক্ষমতা না-দেওয়া, প্রাদেশিক পরিকল্পনায় নানা ত্রুটি, গভর্ণর-জেনারেল ও গভর্ণরদের বিশেষ ক্ষমতাদান, ইউরোপীয়দিগের স্বার্থ-সংরক্ষণ প্রভৃতি। দৃঢ়ভাবে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আইনটির, বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার, বিরোধিতা করার নীতি অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস গণপরিষদের মাধ্যমে নূতন সংবিধান রচনা করিবার গণতান্ত্রিক সূত্র উপস্থাপিত করিল। ব্রিটিশ সরকার এই প্রস্তাবকে বিশেষ গুরুত্ব দেন না, মিঃ জিন্না এই ব্যাপারে তাঁহাদের সুযোগ্য সহায়ক হইয়া উঠেন।

কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনঃ ভারতের অনিচ্ছা

ও প্রতিবাদসত্ত্বেও ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত-শাসন আইন চাপাইয়া দেওয়া হইল। সেই সঙ্গে ১১টি প্রদেশে বহুতর 'রক্ষাব্যবস্থা' (safeguards) ও গভর্ণরের 'বিশেষ দায়িত্ব' ইত্যাদি সহ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইল।[১] নির্বাচনপর্ব সমাপ্ত হইলে দেখা গেল পাঁচটি প্রদেশের আইনসভায় (মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা) কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে এবং চারটি প্রদেশে (বোম্বাই, উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ, বঙ্গদেশ ও আসাম) সর্বাধিক আসন অধিকার করিয়াছে। মুসলিম লীগ কোনও প্রদেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে নাই। প্রথমে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, কেননা তাহাদের ভয় ছিল যে প্রশাসন পরিচালনায় মন্ত্রীদের সত্যকার কোনও স্বাধীনতা থাকিবে না। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে কংগ্রেসকে এই আশ্বাস দেন যে প্রদেশগুলির দৈনন্দিন প্রশাসনে গভর্ণরগণ হস্তক্ষেপ করিবেন না। তৎপর কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করেন (বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ)। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশে কংগ্রেস যুক্তদলীয় (Coalition) মন্ত্রিসভায় যোগদান করে, আসামে কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে এক যুক্তদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এইভাবে বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাব ব্যতীত সমস্ত প্রদেশই কার্যতঃ কংগ্রেস শাসনাধীনে আসে।

বিরোধী দলের ভূমিকায় কংগ্রেস (১৯৩৯-৪৬) ঃ ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ বাধে। আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলীর সমর্থন অথবা জনমতের তোয়াক্কা না করিয়াই ভারতকে যুদ্ধে জড়িত করিয়া ফেলা হয়। ইহার ফলে কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের যে দুস্তর ব্যবধান ছিল তাহা তৎক্ষণাৎ লোকচক্ষুর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল। কংগ্রেস ঘোষণা করিল, "ভারতের পক্ষে যুদ্ধ বা শান্তির প্রশ্ন ভারতের জনসাধারণ কর্তৃকই স্থিরীকৃত হইবে।" "সাম্রাজ্যবাদী কায়দায়, ভারত ও অন্যত্র সাম্রাজ্যবাদকে সুসংহত করিবার জন্য পরিচালিত যুদ্ধে কোনরূপ সহযোগিতা না করার" কথা কংগ্রেস ঘোষণা করে এবং ব্রিটিশ সরকারকে "গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁহাদের যুদ্ধের লক্ষ্য কি এবং (যুদ্ধশেষে) নূতন যে ব্যবস্থার কল্পনা

১ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করা হয়।

করা হইতেছে তাহার স্বরূপ কি তাহা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা" করিতে বলে। "ভারতকে স্বাধীন জাতি হিসাবে ঘোষণা করার এবং বর্তমানে সেই স্বাধীনতার প্রয়োগের" দাবীও কংগ্রেস উপস্থিত করে।

ব্রিটিশ সরকার ইহাতে বিশেষ সাড়া না দেওয়ায় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করিলেন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে নূতন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত পাঁচটি প্রদেশে (বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও মধ্য-প্রদেশ) ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আইনের ৯৩ ধারা মতে গভর্ণরদের স্বৈরশাসন চলিতে থাকে। উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, পরে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে এই প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। আসামে লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, এখানেও ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। বঙ্গদেশ ও সিন্ধু প্রদেশে মধ্যে মধ্যে লীগ-বিরোধী দলগুলির জয় হইলেও লীগের শাসন সুসংহত হয়। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস-শিখ-ইউ-নিয়নিস্ট যুক্তদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্বে পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট দলের শাসন বহাল ছিল।

কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করিবার পর যুদ্ধের প্রথম তিন বৎসর, একমাত্র ভারতের নূতন সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদের দাবী করা ছাড়া, কংগ্রেস সরকারকে কোনভাবে বিব্রত করে নাই। মহাত্মা গান্ধী লিখিলেন, "ব্রিটেনের ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে স্বাধীনতা উদ্ধার করিতে আমরা চাহি না।" ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস সর্তাধীনে সহযোগিতার প্রস্তাব করে, কংগ্রেসের মুখ্য দাবী ছিল অবিলম্বে 'ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা' ঘোষণা করা এবং কেন্দ্রে অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করা। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ৮ই আগস্ট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো এক বিবৃতিতে সংখ্যালঘুদের আশ্বাস দিয়া ঘোষণা করিলেন যে তাঁহাদের সম্মতি ব্যতীত কোনও সংবিধান রচিত হইবে না। এই বিবৃতিতে ভারতীয়দের নিজ সংবিধান রচনা করিবার অধিকারের সর্তাধীন স্বীকৃতি ছিল এবং যুদ্ধশেষে একটি সংবিধান-রচনা-সংস্থা গঠন করা হইবে বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন যে এই বিবৃতির ফলে "কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বে ভারতের ও ইংলণ্ডের মধ্যকার পার্থক্য আরও ব্যাপক হইয়া যায়।" তখন তাঁহার নেতৃত্বে বাক্‌-স্বাধীনতার ন্যূন দাবীতে কংগ্রেস সত্যাগ্রহ শুরু করিল। মহাত্মা গান্ধী এই অভিযানকে ব্যাপক 'গণ-

আন্দোলনে' পরিণত না করার সিদ্ধান্ত করিলেন, কেননা তাহাতে সরকারকে বিব্রত করা হইবে; এই অভিযান হইবে 'নৈতিক প্রতিবাদ' মাত্র।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতের জনজীবনে মুসলীম লীগ ও ইহার নেতা মিঃ এম. এ. জিন্না তেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেন না। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আইনানুসারে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ১১টি প্রদেশের মোট ৪৮২টি মুসলমান আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ মাত্র ১১০টি আসন পায়। কংগ্রেস যখন মন্ত্রিসভা গঠন করিল তখন মিঃ জিন্না ঘোষণা করিলেন যে মুসলমানগণ 'কংগ্রেস সরকারের কাছে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করিতে পারে না'। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে লীগ তিনটি দলিল প্রকাশ করিয়া কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনে। দলিলগুলিতে হিন্দুগণ কর্তৃক মুসলমানদিগের উপর 'নিষ্ঠুর অত্যাচারের' অভিযোগ করা হয়। স্যার রেজিন্যাল্ড কুপ্‌ল্যাণ্ড (Sir Reginald Coupland) বলেন, "কোন নিরপেক্ষ অনুসন্ধানকারী এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিবেন যে হয় এই অভিযোগগুলি অতিরঞ্জিত অথবা তেমন গুরুতর কিছু নয়...এবং কংগ্রেসী সরকারগুলি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমান-বিরোধী নীতি অনুসরণের অভিযোগও সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় নাই। ...যাহা হউক, কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সাধারণ মুসলমানগণ সহজেই বিশ্বাস করিল।" স্বভাবতঃই নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে মিঃ জিন্নার জনপ্রিয়তা বাড়িয়া গেল। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে যখন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করিল তখন তিনি ঘোষণা করিলেন যে প্রতি বৎসর নিষ্ঠাভরে একটি "মুক্তি দিবস" পালন করিয়া প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসী শাসনের অবসানে আনন্দ প্রকাশ করা উচিত।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত হইবার কিছুকাল পরেই মিঃ জিন্না এক তত্ত্ব প্রচার করিতে শুরু করিলেনঃ ভারতীয় মুসলমানগণ শুধু একটি সম্প্রদায়মাত্র নহে, তাহারা একটি 'জাতি'। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একটি ইংরেজী পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি লেখেন, "ভারতে দুইটি জাতি আছে, একই মাতৃভূমির শাসনভার দুইজনকেই ভাগ করিয়া লইতে হইবে।" ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি হিন্দুধর্ম ও ইসলামের পার্থক্যের উপর জোর দিতে গিয়া বলেন, "ধর্ম কথাটির সংকীর্ণ অর্থে ইহারা ধর্ম নহে,

বস্তুতঃ ইহারা পৃথক ও সুস্পষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। হিন্দু ও মুসলমানগণ কখনও একটি জাতিসত্তা গড়িয়া তুলিতে পারিবে, ইহা স্বপ্নেই সম্ভব। হিন্দু ও মুসলমানগণের দুইটি পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক আচরণ ও সাহিত্য আছে··· এইরূপ দুইটি জাতিকে লইয়া কোনও রাষ্ট্র গঠিত হইলে, যে রাষ্ট্রে একদল সংখ্যালঘু হইয়া থাকিবে এবং অন্যদল হইবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহাতে অসন্তোষ উত্তরোত্তর বাড়িবে এবং এইরূপ রাষ্ট্র শাসনের জন্য যে ব্যবস্থাই করা হউক না কেন তাহা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হইবেই।"

অতএব মিঃ জিন্নার মতে মুসলমানদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রয়োজন। "যে সংবিধানে অবশ্যম্ভাবীরূপে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠিত হইবে তেমন কোন সংবিধানকে" মুসলমানগণ স্বীকার করিয়া লইবে না। মুসলমানদের 'বাসভূমি' অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের যে সমস্ত এলাকায় মুসলমানগণ সংখ্যাগুরু সেই এলাকাগুলিকে এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এই ধারণাটির উদ্ভাবক মিঃ জিন্না নহেন। পঞ্জাবের কবি-দার্শনিক স্যার মহম্মদ ইকবাল ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে এক করিয়া একটি স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন অথচ স্বাধীন নয় এমন একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন, এই রাষ্ট্রটি ঢিলাঢালা একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে চৌধুরী রহমৎ আলি নামক একজন পঞ্জাবী ছাত্র 'পাকিস্তান' (পবিত্র মানুষের দেশ) শব্দটি সৃষ্টি করেন। পাকিস্তান হইবে মুসলমান রাষ্ট্র—ইহার অঙ্গীভূত হইবে পঞ্জাব (আদ্যক্ষর 'প্'), উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ বা আফগান অঞ্চল (আদ্যক্ষর 'আ'), কাশ্মীর (আদ্যক্ষর 'ক্'), সিন্ধু (আদ্যক্ষর 'স্') ও বেলুচিস্তান। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে চৌধুরী রহমৎ আলি আসাম ও হায়দরাবাদকে পাকিস্তানের অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া দাবী করেন।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে নিম্নলিখিত ভিত্তিতে গঠিত না হইলে কোনও সাংবিধানিক পরিকল্পনা মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য হইবে না: "ভৌগোলিক দিক দিয়া সংলগ্ন খণ্ড (Units)-গুলি লইয়া অঞ্চল চিহ্নিত করিয়া দিতে হইবে, এজন্য প্রয়োজন হইলে সেই ভূখণ্ডের সীমানা রদবদল করিতে হইবে। যে সমস্ত এলাকায় মুসলমানগণ সংখ্যাগুরু, যথা—ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল—সেই সমস্ত এলাকা লইয়া একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে, এই রাষ্ট্রের

অঙ্গীভূত খণ্ডগুলির স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার ও সার্বভৌমত্ব থাকিবে।” কতখানি অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান গঠিত হইবে প্রস্তাবে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। ইহাতে ‘খণ্ড’, ‘অঞ্চল,’ ‘এলাকা’, ‘ভূখণ্ডের সীমানা রদবদল’ প্রভৃতির কথা বলা হইলেও প্রচলিত রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক খণ্ডগুলির উল্লেখ ছিল না। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে মিঃ জিন্না অধ্যাপক কুপ্ল্যাণ্ডকে বলেন যে পাকিস্তান হইবে ‘একটি মুসলমান রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমবায়, ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ভারতের একদিকে উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ, পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ ও অন্যদিকে বঙ্গদেশ’। তিনি তখন বেলুচিস্তান ও আসাম দাবী করেন নাই, হায়দরাবাদ ও কাশ্মীরও চাহেন নাই। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ই মে তারিখে ‘ক্যাবিনেট মিশনে’র (Cabinet Mission) নিকট প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে মুসলিম লীগ দাবী করে যে “ছয়টি মুসলমান প্রদেশকে (পঞ্জাব, উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধুদেশ, বঙ্গদেশ ও আসাম) এক করিয়া একটি ‘গ্রুপ্’ (Group) করিতে হইবে।” অমুসলমান আসামকে কেন যে “মুসলমান প্রদেশ” বলিয়া বলা হইল তাহা অবশ্য ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

পৃথক হইয়া থাকিবার যে মনোভাব হইতে অবশেষে পাকিস্তানের উদ্ভব হয়, তাহার অতীত বহুদূর-প্রসারিত। ব্রিটিশের ভেদনীতির ফলে মুসলমানদের বিশেষ সুবিধাদি দান করায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে গভীর অনৈক্য সৃষ্টি হয়। ‘পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা’র কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটির কুফল এমনই স্পষ্ট হইয়া ওঠে যে মণ্টেগু-চেম্স্‌ফোর্ড রিপোর্টের প্রণেতৃগণও তাহার সাফাই গাহিতে পারেন নাই। তাঁহাদেরও এই কথা বলিতে হয়, “ধর্ম ও শ্রেণীর ভিত্তিতে ভাগ করার অর্থ পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগঠিত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সৃষ্টি করা। ইহার ফলে লোকে একই দেশের নাগরিকরূপে চিন্তা করিতে শেখে না, শেখে দলীয় সমর্থক হিসাবে চিন্তা করিতে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তে জাতীয় প্রতিনিধিত্ব-ব্যবস্থা কবে যে হইবে তাহা ভাবাই দুষ্কর।” কিন্তু তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে আসিলেন যে, ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে মুসলমানদের নিকট যাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। মিঃ র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড রচিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এই সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাকে শুধু স্বীকৃতিই দিল না, বরং ব্যাপকতর করিয়া তুলিল।

ক্রিপ্‌সের দৌত্য (১৯৪২)ঃ ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের চমকপ্রদ জয়লাভের ফলে ভারতের অচলাবস্থা সমাধানের জন্য ব্রিটিশ সরকার প্রচেষ্টা করিতে বাধ্য হন। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ১১ই মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল ঘোষণা করেন যে যুদ্ধকালীন মন্ত্রি-সভার (War Cabinet) সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ (Sir Stafford Cripps) ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলি শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে এবং 'সরেজমিনে ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে' উক্ত প্রস্তাবের দ্বারা 'তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে কিনা তাহা যাচাই করিবার জন্য' ভারতবর্ষে যাইবেন। স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মার্চ দিল্লীতে আসিয়া পৌছান এবং ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই এপ্রল করাচী হইতে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করেন।

ব্রিটিশ সরকারের এই খসড়া ঘোষণায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি ছিল :

(১) "যুদ্ধ বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের নূতন সংবিধান রচনার জন্য একটি নির্বাচিত সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা করা হইবে।"

(২) "সংবিধান-রচনাকারী সংস্থায় দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হইবে।"

(৩) নিম্নে বর্ণিত সর্তসাপেক্ষে ব্রিটিশ সরকার উক্ত সংস্থা কর্তৃক প্রণীত সংবিধানটিকে স্বীকার ও অবিলম্বে কার্যকরী করিবে :—

(ক) ব্রিটিশ ভারতের কোনও প্রদেশ যদি নূতন সংবিধানকে স্বীকার করিতে না চায় এবং স্বীয় প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক অবস্থা বহাল রাখিতে চায় তবে তাহাকে সেই অধিকার দেওয়া হইবে। ভবিষ্যতে যদি সেই প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে চায় তবে তাহা করিতে পারিবে।

আপাততঃ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে অনিচ্ছুক প্রদেশ যদি ইচ্ছা করে তাহা হইলে ব্রিটিশ সরকার তাহাদের জন্য নূতন এক সংবিধান গঠনে সম্মত হইবে, সেই সংবিধানে এই প্রদেশগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নের অনুরূপ পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হইবে।

(খ) সংবিধান-রচনাকারী সংস্থা ব্রিটিশ সরকারের সহিত এক চুক্তি করিবে, চুক্তিতে 'ব্রিটিশের হাত হইতে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের হস্তে দায়িত্ব হস্তান্তরীকরণের ফলে উদ্ভূত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে' ব্যবস্থা ও 'জাতিগত ও

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রক্ষাব্যবস্থার' প্রতিশ্রুতি থাকিবে। কিন্তু এই চুক্তির ফলে 'ভবিষ্যতে ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থের অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রের সহিত স্বীয় সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপারে ভারতীয় ইউনিয়নের ক্ষমতার উপর কোনও বাধানিষেধ আরোপিত' হইবে না।

(৪) প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীর নিম্নসভাগুলির (Lower Houses) সদস্যগণ কর্তৃক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংবিধান-রচনাকারী সংস্থা নির্বাচিত হইবে।

(৫) নূতন সংবিধান রচনা না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য দায়ী থাকিবে। কিন্তু 'স্বদেশ, কমনওয়েল্‌থ ও জাতিসংঘ সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপারে ভারতের জনসাধারণের মুখ্য অংশগুলির নেতৃবর্গের অবিলম্বে কার্যকরী অংশগ্রহণ করাই' ব্রিটিশ সরকারের 'কাম্য ও বাঞ্ছনীয়'।

এই ঘোষণায় ভারতকে একটি আশ্বাসমাত্র দেওয়া হইল—সে আশ্বাসও আবার পূর্ণ হইবে সঙ্গে সঙ্গে নয়, ভবিষ্যতে। মহাত্মা গান্ধী ইহাকে "ভবিষ্যতের তারিখযুক্ত চেক" বলিয়া অভিহিত করেন। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় ইউনিয়নে প্রদেশগুলির যোগদান না করিবার ব্যবস্থা রাখা পাকিস্তানের দাবীর সুস্পষ্ট স্বীকৃতি যদি না-ও হয় তবে তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ দান নিশ্চয়ই। তৃতীয়তঃ, প্রতিরক্ষা সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কংগ্রেসের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। চতুর্থতঃ, কংগ্রেসের দাবী ছিল ভারতীয় নেতৃবর্গ কর্তৃক গঠিত জাতীয় সরকারের পরামর্শে গভর্ণর-জেনারেল নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তারূপে কাজ করিবেন, এই মর্মে অলিখিত আশ্বাস। কিন্তু কংগ্রেস তাহা পাইল না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মতে ক্রিপ্‌স্ পরিকল্পনার অর্থ দাঁড়ায় ইহাই যে "সরকারের বর্তমান কাঠামো অবিকল পূর্বের ন্যায় বজায় থাকিবে, বড়লাটের স্বৈরাচারী ক্ষমতা বহাল থাকিবে এবং আমাদের মধ্যে জন কয়েক তাঁহার উর্দিধারী হুকুমবরদার হইয়া ভোজন-শালা ও ঐ জাতীয় ব্যাপারের তদারকী করিব।" সেইজন্য কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। মুসলিম লীগও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া পাকিস্তানের দাবীর পুনর্ঘোষণা করে।

'ভারত ছাড়' ও আগস্ট আন্দোলন (১৯৪২)ঃ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ যখন ভারত ত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন ভারত অদৃষ্টপূর্ব উত্তেজনায় কম্পমান।

জাপান যখন ভারতের দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তেমন সংকট-মুহূর্তেও যখন ব্রিটিশ সরকার আপোস-মীমাংসায় রাজী হইল না, তখন কংগ্রেসও সরকারের প্রত্যক্ষ বিরোধিতার নীতি গ্রহণে বিলম্ব করিতে চাহিল না। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই 'ভারত ছাড়' ("Quit India") এই ধারণা মহাত্মা গান্ধীর মনে উদয় হয় এবং অবিলম্বে তিনি ইহাকে জাতীয়তাবাদী ভারতের রণধ্বনি করিয়া তোলেন। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মে তারিখে তিনি 'হরিজন' পত্রিকায় লিখিলেন, "ব্রিটিশের ভারতে অবস্থিতি জাপানকে ভারত আক্রমণে আমন্ত্রণ জানানোরই সামিল। ব্রিটিশ ভারত ছাড়িয়া গেলেই এই প্রলোভন বিদূরিত হইবে......।" ইহার কিছুকাল পরে তিনি লেখেন, "ভারতকে ভগবানের হাতে, অথবা আধুনিক পরিভাষায় বলিতে গেলে, নৈরাজ্যের হাতে ছাড়িয়া দিয়া যান। তখন সমস্ত দল হয় নিজেদের মধ্যে কুকুরের মতো মারামারি করিবে, না হয় সত্যকার দায়িত্ববোধের সম্মুখীন হইয়া নিজেদের মধ্যেই মীমাংসা করিয়া ফেলিবে...।"

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক প্রস্তাবে বলা হইল যে ব্রিটিশের শাসন-ক্ষমতা ত্যাগের দাবী প্রত্যাখ্যাত হইলে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'ব্যাপক' অহিংস সংগ্রাম শুরু করিতে কংগ্রেস 'অনিচ্ছুক হইয়াও বাধ্য' হইবে। এই প্রস্তাব ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ৮ই আগস্ট বোম্বাইতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গৃহীত হয়। ঘোষণা করা হয়:

"ভারতের স্বার্থে এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের সার্থকতার জন্য ভারতে অবিলম্বে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হওয়ার জরুরী প্রয়োজন। এই শাসন চালাইয়া যাওয়ার ফলে ভারত হীনমন্য ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, এবং ইহারই ফলে দেশরক্ষায় এবং পৃথিবীর মুক্তিসংগ্রামে যোগদান সম্বন্ধে ভারত ক্রমশঃই অপারক হইয়া পড়িতেছে।"

পরদিন সকালে (১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ৯ই আগস্ট) মহাত্মা গান্ধী সহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নেতৃবর্গ ও বহু কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি বেআইনী ঘোষিত হইল। লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো ইচ্ছাকৃতভাবে সারা ভারত জুড়িয়া কঠোর দমননীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে হঠাৎ গ্রেপ্তার

করার ফলে জনসাধারণের নেতা বলিতে কেহ রহিলেন না এবং সরকারের হিংস্র অত্যাচারে জনসাধারণ চরম ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহ পাইল। মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নেতৃহীন জনতার সহিংস সংগ্রামের পূর্ণ কাহিনী এখনও পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই। সরকারী বিবৃতি অনুযায়ী ২৫০টি রেল স্টেশন ও ৫০০টি ডাকঘর হয় ক্ষতিগ্রস্ত না-হয় ধ্বংস করা হয়, ১৫০টির অধিক থানায় আক্রমণ চালানো হয়, বেশ কিছু সংখ্যক রাজকর্মচারী ও সৈন্য নিহত হয় এবং ৯০০ জনের অধিক নাগরিকের প্রাণ যায়।

মহাত্মা গান্ধী এই হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিন্দুমাত্র দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে তিনি তিন সপ্তাহ অনশন করিয়া রহিলেন। মহাত্মা গান্ধীর জীবন যখন ঘোরতর সংকটাপন্ন তখনও তাঁহাকে মুক্তিদানে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর অস্বীকৃতির দরুণ দুইজন হিন্দু ও একজন পার্শী বড়লাটের শাসন-পরিষদ হইতে পদত্যাগ করিলেন। ইহার পরেই ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে বাঙ্গালায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে বহু লক্ষ লোকের প্রাণ যায় এবং ১১৭৬ সালের (১৭৭০ খ্রীস্টাব্দ) কুখ্যাত 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' বিভীষিকা নূতন করিয়া বাঙ্গালাদেশে দেখা দেয়।

রাজাগোপালাচারি প্রস্তাব (১৯৪৪)ঃ ইতিমধ্যে মিঃ জিন্না ভারতকে ভাগ করিয়া একটি সার্বভৌম মুসলমান রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। মাদ্রাজের বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারি পাকিস্তানের ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ সহযোগিতার এক প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মে বন্দিদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাবটি মিঃ জিন্নার নিকট পেশ করিলেনঃ (১) মুসলিম লীগ স্বাধীনতার দাবীকে সমর্থন জানাইবে এবং অন্তর্বর্তীকালীন অস্থায়ী সরকার গঠনে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিবে। (২) যুদ্ধ শেষ হইলে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসী গণভোটের দ্বারা পৃথক রাষ্ট্রগঠন করিতে চায় কি না তাহা সিদ্ধান্ত করিবে। (৩) পৃথকীকরণ সিদ্ধান্ত হইলে প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে দুইটি নূতন রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি করা হইবে। (৪) ইংলণ্ড কর্তৃক ভারত সরকারের পূর্ণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর হইলে তবেই এই সর্তগুলি প্রযোজ্য হইবে।

মিঃ জিন্না এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রস্তাবিত গণভোটে মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের অ-মুসলমান অধিবাসীদের অংশগ্রহণ করিতে দিতে তিনি অস্বীকার করিলেন: মুসলমানদের জন্য তিনি যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করিতেন তাহা অ-মুসলমানদের দিতে তিনি রাজী হইলেন না (উত্তর-পূর্ব ভারতের জনসংখ্যায় অ-মুসলমানের হার শতকরা ৪৮ ভাগ ও উত্তর-পশ্চিমে শতকরা ৩৮ ভাগ)। প্রতিরক্ষার ন্যায় যে সমস্ত ব্যাপারে সমস্বার্থ আছে, সেগুলির উপরে মিলিত নিয়ন্ত্রণেও তিনি রাজী হইলেন না।

ওয়াভেল পরিকল্পনা (১৯৪৫): ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর স্থানে লর্ড ওয়াভেল (Lord Wavell) বড়লাট নিযুক্ত হইলেন। প্রধান সেনাপতি হিসাবে তিনি ক্রিপ্‌স্ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের ঐক্যকে সমর্থন করিতে গিয়া তিনি বলেন, "ভূগোলকে সংশোধন করা যায় না। প্রতিরক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহিরের অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় ভারত একটি স্বাভাবিক ঐক্যবদ্ধ খণ্ড (Unit)।" ইহার এক বৎসর পরে তিনি ভারতের অচলাবস্থা দূরীকরণে চেষ্টিত হন। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকারের সহিত পরামর্শের জন্য তিনি লণ্ডন যান। তাঁহার ভারতে প্রত্যাবর্তনের (১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুন) কয়েকদিন পরে ভারত-সচিব মিঃ অ্যামেরী (Mr. Amery) কমন্স সভায় একটি বিবৃতি দেন (১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুন)। বিবৃতিতে বলা হয়, "১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের প্রস্তাব কোনরূপ পরিবর্তন বা সর্তসাপেক্ষ না রাখিয়া পূরাপুরি বহাল রহিল।" নূতন সংবিধান রচনার আগে গভর্ণর-জেনারেলের শাসন-পরিষদকে পুনর্গঠিত করার প্রস্তাব করা হইল। গভর্ণর-জেনারেল ও প্রধান সেনাপতি ব্যতীত ("প্রধান সেনাপতি যুদ্ধ-সচিবের পদে বহাল থাকিবেন") শাসন-পরিষদের অন্য সদস্যগণ ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন। শাসন-পরিষদের সদস্য মনোনয়নে প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের সমভার প্রতিনিধিত্ব ("balanced representation") থাকিবে, ইহার মধ্যে মুসলমান ও বর্ণ হিন্দুদের আনুপাতিক হার হইবে সমান সমান। বৈদেশিক ব্যাপারের দপ্তর গভর্ণর-জেনারেলের হাত হইতে শাসন-পরিষদের একজন ভারতীয় সদস্যের

হাতে দেওয়া হইবে (তবে ভারতের প্রতিরক্ষার অংশ হিসাবে উপজাতীয় ও সীমান্ত সম্পর্কিত বিষয়গুলি এই দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত হইবে না)। বিবৃতিতে এইরূপ আশা প্রকাশ করা হইল যে কেন্দ্রে সহযোগিতার ছাপ প্রদেশগুলিতেও পড়িবে এবং যে সমস্ত প্রদেশে (১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আইনের) ৯৩ ধারার শাসন চলিতেছে সেখানে প্রধান দলগুলির সহযোগিতার (coalition) ভিত্তিতে দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হইবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তিদান করা হইল (১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুন) এবং ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে সিমলায় নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। শাসন-পরিষদের গঠন সম্পর্কে সম্মেলনে কোনও মতৈক্য হইল না। কংগ্রেস দুইজন কংগ্রেসী মুসলমানকে শাসন-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী তুলিল, জাতীয় সংগঠন হিসাবে শুধুমাত্র হিন্দুদের মনোনয়নের অধিকার গ্রহণ করিতে কংগ্রেস স্বীকৃত হইল না। মিঃ জিন্না দাবী করিলেন যে পরিষদের সমস্ত মুসলমান সদস্যদের মুসলিম লীগই নির্বাচন করিবে। লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করিলেন, সম্মেলন ব্যর্থকাম হইয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলিলেন, দেশের প্রগতিকে রুদ্ধ করিতে মুসলিম লীগকে বড়লাটই সাহায্য করিয়াছেন।

সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সেরা ছাত্র সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ইস্তফা দিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। জাতীয় উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁহার আনুগত্যকে কেহ কখনও সন্দেহ না করিলেও, উচ্চতর কংগ্রেস নেতৃত্বের ঘোষিত নীতির সহিত তাঁহার প্রায়শঃই মতানৈক্য ঘটিত। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তোলেন, অথচ কংগ্রেস সংগঠন চাহিল 'ডোমিনিয়ন্ স্ট্যাটাস্'। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের লাহোর অধিবেশনে তিনি অধিবেশন-গৃহ ত্যাগ করিয়া 'কংগ্রেস ডিমোক্র্যাটিক পার্টি' নামক এক নূতন দল গঠন করিলেন। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলে সুভাষচন্দ্র ইহাকে ব্যর্থতার স্বীকৃতি বলিয়া অভিহিত করিলেন। মতামতে রক্ষণশীল না হইলেও ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে এবং ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে পুনর্বার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু উচ্চতর কংগ্রেস নেতৃত্বের সহিত মতবিরোধের ফলে

তাঁহাকে বাধ্য হইয়া 'ফরোয়ার্ড ব্লক' (Forward Bloc) নামক নূতন এক দল গঠন করিতে হয়।

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী কলিকাতার বাসগৃহ হইতে তিনি অন্তর্হিত হন এবং গুপ্তভাবে আফগানিস্তান হইয়া বার্লিন ও রুশিয়ায় যান। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি মালয় ও ব্রহ্মদেশে আসেন। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা তখন এই অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উৎখাত করিয়া ফেলিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র এখানে আসিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়িয়া তোলেন এবং আসামে ব্রিটিশের সহিত লড়াই করেন। জাপানীদের হস্তে বন্দী প্রধানতঃ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের লইয়াই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়। প্রিয়তম 'নেতাজী'র নেতৃত্বে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলিয়া এই সৈন্যগণ ভারতের মুক্তি অর্জনের জন্য প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন। আসাম হইতে ব্রিটিশ ফৌজকে হঠাইবার জন্য তাঁহাদের অদ্ভুত বীরত্বের পূর্ণ কাহিনী এখনও লেখা হয় নাই। কিন্তু অসম যুদ্ধে তাঁহাদের অনিবার্য পরাজয় ঘটে এবং ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশ পুনরধিকার করিবার পর এই বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্য ব্রিটিশের হাতে বন্দী হয়। ১৯৪৫-৪৬ খ্রীস্টাব্দে আজাদ হিন্দ বাহিনীর এই বীরদের এক ব্রিটিশ সামরিক আদালতে বিচার হয় এবং অনেকেই দণ্ডাদেশ পায়। কংগ্রেস ইহাদের সমর্থনে আগাইয়া আসে এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবীদের দ্বারা ইহাদের পক্ষ সমর্থন করায়।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে আগস্ট সুভাষচন্দ্র এক বিমান-দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুবরণ করেন বলিয়া কথিত হয়। তাঁহার সম্পর্কে বলিতে গিয়া কংগ্রেসের এক ইতিহাসকার লিখিয়াছেন, "বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবন ছিল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। (তিনি ছিলেন) অতীন্দ্রিয়বাদ ও বাস্তবতার, অতীব ধর্মানুরাগ ও দৃঢ় বাস্তববোধের, গভীর আবেগবিহ্বলতা ও কঠিন পরিকল্পিত কর্মদক্ষতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।"

নির্বাচন পর্ব (১৯৪৫-৪৬) ঃ সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার পর, ব্রিটেনে শ্রমিক দল (Labour Party) ক্ষমতাধিষ্ঠিত হওয়ায় এবং যুদ্ধ-পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক জটিলতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির ধারায় পরিবর্তন সূচিত হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন সেনানীর বিচারে জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। এই বীর যোদ্ধাদের আদর্শের

প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করায় কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। স্থির হয় যে ১৯৪৫-৪৬ খ্রীস্টাব্দের শীতকালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করিলেন যে নির্বাচনপর্ব শেষ হইলে একটি সংবিধান-রচনাকারী সংস্থা নিয়োগ করা হইবে এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন লইয়া বড়লাটের শাসন-পরিষদ পুনর্গঠিত হইবে।

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল যে সমস্ত প্রদেশেই অ-মুসলমান আসনগুলি এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বেশির ভাগ মুসলমান আসন ও যুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, আসামের কতকগুলি মুসলমান আসন কংগ্রেস লাভ করিয়াছে। উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত সমস্ত প্রদেশের সংখ্যাধিক মুসলমান আসন মুসলিম লীগ পায়। বঙ্গদেশ ও সিন্ধুদেশ ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করিল। সর্বত্রই নিখাদ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হইল, কেবল পঞ্জাবে কংগ্রেস, আকালী শিখ, ইউনিয়নিস্ট হিন্দু ও মুসলমানদের লইয়া গঠিত যুক্তদলীয় মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্যাবিনেট মিশন (১৯৪৬) ঃ ১৯৪৫-৪৬ খ্রীস্টাব্দের শীতকালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এক প্রতিনিধিদল এদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতালাভের জন্য ভারতে আসেন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ সরকার পার্লামেন্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন: ভারত-সচিব (লর্ড পেথিক্-লরেন্স), বোর্ড অব্ ট্রেড-এর সভাপতি (স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্) এবং ফার্স্ট লর্ড অব্ দি অ্যাড্‌মিরাল্‌টিকে (মিঃ এ. ভি. অ্যালেকজাণ্ডার) লইয়া গঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যদের এক বিশেষ মিশনকে সংবিধান গঠনকারী সংস্থা নিয়োগ এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থনপুষ্ট শাসন-পরিষদ গঠনের জন্য ভারতীয় নেতাদের সহিত আলোচনার্থে প্রেরণ করা হইবে। মন্ত্রিসভার এই সদস্যগণ বড়লাটের সহিত একযোগে কাজ করিবেন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই মার্চ প্রধান মন্ত্রী মিঃ অ্যাট্‌লী কমন্স সভায় ঘোষণা করিলেন যে সংখ্যালঘুদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের অগ্রগতিকে নাকচ করিতে দেওয়া হইবে না। এই বিবৃতির ফলে ভারতে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় যে ইহার দ্বারা মুসলিম লীগের সমর্থনকারী চিরাচরিত ব্রিটিশ নীতির পরিবর্তন সূচিত হইল।

তিনজন ব্রিটিশ মন্ত্রী ১৯৪৬খ্রীস্টাব্দের ২৩শে মার্চ করাচীতে আসিয়া পৌছান এবং ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জুন ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। এপ্রিল মাসে তাঁহারা ভারতের সমস্ত দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎকার করেন। মে মাসে সিমলায় কংগ্রেস ও লীগের প্রতিনিধিদের সহিত তাঁহারা এক সম্মেলনে মিলিত হন। কংগ্রেস ও লীগ কোনরূপ আপোষ-মীমাংসায় পৌছিতে অপারক হওয়ার ফলে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে মিশনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

ক্যাবিনেট মিশনের (Cabinet Mission) পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এই :—

মিঃ জিন্না কর্তৃক উপস্থাপিত পাকিস্তানের দাবি মিশন পরীক্ষান্তে বাতিল করিয়া দেন। পাকিস্তান গঠিত হইলেই সম্প্রদায়ভিত্তিক সংখ্যালঘু-প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইবে না এবং বঙ্গদেশ, আসাম ও পঞ্জাবের অ-মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলিকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষে কোনও যুক্তিই নাই। দ্বিতীয়তঃ, পরিবহন-ব্যবস্থা এবং ডাক ও তার-ব্যবস্থাকে খণ্ড-বিখণ্ড করা ক্ষতিকর হইবে। তৃতীয়তঃ, ভারতের সশস্ত্র বাহিনীকে ভাগ করিয়া ফেলা হইলে "গুরুতর বিপদ দেখা দিতে পারে"। সর্বশেষে, "প্রস্তাবিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুইটি অংশ প্রায় ৭০০ মাইল ভূখণ্ড দ্বারা পৃথক হইয়া থাকিবে এবং যুদ্ধ বা শান্তিকালীন এই দুই অংশের যোগাযোগ-ব্যবস্থা ভারতের শুভেচ্ছার উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকিবে।" সেইজন্যই মিশন প্রস্তাব করিলেন যে একটি কেন্দ্রীয় সরকারই কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিবেন :

"ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া গঠিত একটি ভারতীয় ইউনিয়ন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করিবে : বৈদেশিক ব্যাপার, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা ; এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় অর্থাদি আদায়ের ক্ষমতা ইহার থাকিবে।"

কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়সমূহ ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়ে প্রদেশগুলির পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার থাকিবে এবং সমস্ত অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary power) প্রদেশগুলির উপর বর্তাইবে। ইহা ব্যতীত "প্রদেশগুলি শাসন-ব্যবস্থাপক (Executive) ও বিধানমণ্ডলী সমন্বিত 'গ্রুপ' (Group) গঠন

করিতে পারিবে এবং কোন্ কোন্ বিষয় প্রাদেশিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা যায় প্রতিটি 'গ্রুপ' তাহা নির্ধারণ করিতে পারিবে।" ছয়টি হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ (মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা) লইয়া 'ক' 'গ্রুপ' গঠিত হইবে। উঃ-পঃ ভারতের মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি (পঞ্জাব, উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুদেশ) লইয়া 'খ' 'গ্রুপ' গঠন করা হইবে। বাঙ্গালা ও আসাম সম্মিলিতভাবে 'গ' 'গ্রুপ' গঠন করিবে। চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশগুলির মধ্যে তিনটি (দিল্লী, আজমীর-মারওয়াড়া ও কূর্গ) 'ক' গ্রুপে এবং একটি (বেলুচিস্তান) 'খ' 'গ্রুপে' যোগদান করিবে। প্রদেশগুলির 'পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনাধিকার' ও 'গ্রুপ' সৃষ্টির ব্যবস্থা লীগকে 'পাকিস্তানের সারবস্তু' দান করার জন্যই রাখা হয়। স্পষ্ট বোঝা গেল যে 'খ' ও 'গ' গ্রুপগুলি সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

সংবিধান-রচনাকারী সংস্থাটি নির্বাচন করিবার এক জটিল প্রণালী লিপিবদ্ধ হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনটি প্রধান সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়: 'সাধারণ' ('General'—মুসলমান বা শিখ নয় এমন সমস্ত লোক), মুসলমান ও শিখ। প্রত্যেক প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের 'সাধারণ', মুসলমান ও শিখ এই তিনভাগে ভাগ করা হইবে এবং এই প্রত্যেকটি ভাগই একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংবিধান-রচনাকারী সংস্থায় স্বীয় প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে। প্রতিটি প্রদেশ ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে হইবে, মোটামুটি প্রতি দশ লক্ষ লোক পিছু একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। ১১টি গভর্ণর-শাসিত প্রদেশে এই ব্যবস্থা প্রযোজিত হইবে। ৪টি চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ সম্পর্কে অন্য ব্যবস্থা হইবে। মোটের উপর, 'ক' গ্রুপের ছয়টি প্রদেশের ১৮৭ জন (১৬৭ জন 'সাধারণ' ও ২০ জন মুসলমান), 'খ' গ্রুপের তিনটি প্রদেশের ৩৫ জন (৯ জন 'সাধারণ', ২২ জন মুসলমান, ৪ জন শিখ) এবং 'গ' গ্রুপের দুইটি প্রদেশের ৭০ জন (৩৪ জন 'সাধারণ', ৩৬ জন মুসলমান) সদস্য থাকিবেন। এই ২৯২ জন সদস্যের সহিত চারিটি চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশের ৪ জন ও দেশীয় রাজ্যসমূহের অনধিক ৯৩ জন সদস্য যুক্ত হইবেন। দেশীয় রাজ্যসমূহের সদস্য মনোনয়ন-প্রণালী 'পরামর্শ করিয়া নির্ধারণ' করা হইবে।

সংবিধান রচনাকারী সংস্থা এইভাবে গঠিত হইবার পর ইহাকে তিনটি বিভাগে (Section) বিভক্ত করা হইবে ('ক' 'গ্রুপে'র জন্য 'ক' বিভাগ ইত্যাদি)। প্রতিটি 'গ্রুপ' স্বীয় প্রদেশগুলির জন্য সংবিধান রচনা করিবে এবং গ্রুপের জন্য সংবিধান গঠিত হইবে কি না তাহা নির্ধারণ করিবে। এই তিনটি বিভাগ ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণ মিলিতভাবে ভারতীয় ইউনিয়নের সংবিধান রচনা করিবেন। নাগরিক অধিকার, সংখ্যালঘু সমস্যা এবং উপজাতীয় ও সাধারণ শাসনবিধির বহির্ভূত এলাকাগুলি (Excluded Areas) সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য একটি কমিটি থাকিবে।

ইউনিয়ন ও 'গ্রুপ'গুলির সংবিধানে এই মর্মে 'একটি ব্যবস্থা থাকিবে যে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে যে কোনও প্রদেশ প্রাথমিক ১০ বৎসরকাল পরে অথবা তাহার পর প্রতি ১০ বৎসর অন্তর সংবিধানের ধারাসমূহ পুনর্বিবেচনার দাবী করিতে পারিবে'। তাহা ছাড়া, নূতন সংবিধানের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পরে যে কোনও প্রদেশ নিজ 'গ্রুপ' ছাড়িয়া আসিতে পারিবে।

সংবিধান-রচনাকারী সংস্থা ক্ষমতা হস্তান্তরকরণের ফলে উদ্ভূত কতকগুলি বিষয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্রিটেনের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করিবে।

দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রসঙ্গে ক্যাবিনেট মিশন ঘোষণা করিলেন যে নূতন সংবিধান বলবৎ হইলে ব্রিটিশ সরকার সার্বভৌমত্বের (Paramountcy) ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না। বলা হইল, "ইহার অর্থ এই যে, ব্রিটিশ সম্রাটের সহিত দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁহাদের যে ক্ষমতা ছিল তাহার আর অস্তিত্ব থাকিবে না এবং দেশীয় রাজ্যগুলি সার্বভৌম শক্তিকে যে সকল অধিকার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা ফিরিয়া পাইবেন।" অতএব দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান অথবা নিজ পৃথক স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার আইনগত স্বাধীনতা থাকিবে। ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিলে যে সমস্ত ক্ষমতা ইউনিয়নকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে সেগুলি ব্যতীত তাঁহাদের অন্য সমস্ত ক্ষমতাই বহাল থাকিবে এবং তাঁহাদের প্রতিনিধিবর্গ সংবিধান-রচনাকারী সংস্থার কার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থনপুষ্ট 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' (Interim Government) গঠনের উপর ক্যাবিনেট মিশন সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিলেন।

গণপরিষদ ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার (১৯৪৬-৪৭)ঃ সমস্ত দলই ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা স্বীকার করিয়া লইল এবং ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে সংবিধান রচনাকারী সংস্থার বা গণপরিষদের (Constituent Assembly) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। ২১০টি 'সাধারণ' আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৯৯টি আসন পাইল, মুসলিম লীগ ৭৮টি মুসলমান আসনের মধ্যে ৭৩টি অধিকার করিল। কংগ্রেস মনোনীত ব্যক্তি ও মিত্রভাবাপন্নগণ আরও কয়েকটি আসন দখল করায় ২৯৬ জনের পরিষদে ২১১ জন সদস্যের আনুগত্য কংগ্রেসের পক্ষেই রহিল। কংগ্রেস এই কর্তৃত্বের অবস্থায় আসার ফলে মিঃ জিন্না শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জুলাই মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার প্রতি নিজ স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা ও 'পাকিস্তান অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার' সিদ্ধান্ত করিল।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট—মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবসে—কলিকাতায় কুখ্যাত 'হত্যা-তাণ্ডব' অনুষ্ঠিত হইল এবং মুসলিম লীগ সরকারের শাসনাধীন ভারতের প্রধান নগরী কলিকাতা 'রক্তকর্দমাক্ত কসাইখানায়' পরিণত হইল। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বঙ্গদেশে দুইটি মুসলমান-প্রধান জেলায় (নোয়াখালি ও ত্রিপুরা) মুসলমানগণ প্রতিবেশী হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিয়া ভীষণ হত্যাকাণ্ড ও অকথ্য অত্যাচার চালায়। তাহার পর বিহার ও যুক্ত প্রদেশ এবং বোম্বাইতে দাঙ্গা বাধিয়া যায়, ফলে বহু মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বঙ্গদেশের হিন্দুগণ অনুভব করিতে লাগিল যে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের শাসনাধীনে তাহাদের ধনপ্রাণ ও ইজ্জৎ নিরাপদে থাকিবে না, ফলে বঙ্গদেশকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া এক ভাগে হিন্দু-প্রধান এলাকাগুলি ও অন্য ভাগে মুসলমান-প্রধান এলাকাগুলিকে পৃথক করিয়া দিবার দাবী ক্রমশঃই জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে থাকে।

ইতোমধ্যে ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেস-মনোনীত ব্যক্তিদের লইয়া একটি 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' গঠন করিলেন।

এই সরকার ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর কার্যভার গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিত নেহেরু এই সরকারের সহ-সভাপতি হইলেন, গভর্নর-জেনারেল পূর্বের ন্যায়ই সভাপতি রহিলেন। মিঃ জিন্নার সহযোগিতা চাওয়া হইলে তিনি মুসলিম লীগকে সরকারে যোগদানের অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলেন! লর্ড ওয়াভেল অবশ্য তাঁহার সহিত আপোষ-আলোচনা চালাইতে থাকেন, ফলে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর মুসলিম লীগ মনোনীত পাঁচজন ব্যক্তি 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে' যোগ দেন। 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের' অভ্যন্তরে কংগ্রেস ও লীগ দল একত্রে কাজ চালাইয়া যাইতে পারিতেছিল না। কংগ্রেস এই সরকারকে কার্যতঃ জাতীয় সরকারে পরিণত করিতে চাহিতেছিল (গোঁড়া আইনের দৃষ্টিতে এই সরকার অবশ্য পুরাতন শাসন-পরিষদ ভিন্ন অন্য কিছু নহে, শুধু ভিন্নভাবে গঠিত মাত্র), মুসলিম লীগ গভর্নর-জেনারেলের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতেছিল। পণ্ডিত নেহেরু প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে "ব্রিটিশ সমর্থন আদায়ের জন্য লীগ প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে এবং নিজেকে রাজার দল (King's Party) রূপে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে।"

'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে' যোগদানের পরেও লীগ গণপরিষদে যোগ না দিবার সিদ্ধান্তে অবিচল রহিল। গণপরিষদের কাজকর্ম চালানো সম্পর্কে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মতৈক্যের ভিত্তি কি হইতে পারে তাহা আলোচনার জন্য ব্রিটিশ সরকার বড়লাট এবং কংগ্রেস, লীগ ও শিখ প্রতিনিধিদের লণ্ডনে আমন্ত্রণ জানান। এই সম্মেলনে পণ্ডিত নেহেরু কংগ্রেসের ও মিঃ জিন্না লীগের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁহাদের সহিত আলোচনান্তে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকার এক ঘোষণাবাণীতে লীগের দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করেন। লীগ গণপরিষদে যোগদান করিবে এই আশায় কংগ্রেস এই ঘোষণাও স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু মিঃ জিন্না তাঁহার নীতি পরিবর্তনে রাজী হইলেন না।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর নয়া দিল্লীতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়, মুসলিম লীগ ইহাতে অংশগ্রহণ করে নাই। ভবিষ্যতের নূতন শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঘোষণা-সম্বলিত প্রধান প্রস্তাব পণ্ডিত নেহেরু উত্থাপন করেন এবং ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারত

যে একটি "স্বাধীন সার্বভৌম গণরাষ্ট্র" (Sovereign Democratic Republic) হইবে, এই প্রস্তাবে সেই মূলসূত্রটি লিপিবদ্ধ ছিল। পরে এইটিই ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধের (Preamble) ভিত্তিস্বরূপ হয়।

ভারত-বিভাগ (১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট) : অবিচলভাবে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করার ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশঃই অবনতির দিকে যাইতে থাকে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ সরকার একটি ঘোষণাবাণীতে '১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের পূর্বেই দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করার নিশ্চিত মনোভাব' ব্যক্ত করেন। লীগ যদি গণপরিষদে যোগদান না করে তাহা হইলে 'ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্ধারিত সময়ে কাহার হস্তে অর্পণ করা হইবে—ব্রিটিশ ভারতের কোনও ধরণের কেন্দ্রীয় সরকারের উপরই পূর্ণ ক্ষমতা অর্পিত হইবে, না কোনও কোনও এলাকায় বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের উপরই ইহা অর্পিত হইবে, অথবা সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত এবং ভারতের জনসাধারণের স্বার্থানুকূল বলিয়া যাহা বোধ করা যাইবে তেমন কোনও উপায়ে ভারার্পণ করা হইবে—সে-সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে বিবেচনা করিতে হইবে।' ভারতের ঐক্য রক্ষা করা সম্পর্কে ক্যাবিনেট মিশনের সিদ্ধান্তকে এইভাবে উল্টাইয়া দেওয়া হইল এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকেই স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হইল।

এই বিবৃতি প্রকাশিত হইবার পরে কলিকাতা, আসাম, পঞ্জাব ও উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে সুপরিকল্পিতভাবে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধে। অ-মুসলমানগণ সর্বত্রই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষতঃ পঞ্জাবের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে হাজার হাজার অ-মুসলমানের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্জাবে কংগ্রেস-সমর্থক যুক্তদলীয় মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইতে মুসলিম লীগ সক্ষম হয় এবং ঐ প্রদেশে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আইনের ৯৩ ধারা অনুযায়ী গভর্ণরের শাসন শুরু হয়। কিন্তু আসাম ও উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো গেল না। বঙ্গদেশের হিন্দুগণ প্রায় একবাক্যে দেশবিভাগ চাহিল। পঞ্জাবের হিন্দু ও শিখগণও উপলব্ধি করিল যে দেশবিভাগ করিয়া হিন্দু-প্রধান জেলাগুলিকে মুসলিম লীগের আওতার বাহিরে লইয়া গেলেই তাহাদের নিরাপত্তা রক্ষিত হইবে।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে লর্ড মাউন্ট্ব্যাটেন (Lord Mountbatten) লর্ড ওয়াভেলের স্থলে বড়লাট হইয়া আসেন। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জুন এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে তিনি ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার একটি সমাধান ঘোষণা করিলেন। বিবৃতিতে ভারত-বিভাগ এবং বঙ্গদেশ, আসাম ও পঞ্জাব এই তিনটি প্রদেশ ভাগের কথা বলা হইল। বঙ্গদেশ ও পঞ্জাবের বিধানমণ্ডলী এই প্রদেশ বিভাগ চাহে কিনা তাহা নির্ধারণ করা হইবে। (আসামের অন্তর্গত) শ্রীহট্ট জেলায় গণভোট দ্বারা নির্ধারিত হইবে এই জেলা আসামের (ভারতের) অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, না পূর্ববঙ্গে (পাকিস্তানে) যোগদান করিবে। উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ ভারতেই থাকিবে, না পাকিস্তানে যোগ দিবে তাহাও গণভোট দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

কংগ্রেস, লীগ ও শিখগণ মাউন্ট্ব্যাটেন পরিকল্পনা (Mountbatten Plan) স্বীকার করিয়া লইল এবং অবিলম্বে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইল। বঙ্গদেশ ও পঞ্জাবের আইনসভায় এই প্রদেশগুলি বিভাগের সিদ্ধান্ত করা হইল। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম-পঞ্জাব পাকিস্তানে যোগদান করিল, পশ্চিম-বঙ্গ ও পূর্ব-পঞ্জাব ভারতীয় ইউনিয়নে থাকার সিদ্ধান্ত করিল। শ্রীহট্টে গণভোটের ফলে এই জেলাটির পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তিই সাব্যস্ত হইল। স্যার সিরিল র‍্যাড্ক্লিফের সভাপতিত্বে গঠিত এক বিচারবিভাগীয় কমিশন এই নূতন প্রদেশগুলির সীমানা চিহ্নিত করিলেন। গণভোটে উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশের পাকিস্তানভুক্তি সিদ্ধান্ত হইল; এই প্রদেশের কংগ্রেস গণভোটে অংশগ্রহণ করিল না, তাহারা স্বাধীন পাঠান রাষ্ট্র সৃষ্টির দাবী করিল। বেলুচিস্তান ও সিন্ধুদেশ পাকিস্তানে যোগদানই সাব্যস্ত করিল।

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (১৯৪৭)ঃ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি কর্তৃক মাউন্ট্ব্যাটেন্ পরিকল্পনা স্বীকৃত হওয়ায় ভারত-বিভাগ প্রস্তাবকে আইনগত কার্যকরিতা দান এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। অতএব ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act) গৃহীত হইল। এই আইনে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও ভারত-বিভাগের বিধান থাকে। এই তারিখে ভারতবর্ষে ভারত ও পাকিস্তান নামধেয় দুইটি স্বাধীন ডোমিনিয়নের প্রতিষ্ঠা

হইল। প্রতিটি ডোমিনিয়নের সরকারের পরামর্শক্রমে রাজা[১] সেই ডোমিনিয়নে একজন গভর্ণর-জেনারেল[২] নিয়োগ করিবেন। গভর্ণর-জেনারেল বিধানমণ্ডলীর নিকট দায়ী মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে কার্য পরিচালনা করিবেন। ডোমিনিয়ন দুইটির বিধানমণ্ডলীগুলির, অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তানের গণপরিষদ দুইটির, নিজ ডোমিনিয়নের জন্য আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কোনও আইনই ইহাদের কাহারও সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না। ব্রিটিশ ভারতের উপর ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্ব এবং দেশীয় রাজ্যগুলির উপর সম্রাটের আধিপত্য লোপ পাইল।

ভারত ও কমনওয়েল্থ্ঃ ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ্ হইতে ভারতের সম্পূর্ণ সম্পর্ক-বিচ্যুতির পথে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অন্তরায় হয় নাই। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারতকে গণরাষ্ট্র (Republic) ঘোষণা করা হয়। তাহার পর ব্রিটিশ সম্রাটের সহিত ভারতের কোনও সাংবিধানিক সম্পর্ক রহিল না। কিন্তু গণপরিষদ ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত কমন্‌ওয়েল্থ্ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে—এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রিটিশ সম্রাটের অনুগত না হইয়াও ভারত গণরাষ্ট্র কমন্‌ওয়েল্থের সদস্য হইল।

দেশবিভাগের ফলঃ ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ এই উপ-মহাদেশের উপর দিয়া কৃত্রিম সীমান্ত রেখা টানিয়া দিলেও মাউণ্ট্‌ব্যাটেন পরিকল্পনার উদ্ভাবক ও সহযোগীরা কোনও সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেন না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম-পঞ্জাব, উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু

১। ইংলণ্ডের রাজা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট হইতে আর ভারতের 'সম্রাট' রহিলেন না। এই তারিখ হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত তিনি ভারতের 'রাজা' থাকিলেন।

২। লর্ড মাউণ্ট্‌ব্যাটেন্ ভারতের গভর্ণর-জেনারেল রহিলেন। তাঁহার পরে মিঃ রাজা-গোপালাচারী ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর-জেনারেল হন। ভারতীয় গণরাষ্ট্রের উদ্বোধন হইলে তিনি পদাধিকার হারান। মিঃ জিন্না ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট পাকিস্তানের গভর্ণর-জেনারেল হন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে মিঃ নাজিমুদ্দীন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

দেশ, বাহাওয়ালপুর রাজ্য ও বেলুচিস্তানে হিন্দু ও শিখদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার চলে। ফলে ৫০ লক্ষেরও অধিক হিন্দু ও শিখ পাকিস্তানে সর্ববিধ ঐহিক অধিকার পরিত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া আসে। বর্তমানে পশ্চিম-পাকিস্তানে অ-মুসলমান নাই বলিলেই চলে। পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের অবস্থা এরূপ সঙ্কটজনক হইয়া উঠে যে ২০ লক্ষাধিক হিন্দু পশ্চিম-বঙ্গ ও আসামে চলিয়া আসে ; এখনও শরণাগতের ভারতে আগমন বন্ধ হয় নাই। পূর্ব-পঞ্জাবে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের উপর প্রতিশোধাত্মক অত্যাচার চলার ফলে এই প্রদেশের অধিকাংশ মুসলমান পাকিস্তানে চলিয়া যায়। ভারতের অন্যত্র মুসলমানগণ সম্পূর্ণ নিরাপদেই রহিল।

রাজনৈতিক ভাবে দুইটি রাষ্ট্র মিত্র না হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূলে রহিয়াছে পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্মীর আক্রমণ ও কাশ্মীরের একাংশ অধিকার (১৯৪৭) এবং বিদেশে ক্রমাগত ভারত-বিদ্বেষী প্রচার অভিযান। ভারত-পাকিস্তান উপ-মহাদেশের সুসংহত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দেশবিভাগের ধাক্কা সামলাইতে পারে নাই। ভারত বা পাকিস্তান কাহারও পক্ষে দেশবিভাগ শুভ হয় নাই।

রাজন্যবর্গ-শাসিত রাজ্যসমূহের ভারতের অন্তর্ভুক্তি (১৯৪৭-৫০) : ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের অবসানে রাজন্যবর্গ-শাসিত রাজ্যসমূহের নবস্থাপিত "সরকার অথবা সরকারসমূহের সহিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপন, অথবা, তাহা না হইলে, এই সরকার বা সরকারসমূহের সহিত বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থাদি করার" অধিকার স্বীকৃত হয়। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ও ভারতীয় স্বাধীনতা আইন এই ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন সাধন করে নাই। অতএব, ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে দেশীয় রাজ্যসমূহের তত্ত্বগত ভাবে ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগদানের স্বাধীনতা অথবা ইহাদের যে কোনওটির সহিত "বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থাদি করার" স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু 'ভারতের যে কোনও দেশীয় রাজ্যের স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করার এবং ভারতের অবশিষ্টাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার অধিকার' কংগ্রেস মানিয়া লয় নাই। কংগ্রেস রাজন্যবর্গের নিকট 'তাঁহাদের রাজ্যগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নের এক একটি গণতান্ত্রিক খণ্ড (Unit) রূপে গড়িয়া তুলিয়া স্বীয়

প্রজাদের এবং সমগ্রভাবে ভারতের স্বার্থসাধনের' জন্য আহ্বান জানাইল। রাজন্যবর্গ এই আহ্বানে দ্রুত সাড়া দিলেন এবং ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্টের মধ্যেই কাশ্মীর, জুনাগড় ও হায়দরাবাদ ব্যতীত নব 'ভারতের' ভৌগোলিক সীমানাভুক্ত সমস্ত রাজ্যই ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান (Accession) করিল।

প্রথম দিকে যোগদানের সর্ত প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার ও যোগাযোগ—এই তিনটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় এই তিনটি বিষয়ই ইউনিয়ন সরকারের কর্তৃত্বাধীন ছিল। ক্রমশঃ দেশীয় রাজ্যসমূহের জনসাধারণ ও শাসকবর্গ পূর্ণ অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তদানীন্তন দেশীয় রাজ্যসম্পর্কিত মন্ত্রীদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 'বুঝাইয়া রাজী করানোর' নীতির ফলে দেশীয় রাজ্যসমূহ ভারতীয় ইউনিয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়া উঠিল। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাস নাগাদ সংবিধান রচনার কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছানোর সময়ে (কাশ্মীর ব্যতীত) দেশীয় রাজ্যসমূহ ও প্রাক্তন ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলির মধ্যে সমস্ত সাংবিধানিক পার্থক্য নিষ্পত্তি হইয়া যায়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তি (১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট) ও গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার (১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী) মধ্যবর্তী কালে দেশীয় রাজ্যসমূহের সাংবিধানিক বিবর্তন অনেকগুলি স্তরে ঘটিয়াছে। ইহার সবগুলি এখানে সবিস্তারে আলোচনা করা যাইবে না। বর্তমানে অবস্থা এই: (১) দুইটি রাজ্য (কাশ্মীর ও অতিরিক্ত কিছু ভূখণ্ড সমেত মহীশূর) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের খণ্ড (Unit) হিসাবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র প্রশাসন-ব্যবস্থা বজায় রাখিয়াছে। (২) দুইটি রাজ্য (ত্রিপুরা ও মণিপুর) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিলেও এগুলি প্রত্যক্ষভাবে ভারত সরকারের শাসনাধীন। (৩) কতকগুলি রাজ্য একত্রিত হইয়া এক-একটি 'ইউনিয়ন' গঠন করিয়াছে, ইহাদের প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্র প্রশাসন-ব্যবস্থা আছে (যথা—রাজস্থান, কেরল)। (৪) কতকগুলি রাজ্য পার্শ্ববর্তী প্রদেশের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে (যথা—বরোদা, কোল্হাপুর, ময়ূরভঞ্জ, কোচবিহার)।

হায়দরাবাদের নিজাম স্বাধীনতার দাবী করিবেন অথবা ভারত বা পাকিস্তানে যোগদান করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের

২৯শে নভেম্বর ভারত সরকারের সহিত এক স্থিতাবস্থা চুক্তি করিলেন। আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার ফলে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে ভারত সরকার এই রাজ্যের উপর সামরিক দখল জারী করিতে বাধ্য হন। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে নিজাম আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিলেন। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে হায়দরাবাদের অস্তিত্ব লোপ পায়; এই সময়ে ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া পার্শ্ববর্তী অন্ধ্র প্রদেশ, বোম্বাই ও মহীশূরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জুনাগড়ের নবাব পাকিস্তানে যোগদান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু ঐ রাজ্যের প্রজারা ভারত সরকারকে রাজ্যভার অর্পণ করিতে নবাবকে বাধ্য করেন। পরে এক গণভোটে সৌরাষ্ট্র ইউনিয়নের সহিত এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি পাকাপোক্ত হয়।

কাশ্মীরের মহারাজা প্রথমে পাকিস্তানের সহিত এক স্থিতাবস্থা চুক্তি করেন। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানী আক্রমণের মুখে স্বীয় রাজ্যকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করেন। আইনগতভাবে এই রাজ্যটি ভারতীয় ইউনিয়নের অচ্ছেদ্য অংশ। পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্মীর আক্রমণের বিষয়টি ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতের অভিযোগ ক্রমে বর্তমানে জাতিসংঘের বিবেচনাধীন।

সংবিধান রচনা ঃ মুসলিম লীগের বিরোধিতা এবং ফলে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে চূড়ান্ত ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে গণপরিষদ বিশেষ কিছু কাজ করিতে পারেন নাই। ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় গণপরিষদের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হইয়াছিল, মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনায় তাহা দূর হইবার ফলে আইনগত দিক দিয়া এবং কার্যতঃ গণপরিষদ একটি সার্বভৌম সংস্থা হইয়া ওঠে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট গণপরিষদ ডাঃ বি. আর. আম্বেদকরের সভাপতিত্বে সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটি খসড়া সংবিধান রচনা করিয়া ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গণপরিষদের অধ্যক্ষের হাতে দেন। খসড়া সংবিধানের ভিত্তিতে বিস্তৃত ও দীর্ঘস্থায়ী আলোচনার পর ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর তারিখে গণপরিষদ ইহাকে চূড়ান্ত রূপ দান করেন। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে

জানুয়ারী এই সংবিধান বলবৎ হইল। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ হইতে বরাবর ২৬শে জানুয়ারী তারিখে "স্বাধীনতা দিবস" পালিত হইত বলিয়া এই দিনটিকেই স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ভারতের সংবিধান ঘোষণার তারিখরূপে বাছিয়া লওয়া হয়।[১]

অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঃ পূর্বে উল্লিখিত প্রচণ্ড রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক জীবনে সুদূরপ্রসারী বিকাশধারার সূচনা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণের ফলে এবং প্রাচ্যখণ্ডে মিত্রশক্তির যুদ্ধায়োজনে কয়েক বৎসর যাবৎ ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল বলিয়া শিল্পোৎপাদনে তেজীভাব দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, অনেকগুলি রণ-ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভারত হইতে ব্রিটিশ সরকার বহু অর্থব্যয়ে ক্রয় করেন। ফলে ইংলণ্ডের নিকট ভারতের স্টার্লিং পাওনার পরিমাণ স্ফীত হয়। এই অর্থ দিয়া ভারত সরকার যুদ্ধপূর্ব কালের দেয় স্টার্লিং ঋণ পরিশোধ করেন এবং ভারতীয় রেলওয়ে কোম্পানীগুলিতে ব্রিটিশ অংশীদারদের অংশ ক্রয় করেন। শিল্পায়নের অগ্রগতি ও স্টার্লিং পাওনা জমিয়া যাওয়ার ফলেই যুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন কার্য সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

অথচ ভারতের জনসাধারণকে ইহার জন্য চরম মূল্য দিতে হইয়াছে। যুদ্ধব্যয় বাবদ প্রচুর অর্থ দিতে হইয়াছে। যুদ্ধের বৎসরগুলিতে ভারত সরকারের বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা। "ইহার মধ্যে প্রতিরক্ষার জন্যই ব্যয় হইত ৭৯৫ কোটি টাকা। যুদ্ধ না হইলে এই খাতে ভারত যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিত এই অঙ্ক তাহা অপেক্ষা ৫৭০ কোটি টাকা অধিক।" যুদ্ধের সূত্রপাতেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, অথচ ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কোনও প্রচেষ্টা হয় নাই। মুদ্রাস্ফীতিকে সীমা-বদ্ধ করার কাজে সরকারের ব্যর্থতার দরুণই ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে বাঙ্গালার মহা-মন্বন্তর গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে। আজও যে সমস্ত আর্থিক ও

১। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবে বলা হয়, "ভারতকে অবশ্যই ব্রিটিশ বন্ধন ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করিতে হইবে।" ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের সর্বত্র জনসভা করিয়া এই প্রস্তাবটি পাঠ করা হইত।

অর্থনৈতিক সমস্যা আমাদের পীড়ার কারণ হইয়া আছে, তাহাদের উদ্ভব যুদ্ধের সময়েই হয়।

শেষ কথাঃ বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে গণতান্ত্রিক ভারত সম্মানের স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রজ্ঞাদীপ্ত বৈদেশিক নীতির ফলে ভারত আন্তর্জাতিক সম্মান ও আস্থা অর্জন করিতে পারিয়াছে। ভারত এক বার জাতিসংঘের নিরাপত্তা-পরিষদের সদস্য ছিল।

এই প্রাচীন দেশ তবু বিভক্ত। লিখিত ইতিহাসের প্রথম উষাকাল হইতে ভারতের শ্রেষ্ঠতম মনীষিগণ ভারতকে অখণ্ড ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সত্তারূপে দেখিয়া আসিয়াছেন। মহাপদ্ম নন্দ হইতে লর্ড ডালহৌসী পর্যন্ত সমস্ত শক্তিমান শাসকগণই যুদ্ধ ও কূটনীতির মাধ্যমে ভারতের মহান ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। বহুবর্ণাঢ্য এই ভারতীয় জীবন এখন খণ্ডবিখণ্ড। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরুর বলিষ্ঠ প্রেরণার কথা স্মরণ রাখিতে গেলে "ভূগোল, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের যে ভারত, মন ও হৃদয়ের সহিত অচ্ছেদ্য যে ভারত তাহার পরিবর্তন হইতে পারে না।"

ব্রিটিশ রাজশক্তির শাসনকালে ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধিগণ

লর্ড ক্যানিং (নভেম্বর, ১৮৫৮—মার্চ, ১৮৬২)[১]
১ম লর্ড এল্‌গিন্ (মার্চ ১৮৬২—নভেম্বর, ১৮৬৩)
স্যার রবার্ট নেপিয়ার (অস্থায়ী)
স্যার উইলিয়ম্ ডেনিসন (অস্থায়ী)
স্যার জন লরেন্স (জানুয়ারী, ১৮৬৪—জানুয়ারী, ১৮৬৯)
লর্ড মেয়ো (জানুয়ারী, ১৮৬৯—জানুয়ারী, ১৮৭২)
স্যার জন ষ্ট্র্যাচি (অস্থায়ী)
লর্ড নেপিয়ার (অস্থায়ী)
লর্ড নর্থব্রুক (মে, ১৮৭২—এপ্রিল, ১৮৭৬)
লর্ড লিটন (এপ্রিল, ১৮৭৬—জুন, ১৮৮০)
লর্ড রিপন (জুন, ১৮৮০—ডিসেম্বর, ১৮৮৪)
লর্ড ডাফরিন (ডিসেম্বর, ১৮৮৪—ডিসেম্বর, ১৮৮৮)
লর্ড ল্যান্সডাউন (ডিসেম্বর, ১৮৮৮—জানুয়ারী, ১৮৯৪)
২য় লর্ড এলগিন (জানুয়ারী, ১৮৯৪—জানুয়ারী, ১৮৯৯)
লর্ড কার্জন (জানুয়ারী, ১৮৯৯—নভেম্বর, ১৯০৫)
লর্ড অ্যাম্প্‌ট্‌হিল (এপ্রিল—ডিসেম্বর, ১৯০৪)[২]
২য় লর্ড মিণ্টো (নভেম্বর, ১৯০৫—নভেম্বর, ১৯১০)
২য় লর্ড হার্ডিঞ্জ (নভেম্বর ১৯১০—এপ্রিল, ১৯১৬)
লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড (এপ্রিল, ১৯১৬—এপ্রিল, ১৯২১)
লর্ড রীডিং (এপ্রিল, ১৯২১—এপ্রিল, ১৯২৬)
২য় লর্ড লিটন[৩]

১। ক্যানিং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কোম্পানীর অধীনে গভর্ণর-জেনারেল হইয়া ভারতে আসেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সম্রাজ্ঞী ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলে তিনি রাজপ্রতিনিধি হন।

২। লর্ড কার্জন ছুটি নিলে অস্থায়ীভাবে কাজ করেন।

৩। লর্ড রীডিং ছুটিতে গেলে অস্থায়ীভাবে কাজ করেন (১৯২৫)

লর্ড আরুউইন্ (এপ্রিল, ১৯২৬—এপ্রিল, ১৯৩১)[১]

লর্ড গসেন[২]

লর্ড উইলিংডন (এপ্রিল, ১৯৩১—এপ্রিল, ১৯৩৬)

স্যার জর্জ স্ট্যান্‌লী[৩]

লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো (এপ্রিল, ১৯৩৬—অক্টোবর, ১৯৪৩)

লর্ড ওয়াভেল (অক্টোবর, ১৯৪৩—মার্চ, ১৯৪৭)

লর্ড লুইস মাউন্ট্‌ব্যাটেন (মার্চ—১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৭)[৪]

স্যার জন কল্‌ভিল[৫]
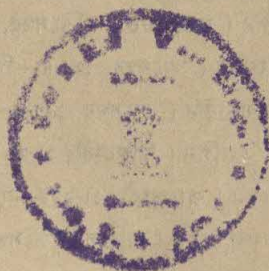
১। বর্তমানে ইনি লর্ড হ্যালিফ্যাক্স।

২। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড আরউইন ছুটিতে গেলে অস্থায়ীভাবে কাজ করেন।

৩। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিংডন ছুটিতে গেলে অস্থায়ীভাবে কাজ করেন।

৪। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনানুযায়ী ভারতের রাজপ্রতিনিধি রহিলেন না, ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ হইতে ভারত ডোমিনিয়নের গভর্ণর-জেনারেল হন। তাঁহার পরে মিঃ সি. রাজাগোপালাচারীই শেষ গভর্ণর-জেনারেল। নূতন ভারতীয় সংবিধানে (২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০) "গভর্ণর-জেনারেল" পদটি বিলুপ্ত হইয়াছে।

৫। ডিসেম্বর ১৯৪৬ ও মে, ১৯৪৭-এ যথাক্রমে লর্ড ওয়াভেল ও লর্ড মাউন্ট্‌ব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের সহিত পরামর্শের জন্য ইংলণ্ডে গেলে অস্থায়ীভাবে কাজ করেন।

ভারতের ইতিহাস

ডাঃ সিংহ ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়